(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৬শ বর্ষ—২য় খণ্ড

(ভাদ্র—মাঘ ১৩৩১)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৩১

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

ষাণ্মাসিক সূচী

(ভাদ্র—মাঘ ১৩৩১)

বিষয় সূচী

লেখক-সূচী

চিত্র (পূর্ণপৃষ্ঠা)

সাজাহান ও তাঁহার কন্যা জাহানারা

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ } ২য় খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩১

{ ২য় খণ্ড { ১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান

শ্রীচৈতন্যদেব কি ভাবে লীলাসংবরণ করেন তৎসম্বন্ধে একটা চির-অনিশ্চয়তা ও সংশয় রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকটতম শিষ্যগণ অবশ্যই তৎসম্পর্কে সকল তথ্যই অবগত ছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক, তাঁহারা কেহই তৎসমুদয় সাধারণ্যে প্রচার করেন নাই, হয়ত প্রচার করা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুকূল মনে করেন নাই। 'চৈতন্য-ভাগবত' ও 'চৈতন্য চরিতামৃত' এই দুই সর্ব্ববৈষ্ণবমান্য গ্রন্থেও একমাত্র তিরোভাবের বৎসর (১৪৫৫ শকাব্দ) ব্যতীত এ বিষয়ে আর কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। এমন কি তাঁহার তিরোভাবের তিথিটিরও উল্লেখ ঐ দুই গ্রন্থে নাই। এরূপ অবস্থায় যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ কতকগুলি প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রবাদগুলির মধ্যে দুইটি অলৌকিক। তাহার প্রথমটি এইরূপ :—শ্রীচৈতন্য একদিন (পুরীর) 'টোটা গোপীনাথ' নামক বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইয়া ঐ বিগ্রহে লীন হইয়া যান। এই প্রবাদবলে অদ্যাপি টোটা গোপীনাথের পাণ্ডারা উক্ত বিগ্রহের বামজঙ্ঘায় একটি স্বর্ণবর্ণ চিহ্ন দেখাইয়া বলেন যে, ঐ স্থান দিয়াই শ্রীচৈতন্য গোপীনাথদেহে প্রবেশ করেন। গৌরাঙ্গদেব 'পুরটসুন্দরদ্যুতি' ছিলেন বলিয়া গোপীনাথের নিকষপাষাণ গাত্রে তাঁহার অঙ্গজ্যোতি অদ্যাপি লাগিয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অলৌকিক প্রবাদ এই যে, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হন। প্রথম প্রবাদটির উল্লেখ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়টির উল্লেখ একখানিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

এই দুইটি অলৌকিক প্রবাদ ভিন্ন তৃতীয় একটি প্রবাদ বা মত এই যে, চৈতন্যদেব একদিন দিব্যোন্মাদাবস্থায় যমুনা বা শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়া আর উঠেন নাই। বাঙ্গালা ১৩১২ সাল পর্য্যন্ত এই তিন প্রবাদ ভিন্ন আর কোনও মত সাধারণের বিদিত ছিল না। আধুনিক কালে যাঁহারা চৈতন্যদেবের

জীবন বা লীলাসম্বন্ধে গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন বা বক্তৃতাদি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব রুচি ও বিশ্বাস অনুসারে এই তিন মতের একমত অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা অলৌকিকে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা সাধারণতঃ তৃতীয় মত গ্রহণ করিয়াছেন; আর যাঁহারা অলৌকিকে অবিশ্বাসী নহেন, তাঁহারা প্রথম বা দ্বিতীয় মত গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ স্বকৃত 'অমিয়-নিমাই চরিত' গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রবাদটি গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য দুইটি প্রবাদের বিচার বা উল্লেখ পর্য্যন্ত করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

বাঙ্গালা ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (ইনি তখনও রায় সাহেব বা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব হন নাই) ও ৺কালিদাস নাথের সম্পাদকতায় কবি জয়ানন্দ প্রণীত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানিতে চৈতন্যদেবের তিরোধান-সম্পর্কে একটি নূতন কথা পাওয়া যায়। উহার মর্ম্ম এইরূপ—রথযাত্রার সময় (বা উহার তিন দিন পরে) নৃত্য করিতে করিতে চৈতন্যদেবের বাম পদে ইটের আঘাত লাগে। ষষ্ঠীর দিন ঐ স্থানে খুব বেদনা হয়, তাহাতেই তিনি স্বীয় আশ্রমে শয্যাশায়ী হন, এবং সপ্তমীর দিন রাত্রিকালে স্বর্গারোহণ করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জয়ানন্দ-রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' একখানি প্রাচীন গ্রন্থ; এমত অবস্থায় তাঁহার প্রচারিত তথ্যটি কি প্রকারে এতকাল সাধারণের, এমন কি বৈষ্ণবসমাজেরও অধিকাংশের, অবিদিত ছিল? ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হয় যে, এই জয়ানন্দের গ্রন্থখানি প্রাচীন হইলেও উহা বৈষ্ণবসমাজে কখনও আদৃত হয় নাই বলিয়া উহার তাদৃশ প্রচার ও প্রচলন হয় নাই। পুস্তকখানিতে কয়েকটি নূতন বিষয় এবং কতকগুলি পূর্ব্বজ্ঞাত ঘটনার নূতন বিবরণ আছে। জয়ানন্দের গ্রন্থের বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় মুখবন্ধে ঐগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য শ্রীচৈতন্যের লীলাবসান উহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা জয়ানন্দ-প্রদত্ত বিবরণটি সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়; অন্ততঃ উহার সত্যতাসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। জয়ানন্দের প্রদত্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এখন উহা একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক।

জয়ানন্দ বলিতেছেন, নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের নবধর্ম্ম প্রচারের ফলে "কলির কলুষ ভরা ডুবিল পাথারে"; এমন কি—যমালয় শূন্য হইবার উপক্রম হইল। তখন যম ব্রহ্মার নিকট গিয়া চাকরী ইস্তাফা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন :—

> যম বলেন, ব্রহ্মা মোর বিষয় কর দূর।
> পাপী সব উদ্ধারিল চৈতন্য ঠাকুর ॥
> চৌরাশী নরককুণ্ড সব শূন্য হৈল।
> ষষ্টিসহস্র দূত ঘরে বসিঞা রৈল ॥

তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শঙ্কর এবং আর আর দেবতা মিলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া

> নীলাচলে নিশায় চৈতন্য টোটাশ্রমে।
> বৈকুণ্ঠে যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে ॥
> আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি।
> রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী ॥

প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়—শেষ দুই ছত্র শ্রীচৈতন্যের উক্তি। জগতে পাপীর অভাব হয় ইহা দেবতারা চান না, কেননা তাহা হইলে যমের চাকরী থাকে না। শ্রীচৈতন্য কি করিবেন? অগত্যা পাপীদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য ফেলিয়া রাখিয়া বৈকুণ্ঠে ফিরিতে রাজি হইলেন, এবং একখানি রথ পাঠাইতে দেবতাদিগকে বলিয়া দিলেন। কেবল তাহাই নহে, দেবতাদিগের নিকট যাহা তিনি অঙ্গীকার করিলেন, সে সকল কথা নিত্যানন্দের অনুপস্থিতিতে "নিষ্কপটে" অদ্বৈতচন্দ্রকে কহিলেন, নিত্যানন্দকে অদ্বৈতের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, এবং নিজে পুরীতে যে বাড়ীতে থাকিতেন (তাহা কাশীমিশ্রের বাড়ী হইলেও) তাহার অধিকার পণ্ডিত গোঁসাইকে দিলেন। এই সকল

বিবরণের পর কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক ছত্রের পর এই পত্রগুলি আছে :—

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে ।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড় দেশে ।*
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে ॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে ।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে ।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা ।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা ॥
নানাবর্ণে দিব্যমালা আইল কোথা হৈতে ।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে ॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ ॥
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি ।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥

"আষাঢ় বঞ্চিত" অর্থ আষাঢ় মাস অতীত হইবার পর। কিন্তু রথ সাধারণতঃ আষাঢ় মাসেই হয়, তবে আষাঢ় মাস প্রায় অতীত হইলে অর্থাৎ মাসের শেষ ভাগে হওয়া সম্ভব। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথ হয়, সুতরাং প্রতিপদ্‌টা বস্তুতঃ আষাঢ় মাস মধ্যে হওয়া চাই, ইহাই বোধ হয় শাস্ত্রের ব্যবস্থা। রথের সম্মুখে চৈতন্যদেব পার্ষদগণ সঙ্গে যে নৃত্য করিতেন, তাহা "বিজয়া" নৃত্য বলিয়া উল্লিখিত হইতেও কোথাও দেখি নাই। আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীতে অর্থাৎ রথযাত্রার তিন দিন পরে "হোরা পঞ্চমী"তে লক্ষ্মীবিজয় নামে একটা পর্ব্ব পুরীতে হইত, ইহার উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে। সে পর্ব্বোপলক্ষ্যেও চৈতন্যদেব সপার্ষদ নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতেন এবং তারপর "জলক্রীড়া" করিতেন। লক্ষ্মীবিজয় পর্ব্বোপলক্ষ্যে যে নৃত্য তাহা সংক্ষেপে "বিজয়া" নৃত্য বলিয়া উল্লিখিত হওয়া অসম্ভব নয়। এ পক্ষে 'বঞ্চিত' শব্দ আষাঢ়ের সঙ্গে না গিয়া 'রথে'র সঙ্গে যাইবে; অর্থাৎ 'আষাঢ় মাস রথের পর'—এইরূপ অর্থ হইবে। এই পক্ষই সমীচীন মনে হয়। সে যাহা হউক, জয়ানন্দ বলিতেছেন, পায়ে আঘাত পাওয়ার পর চৈতন্যদেব সকল পারিষদ সহ নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া করেন। ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বেশী হয়, "সেই লক্ষ্যে" তিনি স্বীয় টোটায় বা টোটাশ্রমে শয়ন করিলেন; এবং পরদিন রাত্রি দশ দণ্ডের সময় দিব্য রথারোহণে বৈকুণ্ঠে গেলেন। তাঁহার মায়া-শরীর টোটাশ্রমেই পড়িয়া রহিল। টোটা অর্থে বাগান।

জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের লীলাসংবরণ সম্পর্কে অনেক বিবরণই দিলেন, কিন্তু 'মায়াশরীর'টার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইল তাহার কোনও উল্লেখ করিলেন না। ইহা একটু অদ্ভুত নয় কি? "কৃষ্ণবিলাসের দেহ" দগ্ধ না করাই বৈষ্ণবগণের সাধারণ ব্যবস্থা। হরিদাসের দেহসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী প্রভৃতির দেহের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যের দেহ সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকিলে, (অর্থাৎ মৃত্তিকাতে সমাহিত করা হইয়া থাকিলে) তাহার উপর যেমনই হউক একটা মন্দির নির্ম্মিত হইত। আর স্বয়ং উৎকলরাজ যাঁহার অনুরাগী শিষ্য তাঁহার সমাধিমন্দিরটা নিতান্ত নগণ্যই বা কেন হইবে? শাস্ত্রে সন্ন্যাসিগণের দেহ দগ্ধ করার ব্যবস্থাও আছে; তাহা করা হইলে শ্মশানেও স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইতে পারিত। সমুদ্রে ভাসাইয়া বা ডুবাইয়া দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব মনে হয়। জয়ানন্দের প্রদত্ত বিবরণ আপাততঃ যতই স্বাভাবিক বোধ হউক না কেন, শবদেহের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায় ঐ বিবরণ কেবল অসম্পূর্ণ

---

* চৈতন্যদেব রথের পাঁচদিন পরে (কেননা, তিনি আষাঢ়ের শুক্লাসপ্তমীতে বৈকুণ্ঠে যাইবেন বলিয়া দেবতাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন) লীলা সংবরণ করিবেন শুনিয়াও অদ্বৈতাচার্য্য রথের পরেই গৌড়দেশে চলিয়া আসিলেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

নহে, একটু সন্দেহজনকও বটে। পূর্ব্বে যে তৃতীয় প্রবাদ বা মত উল্লিখিত হইয়াছে, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে জয়ানন্দের বিবরণ প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের তিরোধান সম্বন্ধীয় ঐ শোচনীয় সত্যটাকে একটা সম্ভাব্য ও স্বাভাবিক আবরণ দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা মাত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবাদ এমনই অলৌকিক যে, সেকালেও ইহা নিশ্চয়ই সকলের নিকট আদরণীয় হয় নাই। সেই জন্যই যে জয়ানন্দ অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর একটা বিবরণ কল্পনা করেন নাই ইহা কে বলিবে? বস্তুতঃ জয়ানন্দের পুস্তকের অনেক বিবরণই অপ্রামাণ্য, এবং মনে হয় সেই জন্যই প্রচুর অলৌকিক কাহিনী সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে আদৃত হয় নাই।

রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত দুইখানি গ্রন্থে চৈতন্যদেবের তিরোধান প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি জয়ানন্দ-প্রদত্ত বিবরণটি মোটের উপর সত্য বলিয়া গ্রহণের পক্ষপাতী; এমন কি, উহাতে যে ত্রুটটুকু উপরে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার সংশোধন-কল্পে একটা নূতন মত বা থিওরি প্রচার করিয়াছেন। দীনেশবাবুর ন্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মত সর্ব্বদাই ধীরভাবে বিচার্য্য; তাহা "কিছু না" বলিয়া এককথায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না; আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার মতে এত অসতর্কতার ও অযৌক্তিকতার প্রমাণ পাইতেছি যে, তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়াও মনে হইতেছে না।

দীনেশবাবু প্রথমে তাঁহার "ওপারের আলো" নামক উপন্যাসখানিতে কানাই বাবাজি নামক একটি পাত্রের মুখে ঐ মতটি ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কানাই বাবাজিটিকে দীনেশবাবু একটি আদর্শ বৈষ্ণবরূপে সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কানাই বাবাজি কথোপ-কথনের মধ্যেই "গৌরপদতরঙ্গিণীর" মধ্যে কোথায় কোন পদটি আছে তাহা পত্রাঙ্কসহ বলিয়া যাইতে পারেন! নিতান্ত আধুনিক একখানি পদসংগ্রহগ্রন্থেও তাঁহার এমনই অধিকার! তিনি বলিতেছেন, "মহাপ্রভু গোপীনাথ জীউর সঙ্গে মিশে গেছেন—এ প্রবাদ লৌকিক। এর ঐতিহাসিক মূল্য কি? জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু রথের দিন নাচতে নাচতে উছট্ খেয়ে পড়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর জ্বর হয়, সেই জ্বরেই তাঁর তিরোধান হয়। লোচন দাসের চৈতন্য-মঙ্গলে দেখা যায়, তিরোধানের পর * মহাপ্রভুকে জগন্নাথের মন্দিরে খিল দিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ভক্তদের ঢুকতে দেওয়া হয় নি। আমার মনে হয় জগন্নাথ মন্দিরের পাথরের নীচে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল—এ জন্য জয়ানন্দের বর্ণনা ও লোচন দাসের লেখায় তিরোধানের সময়ের একটু পার্থক্য আছে। † একজন বলেছেন অপরাহ্নে তিনি স্বর্গারোহণ করেন, অপর জনে বলেছেন রাত্রি সাতদণ্ডে। খিল দেওয়ার সময় ও খিল খোলার সময় নিয়ে এই পার্থক্য। আমার মনে হয় অপরাহ্নই ঠিক, কারণ তিরোধান হওয়ায় খিল দেওয়া হয়েছিল।"

কানাই বাবাজির কথাই দীনেশবাবু তাঁহার "Chaitanya and His Age" গ্রন্থে একটু বিস্তৃততর ভাবে দিয়াছেন। তাহার কতকটুকু উল্লেখ করা আবশ্যক। কানাই বাবাজির উক্তিতেই ইহার মর্ম্ম আছে বলিয়া ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার জন্য ইহার আর অনুবাদ দিলাম না।

"This book (অর্থাৎ জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল') says that during the Car-festival of Jagannath in Ashar 1455 Saka, Chaitanya got a hurt in his left foot from a small brick in the course of his dancings. Then on the sixth *tithi* the pain increased and he could not rise from his bed. On the seventh *tithi* at ten dandas of night (about 11

---

* ঠিক এমন কথা চৈতন্য-মঙ্গলে নাই—তাহা পরে দেখা যাইবে।

† পার্থক্য কেবল তিরোধানের সময়ের মধ্যে নহে, তিরোধানের প্রকারেও এত অধিক যে ঐ দুইটি মতে কোনও সামঞ্জস্য স্থাপন চলে কি না পাঠক তাহা পরে বিবেচনা করিবার সুযোগ পাইবেন।

P. M.) he passed away from the world having suffered from a sympathetic fever. Now this account seems to be quite true ......There seems to be something like an indirect corroboration of this statement by another account given in Lochan Das's Chaitanya Mangal. The text appended to the Bangabasi edition of that book says that on the seventh *tithi* of Ashar on Sunday at *tritiya prahar* (between 3 and 4 P. M.) Chaitanya passed into the image of Jagannath and at the time the priests shut the gate of the temple against all enquirers. The Chaitanya Mangal further adds that none of the followers of Chaitanya had been allowed to see the Master for a long time before he disappeared......Whether the seventh *tithi* belonged to the white or the dark *pakkha* is not stated, but this may be easily found out from the fact that the Car-festival takes place in the white *pakkha*. So it was the seventh *tithi* of the white *pakkha* and in both the accounts we find Sunday to be the date of Chaitanya's *tirodhan*... ......The only point that remains to be settled is that according to Jayananda the time of *tirodhan* is 11 P. M, and according to Lochan Das 4 P. M.. We may, however, make a reasonable guess as to the fact of the case. Chaitanya was in the Jagannath temple when he suffered from high fever. When the priests apprehended his end to be near they shut the gate against all visitors. This they did to take time for burying him within the temple...... The priests at 11 P. M. opened the gates and gave out that Chaitanya was incorporated with the image of Jagannath"

'গৌরপদ তরঙ্গিণী'র পত্রাঙ্ক পর্য্যন্ত কানাই বাবাজির কণ্ঠস্থ থাকিলেও জয়ানন্দের প্রদত্ত বিবরণ উল্লেখ কালে একটু "জিহ্বাস্খলন" হইয়াছে। "জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে পাওয়া যায়...তাতে তাঁর জ্বর হয়..." জ্বরের (দীনেশবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থে উল্লিখিত "sympathetic fever" এর) কথা জয়ানন্দ বলেন নাই। "চরণে বেদনা" ও "সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন" মাত্র আছে। রবিবারে তিরোধান হয় এমন কথাও জয়ানন্দে পাইতেছি না; সুতরাং দীনেশবাবু যে বলিতেছেন, "In both the accounts we find Sunday to be the date of Chaitanya's *tirodhan*" ইহা তাঁহার লেখনীর একটা স্খলন *। আরও একটা স্খলন—দীনেশবাবু বলিতেছেন যে সপ্তমীতে চৈতন্য দেবের তিরোধান হয় তাহা শুক্লা কি কৃষ্ণা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ কোনও পুস্তকে নাই। জয়ানন্দ কিন্তু স্পষ্টই বলিতেছেন, "আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি" ইত্যাদি। ইহা ছাড়া দীনেশবাবু বলিতেছেন Chaitanya was in the Jagannath temple when he suffered from high fever (অর্থাৎ দারুণজ্বরে ভুগিবার সময় চৈতন্য জগন্নাথ মন্দিরেই ছিলেন) এ সিদ্ধান্ত জয়ানন্দের বিবরণ হইতে কিছুতেই আসে না। বরং জয়ানন্দ লিখিতেছেন—"সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।" 'টোটা' অর্থ তাঁহার টোটাশ্রম—অর্থাৎ কাশীমিশ্রের বাড়ী। পীড়িত বা মৃত কোনও অবস্থায়ই চৈতন্য দেবকে জগন্নাথমন্দিরে লইয়া যাওয়ার কোনও প্রমাণ নাই। চৈতন্যদেব শ্রীমন্দিরের কোনও অংশে থাকিতেন না, উহা হইতে অনেকটা দূরে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথে কাশীমিশ্রের একটা বাড়ীতে থাকিতেন। † জয়ানন্দের বিবরণ অনুসারে ঐ বাড়ীতেই রাত্রি দশদণ্ড কালে চৈতন্য দেবের প্রাণবিয়োগ হয় এবং সেই খানেই তাঁহার "মায়াশরীর" পড়িয়া থাকে।

---

* রবিবারের উল্লেখ লোচনদাসের কোনও কোনও পুথিতে আছে, তাহার বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে।

† জয়ানন্দমতে ঐ বাড়ীটার অধিকার চৈতন্যদেবের মৃত্যুকালে পণ্ডিত গোসাঞিকে দিয়া যান।

এখন দেখা যাক লোচন দাসের পুস্তকে কি বিবরণ পাওয়া যায়। দীনেশবাবু 'বঙ্গবাসী' সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সংস্করণে দেখা যায় উহার সুবিজ্ঞ সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, দীনেশবাবু যে অংশের উল্লেখ করিয়াছেন সেই অংশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা সংস্কৃত কলেজের পুঁথিতে কিংবা ১৭৭৪ শকাব্দীয় মুদ্রিত পুস্তকে নাই, একখানি আধুনিক হস্ত লিখিত পুঁথিতে এবং কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে আছে। এমন অবস্থায় ঐ অংশের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা অনুচিত নয়। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' বৈষ্ণবসমাজে আদৃত গ্রন্থ নহে, কিন্তু 'লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' সকল বৈষ্ণবের আদৃত। বৈষ্ণবসমাজে আদৃত অন্য কোনও গ্রন্থে চৈতন্যদেবের তিরোধান প্রসঙ্গ আভাসেও উল্লেখ করা হয় নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বকই করা হয় নাই (a conspiracy of silence) এ কথা দীনেশবাবুই লিখিতেছেন; এবং তাহা সত্যও বটে। এমন অবস্থায় যখন দেখা যায় লোচনদাসের গ্রন্থেরও সকল প্রতিলিপিতে ঐ অংশ নাই, তখন উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা কি অযৌক্তিক? অংশটুকু সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি :—

হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিল মহাপ্রভু।
এত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিল সিংহদ্বারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতরে উতরিল॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ॥
এই বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পাড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পাড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

"গুঞ্জাবাড়ী" শব্দটি সম্ভবতঃ "গুণ্ডিচা" বাড়ী বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরীতে "গুণ্ডিচা" বাড়ীই আছে, "গুঞ্জাবাড়ী" কেহ চিনে না। "গুঞ্জাবাড়ী" নাম লোচন দাসের পুস্তকেও অন্যত্র নাই, অন্য কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থেও পাই নাই। কয়েকজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব পণ্ডিতকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি তাঁহারাও কখনও গুঞ্জাবাড়ী নাম শুনেন নাই। মনে রাখিতে হইবে আষাঢ় মাস,সপ্তমী তিথি জয়ানন্দমতে শুক্লা সপ্তমী। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা হয়, ঐ দিন জগন্নাথ "শ্রীমন্দির" হইতে বাহির হইয়া রথে চড়িয়া গুণ্ডিচা বাড়ীতে যান এবং দশমীর পূর্ব্বে ফিরেন না। সুতরাং শুক্লাসপ্তমীতে শ্রীমন্দির জগন্নাথ-শূন্য থাকে। সেই দিন বেলা তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু হঠাৎ ভক্তগণের সঙ্গে আলোচ্যমান বৃন্দাবন লীলাপ্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া জগন্নাথ দর্শন জন্য শ্রীমন্দিরে আসিলেন। "নিজজন যত" তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে "মন্দির ভিতরে

উতরিল।" তার পর যে দুয়ারে কপাট লাগিল, সেটা বাহিরের সদর দরজা ("gate of the temple") হইতে পারে না; গর্ভগৃহদ্বার, অর্থাৎ যে অন্তর্গৃহে অন্যসময়ে জগন্নাথমূর্ত্তি অবস্থিত থাকেন তাহাই হওয়া সম্ভব। শিষ্যগণ ঐ স্থানের বাহিরে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরবর্ত্তী গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে একজন পাণ্ডা "কি কি" বলিয়া সেখানে আসিয়া সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিল, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে গুণ্ডিচাবাড়ীতেই মহাপ্রভু জগন্নাথদেহে লীন হইয়াছেন। "সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগে আর" ইত্যাদি যে প্রার্থনা এবং "বাহু ভিড়িয়া" যে "হিয়ার" আলিঙ্গন তোলা সেটাও প্রসঙ্গ হইতে মনে হয় যেন গুণ্ডিচাবাড়ীতেই হইয়াছিল, নচেৎ "সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট" একথার মর্ম্ম কিছু বুঝা যায় না। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই:— শ্রীচৈতন্য কাশীমিশ্রের বাড়ী হইতে সোজাসুজি আসিয়া শ্রীমন্দিরে ঢুকিয়া তথায় জগন্নাথমূর্ত্তি না দেখিয়া এমন বিভূতি প্রকাশ করিলেন যে তাহাতে গর্ভগৃহদ্বার আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল এবং তিনি অন্যের অদৃশ্যভাবে (অবশ্য "মায়া শরীর"সহ) গুণ্ডিচাবাড়ীতে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথকে আলিঙ্গনচ্ছলে সেই দেহে লীন হইলেন।

লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার এক হেতু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গুণ্ডাবাড়ী নাম, এবং তিরোধান সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্তটা সেই সন্দেহকে দৃঢ়ীভূতই করে বলিয়া মনে হয়। জয়ানন্দের বিবরণের সহিত ইহার কেবল তিথিগত ঐক্য ভিন্ন আরও কোনও বিষয়ে ঐক্য নাই। ঐ ঐক্যটুকুর বলে ইহাকে "an indirect corroboration of the (অর্থাৎ জয়ানন্দের) statement" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কিছুতেই চলে না। তিথিটা লোচন দাসের গ্রন্থের ঐ অংশের লেখক জয়ানন্দ হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। যদি তিথিটাকে সত্য মনে করা যায় এবং লোচনদাসের ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃ এই প্রশ্নটি মনের মধ্যে উদিত হয় যে, লোচনদাসের উক্তির প্রামাণ্যে বৈষ্ণবগণ আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীটা তাঁহাদের পর্ব্বদিন মধ্যে গ্রহণ করিলেন না কেন? শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তিথিটা দোলযাত্রা উপলক্ষ্যেও বটে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব উপলক্ষ্যেও বটে, বৈষ্ণবগণের একটা মহাপর্ব্ব দিন। তিরোভাব তিথিটা পর্ব্বদিন মধ্যে স্থান পাইল না কেন? চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে তিরোভাবের বৎসরটা মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, তিথিটার উল্লেখ নাই।

লোচনদাসের গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত অংশের লেখক, জয়ানন্দ হইতে তিথি গ্রহণ করিয়া জয়ানন্দ উল্লিখিত তিরোধান কাল (অর্থাৎ রাত্রি দশদণ্ড) ত্যাগ করার একটা হেতু মনে করা যাইতে পারে। রাত্রি দশদণ্ড কালে স্বরূপ ও রামানন্দ ভিন্ন অন্য শিষ্য চৈতন্যদেবের আশ্রমে স্থান পাইতেন না। সাধারণতঃ যে সময়ে চৈতন্যদেব বহুশিষ্য পরিবৃত হইয়া থাকিতেন, (অর্থাৎ তৃতীয় প্রহর বেলা,) প্রক্ষিপ্ত অংশের রচয়িতা ঠিক সেই সময়টি গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—চৈতন্যদেব বহুশিষ্যের সাক্ষাতে স্বেচ্ছায় স্বসামর্থ্যে হাটিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যান ইহাই লোকে বুঝুক।

মোটের উপর লোচনদাসের কোনও কোনও পুঁথিতে প্রাপ্ত ঐ অংশটুকু (অর্থাৎ যাহাকে আমি প্রক্ষিপ্ত অংশ বলিয়াছি তাহা) অবলম্বন করিয়া দীনেশবাবু চৈতন্য-দেবের শবদেহের ব্যবস্থাসম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছেন অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া প্রতিপাদিত করিবার উদ্দেশ্যে পাণ্ডাগণ গোপনে তাঁহার শবদেহ শ্রীমন্দিরের পাথরের নীচে সমাহিত করিয়াছিল,— এ অনুমান নিতান্তই উদ্ভট মনে হয়। পাণ্ডাগণ শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী হইতে পারে, কিন্তু তারা চৈতন্যের পাণ্ডা নয়, জগন্নাথের পাণ্ডা। শ্রীমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার্থ তাহাদের উৎসাহ চিরবিদিত। তাহারা কেন সে মন্দিরে শবদেহ প্রোথিত হইতে দিবে? এবং চৈতন্যদেবের স্বাভাবিক মৃত্যুর বিবরণ গোপন করিবার

জন্য এত আগ্রহই বা তাহাদের কেন হইবে? চৈতন্যদেব যখন লৌকিকভাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন লৌকিক ভাবে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার মাহাত্ম্যের হানি হয় না, কেননা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারও লৌকিক ভাবেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা কি চৈতন্যের শিষ্যেরা জানিতেন না বা বুঝিতেন না? তথাপি যে তাঁহারা তাঁহার তিরোধান বৃত্তান্ত একেবারে গোপন করিয়া রাখিলেন; তাহার তিথিটা পর্য্যন্ত নিজেদের পর্ব্বদিন মধ্যে গ্রহণ করিলেন না, এমন কি সে বিষয়ে কোনও উল্লেখ কেহ ঘুণাক্ষরে করিলেন না, ইহার অবশ্যই কোনও গুরুতর কারণ ছিল। সেই জন্যই জয়ানন্দ, প্রদত্ত নিতান্ত লৌকিক বিবরণও সত্য জ্ঞান হয় না। বস্তুতঃ ঐ গুরুতর কারণ আর কিছু নয়, সম্ভবতঃ তিনি স্বাভাবিক ভাবে অর্থাৎ রোগাদিতে ভুগিয়া দেহত্যাগ করেন নাই, কোনও রূপ অস্বাভাবিক ভাবে (যথা সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়া) মারা যান; এবং তাঁহার দেহ আর পাওয়া যায় না, অথবা পাওয়া গেলেও, তাঁহার তাদৃশ মৃত্যুর কথা প্রচারিত হইলে তাঁহার মাহাত্ম্যহানি বা তাঁহার নিকটতম শিষ্যগণের অসতর্কতা হেতু তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গুরুতর বিদ্বেষ ঘটিতে পারে—এইরূপ কোনও একটা আশঙ্কা করিয়া সে দেহ আর উঠাইয়া আনা হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য একবার অন্যের অলক্ষিতভাবে সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় বহুদূর ভাসিয়া গিয়াছিলেন এরূপ একটা ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। দীনেশবাবু মনে করেন ঐ উক্তিটি হইতেই তাঁহার জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুর প্রবাদ আধুনিক কালে উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। দীনেশবাবু বলেন, সেবার চৈতন্যদেবকে জল হইতে উঠাইয়া আনিবার পর তাঁহার সংজ্ঞা হইয়াছিল, এমন কি, ঐ ঘটনার পর তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে; সুতরাং জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুর কথা নিতান্ত অসমীচীন। কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতেই দেখা যায়—তিনি একাধিকবার রাত্রিতে অন্যের অজ্ঞাতসারে আশ্রমের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। একবার সমুদ্রে পড়েন, একবার সিংহদ্বারের দক্ষিণে "তেলাঙ্গা গবীগণ" মধ্যে গিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকেন, আর একবার সমুদ্রতীরে এক উদ্যানে রাসলীল-স্মৃতি সম্ভোগ করেন। শেষবার শেষে তাঁহার সহিত কয়েকটি শিষ্যও মিলিত হইয়াছিলেন। একবার আশ্রমেই রাত্রিকালে অন্যের অজ্ঞাতসারে মাটিতে মুখ ঘষিয়া রক্তাক্ত করিয়াছিলেন। ইহা কি অসম্ভব যে, সমুদ্রেও একাধিকবার পড়িয়াছিলেন, শেষবার আর উঠিতে পারেন নাই। টোটাগোপীনাথের মন্দির এককালে যে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; এখনও ঐ মন্দির ও সমুদ্র মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ বালুচর ও কণ্টকবন ব্যতীত অন্য কিছু নাই। শেষ বারে তিনি টোটা-গোপীনাথের মন্দিরের নিম্নেই সমুদ্রে ঝাঁপ দেন ইহাও অসম্ভব নয়, এবং হয়ত ঐরূপ ঘটনা হইতেই টোটা-গোপীনাথ দেহে তাঁহার লীন হওয়ার প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয় মতের মূলেই সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। এই মতটি যে আধুনিক ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, তবে কোনও প্রাচীন পুস্তকে ইহা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু দীনেশ বাবুই প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে ওড়িয়া সাহিত্যে কোথায় কিরূপ উল্লেখ আছে তৎসম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং তাহা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমারও বিশ্বাস পরবর্ত্তী কালে লোকে ইচ্ছা করিয়া চৈতন্যদেবের মৃত্যুসম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য বিবরণ নষ্ট করিয়া না থাকিলে, ওড়িয়া সাহিত্যে, বিশেষতঃ, পুরীর নানা মঠের প্রাচীন পুঁথিপ্রভৃতির মধ্যে, এমন কি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতেও শ্রীচৈতন্যের তিরোধানসম্পর্কে সত্য বিবরণ ভবিষ্যতে পাওয়া সম্ভব, এবং ইহাও খুবই আশা করা যায় সে বিবরণ তাঁহার অপমৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রবাদ বা মতেরই পরিপোষকতা করিবে। অল্প প্রমাণে ও প্রচুর বল্পনাবলে কোনও একটা থিওরী

গঠন করা ঐতিহাসিক রীতি-সঙ্গত নয়। যতদিন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া না যায় ততদিন সেইরূপ প্রমাণের প্রতীক্ষায় থাকাই উচিত। দীনেশ বাবু যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক গবেষণাকারীর পক্ষে সমুচিত পন্থা নয়। এ কথা দীনেশ বাবু বা তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থখানির প্রতি কোনরূপ অনুচিত অশ্রদ্ধা হইতে বলিতেছি না, বাঙ্গলা সাহিত্যের গবেষণায় যথার্থ—বৈজ্ঞানিক রীতি অনুপ্রবিষ্ট হউক এই আকাঙ্ক্ষা হইতে বলিতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন।

আশাহত

(বড় গল্প)

৮

"ভজা!"

অর্দ্ধপথ হইতে মুখ ফিরাইয়া ভজহরি গরবীর দিকে চাহিল।

"আমার একটা কথা রাখ্‌বি?"

"নিশ্চয়।"

"আমাকে একবার মেড়াদহে নিয়ে যাবি?"

ভজহরি বিস্ফারিতনয়নে গরবীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই হতভাগাটার কাছে?"

গরবী মাথা নীচু করিয়া অঞ্চলের খুঁট পাকাইতে লাগিল।

ভজহরি আবার বলিল, "সে যদি না নেয়?"

এ কথাটা এতক্ষণ গরবীর মনে হয় নাই। অর্দ্ধমৃত সন্তান কোলে করিয়া, যে তাহার ভয়ে গোপনে পলায়ন করিয়াছে, সে যে সহজে তাহাকে স্থান দান করিতে পারে, ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

গরবী হতাশ স্বরে বলিল, "তবে উপায়?"

"ভাবছিস্ কেন গরব, ভজা বেঁচে থাকতে তোকে শুকিয়ে মরতে হবে না।"

গরবীর ব্যথা কোন খানে, ভজহরি তাহা বুঝিতে পারিল না। শুকাইয়া মরিবার ভয়ে সে কি স্বামীর অনুসন্ধানে যাইতে চাহিতেছে? পরম তাহার উপর যে ভীষণ সন্দেহ বুকে করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, সে একবার তাহা মুছিয়া দিতে চায়; সে একমুহূর্ত্তের জন্য বুঝাইতে চায়, গোবরা তাহার পেটের সন্তান অপেক্ষা কম নয়।

ভজহরির কথায় ভাবটা গরবীর ভাল লাগিল না। সে সতেজে বলিয়া উঠিল, "চিরকালই কি তোর খেয়ে থাকৃতে হবে?"

"তাই কি বলছি?"

"তবে?"

"তোর কেউ অপমান করে সেটা যে আমি চোখে দেখতে পারিনে, গরব।" ভজহরির কথাগুলি ব্যথাভরা।

কর্কশ কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়া গরবীর মনে একটু দুঃখ হইল। ভজহরি তাহার কে? এই ঘোর বিপদে সে না আসিলে, আজ তাহাকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতে হইত না কি?

চোখ দুইটা মুছিতে মুছিতে গরবী ভাবিল, তার কাছে আমার আর আশা কি? প্রকাশ্যে বলিল, "একটা বোঝা পাড়াও ত দরকার।"

ভজহরি কথাটা বেশ করিয়া বুঝিল। গরবীর কথাটা যে একেবারে ফেলিয়া দিবার নহে, ইহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তাহাকে মেড়াদহ লইয়া যাইবার সম্মতি

প্রকাশ করিতে যাইবে, এমন সময় মনে পড়িয়া গেল, গরবী আর পরম স্বামী স্ত্রী, পরস্পর সন্দর্শন মাত্রেই তাহাদের মনের মালিন্য কাটিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে; সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং চুপ করিয়া গেল।

এই কয়দিনে ভজহরির কেমন একটা নেশা জন্মিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর অবসন্ন দেহে জন-মানব হীন অন্ধকার কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিত। একটা স্নেহকোমল কণ্ঠের আহ্বান ধ্বনি শুনিবার জন্ত তাহার কঠোর প্রাণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। একটা বিশ্বস্ত হস্তের সেবা যত্নের প্রত্যাশায় তাহার দেহ মন আকুল হইয়া উঠিত। বহু চেষ্টা করিয়াও সে নিজের পায়ের গতি রোধ করিতে পারিত না; নানা ছলে বিবিধ উপ-ঢৌকন লইয়া সে গরবীর দুয়ারে উপস্থিত হইয়া পড়িত।

গরবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিস্?"

চট্ করিয়া এত বড় সমস্যার একটা সহজ সমাধান ভজহরির মাথায় খেলিয়া গেল। সে মাথাটা খাড়া করিয়া বলিয়া উঠিল, "এক কায কর্, গরব, তোর কোথাও গিয়ে কায নেই, আমিই তাদের খোঁজটা আগে নিয়ে আসি।"

গরবী বুঝিল, ইহা মন্দ নহে। গায়ে পড়িয়া পরমের দ্বারস্থ হইতে যাওয়া অপেক্ষা, দূর হইতে তাহাদের সংবাদ লইয়া নিশ্চিন্ত থাকাই ভাল।

পরদিন সকালেই ভজহরির মেড়াদহ যাওয়া স্থির হইল। গরবীর সংসার চলিবার দুই দিনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ভজহরি বিদায় লইল।

ভজহরি নিকটে নিকটে থাকায়, গরবী এতদিন যাহা ধরিতে পারে নাই, সে চলিয়া গেলে আজ তাহার চোখে সেটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ভজহরির প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন অন্ত আকার ধারণ করিয়াছে। খুটিনাটি কাযে তাহার সঙ্গলাভটা যেন আকাঙ্ক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিবার জন্ত, তাহার কথা শুনিবার জন্ত, গরবীর মনটা যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে।

গরবী তুলসী তলায় মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে ডাকিতে লাগিল, "এ আবার কি করলে, দেবতা!"

ভজহরি যখন ফিরিয়া আসিয়া জানাইল পরম বা গোবরার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না, তখন গরবী সন্দেহাকুল নয়নে একবার তাহার দিকে চাহিল।

ভজহরি অপ্রতিভ হইয়া বলিল "না হয় তুই শুদ্ধ আমার সঙ্গে চল্।"

গরবী তাচ্ছিল্যস্বরে বলিল, "আমার ব'য়ে গিয়েছে।"

"এখন কি করবি?"

"যে দিকে দুই চোখ যায়, চ'লে যাব।"

"কি দুঃখে?"

"খেতে ত হবে?"

"আজকাল বুঝি উপোস ক'রে আছিস্?"

"স্বামীই যখন খোঁজ নিলে না, তখন পরের আবার ভরসা কি?"

কলিকায় চাপাইবার জন্ত একখানা জলন্ত অঙ্গার তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে ভজহরি বলিল, "আমি কি তোর এতই পর?"

গরবী কি একটা উত্তর দিবার জন্য ভজহরির সম্মুখে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় জাল হস্তে ননীর মা আসিয়া ডাকিল "মাছকে যাবি গোবরার মা?"

তাহাদিগকে এইরূপ মুখোমুখী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ননীর মা নিমেষমধ্যে মুখখানা সরাইয়া লইয়া ঘোমটার ভিতরে খানিকটা জিহ্বা প্রকাশ করিয়া সশব্দ পদক্ষেপে দ্রুত প্রস্থান করিল।

উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল। ননীর মা মুহূর্ত্তের অভিনয়ে দু'জনের মনের মধ্যে কি একটা প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেল।

এতদিন সেটা কাহারও মনে উদয় হয় নাই,

আজ অনন্ত আকারে তাহা উভয়ের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। গ্রামের বধূর পক্ষে অভিভাবকবিহীন নির্জ্জন বাড়ীতে নিঃসম্পর্কীয় যুবকের সঙ্গে নিবিষ্টভাবে আলাপ করা যে নিতান্ত দূষণীয়, গরবীর এতক্ষণে তাহা উপলব্ধি হইল। দুই দণ্ডের মধ্যে ভজহরির এই অযাচিত দানের গূঢ় উদ্দেশ্যটা পাড়ায় পাড়ায় যখন রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে, তখন গরবী কেমন করিয়া গৃহের বাহির হইবে, তাহাই ভাবিয়া সে আকুল হইয়া পড়িল।

ভজহরি গরবীর অন্তরের ভাব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "ননীর মা অমন ক'রে পালিয়ে গেল কেন রে?"

গরবী সে কথার উত্তর না দিয়া কেবল বলিল "ভজা, বাড়ী যা।"

ভজহরি চিন্তাভারক্লিষ্ট হৃদয়ে গরবীর কুটীর ত্যাগ করিল।

দেখিতে দেখিতে বহু শাখা পল্লব মেলিয়া কথাটা গ্রামময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বয়োবৃদ্ধেরা বলিল, "যেমন বুড়ো বয়সে বিয়ে করা, তেমনি তার ফল।"

যুবকেরা বলিল "যার কপালে যা থাকে।"

ভজহরি কয়দিন আর গরবীর বাড়ীর দিকে গেল না। কিন্তু যখন অনুমানে বুঝিতে পারিল যে গরবীর চা'লের ভাণ্ডার এতদিন খালি হইয়া আসিয়াছে, তখন একদিন গভীর রাত্রিতে কতকগুলা খাদ্যদ্রব্য লইয়া গরবীর গৃহে যাইয়া ডাকিল "গরব!"

গরবী বাহিরে ছিল। ভজহরির শব্দ পাইয়া ঘরের ঢুকিয়া আগড় বন্ধ করিয়া দিল।

জিনিষগুলি সেখানে রাখিয়া অগত্যা ভজহরিকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

পরদিন সংবাদ লইয়া সে জানিল, যেমনকার জিনিস তেমনি পড়িয়া আছে, গরবী তাহার একটাও স্পর্শ করে নাই।

ভজার সমস্ত রাগটা ননীর মাকে ছাড়িয়া গরবীর উপরে আসিয়া পড়িল। এতবড় মিথ্যা অপবাদটাকে সে ঘাড় পাতিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল? একটা প্রতিবাদ করিবার চেষ্টাও করিল না?

একদিন সুযোগ পাইয়া ভজহরি গরবীকে বুঝাইয়া দিল যে, এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, অপরাধ স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তাহার আপত্তি না থাকিলে ভজহরি একবার প্রতীকার করিবার চেষ্টা দেখে।

গরবী এবার ভজহরির সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "লোকের মুখে হাত দেবার চেষ্টা করে কি হবে?"

"তারা যা খুসী তাই বলবে?"

"বলে বলুক।"

ভজহরির নাসিকাগ্রাভ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বলিল, "এত মিথ্যা কথা যে সহ্য করতে পারিনে!"

গরবী তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল, "তুইত পুরুষ মানুষ, তোর আবার কি?"

"আমার জন্যে আমি ভাবি নে।"

"যত ভাবনা বুঝি আমার জন্যে? আমার কপালে যা আছে তাই হবে।"

হঠাৎ ভজহরির মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল "কপালের ওপর ভার দিয়ে ত একবার দেখেছিস্। এই ভজা না থাকলে—"

গরবীর মনটা ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। ভজহরি এমনি করিয়া তাহার সম্মুখে নিজের উপকারের পরিচয় প্রদান করিবে, সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। দুঃখিত স্বরে উত্তর করিল, "দায়ে পড়ে তোর চা'লগুলো খেয়ে ফেলছি, ভজা। যদি দিন পাই, কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেবো।"

পূর্ব্ব কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভজহরি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। গরবী সে কথাটা যে এভাবে লইবে, তাহা তাহার মনে হয় নাই। অনুযোগের স্বরে বলিল, "গরব, আমি তোর কি করেছি?"

"কি করিস্ নি?"

এই কি সেই গরবী, যাহাকে একদিন অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সে আপনাকে সহস্র অসুবিধায় ফেলিয়া, তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছিল?

ভজহরি ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

৯

আর যাহাতে ভজহরি তাহাকে সাহায্য না করে, সময় অসময় তাহার বাড়ী প্রবেশ না করে, এই মনে করিয়া গরবী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে সেই রূঢ় কথাটা শুনাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু না বুঝিয়া যাহা করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হইল। ভজহরি চলিয়া যাওয়ায় তাহার নিঃসঙ্গ জীবনটা নিতান্ত ভার বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

গরবী এইবার বিলে মাছ ধরিতে যাইতে আরম্ভ করিল। পরম ও ভজহরির ছায়ায় বাস করিয়া, তাহার স্বাধীন জীবিকা আর্জ্জনের ক্ষমতা দিন দিন নষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। এইবার সাহস সংগ্রহ করিয়া সে হাঁড়ি ও জাল লইয়া, সহস্র লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া বিলের পথে চলিতে লাগিল।

মৎস্যকুল কিন্তু এই বুভুক্ষু নারীর প্রতি একটুও দয়া প্রকাশ করিল না। তাহার অশিক্ষিত হস্তের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত কেবলই চাতুরী খেলিতে লাগিল। কর্ম্মসঙ্গিনীগণের তীব্র বিদ্রূপবাণ সহ্য করিয়া দিনের পর দিন তাহাকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে হইল।

গরবী মাছধরা বন্ধ করিয়া দিল। চাটুয্যে বাড়ীতে ঝিগিরি কর্ম্মগ্রহণ করিয়া সে আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লইল।

ভজহরি ভাবিয়াছিল, ক্ষুধার যন্ত্রণায় একদিন না একদিন গরবীকে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু মাসের পর মাস যখন চলিয়া যাইতে লাগিল এবং গরবীর আসিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন তাহার প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিল।

রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির জল গরবীর কুটীরের ভাঙ্গা চাল ভেদ করিয়া, তাহার হাঁড়ি কলসী পর্য্যন্ত ভিজাইয়া তুলিয়াছিল। সকালে বিচালী সংগ্রহ করিয়া গরবী চালখানা মেরামৎ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।

ভজহরি গরবীর বাড়ীর নিকট দিয়া চলিতেছিল। সহসা তাহার দৃষ্টিটা গরবীর উপর পড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া তাহার বিচালীগুলি কাড়িয়া লইয়া ভজহরি মই অবলম্বনে চালের উপর উঠিল এবং যথাস্থানে সেগুলি লাগাইয়া দিয়া নামিয়া আসিল। গরবী দাঁড়াইয়া ভজহরির কাব দেখিতে লাগিল।

পুনরায় একপশলা বৃষ্টি নামিল। উভয়েই ক্ষিপ্রপদে দাওয়ার উপর উঠিয়া পড়িল।

গরবী কাপড়খানা ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া জড় সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে সম্বন্ধটা এমনি করেই চুকিয়ে দিলি?"

গরবী উত্তর দিল না।

ভজহরি বলিল "এখনো কি পরমার ফিরে আসবার আশা করিস্?"

গরবীর চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা মোটা মোটা অশ্রু টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। কথাটা ফিরাইয়া লইয়া, বলিল, "শুনছি নাকি গাঁয়ের লোকে আমাদের পতিত করবে?"

"করবে কি, করেছে! তুই ত চাটুয্যে বাড়ীছাড়া আর কোথাও পা দিস্‌নে, বাইরে গেলে বুঝ্‌তিস্; আমার সঙ্গে কেউ আর খাটতে চায় না।"

তাহার জন্য ভজহরিকেও যে একঘ'রে হইতে হইয়াছে, ইহা গরবীর প্রাণে বাজিল। বলিল, "কোনও রকমে কি তুই উঠ্‌তে পারিস্‌নে?"

"এক খানা মদ দিতে পারলেই কাযটা সহজ হয়ে যায়। তা কিন্তু আমি দেবো না।"

"কেন?"

"আমার মন।"

গরবী বুঝিল, কলঙ্কের ডালিখানা তাহার মাথায় সাজাইয়া রাখিয়া, ভজহরি আপনি নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সমাজে দশজনের একজন হইয়া বেড়াইতে চাহে না। বলিল, "আমার জন্তে তুই কেন মরবি ?"

ভজহরি বলিল, "আমার কথা যদি শুনিস্, তবে সব দিক রক্ষা হয়।"

গরবী প্রশান্তনয়নে ভজহরির মুখের দিকে চাহিল।

ভজহরি চেষ্টা করিল, কিন্তু পরিষ্কার করিয়া কথাটা বলিতে পারিল না।

গরবী বলিল, "কি বল্‌বি, বল্ না।"

"তুই কিছু মনে করবিনে ?"

"মনে আবার কি করব ?"

"তুই যে ঝাঁটা নিয়ে, সকালবেলা চাটুয্যে বাড়ী ঝাঁট দিতে যা'স্, সেটা আমার ভাল্ লাগে না।"

"না লাগে, চোখ বুজে থাকিস্।"

"পরম থাকলে সে কি তোকে এই কায করতে দিত ?"

"সে কথা ছেড়ে দে।"

"তবে আমিই বা দেবো কেন ?"

"তুই কি ব'লে আমাকে আট্‌কে রাখবি ?"

ভজহরি বারকত ঢোক গিলিয়া, এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল "তুই আমার ঘরে চল, দুজনে সাঙা ক'রে ফেলি।"

প্রবল আবেগে গরবীর কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইয়া পড়িল—"দূর !"

অবিশ্রান্ত জলধারার মধ্য দিয়া ভজহরি গৃহে ফিরিয়া গেল।

১০

কথাটা যতই মনে পড়িতে লাগিল, তাহার অন্তরটা ততই ছিছি করিয়া উঠিতে লাগিল। একটা প্রবল ধিক্কার থাকিয়া থাকিয়া তাহার মর্ম্মদ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। গরবী সাধ্যমত শক্তিতে ভজহরিকে ভুলিবার চেষ্টা করিল।

পরমের ফিরিয়া আসিবার আশাটা গরবী একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বৎসর ঘুরিয়া গেলেও যখন তাহার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না, তখন গরবী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। চাটুয্যে বাড়ীর এক-ঘেয়ে কাযে তাহার ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছিল। সে আর একবার পরমের খোঁজ লইতে ইচ্ছা করিল।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে মেড়াদহ যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

আবার সেই পথের সমস্যা। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই কোন পথ ধরিতে হইবে ? কাহারও কাছে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেও তাহার সংকোচ হইতেছিল। এতদিন পরে পরমকে মনে পড়িয়াছে শুনিয়া যদি কেহ কিছু বলিয়া ফেলে ?

তাহার মনে পড়িয়া গেল, ভজহরি পথের আনু-পূর্ব্বিক বিবরণ জানে। ভাবিল, তাহার নিকটেই সমস্ত বৃত্তান্তটা জানিয়া লইলে ক্ষতি কি ? কিন্তু কেমন করিয়া সে আবার তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে ? ইতিমধ্যে ভজহরি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এক দিনের জন্তও সে তত্ত্ব লইবার অবকাশ পায় নাই; আজ নিজের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইতে তাহার বিষম লজ্জা করিতে লাগিল।

একটু রাত্রি হইলে, ভজহরি আহার শেষ করিয়া শুইবার ঘরে গিয়া দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ঘুম না হওয়ায় গুণ্ গুণ্ স্বরে গান ধরিল—

"এত ক'রে পেলেমনা'ক,
মিছে পরলেম গলায় ফাঁসি,
রাত পোয়ালো, ফুল শুকালো,
মিলিয়ে গেল মুখের হাসি।"

বাহিরে শিকল নাড়ার শব্দ হইল।

ভজহরি গান থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে ?"

কোন সাড়া নাই।

বাতাস মনে করিয়া ভজহরি আবার গান ধরিল। এবার দুম্ দুম্ করিয়া দুয়ারে ঘা পড়িতে লাগিল।

ভজহরি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া ফেলিল। দেখিল করুণ দৃষ্টিভরা সজল আঁখি লইয়া গরবী সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত ভজহরির মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

মৃদু হাসিয়া গরবী বলিল, "ভয় নেই, তোকে চুরি ক'রে নিয়ে যাব না।"

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "তবু? এত রেতে?"

"মেড়াদহের পথটা একবার ব'লে দিতে পারিস্?"

"কেন?"

"একবার যাব মনে করছি।"

"একাই?"

"সঙ্গী আর কোথা পাব?"

ভজহরি গ্রাম হইতে মেড়াদহ পর্য্যন্ত সমস্ত পথের বিবরণ একটি একটি করিয়া গরবীকে বুঝাইয়া দিল।

অন্য কথার অবসর না দিয়া, গরবী একেবারে উঠানে নামিয়া পড়িল।

ভজহরি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কবে যাচ্ছিস্?"

"কালই"—বলিয়া গরবী অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

বাড়ীর নিকটে আসিতেই, দুইটা মানুষের সতর্ক কথোপকথনের শব্দ তাহার কাণে গেল। গরবী স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

প্রথম স্বরটি বলিতেছিল, "স্বভাব ম'লেও যায় না।"

অপরটি বলিতেছিল, "ছি ছি কি ঘেন্না! গরমা ফিরে এসে কি মনে করবে?"

গরবী আর অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ীর দিকে চলিল। দেখিল মোক্ষদা ও ননীর মা দ্রুতপদে সরিয়া পড়িল। তখন সে আবার দাঁড়াইল।

ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পরেই গরবীর মনে একটা অননুভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। মোক্ষদা ও ননীর মায়ের গোপন কুৎসা তাহার উপর ঘৃতাহুতি ঢালিয়া দিল। গরবীর দেহের ধমনীসমূহ মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইল। সমস্ত পৃথিবীখানা তাহার সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। গাছপালা লেপিয়া একাকার হইয়া গেল।

গরবী সেইখান হইতে ফিরিল। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে ভজহরির বাড়ী প্রবেশ করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—"ভজা!"

ভজহরি পুনরায় বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আবার ফিরে এলি যে?"

গরবী তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "তোর কথাই রাখব ভজা, কাল আমাদের সাঙা!"

ভজহরি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে বাজনার বায়না দিয়ে আসি?"

"হাসির কথা নয়, ভজা, সত্যি বলছি।"

"আমিই কি মিথ্যা বলছি?"

তিরস্কারপূর্ণ চোখে চাহিয়া গরবী বলিল, "কেন এত সইব? গরবী কি মানুষ নয়?"

ভজহরি বুঝিতে পারিল, এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে গরবীর কঠোর, নির্ম্মম অন্তরটাকেও টলাইয়া দিয়াছে। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "এই কথা ত?"

"গরবীর দু'কথা নেই।" বলিয়া দ্রুতপদে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিল।

১১

পরদিন সকালে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইলে, গরবী কা'ল উত্তেজনার মুহূর্ত্তে কি করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিতে লাগিল। তাহার অন্তরটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে ছুটিয়া গিয়া সে ভজহরির দুই পায়ে ধরিয়া প্রস্তাবটা ফিরাইয়া লয়। কিন্তু এই দুর্ব্বলতাকেও প্রশ্রয় দিতে তাহার মন বিমুখ হইতে

লাগিল। সে নিজেই ত ভজহরিকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে আজ আবার মত পরিবর্ত্তন করিলে সে কি মনে করিবে ?

গরবী মনকে বুঝাইল, কেন সে এত হীন হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে ? তাহার অন্তরেও কি সুখলিপ্সা নাই ? সকলেই পুত্র কন্যা লইয়া সংসার করিবে, আর সেই কেবল পরিত্যক্ত নিরাশ্রয়, নিরবলম্বন হইয়া বিপুল জগৎ সমুদ্রের তীরে বসিয়া লহরী গণিবে ?

ভজহরি আসিয়া জানাইল, সেইদিনই তাহাদের সাঙা হইতে পারে না, পাঁচজন আত্মীয় স্বজনকে ত ডাকিতে হইবে; অন্ততঃ দুই তিনটা দিন অপেক্ষা করিতেই হইবে।

গরবী একটু সময় পাইলেই বাঁচে। সে কোন আপত্তিই তুলিল না।

ভজহরি বলিল, "একদিন যখন আমার ঘরেই যাবি, তখন আর এখানে প'ড়ে কষ্ট পা'স কেন ? আজই আমার বাড়ী চল্।"

গরবী বলিল, "জিনিস পত্রগুলো সামলে নিই।"

"সন্ধ্যার পর এসে তোকে নিয়ে যাব, কি বলিস ?"

গরবী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

জিনিস পত্রের মধ্যে গোটা পাঁচ-ছয় হাঁড়ি, আর খান দুই ছেঁড়া কাঁথা। গরবী তাহাই একস্থান হইতে টানিয়া অন্যস্থানে লইয়া গিয়া সমস্ত দিন আপনাকে ব্যস্ত রাখিল।

অপরাহ্নে মোক্ষদা ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল "হ্যাঁ লা গোবরার মা, তোদের ছোটলোকের ধরণটাই এই রকম। সেই সাঙাই যদি করবি, তবে এত ঢলানটা কেন ঢলালি বল্ দেখি ?"

গরবীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। বহুকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিল।

মোক্ষদা আবার বলিল, "শুনছি নাকি বিয়ে না হতেই ঘর করতে চল্লি ? আমার পয়সা ক'আনার কথা ভুলে গেলি নাকি ?"

গরবী ঝনাৎ করিয়া কতকগুলা পয়সা মোক্ষদার পায়ের কাছে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

সুদ আসল হিসাব করিয়া বুঝিয়া লইয়া ফিরিয়া যাইতে যাইতে মোক্ষদা অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল "মা গো, বিয়ের নামে মাগীর মাটীতে আর পা পড়ে না।"

মোক্ষদা চলিয়া গেলে, গরবী কায শেষ করিয়া, রোয়াকের খুঁটীতে হেলান দিয়া বসিল। সায়ং সূর্য্য লাল হ য়া বাঁশবনের অন্তরালে অস্ত গেল। কতকগুলা কাক কা কা শব্দ করিতে করিতে আশ্রয় অভিমুখে ছুটিতে লাগিল।

গরবীর চোখে আজ অতীতের স্মৃতি একটি একটি করিয়া সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। যেদিন নব বধূবেশে অলক্তরঞ্জিত পদে চেলি পরিয়া সে এই বাড়ীর উঠান প্রথম স্পর্শ করিয়াছিল, সে দিন পরমের অন্তরে কি এক অভিনব ভাব! মৃতপত্নীকের শোকার্ত্ত মুখের ভিতর হইতে আনন্দের একটা মৃদু আভা কেমন ফুটিয়া উঠিতেছিল! উঠানের কোণে সেই আমড়া গাছ, সেই ছায়াস্নিগ্ধ জীর্ণ মৃৎকুটীর, গরবীর স্বহস্ত রোপিত সেই ক্ষুদ্র আমগাছ! সবই তেমনি আছে, কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া সে সংসার পাতিবে ভাবিয়াছিল, নাই কেবল তাহারাই।

গোবরাকে লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মান অভিমানের পালার কথা মনে পড়িতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় পরম গোবরাকে তাহার কোলে ছাড়িয়া দিয়াছিল!

সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। গরবী দুয়ারে তালা লাগাইয়া, অঞ্চলের খুঁটে চাবিটা বাঁধিয়া ফেলিয়া, ভজহরির আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

তাড়ীর আড্ডায় ভজহরির সেদিন একটু বিলম্ব হইয়া গেল। মনের আনন্দে দৈনিক বরাদ্দের অতিরিক্ত তাড়ী টানিয়া ভজহরি তখন দুনিয়াখানাকে বেজায় রঙীন দেখিতেছিল। প্রবল স্ফূর্ত্তিতে সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে স্খলিত পদে গরবীর বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল "গ—র—বি!"

গরবী উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভজহরি ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিল "আরও একটা সুখবর দিই, গ—র—বি ! পাঁমা বেটা রাজগাঁয়ে পটল তুলেছে।"

গরবীর দেহের রক্ত-প্রবাহ সহসা স্তব্ধ হইয়া আসিল। পড়িয়া যাইতেছিল, সজোরে খুঁটাটা চাপিয়া ধরিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল। গরবী মাঝে মাঝে এ সংবাদেরও আশঙ্কা করিত। কিন্তু যত বড় আঘাত পাইবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহার কিছুই হইল না। তাহার নাসিকা হইতে একটা স্বস্তির প্রবল নিশ্বাস বহির্গত হইল।

অকম্পিত স্বরে "চল্—তোর বাড়ী যাই।" বলিয়া গরবী উঠানে নামিয়া পড়িল।

ভজহরির অগ্রে, গরবী তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু বাড়ীর বাহির হইতেই, শুষ্ক পত্রের একটা মর্ম্মর ধ্বনি তাহার কাণে গেল। গরবী থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল একজন অপরিচিত ব্যক্তির কোল হইতে একটা সবল, পুষ্ট, কৃষ্ণকায় শিশু দুইহাত বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

গরবী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে টানিয়া কোলে লইল। গোবরা দুইহাত দিয়া গরবীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া, মাথাটা তাহার কাঁধের উপর গুঁজিয়া দিয়া ডাকিল "নতু মা—"

"বাপ্ আমার!"—বলিয়া গরবী ছেলেকে চুম্বন ভজহরি দাঁড়াইল। ফিরিয়া, নিকটে আসিল। গোবরাকে দেখিয়া, মনে মনে বলিল, "আবার আপদ জুটলো!" অপরিচিত লোকটা বিদায় হইলে ভজহরি বলিল, "চ'লে আয় গরব!"

দৃঢ় কণ্ঠে গরবী বলিল, "না। সাঙা হবে না। তুই বাড়ী যা।"—বলিয়া ছেলে কোলে করিয়া, দ্রুতপদে নিজ ঘরের রোয়াকে আসিয়া উঠিল।

ভজহরি তাহার পশ্চাতে আসিয়া রোয়াকে উঠিল।

"মাপ কর ভজা, বাড়ী যা।"—বলিয়া গরবী চাবি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া আগড় বন্ধ করিয়া দিল। ভজার অনেক ডাকাডাকিতেও সে আর উত্তর দিল না।

"দূ ত্তার্. এই জন্যেই বলে স্ত্রী-চরিত্তির!—বলিয়া ভজা অন্ধকার গ্রাম্যপথ দিয়া ফিরিয়া চলিল। একটা কালপেঁচা সন্ সন্ করিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। সান্ধ্য বায়ু দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় হা হা করিয়া বৃক্ষরাজির পত্রপল্লব নোয়াইয়া দিতে গেল।

সমাপ্ত

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

ফোটা

আনন ভরা হাসি ল'য়ে—
কানন ভ'রে ফুট্ছে ফুল—
আবেশ ভরা, আকুল করা
মলয় তারে দিচ্ছে দুল্।
গন্ধ ছোটে দিগ্‌বিদিকে—,
মাতাল অলি এল ধেয়ে—
স্বপন মোহ জড়িয়ে চোখে
ফুল ছিল সেই পথটি চেয়ে।

আমায় ওগো ফুটিয়ে তোল
এমনি রেণু দলে দলে—
সব-ফোটান পরশ তোমার—
সরস করে হিয়ার তলে।
আশা সুধায় বুকটী ভরে—
পথের পানে আছি চেয়ে—
কুঁড়ি হ'তে মুক্ত ক'রে—
রূপে গন্ধে দাও গো ছেয়ে।

শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী

[৫]

দার্শনিকগণ প্রধানতঃ দুই প্রকার কারণের কথা বলিয়াছেন। একটী উপাদান কারণ (material cause); আর একটী নিমিত্ত কারণ (efficient cause)। যেটী উপাদান কারণ, সেইটী পরিণত হয়, বিকৃত হয়, নানাপ্রকার অবস্থান্তর ধারণ করে। যেটী যাহার উপাদান, সেটী এক অবস্থা ছাড়িয়া আর এক অবস্থায় পরিণত হয়; এক আকার ত্যাগ করিয়া, অন্য আকার গ্রহণ করে। কিন্তু যেটী নিমিত্ত কারণ সেটী অবস্থান্তরিত হয় না। নিমিত্তকারণটী, উপাদান কারণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, পৃথক্ রহিয়া, সেই উপাদানকে নানা আকারে পরিণত করে। একটী দৃষ্টান্ত লউন্। ঘটনির্ম্মাণেচ্ছু কুম্ভকার, ঘটের নিমিত্ত কারণ। কিন্তু যে মৃৎপিণ্ড ঘটের আকারে পরিণত হয়, উহা ঘটের উপাদান কারণ। মৃৎপিণ্ডটী ঘট শরাবাদি নানা অবস্থায় বিকৃত বা পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু নিমিত্ত কারণটীর এ প্রকার অবস্থান্তর হয় না। কুম্ভকার স্বয়ং স্বতন্ত্র থাকিয়াই, মৃৎপিণ্ডটীকে গড়িয়া, পিটিয়া, ঘটাদি আকারে পরিণত করে।

সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে, জগতের উপাদানরূপে একটা ভিন্ন বস্তু কল্পিত হইয়াছে। কেহ সেই বস্তুটীকে 'প্রকৃতি' বলিয়াছেন; কেহ উহাকে 'পরমাণু' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই জগতের স্বতন্ত্র, স্বাধীন, নিত্য উপাদান। এই উপাদান আপনা আপনি, অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, ক্রমে ক্রমে জগতের বিবিধ বস্তুর আকারে, পরিণত হইয়া উঠিতেছে। ইহা সাংখ্য-কারের সিদ্ধান্ত। ন্যায়দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর এই পরমাণুপুঞ্জকে গড়িয়া পিটিয়া সংযোগ-বিয়োগের ফলে, জগতের বিবিধ পদার্থ রচনা করিয়াছেন। উভয়ের মতেই, জগতের মূলে একটা স্বাধীন উপাদান কল্পিত হইয়াছে। মনুষ্যশিল্পী কর্ত্তৃক গৃহাদি রচনা এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগৎ-রচনা—একই প্রণালী অনুসরণ করিয়া থাকে। কোন শিল্পী যেমন কাষ্ঠ বা পাষাণখণ্ডাদি উপাদান লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ঈশ্বরও তদ্রূপ, পরমাণুপুঞ্জ লইয়া তদ্দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, আপনা হইতে স্বতন্ত্র, আপনা হইতে ভিন্ন 'অন্য' একটা উপাদান লইয়াই, ঈশ্বর জগৎ রচনায় নিযুক্ত হন।

বেদান্তদর্শন কিন্তু এ প্রকারে বস্তুনির্ণয় করেন নাই। বেদান্তদর্শনে, এরূপ একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন, 'অন্য' কোন উপাদান, জগতের মূলে কল্পিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় বলিয়াছি, বেদান্তে, অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তুকে জগতের উপাদান না বলিয়া, ব্রহ্মবস্তুকেই জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। এ জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ উভয়ই হইতেছেন—এই ব্রহ্মবস্তু। এই সিদ্ধান্তে একটা চমৎকার ফল হইয়াছে। ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলাতে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র, ভিন্ন বস্তু হইতে পারিতেছে না। এই জগৎ, ব্রহ্মেরই বিকাশ ইহাই পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মের যেটী স্বরূপ তাহাই, জগতের বিবিধ বস্তুরূপে ক্রমে ক্রমে বিকাশিত হইতেছে। আবার, ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ বলাতে ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, যদিও ব্রহ্মের স্বরূপই বিকাশিত হইতেছে, তথাপি সেই স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বিকাশিত হইতেছে না; কেননা, উহা স্বতন্ত্র রহিয়াই যাইতেছে। নিমিত্তকারণ বলাতে ব্রহ্মের এই স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রহিয়া যাইতেছে। তিনি স্বতন্ত্র রহিয়াই, এজগতে আপন স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন। এই তত্ত্বই আমরা পাইতেছি। তিনিই এ জগতের উপাদান কারণ; সুতরাং জগৎ তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, 'অন্য' কোন বস্তু নহে। তিনিই এ জগতের নিমিত্তকারণ; সুতরাং তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্রই রহিয়াছেন; অর্থাৎ এ জগৎ তাঁহার

সম্পূর্ণ বিকাশ নহে। তবেই আমরা ইহাই পাইতেছি যে, ব্রহ্ম, জগতের অতীত থাকিয়াই, আপনাকে বিকাশিত করিতেছেন। এবং এ জগৎ যখন তাঁহারই বিকাশ, তখন এ জগতের কোন বস্তুই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বা 'অন্য' কিছু হইতে পারিতেছে না। বেদান্ত ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ বলার ইহাই তাৎপর্য্য।

কিন্তু প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, বেদান্তের এই মহান্ সিদ্ধান্তটী ঋগ্বেদ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বস্তুই জগতের নিমিত্তকারণরূপে জগতের অতীত এবং জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; আবার ব্রহ্মবস্তুই জগতের উপাদান বলিয়া, এ জগৎ 'অন্য' কোন বস্তু নহে; এ জগৎ তাঁহারই বিকাশ। যে মন্ত্রে ঋগ্বেদ এই মহাতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন আমরা সেই মন্ত্রের উল্লেখ করিব। এবং ঐ মন্ত্রটীর অর্থ করিয়া পাঠক ও পাঠিকা বর্গকে শুনাইব। প্রশ্ন ও উত্তরের ছলে, বেদে এই তত্ত্বের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই মন্ত্র দুইটীর এইটি শেষ মন্ত্র—

"ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ,
যতো দ্যাবা-পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ॥
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো
ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥"

এই বিখ্যাত মন্ত্রটীর প্রথম দুই চরণে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শেষ দুইচরণে ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে।

এই মন্ত্রটীর পূর্ব্বগামী মন্ত্রে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে—'এই পরিদৃশ্যমান্ আকাশ ও পৃথিবী এবং এই দুইএর অন্তর্গত বিবিধ বস্তু—এ সকলের উপাদান কোন্ বস্তু? কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা যেমন প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, তেমনি, এই জগৎ-রূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে কি প্রকার কাষ্ঠ লাগিয়াছিল? কোন্ বন এবং কোন্ বৃক্ষ হইতে এই জগদ্গৃহ বিরচিত হইয়াছিল?' এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলা হইতেছে,' পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন। শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—'ব্রহ্মই সেই বন, ব্রহ্মই বৃক্ষ,—যাহা হইতে এই আকাশ ও পৃথিবীকে 'তক্ষণ' করা হইয়াছে। শিল্পী যেমন বৃক্ষের কাষ্ঠ কাটিয়া, সেই কাষ্ঠ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; কাষ্ঠ-খণ্ড গুলিই যেমন গৃহের উপাদান; এই জগৎরূপ গৃহেরও, ব্রহ্মবস্তু নিজেই কাষ্ঠস্বরূপ। নানা জাতীয় বৃক্ষ কাটিয়া যেমন লোকে কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিয়া লয়, এবং এই সকল কাষ্ঠখণ্ড নানা ভাবে সজ্জিত করিয়া যেমন বহুবিধ সুরম্য গৃহ বা প্রাসাদ বিনির্ম্মিত করিয়া তোলে; এই জগৎ-রূপ প্রাসাদেরও তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুই বৃক্ষস্বরূপ। ব্রহ্ম-বৃক্ষ হইতেই এই জগৎ-প্রাসাদ রচিত হইয়াছে।'

পাঠক-পাঠিকা তবেই দেখিতেছেন যে, প্রথম দুই চরণে শ্রুতি, ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু এস্থলে একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা এই মন্ত্রে 'বন' ও 'বৃক্ষ'—এই দুইটী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাইতেছি।

বৃক্ষকে বরং একটা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহের উপাদান বলা যাইতে পারে, কেন না ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠগুলিই ত গৃহের আকারে অবস্থান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু বনকে কিরূপে ঐ গৃহের উপাদান বলা যাইতে পারে? অথচ আমরা শ্রুতিতে বৃক্ষ শব্দের সঙ্গে, বন শব্দটীকেও দেখিতে পাইতেছি। ইহার কি কোন কারণ নাই? শ্রুতি কি একটা নিষ্প্রয়োজন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন? পাঠক-পাঠিকা, আরও লক্ষ্য করিবেন, বন শব্দটী অগ্রে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বৃক্ষশব্দটীকে বনশব্দটির পরে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহারও কি কোন কারণ নাই? আমাদের বিশ্বাস এই যে, শ্রুতিতে একটী শব্দও বিনা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নাই; এবং শব্দ গুলির অগ্র পশ্চাৎ প্রয়োগেরও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমাদের কেন এ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, বলিতেছি।

Whole এবং parts ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ; অংশ এবং অংশীর মধ্যে যে সম্বন্ধ; সমষ্টি এবং ব্যষ্টির মধ্যে যে সম্বন্ধ; এক এবং অনেকের মধ্যে যে সম্বন্ধ;

—বন এবং বৃক্ষের মধ্যেও সেই প্রকার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। নানাজাতীয় ও নানা আকারের ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু বৃক্ষের সমষ্টিকেই 'বন' বলা যায়। অতিদূর হইতে নদীর অপরতটবর্ত্তী বন যখন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন আমরা একটা ঘন-সন্নিবিষ্ট, মসীশ্যাম, কৃষ্ণ-রেখা দিক্‌চক্রবালকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। দূর হইতে, উহাতে কোন বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয় না। কোন্ বৃক্ষটী বড় বা ছোট, কোন্ বৃক্ষটী কোন্ জাতীয়, কোন্ বৃক্ষের কোন্‌টী শাখা বা পত্র—ইত্যাদি বিষয়ের কোন বিশেষ আকার বা বৈশিষ্ট্য বা কোন ভেদ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-বিহীন, একটা ঘন-শ্যাম কৃষ্ণ-রেখা মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ইহাই বন নামে পরিচিত। ইহা সমস্ত বৃক্ষের সমষ্টিগত একটা সাধারণ রূপ। পরে, যতই আমরা বনটীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি, তখন ধীরে ধীরে, উহার মধ্যস্থ বিশিষ্টতা, ভেদ, আকার প্রভৃতি সমস্তই ভাসিয়া উঠিতে থাকে। অতএব, বৃক্ষসমষ্টিই হইতেছে বন এবং বনমধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষগুলিই উহার অংশ। কিন্তু এখানে একটী কথা আছে। কেবলমাত্র কতকগুলি বৃক্ষের সমষ্টিই কি বন? বনের গম্ভীরতা, বনের ভীষণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির ত আমরা উহার মধ্যস্থ কোন একটী বৃক্ষেই পাই না। বনের মধ্যে এমন কিছু থাকে, যাহা বৃক্ষগুলিতে নাই। সুতরাং বন, বৃক্ষগুলির সমষ্টি হইলেও, আরও কিছু অধিক।

সৃষ্টির প্রাক্‌কালে, সমষ্টিভাবে, নানাজাতীয় ও নানাসংখ্যক শক্তিপুঞ্জ, সকলপ্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত হইয়া, আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বিকাশিত হইয়াছিল। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়া দিয়াছেন যে, যাহা Homogeneous, তাহাই ক্রমে ক্রমে Heterogeneous হইয়া পড়ে। এই একাকার Homogeneous বিশ্বব্যাপক শক্তিপুঞ্জ, সকলপ্রকার বৈশিষ্ট্যের বীজ। আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে, —"সর্ব্বকার্য্য-করণ-শক্তি-সমাহাররূপা ...মায়াশক্তিঃ"। সৃষ্টির পরে, যত প্রকার কার্য্য ও করণশক্তি সমূহ অভিব্যক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিকাশিত হইয়াছে; সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাদুর্ভূত মায়াশক্তিতে, তৎসমুদয়ই একাকার হইয়া বীজরূপে অবস্থিত থাকে। উহাই পরে, নানারূপে, নানাআকারে, বিভক্ত ও পৃথক্‌কৃত হইতে থাকে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতিতে কি অভিপ্রায়ে প্রথমে 'বন' শব্দ এবং তৎপরে 'বৃক্ষ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা প্রথমে Homogeneous, diffuse ভাবে ছিল, তাহাই ক্রমে বিভক্ত হইয়া Heterogeneous রূপে, বিবিধ-নাম বিবিধ রূপ ধারণ করিল।

বেদান্তে আমরা পাই যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সাধারণ বীজস্বরূপ 'হিরণ্যগর্ভ'ই ব্রহ্মের প্রথম বিকাশ। উহাই ক্রমে 'পঞ্চতন্মাত্র'রূপে বিভক্ত হইয়া স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হয়। যাবতীয় বস্তু সেই পঞ্চভূতের অবস্থান্তর বা পরিণাম। বেদের ঐ মন্ত্রটীও এই তত্ত্বেরই নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'বন' শব্দদ্বারা শ্রুতিতে, সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের সাধারণ সমষ্টি-বীজস্বরূপ শক্তির প্রথম অভিব্যক্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। 'বৃক্ষ' শব্দদ্বারা, উহাই যে ক্রমে বিশিষ্ট-আকারে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই তত্ত্ব নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই যে অভিব্যক্তি, ইহা ব্রহ্মস্বরূপেরই অভিব্যক্তি। উহা ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত 'অন্য' কোন বস্তু নহে। তাই শ্রুতি, ব্রহ্মকেই জগতের উপাদানভূত 'বন' এবং 'বৃক্ষ' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। বনশব্দের প্রথম উল্লেখেরও উদ্দেশ্য এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

বর্ত্তমান কালের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Dr James Ward যাহাকে "Objective continuum" অথবা Indistingnishable and confused mass of appearance" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঋগ্বেদ-কথিত 'বন' শব্দটীও তাহাকেই বুঝাইতেছে।

"Dr Ward's theory of a "totum objectivum" as a mass, out of which as material, all presentations or objects arise by the selective attention of the

self". "The distinctions of internal and external, of mental and material, of me and not-me, of my body and other bodies, and of bodies among themselves, all these distinctions are the results of progressive differentiation of one field of consciousness of the one continuous object—the totum objectivum."

পাঠক-পাঠিকা তবেই দেখিতেছেন যে, বন ও বৃক্ষ এই দুইটী শব্দের কোনটাই নিষ্প্রয়োজনে শ্রুতিতে প্রযুক্ত হয় নাই। এবং শ্রুতির এই মহাসিদ্ধান্তটী আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত।

এইরূপে শ্রুতি, প্রথম দুইচরণে ব্রহ্মকেই জগতের উপাদানরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, অন্তিম দুইচরণে ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্তকারণরূপেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্"।—

ব্রহ্ম এই ভুবনের অতীত হইয়া, ভুবনকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 'অধি' এই শব্দটী, জগতের অতীত বা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র- ইহাই বুঝাইতেছে। ঘট-নির্ম্মাতা কুম্ভকার, ঘট হইতে স্বতন্ত্র, এইজন্যই সে ঘটের নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মও এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং তিনি এজগতের নিমিত্তকারণ। কিন্তু যেটী ঘটের উপাদানকারণ, যেটী মৃৎপিণ্ড, সেটি কদাপি ঘট হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। কেননা মৃৎপিণ্ডই ত ঘটের আকারে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং তাহা, ঘট হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারেনা। ব্রহ্মের স্বরূপটীই জগতের আকার ধারণ করিয়াছে, সুতরাং ঐ স্বরূপটীই জগতের উপাদান। কিন্তু তাহা হইলে ত ব্রহ্ম জগতের অতীত হইতে পারিলেন না, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারিলেন না; ব্রহ্মকেও বিকারী হইতে হইল। এই নিমিত্তই শ্রুতি আবার, ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণও বলিতেছেন। তবেই ব্রহ্ম, জগৎ হইতে স্বতন্ত্রই হইতেছেন। তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে যে, ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে আপন স্বরূপকে জগৎ-আকারে পরিণত করেন নাই। জগৎ তাঁহার আংশিক বিকাশ মাত্র। তিনি জগতের অতীত থাকিয়াই, জগৎ-রূপে বিকাশিত। জগৎ, তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিতেছে না, আংশিক পরিচয় দিতেছে মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

বর্ষা বঁধু

সকল আঁচল উড়িয়ে তুমি
কে এলে আজ বাদল বায়ে,
কোন্ গগনের অসীম হতে
কোন্ স্বপনের আবছায়ে!
চক্ষে তোমার বেদন ঝরে,
পরাণ আমার ওঠে ভরে;
সকল ব্যথার ব্যথী, ওগো
পরশ তোমার দাও বুলায়ে।

নিবিড় তোমার চিকুর জালে
ঘিরেছে মোর ভুবনখানি;
আকুল হয়ে বেড়ায় ঘুরে
মনের কোণের কাণাকাণি।
আজ আমার এ শূন্য বাসে
তোমার ছায়া ঘনিয়ে আসে,
আঁধার রাতের সাথী, ওগো
ভয় ভাবনা দাও ভুলায়ে।

শ্রীসরসীকান্ত দত্ত।

গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তীকালের মথুরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকেরা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, গুপ্ত সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং এ ধর্ম্মকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাৎকালীন ব্রাহ্মণেরা দুর্ব্বোধ বৈদিক ধর্ম্মকে জনসাধারণে বোধগম্য করিবার জন্ত এবং উপাসকদিগের ধ্যান ও ধারণা প্রভৃতি সাধন কার্য্যকে সুগম ও সুসাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিরাকার, অখণ্ড ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া, নানাবিধ দেবমূর্ত্তি সকল গঠন করিয়া, সুললিত সংস্কৃত ভাষায় পুরাণাদিতে সেই সকল দেবতাগণের আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের মন্দিরাদি দেশমধ্যে বহুল ভাবে সংস্থাপিত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ ক্ষেত্রের মহিমাও প্রচারিত হইতে লাগিল। খৃঃ ৩০০ হইতে ৭০০ অব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিশেষ উন্নতির দিন। কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে, এই গুপ্ত সম্রাটদিগের সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই চারিশত বৎসরের মধ্যেই কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী, বাণ-ভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; এই চারি শত বৎসরের মধ্যেই আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের উদয় হইয়াছিল; এই চারি শত বৎসরের মধ্যেই সুশ্রুত, রাজ নির্ঘণ্ট, ভাব প্রকাশ ও চক্রপাণি প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছিল; এই চারি শত বৎসরের মধ্যেই অজন্তা, এলোরা, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর কার্য্যের চরম উন্নতি দেখা গিয়াছিল। এই সময়কে হিন্দুধর্ম্মের সুবর্ণ যুগ বলিলেও চলে। আমাদের মনে হয় যেন এই গুপ্ত সম্রাট্‌গণের সময় হইতেই বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া থাকিবেন।

এবার আমরা ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধনের কথা বলিব। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পর প্রায় ২০০ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। গুপ্ত বংশের দৌহিত্র প্রভাকর বর্দ্ধন (উপাধি প্রতাপশীল) নামে একজন রাজা কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী থানেশ্বরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন নামে দুই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের মাতার নাম যশোমতী। পিতার মৃত্যুর পর, পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্যবর্দ্ধন শুনিলেন যে, মালবেশ্বর তাঁহার ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মাকে বধ করিয়া তাঁহার ভগিনী রাজ্য-শ্রীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া করপদে লৌহ বেষ্টনী দিয়া কনৌজের কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছে। রাজ্যবর্দ্ধন এই শোচনীয় সংবাদ শুনিয়া অনতিবিলম্বে সৈন্য লইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং কনোজ-রাজকে অচির কাল মধ্যে নিহত করিলেন। এই সময়ে মালবেশ্বরের প্রিয় মিত্র বঙ্গদেশের অন্তর্গত কর্ণ-সুবর্ণপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত অতর্কিত ভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া রাজ্য বর্দ্ধনের প্রাণ সংহার করেন। এই গোলযোগের সময় রাজ্যশ্রী কান্য-কুব্জ হইতে গোপনে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিন্ধ্যা-টবীতে পলায়ন করেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর হর্ষবর্দ্ধন রাজা হইয়া ভগিনীর অন্বেষণে বিন্ধ্যাচলে যাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভগিনী চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রীহর্ষ ভগিনীকে সেই ভীষণ উদ্যম হইতে নিরস্ত করিয়া আপন রাজ্যে লইয়া গেলেন। রাজ্যশ্রী অতিশয় বিদ্যাবতী

ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি কি রাজ্য পরিচালনা, কি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাধান, সকল বিষয়েই ভ্রাতা শ্রীহর্ষকে সৎপরামর্শ দিতেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ছিলেন। তাঁহারই সদৃষ্টান্তে শ্রীহর্ষ বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

সম্রাট শ্রীহর্ষ কপটাচারী শশাঙ্ককে রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। শিবোপাসক শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত এতই দুর্ব্বৃত্ত, ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন যে, তিনি উরুবিল্বের বোধিদ্রুমকে (বুদ্ধদেব যে অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে তপস্যা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন) সমূলে উৎপাটিত ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন এবং ইহার পার্শ্বস্থ অশোক নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পাটলিপুত্র নগরে অশোক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধদেবের মর্ম্মর পদাঙ্ক ছিল, সেখানিকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন।

এই সময় হইতে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দিলেন। ইঁহার সেনাবাহিনী মধ্যে ষাটহাজার রণহস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী ও অগণিত সংখ্যক পদাতিক ছিল। এই বিপুল বাহিনী লইয়া তিনি উত্তরে হিমাচলের ক্রোড় হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র হইতে পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত সমস্ত নরপতিগণকে পদানত করিয়াছিলেন। সুদূর থানেশ্বরে থাকিয়া সুবিশাল রাজ্য শাসনের সুবিধা হয়না বলিয়া কাণপুর সন্নিহিত কান্যকুব্জ নগরে নিজ নূতন রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি 'পরম মাহেশ্বর' অর্থাৎ শৈব ছিলেন। এখন হইতে শিলাদিত্য উপাধিতে ভূষিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত রত্নাবলী ও নাগানন্দ নাটকের নান্দীতে মহাদেব ও বুদ্ধদেব উভয়েরই স্তুতি আছে। প্রিয়দর্শিকা নামে অপর একখানি নাটকও তিনি রচনা করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রামভট্ট ময়ূরভট্ট প্রভৃতি কবিগণকে নিজ সভাসদ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিদেশী হইলেও চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ং সাংকে তাঁহার গুণের জন্য নিজ অনুগত মিত্ররূপে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। নিজে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও অপর কোন অবৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিতেন না। বরং ব্রাহ্মণগণকে ও তাঁহাদের ধর্ম্মের সমাদর করিতেন। ইঁহাকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর অশোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে কাণাকুব্জ নগরে শেষ বৌদ্ধ মহা সঙ্গীতি সমবেত করিয়াছিলেন। তথায় একবিংশতি জন সামন্তরাজ ও বহু সহস্র বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৌদ্ধ যতি ৪০০০, নালন্দার পণ্ডিত ১০০০ এবং ব্রাহ্মণ ও জৈন পণ্ডিত ৩০০০ ছিলেন। সভায় উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অনেক তর্ক বিচারাদি হইয়াছিল। সঙ্গীতির প্রথম দিবসে বুদ্ধদেবের, দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যদেবের, তৃতীয় দিবসে মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করা হয়। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রয়াগধামে শিলাদিত্য রাজকোষে প্রতি পঞ্চ বৎসরে যতই অর্থ সঞ্চিত হউক না কেন, সমস্তই অকাতরে দান কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তথায় সামন্তরাজগণ ও জনসাধারণ মিলিত হইয়া ৭৫ দিন ব্যাপী মহোৎসবে যোগ দিতেন। বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ বা অপর যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, মুক্তহস্ত দান লাভে কেহই বঞ্চিত হইত না। উৎসবের শেষ দিনে কেবল রাজ্যরক্ষার উপকরণ হস্ত্যশ্ব পদাতিক ও অস্ত্র শস্ত্র ছাড়া, অপর সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি—এমন কি রাজপরিচ্ছদটি পর্য্যন্ত—বিতরণ করিতেন। ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে সামান্য বসন লইয়া সম্রাট দীনবেশ ধারণ করিতেন। ইনি খৃষ্টীয় ৬০৭-৬৩৭ অব্দ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। রাজকবি বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে ইঁহার যে জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হিয়ংসাং বলেন যে, সম্রাট শ্রীহর্ষ দক্ষিণে চালুক্য রাজপুথকেশী দ্বিতীয়কে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই।

হিয়ংসাং যখন পাটলিপুত্র দেখিতে যান, তখন অশোকের সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদটি ধ্বংসমুখে পতিত, বুদ্ধদেবের

অপরাপর লীলা স্থানগুলি শোচনীয় দশাগ্রস্ত। 'মথুরায় তখন বৌদ্ধের সংখ্যা ৩০০০ হইতে কমিয়া গিয়া ২০০০ দাঁড়াইয়াছে। এখানে তখনও একজন শূদ্র জাতীয় বৌদ্ধ সামন্ত রাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে তখন ৫টি ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। সে গুলির নাম দেন নাই, তথাপি বুঝা যায় বিশেষ প্রভাব সম্পন্ন না হইলে, এ বিষয়ের তিনি উল্লেখ করিতেন না। সুতরাং একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম মস্তকোত্তোলন করিতেছিল, অপরদিকে তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম অধঃপতিত হইতেছিল। পরিণত বয়সে শ্রীহর্ষ হীনযান হইতে মহাযান সম্প্রদায়ে যোগ দান করেন এবং অশোকের ন্যায়, নরহত্যা দূরে থাক, কোন রূপ ক্ষুদ্র প্রাণীকে কেহ হত্যা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য ছিল। তিনি সাধারণ প্রজা বর্গের এমন কি পথিকদিগের পর্য্যন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। নগর মধ্যে ও প্রশস্ত রাজপথ পার্শ্বে তিনি যে সকল পান্থশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল খাদ্য পানীয় নয়, চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে যেরূপ পান্থশালা ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান পৃথিবীর অপর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে বহুমূল্য সঙ্ঘারাম ও ১০০ শত ফিট উচ্চ কতকগুলি কাষ্ঠ ও বংশ নির্ম্মিত স্তূপ ও মঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই গুলি ইষ্টক বা প্রস্তর রচিত ছিল না বলিয়া বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। যমুনা তীরবর্ত্তী মথুরা নগর তৎকালে তাঁহার সামন্তরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এই প্রদেশে তিনি কোথাও কোথাও স্তূপও স্থাপন করিয়াছিলেন। আজিকার দিনে সেইগুলি এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে, সেই গুলিকে চিনিয়া লওয়া অসম্ভব। তবে মধুবন ও বানসখেড়া প্রভৃতি কয়েক স্থানে তাঁহার নামাঙ্কিত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। যে শিলালেখ গুলিতে নাম ও অব্দাদি লিখিত আছে সেই গুলিই আমরা কোন সময়ের নির্ম্মিত বলিয়া জানিতে পারি। অপরগুলিতে সেরূপ সময় নিঃসংশয়ে জানা যায় না। তবে গঠনের পার্থক্য জন্য কতকটা ধরা যায়।

হিয়েন্থসাং বলেন, ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম সমূহে অন্যূন দুই লক্ষ বৌদ্ধ যতি শ্রীহর্ষরাজ প্রদত্ত অর্থে প্রতিপালিত হইতেন। সম্রাট এইরূপে বৌদ্ধদিগের প্রতি সমাদর ও আনুকূল্য করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণেরা মনে মনে অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল। একবার তিনি কনৌজ নগরে বুদ্ধোৎসব সমাধান করিয়াছিলেন। ১০০ শত ফিট উচ্চ সুবিশাল সুরম্য মণ্ডপ মধ্যে রাজদেহের সমোচ্চ একটী কনকময় বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট সামন্তরাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অপর একটী ৩ ফিট উচ্চ হিরণ্ময় সচল বুদ্ধমূর্ত্তি স্কন্ধে লইয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন। এইরূপ নগর ভ্রমণকালে একদিন একজন আততায়ী আসিয়া ছুরিকাঘাতে সম্রাটের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। সে, ধরা পড়িয়া স্বীকার করিল যে, ব্রাহ্মণদিগের প্ররোচনায় এইরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপর একদিন অকস্মাৎ প্রধান মণ্ডপটী অগ্নি লাগিয়া পুড়িতে আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে ব্রাহ্মণদিগের চক্রান্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বাণ নিক্ষেপ করাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজহত্যার চেষ্টা, ও মণ্ডপ দগ্ধ করিবার উভয় উভয় অপরাধের যথারীতি বিচার হইল। অবশেষে প্রধান প্রধান অপরাধীর প্রাণ দণ্ড ও অবশিষ্ট পাঁচশত ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল।

শ্রীহর্ষের পিতামহ পুষ্যভূতি ও তৎপূর্ব্বপুরুষেরা শিবোপাসক ছিলেন। তাঁহার পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন সূর্য্য পূজক, তাঁহার ভ্রাতা রাজ্য বর্দ্ধন ও তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। শিলাদিত্য শ্রীহর্ষ এই তিন দেবতার সমন্বয় করিবার জন্যই বুঝি শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধদেব এই তিন দেবতাকেই অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীহর্ষের প্রায় শতাধিক

বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যের কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য নামক দুইজন ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধদিগের নাস্তিকবাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তের ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও শস্ত্র উভয় বলই প্রযুক্ত হইয়াছিল। রাজা সুধন্বা শঙ্করাচার্য্যের রক্ষকরূপে রাজকর্মচারীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, সেতুবন্ধ হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারতের যে স্থানেই হউক বৌদ্ধদিগের বৃদ্ধ বালক যাহাকে পাইবে তাহাকেই হত্যা করিবে। এই আদেশের অন্যথা করিলে সেই রাজকর্ম্মচারীর প্রাণদণ্ড হইবে। ইহার পর বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালায় পাল রাজগণের সময়ে একবার বিদ্যুতের ন্যায় কিয়ৎকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া ভারতের বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতির দলে চিরতরে মিশিয়া গিয়াছে।

শ্রীহর্ষের পর আবার প্রায় ২০০শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ৮৪০ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামভদ্রের পুত্র মিহিরভোজ নামে একজন রাজা শতদ্রু হইতে বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়া নিজে একজন ছোট খাট সম্রাটরূপে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। গুর্জ্জর প্রতিহার বংশে ইঁহার জন্ম, কনৌজ রাজধানী। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ শৈব কেহ শাক্ত; ইঁহার পিতা সৌর ছিলেন। ইনি প্রথম জীবনে "ভগবতী ভক্ত" ছিলেন পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি আপনাকে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার আদি বরাহরূপে পরিচয় দিবার জন্যই হউক, অথবা আপন অভীষ্ট দেবতা বলিয়াই হউক, নিজ রৌপ্যমুদ্রাগুলিতে বরাহ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ বরাহাঙ্কিত মুদ্রা উত্তর ভারতে অনেক স্থানে বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, তিনি সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বাণভট্টের ন্যায় কোন রাজ-কবি ইঁহার জীবন চরিত লিখিয়া যান নাই। তবে ভোজরাজের নামে অনেকগুলি উদ্ভট কবিতা লোক-মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সেই কবিতাগুলি ইঁহার সম্বন্ধে কিনা ঠিক জানা যায় না। এখন কালবশে লোকমুখে সেগুলি কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের নামে চলিত হইয়া গিয়াছে।

জনরবে শুনিতে পাওয়া যায় যে এই মিহির ভোজ অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি অনেক হিন্দুতীর্থে ব্রাহ্মণ্য দেব মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত করিয়াছিলেন। আগ্রা হইতে ২০।২৫ মাইল নিম্নে যমুনাতীরে শৌকরী বটেশ্বর নামক স্থানে ইনি অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মথুরায় যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তৎসঙ্গে যে বরাহদেবের মূর্ত্তিটির কথা পরে বলিব, অনেকে বলেন, সেই বরাহ মূর্ত্তিটী ইঁহারই স্থাপিত। বরাহ পুরাণে কিন্তু লিখিত আছে যে মথুরায় বেদচর্চ্চা লোপ পাইয়াছিল; শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কা হইতে যে বরাহ মূর্ত্তিকে অযোধ্যায় আনিয়াছিলেন, শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করিয়া সেইটীকে এই স্থানে আনিয়া স্থাপন করেন ও তদবধি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। মথুরায় আদি বরাহ মূর্ত্তি অঙ্কিত কয়েকটা মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মিহিরভোজের নামাঙ্কিত কোন নিদর্শনের সংবাদ পাই নাই। তবে মিহিরভোজ যখন নিজ মুদ্রায় আদি বরাহমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তখন মথুরায় বরাহমূর্ত্তিটী স্থাপন করা অসম্ভব নহে। মথুরায় প্রবীণ তীর্থপুরোহিত দাউজী চৌবে (এখন পরলোক-গত) বরাহ পুরাণের শ্লোক "সুধাং তং বরদং দেবং মাথুরাণাং কুলেশ্বরং" আওড়াইয়া বলিয়াছিলেন "চৌবেরা প্রথমে সৌর ছিল। ভোজ নামে একজন রাজা বরাহদেবকে মথুরায় স্থাপন করিয়া আমাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছেন। তদবধি চৌবেরা বরাহদেবের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাদ রটিয়াছে। কিন্তু সেই ভোজরাজ কে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। (ব্রজ পরিক্রমার ১৷৵ পৃষ্ঠা দেখুন)

আমাদের ইংরাজী লিখিত ইতিহাসের কথা বলা শেষ হইল। এবার আমরা দেখিব আমাদের ব্রাহ্মণ লিখিত পুরাণ গুলির মধ্যে কি পাওয়া যায়। পাঠান সম্রাটগণের রাজত্বের শেষ দিনে যখন মাধবেন্দ্রপুরী, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্যদেব ও রূপ

সনাতন প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যবর্গ মথুরা প্রদেশে লুপ্ত তীর্থ ও গুপ্ত দেবমূর্ত্তি গুলির অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে পুঁথি খানি দেখিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহার নাম বরাহ-পুরাণ'। চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে বরাহপুরাণের যে অংশে মথুরার বিবরণ ও মাহাত্ম্য লেখা আছে, সে স্থানকে আদি বরাহপুরাণ বলিয়া নাম করিয়াছেন। এই স্থানটুকুর নাম কেন আদি বরাহ পুরাণ হইল তাহার উত্তর অনেক পণ্ডিতকেও জিজ্ঞাসা করিয়া পাই নাই। আমাদের মনে হয় তবে ৮৪০—৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত মিহির ভোজ নামে যে রাজা আপনাকে আদিবরাহরূপে মুদ্রায় নিজ নাম ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার সময় বা তাঁহার অনুমতি-ক্রমে রচিত বলিয়া এই মথুরা-মাহাত্ম্য অংশটুকুর নাম 'আদি বরাহ' হইলেও হইতে পারে। আদি বরাহপুরাণে মথুরার যে সকল দেবতার নাম পাইয়াছি সেই গুলি এই—কেশব, গতশ্রম, দীর্ঘবিষ্ণু, বরাহ, গোবিন্দ, ও হরি নামে ছয়টী বিষ্ণু। ভূতেশ্বর, স্বয়ম্ভু, গোকর্ণেশ্বর, সোমেশ্বর, গর্ত্তেশ্বর ও পিপ্পলেশ্বর নামে ছয়টী শিব। বসুমতী, মহাবিদ্যা, অপরাজিতা, সুমালো, আয়ুধাগারের দেবতা উগ্রসেনী, দানবদলনী দেবী বধুটী, কংস-গৃহবাসিনী চর্চ্চিকা, কৃষ্ণ-পূজিতা ইক্ষুবালা, এই আটটি শিবের শক্তি। বিঘ্নরাজ প্রভৃতি তিনটী গণেশ ও দুইটী সূর্য্য। হনুমান কর্কোটক নাগ প্রভৃতি অপরাপর দেবতার নামও আছে। পাঠক-গণকে বলিয়া দিতে হইতেছে যে ব্রাহ্মণ্য দেবতা-দিগের মধ্যে বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার শিব ও দুর্গা চণ্ডিকা প্রভৃতি, তাঁহার শক্তি সূর্য্য ও গণেশ, এই পঞ্চ দেবতাকেই মোক্ষদাতা ও পরিত্রাতা বলিয়া হিন্দুশাস্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন। উঁহাদের উপাসক-দিগকে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য নামে অভিহিত করা হয়। বরাহ পুরাণ রচনাকালে মথুরায় এই পঞ্চ দেবতারই অস্তিত্ব ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি গুলিকেই গ্রন্থকার প্রাধান্য দিয়া বলিতেছেন যে মথুরারূপ পদ্মের কর্ণিকা (কেন্দ্র) মধ্যে কেশব-দেব, পশ্চিম দলে হরিদেব, উত্তর দলে গোবিন্দ, পূর্ব্ব দলে বিশ্রান্তি ও দক্ষিণ দলে বরাহ মূর্ত্তি (১৬০ অধ্যায়, ১৬-২১ শ্লোক) অবস্থিত। আর একস্থানে বলিতেছেন, গয়ায় পিণ্ডদানে যে ফল লাভ হয়, মথুরায় শ্বেত বরাহ মূর্ত্তি, কেশব, বিশ্রান্তি, দীর্ঘবিষ্ণু, গোবিন্দমূর্ত্তি, হরিমূর্ত্তি দর্শনে সেই ফল লাভ হয়। (১৬০ অধ্যায় ৬১ ৬২ শ্লোক)। সুতরাং এখানকার প্রধান দেবতাই হইতেছেন বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি। শিবলিঙ্গগুলি এখনকার ক্ষেত্রপাল বা নগর রক্ষক। অপরাপর দেবতাগুলির মধ্যে কেবল মহাবিদ্যা দেবী যশোদার গর্ভ সম্ভূতা বলিয়া 'একানংশা' নামে যোগমায়ারূপে চৌবেগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাকেন। বাকী যে সকল দেবতা আছেন সেগুলির মাহাত্ম্য তত বেশী নহে। যে সকল বিষ্ণুমূর্ত্তির নাম আমরা করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কেশবদেব জন্মকালীন মূর্ত্তি, দীর্ঘবিষ্ণু কংস বিনাশকালীন মূর্ত্তি, গতশ্রম বা বিশ্রান্তিদেব কংস বধের পর বিশ্রাম কালের মূর্ত্তি, শ্বেত বরাহ ইহার মুখ ভিন্ন অবশিষ্ট অংশ বিষ্ণুমূর্ত্তি। গোবিন্দ নামে যে মূর্ত্তির কথা বরাহ পুরাণে উল্লেখ আছে সেইটী গরুড় পৃষ্ঠারূঢ় বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার বর্ত্তমান নাম গরুড় গোবিন্দ। বরাহদেব ছাড়া অপর ৫টি বিষ্ণুমূর্ত্তির কথাই হয়ত হিয়েনসাং উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

হরিদেব বলিয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা হয়ত কোন কোন পুরাণে পাওয়া যায়। কেবল হরিদেবই বামহস্ত উত্তোলন করিয়া দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তি। কৃষ্ণমূর্ত্তির উল্লেখ নাই। অথবা মথুরা বা বৃন্দাবনে কোন রাধা কৃষ্ণের উল্লেখ নাই। মথুরা হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে রাধাকুণ্ড নামে একটী কুণ্ডের নাম উল্লেখ আছে, অপর কোথাও রাধার নাম নাই। আজি কালি বৃন্দাবনে শত শত রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত দেখিতে পাই। বরাহ পুরাণের ভিতর বৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য টিলার উপর এক সূর্য্য ভিন্ন

অপর কোন দেবতার নাম নাই, তবে বৃন্দাবনকে "বহু-গুল্মলতাবৃত' "রম্যঞ্চ সুপ্রতীকঞ্চ" এবং "গোভি-র্গোপালকৈঃ সহ" শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার স্থান বলা হইয়াছে। সুতরাং আমরা এতদুরে বুঝিতে পারিলাম যে গুপ্ত রাজগণের সময় হইতে মিহির ভোজের সময়ের মধ্যে মথুরা নগরে ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তিগুলি বিশিষ্ট ও বহুল ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইবার পর বরাহ পুরাণখানি রচিত। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কয়েকটী বৌদ্ধ দেব ও জৈন তীর্থঙ্কর মূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়াছিল, ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পরিতাপের বিষয় কোন্ সময়ে বা কাহাকর্তৃক ঐসকল দেবমূর্ত্তি ও তাঁহাদের মন্দিরাদি মথুরায় স্থাপিত হইয়াছিল সেই সকল ইহলোকের কথা কোন পুরাণেই পাওয়া যায় না। তবে এখনকার কোন্ তীর্থে স্নান করিলে বা কোন্ দেবতাকে দর্শন করিলে পরলোকে কিরূপ সদ্‌গতি লাভ হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বরাহ পুরাণের মধ্যে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আরও একটি বিস্ময়ের কথা এই যে, বরাহ পুরাণে যে সকল দেবমূর্ত্তির নাম উল্লেখ আছে, সেগুলি কোনটাই বোধ হয় এখন বিদ্যমান নাই। মামুদ গিজনি, আলাউদ্দিন, ফিরোজসাহ তোগলক, সেকন্দর লোদি, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি ধর্ম্মান্ধ মুসলমান বাদসাহেরা বারবার দেবমূর্ত্তিগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া মথুরাকে নির্দ্দেব করিয়াছিলেন। দুই একটি হয়ত এড়াইয়া গিয়া থাকিবে। আমরা সেই সকল মর্ম্মভেদী অপ্রীতিকর কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিব।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বৌদ্ধভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নালন্দার সংস্থান দেশ অদ্যাপি সম্যক্ রূপে পরিমিত, পরীক্ষিত বা ক্ষোদিত হয় নাই। বড়্গাঁওয়ের উত্তর প্রান্তে, বেগমপুর নামক পল্লীতে এই বিশাল ভগ্নাবশেষের অধিক ভাগই নিহিত আছে।

বিহার বাসী জৈনগণের মতানুসারে শ্রীনিক বিম্বিসার (খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসর) জৈন ছিলেন। অদ্যাপি নালন্দায় জৈনগণের একটি মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু উহা অধিক প্রাচীন নহে। ভগ্ন স্তূপাবলী দেখিয়া উহা বৌদ্ধ কীর্ত্তির অবশেষ বলিয়াই অনুমিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় কাল হইতেই নালন্দায় বৌদ্ধ মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।

যে স্থলে বিহার প্রথম সংস্থাপিত হয় তাহা মূলতঃ একটি কুঞ্জ ছিল। এই কুঞ্জটী সুগত-চরণে উৎসৃষ্ট হয়।

মগধ অথবা মধ্য ভারত হইতে, জনৈক যুবক তন্ত্র-রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত দক্ষিণ ভারতে গমন করেন। তাঁহার নিকট মধ্য ভারতের প্রশংসা-বাদ শুনিয়া কোনও ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার সহিত রাজগৃহে আগমন করেন। তিনি মগধরাজের নিকট, যে কোন ব্রাহ্মণের সহিত তর্কযুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মগধরাজ নালন্দাবাসী এক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করেন। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ যুবক তর্কযুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজার নিকট পুরস্কার স্বরূপ নালন্দা গ্রাম প্রাপ্ত হন।

তথায় অবস্থান কালে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটী যথা-সময়ে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠে। শারিকা পক্ষীর ন্যায় চক্ষুর্দ্বয় থাকাতে তিনি কন্যার "শারিকা" নামকরণ করিয়াছিলেন। শারিকাও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়া ভ্রাতাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন।

অপর এক ব্রাহ্মণও হস্তমন্ত্র আনিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ শিষ্যের নিকট লোকায়ত দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। শিষ্য মধ্যভারত দর্শনেচ্ছু হইয়া রাজগৃহে আগমন করেন। মগধরাজকে তর্কযুদ্ধের বাসনা জ্ঞাপন করিলে তিনি নালন্দাবাসী পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। ব্রাহ্মণ পরাস্ত হইলে, মগধরাজ শিষ্যকে নালন্দা গ্রাম অর্পণ করিলেন। মহামতি শিষ্য, নালন্দার অর্দ্ধ উপস্বত্ব গৃহহারা ব্রাহ্মণকে তথায় বাস করিবার নিমিত্ত দান করিলেন। কৃতজ্ঞ-চিত্ত ব্রাহ্মণ এই দান বিনিময়ে উঁহার সহিত নিজ তনয়ার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

বিদুষী শারিকা স্বামীর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে পরাভূত হন; পরে সন্তান সম্ভাবিতা-বস্থায় তর্কযুদ্ধে স্বামীকে পরাস্ত করেন। যথাসময়ে তিনি এক সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। পিতৃ নামানুকরণে বালক শারিপুত্র বলিয়া অভিহিত হইল। শারিপুত্র বেদ-বিজ্ঞান বিষয়ে পিতা অপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

নালন্দার অদূরবর্ত্তী কোনও পল্লীতে রাজা কৌণ্ডিন্য গোটালের পুরোহিত-পত্নী দেবার্চ্চন ফলে মৌদ্গল্যায়নকে সন্তান রূপে লাভ করেন। ইঁহার অপর নাম কোলিত। মাতার আকৃতির সহিত বিশিষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান হেতু ইনি মৌদ্গল্যায়ন নামে খ্যাত হন। মৌদ্গল্যায়ন অথবা কোলিত অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া সর্ব্বোচ্চ যশোলাভ করেন। পঞ্চশত তরুণ ব্রাহ্মণ তনয় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপতিষ্য ও মৌদ্গল্যায়ন উভয়েই শিষ্যমণ্ডলীর সাহচর্য্যে সমধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং বুদ্ধের সর্ব্ব প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন।

সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ অশোক, শারিপুত্রের মন্দির স্থলে মহার্ঘ্য ভক্তি-উপহার প্রদান ও তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই কারণে তারনাথ তাঁহাকে নালন্দা বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুন-চয়ঙ্ ও ঈ-চিং দীর্ঘকাল নালন্দায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন, নালন্দার প্রাচীনতম বিহার ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের অব্যবহিত পরে রাজা শক্রাদিত্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। এই শক্রাদিত্য রাজার উল্লেখ আমরা অন্য কোথাও প্রাপ্ত হই না, এবং তাঁহার রাজত্বকালও অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই। তৎপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র দেউলটী পরবর্ত্তী নৃপতিগণের চেষ্টায় এক বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বহু মন্দির এবং দেউল এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। য়ুন-চয়ঙ্ এই সম্পর্কে পঞ্চজন নরপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিব্রাজকগণের মধ্যে ঈ-চিং এই সকল মণ্ডপ গুলির বিশিষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রধান মণ্ডপটী দীর্ঘ চতুঃস্র, সুবৃহৎ অষ্টকক্ষ সমন্বিত এবং উচ্চতায় ত্রিতল। প্রতি তল দশ ফুট উচ্চ। সমগ্র মণ্ডপটী ইষ্টক নির্ম্মিত; কেবল কারুকার্য্যের নিমিত্ত প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে বারান্দা থাকাতে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ছিল।

পুরগুপ্ত তনয় মহারাজ নরসিংহ গুপ্ত বলাদিত্য তিনশত ফুট উচ্চ এক সুবৃহৎ মন্দির স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করেন। বিপুল স্বর্ণ ও বহু মণি-মুক্তা খচিত মন্দিরটী অপূর্ব্ব কারু-নৈপুণ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। মন্দির মধ্যে একটি মূর্ত্তি বিরাজ করিত।

বিহার সৌধাবলীর অধিকাংশ স্থলই ইষ্টক-মণ্ডিত ছিল। অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ স্থল এবং হর্ম্ম্যতল মসৃণ অথচ সুদৃঢ় বজ্রলেপে আবৃত ছিল। ঈ-চিং এই স্থাপত্য কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন। অলিন্দগুলি বিস্তৃত এবং ভ্রমণোপযোগী ছিল। এই বিশাল সৌধরাজি একটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

কেন্দ্রদেশে অবস্থিত বিহার গৃহগুলি বহু প্রকারে অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত। য়ুন-চয়ঙ্ এই সকল বিহার গৃহের সংস্থান দেশ ও মহিমার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রান্তে বিশত ফুট

উচ্চ একটি বিহার অবস্থিত ছিল। ভগবান তথাগতের স্মরণহেতু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এই বিহারের পূর্ব্ব ভাগে সদ্ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক মহারাজ অশোকের বংশধর মগধ-রাজ পূর্ণবর্ম্মা নির্ম্মিত বিহার বিরাজিত ছিল (৬০০খৃঃ অঃ)। তাম্রনির্ম্মিত অশীতি ফুট উচ্চ একটি বুদ্ধমূর্ত্তি এই বিহার মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় রক্ষিত ছিল। বুদ্ধমূর্ত্তিটী গঠন কুশলতায় অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার আরও উত্তরে তারা ও বোধিসত্বের ইষ্টক-গ্রথিত সু-উচ্চ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

মহারাজ শিলাদিত্য পিত্তল-ফলক দ্বারা একটি মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। যুয়ন্-চয়ঙ্ ভারত পরিত্যাগ সময়ে এই আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়া যান।

নালন্দার স্থাপত্য সমন্ধে যুয়ন্-চয়ঙ্ ও ঈ-চিংয়ের বর্ণনায় বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

ইঁহাদের বর্ণনা পাঠ করিয়া স্বতঃই এই কথা মনে হয় যে, সে সময়ে এই শ্রেণীর স্থাপত্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং উহার অনুকরণ প্রভাব চীন দেশ ও সমগ্র বৌদ্ধ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সিং-য়ুন (প্রজ্ঞাদেব) নামক জনৈক বিখ্যাত চৈনিক চিত্রকর নালন্দা প্রবাস কালে মৈত্রের বুদ্ধের একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে উহা সঙ্গে লইয়া যান।

চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ন-চয়ঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক বর্ষ বয়স্ক সুবিখ্যাত আচার্য্য দন্তভদ্রের (দন্তসেন) চরণ তলে বসিয়া অচিন্ত (অজন্তা) মঠাধ্যক্ষ আর্য্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত বেদাচার্য্য দর্শন শিক্ষা করেন এবং অষ্ট সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট "একান্ত সিদ্ধ" নামক একখানি সুবৃহৎ দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থ পণ্ডিত হরপ্রজ্ঞার যোগাচার্য্য দর্শন বিষয়ক বিরুদ্ধ মত খণ্ডনের নিমিত্ত লিখিত হয়।

তিব্বতরাজ সপ্তম শতাব্দীতে থন্-মি প্রমুখ সপ্তদশ চতুর ও বুদ্ধিমান মন্ত্রীকে লিখন ও পঠন পদ্ধতি শিক্ষা করিবাও জন্য বিপুল স্বর্ণভার সহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। থন্‌মি, লিপিদত্ত নামক জনৈক মেধাবী ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, নালান্দা বিহারে আগমন করেন। আচার্য্য দেববিৎ সিংহের নিকট তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের ধর্ম্ম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ তাঁহার প্রধান পুরোহিত শান্তি রক্ষিতের পরামর্শে নালন্দা হইতে আচার্য্য পদ্ম-সম্ভবকে আনয়ন করেন। ইনিই তিব্বতে মহাযান শাখান্তর্গত বজ্রযানের প্রবর্ত্তক—৭৪৭ খৃঃ অঃ। এই থন্-মি সম্রোটের নালন্দা প্রবাস কালে যুয়ন-চয়ঙ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নাগার্জ্জুনের আচার্য্য দেব শরহের অধ্যক্ষতায় নালন্দার যে বৈভব ও বৈপুল্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তখনও অটুট ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক, শীলভদ্র, ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও শীঘ্রবুদ্ধ এই কয়জনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। ইঁহার পিতা সমতটের অধীশ্বর ছিলেন। যুয়ন-চয়ঙের ভারত পর্য্যটনের সময়ে ইনি নালন্দার সঙ্ঘস্থবির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হর্ষপূর্ণ প্রমুখ রাজন্যবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁহার সুবিশাল পদগৌরবকেও ম্লান করিয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ন-চয়ঙ নালন্দা প্রবাস কালে শীলভদ্রের স্নেহলাভে নিজেকে বিশেষ অনুগৃহীত জ্ঞান করিয়াছিলেন। শীলভদ্রকে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং একমাত্র তাঁহারই প্রসাদে ধর্ম্ম ও শিক্ষা লাভে সমর্থ হইয়াছেন ইহা সর্ব্বদা স্বীকার করিতেন।

কাশ্মীরের প্রধান পণ্ডিত মণ্ডলী যে সকল জটিল বিষয়ের সমাধানে অক্ষম হইয়াছিলেন, কোবিদকুল-

মণি শীলভদ্র সে সকল বিনা আয়াসেই মীমাংসা করিয়াছিলেন। মহাযানী বৌদ্ধ হইলেও শীলভদ্র অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছিল। স্বয়ং পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া প্রিয় শিষ্য য়ুয়ন-চয়ঙকে তৎকালে প্রাপ্ত যাবতীয় টীকার সহিত উহা অধীত করিয়াছিলেন। পাণিনি ব্যতীত তিনি য়ুয়ন-চয়ঙকে বেদশিক্ষা দান করেন। তৎকালে সমগ্র ভারতে শীলভদ্রের সমকক্ষ পণ্ডিত অন্য কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

ঔদার্য্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের সমপরিমাণেই ছিল। য়ুয়ন-চয়ঙের বিশাল জ্ঞান ও শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া যখন বৌদ্ধ কোবিদগণ তাঁহাকে এদেশে স্থায়িভাবে বসতি করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, তখন শীলভদ্র বলিয়াছিলেন, "বিশাল চীন সাম্রাজ্যে য়ুয়ন-চয়ঙের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করা উচিত। য়ুয়ন-চয়ঙ চীনদেশে গমন করিলে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইবে; কিন্তু এদেশে অবস্থান করিলে কোন মঙ্গল লাভই হইবে না। অতএব আপনারা তাঁহার গমনের অন্তরায় হইবেন না।"

আবার যখন কামরূপের কুমাররাজ ভাস্কর বর্ম্মা য়ুয়ন-চয়ঙকে কামরূপে পদার্পণের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুনয় করেন, তখন য়ুয়ন-চয়ঙ অসম্মত হওয়াতে শীলভদ্র বলিয়াছিলেন, কামরূপে অদ্যাবধি বৌদ্ধধর্ম্ম-মহিমা প্রচারিত হয় নাই। উহার বিশেষ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত য়ুয়ন-চয়ঙের কামরূপ গমন আবশ্যক। শীলভদ্র যে কিরূপ দূরদর্শী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন তাহাও এই বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়।

শীলভদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় আনুরক্তি ছিল। শিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে নালন্দায় উপনীত হন। এ সময়ে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল নালন্দার সঙ্ঘস্থবির পদে নিযুক্ত ছিলেন। শীলভদ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই গুরুর সঞ্চিত বিদ্যা আয়ত্ত করেন। তৎকালে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধরাজের নিকট ধর্ম্মপালের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রস্তাব করেন। রাজ আমন্ত্রণে বুদ্ধ-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ধর্ম্মপাল যখন মগধ উদ্দেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, শীলভদ্র তখন এই গুরুভার স্বীয় মস্তকে বহন করিবার জন্য বিনয়নম্র বচনে গুরুর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তর্কযুদ্ধকালে পণ্ডিত প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে শীলভদ্রকে দেখিয়া সস্মিত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বালক আমার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?" কিন্তু এ দর্প তাঁহার ক্ষণস্থায়ী হইল। তর্কের প্রারম্ভেই তিনি বুঝিলেন এ বালক সামান্য নহে। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বালকের বিতর্কের উত্তর প্রদানে অক্ষমতা হেতু সভা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। মগধরাজ শীলভদ্রের বিপুল শিক্ষা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া প্রশংসমান চিত্তে তাঁহাকে একটি নগরীর আধিপত্য দান করিলেন। শীলভদ্র যখন বলিলেন, তিনি শ্রমণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন, অর্থ তাঁহার নিষ্প্রয়োজন, তখন রাজা উত্তর করিলেন, "বুদ্ধ-মহিমা বহুদিন হইল তিরোহিত হইয়াছে। যদি আমরা গুণের পূজা না করি তাহা হইলে সদ্ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই দান গ্রহণ করুন।" শীলভদ্র দান গ্রহণ করিয়া উহার উপস্বত্ব হইতে একটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। য়ুয়ন-চয়ঙ বলিয়া গিয়াছেন, কি ধর্ম্ম, কি বিদ্যা, কি জ্ঞান যে কোন বিষয়েই হউক না কেন শীলভদ্র জীবিত কি মৃত সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই সকল পুস্তকের টীকা সহজ, সরল ভাষায় লিখিত ও অসীম পাণ্ডিত্য পূর্ণ।

নালন্দার সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। বাঙ্গালী সঙ্ঘস্থবিরের নেতৃত্বে নালন্দার যশোভাতি দেশ

দেশান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধ জনগণ সর্ব্ববিষয়ে নালন্দার প্রচলিত রীতি নীতির অনুকরণ করিতেন।

শান্তিদেব নামক একজন বাঙ্গালী, বিহার, ও নালন্দাকে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন এবং একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নালন্দাতেই বাস করিতেন।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তের অন্তঃপাতী কতুবপুরের পরাক্রান্ত স্বাধীন সামন্ত রাজা সুপ্রসিদ্ধ বীরভূপাল রাজা দলজিৎ ও ভিখারী সিংহ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিহারের গয়া জেলা পর্য্যন্ত শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। নালন্দা গ্রামে তাঁহাদের বিহার প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।*

যুয়ন-চয়ঙ্‌ নালন্দা হইতে পঞ্চ লক্ষ শ্লোক সমন্বিত চারিশত সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া যান।

বোধিসত্ত্ব স্থিরমতি "মহাজন বলারক সূত্র" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

যশোধর্ম্ম পুরাধিপতি (বিহার—কানিংহাম; ঘাশারাওয়া—ডাঃ হুল্‌জ) দেবপাল কর্ত্তৃক অভ্যুন্নত দ্বিজাতি বংশ সম্ভূত বীরদেব নালন্দার সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি "বিহার পরিহার বিভূষিতাঙ্গী" নালন্দার প্রতিপালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া "বহুকীর্ত্তি বধূ পতিরূপে" উদ্ভাসিত হইলেও সাধুজন কর্ত্তৃক "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসিত। শ্রামণ্য ব্রতধারী বীরদেব জগতের হিত কামনায় ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতের (গিরিয়াক—কানিংহাম; বিহার নগর—কিট্টো ও ব্রডলি) উপর, তাহার "মুকুট স্বরূপ" দুইটি "চৈত্য চূড়ামণি" উত্থাপিত করাইয়াছিলেন।

পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীগোপাল দেবের রাজ্যাব্দের প্রথম বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে শ্রীনালন্দার "সুবর্ণ ব্রীহিসক্তা" শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকার মূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়।

নালান্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বলাদিত্য মন্দির ভূগর্ভ হইতে বহিষ্কৃত করিবার সময় দ্বার ফলকের নিম্নভাগে একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়। মন্দিরটীর পুনঃ-সংস্কার ফলে লিপিটী উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। কৌশাম্বী হইতে আগত, তৈলাঢ়কবাসী হরদত্ত পৌত্র এবং গুরুদত্ত পুত্র বলাদিত্য এই পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বলাদিত্যের নামানুসারে মন্দিরটী এখন "বলাদিত্য মন্দির" বলিয়াই কথিত হইতেছে।

বিগত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশী কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক উপহৃত লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত একবিংশতি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন মধ্যে মগধের সুবিখ্যাত সঙ্ঘারাম নালন্দার একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে শিব এবং সপ্তমাতৃকা অঙ্কিত আছে। ইহা হইতেই সহজেই অনুমিত হয় যে, তান্ত্রিক শক্তি পূজা মহাযান মতের সহিত একীভূত হইয়াছিল। এই একীকরণ প্রভাব অদ্যাপি নানা তন্ত্রের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত রশ্মিযুক্ত সিংহবাহিত একটি মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

নালন্দায় প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে এইরূপ খোদিত আছে—

"ওঁ শ্রী নালন্দা শ্রীধর্ম্মভট্টদে (র) ধ (র) মো অপ্রতিপলীত সোবীরস্য দকসি (?) কস্য ওঁ" সৌরবীরের দক্ষি কর্ত্তৃক সুবিখ্যাত ধর্ম্মভট্টকে পবিত্র নালন্দাতে পুণ্য কামনায় দান। ব্লুক সাহেব পূর্ব্বোক্ত লিপিটী এইরূপ পাঠ করিয়াছেন, "ওঁ শ্রীনালন্দা শ্রীধর্ম্মহট্টো দেরধমো—যং প্রতিপাদিত আরণ্য গিরি—কস্য দণ্ডিকস্য।"

অরণ্য গিরিবাসী দাণ্ডিকের এই পুণ্যময় দান নালন্দার অন্তর্গত ধর্ম্মহাট্টায় প্রদত্ত হইয়াছিল।

ব্লুক মহোদয় লিপি-লিখিত "ধর্ম্মহাট্টার" সহিত গয়া জেলার উত্তরপশ্চিম প্রান্তে, নালন্দার ত্রিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত "ধারা ওয়াটের" ঐক্য নির্ণয় করিয়াছেন। এই ধারাওয়াটে হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির বহু ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বুদ্ধদেব অম্বলট্‌ঠিকা হইতে আনন্দ ও অনুচর বর্গকে লইয়া নালন্দায় আগমন করিয়াছিলেন।

পাবারিক আম্রকুঞ্জ মধ্যে অবস্থান করিয়া বহু নর নারীকে উপদেশ দানে অমৃতের পথে আনয়ন করেন। এই পাবারিক আম্র কাননে সারিপুত্র বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ মানসে আগমন করেন। শীল ও ধ্যান প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেবের সহিত তাঁহার গভীর আলোচনা হয়।

ধর্ম্মপ্রাণ সন্ন্যাসী মহাবীর, নালন্দার উপকণ্ঠে চতুর্দ্দশ বৎসর বর্ষ যাপন করিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে জিনমাহাত্ম্য প্রচার করেন সে সময় ইহা অতুল বৈভবময় ও হর্ষ সুখসমৃদ্ধ ছিল। লেপ নামক একজন ধনৈশ্বর্য্যশালী গৃহপতি, যান বাহন ও বহু আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া নালন্দায় বাস করিতেন। নালন্দার উপকণ্ঠে তিনি "শেষদ্রব্য" নামে একটা স্নানাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই স্নানাগারের উত্তরপূর্ব্ব কোণে "হস্তি থাম" নামে তাঁহার একটা উপবন ছিল।

নালন্দা সঙ্ঘারামের আচার পদ্ধতি অতীব কঠোর ছিল। প্রতি বৎসর প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইত। তিন শত ক্ষুদ্র কক্ষ ছাড়া আটটি সুবৃহৎ কক্ষ ছিল। ই চিংয়ের আগমন কালে তিন সহস্রেরও অধিক শ্রমণ নালন্দায় অবস্থান করিতেন।

অধ্যক্ষ ও শ্রমণগণের বিদ্যাবত্তা ও কর্ম্ম কুশলতায় আকৃষ্ট হইয়া বিদ্যার্থিগণ বহুদূর দেশ হইতে সমবেত হইতেন। অজাত শিশুর ন্যায় তাঁহাদের নিষ্পাপ চরিত্র-মাধুর্য্য, বিনয় ও ধর্ম্মপ্রাণতা ছাত্রবৃন্দের আদর্শস্থল ছিল। সমগ্র ভারত ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁহাদের উপদেশাবলীর অনুসরণ করিত। সূর্য্যোদয়ের সহিত তাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং সমস্ত দিবাভাগ ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। ত্রিপিটকের আলোচনায় অনভ্যস্ত ভিক্ষুদিগের পক্ষে বহুমান সুলভ ছিল না এবং বিতর্ক কালে তাঁহার লজ্জা বশতঃ অধোমুখ রহিতেন। তর্ক শাস্ত্রে যশোলাভ করিবার বাসনায় পণ্ডিত মণ্ডলী সুদূর দেশ হইতে নালন্দায় আসিয়া বাস করিতেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে পূর্ণব্রত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকামী ছাত্রবর্গকে প্রথমে দ্বারপালের নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। সন্তোষজনক না হইলে আগন্তুকদিগকে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিতে হইত; এজন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ প্রার্থনায় পূর্ব্বে বিদ্যার্থীকে বিপুল বিদ্যা অর্জ্জন করিতে হইত। সুকঠোর শাস্ত্রালোচনায় মুষ্টিমেয় ছাত্রই তাঁহাদের কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইতেন। শত সংখ্যক ছাত্রের মধ্যে বিংশতির অধিক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না।

ত্রিপিটক ও জাতকের কাহিনী গুলি, বেদান্ত এবং স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে নালন্দায় শিক্ষা দান হইত। ইহা ভিন্ন প্রচীন পুঁথি সকলও কীটদংশন হইতে রক্ষণ প্রণালী শিক্ষা করিতে হইত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য শ্রেষ্ঠ রাজোচিত পূজা ও সম্মান সহকারে প্রতি অতিথিকে পরিতুষ্ট করিতেন। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জম্বীর ফল, সুপারি, কর্পূর এবং মগধজাত সুগন্ধযুক্ত বহুমূল্য মহাশালী তণ্ডুল আহারের নিমিত্ত অতিথিগণকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন তৈল, স্নেহ পদার্থ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও অতিথিরা বিহার হইতে প্রাপ্ত হইতেন। রাজা এবং দ্বিশত গৃহপতির উপর এই বিপুল পরিচর্য্যার ভার ন্যস্ত ছিল। উপাসক এবং ব্রাহ্মণগণ হস্তিসহ সতত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত থাকিতেন। নালন্দার পুরোহিতবর্গ কখনও অশ্বোপরি আরোহণ করিতেন না। কাষ্ঠাসনোপরি আসীন হইয়া বাহক দ্বারা নীত হইতেন।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সুগভীর জলাশয়গুলিতে মঠাধিবাসিগণের নিত্যক্রিয়া সম্পাদিত হইত। বৃহদাকার জলাশয় গুলির মধ্যে উত্তরপশ্চিমে অর্দ্ধক্রোশ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট "গিদি" ও "পনসোকর" এবং দক্ষিণে "ইন্দ্রপোখরের" নামই উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভ ভাগে নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইত।

সম্প্রতি নালন্দার বিশাল স্তূপাবলীর খনন কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। এপর্য্যন্ত সে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় খনন কার্য্য আরও অগ্রসর হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। ডাক্তার স্পুনার খনন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি ফুট উচ্চ একটি অবিকৃত সঙ্ঘারম-প্রাচীর আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি ছয়শত মৃত্তিকা নির্ম্মিত মোহর ও দুইশত এগার খানি প্যানেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই প্যানেলের প্রত্যেক খানি বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট ও বিচিত্র অঙ্কন নৈপুণ্যে মনোরম।

নালন্দার এই বিপুল বিহার সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈভবময় দেবায়তন প্রতীচ্যের অনুরূপ অনুষ্ঠান সমূহের বহুপূর্ব্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম যখন অসভ্য বর্ব্বর জাতির আক্রমণ হইতে আপনাকে সম্যক্ মুক্ত করিতে পারে নাই, অথবা তাহার সামন্ত প্রথার বিকাশ লক্ষিত হয় নাই, তখন, নেপাল এবং তিব্বত বাসী বৌদ্ধগণ ধর্ম্মের গ্রন্থ নি আশঙ্কার উৎসব ও অনুষ্ঠানাবলী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা করিতেছিলেন। নালন্দার স্মৃতির মধ্যে যে গৌরব, যে মহিমা দীপ্তি পাইতেছে তাহা অমূল্য।

শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী।

অতীত কথা

বকুল গন্ধে মনে পড়ে যায়
কথা,—সেটি কোন্ অতীতের!
মূর্ত্ত প্রেমের রাঙা ছবিখানি,
ভেসে ওঠে তার শ্রীমুখের!

কুন্তলে তার উথলে ছন্দ,
অঞ্চলে ফোটা ফুলের গন্ধ
অঙ্গটি তার প্রতি তরঙ্গে
অমিয়া ঢালিছে অবিরল।

তারি গলে ছিল বকুলের মালা
এমনি মাতাল গন্ধটি ঢালা,
অন্তরে ছিল মৃদু তরঙ্গ
প্রেম পুলকের সরিতের।

সে ফেলিয়া গেছে শয়নে আমার
মালাটি মোদের মিলনের,
আঁকিয়া দিয়াছে নয়নে আমার
জ্বালাটি তাহার জীবনের!

আনন তাহার শীত নিশীথের
শিশিরের মত নিরমল।
ফোটা ফুলে ছিল সারা দেহ ভরা,
গায়ে মাখা ফুল-পরিমল।

আজি তার সেই মালা আর জ্বালা,
করেছে বাহির, অন্তর, আলা—
নীরবে দহিয়া বেড়াই সহিয়া
দারুণ দাহন হৃদয়ের।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

নগবালা

(উপন্যাস)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পল্লীচিত্র।

সেই পল্লীগ্রামের নাম পাথরকোণা। বাঙ্গলার অন্যান্য পল্লীগ্রামের ন্যায়, তাহাতে কদলী ও নারিকেল কানন, আম্র পনস ও লিচুর বাগান, সেওড়া ও আঁকড় বন, পানা পুকুর এবং সন্ধ্যাকালে মশককুলের মধুর সঙ্গীত—এ সকলই ছিল; অধিকন্তু সেই শোভন গ্রামে জ্যোতিঃপ্রকাশের শ্বশুরালয় বিরাজ করিত। পাছে, জ্যোতিঃপ্রকাশের শ্বশুরালয় এবং তন্মধ্যস্থিতা একাদশ বর্ষীয়া নলকালঙ্কৃতা বধূর কথা কলিকাতার সুশিক্ষিত ছাত্র মহলে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এজন্য বুদ্ধিমান বিধাতা বুদ্ধি পূর্ব্বক গ্রামখানিকে অত্যন্ত নিভৃত করিয়াছিলেন;—বংশাদি গুল্মের ঘন প্রাকারে তাহাকে মানবনয়নের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু. বলা বাহুল্য, বিধাতা, তাঁহার এই বুদ্ধিমত্তার জন্য, জ্যোতিঃপ্রকাশের কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই; কারণ জ্যোতিঃপ্রকাশের হৃদয়মধ্যে কৃতজ্ঞতা নামক সামগ্রীর কোনও অস্তিত্বই ছিল না; থাকিলেও, সেকালের বুড়া বিধাতা তাহা পাইবার অধিকারী হইতেন না।

জ্যোতিঃপ্রকাশের জ্যেষ্ঠ শ্যালকের নাম ভবতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়; পিতার অবর্ত্তমানে ভবতারণ বাবুই এক্ষণে সংসারের কর্ত্তা। তাঁহার বয়স ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছিল। পৈতৃক চাষ আবাদ বজায় রাখিয়া, এবং গোপালন করিয়া, কনিষ্ঠ সহোদর ও সহোদরা-দিগকে তিনি প্রতিপালন করিতেন এবং সাধ্যমত তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন; তিনিই নগবালার জন্য কলিকাতাবাসী পাশকরা সুসভ্য বর ক্রয় করিতে চারি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন; এবং চাষ আবাদের কল্যাণে তাহাতে ঋণগ্রস্ত হ'ন নাই।

ভবতারণ বাবুর পৈতৃক ভদ্রাসনটী, তাঁহার চাষ আবাদাদি কার্য্যের উপযোগী। প্রথমেই একটি প্রশস্ত চত্বর মধ্যে খামার বাটী। ইহাতে ধানের দুইটি অতি বৃহৎ গোলা ও একটী অপেক্ষাকৃত ছোট গোলা, এবং দুইটি সুবৃহৎ পালই উঠানের দুই পার্শ্বে স্থাপিত ছিল। ইহা ছাড়া চত্বরের অন্য দুই পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত তৃণাচ্ছাদিত দুইটি লম্বা গৃহ ছিল; এই গৃহ দুইটী মৃৎপ্রাচীর দ্বারা, চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল।—এক ভাগে ছোলা, মুগ, খেঁসারি, কলাই প্রভৃতি রবিখন্দ ফসল থাকিত; দ্বিতীয় ভাগে গুড়, খৈল, তৈল, তামাক প্রভৃতি নিত্য আবশ্যক সামগ্রী সংগৃহীত থাকিত; আর এক ভাগে লাঙ্গল, কোদালী, খুন্তি প্রভৃতি কৃষিকর্ম্মোপকরণ ও কুড়ুল, কাটারি, সাবল প্রভৃতি মজুদ থাকিত; চতুর্থভাগ বাটীর রক্ষক বা সর্দ্দারের বাসস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। খামার বাটীর পশ্চাতে গোয়ালবাটী; ইহাতে দুগ্ধবতী গাভী, এবং কৃষিকর্ম্মের জন্য ও গাড়ী টানিবার জন্য বলদ রাখিবার প্রচুর স্থান ছিল; এতদ্ব্যতীত মালবহন জন্য একখানি, আরোহী একখানি গোযান ও দুই খানি পাল্কীও ঐ গোয়াল বাড়ীতে থাকিত। খামার বাটীর দক্ষিণ দিকে সদর বাটী; সুবৃহৎ চত্বর চারিদিকে উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; ঐ প্রাচীরের গায়ে গায়ে তিন দিকে উচ্চ ইষ্টক বেদিকার উপর খড়ের চাল ছিল; অন্য দিকে প্রকাণ্ড আটচালা; এই আটচালা ইষ্টকনির্ম্মিত, বৃহৎ ও সুদৃশ্য জানালা ও দরজার দ্বারা শোভিত, কিন্তু ছাদটি খড়ের দ্বারা সুচারু ও সুনিপুণ ভাবে আচ্ছাদিত; ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও মধ্যে পূজার প্রশস্ত

দালান ছিল ; এবং সম্মুখে, পূজার দালান ও প্রকোষ্ঠদ্বয় ব্যাপী লম্বা বারান্দা ছিল ; বারান্দার নীচে দীর্ঘ ও বৃহৎ সোপানাবলী ছিল,—কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে অঙ্গনমধ্যে চন্দ্রাতপ তলে যাত্রাদির অভিনয় হইলে, সমবেত দর্শক-বৃন্দের প্রায় অর্দ্ধাংশ এই সিঁড়িতে বসিয়া, তাহা দর্শন করিতে পারিত। সদরবাটীর পশ্চাতে এবং গোয়াল বাটীর দক্ষিণ দিকে অন্দর মহল ; ইহাও একটি সমকোণ বিশিষ্ট চত্বর ; এই চত্বরের চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত ও ইষ্টক ছাদবিশিষ্ট বারান্দা ও কক্ষসকল ছিল ; দ্বিতলে কোন কক্ষ ছিল না, কক্ষ সকলের মধ্যে দক্ষিণ দিকের কয়েকটি মাত্র শয়ন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত ; পূর্ব্ব দিকের কক্ষগুলি ভোজনাগার ও রন্ধনশালার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল ; পশ্চিম ও উত্তর দিকের প্রকোষ্ঠ গুলি কেবল ভাণ্ডার ও গুদামের জন্য নিয়োজিত হইত,—কোনটার মেঝেতে রাশিকৃত আলু ঢালা থাকিত এবং কড়ি হইতে যে শিকা ঝুলিত, তাহাতে অসংখ্য দেশী ও বিলাতি কুমড়া সকল রক্ষিত হইয়া নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিত। কোন কক্ষের মেঝেতে নারিকেল সংগৃহীত থাকিত, এবং তাকে শুষ্ক এবং আবৃত কলসী সকলের মধ্যে দেশজ বিস্কুট মুড়ি এবং মিষ্টান্নের রাজা নারিকেল লাড়ু পূর্ণ থাকিত ; কোনও কক্ষে, আম কাঁঠালের দিনে, আম কাঁঠাল প্রভৃতি সৌরভ বিস্তার করিত এবং অপর সময় আনারস, পাকা কলা, ফুটি, তরমুজ প্রভৃতি ফল শোভা পাইত।

আমরা সেই সুবর্ণবর্ণ পক্ক কদলী প্রভৃতির বর্ণনা করিতে শঙ্কিত হইতেছি ; পাছে আমাদের পাঠকগণের মধ্যে কলিকাতাবাসী কেহ সেই পক্ক কদলীর লোভ সংবরণ করিতে না পারেন। কিন্তু, বাঙ্গালায় কখনও কি সে শুভদিন আবার আসিবে ? আমাদের আশা কি কখনও ফলবতী হইবে ? বাঙ্গালী কি কখনও চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া পক্ক কদলীর প্রত্যাশায় পল্লীবাস করিবে ? কখনও কি ট্রামগাড়ী, কলের জল ও বৈদ্যুতিক পাখা ত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে আসিয়া মশককুলের ধ্বংস সাধন করিবে, পানা পুকুরের সংস্কার করিবে, অচল পল্লিপথকে সচল করিবে, সেওড়া গাছ কাটিয়া তৃণাচ্ছাদিত গোচারণ ভূমি প্রস্তুত করিবে ? এবং আপন স্বাস্থ্য ও বলের পুনরুদ্ধার জন্য পক্ক কদলী, মুড়ি, ও নারিকেল প্রভৃতির উপাদেয় স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবে ? হায়, ধ্বংসোন্মুখ জাতি ! তোমরা কি কখনও জীবনের পথে ফিরিবে ? আবার নির্জ্জল দুগ্ধ, সদ্যোধৃত মৎস্য ও সুপক্ক সদ্য-আহরিত ফল খাইয়া নব জীবন লাভ করিবে ? এবং পূর্ব্বপুরুষের পরিত্যক্ত ভিটায় সন্ধ্যাদীপ জালিয়া, পল্লীর ম্লান মুখ উজ্জ্বল করিবে ? কিন্তু আমাদের এই বিলাপে ফল কি ? এই গোলামের জাতির আর কি কোনও আশা আছে ?

আমরা ভবতারণ বাবুর আবাস বাটীর বর্ণনা করিয়াছি। এই বাটীর উত্তরাংশে কতকগুলি মৃৎকুটীরে কৃষক, মালী ও গোয়ালা বাস করিত। পশ্চাদ্ভাগে বৃহৎ সরোবর ও সরোবরের চারি পার্শ্বে আম কাঁঠাল নারিকেল প্রভৃতির উদ্যান ছিল। এই সরোবরটিতে স্ত্রীলোকেরা স্নানাদি করিত। পুরুষেরা অদূর প্রবাহিতা কুন্তী নদীতে অবগাহন করিয়া আসিত।

পাথরকোণা গ্রামে, এই বাটীতে জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রেমহীনা, নাবালিকা পত্নী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, প্রতিপালিত হইয়াছিল, এবং আমরা অনুমান করি, বালিকাগণের একমাত্র কাম্য, পতির প্রথম প্রেম—লাভ করিয়াছিল ; অর্থাৎ তাহার নবীন হৃদয়ে প্রথম প্রেমরস সঞ্চারিত হইয়াছিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ সন্ধান না পাইলেও আজ সে পঞ্চদশবর্ষীয়া প্রেমপূর্ণা যুবতী ;—প্রথম যৌবন তাহার সুগঠিত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে লীলা করিতেছিল।

আজ নগবালার বিশেষ আনন্দের একটু কারণ ঘটিয়াছিল। তাহার মেজদাদা জেলার কলেজে পড়িত। সে আজ নৌকাযোগে বাটী আসিয়াছিল ; এবং তাহার জন্য ফরমাইস মত কয়েকখানি পুস্তক আনিয়াছিল। তাহা উপন্যাস বা গল্পপুস্তক নহে ; পাঠ্য পুস্তক। স্বামী সুশিক্ষিত ; মূর্খাকে পছন্দ করিতে পারেন না ; একথা নগবালা তাহার সেই বালিকা বয়সেই বুঝিয়াছিল। তাই. স্বামীর উপযুক্ত হইবার জন্য, এবং তাঁহার মনো-

বিনোদনার্থ, নগবালা বিবাহের কিছুদিন পর হইতেই অত্যন্ত যত্নের সহিত, পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছিল। এই কঠিন কার্য্যে তাহার মেজদাদাই প্রধান সহায় হইয়াছিল; তাহার ঐকান্তিক যত্ন ও প্রতিভাও তাহার বিদ্যাশিক্ষার আনুকূল্য করিয়াছিল। মেজদাদা কোন ছুটি উপলক্ষ্যে বাড়ী আসিলেই, সে তাহাকে ধরিয়া বসিত। এবং তাহার কাছে যাহা শিক্ষা করিত তাহা সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিত। এইরূপে এই কয়েক বৎসরই, সে বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজিতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল। আজ মেজদাদার নিকট হইতে সে গণিত, কাব্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েক খানি পুস্তক পাইয়া অতিশয় পুলকিতা হইয়াছিল। তাহার উপর মেজদাদা বি-এ পরীক্ষার পর কয়েক মাসের অবসর পাইয়া বাটী আসিয়াছেন; কয়েক মাস বাটীতেই অতিবাহিত করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় নূতন শিক্ষাপ্রাপ্তির আশায় নাচিয়া উঠিল। নগবালা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, সে আপনাকে সুশিক্ষিত স্বামীর উপযুক্ত করিবে। সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া নূতন পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিল। না জানি, কত প্রেম, কত আশা তাহার নবীন হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

ভগবান, তুমি দয়া করিয়া কি তোমার দয়াময় নাম সার্থক করিবে না;—এই বালিকার আশা, উদ্যম ও ঐকান্তিক যত্ন সফল করিবে না? তোমার প্রেমরাজ্যে কি অপার্থিব প্রেম স্ফুরিত হইবে না? তুমি ভাগ্য-বিধাতা, তুমি বালিকার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছ তাহা তুমিই জান। কিন্তু আমরা অনুনয় করি, তুমি তাহার অদৃষ্টের কথা এই কিশোর বয়সেই তাহাকে জানিতে দিয়া তাহার আশাভঙ্গ করিও না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উদ্যমে বাধা।

জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে সেই সুসজ্জিত কক্ষ—অমরাবতীর সেই মধুর নিকুঞ্জে—জ্যোতিঃপ্রকাশকে বসাইয়া, আমরা প্রেমময়সহীন অন্য কথা কহিয়াছি। ইহা আমাদের ভাল কায হয় নাই। প্রতীক্ষ্যমান নবীন প্রেমিককে, প্রেমনিকেতনে একাকী বসাইয়া, অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, আমাদের যথেষ্ট ধৃষ্টতা হইয়াছে। আমরা যখন আমাদের ত্রুটী স্বীকার করিলাম, এবং তাহারই প্রেমকথা আবার উত্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমরা ভরসা করিতে পারি, তোমরা আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবে।

আমরা শুনিয়াছি, সময় ও স্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু তেমন তেমন পাল্লায় পড়িলে, মহাকাল বাবাজীকেও অপেক্ষা করিতে হয়। জ্যোতিঃপ্রকাশের মনে হইতে লাগিল যে, গৃহকর্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষায় সময় যেন অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে কক্ষগাত্রে সংলগ্ন মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধা বিচিত্র চিত্রাবলী দেখিল; মর্ম্মর টেবিলের উপর সুসজ্জিত, নানদেশজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনীয় সামগ্রী সকল দেখিল; পাম ষ্ট্যাণ্ডের (Palm stand) উপর সুন্দর সপুষ্প পুষ্পাধারের শোভা দেখিল, গবাক্ষ সকলে লেস্ রচিত যবনিকার শুভ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইল; তথাপি সময় একপদও অগ্রসর হইল না;—আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায়, প্রভুর আগমন প্রতীক্ষায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে আপনাদের নির্লজ্জ দরিদ্রতার সহিত সেই কক্ষের শোভাময় সমৃদ্ধির তুলনা করিল; পিতার নির্ধনতার কথা ভাবিয়া, পিতৃভক্তির পবিত্র সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল; পাথরকোণার বৃক্ষচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন ও শ্রীহীন একতল শ্বশুরালয়ের সহিত, রাজধানীর রাজপথের উপর সুগঠিত ও সুশ্রী ত্রিতল বাটীর বাহারের তুলনা করিয়া তাহার পুরাতন শ্বশুরালয়ের উপর আস্থা রহিল না; তাহার পর, বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবিল;—প্রেমহীনা অশিক্ষিতা নাবালিকার কথা ভাবিল, বিদুষী জ্যোতির্ম্ময়ীর উজ্জ্বল রূপের কথা ভাবিল; এবং কিরূপে তাহাকে লাভ করিতে পারিবে, তাহাও ভাবিল; তথাপি সময় পূর্ব্ববৎ অচল রহিল। পুরাতন শ্বশ্রূর মলিন অশিক্ষিত অভদ্রতার কথা

চিন্তা করিল; তাহার পর, জ্যোতির্ম্ময়ীর সুশিক্ষিতা মাতার অতি শুভ্র ভদ্রতার কথা চিন্তা করিল; তবুও সময় কাটিল না।

অবশেষে সুদীর্ঘ পনের মিনিট কাল পরে, সৌরভের শত পুষ্পনিন্দিত গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, বসনের মৃদু খস্ খস্ শব্দ তাহার কর্ণকুহরে, দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত হইল; তৎপরে ধীর পদক্ষেপে, সচল পুত্তলিকার মত, জ্যোতির্ম্ময়ীর জননী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং জ্যোতিঃপ্রকাশের বিহ্বল নয়নাগ্রে আপন বসনের শুভ্রতার মহিমা প্রকটিত করিলেন।

তাঁহাকে সমাগতা দেখিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ অতি সম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অত্যন্ত সম্মানের সহিত, তাঁহাকে বিনত মস্তকে ও যোড়-করে, নমস্কার করিল; এবং মহা সমাদরে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

তিনি, অভিনয় কুশলার ন্যায়, কিঞ্চিত মস্তকান্দোলন করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন; এবং মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনাকে—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি; ক্ষমা ক'রো।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ ক্ষমা করিতে পারিল না;—অত বড় মাতা, অমন নির্ম্মল বেশধারিণীকে কি ক্ষমা করিতে পারা যায়? তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না; কেবল অতিশয় বিনয়ে এবং অব্যক্ত ভক্তিতে তাহার বিশুষ্ক কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ উত্থিত হইল।

শুভ্রবেশধারিণী মাতা একটা আসন গ্রহণ করিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য এক আসনে জ্যোতিঃপ্রকাশকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। পরে বাক্যের মধুবৃষ্টি করিয়া মিহি সুরে কহিলেন, "তুমি যে আমাদের মনে করে, আজই আমাদের এখানে দয়া করে এসেছ, এতে আমরা যে কত সুখী হ'য়েছি, তা মুখের কথায় বলা যায় না।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ এই শিষ্ট ও প্রীতিময় বাক্যের কোনও উত্তর দিতে পারিল না।—এত সৌজন্যের, এত দয়ার, এত মহানুভবতার কি কোনও উত্তর আছে? এবারও তাহার কণ্ঠ হইতে, একটা অস্ফুট ধ্বনি উত্থিত হইল।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী গীতিময় বাক্যে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "এইমাত্র আমার এক মহিলা বন্ধু আমাদের দেশের বিবাহপ্রথার কথা বলছিলেন। তাঁরই সঙ্গে কথা কইতে, তোমার কাছে আসতে, আমার এত বিলম্ব হয়ে গেল। তিনি তাঁর উত্থাপিত প্রসঙ্গ সাঙ্গ করে বিদায় গ্রহণ করলে, তবে তোমার কাছে আসতে পারলাম।"

জ্যোতিঃপ্রকাশের এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল; সে ধীরে ধীরে কহিল, "আমি এসে আপনাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিলাম।"

মাতাঠাকুরাণী কহিলেন, "কিছু মাত্র নয়। যে কথা তাঁর সঙ্গে হচ্ছিল, তা অনায়াসে তোমার সঙ্গে হ'তে পারে। আমাদের হিন্দুঘরের বিয়ের কথা হচ্ছিল। হিন্দুরা যে সমান জাতির সঙ্গে, পুত্রকন্যাদের বিয়ে দেয়, এটা আমার বেশ পছন্দ হয়। এই ধর, আমরা বামুন— আমি যদি কোনও নীচ জাতির সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিই সেটা কি তোমার পছন্দ হবে?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ তাড়াতাড়ি ব'লল, "না, সেটা আমার মোটেই পছন্দ হ'বে না; কোনও বুদ্ধিমান লোকেরই পছন্দ হবে না। আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনার মেয়ে ব্রাহ্মণকুমারী, তার বিয়ে ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গেই হওয়া উচিত।"

মাতাঠাকুরাণী পুনরপি কহিলেন, "হাঁ, আমারও তাই মত। মেথরের ছেলে—সে রূপবান আর সুশিক্ষিত হলেও, তার সঙ্গে কেউ বামুনের মেয়ের বিয়ে দিতে মত করবে না।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ যন্ত্রচালিতের ন্যায় কহিল, "না, কেউ তা মত করবে না।"

মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "আবার হিন্দুরা যেমন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের—স্বামী স্ত্রী কি বস্তু, তা না বুঝতে, হৃদয়মধ্যে দাম্পত্য প্রেম বিকশিত না হতেই, তাদের কোন মতামত গ্রহণ না করেই,—আপ-

নাদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে দেয়, সেটাও আমি মোটেই ভাল মনে করি না।"

জ্যোতিঃপ্রকাশের হৃদয়াভ্যন্তর দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে মনে করিল, এইরূপ প্রসঙ্গই তাহার হৃদয়-মধ্যস্থ আশালতাকে সজীব করিবে; এইরূপ কথাতেই তাহার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিবার সুযোগ ঘটিবে। অতএব সে সম্ভ্রমের সহিত বলিল, "কোনও লোকই ভাল মনে করে না। আমি প্রেমহীন বিয়ে মোটেই পছন্দ করি না। বাবা কতবার ছোট মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হই নি।—এগার বার বছরের অচেনা, অশিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করে কে আপন জীবনটাকে তিক্ত করবে?"

মাতা বলিলেন, "তোমার সৎসাহসের প্রশংসা করতে ইচ্ছা হয়। তুমি যে বাপের জেদ অগ্রাহ্য করতে পেরেছ, একটা অপরিচিতা নাবালিকা বিয়ে করনি, এতে তোমার বেশ একটু সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কহিল, "আমরা কুলীন কিনা, তাই আমি বি-এ পাশ করবার পর. কত কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যার পিতা, আমার পায়ে হাতে ধরেছে. অর্থের প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই আমায় টলাতে পারেনি। প্রেমহীন বিয়েতে আমি কোন মতে মত দিইনি।"

মাতা বলিলেন, "এতে তোমার সুখ্যাতির আরও কারণ আছে। তুমি যে অনুরোধ ও প্রলোভন উপেক্ষা করে, এ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হওনি, এটাও কম সুখ্যাতির কথা নয়। নিজে অর্থোপার্জ্জন করতে না শিখে যে যুবক বিয়ে করতে যায়, তাকে শেষটা বড়ই কষ্ট পেতে হয়। কত হিন্দু যুবক যে অকালে পরিবার প্রতিপালনের ভারে"......

মাতার বাক্য শেষ না হইতেই, মাতার পূর্ব্ব উপ-দেশানুযায়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী অভিনয়নিপুণা অভিনেত্রীর ন্যায়, ত্বরিতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "মা, তোমার চাবিটা...।" পরক্ষণে যুবক জ্যোতিঃপ্রকাশকে যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে, কক্ষমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া, সে লজ্জায় আপন বাক্য সংযত করিল; এবং নীরবে লজ্জাবনতমুখী ও সংকুচিতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নগবালার দুর্ভাবনা।

সে শুভদিনে, সেই শুভ সময়ে, অর্থাৎ যখন ব্রীড়ালতা জ্যোতির্ম্ময়ী আপনাদের সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে প্রেমাতুর জ্যোতিঃপ্রকাশকে সমাসীন দেখিয়াছিল, তখন পাদপ-পল্লব-সমাচ্ছন্ন, ও পানাদলাচ্ছন্ন পম্বল শোভিত পাথরকোণা গ্রামে, তাহাদের অন্দর সংলগ্ন সরোবরে নগবালা গাত্রমার্জ্জনা করিতেছিল। সুন্দর সরোবরের রক্ত ইষ্টক নির্ম্মিত ও প্রশস্ত অবতরণিকাতে বসিয়া জলমধ্যে অলক্তকনিন্দিত চরণতল নিমজ্জিত করিয়া, অলক্তকবর্ণ গাত্রমার্জ্জনী লইয়া, নবযৌবনা আপন নির্ম্মল মুখ সরোবরের নির্ম্মল জলে আরও নির্ম্মল করিতেছিল—যেন সে জবাকুসুম দিয়া একটি শুক্তি বৃহৎ ডিম্বাকার মুক্তা মার্জ্জিত করিতেছিল। মুক্তা যেমন জবাকুসুমের বর্ণে রক্তবর্ণ ধারণ করে, নগবালার মুক্তা-জ্যোতির্ম্ময় কপোলদেশ তেমনই আরক্তিম হইয়া-ছিল।

গোদোহন কার্য্যে নিযুক্ত গোপ, কম্পজ্বরে কাতর থাকায় আজ আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে পারে নাই; তাই নগবালা, বাটীর অন্যান্য বালিকার সহিত গাভী-সকল দোহন করিয়া আপনার 'দুহিতা' নাম সার্থক করিয়াছিল। তৎপরে বধূদিগের সহিত রন্ধনকার্য্যে যোগদান করিয়া পল্লীবাসিনী বঙ্গকুলকামিনীগণের মহাধর্ম্ম পালন করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় সহরাঞ্চল হইতে এই মহাধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়া পল্লীগ্রামের জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখন ভদ্রসমাজে এই মহাধর্ম্ম 'অধর্ম্মের ভোগ' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমা-দের নগবালা এই মহাধর্ম্মে কখনও হীনতা বোধ করে

নাই ; রন্ধনশালার যজ্ঞধূমে সে কখনও অসুস্থ বোধ করে নাই।—যাজ্ঞিক যেমন প্রসন্ন মনে আপন পুণ্য যজ্ঞে আহুতি প্রদান করে, স্নাতা ও শুদ্ধাচারিণী নগবালাও সেইরূপ প্রসন্নমনে আপন আত্মীয় পরিজনের জন্য পবিত্র রন্ধনযজ্ঞ সমাধা করিয়াছিল ; দেবী অন্নপূর্ণার ন্যায় প্রসন্ন মুখে তাহা পরিবেষণ করিয়াছিল। তাহার পর আহার করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পরে উচ্ছিষ্ট তৈজস মার্জ্জনা করিবার জন্য পরিচারিকার সহিত, পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর সোপানে নামিয়াছিল ; দাসী উহা হীন কার্য্য মনে করিয়া তাহাকে নিষেধ করিলে, সে হাসি মুখে বলিয়াছিল ; "ঝি, কায কখন নীচ হ'তে পারে না ; কুড়েমী আর কায না করাই সব চেয়ে বেশী নীচ।"

তৈজস সকল মার্জ্জিত হইলে, পরিচারিকা পরিষ্কৃত বাসন সকল লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু নগবালা সরোবরের শীতল ক্রোড় ত্যাগ করিল না। সে যৌবন প্রাপ্ত হইলেও, এখনও বালিকা-সুলভ ক্রীড়া সকল ভুলিতে পারে নাই, সন্তরণপটু কমনীয় দেহ লইয়া, শীতল, সরসী সলিলে কিয়ৎকাল সন্তরণ করিয়া আপন শ্রমক্লিষ্ট তনু স্নিগ্ধ করিয়াছিল। পরে পুষ্করিণীর সোপানে উপবেশন করিয়া আপন মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিতেছিল। সিক্ত বসন মধ্যে তাহার চম্পকবর্ণ দেহখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল ; জলমধ্যে সেই জড়তাশূন্য নবীন দেহ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সরসীর সলিলে, স্বর্ণ মৃণালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ; সরসী যেন স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে সরোবর তীরে কদলী, আম্র, পনস প্রভৃতির উদ্যান ছিল। এই উদ্যান মধ্যে একটী বৃক্ষে পল্লবান্তরালে বসিয়া একটি পিক বৈকালিক সঙ্গীত গাইল। কুহুধ্বনিতে নীরব কানন যেন শিহরিয়া উঠিল। সেই উচ্চ পঞ্চম স্বরে যেন সরোবরের স্বচ্ছ সলিলও ঈষৎ তরঙ্গান্দোলনে কাঁপিয়া উঠিল। সেই তীব্র স্বরে, কি জানি কেন, কিশোরীর অনিন্দ্য দেহলতিকাও কাঁপিয়া উঠিল ; নগবালার নবীন বক্ষঃ সেই বীচিমালাময় সরোবরেরই মত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।—বিদ্যুতের শিখা, তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল-ফলক ছুরিকার মত, যেমন নবীনা কাদম্বিনী খণ্ড খণ্ড করে, সেই কুহুরবও তেমনিই তাহার চিন্তাচ্ছন্ন মানস মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার মর্ম্মস্থল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ; অতি ব্যথায়, তাহার হৃদয় যেন জর্জ্জরিত হইয়া গেল।

কেন এরূপ হইল ? আমরা শুনিয়াছি, কুহুধ্বনিতে প্রেমিকাগণের হৃদয় স্বতঃই প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তবে নগবালা হৃদয়ে ব্যথা পাইল কেন ? ইহা কি বিধাতার ইঙ্গিত ? কলিকাতার রামবাগানের সেই সুঠাম বাটীতে সেই সুসজ্জিত কক্ষে, লজ্জা সংকুচিত বক্ষে, ঠিক সেই সময়েই ত জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিঃপ্রকাশের বিস্মিত ও বিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর বিদ্যুদ্দীপ্ত সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে ঝঞ্ঝাবাতের কৃষ্ণমেঘ সঞ্চিত ছিল, তাহারই কৃষ্ণছায়া কি দূরত্বের বাধা অতিক্রম করিয়া, নগবালার চিরপ্রফুল্ল হৃদয় মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ? সেই বিদ্যুদ্দীপ্তির পশ্চাতে যে ভীষণ মেঘগর্জ্জন ছিল, তাহাই কি দূরত্ব বশতঃ ক্ষীণ কুহুরবে পরিণত হইয়া নগবালার নবীন বক্ষঃ কাঁপাইয়া তুলিল ? অথবা জ্যোতিঃপ্রকাশের হৃদয়মধ্যস্থিত পাপের কালী হৃদয়সীমা লঙ্ঘন করিয়া, কলিকাতার প্রাসাদ প্রাকার সমূহ লঙ্ঘন করিয়া, পল্লীর পর পল্লী পার হইয়া, নগর, গ্রাম, মাঠ, কালীময় করিয়া নগবালার নির্ম্মল মর্ম্ম স্পর্শ করিল ?

সে আপন মুখ মার্জ্জন বর্জ্জন করিয়া বিকল ভাবে বসিয়া রহিল ; তাহার মনে আর শান্তি রহিল না। স্বামীর সম্বন্ধে একটা অনিশ্চিত দুর্ভাবনা তাহার হৃদয় অধিকার করিল।

কিয়ৎকাল সরোবর-সোপানে বসিয়া বসিয়া সে কি ভাবিল। তাহার পর, বাটী ফিরিবার জন্য সে উঠিল। সোপান শ্রেণী আরোহণ করিতে যাইয়া, তাহার সিক্তবসননিঃসারিত সলিলে পিচ্ছিল নিঃশ্রেণী আরও পিচ্ছিল হইয়া পড়িল। তাহাতে অন্যমনস্ক ও অসতর্কভাবে পদক্ষেপ করায় তাহার পদস্খলন ঘটিল ;

সে সশব্দে পড়িয়া গেল। অধিরোহনীর ইষ্টকে তাহার চিন্তাব্যাকুল মস্তক প্রহত হওয়ায় সে বিষম ব্যথা প্রাপ্ত হইল, সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল,—বিধাতা কি ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করিয়া তাহার অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ জীবন দেখাইয়া দিলেন?

আপন পদস্খলন ও পতনে সে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিল। শরীরে পতনের বেদনা বহন করিয়া আবার অধিরোহণী শ্রেণী কষ্টে অতিক্রম করিল; এবং বিমর্ষ মনে বাটী ফিরিল। কিন্তু অত্যন্ত কার্য্যকুশলা হইলেও, তাহার আর কোন কার্য্যে উৎসাহ রহিল না; সে রাত্রের রন্ধন কার্য্যে যোগদান করিতে পারিল না। বেদনাব্যথিত দেহ লইয়া, কুস্বরে বিকল হৃদয় লইয়া, অভুক্ত থাকিয়া সে আপন শয়ন কক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। জাগিয়া, কেবল ভাবিতে লাগিল; স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার অন্ধকার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে মহা দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন যামিনী অতিবাহিত করিল।

বিরহিণী নগবালার হৃদয়, বোধ হয়, পূর্ব্ব হইতেই স্বামীর চিন্তায় পূর্ণ ছিল। তাই সামান্য কুস্বরে সেই চিন্তায় তরঙ্গ উঠিয়াছিল। তাহার পর আপন পদস্খলন শব্দ শুনিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, কে যেন বজ্রনির্ঘোষে তাহার কাণের কাছে তাহার স্বামীর অমঙ্গল ঘোষণা করিল। সেই পতিব্রতা সাধ্বী কিরূপে হৃদয়মধ্যে পতির অমঙ্গল আশঙ্কা লইয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবে?

নিদ্রাহীন রজনীরও অবসান হয়। তাই নগবালার রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতালোকে ধরণীর আঁধার বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু নগবালার হৃদয়ের আঁধার কাটিল না। ম্লান মুখে সে শয্যাত্যাগ করিল, ম্লান মুখ লইয়া ভ্রাতৃবধূদিগের সম্মুখে বাহির হইল। বধূগণ তাহার ম্লান মুখের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে ভ্রাতৃজায়াদের কাছে আপন দুশ্চিন্তা জ্ঞাপন করিল। তাহারা আবার ননদিনীর দুশ্চিন্তার কথা আপন আপন স্বামীর নিকট বিবৃত করিল।

এইরূপে ক্রমে ভবতারণ বাবু ভগিনীর দুঃখের কথা শুনিলেন। শুনিয়া, তাহার বিষাদবিমর্ষ ভাব দূর করিবার জন্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "সে ভালই আছে। তোর কোনও ভাবনা নেই। আমি তাকে এখানে আসবার জন্যে আজই পত্র লিখব।"

নগবালা জ্যেষ্ঠের আশ্বাস বাক্যে আশ্বাসিতা হইল না; তাহার আশঙ্কা বা হৃদয় ব্যথা প্রশমিত হইল না। বিষাদম্লান মুখ ম্লানই রহিয়া গেল। দেখিয়া ভবতারণবাবু, এতটুকু মেয়ের এই অগাধ পতিপ্রেমের কথা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

কিন্তু যখন জ্যেষ্ঠ শ্যালকের নিমন্ত্রণ পত্রের কোনও উত্তর দেওয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ আবশ্যক বোধ করিল না; অথবা নবীন প্রেমে মত্ত থাকায় পত্রোত্তর লেখার তাহার অবকাশ হইল না; এবং নগবালা যখন স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অধীরা হইয়া, একটা মানসিক ব্যাধি ঘটাইবার উপক্রম করিল, তখন ভবতারণ বাবুও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অহরহ ভগিনীর ম্লান মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অধীর হৃদয়ে তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, "বোধ হয় জ্যোতিঃপ্রকাশের শুভ সংবাদ আনবার জন্যে আমার একবার কলকাতায় যাওয়ার দরকার হবে।"

স্ত্রী, কলিকাতার রাস্তার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এবং নিজে স্বামীবিরহের ভয় করিয়া স্বামীকে উপদেশ দিলেন, "জ্যোতিঃপ্রকাশের বাপকে আগে একখানা পত্র লেখ। তার উত্তর না পেলে তখন কলকাতায় যেও।"

ভবতারণ বাবু বুদ্ধিমতী স্ত্রীর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন। আবার জ্যোতিঃপ্রকাশকে এবং তাহার পিতাকে পত্র লিখিলেন।

আবার কয়েকদিন নগবালা কত দুর্ভাবনার তীব্র দংশন তাহার বক্ষের ভিতর সহ্য করিল;

দুর্ভাবনার দারুণ বিষে তাহার তরুণ হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া গেল।

কিন্তু এবার পত্রের উত্তর আসিল। উত্তর জ্যোতিঃপ্রকাশ লিখে নাই, রামপ্রাণ বাবু লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন, শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবাজীবন শারীরিক ভাল আছে, এবং সে গভর্ণমেণ্ট অফিসে একটী উচ্চবেতনের চাকুরী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে; এক্ষণে সে উপায়ক্ষম হইয়াছে, অতএব শ্রীমতী বধূমাতাকে কলিকাতার বাটীতে লইয়া আসিবেন।

এই পত্রের কথা শুনিয়া, এবং গোপনে তাহা বার বার পাঠ করিয়া নগবালা আবার প্রফুল্ল হইল; আবার তাহার ম্লানমুখে হাসি দেখা দিল; আবার সে রন্ধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল, আবার সরসীর স্নিগ্ধজলে সন্তরণ করিয়া, তাহার প্রফুল্ল বক্ষের তাড়নে, নির্ম্মল জলরাশিকে খল খল শব্দে হাসাইল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রাবণ রাতে

মেঘের পরে মেঘ জমেছে গগন কিনারাতে,
লুপ্ত হ'ল চন্দ্র তারা আজকে শাঙণ রাতে!
অন্ধ করা অন্ধকারে
জমাট বাঁধা পথের ধারে
ঝিল্লি ঝিঁঝিঁট মিস্ছে ভেকের হর্ষ রোলের সাথে।

আকাশ তলে উঠ্ছে জ্বলে যেন সোণার বাতি—
দেখ্ছি যেন মানস বালার পদ্মমুখ ভাতি।
গগনে তাই বস্‌ল মেলা—
মনে হ'ল গোঠের খেলা;
আজকে কি এ বৃন্দাবনের ঝুলন খেলার রাতি?

মানস চাতক তাকিয়ে আছে সুদূর মেঘের পানে—
মরু তিয়াস মিটাবে আশ, আজ সে সুধা দানে।
যখন বারি পড়ল ঝ'রে,
হৃদয় সারা উঠ্‌ল ভ'রে—
দূরের কেয়াবন গন্ধে, দাদুরিদের গানে।

গভীর রাতের বাদলেতে একলা জেগে রহি—
সজল হাওয়া কাণে আমার যায় কত কি কহি।
দূরের কল কথা কত
তাহার বুকে কূজনরত,—
অতীত স্মৃতি মোর হিয়াতে জাগ্‌ছে রহি রহি!

মনে পড়ে ফাগুন দিনের এমনি নিশীথ রাতে—
চাঁদের ভরা আলো আমার পড়্‌লো আঁখি পাতে,—
বাজিয়ে বাঁশি সুদূর মাঠে
ডাক দিল কে ঘাটে ঘাটে,—
সাথী আমার—হয়নিক মোর চেনা তাহার সাথে।

বাদল নিরালাতে হৃদয় তায়ই স্মৃতিভরা—
উঠ্‌বে নাকি সে সুর আজি পরাণ আকুল-করা?
বারি ঝরা শাঙণ রাতে
চেনা হবে তাহার সাথে—
মিলন গানে মাত্‌ছে কি তাই সলিলস্নাতা ধরা!—

শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বহুভর্ত্তৃতা প্রথা

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই স্বভাবতঃ মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়,—প্রাচীন ভারতে হিন্দু সমাজে বহুভর্ত্তৃতা প্রথার প্রচলন ছিল কিনা? পাশ্চাত্য সুধীগণ ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া অবান্তর তর্ক উপস্থিত করিয়া শেষ পাণ্ডুপুত্রদিগকে তিব্বতীয় সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই প্রকারে ত তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইল,—কিন্তু সত্যই কি আর্য্য সমাজ বহুভর্ত্তৃতা দোষে দুষ্ট ছিল না?

কোন্ আদিম কালে ভারতে সর্ব্ব প্রথম বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। বেদই হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং চতুর্ব্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্ব পুরাতন। ঋগ্বেদের সূক্ত হইতে হিন্দু সমাজের যে চিত্র, দেখিতে পাই তাহা পূর্ণপরিণত সভ্য সমাজেরই চিত্র; তাহাতে আদিম কালের অসভ্য সমাজের পরিত্যক্ত আচার ব্যবহারের লেশমাত্র চিহ্ন নাই। তবে দাম্পত্য সম্বন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার উল্লেখ ৫।২৮।৩ ঋকে দেখিতে পাই—কিন্তু পঞ্চম বেদ মহাভারত পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন হিন্দু সমাজও এক কালে ব্যভিচার দোষে দুষ্ট ছিল। মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে প্রমাণ হইবে যে বহু পুরাকালে আর্য্যদিগের মধ্যেও বিবাহ বন্ধন এক প্রকার ছিল না, এবং ইহারই প্রতিবিধানকল্পে ঋষি উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু সর্ব্ব প্রথম বিবাহ প্রথার প্রচলন করেন। শতপথব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যোপনিষদে এক শ্বেতকেতুর দেখা পাই; পরে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ঔদ্দালক শ্বেতকেতুর দ্বারা গম্যাগম্য-ব্যবস্থা নিয়মের উল্লেখ দেখি, কেন না "সর্ব্ব সাধারণ স্ত্রীই পকান্ন সদৃশ," অতএব তৎকালে পরদারাভিগমন প্রসিদ্ধই ছিল। ঋগ্বেদে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর উল্লেখ আছে; কিন্তু ব্যভিচার সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। এই প্রসঙ্গে পাণ্ডু-কুন্তীর সংবাদও উল্লেখযোগ্য। পুত্রহীন পাণ্ডুর স্বর্গে অধিকার ছিল না,—তিনি যে পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া কুন্তীকে তপস্বীব্রাহ্মণ হইতে অপত্যোৎপাদন করাইতে স্বীকৃত করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "পুরাকালে স্ত্রীজাতি অনাবৃতা ছিল, ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিত এবং পর্য্যটনশীলা স্বতন্ত্রা নারীগণ কৌমার কাল হইতেই একাধিক পরপুরুষের সহিত মিলিত হইলেও পতির নিকট হইতে কোনও বাধা প্রাপ্ত হইত না; কেননা তাহাতে কোনও অধর্ম্ম ছিল না। বরং পুরাকালে এই ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়াই পরিগণিত হইত। মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং অদ্যাবধি উত্তর কুরুতেও ইহার প্রচলন রহিয়াছে।"

> "অথ ত্বিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মতত্ত্বং নিবোধ মে।
> পুরাণমৃষিভির্দৃষ্টং ধর্ম্মবিদ্‌ভির্মহাত্মভিঃ॥
> অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
> কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
> তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
> নাধর্ম্মোঽভূদ্ বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
> প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
> উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষদ্যাপি পূজ্যতে॥"

(আদি, ১২৭ অধ্যায়)

আরও দেখিতে পাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে দিগ্বিজয়ে বহির্গমন করিয়া সহদেব মাহীষ্মতী নগরীর নারীদিগকে স্বৈরিণী হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখেন (সভা—৩০ অধ্যায়)। মদ্র দেশের কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পর পুরুষে মিলিত হইয়া থাকে। বাহীকদিগের স্ত্রী স্ব-পর-পুরুষ-বিবেক-বিহীন হইয়া ইচ্ছামত বিহার করিয়া থাকে। আরট্ট, প্রস্থল,

মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশেও এই কুৎসিত প্রথা বর্ত্তমান আছে।

(কর্ণ,—৪১ এবং ৪৪ অধ্যায়)

অতএব দেখা যাইতেছে যে অতি পুরা কালে হিন্দু সমাজে বিবাহ বন্ধন ছিল না; এবং সমাজের এই অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চনদের শ্যামল তটে বহুপতিত্ব প্রথারই অধিক প্রচলন দেখিতে পাই। আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পর্য্যন্তও শতদ্রুর উভয় তটবর্ত্তী অম্বালা, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, জলন্ধর, ও হোসিয়ারপুর জেলায় জাঠ রমণীগণ বহুভর্তৃকা। রণদুর্ম্মদ জাতিদের প্রত্যেকের বিবাহ করা সম্ভবপর নহে, প্রত্যেকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে যুদ্ধের সময় সৈনিকের অভাব ঘটিতে পারে; ফলতঃ সমরশীল জাতিদিগের পক্ষে বহুপতিত্ব বড়ই সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয়। ঠিক এই কারণের জন্যই মালাবারের নায়রগণ প্রত্যেকেই বিবাহ করা প্রয়োজন মনে করে না, এক ভ্রাতা বিবাহ করিলেই সেই স্ত্রী ধর্ম্মতঃ অপর ভ্রাতা দিগের পত্নীরূপে গণ্য হয়। অদ্যাপি কুমায়ূনের ব্রাহ্মণ, রাজপুত (ক্ষত্রিয়) এবং শূদ্রদিগের ভিতর এই প্রথা পরিলক্ষিত হয়। তিব্বতের কথা দূরে থাকুক, হিমালয়ের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন দেখা যায়। কাশ্মীরে স্থানে স্থানে আজও এক ভ্রাতার স্ত্রী দ্রৌপদীর ন্যায় অপরাপর ভ্রাতার স্ত্রী বলিয়া গণ্য হয়। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরির টোডাদিগের মধ্যেও এই প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। মাদুরার কাল্লবন স্ত্রীগণ ধর্ম্মতঃ পর পর বহুপতি গ্রহণ করিয়াও বিনা আপত্তিতে উপপতির সহিত মিলিত হইয়া থাকে। মালাবারের সূত্রধর ও লৌহকার প্রভৃতি শিল্পীরা প্রকাশ্য ভাবে মহাসমারোহে ৪.৫ জনে একত্র হইয়া এক পত্নীকে বিবাহ করিয়া থাকে। এই সকল সমাজে জন্মদাতা পিতার নাম সঠিক নির্দ্ধারণ দুরূহ, কাযেই সাধারণতঃ মাতার নামানুসারে সন্তানাদির নামকরণ হইত, এবং ভগিনী পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

"In consequence of their strange arrangement no Nair knows his father and every man considers his sister's children as his heirs."

স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া পাঞ্চালী লাভ করিলেন। ভীমার্জ্জুন দ্রৌপদী সহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃসকাশে এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে বলিয়া নিবেদন করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতা কুন্তী বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই, পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া ভোগ করিবার আদেশ প্রদান করেন। "কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে।" কিন্তু পরে কৃষ্ণাকে দেখিয়া "কি কুকর্ম্ম করিলাম" বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। শেষে ধর্ম্মভয়ে ভীতা হইয়া যাহাতে স্বীয় বাক্য মিথ্যা না হয় এবং দ্রুপদ কুমারীকেও অধর্ম্ম পাপে লিপ্ত হইতে না হয় সেই বিষয়ে উপায় বিধান করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুদয় প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু মাতৃপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন না; তিনি অর্জ্জুনকে জয়লব্ধা পাঞ্চালীকে বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন এই গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া অধর্ম্মাচরণে সম্মত হইলেন না। কেননা, যুধিষ্ঠিরই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতএব সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই বিবাহ করা কর্ত্তব্য, তৎপর ভীম, তৎপর অর্জ্জুন, তৎপর নকুল ও সর্ব্বশেষে সহদেবের বিবাহ করা উচিত।

"কুরু প্রবীরো।
ধনঞ্জয়ং বাক্যমিদং বভাষে॥
ত্বয় জিতা ফাল্গুন যাজ্ঞসেনী
ত্বয়ৈব শোভিষ্যতি রাজপুত্রী।
প্রজ্বাল্যতামগ্নির মিত্রসাহ
গৃহাণ পাণিং বিধিবৎ ত্বমস্যাঃ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

"মা মাং নরেন্দ্র ত্বমধর্ম্মভাজং
কৃথা ন ধর্ম্মোহয়মশিষ্টদৃষ্টঃ।
ভবান্ নিবেশ্যঃ প্রথমং ততোহয়ং…ভীমো…

অহং ততো নকুলোঽনন্তরং মে
পশ্চাদয়ং সহদেবস্তরস্বী।" আদি ২০১ অধ্যায়

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তাঁহার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে একান্ত মোহিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যাসদেবের বাক্য স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া সকলেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন।

"জিষ্ণোর্বচনমাজ্ঞায় ভক্তিস্নেহ সমন্বিতম্।
দৃষ্টিং নিবেশয়ামাসুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ॥
তেষাং তু দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা সর্ব্বেষামমিতৌজসাম্।
সংপ্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাদুরাসীন্মনোভবঃ॥

... .

তেষামাকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্বৈপায়ন বচঃ কৃৎস্নং সস্মার মনুজর্ষভঃ॥
অব্রবীৎ স হি তান্ ভ্রাতৄন্ মিথো ভেদ ভয়ান্নৃপঃ।
সর্ব্বেষাং দ্রৌপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা॥"
(আদি, ২০৬ অধ্যায়)

মাতৃ আজ্ঞা "ভুঙ্ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে" কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়াই এইরূপে একমাত্র ভ্রাতৃভেদ ভয়ে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্বের মীমাংসা হইয়া গেল। অতএব যখন আদি পর্ব্ব ২২১ অধ্যায়ে "পরস্পরেণ ভেদশ্চ না ধাতুং তেষু শক্যতে। একস্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিদ্যন্তে পরস্পরম্॥ ন চাপি কৃষ্ণা শক্যেত তেভ্যো ভেদয়িতুং পরৈঃ। ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকস্যা বহুভর্ত্তৃতা। তং চ প্রাপ্তবতী কৃষ্ণা ন সা ভেদয়িতুং শুভা।" বলিয়া কর্ণ এক পত্নীতে অনুরক্ত পাণ্ডবদিগের সৌভ্রাত্র উল্লেখ করিয়া ভ্রাতৃবিরোধ উৎপাদনের চেষ্টা বিফল বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, তখন মনে হয় যে সত্যই বুঝি যুধিষ্ঠিরের পাঞ্চালীর জন্য ভেদ ভয়ে ভীত হইবার কারণ ছিল। এই প্রসঙ্গে দ্রুপদ কর্ত্তৃক আহূত যুধিষ্ঠিরের নিম্নলিখিত উত্তর হইতেই বহু ভর্ত্তৃতার সমর্থন দেখিতে পাই না কি?

"পূর্ব্বেষামানুপূর্ব্ব্যেণ যাতং বর্ত্মানুযামহে॥
এবং চৈব বদত্যম্বা মম চৈতন্মনোগতং॥
এষ ধর্ম্মো ধ্রুবো রাজংশ্চরৈনমবিচারয়ন্।
মা চ শঙ্কা তত্র তে স্যাৎ কথঞ্চিদপি পার্থিব॥"
(আদি, ২১০ অধ্যায়)

অর্থাৎ আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি এবং আমারও ইহা মনোগত বটে; হে রাজন, ইহা সনাতন ধর্ম্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইবেন না।

বহুপতিত্ব প্রথা যে বেদ ও তৎকালীন লোকাচার বিরুদ্ধ তাহা মহাভারতকার স্বয়ং ব্যাসদেবের এবং দ্রুপদ রাজার উক্তি হইতেই জানিতে পারি।

"নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ।
সোঽয়ং ন লোকে বেদে বা জাতু ধর্ম্ম প্রশস্যতে॥
লোকবেদ বিরুদ্ধং ত্বং নাধর্ম্মং ধর্ম্মবিচ্ছুচিঃ।
কর্ত্তুমর্হসি কৌন্তেয় কস্মাৎ তে বুদ্ধিরীদৃশী॥"
(আদি, ১১০ অধ্যায়)

"অস্মিন ধর্ম্মে বিপ্রলব্ধে লোক বেদ বিরোধকে।"
(আদি, ১১১ অধ্যায়)

"অধর্ম্মোঽয়ং মম মতো বিরুদ্ধো লোকবেদয়োঃ
নহ্যেকা বিদ্যতে পত্নী বহুনাং দ্বিজসত্তম॥"
(আদি, ১১১ অধ্যায়)

কিন্তু সত্যই কি ইহা বেদ-বিরুদ্ধ? ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত ঋক্‌গুলি বহুভর্ত্তৃতা প্রথার সমর্থন করে না কি?

"হে অশ্বিদ্বয়!...কুমারী সূর্য্যা...'তোমরা আমার পতি' এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন।—মণ্ডল ১। সূক্ত ১৯। ঋক্ ৫। "দুইজন (অশ্বিদ্বয়) এক স্ত্রীর সহিত প্রবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন।" (৮ ৩০।৮) "সূর্য্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন তাহাতে সূর্য্য যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁহার বররূপে পরিগৃহীত হইলেন। (১০।৮৫।৯)

এই ত গেল সূর্য্যদুহিতা সূর্য্যার কথা। তারপর

মরুদ্‌গণের সপ্ত কিংবা ত্রয়ঃষষ্টি মরুদ্‌গণের স্ত্রী হইল রোদসী। (১। ৪। ১৬৭। ৫) এবং ৬ ঋকে দেখিতে পাই যে, "বলশালিনী রোদসী নিয়মক্রমে তাঁহাদিগের (মরুদ্‌গণের) সহিত মিলিত হয়েন।" দ্রৌপদীও ঠিক এই নিয়মক্রমেই পঞ্চভ্রাতার সহিত মিলিত হইতেন। ইহা ভিন্ন মনুষ্য ও দেবতার বিবাহের ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে;—তাহা অন্ততঃ পাশ্চাত্য সুধীগণের মতে বহুভর্ত্তৃতার সমর্থন করে। (তজ্জন্য এই সকল ঋক্‌গুলি দ্রষ্টব্য—৮। ৯১। ৪, ১। ৬৬। ৪; এবং ১০। ৮৫। ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১ এবং অথর্ব্ববেদের ১৪। ১।। ৪৯, ৫০, ৫১, ৬২, এবং ১৪।২।১, ১২, ১৪ এবং ৫৩।)

আরও দেখা যায় যে দ্রুপদের "নৈকস্যা বহবঃ পুংসঃ শ্রূয়তে পতয়ঃ কচিৎ" বাক্য, শ্রুতির "নৈকস্যাঃ বহবঃ সহ পতয়ঃ" শব্দেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সহপতয়ঃ অর্থে এক কালীন বহু পতিত্ব; অর্থাৎ একই সময়ে একই স্ত্রীর একাধিক পতি থাকা দূষণীয়, সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় না কি যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, একই স্ত্রী বহুপতির সহিত মিলিত হইলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে না। এই জন্যই বোধ হয় যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের আদেশানুসারে ও ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিবার জন্য নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে যখন একজন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবেন, তখন অন্য কেহ তথায় যাইতে পারিবেন না, এবং এই নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ তাহাকে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। অর্জ্জুন স্বয়ং ভুক্তভোগী। খুব সম্ভবতঃ বেদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া এবং পুরাণ হইতে জটিলা ও বার্ক্ষী নাম্নী বহুভর্ত্তৃকা কন্যাগণের নজীর উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠির দ্রুপদ রাজাকে সম্মত করাইয়াছিলেন।

"শ্রূয়তে হি পুরাণেঽপি জটিলা নাম গৌতমী।
ঋষীণাধ্যাসিতবতী সপ্তধর্ম্মভৃতাং বরা॥
তথৈব মুনিজা বার্ক্ষী তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ।
সংগতাভূদ্‌ দশভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ॥"

(আদি, ২১১ অধ্যায়)

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ব্যাসদেব যিনি স্বয়ং প্রথমে "অস্মিন ধর্ম্মে বিপ্রলব্ধে লোক বেদ বিরোধকে" বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিই যুধিষ্ঠিরের ব্যাখ্যার পর বহুব্যক্তির এক পত্নীতা যে সনাতন ও ধর্ম্মবিহিত তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য দ্রুপদরাজকে বলিতে লাগিলেন

"যথায়ং বিহিতো ধর্ম্মো যতশ্চায়ং সনাতনঃ।
যথা চ প্রাহ কৌন্তেয়স্তথা ধর্ম্মো ন সংশয়ঃ॥
... ...
ততো দ্বৈপায়নস্তস্মৈ নরেন্দ্রায় মহাত্মনে।
আচখ্যৌ তৎ যথা ধর্ম্মো বহুনামেকপত্নিতা॥"

ব্যাসদেবের এই উক্তির সহিত যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বোক্ত উক্তি একত্র করিয়া পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতে বহুভর্ত্তৃতা প্রথা যে প্রবল ছিল সে সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না—এককালে ইহা সনাতন বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু দ্রুপদ ও তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা এবং স্বয়ং ব্যাসদেব কৃষ্ণার অলৌকিক পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, এক স্ত্রীর বহুপতি থাকা যদিও ধর্ম্মবিহিত, তথাপি লোকাচার বিরুদ্ধ, কেন না তৎকালীন সমাজে ইহার প্রচলন প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, নহিলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার বিবাহে এত তর্কের প্রয়োজন হইত না। তবে ইহাও দ্রষ্টব্য যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বাৎস্যায়ন পাঞ্চাল দেশীয় বাভ্রবীয় শাস্ত্রকারগণের মতানুসরণ করিয়া এই পঞ্চপতিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। "দৃষ্ট-পঞ্চপুরুষাঃ নাগম্যা কাচিদস্তীতি বাভ্রবীয়াঃ॥" (১।৫ অধ্যায়, ২২) টীকাকার জয়মঙ্গল ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"স্বপতিব্যতিরেকেণ দৃষ্টাঃ পঞ্চপুরুষাঃ পতিত্বেন যয়া সা স্বৈরিণী কারণবশাৎ সর্ব্বৈরেব গম্যা। তথা চ পঞ্চাতীতা বন্ধকীতি পরাশরঃ। একদ্ব্যাদিদর্শনে তু সৎস্বপি কারণেষু নৈবেত্যার্থোক্তম্। দ্রৌপদী তু যুধিষ্ঠিরাদীনাং স্বপতিত্বাদক্তৈবামগম্যা। কথমেকা সত্যনেক পতিরিতি চৈতিহাসিকাঃ প্রষ্টব্যাঃ।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে অন্ততঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এক স্ত্রীর

বহুপতি কি করিয়া হয় সেই সমস্যা ঐতিহাসিক ভিন্ন কেহই পূরণ করিতে সমর্থ নন; অর্থাৎ বহুপতিত্ব প্রথা লুপ্ত হইয়া ঐতিহাসিক তর্করূপে গণ্য হইতেছিল। কিন্তু ভাবিবার বিষয় যে পাঞ্চাল দেশেই পাঞ্চালদেশের বাভ্রব্যীয় শাস্ত্রকারগণের দ্বারা দ্রৌপদীপাঞ্চালীর পঞ্চপতিত্বের সমর্থন। অতএব প্রাচীনকালে খুব সম্ভবতঃ পাঞ্চাল ও তৎ পারিপার্শ্বিক প্রদেশে বহুভর্তৃতা প্রথার প্রচলন ছিল। বেদে "কুরু-পাঞ্চাল" শব্দের উল্লেখ পাই, অর্থাৎ কুরু ও পাঞ্চাল আর্য্যদিগের একই শাখান্তর্গত ছিল, এবং মহাভারত ও পুরাণ সাক্ষ্য দেয় যে একই পূর্ব্বপুরুষ ভরত হইতে হস্তিনাপুরের কুরু ও উত্তর দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজবংশধরের জন্ম। তাহা হইলে কুরুবংশীয় পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাদিগের উভয়ের আচার ব্যবহার একই হইবার সম্ভাবনা, কেন না তাঁহারা একই আর্য্যশাখান্তর্গত ও একই পূর্ব্বপুরুষ হইতে জাত। সেই জন্যই যুধিষ্ঠির মাতৃ-আজ্ঞার উত্তর প্রদান না করিয়াই "সর্ব্বেষাং দ্রৌপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা" বলিয়া পঞ্চপতিত্বের মীমাংসা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই; কেননা তিনি ত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই কায করিয়াছেন। যাহা হউক, পাঞ্চালী দ্রৌপদীর সহিত কুরুবংশধর পাণ্ডবের বিবাহ যে সমাজ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে তাহা পাঞ্চালদেশের আচার ব্যবহার দ্বারাই জানা গেল।

বাৎস্যায়ন "পারদারিকাধিকরণম্" অধ্যায়ে যে সকল আচার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কি বহুভর্তৃতার সমর্থন করে? "প্রস্তা জনপদকন্যা দশমেঽহনি কিঞ্চিদৌপায়নিকমুপগৃহ্য প্রবিশন্ত্যন্তঃপুরমুপভুক্তা এব বিসৃজ্যন্তে ইত্যান্ধ্রাণাম্। মহামাত্রেশ্বরাণামন্তঃপুরাণি নিশি সেবার্থং রাজানমুপগচ্ছন্তি বাৎসগুল্মকানাম্। রূপবতীর্জনপদযোষিতঃ প্রীত্যপদেশেন মাসং মাসার্দ্ধং বাহয়িতিবাসয়ন্ত্যন্তঃপুরিকা বৈদর্ভাণাম্। দর্শনীয়াঃ স্বভার্য্যাঃ প্রীতিদায়মেব মহামাত্ররাজভ্যো দদত্যপরান্তকানাম্। রাজক্রীড়ার্থং নগরস্ত্রিয়ো জনপদস্ত্রিয়শ্চ সঙ্ঘশ একশশ্চ রাজকুলং প্রবিশন্তি সৌরাষ্ট্রিকাণামিতি।" এই যে অন্ধ্র, বাৎসগুল্মক, বিদর্ভ, অপরান্ত ও সৌরাষ্ট্রের বিবাহিত কন্যাগণ রাজ-অন্তঃপুরিকা স্ত্রীরূপে, কোনও স্থলে একমাস পর্য্যন্তও বাস করিয়া ফিরিয়া আসিত, তাহা নিন্দনীয় ছিল বলিয়া বোধ হয় না, বরং "দেশ-প্রবৃত্তিযোগাৎ" বলিয়া আচরিত হইত।

উপরিউক্ত তথ্য গুলি হইতে প্রাচীন ভারতে বহুপতিত্ব প্রথা বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা নিঃসন্দেহে মীমাংসা করিবার ভার আপনাদের উপর অর্পণ করিলাম। আমি কেবল তথ্য সংগ্রহ করিয়াই খালাস। তবে একটী কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। আপস্তম্ব ও বৃহস্পতির সূত্রে কুলে স্ত্রীদান করিবার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে পাশ্চাত্য মনীষিগণ ইংরাজিতে যাহাকে Group marriage (গোষ্ঠী বিবাহ?) বলে তাহারও চলন ভারতবর্ষে ছিল, এই প্রমাণ করিতে চান—কন্যাকে স্বামীর নিকট সম্প্রদান করিলে স্বামীর কুলে সম্প্রদান করা হইত, অর্থাৎ তাহাকে স্বামীর সপিণ্ড ও সগোত্র সকলেরই স্ত্রী বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু কুলস্ত্রী অর্থে আমার যাহা ধারণা তাহা আপনাদের মনঃপূত হইবে কি না জানিনা, তবে তাহা পাশ্চাত্যমতের সঙ্গে কিছুই মিলে না। পাশ্চাত্য সুধীগণ কুলস্ত্রীর অর্থ যাহাই করুন, কোনও হিন্দুর নিকট কুলস্ত্রী স্বামীর পরিবারস্থ সকলের স্ত্রীরূপে গণ্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বিবাহের যাহা বিশেষত্ব—এক কুলের সহিত ভিন্ন কুলের সম্বন্ধ স্থাপন করা—তাহা পাশ্চাত্য সমাজে নাই। তাই হিন্দুনারী কুলস্ত্রী-রূপে এই একতা ও সখ্যের বরণডালা লইয়া পিতৃকুল ও স্বামিকুলের মিলন ঘটাইয়া দেয়—তাই সে কুলবধূ, তাই সে কুললক্ষ্মী। *

শ্রীনীলমণি আচার্য্য।

* ভাগলপুর সাহিত্যপরিষদ শাখায় পঠিত।

দারার দুরদৃষ্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজপুত্র দারা যখন দেখিলেন একান্তই মৃত্যু উপস্থিত, তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, জীবলীলার অবসান-মুহূর্ত্ত সমাগত, তখন ভীরু কাপুরুষের স্তায় হত্যাকারীর পদতলে সাশ্রুনয়নে প্রাণভিক্ষা চাহিয়া হৃদয় দৌর্ব্বল্য দেখাইতে আর তাঁহার ইচ্ছা হইল না—তাঁহার উপাধান-নিম্নে আত্মরক্ষার জন্ত যে ক্ষুদ্র ছুরিকা তিনি লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, বিদ্যুদ্বেগে তাহা বাহির করিয়া, দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করতঃ হত্যাকারী নজরের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। তখনও সিপারের রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে।

নজর এবং তাহার সহচরগণ যখন দারার কক্ষে প্রবেশ করিল, দারা দেখিলেন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ত নির্ম্মম ঘাতকের করে তীক্ষ্ণধার কোষমুক্ত কৃপাণ রহিয়াছে এবং পাষণ্ড সেই খর করবাল উদ্যত করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে দারার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দারা তখন আহত সিংহের স্তায় লম্ফপ্রদান করিয়া হত্যাকারীর উপরে আপতিত হইলেন এবং তাঁহার দৃঢ়মুষ্টিধৃত সেই ক্ষুদ্র ছুরিকা পাপাত্মার দেহে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। বিশাল বাহুবলের সহিত ছুরিকাঘাত করায় ক্ষুদ্র অস্ত্র খানি মাংস ভেদ করিয়া পাষণ্ডের অস্থির মধ্যে গভীর ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল, পুনরায় আঘাতের জন্ত দারা অস্ত্র টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ছুরিকার লৌহ ফলক ঘাতকের দেহ মধ্যে বিদ্ধ হইয়াই রহিল, কেবল ভগ্নমুষ্টি খানি দারার হস্তে ফিরিয়া আসিল; আর কোন অস্ত্র দারার নিকটে নাই, তখন অনন্তোপায় হইয়া তিনি হত্যাকারীদিগকে মুষ্টি প্রহার ও পদাঘাত দ্বারা যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এরূপ যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব? এক পক্ষে সশস্ত্র বহু লোক, অপর পক্ষে দারা একক এবং নিরস্ত্র। পাষণ্ডগণ সকলে একত্রে দারাকে আক্রমণ করিল এবং তাহাদের অস্ত্রাঘাত জনিত রক্তস্রাব তাঁহাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে লাগিল।

যখন এই ভীষণ ব্যাপার চলিতেছে, তখন কক্ষান্তর হইতে ক্ষিপ্র পদক্ষেপের শব্দ এবং অস্ত্রাঘাতজনিত বেদনায় দারার আর্ত্তকণ্ঠরব শুনিতে পাইয়া সিপার বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পিতার কি অবস্থা; ঘাতকগণ পিতাকে হত্যা করিতেছে অথচ পুত্র এত নিকটে থাকিয়াও পিতার অন্তিম কালে তাঁহাকে কোন সাহায্যই করিতে পারিতেছে না, এই চিন্তায় বালক অধীর হইয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল এবং কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহাতে বারংবার পদাঘাত করিতে লাগিল। দারার সেই অসম্ভব আত্মরক্ষার চেষ্টাই বা কতক্ষণ স্থায়ী? বহুর সহিত একের সংগ্রাম, তাহাও আবার অস্ত্রহীন অবস্থায়—রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে! সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত, রক্তস্রাবে হীন কলেবর দারা কক্ষতলে পড়িয়া বেদনায় আর্ত্তকণ্ঠে যথাশক্তি ভগবানের নাম করিতেছেন—কক্ষান্তর হইতে প্রাণ-প্রতিম পুত্রের রোদন ধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিয়া চরমের পরম সম্বল সে নামও ভুলাইয়া দিতেছে। মুহূর্ত্ত পরে সমস্তই শুব্ধ হইয়া গেল, দারার যমযন্ত্রণার আর্ত্তকণ্ঠ নীরব হইল, সিপার বুঝিল সব শেষ হইয়া গিয়াছে, তক্তে তাউস ধরার ধূলির উপরে ফেলিয়া রাখিয়া তাহার পিতা ঊর্দ্ধ-লোকে চলিয়া গিয়াছেন। সিপারের আপনার বলিতে আর ইহলোকে কেহ নাই—নিদারুণ মর্ম্ম বেদনায় বালক একবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বর্ষব্যাপী দ্বন্দ্ব বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, জয় পরাজয়,

সমস্তই দারার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আজ শেষ হইয়া গেল। ঔরঙ্গজীব অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপে ময়ূরাসনে বসিয়া পর্ব্বত-প্রাকার এবং সাগর-পরিখা পরিবেষ্টিত নিঃসপত্ন বিশাল ভারত সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারিবেন—ধর্ম্মের পরাভব সম্পূর্ণ হইল, অধর্ম্মের ধ্বজদণ্ড তাহার গর্ব্বোন্নত মস্তক ঊর্দ্ধাকাশে উত্তোলন করিল!

শৈশবে যখন "রূপকথা" শুনিতাম, তখন অনেক গল্পে শুনিয়াছি, রাজার আদেশে যাহাকে হত্যা করিবার কথা সে যদি জনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে ঘাতকগণ তাহাকে হত্যা না করিয়া শৃগাল কুকুর কাটিয়া সেই রক্ত রাজাকে দেখাইত, এবং রাজরোষ উপশমিত হইলে দণ্ডিত ব্যক্তিকে যথাকালে রাজ সন্নিধানে আনয়ন করা হইত। দারা প্রজাপুঞ্জের প্রিয় রাজকুমার ছিলেন, তাহার প্রমাণ ঔরঙ্গজীব বহু সময়ে পাইয়াছেন। দিল্লী-বাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক মালেক জিউয়ানের দুর্গতি তাহার শেষ এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই জন্য ঔরঙ্গজীবের মনে ভয় ছিল, যদি ঘাতকগণ দারাকে হত্যা না করিয়া গোপনে তাহাকে মুক্ত করতঃ তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ জ্ঞাপন করে, সেই জন্য দারার ছিন্নমুণ্ড তাঁহার নিকটে আনিয়া দেখাইবার আদেশ ঔরঙ্গজীব দিয়াছিলেন। শস্ত্রাঘাতে শোণিত পরিপ্লুত সহোদরের শিরশ্ছেদ করিতে হয়ত বা পাপ-কঠিন-প্রাণ ঘাতকেরও অন্তর মন বিদ্রোহ করিয়াছে, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা সে আদেশ দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই! মানবাকারে ঔরঙ্গজীবের দেহ নির্ম্মাণ করিয়া ভগবান রাক্ষসের প্রাণ তাহার মধ্যে কেমন করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন সে রহস্য বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই! পাপিষ্ঠ বাদশাহের আদেশ পরিপালিত হইল, নজর বেগ রাজপুত্র দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঔরঙ্গজীবের সম্মুখে উপস্থিত করিল, বাদশাহ নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা যখন নিশ্চিত বুঝিলেন যে উহা দারারই ছিন্নশির, অপর কোন ব্যক্তির নহে, কিংবা বস্তু-বিশেষের দ্বারা শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নরমুণ্ডের অনুকরণ নহে, তখন একান্ত নিশ্চিন্ত আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভগবানের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থ নমাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! এত বড় পাপী জগৎ সংসারে দ্বিতীয় আর জন্মে নাই। হিরণ্যকশিপু, শুম্ভ, নিশুম্ভ, শিশুপাল, প্রভৃতি দৈত্য দানবগণ ইহার তুলনায় ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাপানুষ্ঠানে সফলকাম হইয়া, তাহাকে ঈশ্বরের কৃপা জ্ঞানে নমাজ দ্বারা ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করা এবং ঈশ্বরকে পাপের সহকারী বলা একই কথা। এইরূপ নির্ভীক পাপী জগতে আর দ্বিতীয় জন্মিয়ার ইতিহাস আমি আজও পাঠ করি নাই।

দারার নির্য্যাতন তখনও শেষ হয় নাই, মৃত্যুতেও তিনি অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। যতই শত্রুতা থাকুক, মৃত্যুর পরে শত্রুর শবদেহের অবমাননা করিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা কোন সভ্য মানবের দ্বারা সম্ভব ইহা কল্পনা করিতেও সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। অন্ধ হস্তীর স্কন্ধে চড়াইয়া জীবিতাবস্থায় শৃঙ্খলবদ্ধ দারাকে দিল্লী সহর প্রদক্ষিণ করাইয়া ঔরঙ্গজীবের তৃপ্তি হয় নাই, তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার ছিন্নশির কবন্ধ দিল্লীবাসীর চক্ষুর সম্মুখে পুনরায় নগর প্রদক্ষিণের জন্য বাহির করা হইল। শুষ্ক শোণিতলিপ্ত শস্ত্রদীর্ণ, ছিন্নশির দারার দেহ দেখিয়া দিল্লীবাসী কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল ইহাও এক আশ্চর্য্যের বিষয়। পুরবাসী জনমণ্ডলী এবং ঔরঙ্গজীবের নিজ সৈন্যগণও এই অমানুষিক অত্যাচার—রাজপুত্রের শবদেহের এমন বীভৎস অবমাননা দেখিয়া, রাজপুরী আক্রমণ করতঃ পাষণ্ড আলমগীরকে হত্যা করিয়া, তাহার কবন্ধও দারার দেহের সহিত একত্রে নগর প্রদক্ষিণ করাইল না কেন, একথা বুঝা কঠিন। হস্তিনার অক্ষক্রীড়া সভায় দ্যূতপরাজিত দুঃশাসনকৃত পাণ্ডববধূ পাঞ্চালীর দুরন্ত অবমাননা দেখিয়া ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ ত্রিলোক বিজয়ী বীরেন্দ্রবর্গ অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কোষবদ্ধ অসি এবং বাণপূর্ণ তূণ কেবল তাঁহাদের বীরদেহের শোভা বর্দ্ধনই করিয়াছে, পাপের দণ্ড বিধানের জন্য সে অসি কোষমুক্ত হয় নাই, তূণের সে বাণ তূণেই রহিয়াছে—ইহাই ত দিল্লীর পুরাণ কথা, ঐতিহ্য বা কিংবদন্তী। সেই

দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দ মৃতদেহের অবমাননা দেখিয়া নীরবে অবস্থান করিবে বা গৃহকোণে গোপনে অশ্রু বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে। প্রাচী দিগ্‌বিভাগের অধিবাসিগণের অত্যাচার সহ্য করিবার ধৈর্য্য যে অপরিসীম ইহা ঐতিহাসিক সত্য, সেই জন্যই কালে কালে দিল্লী-রাজদণ্ড এমন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতে পারিয়াছে।

বাবরশাহ একদিন স্নেহবশে পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া নিজ দেহে লইয়া পুত্রকে রোগমুক্ত করতঃ স্বয়ং স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সেই বাবরের বংশধর ঔরঙ্গজীবের হস্তে পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, কেহই নিস্তার পায় নাই; স্নেহ প্রেম, দয়া করুণা, মায়া মমতা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি পাষাণের অজ্ঞাত—ইহাও এক অদ্ভুত ব্যাপার! তৈমুর এবং চেঙ্গীসের বর্ব্বরতা বহুপুরুষ পরেও ঔরঙ্গজীব উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতের কোমল মৃত্তিকা, মন্দমন্দ বায়ু এবং গঙ্গোদকে জন্মগত প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তনই ঘটাইতে পারে নাই।

কবন্ধের নগর প্রদক্ষিণ শেষ হইল, কিন্তু বাদশাহের মনোবাঞ্ছা তখনও পূর্ণ হয় নাই। প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং দারার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন তখনও শেষ হয় নাই। ভাগ্যহীন দারার দ্বিধা খণ্ডিত দেহ যখন সমাধিস্থ করা হইল, তখন মুসলমান প্রথানুযায়ী তাহা ধৌত, সুগন্ধার্চ্চিত, তৈলনিষিক্ত কিছুই করা হইল না। শুষ্কশোণিতাবলিপ্ত, কর্দ্দমাক্ত, ধূলিসমাকীর্ণ দেহ অতি অবজ্ঞ শবাধারে স্থাপিত করিয়া সমাধিগর্ভে প্রোথিত করা হইল। পুরোহিত মোল্লা মন্ত্রোচ্চারণ করিল না, শবের পশ্চাতে শোকযাত্রা করিয়া কেহ গেল না; সমাধিগহ্বরে একমুষ্টি মৃত্তিকা ফেলিবার অধিকারও কাহাকেও দেওয়া হইল না। ভারতের একচ্ছত্র অধীপ শাহানশাহ শাজাহানের জীবমানে তাঁহার আনন্দদুলাল দারার এইভাবে অবসান হইয়া গেল; বৃদ্ধপিতামহ হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের এক নিভৃত অংশে ভারতের ভাবী সম্রাট অবজ্ঞা ও অবহেলায় চিরশয়ন লাভ করিলেন।

উপসংহার

মৃত্যুর পরে সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, আনন্দ নিরানন্দ সমস্তই শেষ হইয়া যায় ইহাই অনেকের বিশ্বাস। আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, ইহজীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই শেষ হয় না, লোকান্তরে গিয়াও নিস্তার নাই, কৃতকর্ম্মজনিত সুখ দুঃখের ভোগ সর্ব্বত্রই আছে। এই শেষোক্ত মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দারা তাঁহার দেহত্যাগের পরেও দুঃখের হাত এড়াইতে পারেন নাই; তাঁহার লোকান্তরিত আত্মা, পুত্র সুলেমান ও সিপারের ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে মৃত্যু নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছে এবং গতজন্মের আত্মজের শোচনীয় অকাল মৃত্যু জানিতে পারিয়া নিশ্চয়ই ব্যথিত হইয়াছে। দারার দুরদৃষ্ট মৃত্যুর পরেও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গিয়াছে। জানিতে ইচ্ছা হয়, বিধাতা পুরুষ কি প্রকার লেখনী দ্বারা, কোন হস্তে, কি অক্ষরে দারার দুরপনেয় অদৃষ্টলিপি লিখিয়াছিলেন।

জয়সিংহ এবং দিলীর্ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় সুলেমান যখন সৈন্যবল হারাইয়া পিতার সাহায্যার্থ তাঁহার নিকট যাইতে পারিলেন না, তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে গাড়বাল রাজের আশ্রয়ে শ্রীনগরে থাকিতে হইল। শ্রীনগর-রাজ যে ঔরঙ্গজীবের ক্রোধকে উপেক্ষা করিয়া সুলেমানকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সময়ানুসারে ইহাই সুলেমানের যথেষ্ট সৌভাগ্য বলিতে হইবে। হিন্দু রাজগণের দ্বারা যখন যে কোনও দুষ্কার্য্য করাইতে হইয়াছে, কুচক্রী ঔরঙ্গজীব কুটিল জয়সিংহকেই দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। যশোবন্তের দ্বারা দারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন জয়সিংহের পরামর্শে, এবার শ্রীনগররাজ যাহাতে শরণাগত সুলেমানকে ঔরঙ্গজীবের হস্তে সমর্পণ করেন তাহার ভারও অর্পিত হইল সেই জয়সিংহেরই উপরে। কুটিল,

কুচক্রী, অনৃতবাদী, স্বজাতিদ্রোহী। জয়সিংহের চেষ্টা চলিতে লাগিল, শ্রীনগররাজ ক কখনও ভয় কখনও বাদশাহের প্রসাদলাভের প্রলোভন প্রদর্শন আরম্ভ হইল; কিন্তু সকলেই জয়সিংহ বা যশোবন্ত নহে। বৃদ্ধ শ্রীনগররাজ শরণাগত সুলেমানকে ঔরঙ্গজীবের হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। বাদশাহের কোপে যদি তাঁহার রাজ্য নাশ হয়, তাহাতেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পাষণ্ড জয়সিংহ সে দিকে অকৃতকার্য্য হইয়া, রাজমন্ত্রীকে প্রলোভনে বশীভূত করতঃ বিষপ্রয়োগে সুলেমানের জীবন নাশের ব্যবস্থা করাইলেন; ঔষধের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া সুলেমানকে দেওয়া হইল। ভাগ্যক্রমে সুলেমান বিড়ালকে সেই ঔষধ দেওয়ায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে ভেষজ বিষাক্ত। সেই কথা বৃদ্ধ রাজার কর্ণগোচর হইবামাত্র, আশ্রিতজনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধে তাহার বধ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইল; রাজাজ্ঞায় দুরাত্মা মন্ত্রীর শিরশ্ছেদ হইয়া গেল। কিন্তু জয়সিংহের চেষ্টার বিরতি নাই। তিনি শ্রীনগররাজের যুবাপুত্র, যিনি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, তাঁহাকে বশীভূত করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। জয়সিংহের কূটবুদ্ধির প্রভাবে যুবা রাজপুত্র প্রতারিত হইলেন, তাঁহার ধারণা হইল সুলেমানকে আশ্রয় দিয়া পিতা বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের বিরাগভাজন হইতেছেন, অতঃপর বাদশাহের সহিত কলহে রাজ্যধ্বংস, প্রাণনাশ সমস্তই ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং সুলেমানকে শ্রীনগর হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। শ্রীনগররাজ পৃথ্বীসিংহ, মোগল রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য সুলেমানের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; একে শরণাগত অতিথি, তাহার উপরে স্বীয় দুহিতার সহিত বিবাহ হইয়াছে, জামাতাকে যমের হস্তে সমর্পণ করিতে কে চাহে? পৃথ্বীর পুত্র মেদিনী সিংহ স্বার্থের জন্য ভগিনীপতিকে ঔরঙ্গজীবের হস্তে সমর্পণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। পিতাপুত্রে এই ব্যাপার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল, বৃদ্ধরাজার বাক্য অমান্য করিয়া মেদিনীসিংহ জয়সিংহকে পত্র লিখিলেন যে, শীঘ্রই সুলেমানকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সেই পত্র পাইয়া জয়সিংহের পুত্র কুমার রামসিংহ শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং মোগল ফৌজ, গাহড়বাল রাজ্যের সীমান্তের পথ ঘাট সমস্তই বন্ধ করিয়া রহিল—সুলেমান কোন মতে পলায়ন করিতে না পারেন। নিজ শ্যালকের পাপমন্ত্রণার কথা সুলেমানের অজ্ঞাত ছিল না, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া লাদাকে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গী মাত্র সপ্তদশ সংখ্যক অনুচর এবং ধর্ম্মভ্রাতা। পাষণ্ড মেদিনীসিংহ এই পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুলেমানের পশ্চাতে গাহড়বাল রাজ্যের ফৌজ প্রেরণ করিল এবং পার্ব্বত্য পথে অনভ্যস্ত সুলেমান অধিক দূর না যাইতেই, পাহাড়ী সৈন্যগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। সুলেমান এবং তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা মহম্মদশাহ নিতান্ত কাপুরুষের মত বিনা বাধায় ধরা না দিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন —সম্বল মাত্র সপ্তদশ সংখ্যক সমভিব্যাহারী সৈন্য। প্রভুপরায়ণ এই মুষ্টিমেয় অনুচর প্রভুর রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের নেতা সুলেমান এবং তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা মহম্মদ। ঔরঙ্গজীব দারা, সুজা, মুরাদের সহোদর ভ্রাতা, সহোদর হইয়া সহোদরগণকে পাষণ্ড কি নৃশংসভাবে হত্যা করাইয়াছে! আর সুলেমানের সহোদর নহে, শোণিত সম্বন্ধ কিছুই নাই, অথচ সপ্তদশ জন সৈনিক মাত্র সহায় করিয়া মহম্মদশাহ ধর্ম্মভ্রাতার রক্ষার্থে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে! মানুষে মানুষে কি প্রভেদ! পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা পৃথ্বীসিংহের সহিত সুলেমানের কোন সম্বন্ধই ছিল না; স্বীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুলেমানকে আশ্রয় না দিলেও বিশেষ নিন্দার কথা ছিলনা; এই পৃথ্বী শরণাগত সুলেমানের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। আর যে জয়সিংহের সর্ব্বস্বই মোগল সম্রাট শাজাহানের

অনুকম্পায়, সেই বৃদ্ধ রুগ্ন সম্রাট শাজাহানের, পাষণ্ড পুত্র কর্ত্তৃক নিদারুণ নিগ্রহ, সেই জয়সিংহ নিতান্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সহাস্যমুখে দেখিল এবং প্রতিবাদের একটি বাণীও উচ্চারণ করিল না। কেবল তাহাই নহে, যাহার রক্ষার্থ শাজাহান এবং দারা জয়সিংহকে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সুলেমানকে অকারণে বিপদ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ঔরঙ্গজীবের পতাকা নিয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দারার সর্ব্বনাশ সাধন শেষ করিয়া নবোদ্যমে সুলেমানের বধের ব্যবস্থার জন্য এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া সোৎসাহে ধাবমান হইয়াছে! রাজপুতকুল কুলাঙ্গার জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র; দারার শোণিত পান করিয়া ইহাদের পিপাসা শান্ত হয় নাই। পিতাপুত্র ধাবমান হইয়াছেন সুলেমানের তপ্ত রক্ত পানের লালসায়! পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা পৃথ্বীর সহিত তুলনায় সুসভ্য রাজবাড়ার এই পিশাচদ্বয়কে নরকের কুক্কুর বলিলেও ইহাদের যথাযথ বর্ণন হয় না। পৃথ্বীও রাজপুত, জয়সিংহও রাজপুত, উভয়েই হিন্দু কিন্তু রাজপুতে রাজপুতে, হিন্দুতে হিন্দুতে কি প্রভেদ!

অসম যুদ্ধের ফল যাহা হয় তাহাই হইল। ধর্ম্ম ভ্রাতার রক্ষার্থ মোহাম্মদ শাহ রণক্ষেত্রেই অসিহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, সপ্তদশ সৈনিকের অধিকাংশই রণমৃত্যু লাভ করিল। শস্ত্রাহত সুলেমান গাড়োয়াল বাহিনীর হস্তে বন্দী হইয়া রামসিংহের করে সমর্পিত হইলেন। যথাকালে রামসিংহ তাঁহাকে দিল্লীর সেলিমগড় দুর্গে আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া বাদশাহকে সংবাদ দিল। সেলিমগড়ে দুই দিবসকাল অবরুদ্ধ রাখিয়া, তৃতীয় দিবসে বাদশাহের সম্মুখে সুলেমানকে আনা হইল। ঔরঙ্গজীব দেওয়ানখাসে "বার দিয়া" বসিয়াছেন; পাত্র মিত্র সভাসদ মন্ত্রী মোল্লা কাজী সকলে পদ মর্য্যাদানুসারে নিজ নিজ স্থানে উপবিষ্ট। স্বয়ং বাদশাহ দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় মণিময় ময়ূরতক্তে সমাসীন। মহার্ঘ পরিচ্ছদধারী সশস্ত্র শরীররক্ষগণ সিংহাসন সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া সদর্পে সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। এমন সময়ে শাজাহান বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র—চিরাচরিত প্রথানুসারে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট সুলেমান, প্রহরিবেষ্টিত অবস্থায় সভাতলে সমানীত হইলেন। তাঁহার করচরণের লৌহ শৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। মোগল বাদশাহের বংশে সেই সময়ে সুলেমান অপেক্ষা সুন্দরকায় যুবা আর কেহ ছিল না—তাঁহার মদনমনোহর মূর্ত্তি, নবোদ্ভিন্ন যৌবনশ্রী এবং বীরখ্যাতি, পাত্রমিত্রগণের মধ্যে অধিকাংশকেই সুলেমানের পক্ষপাতী করিয়াছিল এবং যাঁহার একদিন যথাসময়ে ঐ কক্ষে ময়ূর সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড পরিচালিত করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাকেই নিগড়বদ্ধ পদে অপরাধীর ন্যায় কক্ষতলে দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলেই গোপনে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। ঔরঙ্গজীবের অন্তঃপুরচারিণী নারীবর্গের মধ্যে অনেকে করুণায় বিগলিত অন্তর হইয়া উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের যে অবস্থা, সুলেমানের অবস্থা তদ্রূপ; তাঁহার করচরণ শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলে, হয়ত সেই কক্ষতলে ময়ূর সিংহাসনের উপরেই ঔরঙ্গজীবকে তদ্দণ্ডে আক্রমণ করিয়া, সুলেমান দারার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেন। কিন্তু উপায় নাই—হস্ত পদ বদ্ধ, পিতৃঘাতী শত্রুকে সম্মুখে পাইয়াও তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না, আনায়বদ্ধ সিংহের ন্যায় কেবল রোষ কটাক্ষে ঔরঙ্গজীবের দিকে চাহিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলের মনোভাব বুঝিয়া সুলেমানকে কোন রূঢ় কথা বলিতে ঔরঙ্গজীবের সাহস হইল না, কপটী কপট স্নেহের ভান করিয়া মিষ্ট স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, তোমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, তুমি আশ্বস্ত হও; দারা ধর্ম্মচ্যুত কাফের হইয়াছিল বলিয়া মোল্লাগণ তাঁহার মৃত্যুব্যবস্থা করিয়াছিল। তোমার সে ভয় নাই—সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর একমনে নির্ভর কর।"

দুরাত্মা বিষপ্রয়োগে সুলেমানকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, অথচ পবিত্র ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছে যে, তাহার কোন ভয় নাই। এমন সর্ব্ব পাপে কুণ্ঠাহীন কপট ধর্ম্মধ্বজী জগতে আর কেহ কখনও দেখে নাই! মোগল বাদশাহগণের প্রথা ছিল, যাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হইবে না, তাহাকে অহিফেন মিশ্রিত এক প্রকার পানীয় প্রতিদিন প্রত্যূষে পান করিতে দেওয়া হইত, সেই পানীয়ের প্রভাবে দিনে দিনে দণ্ডিত ব্যক্তি বিশীর্ণ কলেবর হইয়া অবশেষে প্রাণে মরিত। সুলেমান জানিতেন যে, যে ভণ্ড কপটী মিথ্যাবাদী পাষণ্ড ঔরঙ্গজীব সহোদরকে হত্যা করিয়াছে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করা তাহার পক্ষে কিছুই নহে এবং অহিফেন মিশ্রিত পানীয় তাহাকে দিবার সঙ্কল্প মনে করিয়াই ওরূপ কপট স্নেহের মিথ্যা আশ্বাস বাক্য বলিতেছে। পলে পলে ক্ষীণ কলেবর দুর্ব্বল পদক্ষেপে সমাধি গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার ক্লেশ অপেক্ষা এক নিমেষের মৃত্যু শতগুণে শ্রেয় মনে করিয়া সুলেমান, সিংহাসনাধিষ্ঠিত পিতৃব্যকে সসম্মানে কুর্ণীশ করিয়া কহিলেন, যদি তাঁহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাই হইয়া থাকে তাহা হইলে ফণী-ফেন মিশ্রিত "পোস্তা" পান করিতে না দিয়া, ত্বরিত মৃত্যুর কোনরূপ ব্যবস্থা করা হউক; বিষাক্ত পানীয়ের প্রভাবে বিশীর্ণ দেহ, বিগতেন্দ্রিয়, বিলুপ্ত-বুদ্ধি জড়ভরত হইয়া পলে পলে পরলোকের পথে পদচারণার দুঃসহ ক্লেশ তাঁহাকে না দেওয়া হয়। ঔরঙ্গজীব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কাপট্য অবলম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আশ্বাস বাণী কহিতে লাগিলেন—"ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আল্লার নামে শপথ করিয়া কহিতেছি, পোস্তা তোমাকে পান করিতে দেওয়া হইবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হও।" পবিত্র আল্লার নাম তারস্বরে বারংবার গ্রহণ করিয়া সভাস্থ সকলকেই আশ্বাস বাণী শুনান হইল। কিন্তু অনৃতভাষী কপটচূড়ামণি ঔরঙ্গজীবকে যাহারা জানিত, তাহারা কেহই সে আশ্বাস বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। তাহারা বুঝিল দারাকে যে পথে প্রেরণ করা হইয়াছে, সুলেমানকেও সেই পথেই যাইতে হইবে—প্রভেদ মাত্র এই যে, দারার নিমেষার্দ্ধে শিরশ্ছেদ হইয়াছে, সুলেমানের 'পোস্তা' পানই বিধিনির্ব্বন্ধ।

ঔরঙ্গজীব

মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহাদিগকে কারাগারে থাকিতে হইবে, সে সকল

বন্দীকে গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। সুলেমানকে গোয়ালিয়র দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ হইল। প্রহরী-পরিবেষ্টিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী সুলেমান চির আনন্দের কল্লোল মুখরিত দিল্লীর ইন্দ্রভবন চিরদিনের জন্ম ত্যাগ করিয়া, গোয়ালিয়র দুর্গে গাঢ়তমসাবৃত কারা কক্ষের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নিত্য প্রভাতে 'পোস্ত' পান করিবার পরে অপর খাদ্য দেওয়া হইবে, নতুবা, অনশন ব্যবস্থা, ইহাই চিরাচরিত বাদশাহী বিধি। সুলেমানের সম্বন্ধেও সেই বিধান হইল। কোথায় রহিল ঔরঙ্গজীবের আশ্বাস বাণী, কোথায় রহিল সে পাষাণের ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া শপথ, কোথায় রহিল দুরাত্মার মক্কাভিমুখী হইয়া পাঁচ 'ওক্তেম' নমাজ। দিনে দিনে দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তি অন্তর্হিত হইতে লাগিল, মন মস্তিষ্ক চেতনা জড়িমাযুক্ত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে সুলেমান সমাধি গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন; পিশাচ পিতৃব্যের কবল হইতে মহাকাল তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া মৃত্যুর শান্তিময় রাজ্যে লইয়া গেল, যেথানে তাঁহার অপেক্ষায় জননী নাদিরা এবং জন্মদাতা দারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুলেমানের অভিনব যৌবন, মদনমনোহর কান্তমূর্ত্তি এবং যথাকালে প্রাপ্তব্য ভারতের একাতপত্র প্রভুত্ব সমস্তই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। আর রহিল দারার পক্ষপাতী প্রজাপুঞ্জের দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ও আকুল অশ্রুর অফুরন্ত উৎস।

ঔরঙ্গজীবের রাজসভায় দারার ছিন্নমুণ্ড প্রদর্শন

সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী শাহানশাহ বাদশাহ শাজাহানের পুত্র পৌত্রের পরিণামের ন্যায় উৎকট দুঃখের পরিণাম ইতিহাস অন্বেষণ করিলে আর পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ এবং ঔরঙ্গজীবের মত স্বজনহন্তা, সর্ব্বপাপ-পরায়ণ, সর্পবৎ ক্রুর, অনৃতভাষী, দুরাত্মা নরপতি পৃথিবীর আর কোনও রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসিয়াছে কিনা জানি না। দারার দুর্ভাগ্য যে, তিনি ঔরঙ্গজীবের

সহোদর হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন—ঘাতকের অসি মুখে প্রাণ বিনাশ করিয়াও দুরাত্মা ঔরঙ্গজীবের দারার প্রতি ক্রোধের উপশম হইল না, ভারত সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি হইয়াও পরলোকগত জ্যেষ্ঠকে সেও ক্ষমা করিতে পারিল না, তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কারাগারেও জীবিত রাখা ঔরঙ্গজীবের পক্ষে সম্ভব হইল না তাহাদিগকে বিষ প্রয়োগে বিনাশ করিয়াও পিশাচাধমের ক্রোধের শান্তি হইয়াছিল কিনা তাহা সেই পাষণ্ডই জানিত। পরলোক হইতে বংশধরগণের অপঘাত মৃত্যু দেখিবার পরে, রাজপুত্র দারার দুরদৃষ্টের অবসান হইল।

সমাপ্ত

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

ত্রিবেণী

ত্রিবেণী হুগলী জেলার মধ্যে বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান। মহাভারতে ত্রিবেণী দক্ষিণ প্রয়াগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের "প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে"—"দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের সন্নিকটস্থ গ্রাম হইলেও তাহা তৎসংলগ্ন অভিন্ন স্থান রূপে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রেমনাম প্রচার করিতে সপ্তগ্রামে আসেন। বৃন্দাবন দাস তদুপলক্ষে "শ্রীচৈতন্য ভাগবতে" এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে॥
সে সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় যাঁহার দর্শনে॥

কান্যকুব্জের প্রিয়বন্ত রাজার সপ্তমহর্ষি সন্তান অগ্নিত্র, ইমণক, তপিসন্ত, স্বরবান, বরাট, সবন এবং দ্যুতিমন্ত সরস্বতী-তীরে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাভাগবত পুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরিদ্বার হইতে দেবী সুরধুনী যাত্রা করিলে তৎ সমভিব্যাহারে সপ্তর্ষি মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ বঙ্গে শুভাগমন করিয়া ত্রিবেণী সপ্তগ্রামে নদীতীরে আম্রকাননে অবস্থান করিয়া দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দেবদুর্লভ দেবী সুরধুনীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা শঙ্খধ্বনি সহ সম্বর্দ্ধনা করিয়া দেবীর প্রীতি সাধন করেন।

কেহ কেহ বলেন সপ্তগ্রাম বলিলে পূর্ব্বে নিম্নলিখিত সাতটী গ্রামের সমষ্টি বুঝাইত :—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। ত্রিবেণী সপ্তগ্রামেরই অঙ্গীভূত ছিল, পৃথক অস্তিত্ব ছিল না নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

সপ্তগ্রাম দেখি প্রণময়ে দূর হইতে॥
সপ্তঋষি—তপস্যার স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী ধারাত্রয়॥
সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে॥

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রাকালীন

পথের বিবরণে সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে কবি মুকুন্দরাম "চণ্ডী" গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"সপ্তগ্রামের বণিক সব কোথায় না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান দান করিল শ্রীপতি॥"

গাজী দরাফ (বহির্ভাগ)

ত্রিবেণী পাশ্চাত্য দেশেও এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্লিনি (Pliny) এবং টলেমী (Pto'emy) প্রভৃতি ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট ফারোক্‌শিয়ারের নিকট ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে দূত প্রেরণ করেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে যখন দূতেরা প্রত্যাগমন করেন তখন ত্রিবেণীতে মহাসমারোহে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হয়। হুগলী কাউন্সিলের সভাপতি রবার্ট হেজেস্ এবং চারিজন সদস্য অভ্যর্থনা করিবার জন্য ত্রিবেণীতে আগমন করেন। দূত ছিলেন কুঠীয়াল জন সারমান্ এবং ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন্ সার্জ্জন। হ্যামিল্টন সম্রাট ফারোকশিয়ারকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া লন।

পর্যটক টীবরিনাঁস ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে নও-সরাই হইতে পদব্রজে ত্রিবেণীতে আগমন করেন। তিনি পথে একটী মসজিদ ও সমাধিস্থান দেখিয়াছিলেন লিখিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেইটী গাজী দরাফ। তিনি ত্রিবেণীকে "তারবুনী" (Terboonee) আখ্যা দিয়াছেন। এখনও সাধারণ লোকে "তিরপুনী" বলিয়া থাকে।

মুসলমান অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে ত্রিবেণী উড়িষ্যার কেশরী বংশের নৃপতিদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। নরপতি মুকুন্দ দেব ত্রিবেণী ঘাট ও "বেণীমাধব" শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

বাঁশবেড়িয়া দুর্গের প্রবেশদ্বার

আশ্চর্য্যের বিষয় ত্রিবেণীর ন্যায় মহাপুণ্য ক্ষেত্রে একটিও উল্লেখযোগ্য দেবালয় নাই। ত্রিবেণী এবং সরস্বতীর তীরে অনেক দেবমন্দির ছিল, তবে কি সেগুলি বিধর্ম্মীগণ কিংবা নরাধম কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বা কালের কঠোর প্রভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে?

ত্রিবেণীর একটী সুবৃহৎ মন্দির মুসলমানদিগের মসজিদ রূপে পরিণত হইয়াছে সেইটী পূর্ব্বোক্ত গাজী দরাফ। গাজী দরাফ্ পূর্ব্বে যে হিন্দু দেবমন্দির ছিল সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। চারিটী প্রশস্ত প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ দেবমন্দির সমূহ বিরাজ করিত।

গাজী দরাফ

পাণ্ডুয়া বিজয় স্তম্ভ (পেঁড়োর মন্দির)

কয়েকটী ভগ্নসোপান অতিক্রম করিয়া প্রথম প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে উত্তরদিকে দুইটী প্রকোষ্ঠ সম্বলিত প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবেশ দ্বার ও প্রাচীর প্রস্তরফলকে গ্রথিত। দেবালয়ের গঠন প্রণালীর দৃঢ়তা দেখিলে অবাক হইতে হয়। মুসলমান আক্রমণ ও অত্যাচার এবং সর্ব্বধ্বংসী কালকে উপেক্ষা করিয়া আজিও সেই প্রাচীর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রস্তর সরাইয়া দ্বারগুলি মিশর দেশীয় দ্বারের ন্যায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। দ্বারের প্রত্যেক দিকের অভ্যন্তর ভাগ ছয় হস্ত পরিমিত লম্বা এক এক খণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রথম প্রকোষ্ঠের একটী সুবৃহৎ গবাক্ষ ভাগীরথীর দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। গবাক্ষের বহির্ভাগের কারুকার্য্য পরিষ্কার ও সুন্দর। সেই প্রকোষ্ঠে পূর্ব্ব খাদিম দিগের সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গনের সম্মুখে আর একটী প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গঠন প্রণালী ভিন্ন প্রকারের। মুসলমানদিগের কঠোর হস্তে এই মন্দিরটি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। কয়েকটি মন্দির স্তম্ভ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেগুলি প্রাচীন কালের বলিয়া স্পষ্টই অনুভূত হয়। একটী স্তম্ভে দেবনাগরী অক্ষর ক্ষোদিত রহিয়াছে, বহুকষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করা যায়। মার্শম্যান সাহেব অনুমান করেন মন্দিরটী ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মার্শম্যান সাহেবের অনুমান যে ঠিক নহে, খোদিত লিপিগুলি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জাফর খাঁ বা দরাফ্ খাঁর সমাধিস্তম্ভ ৭১৩ হিজরী বা ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরগুলি কিরূপে মুসলমান দিগের হস্তগত হইল, তৎসম্বন্ধে নানা প্রবাদ মূলক গল্প প্রচলিত আছে। মসজিদে অদ্যাপি যে কুর্শীনামা (বংশতালিকা) রক্ষিত আছে. তাহা হইতে জানা যায় যে শাহ জাফর খাঁ গাজী তদীয় ভাগিনেয় শাহসুফীকে সমভিব্যাহারে লইয়া চাকলা মুকসুসাবাদ, পরগণা কোনওয়ার পর্ত্তুপের অন্তর্ভুক্ত মুন্তর্গাও হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ এই স্থানে আগমন করেন। দরাফ্ খাঁ মহানাদের অধিপতি মান-নৃপতিকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। হুগলীর রাজা ভূদেবের সহিত এক যুদ্ধে মাননৃপতি হত হন। তাঁহার মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তাঁহার দেহ

ত্রিবেণীতে সমাহিত হয়। শাহ জাফর খাঁ গাজীর পুত্র আগোয়ান খাঁ সরকার সপ্তগ্রামের অধীন হুগলীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয়লাভ করেন। আগোয়ান খাঁ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং রাজাকে সবংশে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। রাজকন্যা এবং আগোয়ান খাঁ ত্রিবেণীতেই মৃত্যুমুখে পতিত ও সমাহিত হন। ফিরোজ শাহ ইহাদিগকে "খাঁ" উপাধি প্রদান করেন।

জাফর খাঁ গাজী ও তদীয় ভাগিনেয় অন্য উদ্দেশ্যে ত্রিবেণীতে আগমন করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ার মসজিদ ও স্তম্ভ শাহ সুফী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। শাহ সুফী দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জাফর খাঁ গাজীর ভাগিনেয়। পাণ্ডুয়ার মসজিদের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বের আমলা সংক্রান্ত একখানি দলিল আছে। জাফর খাঁর ত্রিবেণী মসজিদ পাণ্ডুয়া মসজিদের সমসাময়িক, সুতরাং মাতুল ও ভাগিনেয় যে একই সময়ে একই উদ্দেশ্য সাধন জন্য এ প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। দিল্লী হইতে ইঁহাদের আগমনের কারণ এইরূপ কথিত আছে। ত্রিবেণীর চারি ক্রোশ পশ্চিমে মহানাদ নামক স্থানের হিন্দুরাজার জনৈক মুসলমান প্রজা, পুত্রের মঙ্গলার্থে গোহত্যা করিয়া গোমাংস ব্যবহার করিয়াছিল। হিন্দুরাজা এই সংবাদ পাইয়া মুসলমানের পুত্রকে বধ করিবার আদেশ দেন। আদেশ প্রতিপালিত হইলে মৃত বালকের পিতা দিল্লীতে সম্রাট ফিরোজ শাহের নিকট উপস্থিত হইয়া ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে। সম্রাট মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে জাফর খাঁ ও শাহ সুফীর অধীনে এক দল সেনা প্রেরণ করেন। মহানাদের রাজার নাম মান নৃপতি। জাফর খাঁ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। কিন্তু পরাভূত করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। মুসলমানেরা দেখিত যে আজ যে সেনাপতি যুদ্ধে হত হইল, পরদিন সে আবার যুদ্ধ করিতেছে। অনুসন্ধান দ্বারা তাহারা জানিতে পারিল মহানাদের বশিষ্ঠ গঙ্গার সঞ্জীবনী শক্তির বলে এইরূপ ঘটিতেছে—ইহার শক্তি নষ্ট না করিতে পারিলে যুদ্ধ জয়ের কোনও আশা নাই। প্রতীকারকল্পে তাহারা এক ফকীরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই বশিষ্ঠ গঙ্গা নামক সরোবর বশিষ্ঠের স্থাপিত, ইহাতে দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া ইহার জলের সঞ্জীবনী শক্তি ছিল, মৃতব্যক্তি প্রাণ পাইত।

মহানাদ যুদ্ধ ও বশিষ্ঠ গঙ্গা

বেণ্ডটা সার্কিট হাউস

কথিত আছে ফকীরডাঙ্গা নিবাসী রাজমল্লিক নামক জনৈক মুসলমান ফকীর বশিষ্ঠ গঙ্গায় গোমাংস নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করায় বশিষ্ঠ গঙ্গার সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হয়। গোমাংস নিক্ষেপ কালে বশিষ্ঠ গঙ্গা হইতে সূচীভেদ্য ধূমস্তম্ভ উদ্গত হইয়া, 'রাম' 'রাম' শব্দে দিক্ পূর্ণ, এবং ঘন ঘন ভূকম্পন হইয়াছিল।*

জাফর খাঁ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ ও হিন্দুরাজত্বের বিনাশ সাধন করিয়াও পরিশেষে দেবী সুরধুনীর কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন ও হিন্দুদের নিকটে পূজনীয় হইয়াছিলেন।

তাঁহার গঙ্গামাহাত্ম্য উপলব্ধি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। একদা জাফর সন্ধ্যার সময় এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সে সময় তিনি বৃক্ষোপরি দুই জন অশরীরী আত্মার কথোপকথন শুনিতে পান। একজন অপরকে বলিতেছিল, "তুমি তো শীঘ্রই অন্য লোকে চলিয়া যাইবে; আমি একা থাকিব কি করিয়া?" অপর জন বলিল, "তোমায় একা থাকিতে হইবে না—অমুক ব্রাহ্মণের গোরক্ষক কল্য বৃষশৃঙ্গে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, অপঘাত মৃত্যুজন্য সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই খানে আশ্রয় লইবে।" জাফর ব্রাহ্মণকে গিয়া অবিলম্বে সতর্ক করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণও গোরক্ষককে সারা দিন বাটীর বাহির হইতে দিলেন না—কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র, বৃষশৃঙ্গে আহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। জাফর কৌতূহল পরবশ হইয়া সন্ধ্যার পর সেই বৃক্ষতলে আসিয়া অশরীরী আত্মাদের কথোপকথনে জ্ঞাত হইলেন যে, বৃষের শৃঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লাগিয়া ছিল, সেজন্য গঙ্গামাহাত্ম্যে সে উদ্ধার লাভ করিয়াছে, প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর হইতেই জাফর গঙ্গাদেবীর কৃপালাভের আশায় সাধনা আরম্ভ করেন।

তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া গঙ্গা দেবী সলিল হইতে উত্থিত হইয়া সশরীরে ভক্ত জাফরকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। জাফর খাঁ দেবীর কৃপায় হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি মনের আবেগে যে স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ভক্তির সহিত পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। দরাফ খাঁর স্তোত্রের এই কয় ছত্র কে না জানে?

> সুরধুনী মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
> স তরতি নিজ পুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্বম্।
> যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্
> তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্॥

জাফর খাঁ বা দরাফ্ খাঁর স্থাপিত কুঠার পূর্ব্বোক্ত মসজিদের পূর্ব্বদিকের গবাক্ষের বহির্ভাগে স্থাপিত আছে।

"গাজীর কুড়ুল"

এই কুঠারকে লোকে "গাজীর কুড়ুল" বলে। এই কুড়ুল উপলক্ষে এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। অলস ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া লোকে বলে "যেন গাজীর কুড়ুল, নড়ে চড়ে, পড়ে না।"

শিশুর মনে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য এদেশের জননীগণ "বর্গী এল দেশে" ইত্যাদি শ্লোকটি সুর করিয়া গাহিয়া থাকেন। শ্লোকটি নিতান্ত কল্পনা-প্রসূত নহে—প্রকৃতই বর্গীদের অত্যাচারে এ প্রদেশ এক দিন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—এমন কি বঙ্গের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাদিগকে "চৌথ" বা বঙ্গদেশের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব প্রদান করিয়া দেশে শান্তি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্গীরা কয়েকবার হুগলী সপ্তগ্রাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল, কিন্তু ত্রিবেণী প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা বংশবাটীতে রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়ের দুর্গাভ্যন্তরে ধনরত্নের সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কয়েক বারই রক্ষা পাইয়াছিল।*

বর্গীর হাঙ্গামায় ত্রিবেণী

(আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়।

* এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত "হুগলী কাহিনী" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।—লেখক।

* It had a fort mounted with four pieces of cannon and surrounded by a trench; when the Marhattas came near Triboni, that people fled hither for protection."—Hunter's Statistical Account of Bengal Vol III and Gazetteer of India Vol I·

কর্ত্তব্য

(গল্প)

"মাধুরী, পাণ নিয়ে আয় ত দিদি!"

খয়ের রঙের শাড়ী পরিহিতা একটী কিশোরী জার্ম্মান সিলভারের ডিবায় করিয়া গুটিকতক পাণ আনিয়া দাদুর সম্মুখে রাখিল।

"এঁকে প্রণাম কর—তোমার জ্যেঠামহাশয় হন। তোমার বাবাকে ইনি ছোট ভাইয়ের মত দেখ্‌তেন।"

সম্মুখে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটীকে প্রণাম করিয়া ধীর পদে মাধুরী বাহির হইয়া গেল।

দুটী পাণ হাতে নিয়া হরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি রমণের মেয়ে?"

করুণকণ্ঠে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ বাবা—ওকে আঁতুড়ে রেখে মা মরে গেল—বছর না ঘুরতে ওর বাবা আমার হাতে ওকে তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। তখন এর মুখ দেখেই সব দুঃখ ভুলে ছিলাম, এখন দেখছি সে আমার বুকে শুধু ভার চাপিয়ে দিয়ে গেছে।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হরিশবাবু বলিলেন, "বিয়ে হয় নি?"

"কৈ আর হল? আজকাল মেয়ের রূপ গুণের দিকে কেউ আর চায় না, বাপের পকেটের দিকেই তাদের নজর! আমার অবস্থা জান ত? সেই পেন্সনের টাকা ক'টি সম্বল। তাই আর কেউ এগোয় না। একটা সম্বন্ধ এসেছিল,—ছেলেটী পাটের আপিসে না কোথায় চাকরী করে, তা মেয়ে দেখে বল্লে রংটা যখন সোণার মতন নয়, তখন সোণা দিয়ে অভাব পোরাতে হবে। কাযেই আমাকে পিছিয়ে যেতে হল।—মাধুরী আমার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ না হোক, কালো নয় তো। আর; মুখশ্রীতে ওর যোড়া মেলা ভার। কিন্তু তাতে কি কেউ ভোলে?"

হরিশবাবু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তা সত্যি।"

করুণাবাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "টাকা না থাকলে মেয়ের সুপাত্রের আশা নেই। ও পাড়ার বোস্‌জা মশাই তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছেন, নিত্যি অসুখ,—তিনিই বার বার ঘটক পাঠাচ্ছেন। তা, টাকা নেই বলে কি আমার প্রাণও নেই? ঐ ঘাটের মড়ার হাতে মেয়ে দিতে যাব? তাই বলাতে সেদিন ও বাড়ীর দাদা কত কথা শুনিয়ে দিয়ে গেলেন। "বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ নাকি! এর চেয়ে কি ভাল পাত্র জুটবে?" তার পর তিনিই আবার একটা সম্বন্ধ জুটিয়েছেন—দোজবরে ছেলে, বিষয় আশয় আছে, দোষের মধ্যে একটু মাতাল। আগের বৌকে কি করে মেরেছিল তাও আমরা জানি—কিন্তু কি করব? উপায় নেই, শেষকালে হয়ত ওর হাতেই মেয়ে দিতে হবে।" এক ফোঁটা চোখের জল কোঁচার খুঁটে মুছিয়া করুণাবাবু আবার বলিলেন—"ছেলে মেয়ে দুইই বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করতে হয়; কিন্তু মেয়ে নিয়ে এত ভুগতে হয় বলেই বুঝি মেয়েতে লোকের এত বিরক্তি।"

হরিশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ব্যথিত ভাবে বলিলেন—"আপনি চিন্তা করবেন না, মাধুরীকে আমিই নেব। আমার মেজো ছেলে এখন বি-এ, পড়ছে; আপনি দেখেছেন ত? মাধুরী তার অযোগ্য হবে না।"

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় গলিয়া করুণাবাবু হরিশবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন—"ওকি বলছো? মাধুরী তোমাদের যোগ্য হবে কিনা তাই বল। তুমি ওকে নেবে? কি বলবো! আমায় যেমন সুখী করলে তেমনি—"

"এত কৃতজ্ঞ হচ্ছেন কেন? এমন লক্ষ্মীকে কে আদর করবে না?"

তারপর আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া হরিশবাবু বিদায়

লইলেন। বলিয়া গেলেন, বাড়ী গিয়া চিঠিতে আর সব ঠিক হইবে।

কিছুক্ষণ পরে মাধুরী ঘরে ঢুকিয়া দেখিল দাদা-মহাশয় চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি ডাকিলেন—"মাধুরী!"

"কেন দাদু?"

"আমার কাছে বোস।"—ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার ডাকিলেন—"দিদি।" মাধুরী হাসিয়া বলিল—"খালি খালি ডাকচো কেন দাদু?"

"তোকে যে পর করে দিচ্চি ভাই! এই বুড়োটার কি হবে বল্ ত?"

মাধুরী বলিল—"যাও ওরকম বলো না দাদু!"

করুণাবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"সত্যি ভাই—দেখ্ ছিস নে, আনন্দ রাখ্‌তে পারছিনে, দিদি ভাই! আজকের দিনে তোর বাবা কোথায় রে?" মাধুরী কাঁদিয়া দাদুর বক্ষে মুখ লুকাইল।

২

হরিশবাবুকে বাহিরের লোক বুদ্ধিমান এবং সহৃদয় বলিয়া প্রশংসাই করিত, কিন্তু তাঁহার গৃহিণী বলিতেন এমন কাঁচা মানুষ সংসারে আর দুটী নাই। তাঁর প্রধান দোষ, লোকের দুঃখ দেখিলে প্রাণপণে তাহা মোচন করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু গৃহিণী ইহাই বেশী অপছন্দ করিতেন। "কেনরে বাবু, যার ভাগ্যে যা আছে সে তা ভুগিবেই—তাতে অন্যের কি?" এই ছিল তাঁর মত।

তাই আজ ছেলের সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিয়া নিতান্ত ভীতস্বরে হরিশবাবু ডাকিলেন—"গিন্নি শুন্‌চ?" গৃহিণী তখন বারান্দায় রোদে বসিয়া বড়ি দেওয়ার জন্য ডাইল ফেনাইতেছিলেন। কর্ত্তার ডাক শুনিয়া হাতখানি বাটীর ধারে কাঁচাইয়া উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—"তুমি কখন এলে?"

"এই মাত্র আসছি। শোন, বিভূতির সম্বন্ধ ঠিক করে এলুম!"

"ওমা সে কি কথা? কথাবার্ত্তা একেবারে ঠিক? কোথায় গো?"

হরিশবাবু বলিলেন, "কলকাতায় গিয়ে করুণাবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি আমায় না খাইয়ে ছাড়লেন না। তাঁরই নাতনী—দেখে ভারী পছন্দ হ'ল। রূপে গুণে লক্ষ্মী। বড় বৌ সুন্দরী নয় বলে তোমার যে দুঃখ ছিল, সে খেদ এবার মিটিয়ে দিচ্ছি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবে থোবে কি রকম?"

"সে সব কথা হয়নি ত। আর টাকা নেওয়াটা কি ভাল? কি বল? যাদের অভাব আছে তারা নেয় নি'ক, আমরা কেন কসাই হতে যাব?"

"তা সত্যি! ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অভাব নেই। অপরের কাছে থেকে দু'দশ টাকা নিয়ে কত আর বাড়বে? তা, জিনিস পত্তর, গা-ভরা গয়না দেবে ত? একেবারে ডোমের চুপড়ী ধোয়া মেয়েও ত ঘরে আনতে পারি নে।"

হরিশবাবু বলিলেন, "দেবে বই কি! ঐত একটী মেয়ে; যথাসাধ্য দেবে নিশ্চয়ই। ওর জন্য তুমি ভেবো না। সব ঠিক হবে।"

৩

শুভদিনে মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল। করুণাবাবু চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিভূতির হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাঙালের ধন তোমার হাতে তুলে দিলুম, দেখো ভাই ও যেন দুঃখ না পায়।"

যাত্রাকালে মাধুরী বড় কাঁদিল। করুণা বাবু বলিলেন, "কেন ভাই, নিজের ঘরে যাচ্ছিস, তার চেয়ে আনন্দ কি আছে? অশীর্ব্বাদ করছি, সেই ঘর তোর অক্ষয় হোক। আজকের দিনে কাঁদতে নেই।"

মাধুরী বারণ মানিল না। শ্বশুর বাড়ী যাইতেছে বলিয়া ত তার দুঃখ নয়। দাদুকে যে সে একা ফেলিয়া যাইতেছে! কে তাঁকে দেখিবে?

অবশেষে ট্রেণের সময় হইল। মাধুরী ধীরে ধীরে দাদুকে

প্রণাম করিল গাড়ীতে উঠিল। করুণা বঁধু এবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন।

যথা সময়ে বর কনে পৌঁছিল। খাশুড়ী আসিয়া বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। "হ্যাঁ, মুখখানি সুন্দর বটে, কিন্তু একি? এই কি গা সাজান গয়না? দুখানা হাল্‌কা গয়না দিয়া মেয়ে পার করতে লজ্জা হল না! মায়ের গায়ের গয়না বুঝি? জিনিস পত্তরও কিছু দেয়নি দেখতে পাচ্ছি। কৈ, কর্ত্তাকে ডাক্ দেখিনি! এই কি তাঁর যথা সাধ্যি দেওয়া? যা ত ঝি, বাইরে থেকে ডেকে নিয়ে আয় ত।"

ঝি একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি বাড়ী নেই গো—রায় বাবুদের বাড়ীতে গেছেন।"

গৃহিণীর ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। কর্ত্তাকে না পাইয়া বধূকে বকিয়া ঝাল মিটাইতে লাগিলেন।

বড় বধূ নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"গয়না দেয়নি, তাতে কি হয়েছে মা? ইচ্ছে হলে আমরাই গা সাজিয়ে দিতে পারব। কেমন মুখখানি একবার চেয়ে দেখ! আহা মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি থামো মা—সবেতেই কথা কইতে এসো না। ছেলেমানুষের অত কর্ত্তামি মোটে সাজে না ত!"

বধূ লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। গৃহিণীর কণ্ঠস্বর ক্রমে বাড়িতেছে দেখিয়া পাশের ঘর হইতে বড় ছেলে ডাকিয়া কহিল—"চুপ কর মা—ওদের কি খেতে টেতে দেবে না? বকবার ঢের সময় পাবে, এখন একটু চুপ কর।"

গৃহিণী রাগ করিয়া বলিলেন, "চুপতো করেই আছি। কোনও বাবে কথা কইনে, তাই এমনি ফাঁকি দিতে হয়! আমিও বলে রাখছি—এই বৌ বিদায় দিয়ে আমি আবার ছেলের বিয়ে না দিচ্ছি ত তবে আমার নাম নেই। তখন যদি কর্ত্তা কথা কইতে আসেন তবে মাথায় কাটারি মেরে রক্তগঙ্গা হব।"

৪

বিবাহের গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে। মাধুরী কোণের ঘরটায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। কাল তাহার যাওয়ার দিন। খাশুড়ী বলিয়াছেন, আর তাহাকে আনা হইবে না। সেই কথাটাই সে বার বার ভাবিতেছিল। আর যদি না আনে, তবে তার যে বেশী দুঃখ হইবে তা নয়, কিন্তু দাদুর কথা মনে করিয়া সে কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না। বাঙ্গালীর মেয়ের বিয়ে দিলেই সব শান্তির শেষ নয়, এর পর আরও আছে। ক'দিন দাদুর মুখে কি তৃপ্তির হাসি দেখিয়াছে সে কি আবার সেটুকু মুছাইয়া দিবে! মনে মনে বলিল, কি পাপই করেছিলাম দাদু। জন্মাবধি তোমায় জ্বালাচ্ছি। না জানি চিরকাল তোমার ভার হয়েই, থাকি বা!

বিভূতি কি একটা বই লইতে ঘরে ঢুকিয়া মাধুরীর নিকটে আসিয়া বলিল—"কাঁদচো মাধুরী? দাদুর জন্যে কষ্ট হচ্ছে? দুঃখ কি? কালই তো যাবে।" নিজের অজ্ঞাতে কখন যে দু'ফোটা জল চোখ ছাপাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মাধুরী কহিল—"সেজন্যে কাঁদিনি ত।"

বিভূতি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কিসের জন্যে?"

মাধুরীর মনে হইল, এঁর কাছে বলিলে হয়ত কোন উপায় হইতে পারে। বলিতে একটু লজ্জা করে বটে—তা হোক, স্বামীর কাছে লজ্জা কি? মৃদুস্বরে বলিল—"মা বলেছেন আমায় আর আনা হবে না। দাদু তাহলে কি রকম দুঃখ পাবেন! তাই কষ্ট হচ্ছিল।"

বিভূতি বলিল—"ওঃ সেই কথা! মা মুখে বলেছেন বৈত নয়! তুমি ভেবোনা; বাবা যখন তোমায় এনেছেন তখন তুমি এখানেই থাক্‌বে।" মনটা ছিল তখন উচ্চসুরে বাঁধা। ভাবিল ছিঃ, টাকায় এত প্রভেদ? দাদামশায় গরীব বলেই কি মাধুরীর এ বাড়ীতে স্থান নাই? তৎক্ষণাৎ মার কাছে গিয়া বলিল,—"মা, শুনছি বৌকে নাকি চিরকালের জন্য এ বাড়ী থেকে বিদায় করছ? কেন, ওকে গয়না দিতে পারে নি এই ওর অপরাধ? বাবা ত জেনে শুনেই এনেছেন! এখন এরকম করলে প্রকারান্তরে বাবাকেই অপমান করা হবে।" মায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিভূতি বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে বিভূতির ছোট বোন বিনু আসিয়া বলিল, "মা বৌকে পাঠাবে বলে মেজদা রাগ করেছে।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ছেলে আমাকেও তাই শুনিয়ে গেলেন। আমার হয়েছে সেই দশা,—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! ভালরে বাপু, এখন থেকে তোদের সংসার তোরাই বুঝেনে, আমি আর কিছুর মধ্যে নেই।"

৫

উপরাউপরি দুইবার যখন পাশের লিষ্টিতে বিভূতির নাম পাওয়া গেলনা, তখন জেষ্ঠ ভ্রাতা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "মিথ্যে ওকে টাকা ঢেলে পড়ানো। ওর কি পড়ার মন আছে?"

মা বলিলেন, "কি অপয়া বৌ ঘরে এনেছি! এর আগে ত বাছা আমার কেমন টক্ টক্ পাশ করে যাচ্ছিল, আর বৌ এসে অবধি যেন পেছনে অলক্ষ্মী লেগেছে।"

নানা প্রকার মন্তব্যে দুঃখিত হইয়া মাধুরী দ্বিপ্রহরে বিভূতিকে কহিল, "কেন তুমি ফেল করলে? আর একটু মনোযোগ দিলে না?"

এমনই মনটা ছিল খারাপ—তার উপর সহানুভূতির বদলে উল্টা অনুযোগ শুনিয়া বিভূতি রাগ করিয়া বলিল, "সে তুমি কি বুঝবে! যে বিষয়ে একবিন্দুও জ্ঞান নেই তা নিয়ে কথা কইতে আসা বাহাদুরী বটে!"

ব্যথিত হইয়া মাধুরী বলিল, "আমার কি কোন কথা বল্‌বার অধিকার নেই? তোমার কিসে ভাল হয় তা কি আমি বুঝতে পারি না? তোমার উন্নতি কি আমার আকাঙ্ক্ষার জিনিষ নয়?"

"থামো! ঢের লেকচার দিয়েছ। অকৃতজ্ঞের কাছে এর চেয়ে বেশী আশা করাই ভুল! জানো, তুমিই যত নষ্টের গোড়া!" বলিয়া বিভূতি সক্রোধ পাদ বিক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাস্তবিক সেই ত যত নষ্টের মূল! মাধুরী সেখানেই বসিয়া পড়িল! ভাবিতে লাগিল—কি দুর্ভাগিনী সে। বড় হইয়া অবধি দাদুর বুকের বোঝা, তার পর তাকে আশ্রয় দিয়া শ্বশুরকে নিত্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়; স্বামীও তাহাকে তাড়ায় নাই বলিয়া মার কাছে অপরাধী! এও কি যথেষ্ট নয়? কেন সে বিভূতিকে অত কথা কহিতে গেল? এত স্পর্দ্ধা কি তার সাজে? স্বামী দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে, তাই—নইলে তার কি আছে যে স্বামীর সমকক্ষ হইয়া কথা বলিতে যায়?

মনে পড়িল, বড় যা একদিন বলিয়াছিলেন 'বাঙ্গালীর মেয়ের জীবন ভাই! যার ভাগ্যে স্বামীর ভালবাসা জুট্‌ল তার জীবন তবু সার্থক, আর যে তা পেলেনা, তার জীবন এমনি অন্ধকার যে পথ খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল!

স্বামীর প্রেম যে কি জিনিস তা সে ঠিক বোঝে না, বুঝিতে চায়ও না। স্বামীর দয়াতেই ত সে কৃতজ্ঞ ছিল! তারা তার দাদুকে মুক্তি দিয়াছেন, এইত আশার অতীত। তবে কেন আজ সে সব ভুলিয়া অত জোরে কথা কহিতে গেল?

দাদুর কথা মনে পড়িল! সেই বিবাহের পর আসিয়া তিনি একটুখানি দেখিয়া গিয়াছেন; তার-পর দুই বৎসর হইতে চলিল আর তাঁকে দেখে নাই। চিঠি লিখিয়া সংবাদ আনিবার ক্ষমতাও তার নাই। কে জানে তিনি কেমন আছেন? আর কি দাদুকে দেখিবে?

চোখ দুটী জলে ভরিয়া উঠিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া হাত যোড় করিয়া ভগবানকে যেন সব দুঃখ নিবেদন করিল—"কোন্ পাপে মেয়ে জন্ম দিয়েছ ঠাকুর? আবার যদি ফিরে জন্ম পাই তবে দাদুর বুকের ভার করে আর পাঠিয়ো না, ছেলে হয়ে এসে যেন দাদুর দুঃখ ঘোচাতে পারি!"

৬

আহারাদির পর গৃহিণী ভাঁড়ার গুছাইয়া রাখিতে-ছিলেন; বিভূতি ম্লান মুখে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি যেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—"ফেল না হয় হয়েছে। তাতে আর দুঃখ কি? দুবার বৈত নয়। কর্ত্তাকে তাই বল্‌ছিলাম, এই নিয়ে তোমরা কেউ বিভুকে

কিছু বল্‌তে পাবে না। তেমন যাঁর বিয়ে করে নি তাই, নইলে এই ফাঁকে মোচড় দিয়ে কত টাকা আদায় করা যেত।" বিভূতি কিছু উত্তর দিল না।

"কর্ত্তা ত কোন বিষয়ে আমার পরামর্শ নেবেন না। কোথা থেকে সম্বন্ধ জুটিয়ে আনলেন, কথা কইতে অবকাশ পেলাম না। নইলে ও বাড়ীর নলিনীর মা এখনো বলে, কথা দিয়ে কথা রাখলে না দিদি? আহা, বিধবা মানুষ, নইলে টাকার ত আর অভাব নেই। আর নলিনী রূপে গুণে চমৎকার। এমন মেয়ের বর জোটেনা!" বলিয়া গৃহিণী সাগ্রহে পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তুই নলিনীকে দেখিসনি বাবা?"

দেখিয়াছে বৈ কি—কতবার পথে ঘাটে তার চোখে পড়িয়া যায়। আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি সে! আর মাধুরী! যদিও কুৎসিৎ নয়, তবু কি রকম ম্যানমেনে ভাব। বিভূতির মনটা একটু দুলিয়া উঠিল। বলিল, "সত্যি মা, তোমার কথা না শুনে বড্ড ভুল করেছি।"

মা বলিলেন, "তার আর কি হয়েছে? ভুল করলে শোধরাবার পথ আছে ত! আমি বলি, বৌকে পাঠিয়ে দে, গরজ থাকে, তবে তার দাদামশাই যেন কিছু টাকা শুদ্ধ রেখে যায়।"

পুত্রকে নীরব দেখিয়া আশান্বিত চিত্তে গৃহিণী বলিলেন—"তবে দিন. ঠিক করে ফেলি বাবা? ঐত রায় মহাশয়ের ভাগ্নে কলকাতা যাচ্ছে তাকে বল্লে সেই এ বউকে নিয়ে যাবে। কর্ত্তাকে জানিয়ে আর দরকার নেই। যা বলবার আমিই বলব—কি বলিস?"

বিভূতি বলিল, "না মা—বৌ যাবে, কিন্তু অপরের সঙ্গে পাঠানো ঠিক হবে না। আমিই রেখে আস্‌ব'খন।"

৭

"দিদি এলি ভাই? এতকাল পরে দাদুকে মনে পড়ল?"

মাধুরী প্রণাম করিতে ভুলিয়া দাদুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—"তুমি এমন হয়ে গেছ দাদু, কি চেহারা হয়েছে তোমার?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—"অনেকদিন পরে দেখলি কিনা, তাই এমন লাগছে। আমার ত কিছু হয় নি।"

সেদিন ক্ষুদ্র গৃহখানিতে যে আনন্দের স্রোত বহিল তাহা অবর্ণনীয়। হাস্য পরিহাসেরও অন্ত নাই। বৃদ্ধ অপটু হস্তে খাওয়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"রাজরাণীর যোগ্য আদর কি করে করি বলত ভাই?"—মাধুরী তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—"সেজন্যে তোমার ভাবতে হবে না। তুমি এখন সরো। আমি রান্নাটা শেষ করে ফেলি।"

অজস্র হাসি কলহের মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া দাদুকে ঘুম পাড়াইয়া, মাধুরী যখন শয়ন কক্ষে গেল, তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বিভূতি তখনও বসিয়া ছিল! আজ মাধুরীর শৈশবের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। স্বামী তখনো অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া সে কাছে গিয়া বলিল "তুমি এখনো ঘুমাও নি?"

বিভূতি গম্ভীর ভাবে কহিল—"না, আমায় এখনি যেতে হবে!"

মুহূর্ত্তে মাধুরী বিষণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন, কোনও দরকার আছে কি এত রাত্তিরে?"

বিভূতি বলিল—"না গেলে তাঁরা ব্যস্ত হবেন। বলে এসেছি যাব। তোমায় বলে' যাবার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম—এখন তবে যাই!"

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসবে? তুমিই এসো আমায় নিয়ে যেতে।"

বিভূতি ভাবিল আর লুকাইবার দরকার কি? সত্য কথা বলাই ভাল। বলিল, "কি জানি, আর আসা হবে না বোধ হয়।"

মাধুরী কহিল—"সেকি! কি হয়েছে আমায় বল্‌বে না?"

বিভূতি বলিল,—"ভেবে দেখলাম মাধুরী, সাহেবদের মত বৌ সর্ব্বস্ব হওয়া ঠিক নয়। মা যখন তোমায় চান না, তখন তাঁর অমতে রাখা আমার ঠিক হয় না। তাঁর প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত।"

মাধুরী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"কর্ত্তব্যের কথা কি তোমার আগে মনে হয় নি? আগেই কেন আমায় তাড়িয়ে দিলে না? তাহলে এতটা কষ্ট হ'তনা।"—বলিতে বলিতে মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিল। আবার বলিল "তোমার কাছে ত বেশী কিছু চাইনি। শুধু একটুখানি আশ্রয়। তুমি ছাড়া কার কাছে এটুকু চাইতে পারি? তাও কি তুমি আমায় দেবে না? দাদামশায়ের প্রাণে কি রকম লাগবে! আমার নিজের জন্য ত ভাবিনে! কিন্তু তিনি হয়ত সইতে পারবেন না। তাঁর কথা ভেবেও আমায় এতটুকু দয়া কর।"

বিভূতি বলিল—"আমার এতে কোন হাত নেই। মার অনুমতি না পেলে নিতে আসতে পারব না। একবার ভুল করেছি বলে ভুলটাকে চিরস্থায়ী করা উচিত নয়।"

মাধুরী চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"ভালই হ'ল। তোমার মত নিষ্ঠুরের দয়ায় আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম—ভগবান আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। তুমি যেতে পার।"

বিভূতি আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। অন্ধকার রাত্রি; জন কোলাহল নীরব হইয়া গিয়াছে। খালি দু একখানা গাড়ীর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছিল। বিভূতি একটু দাড়াইল—ভাবিল এত নিষ্ঠুরতা না দেখাইলেও হইত। আহা, তার কি দোষ!

মাধুরীর অশ্রু-সজল মুখ যেন মনের কোণে আসিয়া বার বার খোঁচা দিতে লাগিল। ফিরিয়া যাইবে কি?

দূরের রাস্তা দিয়া থিয়েটার ফেরৎ একটি যুবক গাইতে গাইতে চলিয়াছে,—

এস ফিরে এস এস, প্রিয়তম
শেষ মিনতি এসো গো ফিরে।"

শ্রীপ্রমীলা সেন।

৺স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে মৌলিক গবেষণার প্রয়োজনীতা বঙ্গ দেশে আশুতোষই প্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আধুনিক সময়ে মৌলিক গবেষণার ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, আশুতোষের পূর্ব্বেই কেহ কেহ এইরূপ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন, কারণ ঐ দিন তদানীন্তন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে এক সভার অনুষ্ঠান হয়, সেই সভাতে স্যার উইলিয়াম জোন্স Discourse on the institution of a society for enquiring into the history, civil and natural, antiquity, arts, sciences and literature of Asia নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং এসিয়াটিক সোসাইটী নামক এক বিদ্বজ্জন সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইলেও প্রায় ৫০ বৎসর কাল কোন দেশীয় পণ্ডিত এই সঙ্ঘের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন নাই এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি ডাক্তার H. H. Wilsonএর প্রস্তাবে কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিত এই সমিতিতে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামকমল সেন মহাশয় উক্ত সঙ্ঘের Natural Science Secretary নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং

এই সমিতির প্রথম শতাব্দীর যে কার্য্য বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উক্ত সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে আরও অনেকবার তিনি সহকারী সভাপতিরূপে বা ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদকরূপে সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। এই শতবার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রবেশ করিবার পর কয়েক জন ভারতবাসী নিজেদের গবেষণার ফল এই সমিতির পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণার যে এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এই সমস্ত লেখকই সেই বিষয়ে অগ্রগামী। সুতরাং তাঁহাদের নামের একটী তালিকা বোধ হয় সাধারণের নিকট অপ্রীতিকর হইবেনা। ব্রজনাথ বন্দোপাধ্যায়, রেভঃ কৃষ্ণমোহন বানার্জ্জি, রঙ্গলাল বানার্জ্জি, চন্দ্রশেখর বন্দোপাধ্যায়, দুর্গারাম বোস, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকান্ত বোস, প্রমথনাথ বোস, রাস বিহারী বোস, গৌরদাস বসাক, পণ্ডিত কাশীরাজ, গোবর্দ্ধন কোয়েল, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর চাটার্জ্জি, ডাক্তার ভাউদাজি, শরৎচন্দ্র দাস, নরসিংহ দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, রাখালদাস হালদার, সর্দ্দার গুরুদয়াল সিংহ, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, কাশীনাথ, আলি খাঁ, মুন্সী মোহন লাল, ছেদি লোহার, মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মণিরাম, উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি, প্রাণনাথ পণ্ডিত, সুরয প্রসাদ, রাজা খাঁ, রামলোচন পণ্ডিত, অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, গোপীনাথ সেন, রামকমল সেন, রাধাকান্ত শর্ম্মা, রাধানাথ শিকদার, জি, এম ঠাকুর, মৌলবী আবদুল লতিফ ও হাজী আবদুল নবির প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাতে ও কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির জীবনের শত বৎসর পূর্ণ হয় এবং ইহার পরবর্ত্তী বৎসর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রায় এই সময়েই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসীডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদের নিয়োগের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেশে বিজ্ঞান আলোচনার ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির জন্য Indian Association for the Cultivation of Science নামক সমিতি স্থাপন করেন। আশুতোষ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার নিযুক্ত হন। এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রথম শত বাৎসরিক অধিবেশনের সময় এবং তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররূপে নিযুক্ত হওয়ার সময়—এতদুভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ অধিক বিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল এবং এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, এমন একটী স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল যাহার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে দুই একজন স্থির সঙ্কল্প করিলেন যে তাঁহারা জগতের সম্মুখে দেখাইবেন যে বাঙ্গালী পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু অর্পণ করিতে পারে। যে সমস্ত বাঙ্গালী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন আশুতোষ তাহাদের অন্যতম এবং তাঁহার গবেষণার ফল উচ্চতর গণিত শাস্ত্রে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশুতোষের জীবনী পাঠ করিলে জানা যায় যে তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত Indian Association for the Cultivation of Science এর উন্নতিকল্পে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে রাজা রাজেন্দ্রলালের প্রস্তাবে তিনি Asiatic Society এর অন্যতম সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে সমস্ত কৃতি-পুরুষ দেশে শিক্ষাবিস্তারকল্পে ও দেশবাসীর মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অগ্রণী। এই সময়ে যাঁহারা মৌলিক গবেষণাতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজকর্ম্মচারীরূপে বা কেহ কেহ নিজের খেয়ালবশতঃ ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান কার্য্য করিতেন। কিন্তু যেদিন আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজ নিজ পরীক্ষাগারে তাঁহাদের শিষ্যদের সহিত মৌলিক গবেষণা কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন সেইদিন ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণার

ইতিহাসে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইল। সেইদিন আমাদের দেশে লোকে বুঝিতে পারিল যে ছাত্রদিগের দৈনন্দিন অধ্যাপনাতেই কলেজের অধ্যাপকদের কর্ত্তব্য কার্য্য পর্য্যবসিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে; নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা উপযুক্ত শিষ্যদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে উৎসাহ প্রদানও অধ্যাপকদের একটী অবশ্য করণীয় কার্য্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্যার আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন দেশের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল যে তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আশুতোষ ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বারা যে তিনি প্রথম যৌবনে এই কার্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সেই সময়ে যাঁহারা মৌলিক গবেষণাতে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা বিক্ষিপ্তভাবে কার্য্য করিতেন। দেশে এমন একটী প্রবল কর্ম্মীর অভাব হইয়া পড়িয়াছিল, যিনি সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ও বড় শক্তি একত্রিত করিয়া এক মহাশক্তিতে পরিণত করিতে এবং দুর্ব্বল না হইয়া যাহাতে উত্তরোত্তর এই শক্তি অধিকতর বলশালী হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই কর্ম্ম সুসম্পন্ন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক আশুতোষেরই এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিবার ক্ষমতা ছিল। কেবলমাত্র বিদ্যা ও মনীষার সাহায্যেই যে আশুতোষ এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভারতের ইতিহাসে চিরকালের জন্য অমর হইয়া থাকিবেন তাহা নহে। তাঁহার সমস্ত কার্য্যে যে এক সজীব জাতীয়তার ভাব বিদ্যমান ছিল, তাঁহার নিজের যে একটী ব্যক্তিগত সম্মোহনী শক্তি ছিল, বাহিরে সময়ে সময়ে ধৃত পরুষ আবরণের মধ্যে যে একখানি অতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় ছিল, তাহাদের সাহায্য না পাইলে, কেবল মাত্র ধীশক্তি ও মনীষা লইয়া স্যার আশুতোষ এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সকলেই জানেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী অনেক মাস পর্য্যন্ত বেতন গ্রহণ করা বন্ধ রাখিয়া সহাস্যবদনে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। যদি আশুতোষের ন্যায় বজ্রাদপিকঠোর ও কুসুমাদপি কোমল—যিনি নিজের চরিত্রমাধুর্য্যে ছোট বড়, ধনী নির্ধন, বালক যুবা সকলকেই নিজের আপনার করিয়া লইয়াছিলেন—তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকিতেন তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা সম্ভবপর হইত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আনন্দ বাজার পত্রিকাতে সত্যই উল্লিখিত হইয়াছে যে "এই কঠোর কর্ম্মী পুরুষের সহজ বিগলিত দয়া অজস্রধারায় পাত্রে অপাত্রে ঝরিয়া পড়িত।" সুতরাং আশুতোষকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, কেবলমাত্র তাঁহার বিদ্যার ও বুদ্ধির অনুসন্ধান করিলে চলিবে না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়টীও যে কত বড় ছিল, তাহাও আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে, এবং তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে এই সমস্ত গুণ থাকা হেতুই বঙ্গের নরশার্দ্দূল অসাধ্যসাধন এবং বঙ্গদেশে তথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ আশুতোষের ব্যক্তিগত যত্ন ও অধ্যবসায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে যে ক্ষুদ্র বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, কেবলমাত্র অঙ্কুরোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষের প্রধান রক্ষক অকস্মাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্র হইতে চিরকালের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আশুতোষের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ মুহ্যমান। আশুতোষের স্বহস্ত-রোপিত ও স্বযত্ন-বর্দ্ধিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষটীর শত্রুরও অভাব নাই এবং যদি কখনও এই বৃক্ষের গতি প্রতিহত করিবার বা ইহা সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইবে একস্বরে সেই চেষ্টার প্রতিবাদ করা—তাহা যদি না করা হয় তবে বুঝিতে হইবে যে আশুতোষের জন্য এই যে ক্রন্দন, এই যে হাহাকার ইহা কেবল শব্দ মাত্র, ইহাতে কেবল বায়ুর তরঙ্গ আছে, কিন্তু হৃদয়ের কোনও

স্পন্দন নাই। বাস্তবিকপক্ষে আশুতোষের স্মৃতি মন্দির তিনি নিজেই গড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামানুসারে বিদ্যালয়ের নামকরণ হউক তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু বাঙ্গালী যদি আশুতোষের নিজহাতে-গড়া মন্দিরকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে দেয়, তাহা হইলে যে কেবলমাত্র তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা হইবে তাহা নহে, বাঙ্গালী অজ্ঞাতসারে নিজের মৃত্যুকে নিজে বরণ করিয়া লইবে।

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার গভীরতা বাড়াইবার জন্যই কেবল সচেষ্ট ছিলেন না; ইহার প্রসার যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত এবং অনেকে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার বিস্তার করা সম্বন্ধে অনেকে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত মন্তব্যের বিস্তৃত সমালোচনা বর্ত্তমান সময়ে সম্ভবপর নহে, তবে সমালোচকদের মন্তব্যগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যেন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অভিমত প্রকাশকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীত বিষয়গুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যদি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীত বিষয়গুলির সংখ্যার বৃদ্ধি করা। পৃথিবীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসগুলি আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের জোরে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন বিশেষ বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিয়া থাকে। ভারতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র দেখিয়া আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল কলিকাতাতেই একটী পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিবার সুযোগ ও সুবিধা বিদ্যমান। কেবলমাত্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হইলেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে না। প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইলে, পুস্তকাগার, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, নানা বৈষয়িক চিত্রশালা, বিদ্বজ্জন সঙ্ঘ প্রভৃতি অনেক প্রকারের উপকরণের প্রয়োজন এবং এই সমস্ত উপকরণ কলিকাতাতে যেরূপ আছে ভারতবর্ষের আর কোনও স্থলে সেরূপ নাই। যে সমস্ত নূতন বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যান্তর্গত হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আশুতোষের উর্ব্বর মস্তিষ্কের ফল। ভারতবর্ষের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে কেহই কখনও করেন নাই। এই বিষয়ের শিক্ষা প্রদানের ধারণা সম্পূর্ণরূপে আশুতোষের নিজস্ব। সাধারণতঃ লোকে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার শিক্ষার ব্যবস্থার সহিত সুপরিচিত নহে এবং এই বিষয়ের শিক্ষাকে অনেকে বাঙ্গালা ভাষাতে এম, এ অধ্যয়ন নামে অভিহিত করিয়া থাকেন এবং বলিতে লজ্জা হয় যে কেহ কেহ এই বিষয়ের পঠন ও পাঠন অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কি উচ্চ আদর্শ প্রণোদিত হইয়া আশুতোষ ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সম্যক্ পরিচয়ের অভাব হেতুই অনেকের মনে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। আমার বোধ হয় যে তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, এম, এ শ্রেণীতে কি ভাবে Indian vernaculars বা ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলি অধীত হইয়া থাকে, তাহার একটী অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রয়োজন। Indian v'ernaculars বা ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার পরীক্ষার্থিগণকে ৪টী ভারতীয় ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়—ইহাদের মধ্যে একটী মুখ্য, দুইটী গৌণ, ও অপর একটী মৌলিক। সম্প্রতি বাঙ্গালা, হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া এবং গুজরাটী এই কয়েকটি মুখ্য প্রাদেশিক ভাষাতে, বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দী, গুজরাটী, উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কেনারীয়, সিংহলী ও মৈথিলী এই কয়েকটি গৌণ ভাষাতে, এবং পালি, প্রাকৃত ও পার্শী এই কয়েকটী মৌলিক ভাষাতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার মূলে যে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, জাতীয়তার ভাবে কিরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি এইরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন

করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া তাঁহার নিজের কথা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৩২৮ সালে হাওড়া সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি রূপে আশুতোষ বলিয়াছিলেন—"আমি বলিতেছি শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাবগত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া যাহার যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিয়া কি করিয়া ভারতে এক ভাব, এক চিন্তা, এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কি করিয়া সমগ্র ভারতে এক জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, নিষ্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে ইহাই আমার বক্তব্য। তাই বলিতেছিলাম আমাদিগকে নিপুণ ভাবে দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে এই ভাবগত, জাতীয় সাহিত্যগত একতার সমাধান করিতে পারি। যদি এই মহৎ কার্য্যের এই দুঃসাধ্য কার্য্যের সুসম্পন্নের কোন উপায় থাকে তবে তাহা আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, যাহাতে বিদ্যার্থীরা প্রথমে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্ব লাভের পর, ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে, বাঙ্গালী বি-এ, এম-এ, উপাধিমণ্ডিত যুবক দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে আরও দুই একটা ভারতীয় ভাষা, হিন্দি বা মারহাট্টি, উর্দ্দু বা তৈলঙ্গি ভাষা শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে ক্রমে শিক্ষা সমাপ্তির পর ঐ ঐ যুবক, পরকীয় ভাষার অর্থাৎ এই হিন্দি বা মারাহাট্টি ভাষার সম্পদ-সৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় বিবর্ত্তিত ও ভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় মহারাষ্ট্র উন্মত্ত, যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় হিন্দুস্থান আপনার ভাবে আজও নৃত্য করে, সেই উন্মাদনা বঙ্গ ভাষার শিরায় শিরায় বহাইতে পারিবে ......শুধু এক প্রদেশে একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রীতি প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাবে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে দেশীয় ভাষায় এম-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে...যদি এই ভাবে সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশীয় ভাষায় এম-এ, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যায় তবে প্রতিবর্ষে আমরা এমন দুই চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব—যাহারা তাহাদের স্ব স্ব মাতৃ-ভাষা ছাড়া ভারতের অপর দুই চারটী ভাষাতেও সুপণ্ডিত। এইরূপে কিছু কাল পরে বিশ, পঁচিশ কি পঞ্চাশ বৎসর পরে, আজ যেমন ইংরাজীতে বি-এ, এম-এ, অনেক লোক পাইতেছি, সেই প্রকার স্বীয় মাতৃ-ভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় অপরাপর ভাষাতেও সুপণ্ডিত লোকের অভাব থাকিবে না। ফলে দাঁড়াইবে এই—ভারতের ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা, দীক্ষা, মতিগতি সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে।......ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাবগত একতার সাড়া পড়িবে। পরস্পরের আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে, যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু দেশীয় ভাষা জানে, তাহারাও ভিন্ন দেশের মনোহর ভাব সম্পদ উপভোগ করিতে পারিবে। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্য বন্ধনের সূত্রপাত হইবে। ......ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে। যদি একবার সেই ভারতপ্লাবিনী বন্যার আবির্ভাব হয় তবে তখন সকল অবসাদ সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্না অপরে কাঁদিবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনন্দিত হইবে।" শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আশুতোষের চরিত্র সমালোচনা কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষার শিক্ষা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ভারতের সমস্ত প্রদেশ একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় নাই। ভারতের একতার মুখ্য ভিত্তি, ভারতবাসীর মানসিক ভাবের উপর স্থাপিত এবং "In the institution of the new M, A, degree in the

Indian vernaculars Sir Ashutosh has indicated the line along which we can move immediately towards the solution of the vital problem of Indian unity and federation in our time,".

আশুতোষের অকাল মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশস্থ সমস্ত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীরই ক্ষতি হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যে কতখানি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। আশুতোষ অনেকবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। একথা সত্য যে আশুতোষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিষদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। পরিষদের পক্ষ হইতে কাশীরাম দাসের মহাভারতের সম্পাদনের ভার তিনি লইয়াছিলেন কিন্তু প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত না হওয়াতে এই কার্য্য তিনি আরম্ভ করিতে পারেন নাই। কলিকাতাতে যখন Oriental Conference এর অধিবেশন হয় সেই সময়ে তিনি পরিষদের বর্ত্তমান মন্দিরে প্রথম ও শেষবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনাতে যোগদান করিবার জন্য তিনি আসিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে আসিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে পরিষদের সঙ্গে বিশেষরূপে সংসৃষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যে সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাঁহার কার্য্য পরিষদের কোন কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, অপর কাহারও কার্য্যে যে সেইরূপ সহায়তা করে নাই তৎসম্বন্ধে দুই মত থাকিতে পারে না। দেশে নানা সাহিত্য-সভা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অস্তিত্বের কারণ কি, দেশে বাঙ্গালা ভাষাতে প্রচারিত নানা পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার পরিচালনা করার উদ্দেশ্য কি তাহা যদি আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করি, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বোক্ত কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। কিন্তু সময়াভাবে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যে সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে, এবং স্থাপনাবধি যে সমস্ত উদ্দেশ্য কার্য্যের পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চেষ্টা করিতেছেন, দেশে যাহাতে বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন ও পাঠন হইতে পারে এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার্থীদের পঠন ও পাঠনের বিষয়ান্তর্ভুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা তন্মধ্যে অন্যতম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থাপনের পরেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, নন্দকৃষ্ণ বসু, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ভাবে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, এবং সেই সমিতির প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত দুইটি সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলঃ—

"That at the F A Examination and in the A. Course of the B. A. Examination (when a classical language is taken as a third subject) one paper should be set, containing (i) passages in English to be translated into one of the vernaculars of India recognised by the Senate and (ii) a subject for original composition in one of the vernaculars recognised by the Senate, text books being recommended as models of style.

"That in Geography, Histry, and Mathametics the answers may be given in any of the living languages recognised by the Senate."

পরিষদের এই প্রস্তাবের ফলে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন যে পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে এফ, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় নিরূপিত বিষয় ব্যতীত বাঙ্গালা রচনার বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে ও পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে এক একখানি প্রশংসাপত্র পাইবে। ইহার পর পরিষদ ও পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসার-বৃদ্ধিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩২১ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

"৪। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসারের জন্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ধন্যবাদ জানাইতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের আরও যথাসম্ভব প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন :—(ক) প্রবেশিকা হইতে বি-এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য পঠন ও পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবে।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান এম-এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

পরিষদের আশা ও বিশ্বাস ছিল যে যদি আশুতোষ আরও কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে সংযুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আদর উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য এখনও স্বীয় ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, এবং যে সন্তানের অক্লান্ত সেবাতে ভাষা-জননী দেশে ও বিদেশে স্বীয় মর্য্যাদা পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন বলিয়া লোকে আশা করিয়াছিল, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত দেশের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদও গভীর শোকাচ্ছন্ন। বঙ্গভাষাতে প্রচারিত অনেক সাময়িক পত্রিকা থাকা সত্ত্বেও কি উদ্দেশ্যের প্রেরণাতে সাহিত্য-পরিষদ একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রচার করিতেছেন, এবং অন্যান্য পত্রিকার সহিত তুলনাতে পরিষদ-পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য কোথায় তাহা বুঝাইবার জন্য পরিষদের কার্য্যবিবরণী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"পত্রিকা প্রকাশ সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যে সমস্ত প্রবন্ধ কেবল পুরাতন কথার বা অপরের আবিষ্কৃত পুরাতন তথ্যের অনুবৃত্তি বা ব্যাখ্যা মাত্র, সে সকল প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও পরিষদ পত্রিকায় স্থানের সঙ্কীর্ণতা বিবেচনায় প্রকাশিত হইবে না। সম্প্রতি বাঙ্গালায় অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বিদ্যমান আছে, ঐ সমস্ত পত্রিকাই ওশ্রেণীর প্রবন্ধের প্রকাশের যোগ্য স্থান। কিন্তু যে প্রবন্ধে কোনরূপ নূতন অনুসন্ধানের বা নূতন গবেষণায় আবিষ্কৃত বা নূতন চিন্তায় লব্ধ কোন তথ্যের সংবাদ আছে, তথ্য প্রচারার্থ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা যোগ্য স্থান। এইরূপে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার বিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য।"

"আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্যগণ যে সমস্ত নূতন তথ্যের আবিষ্কার ও আলোচনা করেন, নানাকারণে তাহাদের সেই সমস্ত আবিষ্কারের ফল বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে সুধী সমাজে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাহিত্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আশা করেন যে, ক্রমশঃ বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন তথ্য বাঙ্গালা ভাষাতে পরিচালিত পত্রিকার সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া দেশবিদেশে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির গৌরব বিস্তার করিবে। পরিষদ সানুনয়ে আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্যগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নূতন তথ্যাদির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের পরিশ্রমলব্ধ অনুসন্ধানের ফল মাতৃভাষার সাহায্যে পরিষদ পত্রিকার মধ্য দিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশিত করেন। নানা কারণে আমাদের সুধীগণ দ্বারা প্রচারিত নূতন তথ্যের আবিষ্কার—বার্ত্তা বিদেশীয় ভাষায় বিদ্বৎসমাজে প্রকাশিত হইতেছে।

কিন্তু পরিষদ আশা করেন যে যাঁহারা কেবলমাত্র বিদেশী ভাষার সাহায্যে নিজেদের অনুসন্ধান বা আলোচনার ফল প্রকাশিত করিতেছেন, দেশ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহারা অতঃপর উক্ত ফলের অন্ততঃ কিয়দংশ মাতৃভাষার সাহায্যে সুধীসমাজে প্রচার করিবেন। কোন দেশের সাহিত্যকে যথার্থ গৌরব বা সম্মান-লাভ করিতে হইলে, সেই ভাষাতে মৌলিক অনুসন্ধানাদির পরিচয় থাকা বিশেষভাবে আবশ্যকীয়। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কপ্রসূত নূতন তথ্যাবলীর আবিষ্কার সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত করিয়া যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অন্যান্য সভ্যদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে একত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, পরিষদ পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন।"

পরিষদের এই উদ্দেশ্যের সহিত আশুতোষের কিরূপ সহানুভূতি ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য পাটনা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য গঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বৎবৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে তাহারও চিন্তা করিতে হইবে।......তবেই তো বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয় এমন সম্পদে বঙ্গ সাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আজ যেমন আমরা অনেক অনর্থ ও শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় এবং আবিষ্কার উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ ঐ বিষয় সমূহ এতাবৎ কাল লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্‌বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন।...

"যে ভাষায় যত সম্পদ, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক.........যদি বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণ তাঁহাদের জ্ঞান গরিমার সম্পদ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান, এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহত ভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন একদিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।"

এই সমস্ত বিষয় হইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে আশুতোষের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে এরূপ ক্ষতি আর কোনও সভা বা সমিতির হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য পরিষদ যে বিশেষ সভার অধিবেশন করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র লৌকিক প্রথামত দেশের একজন বড়লোকের মৃত্যুতে সমবেত ভাবে শোক প্রকাশ করা নহে ; তাঁহার মৃত্যুতে যে পরিষদের কোন কোন উদ্দেশ্য সাধনের এক অতি প্রধান কর্ম্মীর তিরোভাব হইল বলিয়া পরিষদ মনে করেন, এই সভা পরিষদের সেই মনোভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র।

আশুতোষের কার্য্যকলাপের অনেক সমালোচনা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সমস্ত সমালোচনার পরীক্ষা এখন অসম্ভব। আশুতোষ এমন কতকগুলি কার্য্য করিয়াছেন যাহা তাঁহার করা উচিত ছিল না এবং এমন কতকগুলি কার্য্য তিনি করেন নাই যাহা তাঁহার করা উচিত ছিল.........এই দুই শ্রেণীতে এই সমস্ত সমালোচনা বিভক্ত হইতে পারে। সমালোচকগণের বক্তব্য পাঠ করিলে মনে হয় যে তাঁহারা অনেকেই সমালোচনা কালে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে আশুতোষ অক্লান্ত কর্ম্মী হইলেও, আইনের বিধানে তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ

ছিল। ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত আর কাহারও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় আইনের পরিবর্ত্তন করার কোন ক্ষমতা নাই, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনগুলির যদি কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় তাহাও রাজসরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ। এই দুইটী কথা মনে রাখিয়া যদি আমরা আশুতোষের কার্য্যাবলীর আলোচনা করি তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অনেকে অন্যায় ভাবে তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক শ্রেণীর সমালোচকের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাঁহারা মনে করেন যে আশুতোষ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আলোচনাতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধিকল্পে তিনি কিছু করেন নাই। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রসঙ্গে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীতা যে তিনি কিরূপ অনুভব করিতেন, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন যে :—

"Let us expand our Universities......Our own sons must be taught to build and operate machinery. Furnace and foundries, studios and workshops must be deemed as honourable and made as abundant as the offices of the learned professions, and they must be filled with our own children, made experts in our own Schools of Science. Then and then alone shall we be able to make adequate provision for the full utilisation of our raw materials. I feel humiliated when I realise the enormous extent to which the products of our inexhaustible natural resources are carried away to foreign shops by adventurous exploiters, the masters of industries elsewhere, who apply to them their skill and art, freight them back as manufactured articles, resell them for our purpose and profit by the multifold increase in value."

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ধর্ম্মাশোকস্মৃতিবিজড়িত পাটলীপুত্র নগরে যে মহাপ্রাণের অবসান হইয়াছে, সেই মহাপ্রাণের কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে কিছু বলিতে আহূত হইয়া আমি নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। অন্যান্য অনেক ব্যক্তির ন্যায় কার্য্যবশে সময়ে সময়ে সেই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ও সুবিধা আমার হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য, হৃদয়ের তেজস্বিতা ও কর্ম্ম করিবার প্রবল শক্তি, অন্যান্য বহু ব্যক্তির ন্যায় আমাকেও মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতাম।

আশুতোষ যে বৎসর বি-এ পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হয়েন, সেই বৎসরের বি-এ পরীক্ষাতে কৃতী ছাত্রদিগের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একটী যুবকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুবক পরে স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম প্রতিপন্ন করিলেন যে, ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকাকে কোন কোন বিষয়ে নূতন তথ্য শুনাইতে পারে। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে মৃতপ্রায় ভারতবাসীর মধ্যে এখনও এরূপ শক্তি লুক্কায়িত আছে, যাহার বলে সে নিজে সগৌরবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সমর্থ। তাঁহার লিখিত কর্ম্মযোগ যখনই পাঠ করিয়াছি, তখনই আশুতোষের কথা মনে হইয়াছে। কর্ম্মযোগে স্বামীজি যে সমস্ত মূল সূত্রের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, আশুতোষের প্রত্যেক কার্য্যেই সেই সমস্ত সূত্র বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। সেদিন কর্ম্মযোগ পড়িতে পড়িতে যখন দেখিলাম যে বিবেকানন্দ বলিতেছেন—

"What is Karmayoga? The knowledge of the secret of work. We see that the whole universe is working. For what? For salvation, for liberty; from the atom to the highest being working for the one end, liberty for the mind, for the body, for the spirit."

তখনই আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত "Freedom first, freedom second, freedom always," এই উক্তি মনে পড়িয়া গেল। বহুদিন পূর্ব্বে দেশনায়ক কোন ব্যক্তিকে উল্লেখ করিয়া জনৈক বাঙ্গালী কবি বলিয়াছিলেন :—

"গর্ব্বিত উন্নত শির, এমনি উন্নত রবে,
নোয়াইবে একদিন, অনন্তে মিশিবে যবে।

প্রবল ঝটিকা স্রোত, বহিবে ইহার গায়,
ভাঙ্গিলে ভাঙ্গিতে পারে, নত নাহি হবে তায় ॥"

আমরাও পূর্ব্বোক্ত কবির কথার অনুসরণ করিয়া আশুতোষের সম্পর্কে বলিতে পারি যে :—

গর্ব্বিত উন্নত শির, এমনি উন্নত ছিল,
সাধি বিশ্বে নিজ কাজ, অনন্তে মিশিয়া গেল।
প্রবল ঝটিকা স্রোত, লেগেছিল কত শত,
ভাঙ্গিতে নারিল কিন্তু কভু নাহি হ'ল নত ॥

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হায়দ্রবাদের "ফলকনুমা" প্রাসাদ ধরণীর ইন্দ্রভবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রাসাদ শুনিয়াছি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে নিজাম সরকার মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়াছেন। পুরাতন হায়দ্রাবাদ সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি অতি বৃহৎ পর্ব্বতের উপরে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে; পর্ব্বত না বলিয়া উহাকে "টিলা" বলাই সঙ্গত। সমতলভূমি হইতে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া এই টিলার সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে এবং উহার শিরোভাগ প্রাসাদ নির্ম্মাণের উপযোগী সমতল করিয়া লইয়া তাহারই উপরে সুবৃহৎ পাষাণ প্রাসাদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই টিলাটির তিনটি স্তর, সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রাসাদ, নিম্ন দুই স্তর বাহিয়া পথ গিয়াছে এবং সেই পথের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিতে নন্দননিন্দী উদ্যান রচিত হইয়াছে—উদ্যানের স্থানে স্থানে মর্ম্মর মূর্ত্তি, জলযন্ত্র ও লতামণ্ডপে, সমগ্র স্থানটিকে অপূর্ব্ব শোভাময় করিয়া রাখিয়াছে। প্রাসাদটি সুবৃহৎ কিন্তু দেখিলে মনে হয় যেন উহার গুরুত্ব কিছুই নাই, বালক বালিকার খেলাঘরের মত, যেন ইচ্ছা করিলে অনায়াসে উহাকে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে—মনে হয় যেন ফুৎকারে-স্ফীত সাবানের ফেন (soap bubble) দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুরুভার মর্ম্মর প্রাসাদকে দেখিতে ওরূপ হাল্কা করিয়া গড়া, স্থপতির অদ্ভুত কৌশলের পরিচায়ক। সমগ্র ধরণীর দেশ দেশান্তর হইতে বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া প্রাসাদ সজ্জিত করা হইয়াছে, দেখিলে মনে হয় যেন আমাদের চিরন্তন কল্পনার ইন্দ্রভবন প্রত্যক্ষ করিতেছি; গৃহসজ্জার প্রত্যেক আস্‌বাবটি অতি সুন্দর এবং যেখানে যে জিনিষ দিয়া যেমন করিয়া সাজাইলে সুন্দর হয় তেমনই করিয়া প্রাসাদের প্রতি কক্ষ সজ্জিত। চেয়ার চৌকী, কৌচ কেদারা, গালিচা দুলিচা প্রভৃতির গঠন, রং, সমস্তই সুরুচি-সঙ্গত। ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গের বহু প্রাসাদ দেখিবার আমার সুযোগ হইয়াছে। বরোদা, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, কর্পূরতলা প্রভৃতি অনেক স্থানে আমি গিয়াছি, কিন্তু সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে আমার মনে হয় হায়দ্রাবাদের "ফলকনুমা" প্রাসাদ, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ না হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। বরোদার "লক্ষ্মীবিলাস" প্রাসাদ ফলকনুমা অপেক্ষা বড়, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ উদ্যানও বৃহত্তর, কিন্তু ফলকনুমাই সুন্দরতর বলিয়া আমার বিশ্বাস। বরোদা রাজের মকরপুরা প্রাসাদ লক্ষ্মীবিলাস অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও সুন্দরতর বলিয়া আমার ধারণা। পৃথিবীতে সমস্ত বৃহৎ সামগ্রীই সুন্দর নহে, ক্ষুদ্রের মধ্যেও সৌন্দর্য্যের সমাবেশ অনেক সময়েই দেখা যায়।

"ফলকনুমা" প্রাসাদের নিম্নতল হইতে দ্বিতলে উঠিবার সোপানাবলী মর্ম্মর নির্ম্মিত, কিন্তু সচরাচর যেমন মর্ম্মরের সোপান শ্রেণী আমরা দেখিতে পাই উহা সেরূপ নহে—সোপানগুলি বাঁকিয়া বাঁকিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার এক একটি বাঁক পর্য্যন্ত যতগুলি সোপান আছে, সে সমস্ত গুলিই এক বৃহৎ মর্ম্মর খণ্ড হইতে কাটিয়া একত্র সংযুক্তভাবে বাহির করা এবং আমার মনে হইল সোপানের পার্শ্ব দিয়া যে রেলিং উঠিয়াছে তাহাও এক প্রস্তর-খণ্ড হইতে কাটিয়া প্রস্তুত। আমার অনুমান সত্য হইলে, কি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সকল ইতালি হইতে কত ব্যয় আনীত হইয়াছে! সোপানের উভয় পার্শ্বে যে সকল মর্ম্মর মূর্ত্তি দীপাধার হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে গুলির কেবল আকারই বৃহৎ নহে, উহাদের গঠন সৌন্দর্য্য অতি মনোহর, দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয়না। ভোজনাগার, নাচঘর, বৈঠকখানা, পুস্তকাগার, আফিস কামরা, শয়ন কক্ষ সমস্তই অনুরূপ দ্রব্য সম্ভারে অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত—সমস্তই হায়দ্রাবাদের রাজাধিরাজের বাসের উপযুক্ত। পারী নগরী হইতে কতকগুলি তৈল এবং জলচিত্র আনিয়া প্রতি কক্ষের ভিত্তি গাত্রে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি দেখিলে হঠাৎ জীবন্ত মানুষ বলিয়াই ভ্রম জন্মে। বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষগণের যে সকল তৈলচিত্র দেখিলাম সেগুলিও অতি সুন্দর।

"পুরাণা হাবেলী" নিজাম বাহাদুরগণের প্রাচীন প্রাসাদ, ইহাতে বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়না, ইহা বিগত কালের মুসলমান স্থাপত্য কলার বিধানানুসারে নির্ম্মিত। বৃহৎ প্রাসাদ, কক্ষগুলিও বৃহৎ, বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত, কিন্তু আমার মনে হইল দিল্লী, আগরা, ফতেপুর শিক্রী প্রভৃতি মোগল বাদশাহগণের প্রাসাদ দুর্গের দেওয়ানে খাস, দেওয়ানে আম, শিশমহল, গোসলখানা প্রভৃতির ন্যায় "ইণ্ডোস্যারাসিনিক্ স্থাপত্য-শিল্প সঞ্জাত, সুন্দর সুঠাম কক্ষ ইহাতে একটিও নাই এবং নিজাম বাহাদুরগণ ইহাতে বাস করিয়া আরামও অনুভব করেন না। হয়ত আমার এ অনুমান ভ্রান্ত, কিন্তু উভয় প্রাসাদ দেখিয়া আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছিল আমি তাহাই লিখিতেছি। প্রধান মন্ত্রীর বাস ভবন হইবে বলিয়া নাকি ফলকনুমা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু পরে নিজাম সরকার হইতে ইহা মূল্য দিয়া লওয়া হইয়াছে শুনিয়াছি; এই জনরব সত্য কিনা বলিতে পারিনা। শুনিলাম নিজামগণ সর্ব্বদা এই প্রাসাদে বাস করেন না, সময়ে সময়ে আসিয়া কিছুকাল থাকেন এবং বড়লাটগণ হায়দ্রাবাদে আসিলে, তাঁহাদের সাময়িক বাসের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক এই প্রাসাদ ধরণীর যে কোন রাজাধিরাজ বা শাহেন শাহের বাসের উপযুক্ত করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছে।

হোসেন সাগরের বিস্তীর্ণ বারিবক্ষে নৌবিহারের পাস সংগ্রহ করিলাম। ধূমকলের নৌকা (steam launch) ব্যবহার করিবার অনুমতি সেই পাসের উপরেই লিখিত থাকে এবং যে সময়ে যাইব তাহা জানাইলে সরকার হইতেই যথোপযুক্ত আদেশ সারেঙ্গ প্রভৃতি নৌচালকগণের উপরে প্রচারিত হয়। আমরা অপরাহ্নে যাইবার মনস্থ করিলাম। হোটেলের মালিক বুরি ও তাঁহার গৃহিণী চা পান করিবার ব্যবস্থা সঙ্গে লইলেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ নিজ নিজ পত্নী সহ আমাদের সহযাত্রী হইলেন—আমাদের নাতি ক্ষুদ্র একটি দল অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে হোটেল হইতে বাহির হইল। সে দিবস বুরি-গৃহিণী সাজ-সজ্জার একটু পারিপাট্য বিধান করিয়াছিলেন, 'চা' পার্টিতে যাইতেছেন বোধ করি ইহাই তাহার কারণ; তাঁহার অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ছিল না, কৃষ্ণকেশী সুন্দরী ইতালীয় যুবতীর অধিক অলঙ্কারের প্রয়োজনও হয় না। তিনি নিজ কক্ষ হইতে একটি পুষ্পগুচ্ছ (button hole) হস্তে বাহির হইয়া আমার কোটে লাগাইয়া দিলেন, আর সকলগুলি ইউরোপীয় নর-নারীর দ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের উপরে এক সঙ্গে পতিত হইল।

বুরি গৃহিণী আমার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন, তাহার অর্থ এই, যে—কেমন জ্বালাতন করিতেছি! তাঁহার এই রঙ্গপ্রিয়তা উহাদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিতেছিল। জ্বালার উপর জ্বালা হইল—তিনি আমার সহিত আরব জুড়ি যোজিত তাঁহার নিজের ফিটন গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন, অপর সকলের জন্য হোটেলের ভাড়া গাড়ী! শ্বেতের নিকট কৃষ্ণের এত সমাদর, ইহা কি প্রাণে সহ্য হয়?

দুই চারি বার দৃষ্টির ছুরিকা দ্বারা আমাদিগকে বিদ্ধ করিয়াই হয়ত ইউরোপীয় নর নারীগণের ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম হইল। আমরা গিয়া হোসেন সাগরের তীরে, যেখানে আমাদের জন্য ষ্টীম লঞ্চ খানি ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে গাড়ী লাগাইয়া সকলে নৌকায় আরোহণ করিলাম। চা পানের সরঞ্জাম এবং তৎসহ কিছু আহারীয় সামগ্রীও পূর্ব্বেই বুরিগৃহিণী নৌকায় পাঠাইয়াছিলেন, হোটেলের খানসামা সে সকল দ্রব্য-সম্ভার সহ আমাদের অপেক্ষায় ষ্টীমারের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা সকলে আরোহণ করিবামাত্র সারেঙ্গ নৌকা ছাড়িল।

স্বচ্ছবারিপূর্ণ, সুগভীর হোসেন সাগর সরোবরের সুবিস্তৃত বক্ষে নৌবিহার অতীব আনন্দদায়ক। ডিসেম্বর মাসেও হায়দ্রাবাদে শীত অধিক নহে, বাঙ্গালা দেশের ফাল্গুন মাসে বসন্তের প্রারম্ভে যতটা শীত, হায়দ্রাবাদে ডিসেম্বর মাসে তদপেক্ষা অধিক নহে, বরং কিছু কম। সেই জন্য, ষ্টীম লঞ্চখানি যখন হোসেন সাগরের প্রশস্ত বক্ষের উপর দিয়া চলিতে লাগিল, তখন তরণীর গতিবেগ জনিত মন্দমারুতের স্পর্শে বড়ই আরাম বোধ করিতেছিলাম। বিশাল সরোবরের মধ্যে স্থানে স্থানে কৃত্রিম দ্বীপ রহিয়াছে, ষ্টীমার সেই দ্বীপ গুলি প্রদক্ষিণ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া সরীসৃপ গতিতে চলিতে লাগিল। আমরা চা পান করিতে করিতে নানা দেশ বিদেশের গল্পের সঙ্গে আনন্দ হাস্যরোলে সমস্ত ষ্টীমার খানিকে মুখরিত করিয়া তুলিলাম। প্রদোষের স্তিমিতালোক যখন ক্রমে অন্ধকারে পরিণত হইয়া আসিল, তখন আমার মনে হইল "আর বেয়ে কাজ নাই তরণী;" সঙ্গীয় সহযাত্রী ও যাত্রিণীগণের অভিমত লইয়া নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলাম। সারেঙ্গ ঘাটে নৌকা লাগাইয়া তীর ভূমিতে অবতীর্ণ হইবার জন্য সিঁড়ি নামাইয়া দিল, বুরিগৃহিণী আমার হস্তাবলম্বন করিয়া তীরে নামিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে সকলের মুখের উপরে একবার তাঁহার কৃষ্ণ-তার-লোচনের বিদ্যুদ্দামতুল্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। অমনি দেখিলাম সকলের হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল ঈশান কোণের জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল—অবশ্য পুরুষদিগের মুখেই এইভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাও কৃষ্ণের প্রতি শ্বেতের দ্বেষসঞ্জাত সন্দেহ নাই।

মন্দবাতান্দোলিত বিপুল সরসীবক্ষে প্রদোষের এই নৌ-বিহারের কথা আমরণ ভুলিবার নহে। প্রশস্ত হ্রদের স্থানে স্থানে দ্রুমচ্ছায় সমন্বিত নাতিবৃহৎ দ্বীপাবলী রহিয়াছে, ধীর সমীরের মৃদুস্পর্শ বারিবক্ষে ক্ষুদ্র বীচিমালার সৃজন করিয়াছে, তীরসংলগ্ন সুদীর্ঘ রাজপথের পার্শ্বস্থ দীপাবলী দূর হইতে গগন গাত্রে, নক্ষত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে, সিতসপ্তমীর অপরিপূর্ণ চন্দ্রমা স্বচ্ছ সলিল মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। একত্র এত সৌন্দর্য্যের সমবায়ে এমন মায়ারাজ্য দেখিবার সৌভাগ্য মানুষের কদাচিৎ ঘটে, তাই সেদিনের সুখসম্ভোগের কথা আজও ভুলি নাই; আজীবন ভুলিব না।

গোলকুণ্ডার প্রাচীন দুর্গ দেখিবার হুকুমনামা সে দিনে স্বয়ং নিজাম বাহাদুর দিতেন; সে বড় কঠিন স্থান, শীঘ্র আদেশ পত্র পাওয়া পরম ভাগ্যের কথা হায়দ্রাবাদের লোকে বলিত, কারণ নিজাম বাহাদুরের মেজাজ বুঝিয়া পদস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা প্রার্থনা জানাইতে হইবে এবং সকল দিন তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়াও যাইত না; শুদ্ধান্তে তিনি

যখন বিশ্রাম উপভোগ করিতেন, সেখানে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজাম বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট আমি এবং নিশিকান্তবাবু গেলাম। দেখিলাম তিনি জাতিতে পার্শী, সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিলাত প্রত্যাগত, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক। নিশিবাবুর সহিত তাঁহার সামান্য পরিচয় ছিল, তিনি আমার সহিত ভদ্রলোকের আলাপ করিয়া দিলে, বিশেষ সৌজন্যের সহিত আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। দেখিলাম ভদ্রসন্তানের বিলাতী শিক্ষার গুণে, সময়ের মূল্যজ্ঞান প্রাচ্যজনের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে; তিনি কহিলেন, "ব্যাপার সহজ নহে, তথাপি আশা করি আজ সন্ধ্যার মধ্যে আপনার হোটেলে পাস পাঠাইতে পারিব, কাল আপনারা গোলকুণ্ডায় যাইতে পারিবেন এরূপ ভরসা করিতেছি।" শুনিয়াছিলাম অনেক সময় পাস পাইতে মাস লাগে, সেই দিন সন্ধ্যার পাস পাইব শুনিয়া আনন্দ ও বিস্ময় যুগপৎ মনে আসিল। বোধ করি বিস্ময়ের চিহ্ন আমার মুখে দেখিয়া ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বিস্মিত হইতেছেন, হইবার কথাও বটে। তবে, আজ পাস বাহির করিবার আশা কেন করিতেছি তাহা বলি; আজ অপরাহ্ণে কার্য্যান্তরে নিজাম বাহাদুর আমাকে তলব করিয়াছেন, সেই সুযোগে পাস পাইবার আর্জি পেশ করিব; আর্জি পেশ হওয়াই কঠিন, একবার পেশ হইলে পাস পাইতে বিলম্ব হয় না।"

আমি ভদ্রলোককে পুনঃ পুনঃ প্রচুর ধন্যবাদ

চাদর ঘাট-হায়দ্রাবাদ

জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার মূল্যবান সময়ের অপচয় করিলাম বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ বিদায় লইলাম। বস্তুতঃই সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সজ্জন পার্শীর পত্র-সহ পাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

হায়দ্রাবাদ হইতে গোলকুণ্ডা দূর পথ, বুরি-গৃহিণীর আরব জুড়ী ও ফিটন গাড়ী লইয়া ততদূরে যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তিনি দূর পথ বলিয়াই ভাল গাড়ী ও দ্রুতগামী অশ্ব লইবার জন্য বারম্বার আমায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "দূর পথ যাইতে হইলে দ্রুতগামী অশ্বই আবশ্যক, উহাতে সময় অল্প লাগে; আরও, রাত্রির আহারের পূর্ব্বেই ফিরিতে হইবে সে কথাটাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—যে দিক হইতেই দেখা যাউক দ্রুতগামী ঘোড়ার প্রয়োজন আছেই।" আমার যে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে, তবে ভদ্রতার অনুরোধে ভাড়াটিয়া ঘোড়া গাড়ী লইয়াই যাইব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বন্ধুবৎসলা বুরিপত্নী জোর করিয়া তাঁহার গাড়ী ঘোড়া যখন দিতেছেন, তখন আর কোন সঙ্কোচ আমার মনে রহিল না। প্রায় সমস্ত দিবস পথে এবং গোলকুণ্ডার কাটিবে, সেইজন্য হায়দ্রাবাদ হইতে বুরি গৃহিণী দিনের মত আহার্য্য অর্থাৎ রুটি, মাখন, ফল প্রভৃতি আমাদের সঙ্গে দিলেন।

আমরা পূর্ব্বাহ্ন আটটার সময়ে গোলকুণ্ডা যাত্রা করিলাম। সঙ্গী নিশিকান্ত, আমার সেক্রেটারী বাবু, ডাক্তার বাবু এবং শশিশেখর। ইউরোপীয় ভ্রমনকারি-গণকে সঙ্গে লইবার পাস পাই নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে লওয়া হইল না—তাহাতে বুরি গৃহিণীর মুখ কিছু প্রফুল্লই দেখিলাম। বিচিত্র এই নারীর মনের গতি! শুনিয়াছি ইউরোপে কৃষ্ণকায়ের আদর আছে, কিন্তু এই কৃষ্ণের দেশে স্বদেশী শ্বেতকায় অপেক্ষা কৃষ্ণকায়ের সমাদর আমি সেই প্রথম দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহার পরে জীবনে আরও দুই চারিজন শ্বেতকায় পুরুষ এবং স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, যাঁহারা মানুষের বর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আদর অনাদর, মর্য্যাদা অমর্য্যাদা দেখান না, মানুষকে মানুষভাবে দেখিয়াই তাহার প্রাপ্য তাহাকে দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যাইতে পারে। বুরি গৃহিণীর হোটেলে আমি যখন প্রথম যাই, সেই সময় হইতেই সম্ভবতঃ ব্যবসায়ের হিসবে এবং হয়ত বা তাঁহার স্ত্রীজনোচিত স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের বশে, আমাকে একটু খাতির যত্ন করিতেছিলেন। পরে যখন তাঁহার স্বদেশবাসিগণের ঈর্ষা বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার যুবতীসুলভ রঙ্গপ্রিয়তা অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এবং সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে সাড়ম্বরে পক্ষপাত দেখাইয়া তাঁহার স্বদেশীয় শ্বেতাঙ্গগণের ঈর্ষার ইন্ধন যোগাইতে আরম্ভ করিলেন। হোটেলের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীর রঙ্গপ্রিয়তায় আমার অনেক সুবিধা হইয়া গেল—অর্থদ্বারা যে সকল সুবিধা ক্রয় করা যায় না, আমার বিনা ব্যয়ে বিনা আয়াসে তাহা লাভ হইতে লাগিল—যথা কর্ত্রীর নিজ ব্যবহারের গাড়ী, ঘোড়া, মূল্যবান বিলাতী পুষ্পের button hole, হোটেলের সাধারণ খাদ্যের স্থলে নিত্য বিশেষ ব্যবস্থা (special menu)।

হায়দ্রাবাদের চাদরঘাট হইতে (যেখানে আমাদের হোটেল) গোলকুণ্ডার কেল্লার দ্বারে উপস্থিত হইতে আমাদের এক ঘণ্টারও কিছু অধিক সময় লাগিল। কয় মাইল পথ তাহা আমার এখন ঠিক স্মরণ নাই, দ্রুতগামী আরবীয় অশ্ব যুগলের যখন এতখানি সময় লাগিল, তখন হোটেলের ঠিকা-খাটা ঘোড়া উহার দ্বিগুণ সময় লইত সন্দেহ নাই। সেজন্য মনে মনে বুরি গৃহিণীকে অকপটে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ভাগ্যে তিনি জোর করিয়া তাঁহার নিজের গাড়ী ঘোড়া দিয়াছিলেন! সঙ্গী শশিশেখর আমার সঙ্কোচকে বারবার ধিক্কার দিয়া বুরি গৃহিণীর সৌজন্যের সর্ব্বাধিক প্রশংসা করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী থামিলে দেখিলাম গোল-কুণ্ডার দুর্গ প্রবেশের প্রকাণ্ড তোরণদ্বার সম্মুখে—দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। দিল্লী আগ্রার প্রাসাদ

গোলকুণ্ডা দুর্গ

দুর্গের দ্বার পথগুলিও প্রকাণ্ড, তাজের তোরণ বৃহৎ, লক্ষ্ণৌএর ইমামবাড়ার দ্বারও সুউচ্চ সন্দেহ নাই, কিন্তু গোলকুণ্ডার তোরণের নির্ম্মাণ অন্য প্রকারের। ইহার গঠন বিভিন্ন এবং যে পথে প্রবেশ করিতে হয় সে প্রবেশ পথও প্রশস্ত—তবে বহুদিন হইল দেখিয়াছি, এখন ভাল মনে নাই, ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না যে সূক্ষ্ম পরিমাপ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা এই দ্বারপথই প্রশস্ত হইবে কিনা। ফলতঃ ভারতের বিরাট তোরণগুলির মধ্যে যে ইহা একতম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দ্বারপথে অনেকগুলি হায়দ্রাবাদ ল্যান্সার্সের (Hyderabad Lancers) সিপাহী সশস্ত্র হইয়া পাহারা দিতেছে। তাহাদের পরিচ্ছদের জাঁক জমকও প্রচুর। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া আসিয়া সিপাহীয়ানা ধরণে গুম্ফদ্বয় একত্র সংযুক্ত করিয়া সেলাম করতঃ প্রবেশের পাস চাহিল। পাস খানি আমার নিকটেই ছিল, সিপাহীর হস্তে দিবা মাত্র সে পুনরায় মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন করিয়া গুল্‌ফের উপরই ভর করতঃ অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ঘুরিয়া তাহার নিজস্থানে গিয়া দাঁড়াইল। রঙ্গপ্রিয় বাক্‌পটু শশিশেখর আমাকে কহিল, "নিশ্চয় উহার জুতার গোড়ালিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি চাকা লাগান আছে, নতুবা মানুষ অমন ভাবে কি ঘোরা ফেরা করিতে পারে?" আমি কহিলাম, "সিপাহীদিগের ঐরূপই নিয়ম, উহাদিগকে ঐ সকল শিক্ষা করিতে হয়।" শশী বলিল, "ভাগ্যে আমি সিপাহী হই নাই, নতুবা ঐ ঘোরা শিখিতেই জন্মান্তরের মধ্য দিয়া আমাকে আবার ঘুরিয়া আসিতে হইত, এক জন্মে ঐ ঘোরা শিক্ষা করা আমার দ্বারা হইত না।"

বাহামনী রাজ্য যখন অধঃপতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইল, তখন কুতুবশাহী বংশের তুর্কী

আদিপুরুষ কর্ত্তৃক গোলকুণ্ডা নগর এবং এই দুর্গ প্রস্তুত হয়। ঔরঙ্গজীব মোগল অধিকারে ইহাকে আনিবার জন্য বহু যুদ্ধ বিগ্রহে বহুকাল ধরিয়া লিপ্ত ছিলেন। এখন ইহা হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের অধীন রহিয়াছে। নগরের সমৃদ্ধির অবশিষ্ট আর বিশেষ কিছু নাই, কেবল দুর্গটি নিজাম বাহাদুরের খাজনাখানা এবং রাজ বন্দিগণের কারাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইজন্যই ইহার সর্ব্বত্র সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

শশিশেখরের রঙ্গ লাগিয়াই আছে, সে কহিল, "দেখ এত সিপাই শাস্ত্রী কেন, জান? ছেলেবেলায় পড়েছ ত 'গোলকুণ্ডা প্রদেশের হীরক আকর', এখনও বোধ করি এখানে হীরা আছে, দেখ ত যদি কুড়াইয়া এক আধখানা কোহিনুরের মত হীরা পাওয়া যায়; তত বড় না পাইলেও ক্ষতি নাই, একটু ছোট হইলেও আমাদের চলিয়া যাইবে, কেমন? কোহিনুর খানা বিলাতে গিয়া ত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, আমরাও না হয় তিন চারি টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লইব, কি বল?" এইরূপ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আমরা দুর্গের অভ্যন্তর ভাগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হায়দ্রাবাদ সহর হইতে গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগই ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং দুর্গের তোরণ হইতে অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডও ক্রমোন্নত। দুর্গতল হইতে সুলতানের প্রাসাদ ভবনের উচ্চতম কক্ষে যাইতে স্থানে স্থানে বহু সোপানাবলী আরোহণ ও অবরোহণ করিতে হয়। সেই শ্রমসাধ্য সোপানারোহণ করিতে করিতে আমার উরু জানু জঙ্ঘায় বিষম বেদনা উপস্থিত হইল, স্থানে স্থানে বিশ্রাম না করিয়া চলাই অসম্ভব হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া দুইদিন পরিপূর্ণ বিশ্রামের পর আমার সে কষ্টের লাঘব হয়। মুসলমান আমলের স্থপতিগণ কেন সোপানগুলি সুখে এবং অনায়াসে আরোহণ অবরোহণের উপযোগী করিতেন না ইহার কারণ বুঝা যায় না; মোগল বাদশাহ হুমায়ুন নমাজের জন্য ত্বরান্বিত হইয়া নামিবার সময়ে পদস্খলিত হইয়া সোপান হইতে নিম্নে পতিত হন, সেই পতন-জনিত বিষম আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়, তথাপি পরবর্ত্তী কালে যে সকল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সোপানাবলীও পূর্ব্ববৎ দুরারোহই রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় স্থাপত্যে সোপান নির্ম্মাণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় এবং বহুব্যয়ে সোপান গুলি সুন্দর এবং আরোহণ অবরোহণ সুখসাধ্য করিয়া নির্ম্মিত হয়; মুসলমান যুগে বোধ করি সোপান নির্ম্মাণের ব্যয় নিতান্তই অপব্যয় মনে করা হইত এবং সেই জন্য যত অল্প ব্যয়ে অল্প স্থান অধিকারে সোপান নির্ম্মিত হইতে পারে তাহারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গৃহস্থের বাস ভবনের সোপান এমন কদর্য্য যে প্রতি পাদক্ষেপে আমাদের মনে হয় এইবার বুঝি ভূমিশায়ী হইতে হইবে।

হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় যে বিশাল বাহামনি সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, কাল-বশে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আজ কেবল "হোসেন গঙ্গা" এই নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই ধ্বস্ত সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপের উপরে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদ নগর প্রভৃতি রাজ্যের অভ্যুত্থান একদিন হইয়াছিল, কিন্তু ভস্মলোচন ঔরঙ্গজীবের অগ্নি দৃষ্টি এই সকল সমৃদ্ধ রাজ্যের উপর আপতিত হইয়া অচিরে সে গুলিকে ছার-খার করিয়া দিল। তাহার করাল দংষ্ট্রার মধ্যে পড়িয়া আদিলশাহী, কুতবশাহী, নিজামশাহী বংশগুলি নিঃশেষে নিষ্পেষিত হইয়া কোন্ ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিল, আজ তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রহিয়াছে কেবল বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগরের কয়টি পাষাণ দুর্গ, যাহারা কায়ক্লেশে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দর্শকের চিত্তে গত গৌরব ও হৃত বৈভবের ক্ষীণ আভাস প্রদান করিতেছে। বহু আয়াসে সোপান আরোহণ করিয়া প্রাসাদ দুর্গের সর্ব্বোচ্চ কক্ষ গুলির

মধ্যে যখন বিচরণ করিতেছিলাম, তখন জনহীন বিশাল পুরীর কক্ষকুট্টিমে স্বীয় পদশব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাই নাই, এমনই ভীষণ নিস্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করিতেছিল।

এক দিন এই পাষাণ প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে জলযন্ত্র হইতে সুগন্ধী জলধারা উৎসারিত হইয়া সমস্ত রাজপুরীর নিদাঘতাপকে প্রশমিত করিয়া রাখিত; নৃত্যকুশলা কলকণ্ঠী নটীর নূপুরনিক্কণের সহিত ত্রিতন্ত্রীর মধুর ঝঙ্কার মিশ্রিত হইয়া এই রাজভবনকে একদিন ইন্দ্রভবনে পরিণত করিত; বিলাসের লীলা নিকেতন এই পাষাণপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উর্ব্বশীমদভঞ্জিনী ইরাণী যুবতীবৃন্দের কোকনদনিন্দী চরণ স্পর্শে গৃহকুট্টিমের প্রাণহীন পাষাণেরও বোধ করি একদিন রোমাঞ্চ হইত। আজ সব নীরব, সমস্ত নিস্তব্ধ। কচিৎ সমাগত দর্শনেচ্ছু পথিক, কঠিন কক্ষতলে তাহারই পদক্ষেপোত্থিত কর্কশ শব্দে স্বয়ং চমকিত হইয়া উঠিতেছে! একদিন হয়ত এই বিশাল রাজপুরী দিনারম্ভ হইতে দিনান্ত পর্য্যন্ত অর্থী প্রত্যর্থিগণের আবেদন-রবে মুখরিত থাকিত, এমন দিন ছিল যখন জন্ম পরিণয়াদি আনন্দ ব্যাপারের উৎসব কলরবের সহিত তোরণ শীর্ষের দুরশ্রুত নহবত ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মোহে পুরবাসী জনকে দিন-যামিনী পুলকাচ্ছন্ন করিয়া রাখিত; এমন দিন গিয়াছে যখন নব ফাল্গুনের নবীন বসন্তোৎসবে উন্মত্ত নরনারী কস্তুরি কুঙ্কুমে, গুলাবে গুলালে, উশীরে চন্দনে, ঋতুরাজকে অভ্যর্থনা করিয়া লইত। আবার হয়ত এক দিন অযুত

চার-মিনার-হায়দ্রাবাদ
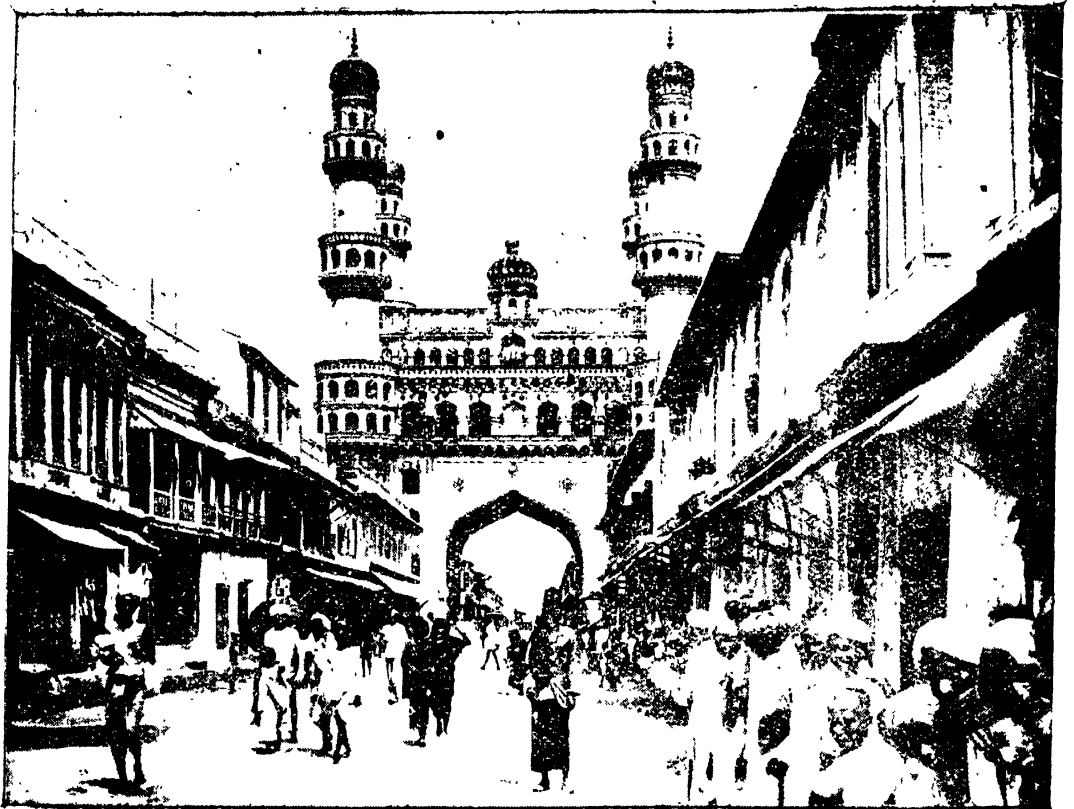
অশ্বারোহীর অধিনায়করূপে দুর্গাধিপতি তুর্কবীর ঐরাবতনিন্দী গজেন্দ্র আরোহণে বীরদর্পে শত্রু দমনে বাহির হইতেন, গজ-পৃষ্ঠ বাহিত গর্ব্বিত অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত হরিৎ পতাকা, গোলকুণ্ডার আকাশ সেইদিন আলোকিত করিয়া রাখিত, আর অশ্বারোহী সেনা সমূহের করধৃত সৌরকর প্রতিফলিত উজ্জ্বল বর্শাফলক বৈধব্যভয়ভীতা বৈরিবনিতাগণের হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ করিয়া দিত—আজ সে সমস্তই ইতিহাসে ও কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে।'

গোলকুণ্ডার প্রাসাদ দুর্গের নির্জ্জন কক্ষে দাঁড়াইয়া সুদূর অতীতে যাহা সত্য ছিল তাহাই যেন আবার সত্য হইয়া কাল-যবনিকার অন্তরাল হইতে একটির পর একটি আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। সত্যই যেন সম্মুখে দেখিতেছি কুতুবশাহী সুলতানের উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত বিরাট বিশাল-কক্ষ, সুস্নিগ্ধ গন্ধবারি পরিপূর্ণ দর্পণ খচিত স্নানাগার, মদা সমস্বর-গমনা অনবদ্যাঙ্গী সুরকেশীয়া নারীর সারি—সারি—সারি; পিঞ্জরস্থ শুক কোকিল বুলবুলের মধুর ধ্বনি যেন সত্য সত্যই আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। সত্যই যেন দেখিতে লাগিলাম, নারী প্রকোষ্ঠের ভূষণ শিঞ্জিতের তালে তালে বিস্তৃতকলাপ কেকাবলের উন্মত্ত নর্ত্তন; সত্যই যেন বারুণী বিঘূর্ণিতারুণ-নয়না-রূপজীবিনী গণের জঘনস্থ রশনার রণন্ আমার কর্ণরন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল, কামিনীগণের নিতম্বাবলম্বী হেম-সূত্রের ছিন্নাংশ কক্ষতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া গত যুগের উদ্দাম মন্মথ-বিলাসের পরিচয় দিতেছিল; দুই শতাব্দী পূর্ব্বের যুঁই চামেলী বেলার পরিমলের সহিত নারী অঙ্গের হেনার সৌরভ যেন ভাসিয়া আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুস্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল।

ফলতঃ গোলকুণ্ডার প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে করিতে আমি স্থান কাল পাত্রের জ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সঙ্গীগণের কণ্ঠস্বরে আমার হৃত চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, আমি যেন আরব্যোপন্যাসের শাহাজাদীর মায়াময় স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তব ধরণীর কঠিন ভূমিতলে নামিয়া আসিলাম; সমস্ত অন্তর মন যেন কেমন বিষাদ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। মুসলমান গৌরবের অধঃপতনের কথা ভাবিতে ভাবিতে দাক্ষিণাত্যের শেষ হিন্দু নরপতি বিজয়-নগরাধীশ্বরের কথা মনে আসিল, যেখানে হিন্দু গৌরবের শেষ সৎকার হইয়া গিয়াছে সেই তালিকোটার মহাশ্মশানের কথা মনে পড়িল, আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। একটু ক্ষিপ্রতার সহিত অবশিষ্ট দ্রষ্টব্যগুলি দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হায়দ্রাবাদে ফিরিলাম।

দুর্গের সোপানাবলী আরোহণ জনিত ক্লান্তি এবং উরুজানুজঙ্ঘার বেদনায় আমি বড়ই কাতর হইয়াছিলাম—তত অধিক কাতর হইবার আশঙ্কা আমি করি নাই, কারণ সে বয়সে ব্যায়াম এবং ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ায় শ্রম করা আমার অভ্যস্তই ছিল, কেবল ক্রমাগত সিঁড়ি উঠানামা করিতেই ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছিল বুঝিলাম। গরম জলের টবে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলাম। তাহাতে দুটি উপকার হইল, প্রথমত পথের ধূলায় সমাচ্ছন্ন সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কৃত হইল, দ্বিতীয়ত পায়ের ব্যথা অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। বুরি গৃহিণীর প্রসাদাৎ আহারটি পরিপাটি রূপে সমাধা হইল; দেখিলাম আমা অপেক্ষা নিশিকান্ত বাবুর ক্ষুধার বেগ সমধিক, তিনি সে রাত্রে প্রত্যেক ভোজ্য পদার্থ দুই তিনবার করিয়া লইলেন এবং পাত্রাবশিষ্ট কিছুই রহিল না। অনেক সময়েই দেখিয়াছি নিশি বাবুর জঠরাগ্নি প্রবল, আহারের প্রস্তাব হইলে কখনই তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখি নাই, সময়ে অসময়ে যখনই হউক আহারের অনুরোধ করিলেই সে অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতেন না। নিশি বাবু বহুকাল হইল লোকান্তরিত হইয়াছেন। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, আমরা আমাদের হায়দ্রাবাদ অবস্থান কালে তাঁহার নিকট হইতে পাস প্রভৃতি পাইবার অনেক সাহায্য পাইয়াছি, তাহা না পাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাস বাহির করা ও সকলগুলি দ্রষ্টব্য স্থান এবং পদার্থ দেখা একরূপ অসম্ভব হইত।

সমস্ত দিবসের শ্রমজনিত ক্লান্তির পরে মনে করিলাম শয্যার সহিত অঙ্গের সংযোগ হইবামাত্র নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহার সুকোমল পদ্মহস্ত আমার চক্ষুর উপরে বুলাইয়া দিবেন, কিন্তু তাহা হইল না; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেই, আমার নিমীলিত নেত্রের সম্মুখে, দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বের মুসলমান রাজধানী গোলকুণ্ডার গৌরবময় দিনের কাল্পনিক ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সে দিবস তিথি ছিল পূর্ণিমা কি তাহার কাছাকাছি—ত্রয়োদশী বা চতুর্দ্দশী। আমার শয়ন কক্ষের বাতায়ন দিয়া পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমার জ্যোৎস্না-স্রোত অবাধে কক্ষমধ্যে ঢালিয়া পড়িতেছিল, কক্ষতলের শ্বেতমর্ম্মর, ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ বারিধির তরঙ্গ-শীর্ষের ফেনরাশির মত শুভ্র দেখাইতেছিল। হায়দ্রাবাদে শীত তেমন অধিক নহে, আমাদের দেশের বসন্ত কালের মত, সুতরাং কক্ষের সকলগুলি বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেই জন্যই চন্দ্রকরও অবাধে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। গৃহস্থ দীপ-শিখা নির্ব্বাপিত না করিলে চাঁদের আলো ভাল করিয়া দেখা যায় না, তাই আমি শয্যা হইতে উঠিয়া শয়ন কক্ষের প্রদীপটি স্নানের ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিতেই দেখি, চন্দ্রকিরণপাতে আমার নির্জ্জীব কক্ষ যেন সজীব হইয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। সেই চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত নির্জ্জন কক্ষে শয়ন করিয়া বিনিদ্র নয়নে ভাবিতে লাগিলাম, মুসলমান সুলতানগণ কি নিয়তই দীপালোকে উজ্জ্বলিত বিলাস কক্ষে অপ্সরী বিনিন্দিতা সুন্দরীগণের সাহচর্য্য জনিত আনন্দ সম্ভোগে কৃষ্ণ শুক্ল নির্ব্বিশেষে সকল রজনীই কাটাইয়া দিতেন, কিংবা কদাচিৎ বাসন্তী বা শারদ রজনীর পরিপূর্ণ চন্দ্রকিরণে আকৃষ্ট হইয়া বিলাস ভবনের দীপ নির্ব্বাপিত করিবার আদেশ প্রদান করিতেন? ভোগ বিলাসের কৃত্রিম অনুষ্ঠানেই সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল বাহিত হইত, কিংবা ষড়ঋতুশালিনী প্রকৃতির আনন্দ আয়োজনে মুগ্ধ হইবার অবসর কখনও তাঁহাদের ঘটিত? আবার মনে আসিল আরব, ইরাণী, তুরকেশীয় ক্রীতদাসীগণের কথা; মনে আসিল দূর দেশান্তর হইতে মাতৃক্রোড়-বিচ্ছিন্না কুমারী, এই ঈর্ষা দ্বেষময় এবং ঐশ্বর্য্য ও পাপপরিপূর্ণ পাষাণ পুরীতে নিয়ত ভোগ বিলাসের অবসাদে, বৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর মত অকালে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িত—কেমন করিয়া পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনতা লতিকার ন্যায় ইরাণী তরুণী তাহার যৌবন সমাগম-জনিত সরম-সন্নত দেহের পরিপূর্ণ সুষমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীগণের ঈর্ষানল জ্বালাইয়া তুলিত, এবং ষড়যন্ত্রসঙ্কুল রাজপুরীর কোন অন্ধকক্ষে অজ্ঞাত-মরণের মধ্যে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইত। এইরূপ নানা চিন্তা মনের মধ্যে আসিয়া আমার মস্তিষ্ক উষ্ণ করিয়া তুলিল, উন্মাদ কল্পনার ইন্দ্রজাল বলে দ্বিশতাব্দী পুর্ব্বের মুসলমান সময়ের নরনারীর কাল্পনিক মূর্ত্তিগুলি ছায়া-বাজির পুত্তলিকার মত একটির পর একটি আমার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। বারম্বার উঠিয়া মুখে মাথায় শীতল জল দিতে লাগিলাম, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই রাজান্তঃপুরের যৌবন ভারাবনতা ইরাণী নারীর মায়া মূর্ত্তি ষড়যন্ত্রের ফেনিলাবর্ত্তোত্থিত অস্বাভাবিক, ভীষণ, নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে যেন হাহারবে লুটাইয়া পড়িতেছে, দেখিতে লাগিলাম। এইরূপে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, কখন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। চা আনিয়া ভৃত্য যখন আমাকে ডাকিয়া তুলিল তখন দেখি পূর্ব্ব রজনীর কৌমুদী-প্লাবনের পরিবর্ত্তে প্রাতঃসূর্য্যের বিমল কিরণ ধারায় আমার শয়নকক্ষ ভরিয়া গিয়াছে; বেলা তখন প্রায় আটটা।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন
(চিত্রকর শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন)
যৌবনে—চিমটা কম্বল চরণ সম্বল হিমালয়ে বসবাস।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হাওদা শিকার

এইবার একটী অত্যাশ্চর্য্য গল্প বলিব। ইহার সঙ্গে শিকারের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, শিকার উপলক্ষেই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল বলিয়া, এ স্থলে ইহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা শ্রীপুর হইতে ক্যাম্প উঠাইয়া, আরও কয়েক স্থানে শিকার করিয়া, শেষ ক্যাম্প সিলেটের 'তরঙ্গিয়া' নামক স্থানের একটী নদীর পারে করি। একদিন ১০।১২ মাইল দূর হইতে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দুইজন লোক আসিয়া বাঘের খবর দিল—অমুক গ্রামে রক্তি নদীর অপর পারে, সেই দিনই বাঘে দুইটি গরু মরি (Kill) করিয়াছে। সেবার সেই ক্যাম্পে, আমাদের কেমন অযাত্রা হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন স্থান হইতে বাঘের খবর পাইতাম, কিন্তু প্রতিদিনই বিফল হইয়া ফিরিতাম। কোনদিন টাইগার লেপার্ড হইয়া দাঁড়াইত, কোনদিন বা অদৃষ্টগুণে তাহাও জুটিত না। আবার কোনদিন বা 'মরি' খাইয়া বাঘ সে জঙ্গল হইতে চলিয়া গিয়াছে, এরূপও ঘটিত। কখনও বা ঘনবিস্তৃত জঙ্গলের জন্য, অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপ নানা কারণে কয়েক দিনের বিফলতায়, সকলেই প্রায় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলাম; এমন সময় এই সংবাদটী পাইয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রমাগত কয়েক দিনের বিফলতায়, ও শিকার স্থানের দূরত্বের কথা উল্লেখ করিয়া, বড় বেশী উৎসাহ দেখাইলেন না। যাহা হউক স্থির হইল, পরদিন আমরা 'প্যাড্' হাতীতে (গদীর হাতীতে) পরে যাইব, একটু সকাল করিয়া কতকগুলি বাজে হাতীতে হাওদাগুলি রওয়ানা করিয়া দিব, ইহাতে হাওদার হাতীগুলির পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে।

তদনুসারে পরদিন প্রত্যূষে, একজন খুঁজিকে দিয়া হাতীগুলি রওনা করাইয়া দেওয়া হইল, একজন আমাদের অপেক্ষায় থাকিল।

অনুমান ৯ ঘটিকার সময় রওনা হইয়া প্রায় ১২টার সময় আমরা 'রক্তি' নদীর পারে গিয়া দেখি, হাতীগুলি আমাদের প্রতীক্ষায় বিশ্রাম করিতেছে।

নদীর অপর পারে খানিক দূরেই শিকারের স্থান। এই স্থানে নদীর অবস্থাটা একটু বলা আবশ্যক। ইহা একটি মন্দস্রোতা ও স্বল্পপরিসরা নদী, উভয় তীর নানাবিধ ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজি ও জঙ্গলে আচ্ছাদিত। বর্ষায় পারাপারের জন্য একটি খেয়াঘাট আছে; লোকজন ও গো-মহিষাদি চলিতে চলিতে উহা একটি ডোবার মত হইয়া গিয়াছে। স্রোত ছিল না বলিয়া, সাধারণতঃ সাঁতরাইয়াই সকলে পার হয়; কিন্তু ঐ ডোবার মধ্যস্থলে জল অত্যন্ত গভীর ছিল, বোধ হয় ১০।১২ হাতের কম হইবে না। হাওদা ও গদীগুলি পার করার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে নৌকা আনার বন্দোবস্ত করিয়া, হাতীগুলিকে পার করার জন্য হুকুম দেওয়া হইল। মাহুতগণও হাতীগুলিকে 'এলোমেলো' ভাবে জলে নামাইয়া পার করিতে লাগিল। কতক পার হইয়াছে, কতক বা ডুবিয়া ডুবিয়া সাঁতার দিতে দিতে পার হইতেছে, সে এক মনোহর দৃশ্য! মাহুতগণ, কেহ বা হাতীর পিঠে দাঁড়াইয়া, কোমর অবধি, কেহ বা বসিয়া গলা অবধি ডুবিয়া ডুবিয়া যাইতেছে। ময়মনসিংহ কালীপুরের ভূম্যধিকারি, স্বর্গীয় ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের 'মধুমতী' নাম্নী একটী কুন্কী হাতী, খানিকটা সাঁতরাইয়া যাওয়ার পরই, হঠাৎ যেন 'ঘুরপাক" খাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই

প্রথমতঃ মনে করিলাম, হাতীটী জলে খেলা করিতেছে। কিন্তু মাহুত ক্রমেই জলে ডুবিতে লাগিল ও "আমার হাতী গাঙ্গে নিল, গাঙ্গে নিল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন যেন হাতী ক্রমেই ডুবিয়া যাইতেছে, মাহুতও হাতীর উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে মাহুতের গলা পর্য্যন্ত তলাইয়া গেল। তখন হাতীর শরীরের আর কিছুমাত্র দেখা যায় না; কেবল শুঁড়ের ডগাটী জলের উপর নড়িতেছে ও তাহা দ্বারাই নিশ্বাস ফেলিতেছে। এদিকে মাহুত চীৎকার করিতে করিতে যখন ডুবিয়া যায় যায় হইল, তখন আর হাতীর উপর থাকিতে না পারিয়া, জলে সাঁতার দিয়া পার হইয়া আসিল। হাতীটীও সঙ্গে সঙ্গে তলাইয়া গিয়া, জলের নীচে ক্রমাগত ২৩ মিনিট 'ভুরভুরি' কাটিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বুঝিলাম সব শেষ হইয়াছে।

অন্যান্য মাহুতগণ এই দৃশ্য দেখিয়া, কেহ কেহ তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল, কেহ কেহ বা ফিরিয়া আসিল। আমরা সকলেই পারে দাঁড়াইয়া 'চেঁচামেচি' ও 'হা-হুতাশ' করিতে লাগিলাম। ইহা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? এত বড় প্রকাণ্ড একটা হাতী যে নিমেষের মধ্যে স্রোতহীন ডোবায় এই ভাবে সিকি দু-আনীর মত ডুবিয়া যাইতে পারে, এইরূপ দৃশ্য দেখা দূরে থাক, কোনদিন কল্পনাও করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে কোন কোন সিলেটী মাহুতের নিকট 'গাঙ্গে হাতী নেয়' এইরূপ গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা কোনদিন বিশ্বাস করি নাই। এইবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে একবার আমাদের 'নয়তারা' নাম্নী একটী কুন্‌কী হাতী, পায়ে 'বাণ্ডা ভরা' (জোতন দেওয়া) থাকা সত্বেও, ছুটিয়া বর্ষার বিস্তীর্ণ তরঙ্গান্দোলিত খরস্রোতা যমুনা নদী, পোড়াবাড়ী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কোন চর হইতে উজান বহিয়া সাঁতরাইয়া, সুবর্ণখালি আসিয়াছিল। সেদিনও মহারাজ শশিকান্তের 'হরি' নাম্নী হস্তিনী, ঐরূপ 'বাণ্ডা বাঁধা' অবস্থায় বর্ষায় সুপ্রশস্ত মেঘনা নদ সাঁতরাইয়া আশুগঞ্জ হইতে ভৈরব আসিয়াছিল। অথচ এইরূপ পয়ঃপ্রণালী সদৃশ নদীতে এই প্রকার অসম্ভব ঘটনা চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়া গেল। ইহাতেই মনে হয়, হাতীটীর সাঁতার দেওয়ার সময়, পায়ে কোনরূপ ক্র্যাম্প বা অন্য কোনরূপ ব্যারাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই বেচারী আর উঠিতে পারে নাই। মাহুতগণ কিন্তু তাহা বিশ্বাস করে নাই। তাহাদের ধারণা "দেও" বা "ভূতে" উহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

এই দুর্ঘটনার পর, সেদিন আর আমাদের শিকার হইল না, সকলেই বিমর্ষ-চিত্তে ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন লোক পাঠাইয়া দেখা গেল, হাতীটী ডোবার কিছু ভাটিতে ফুলিয়া ভাসিতেছে।

এইরূপ আর একবার রাজা জগৎকিশোরের প্রায় ১১।॰ ফিট্ ঐরাবৎ সদৃশ বিশালকায় ভোলানাথ নামক বড় আদরের মাকুনা; জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা দিতে ঢাকার পথে 'কাওরাইদের' নিকটবর্ত্তী রক্তি নদী অপেক্ষাও, একটী ছোট খালে ঠিক ঐরূপেই ডুবিয়া গিয়াছিল। অথচ এই সব নদী নালা, গো মহিষ ত দূরের কথা, ছাগল ভেড়া পর্য্যন্ত অনায়াসে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত "হাতীডুবি" যদি স্বচক্ষে না দেখিতাম, তবে ভোলানাথের এই কাহিনী শুনিয়া নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতাম না।

এখন বাঘের কথা বলি :—

সব বাঘের স্বভাব, সকল সময় সমান দেখা যায় না। কোন কোন বাঘ জঙ্গলে হাতী ঢুকিলেই; দূর হইতে শব্দ পাইয়া পলাইবার পথ দেখে; কোনটা আবার প্রাণান্ত পর্য্যন্ত বুঝিয়াও, জঙ্গল ত্যাগ করে না। যে সব বাঘ পূর্ব্বে তাড়া পাইয়াছে তাহারাই খুব চালাক ও ফন্দীবাজ হয়। কোন দুই জঙ্গলের মধ্যে মাঠ বা নদী থাকিলে, জঙ্গলে পা দিতে না দিতেই তাহারা নিঃশব্দে হঠাৎ মাঠে বাহির হইয়া অথবা নদী সাঁতরাইয়া পলাইয়া যায়। বাঘিনীর সঙ্গে বাচ্চা থাকিলে, তাহারা বাচ্চার মায়ায় জঙ্গল ত্যাগ করে না। কিন্তু পূর্ব্বে তাড়া প্রাপ্ত বাঘিনী, অনেক সময় বাচ্চার মায়া কিছুমাত্র

না করিয়া, উহাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কখন কখন আবার যে দিক দিয়া পলাইবার কোন সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় না, তাহারা সেই দিক দিয়াই শিকারীকে ফাঁকি দেয়। নদী পার হইবার সময় ইহারা খুব জোরে সাঁতরাইয়া পার হইয়া যায়। খুব স্রোতের মধ্যেও ইহারা জোরে সাঁতার দিতে পারে। সাঁতরাইবার সময় ইহাদের কেবল মাথাটাই দেখা যায়।

সাধারণতঃ প্রায় সকল বাঘই, প্রথমে পলাইবার চেষ্টা করিয়া, পরে আহত হইলে 'চার্জ্জ' করে। কিন্তু কতকগুলি এরূপ ভীরু প্রকৃতির হয় যে, সাংঘাতিক আহত হইয়াও, ক্রমাগত পলাইবার চেষ্টা করে। আবার কোন কোন বাঘের স্বভাব ইহার বিপরীত, জঙ্গলে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তাহারা ক্রমাগত 'চার্জ্জ' করিতে আরম্ভ করে। একবার সিলেটের "শৈধার গাঁও" নামক স্থানে এইরূপ এক বাঘের পাল্লায় পড়িয়া, আমরা বড়ই 'নাকাল' হইয়াছিলাম। জঙ্গলে ঢুকিতে না ঢুকিতেই ক্রমাগত ১২।১৩টী হাতীকে 'চার্জ্জ' ও জখম করিবার পর অগত্যা তাহার নিকট অপদস্ত হইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা, বাঘে চার্জ্জ করিয়া তাহাদের হাতী না ধরিলে, বুঝি বড় শিকারী হওয়া যায় না। খুব ভাল হাতী না হইলে, 'চার্জ্জ' করিয়া হাতীকে "বাল" করিবার সময়, কাহারও গুলি করা সম্ভবপর নহে। হাতীর ঝাকানিতে, তাহার তখন হাওদার শিক ধরিয়া কোনরূপে নিজকে রক্ষা করিতেই বিব্রত থাকিতে হয়, তখন আর আক্রমণকারীর প্রতিরোধ করিবার সুযোগ থাকেনা। তবে খুব শিক্ষিত হাতী হইলে স্বতন্ত্র কথা। এরূপ অবস্থায় অনেক সময়েই হাতীর ঝাকানিতে বাঘ পড়িয়া যায়, কোন কোন সময় সুবিধা হইলে, অপর শিকারী কর্ত্তৃক নিহতও হয়।

বাঘের চার্জ্জ-এর সময়েই তাহাকে মারা সুবিধা। চার্জ্জ-এর মুখে যদি উহাকে গুলি করিয়া ফিরান না যায়, তবে হয় হাতীর পা কামড়াইয়া ধরিবে, অথবা হাতীর উপর লাফাইয়া উঠিবে। একটু দূর হইতে চার্জ্জ করিলে, আরও নিকটে না আসিলে, গুলি লাগিবে না মনে করিয়া, গুলি না করা অত্যন্ত ভুল। অনেক সময় গুলি না লাগিলেও বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই, গুলির আঘাতে উহার সম্মুখের ধুলা মাটি উড়িতে ও বন্দুকের ধোঁয়া দেখিয়াও ফিরিয়া যায়। কোন কারণে রাইফেল আওয়াজ করিয়া আবার গুলি ভরিবার অবসর না পাওয়া গেলে, হাওদায় ছুর্‌রার বন্দুক থাকিলে, তাহাই আওয়াজ করা উচিত। তখন বাঘকে ফিরাইয়া দেওয়াই কায। আমাকে একবার এইরূপ একটু দূর হইতে চার্জ্জ করিলে, খুব কাছে আসিলে নিশ্চিত মারিতে পারিব মনে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। বাঘ আর একটু নিকটে আসুক মনে করিতে করিতে হঠাৎ যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। সম্মুখে একটী নালা ছিল, বাঘ সেই নালাতে নামিয়া পড়ায়, আমি আর দেখিতে পাই নাই, কিন্তু যখন নালা হইতে উঠিল, দেখা গেল আমার হাতীর পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আমার হাওদার হাতী দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু পা ঝাড়িতেছিল; বাঘটীকে মারিতে আমাকে একটুও বেগ পাইতে হয় নাই। যদি আমি উহাকে চার্জ্জএর সময় দূর হইতেই মারিতাম, তাহা হইলে বোধহয় উহাকে নিকটেই আসিতে হইত না। ইহা আমার নির্ব্বুদ্ধিতারই ফল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, অন্যান্য শিকারের মত হাওদা শিকারে 'বেট' না বাঁধিলে, অর্দ্ধেক শিকারও হয়না। 'বেট' বাঁধিলে, অনেক সময়ই উহাকে মারিয়া, জঙ্গল পাতলা হইলে, টানিয়া অনেক দূরেও লইয়া যায়। কিন্তু নিকটে ঘন আবরণ থাকিলে, অধিকাংশ সময়ই তাহাতে লইয়া রাখে; তখন আর দূরে যায় না। কিন্তু আবার নিকটে কি দূরে, যদি সুবিধা মত জঙ্গল না থাকে, তবে রাত্রেই যতদূর পারে খাইয়া চলিয়া যায়। কাযেই 'বেট' বাঁধিবার স্থান নির্ব্বাচন, একটু দক্ষতার কায। কোন বহুদূর বিস্তৃত ঘন জঙ্গলে বা একেবারেই

ঝাঁকা জঙ্গলে, কি কোন 'দাবা' জঙ্গলের নিকটে, 'বেট' বাঁধা বিধেয় নয়। তাহার ফল অনেক সময়েই নৈরাশ্যজনক হইয়া থাকে। 'বেট' বন্ধনকারীদের ইহা লক্ষ্য রাখা উচিত যে মরি করিলে, উহা এমন যায়গায় লইয়া না যাইতে পারে, যেখানে উহাকে পাওয়া অসম্ভব। বহুবার এইরূপ আনাড়ির হাতে কার্য্যভার দিয়া ঠকিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে গ্রাম্য কথায় 'পিয়াজ পয়জার' যাহাকে বলে, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে।

খুব ভাল জঙ্গলে ও সদা সর্ব্বদা চলাচলের স্থান দেখিয়া 'বেট' বাঁধিলেও কোন কোন সময় উহার আশ পাশ দিয়া বাঘকে ঘুরা ফিরা করিতে দেখা যায়, কিন্তু 'বেটের' দিকে কোন লোভ করে না। দুই একবার এমনও দেখিয়াছি যে বেটের চতুর্দ্দিকেই সমস্তরাত্রি ব্যাঘ্রদম্পতী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এক একবার কোন কোন স্থানে, উহাদের বসিবার ও মাটীতে গড়াগড়ি দিবার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।, উহাদের এই ব্যবহারকে আমরা কি বলিতে পারি? এইসব মাংসাশী, শিকারী পশুর পক্ষে, অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব হইলেও আমি ইহার অন্য কারণই অনুমান করি। আমার মনে হয় এই বেট বাঁধার মধ্যে এমন কিছু অস্বাভাবিকত্ব ছিল, যাহা আমাদের চক্ষে না পড়িলেও, উহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিয়াছিল যে. এখানে লোভ করিলেই বিপদে পড়িতে হইবে।

আবার এমনও দেখা গিয়াছে, খুব ভাল জঙ্গলে 'বেট' বাধিলেও, তাহাকে মারিয়া, আহার না করিয়া একেবারেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কখনও বা 'মরি' করিয়া অল্প একটু খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে, দিনে আর তাহাকে সেই জঙ্গলেই পাওয়া যায় নাই। প্রতি রাত্রেই আসিয়া একটু একটু করিয়া পচা মাংস আহার করিয়া যায়। ইহাদের এইসব ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ মরি করিয়া শিকারী কর্ত্তৃক "তাড়া" খাইয়াছিল, কাযেই এখন সতর্ক হইয়াছে।

একবার আশ্চর্য্য রকমে, একটী 'মরি' করা দেখিয়াছিলাম। কোন জঙ্গলে, একটী প্রাপ্তবয়স্ক ঘোটক শাবক 'বেট' বাঁধা হইয়াছিল। স্থানটী আমাদের তাঁবু হইতে ৪।৫ মাইল দূরে হইবে। আমাদিগকে প্রাতে একটী লোক আসিয়া সংবাদ দিল, ঘোড়াকে বাঘে জখম করিয়াছে কিন্তু উহা একেবারে মরে নাই। আমরা সেই সংবাদ পাইয়া গিয়া দেখিলাম, ঘোড়াটী পড়িয়া আছে, নড়িবার শক্তি নাই। ঘাড়ে বাঘের দাঁতের চিহ্নও দেখিলাম; বোধ হয় ঘাড়ের হাড় ভগ্ন বা কণ্ঠনালী ছিন্ন হয় নাই। আমরা নিকটবর্ত্তী সমুদয় জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, ব্যাঘ্রের সন্ধান না পাইয়া তাঁবুতে ফিরিবার সময়, একজন খুঁজিকে অতঃপর এই 'মরি' পুনঃ আসিয়া খায় কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিতে রাখিয়া গেলাম। পরদিন প্রাতে সংবাদ পাইলাম যে, 'মরিটী'কে স্থানান্তরিত করিয়াছে। আমরা পুনরায় গিয়া দেখিলাম, ঘোড়াটীকে পূর্ব্বস্থান হইতে ১০।১৫ হাত দূরে সরাইয়া নিয়াছে এবং উহার পিছনের একটী ঠ্যাং ছিঁড়িয়া নিয়াছে। সেই পা-খানা, আরও ১০।১৫ হাত দূরে একটী ঝোপের মধ্যে পড়িয়া আছে। পা খানা টানিয়া কি কামড়াইয়া ছিঁড়িয়াছে, তাহা ঠিক করা গেল না। ঘোড়াটী কিন্তু তখনও মরে নাই, হতভাগ্যের কি কঠিন প্রাণ! আমার হাতীর দারোগা আশ্রব আলী, উহার কষ্টের অবসান করিয়া দিয়াছিল। আমি জীবনে এরূপ ঘটনা আর কখনও দেখি নাই; এই জাতীয় বীভৎস দৃশ্য দেখিতেও ইচ্ছা করি না।

ব্যাঘ্রাদির এই সমস্ত চরিত্র বৈচিত্র্য লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহারা অমুক কায করিতে পারে, বা অমুক কায করিতে পারে না, এই সব কথা মনে করিয়া, শিকারীদের কোন উপেক্ষার ভাব মনে আনা উচিত নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

কাশ্মীর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৪—১৭ই ডিসেম্বর—রোজই বুখারী জ্বলিতেছে। সূর্য্যের মুখ বড় একটা দেখা যায় না। এইবারে বাঙ্গালী চাকুরিয়ারা কেহ জম্মু কেহ বা কলিকাতা শীতের ছুটিতে চলিয়া যাইতেছেন। কেহ মোটর কেহ লরি কেহ বা টঙ্গার ব্যবস্থা করিতেছেন। ২৪শে ডিসেম্বর যাইবার শেষ দিন, তাহার পর আর 'মরির' রাস্তায় যাওয়া সম্ভব হইবে না। তখন 'দোমেল' হইতে 'এবটাবাদের' রাস্তায় যাইতে হইবে, সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। শেষে কি এই সুদূর পর্ব্বত-প্রাকার-বেষ্টিত ভূস্বর্গে বন্দী হইয়া থাকিব? মোটরের ভাড়াও কমিয়া গিয়াছে। ১২০৲ হইতে ১৪০৲ টাকায় এখন একখানা পুরা গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। Season এ গাড়ীর ভাড়া ২২৫৲ মোটরে প্রায় দুই দিন, লরিতে তিন দিন, আর টঙ্গায় প্রায় পাঁচ দিনের পথ। ইহার মধ্যে তুষারপাত আরম্ভ হইলে যে কত দিনের পথ তাহা বলা কঠিন।

১৮ই ডিসেম্বর—আজ ১নং 'প' বাবু কলিকাতা রওনা হইবেন বলিয়া এক মোটর স্থির করিয়াছিলেন। ৯টায় মোটর আসিবার কথা ছিল কিন্তু ১১টায়ও আসিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনি আর একখানা মোটর স্থির করিলেন, সেও সুযোগ বুঝিয়া ১৯০৲ ভাড়া আদায় করিয়া লইল। আজ সকাল বেলা হইতেই আকাশ মেঘাবৃত ছিল, মাঝে মাঝে একটু বৃষ্টিপাতও হইতেছিল। সাড়ে বারোটায় ১নং 'প' বাবু রওনা হইলেন। আমরা তাঁহার জন্য বড়ই চিন্তিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে বেলা প্রায় ১টায় আকাশ পরিষ্কার হইয়া একটু রৌদ্র দেখা দিল।

১৯শে ডিসেম্বর—শীত ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। ঘরে দিন রাত বুখারি না জ্বালিলে পা মোজার ভিতরেও ঠাণ্ডা হইয়া উঠে। চারিদিন একটু অসুস্থতার জন্য বাড়ীর বাহির হই নাই। আজ সকাল বেলা অর্থাৎ সাড়েনয়টায় গুপ্‌করের দিকে রওনা হইলাম। রাত্রে বৃষ্টি হইয়া রাস্তা কিছু খারাপ হইয়াছে তবে সৌভাগ্যের বিষয় বরফ পড়ে নাই। এত শীত, কিন্তু দুই মাইল হাঁটিতেই গা গরম হইয়া উঠিল। এখন আর চারিদিকের পাহাড় দেখা যায় না। সমস্ত দেশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন। আর সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে পত্রশূন্য বৃক্ষের সারি ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে।

Mr. Q এর সহিত দেখা হইল। Q পরিবার গতকল্য মোটরে জম্মু হইতে "বানিহাল পাস্" (Banihal Pass) হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। Mr Q বলিলেন যে অতি কষ্টে তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। ৯২০০ ফুট উচ্চ বানিহালের রাস্তা, পার্শ্বেই বিরাট 'খাদ', তাহার উপর ঘণ্টায় প্রায় এক ফুট বরফ পাত হইতেছে। কুলীরা রেসিডেণ্ট সাহেব এই পথে জম্মু যাইবেন বলিয়া বরফ কাটিয়া রাস্তা পরিষ্কার রাখিতেছে। কিন্তু তুষারের (snow) নিচে প্রায় এক ফুট বরফ জমাট (ice) পরিষ্কার করিতে না পারায় তাহার উপর মোটরের চাকা ক্রমাগত পিছ্‌লাইয়া গিয়া ঘণ্টায় আধ মাইল আসিতে তাঁহার মোটরের দুইখানা চাকাই রাস্তার বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ৫০০০ হাজার ফুট নিম্নের খাদে সপরিবারে পতন হইত। ২০ জন কুলী দিয়া টানিয়া মোটর সরাইয়া অতি কষ্টে শ্রীনগরে ফিরিয়াছেন। পথে অনন্তনাগ পর্য্যন্ত গিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাপার শুনিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া পিণ্ডির পথে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন!

২০শে ডিসেম্বর—আজ সকালবেলা হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে দারুণ

শীতে হাত পা আড়ষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। আর শ্রীনগরে কোন সুখ নাই, দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। এই সমস্ত মনে করিয়া আমি ও ২নং 'প' বাবু বুখারির আগুনের পাশে বিমর্ষ মনে বসিয়া আছি, এমন সময় বোস সাহেবের বাড়ী হইতে রাত্রি ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল। যদিও বাসা অতি নিকট তথাপি রাত্রে এই শীত ও জলের ভিতর যাইতে হইবে ভাবিয়া রাত্রে মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল।

৭টার উভয়ে ছাতা মাথায় দিয়া রওনা হইলাম। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। 'প' বাবু আগে, আমি পাছে; বৃষ্টি পড়িতেছে অথচ ছাতায় শব্দ নাই। কৌতূহল বশতঃ সম্মুখে চাহিয়া দেখি 'প' বাবুর ছাতার উপর বড় বড় তুলার টুকরার মত যেন লাগিয়া রহিয়াছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ছাতায় তুষার পড়িয়াছে নাকি?" তিনি বলিলেন "আরে না, বুখারির ছাই লাগিয়া রহিয়াছে!" বলিতে বলিতে আমরা বোস্ সাহেবের বাড়ীতে পৌছিলাম। ছাতা নামাইয়া আর সন্দেহ থাকিল না। ছাতার উপর সূক্ষ্ম পেঁজা তুলার আকারে তুষার সংলগ্ন রহিয়াছে! সকলে বলিলেন, 'এ জ'লো বরফ থাকিবে না।' প্রায় আধ ঘণ্টা বৃষ্টির সহিত সেইরূপ বরফ পড়িতে লাগিল। আমরা ঘরে বসিয়া নানারূপ গল্প গুজবের সহিত জাফরাণ-সুগন্ধি পোলাও ও মাংসাদির সদ্গতি করিয়া অবশেষে বিদায় লইলাম। সকলেই বলিলেন যে রাত্রে যথেষ্ট তুষারপাত হইবে। সকাল বেলা উঠিয়া দেখি, সেইরূপ বৃষ্টিপাত হইতেছে কিন্তু তুষার নাই!

২১শে ডিসেম্বর—বৃষ্টি আরও বাড়িয়াছে। এখানে শীতকালেই বৃষ্টির কিছু বাড়াবাড়ি।

আহারাদির পর 'প' বাবুর সহিত এক টঙ্গায় 'গুপকরের' দিকে রওনা হইলাম। ঘরে বসিয়া থাকিলে জমিয়া যাইতে হয়, আর আগুনের পাশে দরজা বন্ধ করিয়া ক্রমাগত বসিয়া থাকিলেও মাথা ধরিয়া উঠে। বৃষ্টি পড়িতেছিল। বিরাট বস্ত্র সম্ভার লইয়া টঙ্গায় উঠিয়া বসিলাম। খানিকটা যাইতেই পায়ে ঠাণ্ডা লাগিল অর্থাৎ মাত্র এক যোড়া পশমিনার মোজার উপর জুতায় সামাইতেছিল না। দুই মাইল যাইতেই পা জমিয়া যাইবার মত হইল। আর খানিকটা যাইতেই বেজায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টঙ্গার চাক ভাঙ্গিয়া গেল! একটী ভাঙ্গা ছাতার মধ্যে আমরা উভয়ে বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে করিতে Mr Q এর বাটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইতেছিলাম, হাত শীতে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, সৌভাগ্য ক্রমে একটু যাইতেই দেখি Mr Q এর মোটর খানি রাস্তায় রহিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইলাম, কিন্তু শীতে মৃত্যুর সম্ভাবনায় ক্রমাগত হর্ণ বাজাইতে আরম্ভ করিলাম। Mr Q বৃষ্টি একটু থামিতেই ঘরের বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিলেন এবং তখনই বাসায় পৌছাইয়া দিলেন। বুখারিতে হাত পা সেঁকিয়া এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হইল।

২২-২৩ ডিসেম্বর—দেশে ফিরিবার জন্য মোটরের চেষ্টায় অনেক ঘুরিয়া অবশেষে এখানকার একটী অধ্যাপক 'ব' বাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী কলিকাতা ফিরিবেন কিন্তু মোটরের অভাবে যাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি বলিলেন যে তিনি মোটর দেখিয়া দিতে পারেন, তবে বেশী টাকা খরচ করিতে পারিবেন না। আমি বলিলাম তাহাই হইবে। তখন উভয়ে বাহির হওয়া গেল। ক্রমাগত বৃষ্টিতে ও তুষার পাতে রাস্তা ধসিয়া গিয়া আজ চারিদিন হইল কোন মোটর এমন কি ডাক পর্য্যন্ত আসে নাই। অনেক চেষ্টায় অবশেষে ১৯০৲ টাকায় এক মোটর স্থির হইল। ২৪শে তারিখে বেলা ১০টায় রওনা হইব।

২৩শে বিকাল বেলা একটু বাতাস উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। Mr H আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে Mr Ghosh এর বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, তাহা রক্ষা করিয়া গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তখন নিমন্ত্রণ রক্ষায় বাহির হইলাম। সঙ্গে পাচক পণ্ডিত মহেশ্বরনাথ

ছাতা হইয়া চলিল। একটু যাইতেই তুষারপাত আরম্ভ হইল। পণ্ডিত বলিল যে পূর্ব্বে যেরূপ তুষার পড়িত এখন সেরূপ দেখা যায় না। এমন কি তাহার পিতার আমলে এই 'বেগম্' জমিয়া গিয়াছিল এবং তাহার উপর 'খালি কুটা' (ধান ভানা) হইত। সে আরও বলিল আজকাল শ্রীনগরে তিন ফুটের উপর তুষার পাত দেখা যায় না। তুষার সামান্যই পড়িতেছিল, আমরা মীরাকদল পার হইয়া বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। বাসায় উঠিতেই বেশ জোরে তুষারপাত আরম্ভ হইল। আমি বন্ধুকে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিলাম, তিনি অবাক হইয়া গেলেন। বলিলাম বিশেষ গোপনীয় কথা আছে অত লোকের মধ্যে বলিব না। রাস্তায় আসিয়া সত্যকথা বলিলাম—"বরফের মধ্যে একটু বেড়াইব।" আমার আগ্রহাতিশয্যে তিনি স্বীকৃত হইলেন। বৃষ্টির মত তুষারপাত হইতেছে। বড়ই আমোদ বোধ হইল। আমি ছাতা বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। মুখে চোখে তুলার মত বরফ পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বন্ধুর কালা ওভারকোট সাদা হইয়া গেল এবং পুনরায় ছাতা মাথায় দিতে ছাতার উপর তুষার জমিয়া তাহা ভারী হইয়া উঠিল। প্রায় ১½ মাইল ঘুরিয়া আমরা বাসায় পৌছিলাম। গা হইতে তুষার ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিতে হইল, কারণ ঘরের গরমে উহা গলিয়া গেলেই কাপড় ভিজিয়া যাইবে। গিয়া দেখি আহারাদি প্রস্তুত। দ্রুত ভ্রমণে কোন ক্লান্তি বোধ হইতেছিল না। বেশ তৃপ্তির সহিত আহারাদি শেষ করিয়া অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিলাম, তখন তুষার পাত বন্ধ হইয়া রাস্তায় গলিয়া জল কাদা হইয়া গিয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর—সকালবেলা উঠিয়া দেখি বৃষ্টি হইতেছে না এবং আকাশও অনেক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বিছানা ইত্যাদি বাঁধিতে বেলা হইয়া গেল। আজ 'ঘ' বাবুর বাড়ীতে আহারাদি করিয়া গাড়ীতে উঠিবার কথা। বোস সাহেবেরও আজ যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার যে মোটর আনিবার কথা ছিল তাহা আনিতে না পারায় তাঁহার যাওয়া হইল না। বিশেষ তিনি খবর পাইয়াছেন যে মারী ও এবটাবাদ দুই রাস্তাই বন্ধ, সুতরাং আজ থাকিয়া খবর লইয়া যাওয়াই সঙ্গত এরূপ তিনি বলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বন্ধু Mr, H আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন স্থির হইল যে 'ঘ' বাবু ও মোটর চালককে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের কথা মত কাষ করা হইবে। মোটর চালক বলিল যাত্রা করাই উচিত, কারণ আবার যদি বর্ষা হয় তবে বরফে আটকাইয়া থাকিতে হইবে। 'ঘ' বাবুর বাসায় যাওয়া গেল। তিনি বলিলেন তাঁহারা সস্ত্রীক প্রস্তুত। সুতরাং যাওয়াই স্থির। 'ঘ' বাবুর বাসায় পোলাও ইত্যাদির বেশ সদ্গতি করিয়া বাসায় ফিরিলাম। বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রওনা হইতেই ১২টা বাজিয়া গেল।

একখানা পুরাতন "ডজ্" মোটরকার—ভিতরে 'ঘ' বাবু ও তাঁহার স্ত্রীকে বসিতে দিয়া আমি চালকের পাশে বসিলাম। সহিস বাহিরে mud guardএর গায়ে ঠেস দিয়া পাদানের উপর বসিল।

১২-১০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বন্ধুবর H আমাদের সঙ্গেই আসিলেন। বাড়ীতে প্রায় আধ ঘণ্টা মোটরের সরঞ্জাম লইতে কাটিয়া গেল। ফলে বেলা ১টার সময় আমরা রওনা হইলাম। মীরাকদল পার হইতে সেই পরিচিত বাজারের মধ্যে বন্ধুবর বিষণ্ণ ভাবে নামিয়া গেলেন, আমাদের গাড়ীও শ্রীনগর পশ্চাৎ ফেলিয়া ছুটিল। মনটা যেন একটু উদাস হইয়া গেল। দুইমাসের উপর এখানে আসিয়া কেমন যেন একটা মায়া বসিয়া গিয়াছিল। একটু একটু রৌদ্র উঠিবার মত হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যদেব বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চারিদিকের পাহাড় কতক একেবারে সাদা, কতক বা সাদায় কালোয় হইয়া আছে। কাল যে তুষার পাত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন সহরে না থাকিলেও পাহাড়ে বিলক্ষণ পরিমাণেই রহিয়াছে—শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত সাদা দেখাইতেছে।

সেই সফেদার avenue এখন সৌন্দর্য্য বিহীন, শুষ্ক পোড়াকাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাস্তায় একখানা মোটরের সহিত দেখা হইল—পিণ্ডি হইতে আসিতেছে। বলিল মারী বরফে বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাই সে 'এবটাবাদ' হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক একটা রাস্তা খোলা আছে জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ক্রমে ডাকের 'লরি' এবং আরও মোটরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আজ চারিদিন পর ডাক আসিতেছে।

আমরা 'পত্তন' ছাড়াইয়া বরমুলার দিকে ছুটতেছি। শীত খুব ছিল তবে অসহ্য নয়। 'ঘ' বাবুর স্ত্রী বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি এক কাংরী লইয়া কম্বলচাপা দিয়া রহিলেন—আমি তেমন কাঁপিবার কারণ দেখিলাম না।

(আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ওয়ালং যাত্রা।

প্রথমটা অনেকখানি উৎরাই। নিনা আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে—অল্প ব্যবধানে কিশোরীর টাটু। দুইজনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক নামিবার পর, তাহারা একটি গিরিনদীর নিকট আসিয়া পৌঁছিল। নিনা টাটু হইতে নামিয়া, কিশোরীকে বলিল, "এখানে একটু বিশ্রাম করিবে?" কিশোরীও নামিয়া, অশ্বদ্বয়কে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধিয়া বলিল, "আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে—একটু জল খাইব।"—বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠ লম্বিত থলিটি হইতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত জলপাত্র বাহির করিয়া আনিল। তাহার সেই চামড়ার ব্যাগ, কিংবা এনামেলের গ্লাসটি, ইচ্ছা পূর্ব্বক্ই সঙ্গে লওয়া হয় নাই—কারণ সে সব দেখিলে, অন্য লোকের মনে কিশোরীর জাতি সম্বন্ধে সংশয় জন্মিতে পারে।

নদীটি খরস্রোতা। জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও শীতল। উভয়ে জল পান করিয়া, নদী সন্নিকটে এক প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিল। নিনা পূর্ব্বদিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ যেখানে নদীটি বাঁকিয়াছে, উপরে পাহাড়, নীচে জঙ্গল, ঐ স্থানের নাম কি জান?"

"কি?"

"ওখানটার নাম টং-শং-ফুগ্,—অর্থাৎ হাজার খুনের স্থান।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "হাজার খুন! কে করিল?"

"করিয়াছিল একজন স্ত্রীলোক—রাণী। এ সকল স্থান তখন নেপালের মগরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রবাদ এই যে, তিব্বৎ হইতে শার্পাগণ আসিয়া এই কাংপাচেন অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। তাহাদিগকে কিরাতও বলিত। মগরদের রাজা, এই কিরাতগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন, নানাবিধ রাজস্ব আদায়ের অছিলায় তাহাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেন। সেই কারণে, এ অঞ্চলের প্রজারা সেই রাজার উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিল। রাজা

কোনও সময়ে, কাংপাচেন পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন; এই সুযোগে, শার্পা অথবা কিরাতগণ, ষড়যন্ত্র করিয়া, অনুচরবর্গ সহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। সপ্তাহ যায়, মাস যায়, রাজা ফিরিতেছেন না—দেখিয়া রাণী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অনুসন্ধান জন্ম চর পাঠাইলেন; কিন্তু রাজা কোথায় বা তাঁহার কি হইল, কেহই কোনও সংবাদ আনিতে পারিল না। অবশেষে রাণী নিজে বাহির হইলেন। রাপ্চান নামক নদী পার হইবার সময়ে দেখিলেন, তীর-লগ্ন একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, স্রোতের বেগে স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে বহু সংখ্যক মাছি উড়িয়া বাহির হইতেছে। রাণীর আদেশে সেই স্থান খনন করা হইলে, রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের মৃতদেহ বাহির হইয়া পড়িল। কাংপাচনের কিরাতগণই যে তাঁহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে, এ বিষয়ে রাণী কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু সে কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। রাজার শব নিজ দেশে লইয়া গিয়া, মহা সমারোহে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। স্বামীর স্থলে তিনিই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, সমস্ত কাংপাচেনবাসীকে তিনি এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজধানীতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া, নদীর বাঁকের ঐ স্থানটি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এক হাজার কিরাত ও কিরাতিনী ঐ স্থানে সমবেত হইল। খাদ্যসম্ভারের সহিত, জালা জালা মদ আনা হইয়াছিল। সেই মদে, তীব্র বিষ মিশ্রিত ছিল। সেই হাজার কিরাত, এই মদ্য পান করিয়া, সেইখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই অবধি ঐ স্থানের নাম হইয়াছে টং-শং-ফুগ—হাজার খুনের স্থান।"

এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া কিশোরী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর কি হইল?"

নিনা বলিল, "ক্রমে এই হত্যা সংবাদ তিব্বতে পৌঁছিল। তিব্বত রাজ, মগর-রাণীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সে বার রাণীই জয়লাভ করেন। কিন্তু পরে, তিব্বতীয়গণ কাংপাচেন প্রদেশ, মগরদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়াছিল।"

কিশোরী আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। কহিল, "চল, এখানে আর অধিক বিলম্ব করিয়া কায নাই। সন্ধ্যার মধ্যে আমাদিগকে জ্ঞাংডিং গোম্বায় পৌঁছিতে হইবে ত?"

দুইদিনের পথ—তৎপূর্ব্বেই পরামর্শ হইয়াছিল, জ্ঞাংডিং গোম্বার বা মঠে আশ্রয় লইয়া রাত্রিটা কাটাইতে হইবে। উভয়ে তখন উঠিয়া অশ্বারোহণে নদীর তীরে তীরে পশ্চিমাভিমুখে চলিল। যদিও 'চড়াই' কিন্তু বেশী কষ্টদায়ক পথ নহে। কখনও নদীর উভয় তীরে, কখনও একদিকে মাত্র, পাহাড় জঙ্গল দেখা যাইতে লাগিল। কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে কৃষক হল চালন করিতেছে। নিনা বলিল, এই সকল ক্ষেতে যব, গম, সরিষা প্রভৃতি জন্মায়, আর এই সকল পাহাড়ে বন্য মেষ থাকে; কস্তুরী হরিণও থাকে, আরও কিছুদুর অগ্রসর হইলে, মাঝে মাঝে বায়ুতে কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হইবে।

ঘণ্টা দুই চলিবার পর, নদীতীরবর্ত্তী জঙ্গলের প্রান্তে একটি রমণীয় স্থান দেখিয়া, উভয়ে সেই স্থানে বিশ্রাম করিবার পরামর্শ করিল। ক্ষুধায় দু'জনেই কাতর হইয়াছিল। অশ্বদ্বয়কে একটি তৃণবহুল স্থানে বাঁধিয়া, প্রথমে তাহারা নদীর জলে মুখ হাত ধুইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, থলি হইতে খাবার বাহির করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। সেই পথে দুইজন কৃষক যাইতেছিল, নিনা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, জ্ঞাংডিং গোম্বা তথা হইতে আরও দুই ঘণ্টার পথে অবস্থিত। সুতরাং অধিক কালক্ষেপ না করিয়া, আবার তাহারা অশ্বারোহণ করিল।

জ্ঞাংডিং গোম্বার নিকটবর্ত্তী হইতে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল। গোম্বাটি নদী তীর হইতে কিছুদূরে, একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। নিনা বলিল, "ঐ

গোম্বায় কয়েক জন লামা থাকেন, আমার বাপের নাম শুনিলে তাঁহারা হয়ত চিনিয়া ফেলিবেন, সুতরাং ওখানে গিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া হইবে না। শুধু বলিব, আমরা ওয়ালং মঠে যাইতেছি, রাত্রিটার জন্য আশ্রয় চাই। যত গুহা ওখানে আছে, তত লামা নাই শুনিয়াছি—সুতরাং স্থানের অভাব হইবে না।"

কিশোরী বলিল, "আত্মপরিচয় দিবে না বলিতেছ, কিন্তু যদি উহারা জিজ্ঞাসা করে আমি তোমার কে ?"

"সে ত জিজ্ঞাসা করিবেই। লামারা না করুক, আনীরা ত করিবেই। তখন পরিচয় মাত্র গোপন করিয়া, প্রকৃত কথাই বলিতে হইবে—আমরা বিবাহিত হইবার জন্য ওয়ালং মঠে যাইতেছি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "আনী কি ?"

নিনা বলিল, "মঠে, কোন কোন লামার আনী থাকে, তাহা কি তুমি শোন নাই ?"

কিশোরী বলিল, "না, শুনি নাই ত! আনী কি ? শিষ্য ? চেলা ?"

নিনা মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না। অবিবাহিতা স্ত্রী।"

ক্রমে তাহারা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। পাহাড়টি অধিক উচ্চ নহে,—অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা সেখানে পৌঁছিতে পারিল। মঠের সম্মুখে কয়েক জন স্ত্রীলোক (আনী) দেখা গেল। কেহ কেহ বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ শিশু সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইতেছে, কেহ বা উদূখলে শস্য চূর্ণ করিতে ব্যস্ত। নিনা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই মঠের প্রধান লামা কোথায় ?"

একজন আনী বলিল, "প্রধান ও অন্য অন্য লামাগণ এখন কাহ্‌গিয়ুর পাঠে নিযুক্ত আছেন—সন্ধ্যার পর তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইবে।"

"প্রধান লামার কেহ আনী আছেন কি ?"

উক্তিকারিণী, একজন প্রৌঢ়া রমণীকে সসম্ভ্রমে দেখাইয়া বলিল, "উনিই প্রধান লামার আনী।"

নিনা তাঁহার নিকট গিয়া নিজ প্রার্থনা জানাইল। তিনি খুঁটিনাটি করিয়া নিনাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে সকলের সদুত্তর পাইয়া অবশেষে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ দিকে কয়েকটি খালি গোম্বা (গুহা) আছে—তোমার লোকটিকে বল, একটি নির্ব্বাচিত করিয়া লউক; আমার দাসী যে গোম্বায় শয়ন করে, তোমার স্থান সেই খানেই হইতে পারিবে।"—বলিয়া তিনি দাসীকে ডাকিয়া, অতিথি সৎকারের আদেশ প্রদান করিলেন।

কিশোরী টাট্টু দুইটিকে ঘাস দানা দিয়া, তাহাদিগকে এক একটি গুহায় বাঁধিয়া রাখিল। লামাগণ শাস্ত্র পাঠ শেষ করিয়া, অতিথি যুগলের আগমন সংবাদ পাইলেন, এবং তাহাদের পরিচর্য্যার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া, ও বিষয়ে আর কোনও তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, লামাগণ প্রদত্ত যবের রুটি ও ডিম সিদ্ধ আহার এবং চা পান করিয়া, মঠে কিঞ্চিৎ "প্রণামী" দিয়া, নিনা ও কিশোরী পুনরায় যাত্রা করিল। নিনা গতরাত্রে আনীদের নিকট হইতে ওয়ালং মঠ এবং তথায় যাইবার পথ ঘাট সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শুভ বিবাহ।

সেদিন ওয়ালং মঠে পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

ওয়ালং একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার মঠ এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মঠ। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গাত্রে মঠটি স্থাপিত। উভয়ে পৌঁছিয়া, প্রধান লামার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তাহারা জানাইল, কল্য প্রাতে ভিন্ন সাক্ষাৎ হইবে না। তবে অতিথ্যের কোনও ত্রুটি হইল না।

পরদিন প্রায় ৮ টার সময় কিশোরী ও নিনা উভয়ে গিয়া প্রধান লামার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বিবাহিত

হইবার প্রার্থনা জানাইল। ইহাঁর নিকট কিশোরীর প্রকৃত পরিচয়ই দেওয়া হইল—খাস তিব্বতীয় ব্যক্তির নিকট, তিব্বতীয় বলিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা বৃথা হইত।

লামা মহাশয়ের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁহার অঙ্গে রক্তবর্ণ পশমী পরিচ্ছেদ, দুই কাণে দুইটি সোণার মাকড়ি। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া—কতক নিজে বুঝিয়া, কতক নিনার নিকট জানিয়া—কিশোরী বুঝিতে পারিল, লামা মহাশয় এই সুদূর হিমালয় বক্ষে বাস করিয়াও, পৃথিবীর অনেক সংবাদ রাখেন। নিনা, কাংপাচেনের ভূতপূর্ব্ব লামার আনী-গর্ভজাতা কন্যা শুনিয়া লামা মহাশয় তাহাকে সমাদর করিলেন। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত হিন্দু-সন্তান? হিন্দুধর্ম্মই ত তুমি মান?"

কিশোরী নিনার নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, তিব্বতীয়গণ মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান নাই;—বৌদ্ধ কন্যার সহিত হিন্দু বরের বিবাহে কিছুমাত্র বাধা নাই। সুতরাং সে নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, "আমি হিন্দু।"

"হিন্দু মতে বিবাহ হইলে, তোমার মনে এ কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যে পবিত্র ভাবটি জাগিত, বুদ্ধদেবের নামে শপথ করিয়া, বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলে, সেইরূপ পবিত্র ভাব জাগিবে কি?"

কিশোরী বলিল, "নিশ্চয়ই জাগিবে, কারণ বুদ্ধদেবকে আমরা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করি।"

লামা বলিলেন, "উত্তম কথা। অদ্যই আমি, শুভদিন স্থির করিয়া দিব। তোমাদের কাহারও পিতা জীবিত নাই বলিতেছ। বর, কন্যাকে 'রিণ' স্বরূপ কত টাকা দিবেন, তাহা তোমরা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লইয়াছ ত?"

নিনা বলিল, "সে সব আমরা ঠিক করিয়াছি।"

লামা বলিলেন, "নিনা, তুমি অবশ্যই অবগত আছ, তিব্বতীয় প্রথা অনুসারে, বিবাহের পূর্ব্বে, বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে একদিন এবং বিবাহের পর স্বজন বন্ধু ও গ্রামবাসিগণকে তিন দিন, ভোজ দিয়া থাকেন। তোমার বর, এ কার্য্যের জন্য কত টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন জানিতে পারিলে, তদনুসারে ব্যবস্থা হইতে পারে।"

নিনা বলিল, "বরপক্ষ কন্যাপক্ষ আর কৈ বাবা? বরপক্ষের মধ্যে উনি, কন্যাপক্ষের মধ্যে আমি।"

লামা হাসিয়া বলিলেন, "তাও কি হয়? উপস্থিত ক্ষেত্রে এই মঠের লামাগণ বরপক্ষ এবং আনীগণ কন্যাপক্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।"

নিনা জানিত, ওয়াংএর বৃহৎ মঠে আসিয়া বিবাহ করিতে হইলে, এই বাবদ বিলক্ষণ "ব্যয়ভূষণ" আছে, সুতরাং সে অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিল। বলিল, "আমার বর, ভোজের জন্য ৩০০৲ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।"

লামা কহিলেন, "উত্তম। কিন্তু ও টাকায় চারি দিন ভোজ হইবে না, দুই দিন হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন, এবং বিবাহের দিন। দুইদিন হইলেই চলিবে। এখন তোমরা যাও—আনন্দ কর। অদ্যই আমি শুভদিন স্থির করিয়া, ও বেলা তোমাদের জানাইব। এ মঠে তোমাদের পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটি হইতেছে না ত?"

নিনা বলিল, "না বাবা, আমরা বেশ সুখে আছি।"—বলিয়া, দুইজনে লামা মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

উভয়ে তখন মঠ হইতে বাহির হইয়া, মনের সুখে গল্প করিতে করিতে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে মঠে ফিরিয়া আসিয়া, ভোজনাদির পর স্ব স্ব গুহায় বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিল। বিকালে সংবাদ পাইল, পঞ্চম দিনের পূর্ব্বে শুভদিন নাই—লামা ঐ দিন বিবাহের জন্য স্থির করিয়াছেন।

শুনিয়া নিনা কিশোরীকে একান্তে লইয়া বলিল, "ভোজের ব্যয় ৩০০৲ টাকা তুমি আজই গিয়া লামাকে দিয়া আইস। উহারা সব যোগাড়যন্ত্র করিবে, মদ

চোয়াইবে, তাহাতে সময় লাগিবে কিনা!”—কিশোরী তখনই গিয়া প্রধান লামার হস্তে টাকাগুলি দিয়া আসিল।

ওয়ালং এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে, অন্যান্য লামাগণ ভারে ভারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। বড় বড় বকযন্ত্রের সাহায্যে সুরা প্রস্তুতের ধূম পড়িয়া গেল। আনীগণ, নিনাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্কা, তাহারা নির্জ্জন পাইলেই কৌতূহল বশতঃ তাহাকে কত না প্রশ্ন করিতে লাগিল। “বরের সঙ্গে কোথা দেখা হল? কি করে’ ভাব হল? কতদিনের ভাব? বর কেমন ভালবাসে?” ইত্যাদি। নারী চরিত্র সর্ব্বত্রই একরূপ—তা সে কৌচ কেদারা ছবি আয়না সমন্বিত বিদ্যুৎ-আলোকিত গৃহে, বিজলী পাখার নিম্নেই হউক, আর হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে, পাষাণে খোদিত আদিম যুগোপযোগী গুহামধ্যেই হউক।

চতুর্থ দিনে, মহা সমারোহে ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন হইল। নিনা ও কিশোরী তাহাদের মধ্যস্থলে পাশ-পাশি বসিয়া ভোজন করিল, কিন্তু তাহাদের উপরোধ সত্বেও, সুরাপান করিতে সম্মত হইলনা।

অবশেষে বিবাহ-দিনের প্রভাত আসিয়া, হাসিয়া দেখা দিল। বেলা এগারটায় লগ্ন। আনীগণ নিনাকে লইয়া কনে’ সাজাইতে বসিয়া গেল। যুবক লামাগণ, কিশোরীর তত্বাবধানে রত হইল।

যথা সময়ে, দুইটি বেদিকার উপর বরকন্যাকে বসাইয়া, প্রধান লামা স্বয়ং পুরোহিতের আসনে উপবেশন করিলেন। লামাগণের সমবেত স্বরে, “ওম্ মণিপদ্মী হুম্”—শব্দে পর্ব্বতগাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্তোত্রপাঠ মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়াকলাপে শেষ করিতে প্রায় অপরাহ্লকাল উপস্থিত হইল। বরবধূ প্রবীণ লামাগণের পদতলে প্রণত হইয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। আহারাদি আরম্ভ হইতে বেলা প্রায় ঢলিয়া আসিল সন্ধ্যার পর অবধি অনেকক্ষণ ভোজের উৎসব চলিল। আনন্দ রোলের অন্ত নাই।

এদিনেও ভোজের সময় এতক্ষণ নিনা বা কিশোরী সুরা স্পর্শ করে নাই। শেষের দিকে কয়েকজন আনী, এ বিষয়ে উভয়কে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বলিল, “খাও। যে দিনের যে নিয়ম, তাহা ত পালন করা চাই—নহিলে অকল্যাণ হইবে যে!” অবশেষে কিশোরী, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ হিসাবে কিঞ্চিৎ মাত্র পান করিল, নিনাও তাহার প্রসাদ পাইল।

“অবশেষে আনীগণ বর কন্যাকে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গুহাকক্ষে লইয়া গেল। এই কক্ষটি সুপরিসর। রৌপ্য নির্ম্মিত দীপাধারের উপর সুবর্ণের প্রদীপে গন্ধতৈল জ্বলিতেছিল। গাঢ় লোহিতবর্ণের রেশমী বস্ত্রে গুহা প্রাচীর সমাবৃত—উপর প্রান্ত ব্যাপিয়া, গোলাপী রেশমের ঝালর ঝুলিতেছে। শয্যার প্রচ্ছদবস্ত্রও রেশমী, উপাধান দুইটি সুকোমল মখমলে মণ্ডিত।

আনীগণ নানারূপ হাস্যপরিহাসে গুহাখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশেষে নবদম্পতীকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া, তাহারা সকলে প্রস্থান করিল।

দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া কিশোরী বলিল, “এ যে রাজপুত্রের বাসর ঘরের মত করিয়া সজ্জিত হইয়াছে!”

নিনা বলিল, “এ মঠের প্রধান লামা রাজতুল্যই ধনবান।”

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা পানান্তে নিনা ও কিশোরী প্রধান লামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল। লামা তাহাদিগকে নিকটে বসাইয়া স্নেহগর্ভ স্বরে কয়টি উপদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি তোমার নববধূকে লইয়া এখন হিন্দুস্থানে ফিরিয়া যাইবে?”

কিশোরী বলিল, “এখন কিছুদিন আমরা কাংপা-চেনেই বাস করিব। পরে কি করিব, তাহা এখনও আমরা স্থির করি নাই।”

কিশোরী লামাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদ-প্রান্তে পাঁচটি মোহর রাখিয়া দিল। নিনা দুইটি মোহর দিয়া প্রণাম করিল। তার পর অন্যান্য লামা ও আনীগণের নিকট বিদায় লইয়া তাহারা অশ্বারোহণে

যাত্রা করিল। সে রাত্রি ন্যাংডি' গেংস্বার বিশ্রাম করিয়া, পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাংপাচেনে আসিয়া পৌঁছিল।

গৃহে ফিরিয়া, নিনার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কিশোরী বলিল, "কেন নিনা, এ আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলিতেছ কেন ?"

নিনা বলিল, "বাবা দেখিলেন না।"

কিশোরী আদর করিয়া নিজ রুমালে নিনার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "তিনি স্বর্গ হইতে আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।"

(২য় খণ্ড সমাপ্ত) ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতি

(সমালোচনা)

৺সূর্য্যনারায়ণ ঘোষের "রামধনু" ১৮৮২ সালে বাহির হইয়া ১৮৮৭ সালে লুপ্ত হয়। ৺অমৃতলাল সরকারের "বিজ্ঞান" পত্রের পরমায়ু ১৯১২ হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত। এই দুই খানি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকার অকাল মৃত্যুতে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা যে অভাব অনুভব করিয়াছিলেন, বাণী ও কমলার বরপুত্র শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, এম্-এ, বি-এল্, এফ্-জেড্-এস্, "প্রকৃতি" প্রকাশিত করিয়া তাহা অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ছয় ঋতুতে ছয় বার বাহির হইবে। গ্রীষ্ম সংখ্যা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) পাঠ করিয়া আমরা অনেক নূতন তথ্য শিক্ষা করিয়াছি।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষের "প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা" হইতে কয়েকটী পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

Protoplasm—জীববস্তু; Ectoplasm—বাহ্যস্তর; Endoplasm—মধ্যখণ্ড; Cephalina—শিরোদেহী; Acephalina—অশিরোদেহী; Plasmodroma—তরলদেহী, Capillitum—জড়িততন্তু; Hyliozoa—দৃঢ়াংশুপদী; Sporozoa—রেণুদেহী।

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ঘোষের "বাংলার মাছ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে রুই মাছের প্রজনন-রীতি সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"বর্ষাকালে যখন শতধারায় পুকুরে বিলে জল প্রবেশ করিতে থাকে তখন রুই-দম্পতী চঞ্চল হইয়া উঠে; পুংমৎস্যের (milter) ক্ষিপ্রতা সমধিক বর্দ্ধিত হয় এবং অনবরত স্ত্রীমৎস্যের (breeder) চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুই তিনটী পুংমৎস্য একই স্ত্রীমৎস্যকে ডিম্বপ্রসবে সহায়তা করে। স্ত্রী ও পুংমৎস্য কিছুক্ষণ পাশাপাশি সাঁতার দিতে দিতে, পুংমৎস্যটী স্ত্রীমৎস্যের দিকে কাৎ হইয়া পড়ে, এবং মৎস্য দেহের অধোভাগে পুচ্ছের সম্মুখে যে ডানা থাকে (ventral fins) সেই স্থান, স্ত্রীমৎস্যের ঐ স্থানে সংযোজিত করে। তৎপরে ইহাদের ঘন ঘন পুচ্ছতাড়নায় জল আলোড়িত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শরীর হইতে ডিম্বাণু বা ডিম্বরজঃ (ovum) নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহার উপর পুংমৎস্য তাহার শুক্র (milt) ঢালিয়া দেয়। এই শুক্রলিপ্ত ডিম্বাণু জলে ভাসিয়া বেড়ায় এবং সাত আট ঘণ্টার মধ্যে ডিম্বে পরিণত হয়। ডিম্বগুলি লালাযুক্ত না হওয়ায় কোনও জলজ উদ্ভিদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে না, ভাসিয়া বেড়ায়। এই ব্যাপার অগভীর জলে তীর পার্শ্বে নিষ্পন্ন হয়। ডিম্বসৃষ্টির আটাশ

হইতে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফাটিয়া পোনা বাহির হয়। যৌনমিলনের পর, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া পড়ে। সে সময় ইহারা প্রায়ই আপনার ডিম ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এক একটী স্ত্রীমৎস্য অনুন দুই লক্ষ ডিম্বাণু ত্যাগ করে। সহজেই অনুমিত হইবে যে, এতগুলি ডিম্বনিষেক (fertilization) একটী পুংমৎস্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে, সেই জন্যই প্রকৃতির ব্যবস্থায় একাধিক পুংমৎস্য এই সময়ে একই স্ত্রীমৎস্যের অনুগামী হয়। দেখা যাইতেছে যে, আমরা মাছের ডিম বলিয়া যাহা খাই, তাহা বাস্তবিক ডিম নহে, স্ত্রীমৎস্যের ডিম্বাণু বা ডিম্বরজঃ।"

"কলিকাতার চারিধারের ভূপ্রকৃতি" সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

"যে স্থানে এখন কলিকাতা ঐ স্থানে যে একদিন সমুদ্র ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ সমুদ্র যে বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এ সমুদ্র ভরাট হইল কিরূপে? যখন কোনও নদী সমুদ্রে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার স্রোত সমুদ্রের জলে বাধা পায়। বাধা পাইলে জলে যে পলি থাকে তাহা মাধ্যাকর্ষণের বলে সমুদ্রতলে থিতাইয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া একস্থানে এইরূপ ভাবে পলি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত পলি একটু উচ্চ হইলে চর আখ্যা পায়। এই চর ভাটার সময় জাগিয়া থাকে ও জোয়ারের সময় ডুবিয়া যায়। এই সময়ে আটাল মাটী এই বালির চরের উপর ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে। ক্রমে এমন হয় যে এই চর জোয়ারেও আর ডোবে না। তখন ইহাতে বৃক্ষাদি জন্মিতে থাকে। এই নবগঠিত ভূমির আকার "ব" সদৃশ; তাই ইহাকে ব-দ্বীপ বলা হয়। কলিকাতার বহু উত্তর হইতে গঙ্গা ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া ভূমি গঠন করিতে করিতে দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছিল। এমন এক সময় আসিল যখন এই নদীর মোহানা (অর্থাৎ নদী যে স্থানে সমুদ্রে আসিয়া পড়ে) বর্ত্তমান বরানগর ও টালায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই মোহানার পরই অর্থাৎ ইহার দক্ষিণে সমুদ্র। নদী সমুদ্রজলে বাধা পাইয়া ব-দ্বীপ নির্ম্মাণ করিল ও কলিকাতার ভিত্তি গঠিত করিল।.......অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, প্রায় বার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র অপসারিত হইবার সূত্রপাত হয় ও কলিকাতার ভিত্তির পত্তন হয়।"

উপরোক্ত তিনটী প্রবন্ধ ভিন্ন "গরিলা", "ভূমিকম্প", "পাখীর বাসা" প্রভৃতি অনেকগুলি সুপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। "প্রকৃতি"র ঠিকানা—২৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা।

শ্রীগৌরহরি সেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

আঁধারের শিউলি

উপন্যাস। শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৭৫ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৷৷০

পাঁচুলাল বাবু নূতন লেখক নহেন। এক সময় গল্প রচনায় তাঁহার বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখা গিয়াছিল। তবে ইদানী কয়েক বৎসর তিনি "ডুব মারিয়া" ছিলেন। গল্প তিনি অনেকগুলি লিখিয়াছিলেন; এইখানিই তাঁহার প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসখানি ১৮ বৎসর পূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময় ইহা যথেষ্ট প্রশংসালাভও করিয়াছিল। তা, বহিখানি, প্রশংসার উপযুক্ত বটে। ইহাতে লেখক দুঃখের এমন একটি গভীর সুর বাজাইয়াছেন, যে পাঠক

—বিশেষতঃ পাঠিকারা—অভিভূত হইয়া পড়ে—চোখের জল রাখিতে পারে না। পাঁচুলাল বাবু পাকা হাতের নিপুণ তুলিকায় চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা সংস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে মৌলিকতা আছে—বিশেষতঃ, মামীর চরিত্রটি বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে একেবারে নূতন, এবং অতি মনোহর।

পুস্তকখানি ১৩২৮ সালে প্রকাশিত হইলেও, ১ম সংস্করণের একখানিই আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। অথচ চোখের উপর দেখিতেছি. কত রামা শ্যামার নেহাৎ বাজে এবং ঝুটা মাল, বাহ্য চাকচিক্য এবং বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড ও "বন্ধু" লিখিত সমালোচনার ঢক্কা নিনাদের জোরে, হুহু বিকাইয়া যাইতেছে। অবান্তর হইলেও, এই প্রসঙ্গে আরও দুইজন ঔপন্যাসিকের কথা লিখি—প্রথম, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের রচনা সুধীসমাজে যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছে বটে—কিন্তু সাধারণ পাঠক সমাজে সমুচিত আদরলাভ করে নাই। ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যে যথার্থ ভাল জিনিষ দিয়াছেন এবং দিতেছেন। তাঁহাদের মাল ঝুটা নহে—সাঁচ্চা; তাঁহারা নকলনবীশ নহেন, উচ্চ দরের আর্টিষ্ট। মনোমোহন বাবুর ন্যায় হাস্যরসের এবং মাণিক বাবুর ন্যায় করুণরসের অবতারণায় ওস্তাদী হাত আজকাল বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে খুব কমই দেখা যায়; কিন্তু তাঁহারাও ঐ এক রোগে কাহিল হইয়া রহিয়াছেন, না আছে প্যাড বাইণ্ডিং ও রঙীন ছবির প্রাচুর্য্য, না আছে বিজ্ঞাপন—প্ল্যাকার্ড—সমালোচনার ঢক্কা নিনাদ। বাঙ্গালী পাঠক গুণের আদর করিতে কবে শিখিবেন?

পারস্য প্রতিভা

১ম খণ্ড—মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল প্রণীত। কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত; প্রাপ্তিস্থান—রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, ২৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৮১ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১।০।

পারস্য সাহিত্য, ফের্দৌসী, হাফেজ, ওমরখাইয়াম, সাদী ও জালালউদ্দিন রুমী—এই কয়েকটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি বিভক্ত। পারস্যের বিপুল কাব্য সাহিত্য-সম্পদের পরিচয় বঙ্গভাষায় আমরা এতাবৎকাল যাহা পাইয়াছি, তাহা নিতান্তই অল্প—ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। গ্রন্থকার এই পুস্তকে পারস্য সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার নিপুণ হস্তে বর্ণনীয় বিষয়টি সুপরিস্ফুট ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাটিও উত্তম ও বিষয়োপযোগী। বহিখানি পড়িলে পারস্য সাহিত্যের সহিত আরও অধিক পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠে। আশা করি মৌলভি সাহেব ক্রমে ক্রমে আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা পুরণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। বহিখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই ভাল।

ঝড়ের আলো

উপন্যাস। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি-এল প্রণীত। কলিকাতা মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও তথা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৩৪ পৃষ্ঠা, কাঁপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১।০

প্রফুল্ল বাবুর ছোট গল্পের গুণপনা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পাঠক-পাঠিকাবর্গের অপরিজ্ঞাত নহে। সমালোচ্য উপন্যাসখানি, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। যে অভাবনীয় ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া এই আখ্যায়িকা গড়িয়া উঠিল, (৩২ পৃষ্ঠা) তাহার অবতারণায় লেখক বেশ 'মুন্সিয়ানা'র পরিচয় দিয়াছেন; উহা অভাবনীয় হইলেও, অস্বাভাবিক হয় নাই। সীতার চরিত্রটি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। উপন্যাস-পিপাসু পাঠক এই বইখানি পড়িয়া খুসী হইবেন আশা করা যায়।

রসাঙ্কুর

কবিতা গ্রন্থ। শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, প্রতিভা প্রেসে মুদ্রিত ও চুঁচুড়া হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১১০ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ৸০

নানাবিষয়িণী কবিতা। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী লিখিত ভূমিকা সহ। এখানিই বোধ হয় লেখক মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ—কিন্তু ইহার মধ্যে শিক্ষানবীশের হাতের কোনও লক্ষণ নাই। কবির ভাষা ও রচনা প্রণালী চিত্তাকর্ষক। নব্য কবির প্রথম কবিতা গ্রন্থ যেরূপ হইয়া থাকে, ইহা তদপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর। "আর্য্যভূমি," "বরষা," "বিধবা," "শরতের গান," "বঙ্গভূমি" প্রভৃতি কবিতাগুলি বেশ ভাল লাগিল।

কলিকাতা
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তুর্ক হারেমে নবাগত অতিথি।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ } ২য় খণ্ড
আশ্বিন, ১৩৩১
{ ২য় খণ্ড { ২য় সংখ্যা

লঙ্কায় আর্য্যসভ্যতা

রামচন্দ্রের লঙ্কাজয় সত্যঘটনা মূলক কিংবা কাল্পনিক তাহা এখনও পণ্ডিতগণের তর্কস্থল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থের মতে প্রাচীন লঙ্কা যক্ষ ও রাক্ষসের আবাসভূমি।

রামায়ণের রাক্ষস অনেকটা উন্নত জীব,—মদ্যমাংসপ্রিয়, রম্য অট্টালিকাবাসী, বিলাসপরায়ণ, বিকৃতদেহ ও মায়াবী। বৌদ্ধ গ্রন্থের রাক্ষসও মায়াবী, কিন্তু সে ঘোর অসভ্য বনচারী জীব। বুদ্ধদেব যখন লঙ্কাদ্বীপ হইতে যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে গিরিদ্বীপে স্থানান্তরিত করেন বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থে পাই, তখন এইরূপ বনচারী জীবের সহিতই আমাদের পরিচয় হয়। অমর বিভীষণকে বা তাঁহার পত্নী সরমাকে কোথাও খুঁজিয়া পাই না।

সিংহলই বৌদ্ধদিগের লঙ্কা। ইহার প্রাচীন নাম ওজদ্বীপ, বরদ্বীপ বা মণ্ডদ্বীপ। রামায়ণের লঙ্কাও সাধারণতঃ সিংহল হইতে অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের মতে লঙ্কা সিংহল হইতে পৃথক্। আধুনিক যুগেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির মতে সিংহল ও লঙ্কা বিভিন্ন। মুকুন্দরামের সিংহলের রাজা শালবান্, তাহার অধিবাসী হাড়ি, ডোম প্রভৃতি (যেমন রাঢ় দেশে); আর লঙ্কায় সেই নিশাচর।

আমাদের পৌরাণিকগণের ভৌগোলিক জ্ঞানের উপর প্রায় কেহই অধিক আস্থা প্রদর্শন করেন না। আমরাও অপর কোন গভীর গবেষণার সাক্ষাৎকার লাভ পর্য্যন্ত লঙ্কা ও সিংহল অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

সিংহল নামটি যে বিজয় সিংহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা এখন ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত। বিজয় সিংহ বৌদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বিবরণ বৌদ্ধ গ্রন্থেই পাই। তিনি বঙ্গদেশীয় সিংহপুরের রাজা সিংহবাহুর পুত্র—দুর্ব্বৃত্ততার জন্য অনুচরবর্গ সহ নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্র-পথে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি ও তাঁহার অনুচরবর্গের চেষ্টায় সিংহলে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃতিলাভ করে—

অরণ্য ক্রমে নগরে পরিণত হয়। তিনি স্বয়ং তাম্রপর্ণী নগরের স্থাপয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অনুচর-বর্গের নামানুসারে বিজিতপুর, অনুরাধাপুর প্রভৃতি নগর স্থাপিত হয়। সিংহলের ইতিহাসে সিংহবাহুর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা অদ্ভুত। 'দীপ বংশ' ও মহাবংশের মতে সিংহের ঔরসে বঙ্গরাজকন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম, সহোদরা ভগিনী তাঁহার পত্নী। পৃথিবীর ইতিহাসে বীরবংশ প্রতিষ্ঠাতা অনেক আদি পুরুষের বিবরণই অলৌকিকতার কুহেলিকায় আবৃত। সিংহ-বাহুর বিবরণ রমুলাস্ ও রিমাসের বিবরণ হইতে অলৌকিকতায় হিসাবে একটু অধিক উপরে উঠিয়াছে মাত্র। বৌদ্ধযুগে পরিণয়-ব্যাপার অনেকটা স্বেচ্ছা-চারিতায় পরিণত হইয়াছিল, দার-নির্ব্বাচনে পিতৃবংশের "অসগোত্রা" বা মাতৃবংশের "অসপিণ্ডা"র প্রয়োজন হইত না। স্বয়ং রামচন্দ্র বৌদ্ধ আখ্যায়িকায় সহোদরা বিবাহের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। সিংহবাহুর বিবাহ-ব্যাপারেও সেই পরবর্ত্তী বৌদ্ধ প্রভাবের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয় মনে হয়। সে যাহা হউক সিংহবাহু যে বঙ্গের অর্থাৎ বঙ্গের রাঢ় প্রদেশের একজন নৃপতি ছিলেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাঁহার সিংহপুর হুগলী জেলার বর্ত্তমান সিঙ্গুর কিংবা প্রাচীন সমুদ্র বন্দর তাম্রলিপ্তের অধিকতর নিকটবর্ত্তী অপর কোন স্থান তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইতিহাস সম্ভবতঃ এ বিষয়ে কখনও একমত হইতে পারিবে না। তবে সমুদ্রোপকূল হইতে বহুদূরে অবস্থিত সিংহভূমকে আমরা বিজয় সিংহের জন্মভূমির সম্মান প্রদান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

সিংহলের আখ্যায়িকার মতে বিজয়সিংহ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। কথিত আছে তিনি বুদ্ধের জীবৎকালের শেষ বৎসর লঙ্কায় পদার্পণ করেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডু-বাস আসিয়া সিংহলের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বিজয় সিংহের সিংহলে আগমন যেমন পবনদেবের অনুগ্রহ-জনিত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, পাণ্ডুবাসের আগমন তেমন নহে। সিংহলের ইতিবৃত্তে পাই বিজয় শেষ বয়সে সিংহপুরে ভ্রাতা সুমিত্রের নিকট দূত প্রেরণ পূর্ব্বক লঙ্কা শাসনের জন্য স্ববংশীয় এক-জনকে আহ্বান করেন এবং সেই আহ্বানের ফল পাণ্ডু-বাসের আগমন। ইহাতে সেই প্রাচীনকালে যে বঙ্গদেশ ও সিংহলের মধ্যে সমুদ্রপথে যাতায়াতের রীতিমত ব্যবস্থা ছিল তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। আরও পাই শাক্যবংশীয় নৃপতি পাণ্ডুর কন্যা কচ্চানা পাণ্ডুবাসের সহধর্ম্মিণী। এই বিবাহের পর স্ত্রীর পক্ষীয় ভারতীয় কুটুম্বেরা পাণ্ডুবাসের রাজধানীতে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করে। পাণ্ডুবাসের এক শ্যালকপুত্র রাজকন্যা চিত্রার প্রেমে মুগ্ধ হন। তাঁহাদের এই অবৈধ প্রণয়ের ফল পাণ্ডুকাভয়। মাতুলগণের তাড়নায় ইনি নানাস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা বল সংগ্রহ পূর্ব্বক সিংহলের রাজ সিংহাসনের দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন। যুদ্ধে পরিণামে ইঁহারই জয় হয়।

পাণ্ডুকাভয়ের পৌত্র "দেবানাম্ প্রিয়" তিস্সের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার। বিবরণটি এইরূপ —তিস্স সিংহাসনারোহণের পর অনেক বহুমূল্য উপ-ঢৌকন পাইয়াছিলেন, মহারাজ অশোক তখন আর্য্যা-বর্ত্তের সম্রাট্। তিস্স মনে করিলেন মহারাজ অশোকই এই সকল দ্রব্যের উপযুক্ত পাত্র, তিনি স্বীয় ভাগিনেয় অরিথ, জনৈক ব্রাহ্মণ ও দুইজন রাজকর্ম্মচারীকে অনুচরবর্গ ও উপঢৌকন সহ পাটলিপুত্রে প্রেরণ করিলেন। অশোক এই উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করতঃ রাজ্যাভিষেকের উপযুক্ত বিবিধ মহামূল্য পদার্থ সহ স্বয়ং সিংহলরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের বিবরণও সিংহলের রাজধানীতে প্রেরিত হইল। কালে এই আদান প্রদানের ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজপুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে রাজার ভ্রাতা) সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ যাত্রা করিলেন ও সাদরে গৃহীত হইলেন। শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্মই সিংহলের রাজধর্ম্ম হইল। রাণী অনুলা

তখন দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পুরুষগণ দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, কাযেই মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা এবং আর কয়েকজন ভারত-রমণী গিয়া সিংহলের মহিলা মহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। সিংহল বাঙ্গালীর বাহুবলে জিত হইয়াছিল—ভারতের নীতিবলের নিকট যাচিয়া মস্তক অবনত করিল।

বিজয় সিংহের লঙ্কায় অভিযানের সময় হইতে সিংহলের সহিত ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সম্বন্ধের বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে, কখনও দাক্ষিণাত্য হইতে ভারতীয় রাজবংশ যে লবণ সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে গিয়া শাসন দণ্ড চালাইয়াছেন, মহাবংশ প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য স্বাধীনভাবে বা কোনও রাজবংশের আশ্রয় ছায়াতলে সিংহলে পদার্পণ করিয়াছেন তাহা কে বলিবে? সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাসে বহু ভারতীয় ভিক্ষু ভিক্ষুণীর নাম পাওয়া যায়। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি বা ভগ্নাবশেষও লঙ্কায় বিরল নহে। কিন্তু হিন্দু কবে রাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস লিখিয়াছে? হিন্দু প্রচারকদিগের নাম অতীতের তিমির গর্ভে লুক্কায়িত।

কবি কালিদাসের সিংহলে যাওয়ার প্রবাদ আছে। "শকুন্তলার" অমর কবি সিংহলে গিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, কুমারদাসের ন্যায় রাজকবির অস্তিত্ব প্রাচীন সিংহলে সংস্কৃত চর্চ্চার অকাট্য প্রমাণ।

বাণিজ্য ব্যাপার সম্ভবতঃ বিজয় সিংহের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সম্বন্ধ ঘনীভূত হইলে তাহা যে অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিত। বঙ্গের নাবিকগণ বহু প্রাচীনকাল হইতে সুদূর চীনদেশ পর্য্যন্ত আপনাদের বাণিজ্যতরী চালাইত। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান্ যে তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহলযাত্রার বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অনেকেরই পরিচিত। তিনি যবদ্বীপে পর্য্যন্ত বহু ব্রাহ্মণের বাস দেখিয়া গিয়াছিলেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার সিংহল গমন কাল্পনিক মনে করেন। রাজার পুত্র ও কন্যা সিংহলে যাউন আর নাই যাউন, পাটলিপুত্র-প্রেরিত প্রচারকগণ যে শান্তিময় বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোষণা দ্বারা সিংহলের সভ্যতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন, শুধু ধর্ম্ম নয় অশোকের প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপ্রণালীও যে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। অশোকের অনুশাসনই তাহার প্রমাণ। তাঁহার চিকিৎসালয়ে কেবল দ্বিপদ নহে, চতুষ্পদ জন্তুরও স্বাস্থ্যলাভের ব্যবস্থা ছিল।

আর, আর্য্যাবর্ত্তের বৌদ্ধ বিহারগুলি—যাহার আলোকে এককালে সমগ্র প্রাচ্য জগৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল—কত সিংহলী ছাত্র যে সেখানে জ্ঞানলাভ করিতে আসিয়াছিল তাহার সংখ্যা কে করিবে?

দীর্ঘকাল ভারতবাসীর সংস্রবে—ভারতীয় রাজনীতি ভারতীয় সমাজনীতি ভারতীয় ধর্ম্মনীতির আশ্রয়ে—সিংহলবাসী যে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, যুগ যুগান্তরেও তাহার ফল অপনীত হইবার নহে। সিংহলের সমাজ এক্ষণে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন, রাজ্যশাসনও ঠিক এক প্রণালীতে হয় না। কিন্তু ভাষায় ও ব্যবহারে যে সকল ভারতীয় চিহ্ন রহিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করে। সিংহলের ভাষায় এখনও বাঙ্গালীর শব্দ বাঙ্গালীর ব্যাকরণ অনুসন্ধান করিলেই ধরা দেয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কামিই

(গল্প)

(প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি Alfred de Musset)

১

শেভ্যালিয়ে একজন অশ্বসৈন্যের সেনানায়ক। অল্প বয়সেই তিনি তাঁর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া Mans নগরের নিকট একটা পল্লী-ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে,—এক সওদাগর যিনি কাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঐ পল্লীতে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, শেভ্যালিয়ে সেই সওদাগরের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিছুকালের জন্য এই বিবাহটা সুখের বিবাহ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাঁর স্ত্রী "সেসিলের" আত্মীয়েরা বেশ গণ্যমান্য লোক; উহারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিল—এখন চির রবিবাসর ভোগ করিতেছে। ভের্সাই নগরের কৃত্রিম চাল-চলনে ক্লান্ত হইয়া শেভ্যালিয়ে আহ্লাদের সহিত উহাদের সাদাসিধা আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিল। সেসিলের একটি খুব ভালো কাকা ছিল, তাঁর নাম "জিরো"। জিরো গোড়ায় সর্দ্দার-রাজমিস্ত্রী ছিল, ক্রমে বাস্তুশিল্পীর পদে উন্নীত হয়। এক্ষণে তাহার প্রভূত সম্পত্তি। শেভ্যালিয়ের বাড়ীর নাম "শার্দনো"। এই বাড়ীটা জিরোর খুবই পছন্দসই ছিল; তাই জিরো প্রায়ই ঐ বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন এবং সাদর অতিথিরূপে গৃহীত হইতেন।

ক্রমে, শেভ্যালিয়ে ও সেসিলের একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। প্রথমে উহারা খুব উল্লসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু একটা হৃদয়-বিদারক সংবাদ তাহাদের জন্য সঞ্চিত ছিল। উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিল,—কামিই কালা সুতরাং সেই সঙ্গে বোবা!

২

মায়ের প্রথম চিন্তা হইল—উহার বধিরতা কি করিয়া সারানো যায়। কিন্তু এই আশা অগত্যা বিসর্জ্জন করিতে হইল; কোন ঔষধ মিলিল না। যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি সে সময়ে আমরা যাকে "কালা-বোবা" বলি সেই বেচারীদের সম্বন্ধে একটা নির্ম্মম অন্ধ সংস্কার ছিল। এ কথা সত্য, কতকগুলি মহাশয় লোক এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৬শ শতাব্দীর একজন মঠ-সন্ন্যাসী, মূকদিগকে বিনা বাক্য ব্যবহারে কথা কহা শিখাইবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—যাহা ইতিপূর্ব্বে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। বিভিন্ন সময়ে, তাঁহার এই দৃষ্টান্ত ইতালি, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে,—Bonnet, Wallis, Bulwer ও Van Helmont কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়। কিন্তু তথাপি, এমন-কি প্যারিসেও কালা বোবাদিগকে সাধারণতঃ পৃথক জীব বলিয়াই মনে করা হইত—যাহারা দৈব-অসন্তোষের চিহ্নে চিহ্নিত। উহাদিগকে দেখিয়া লোকের দয়া হওয়া দূরে থাক্ বরং আতঙ্ক হইত।

কামিইর জনক জননীর মুখের উপর, আস্তে আস্তে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। উহাদের মধ্যে হঠাৎ একটা নীরব দূর-দূর ভাব আসিয়া পড়িল। উহা উদ্বাহ-বন্ধনচ্ছেদ অপেক্ষা, মৃত্যু অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। তাহার কারণ কন্যার জননী হতভাগ্য মেয়েটিকে যারপর নাই ভালবাসিত; এদিকে শেভ্যালিয়ে, স্বকীয় দয়ার্দ্র হৃদয়ের প্ররোচনা সত্ত্বেও, এই ইন্দ্রিয়-বিকলতার দরুণ তার কন্যার উপর তাহার যে-একটা বিরাগ জন্মিয়াছিল, সে ভাবটাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না।

মেয়েটির মা মেয়ের সঙ্গে ইসারা ইঙ্গিতে কথা কহিত। এবং কেবল মা-ই কোনপ্রকারে তাহার কথা তাহাকে বুঝাইতে পারিত। বাড়ীর আর সকলেই—এমন কি

তার বাবাও তাহার নিকট অপরিচিত। মাদাম শেভ্যালিয়ের মার একটুও সাংসারিক চাতুর্য্য ছিল না। তিনি তাঁর মেয়ে ও জামাইয়ের দুর্ভাগ্যের কথা লইয়া উচ্চৈস্বরে অবিরাম পরিতাপ করিতেন। একদিন তিনি বলিয়া উঠিলেন;—"মেয়েটা না জন্মালেই ভাল হত!" সেসিল রাগ ও অভিমান ভরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আমি যদি এইরকম হতুম, তুমি তাহলে কি করতে?"

নারীর মূকতা একটা ভয়ানক দুর্ভাগ্য বলিয়া "জিরো"-কাকা কিন্তু মনে করেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমার স্ত্রী এমন বাচাল যে, আর সব জিনিসই ওর চেয়ে কম খারাপ বলে' আমি মনে করি। এই ক্ষুদে স্ত্রীলোকটি খারাপ কথা কখনো বল্‌বে না, খারাপ কথা কখনো শুন্‌বে না, যাত্রার গান গুন্‌গুন্ করে গেয়ে বাড়ীর লোকদের জ্বালাতন করবে না, কখনো ঝগড়া করবে না, ওর স্বামী কাস্‌লে কখনো জাগ্‌বে না, কিংবা সকাল-সকাল উঠে স্বামীর মজুরদের তত্ত্বাবধান করবে না। ও বেশ স্পষ্ট সব দেখ্‌তে পাবে, কেন না, কালাদের চোখের দৃষ্টি ভাল। ও বেশ সুন্দরী হবে, বুদ্ধিমতী হবে, আর, কোন গোলমাল করবে না। আমার বয়স যদি অল্প হত, আমি ওকে বিয়ে করতুম। এখন আমি বুড়ো হয়েছি। আর তুমি যখনই ওকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমি ওকে পুষ্যি নেব। ও আমার মেয়ে হবে।"

জিরো কাকার এই উৎফুল্ল ধরণের কথাবার্ত্তায়, বিষণ্ণ জনক জননীর মন একটু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু আবার উহাদের উপর মেঘ নামিয়া আসিল।

৩

কালক্রমে মেয়েটি বেশ বড় হয়ে উঠিল। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি কৃতিত্ব সহকারে যথাবৎ সংসাধন করিল। কিন্তু কামিই সম্বন্ধে শেভ্যালিয়ের হৃদয়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তার মায়ের স্নেহ-দৃষ্টি তথনো তার উপর নিবদ্ধ ছিল, একদণ্ড তাহাকে ছাড়িয়া থাকিত না, তার প্রত্যেক ছোটখাটো কাজের উপর আগ্রহের সহিত নজর রাখিত। জীবনের সুখ দুঃখে ঔৎসুক্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে কি না, তাহাও লক্ষ্য করিত।

যখন কামিইর শৈশব-বন্ধুদের শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা পাইবার বয়স হইল, তখন এই মেয়ে-বেচারী অন্যের সহিত নিজের পার্থক্য অনুভব করিল। এক প্রতিবেশীর মেয়ের শিক্ষয়িত্রী বড়ই কঠোর-প্রকৃতি ছিল। মেয়েটির বানান পাঠের সময় কামিই একদিন উপস্থিত ছিল; সে তার ছোট সাথীটিকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছিল। সে বানান করিবার যতই নিস্ফল চেষ্টা করিতেছে ততই কামিই সেই সব চেষ্টা তার চোখ দিয়া অনুসরণ করিতেছে—মনের ভাবটা, যদি কোনরকমে উহাকে সাহায্য করিতে পারে। ধমক্ খাইলে সে যখন কাঁদিত, কামিইও তার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিত। বিশেষত কামিই-এর নিকট সঙ্গীতের পাঠগুলা বড়ই দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হইত।

ঐ প্রতিবেশী উহার সন্তানদিগের সহিত সায়াহ্নে একত্র উপাসনা করিত; ইহাও কামিইর নিকট একটা প্রহেলিকা স্বরূপ ছিল। তাহার বন্ধুদের সহিত সে নতজানু হইত, হাত যোড় করিত, কিন্তু জানিত না কেন করিতেছে। শেভ্যালিয়ে মনে করিত, ইহা ঈশ্বর-অবমাননা, কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহা মনে করিত না। যেমন কামিই বড় হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন একটা পবিত্র সহজ সংস্কার বশে, যে সব গির্জ্জা সে চক্ষে দেখিত সেই গির্জ্জাগুলার উপর তাহার একটা অদম্য অনুরাগ জন্মিল। সে মনে মনে ভাবিত, "আমি যখন শিশু ছিলাম তখন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতাম না, শুধু আকাশকেই দেখিতাম।" একটা ধর্ম্মসংক্রান্ত মিছিল, জাঁকালো বেশভূষায় সজ্জিত একটা ভর্জ্জিনের স্থূল মূর্ত্তি, যাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইত না সেই ধর্ম্মগান-গায়ক দলের অন্তর্ভূত একটা জঘন্য মলিন আলখাল্লা পরা বালক—এই সমস্তের মধ্যে, কে জানে কোন্ উপায়ে একটি মেয়ের নেত্রযুগল উর্দ্ধে উত্তোলিত হইল।

কিন্তু তাতে কি আসিয়া-যায় ? ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইলেই হইল।

কামিই আকারে একটু খাটো, গায়ের রং সাদা, লম্বা কালো চুল, এবং উহার চলা-ফেরায় একটা বেশ শ্রী আছে। মায়ের কি ইচ্ছা সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিত, এবং সেই ইচ্ছা অনুসারে চলিতে একটুও বিলম্ব করিত না। এতটা দুর্ভাগ্যের সহিত, এতটা শ্রী সৌন্দর্য্য সংযুক্ত হইয়াছে—এই কল্পনাটাই শেভ্যালিয়েকে যারপর নাই ব্যথিত করিত। অনেক সময় শেভ্যালিয়ে খুব উত্তেজিত হইয়া তাহার মেয়েকে চুম্বন করিত এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিত—"আমি এখনো দুষ্ট লোক হইনি মা!"

উদ্যানের শেষপ্রান্তে, গাছপালায় ঢাকা একটা বেড়াবার রাস্তা ছিল, প্রাতরাশের পর শেভ্যালিয়ে নিত্য এখানে আসিতেন। গাছের তলায় যখন তিনি পায়চালি করিতেন, তখন অনেক সময় গৃহিণী তাঁহার শয়ন-কক্ষের জানালা হইতে, তাঁহাকে তৃষিত নয়নে দেখিতেন। একদিন প্রাতে সাহস করিয়া, স্পন্দিত-হৃদয়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে সেইদিন সায়াহ্নে অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের 'বল্‌' নৃত্য হইবে, গৃহিণীর ইচ্ছা, সেই নাচের মজলিসে তিনি তাহাকে লইয়া যান। তাঁহার ভারি দেখিবার সাধ, তাঁহার মেয়ের শ্রীসৌন্দর্য্য বাহিরের লোকের উপর, তাঁহার স্বামীর উপর কিরূপ কাজ করে। কিরূপ বেশভূষায় তাহাকে সজ্জিত করিবেন, এই চিন্তায় এক রাত্রি তাঁর ঘুম হয় নাই। অতীব মধুর আশায় তাঁর মন পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন "আমার পুঁটুরাণীকে দেখে আমার স্বামী গর্ব্বিত হবেন, এবং অন্য মেয়েরা হিংসায় মরবে। কথা না কইলেও ওকেই সব-চেয়ে রূপসী বলে সবাই মনে করবে।"

ভের্সাই নগরের ধরণে, শেভালিয়ে তাঁর স্ত্রীকে অতি শিষ্টভাবে আদর অভ্যর্থনা করিলেন। পাশাপাশি বেড়াইবার সময় কতকগুলা সাদামাটা তুচ্ছ কথা বলিয়া বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। তারপর একটা নিস্তব্ধতা উহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কিরূপ বাছা-বাছা কথায় স্বামীর কাছে প্রস্তাবটা করিবেন, এবং বাহিরের কোনো মজলিসে তাঁর মেয়েকে যাইতে দিবেন না এই যে স্বামীর দৃঢ় সঙ্কল্প, এই সঙ্কল্পটা কি করিয়া ভাঙ্গিবেন গৃহিণী তাহাই মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। শেভ্যালিয়েরও মন একটা চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। শেভ্যালিয়ে প্রথমে কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি স্ত্রীকে জানাইলেন যে, কোনো জরুরী পারিবারিক কার্য্য উপলক্ষে তাঁকে হলণ্ডে যাইতে হইবে। কাল প্রাতেই ছাড়িতে হইবে—আর বিলম্ব করিলে চলিবে না।

গৃহিণী স্বামীর মনোগত ভাবটা খুব সহজেই বুঝিলেন। তাঁর স্ত্রীকে একেবারে ত্যাগ করিবেন—এ চিন্তা তাঁর কখনই ছিল না, কিন্তু একটা ক্ষণিক বিচ্ছেদের জন্য তিনি আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকৃত দুঃখের সময় বিজন-বাসের জন্য মানুষের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা হয়—ইতর জীবজন্তুদিগেরও হইয়া থাকে।

তাঁর স্ত্রী তাঁর প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না, কিন্তু আর একটা নূতন কষ্ট আসিয়া তাঁর হৃদয়কে দলিত করিতে লাগিল। ক্লান্তি অনুভব করিয়া তিনি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বিষাদময় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিনি অনেকক্ষণ এই ভাবে রহিলেন। তারপর উঠিয়া, স্বামীর বাহু অবলম্বন করিলেন এবং দুইজনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গিন্নী বেচারী নিজের ঘরে থাকিয়া, শান্তভাবে, ভগবানের নিকট প্রার্থনাদি করিয়া সমস্ত অপরাহ্ণটা কাটাইলেন। সায়াহ্নে, যখন রাত্রি প্রায় ৮টা, তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন এবং গাড়ীতে ঘোড়া জুড়িতে হুকুম দিলেন, এবং সেই সঙ্গে শেভ্যালিয়েকেও বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সেই নাচের মজলিসে যাইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, এবং আশা করিতেছেন, তিনি তাঁর সঙ্গে যাইবেন।

সাদা মস্‌লিনের উপর চিকনের কায করা একটা "গাউন," শাদা সাটিনের ছোট এক যোড়া জুতা,

মার্কিণ পুঁতির এক ছড়া হার, ভায়োলেট ফুলের একটা কিরীট—এই সাদাসিধা বেশভূষায় কামিই বিভূষিত হইয়াছিল। তার মা যখন তাহাকে এইরূপ সজ্জিত করিল, সে আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিল। যখন গৃহিণী মেয়েকে চুম্বন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছিলেন—"বাছা বাস্তবিকই তুই রূপসী; বাস্তবিকই তুই রূপসী," সেই সময় শেভ্যালিয়ে আসিয়া পড়িলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বাহু অবলম্বন দিলেন এবং তিনজনে নাচ মজলিসে যাত্রা করিলেন।

প্রকাশ্য লোকালয়ে কামিই এই প্রথম বাহির হওয়ায় স্বভাবত সে লোকের কৌতূহল খুবই আকর্ষণ করিল। শেভ্যালিয়ের কষ্ট হইতেছে, স্পষ্টই দেখা গেল। যখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁর মেয়ের রূপের প্রশংসা করিতেছিল, তখন তিনি বেশ অনুভব করিলেন তাঁকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই উহার এইরূপ প্রশংসা করিতেছে। কিন্তু এরূপ সান্ত্বনা তাঁর রুচিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি একটা গর্ব্ব ও আনন্দের ভাব তিনি সম্পূর্ণরূপ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁর হৃদয়ের ভাবগুলা অদ্ভুত রকমে মিশ্রিত ছিল। মজলিস-ঘরের সবাইকে ভাবভঙ্গীর দ্বারা অভিবাদন করিয়া, তাহার পর কামিই মায়ের পাশে আসিয়া বসিল। ক্রমে লোকেরা আরও উচ্ছ্বাসের সহিত প্রশংসা করিতে লাগিল। এই মূক মেয়ে বেচারীর আত্মার বহিরাবরণটি বড়ই সুন্দর ছিল। তাহার দৈহিক গঠন, তাহার মুখমণ্ডল, তাহার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, সর্ব্বোপরি তাহার অতুল্য জলজলে চোখ্ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত। তাছাড়া তার তৃষিত চাহনি ও শোভন ভাবভঙ্গী এমন করুণ-রসোদ্দীপক। লোকেরা শেভ্যালিয়ে-গৃহিণীর চারিধারে ভীড় করিয়া কামিই সম্বন্ধে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমে বিস্ময় ও একটু ঔদাস্য—তাহার পরেই দয়া ও মমতার ভাব উহাদের মনে আবির্ভূত হইল। এমন চিত্তবিমোহিনী মেয়ে তাহারা কখনো দেখে নাই। ওরূপ স্ত্রীসৌন্দর্য্যের তুলনা আর কোথাও নাই। কামিই নাচের মজলিসে পুরাপুরী উৎরাইয়া গেল।

বাহ্যতঃ চিরকাল শান্ত, শেভ্যালিয়ে-পত্নী আজ যেরূপ বিশুদ্ধ ও তীব্র সুখ আস্বাদন করিলেন, জীবনে কটা তেমন আর কখনো করেন নাই। পতি পত্নীর মধ্যে যে একটি স্মিত হাস্যের বিনিময় হইল, তাহা অশ্রুরই তুল্যমূল্য।

শেভ্যালিয়ে তাঁহার কন্যার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন, এমন সময় একটা পল্লী-নৃত্য আরম্ভ হইল। কামিই খুব ঔৎসুক্যপূর্ণ মনোযোগ সহকারে উহা দেখিতে লাগিল—তাহার দৃষ্টিতে কেমন একটা বিষাদের ভাব ছিল। একটি বালক ঐ নৃত্যে যোগ দিতে তাহাকে আহ্বান করিল। উত্তরচ্ছলে সে কেবল মাথা নাড়িল, তাহাতে করিয়া কতকগুলা ভায়োলেট ফুল তাহার কিরীট হইতে খসিয়া পড়িল। তাহার মা উহা কুড়াইয়া লইয়া আবার তাহার মাথায় ঠিকঠাক করিয়া পরাইয়া দিলেন। কারণ এই ফুলের মুকুটটি তাঁহার নিজের হাতের রচনা। তাহার পর তিনি যখন তাঁহার স্বামীর উদ্দেশে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন তখন দেখিলেন, ঘরের ভিতর তাঁর স্বামী আর নাই। তিনি অনুসন্ধান করিলেন, শেভ্যালিয়ে চলিয়া গিয়া গাড়ীতে বসিয়াছেন কি না। লোকেরা তাঁকে বলিল, তিনি পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী গিয়াছেন।

৪

শেভ্যালিয়ে মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, স্ত্রীর নিকট বিদায় না লইয়াই বাড়ী ছাড়িবেন। তর্ক বিতর্ক কৈফিয়তের ভয়ে তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। আর, যখন শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছেন,—তখন ভাবিলেন মুখের কথায় বিদায় না লইয়া, একটা পত্র রাখিয়া গেলেই সুবুদ্ধির কায হইবে। একটা কাযের উপলক্ষ যে ছিল না, এরূপ নহে; কিন্তু সেই উপলক্ষটা তাঁর যাইবার প্রধান কারণ ছিল না। এখন আবার সত্বর যাইবার জন্য তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিল। এটা বেশ একটা ওজর হইল। গাড়ীতে না উঠিয়া পদব্রজে পথসংকোচ করিয়া একাকী বাড়ী ফিরিলেন,

ভৃত্যদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়া জিনিস পত্র তাড়াতাড়ি গুছাইয়া বাক্সবন্দি করিলেন, হাল্‌কা বোচকাবুক্‌কি গুলা সহরে পাঠাইয়া দিলেন,—তাহার পর ঘোড়ায় চ'ড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

তথাপি তাঁর মনে একটা ধুকপুকুনি হইতেছিল; যদিও নিজের মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, শুধু নিজের জন্ম নহে, তাঁর স্ত্রীর ভালোর জন্যও এই কাযট করিতেছেন, তবু তিনি জানিতেন, হঠাৎ এইরূপ ভাবে প্রস্থান করায় তাঁর স্ত্রীর মনে খুবই কষ্ট হইবে। যাই হোক, তিনি আর থামিলেন না।

ইতিমধ্যে, গৃহিণী গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন—তাঁর কোলে তাঁর মেয়ে নিদ্রিতা। তাহাদিগকে একাকী বাড়ী ফিরিতে বাধ্য করায়, শেভ্যালিয়ের এই রূঢ় ব্যবহারে তিনি ব্যথিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন, সকলের চোখের সামনে, স্ত্রী ও কন্তার প্রতি একটা তাচ্ছিল্য দেখান হইয়াছে! একটা নূতন তৈয়ারী রাস্তায় পাথরগুলার উপর দিয়া তাঁহার গাড়ী যখন ঝাঁকানি দিয়া আস্তে আস্তে চলিতেছিল, সেই সময় তাঁর মনে ভাবী আশঙ্কাসূচক নানাপ্রকার দুর্ভাবনা হইতেছিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন;—সকলের উপরেই,—যেমন, অন্যের উপর তেমনি আমাদের উপরেও—ঈশ্বরের সজাগ স্নেহদৃষ্টি আছে। কিন্তু আমরা করব কি? আমার মেয়ে বেচারীর কি দশা হবে?

সার্দ্দোনো হইতে কিছু দূরে, হাঁটিয়া পার হইবার মত একটা অল্প-গভীর স্রোতস্বিনী ছিল। বিগত সমস্ত মাস ধরিয়া বৃষ্টি হওয়ায় নদীটা দুই কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। খেয়ার মাঝি তাহার নৌকায় গাড়ী লইতে অসম্মত হইল। সে বলিল, লোকদিগকে ও ঘোড়াকে সে নির্ব্বিঘ্নে নদী পার করিয়া দিবে, কিন্তু গাড়ীকে পার করিতে পারিবে না। স্বামীর সহিত শীঘ্র মিলিত হইবার ব্যগ্রতা বশতঃ গৃহিণী কিছুতেই গাড়ী হইতে নামিতে চাহিলেন না। তিনি নৌকায় প্রবেশ করিতে তাঁর কোচমানকে হুকুম দিলেন; পার হইতে মিনিট কয়েক মাত্র লাগিবে; তিনি কতবার পার হইয়াছেন, বলিলেন।

মাঝ নদীতে একটা স্রোত আসিয়া সিধাপথ হইতে নৌকাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। যাহাতে নৌকাখানা ভাসিয়া বাঁধের দিকে না যায় এই জন্য মাঝি কোচমানের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কারণ, অনতিদূরে একটা জাঁতাকল ও তাহার সংশ্লিষ্ট বাঁধ দিয়া আবদ্ধ একটা জলাশয় ছিল; সেখানে জল-রাশি প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়া একটা জল-প্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা সুস্পষ্ট, যদি নৌকাখানা ভাসিয়া এই জায়গায় আসিয়া পড়ে তাহা হইলে একটা ভয়ানক বিপদ ঘটিবে।

কোচ্‌ম্যান তাহার আসন হইতে নামিয়া, খুব মনের সহিত কাযে হাত লাগাইল। কিন্তু একটা লগি ছাড়া তার আর কোন হাতিয়ার ছিল না; অন্ধকার রাত্রি; ফিন্‌ফিনে বৃষ্টিতে, অন্ধ হইয়া লোকেরা কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। এবং একটু পরেই ঐ বাঁধ-বদ্ধ জলের ভীষণ কল্লোল আসন্ন বিপদের সূচনা করিল। শেভ্যালিয়ে গৃহিণী তখনো গাড়ীর ভিতরেই ছিলেন, তিনি ভয়ে গাড়ীর জানালাটা খুলিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন "তবে কি, আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই?" ঠিক্‌ এই সময়ে সেই লগিটা ভাঙ্গিয়া গেল। দুইজন লোক অবসন্ন হইয়া নৌকার মধ্যে পড়িয়া গেল—তাদের হাত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল।

খেয়ার মাঝি সাঁতরাইতে পারিত, কিন্তু কোচম্যান পারিত না। আর সময় নাই। মাদাম, পাট্রনীর নাম ধরিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সেয়ার-জর্জো, তুমি কি আমাকে ও আমার মেয়েকে বাঁচাতে পারবে?" যেন এই প্রশ্নে অবমানিত হইয়া সে উত্তর করিল—"নিশ্চয়ই।"

মাদাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আমাদের কি করতে হবে?"

পাট্রনী উত্তর করিল—"আমার কাঁধে উঠ, দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধর। আর ঐ বাচ্চাটিকে এক হাতে ধরে', আর এক হাতে সাঁতার কাটব। তাহালে আমরা ডুব্‌ব না। এখান থেকে আলুর ঐ ক্ষেতটা বেশী দূর নয়।"

আর "জঁা" ?—অর্থাৎ তাঁর কোচম্যান। "আশা করি, জঁার কিছু হবে না—যদি ঐ বাঁধের জলে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে, তাহলে আমি সেখানে একটু পরেই গিয়ে তাকে উদ্ধার করব।"

সেয়ার-জর্জে। দুইটা বোঝা লইয়া ঠেলিয়া চলিল। কিন্তু নিজ শক্তি সম্বন্ধে তার একটু হিসাবের ভুল হইয়াছিল। আসল অপেক্ষা বেশী করিয়া ধরিয়াছিল। এখন ত আর সে যুবা নহে। যতটা মনে করিয়াছিল, তটভূমি তাহা অপেক্ষা আরও বেশী দূরে ছিল, স্রোতের টানও আরও বেশী ছিল। সে খুব যুঝাযুঝি করিতে লাগিল কিন্তু স্রোতের বেগ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাহার পর একটা উইলো গাছের গুঁড়ি জলের ভিতর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই গুড়িটা তাহার কপালে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত করাতে সে থামিয়া পড়িল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়া তাহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"যদি শুধু আমার মেয়েটাকে বয়ে আনতে, তাহলে কি তাকে বাঁচাতে পারতে ?"

পাট্নী বলিল—"ঠিক বলতে পারিনে—বোধ হয় পারতাম।"

মাতা লোকটার গলা হইতে আপন হাত ছাড়াইয়া লইয়া, আস্তে আস্তে জলে পিছলাইয়া পড়িলেন।

পাট্নী কামিইকে শক্ত ডাঙ্গামাটির উপর নির্ব্বিঘ্নে যখন স্থাপন করিয়াছিল, তখন দেখিল, একজন চাষী কোচম্যানকেও উদ্ধার করিয়াছে। তখন ওরা দুজনে মিলিয়া মাদামের শরীরের খোঁজ করিতে লাগিল। পর দিন প্রাতে দেখিল, শরীরটা তটের কাছাকাছি এক জায়গায় রহিয়াছে।

৫

মাকে হারাইয়া কামিইর যেরূপ ভয়ানক কষ্ট হইয়াছিল তাহা চক্ষে দেখিতে পারা যায় না। সে বিকট চীৎকার শব্দ করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে করিতে লাগিল, মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল, দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে লাগিল। এই প্রচণ্ড আবেগের পর একটা অস্বাভাবিক শান্তি আসিল। মনে হইল, যেন তার বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় লোপ পাইয়াছে।

ঠিক এই সময় আপন ভাইঝির উদ্ধারার্থে জিরো কাকা আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, "আহা বেচারী! ওর এখন মা নেই, বাপ নেই। ও বরাবরই আমার স্নেহের পাত্র ছিল, আমি এখন কিছুকালের জন্য ওর ভার নেব।" আরও বলিলেন—"স্থান পরিবর্ত্তনে ওর খুব উপকার হবে।" পত্রযোগে শেভ্যালিয়ের অনুমতি লইয়া তিনি কামিইকে প্যারিসে লইয়া গেলেন। শেভ্যালিয়ে তাঁর শার্দ্দোনো গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। গভীর শোক ও তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, কোন জীবিত ব্যক্তির মুখ দর্শন না করিয়া, সেখানে তিনি গভীর বিজনবাসে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে অতি কষ্টে এক বৎসর কাটিয়া গেল। জিরো-কাকা এখনো পর্য্যন্ত কামিইকে চেতাইয়া তুলিতে পারেন নাই। সে কিছুতেই ঔৎসুক্য অনুভব করিত না। অবশেষে একদিন জিরো-কাকা তার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, তাহাকে অপেরা দেখাইতে লইয়া যাইবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। সেই উপলক্ষে তাহার জন্য একটা নূতন সুন্দর পোষাক ক্রয় করা হইল। এই পোষাক পরিয়া কামিই যখন আয়নায় আপনাকে দেখিল, তখন ঐ ছবিটি তাহার এত ভাল লাগিল যে বাস্তবিকই তাঁর মুখে মিষ্ট হাসির রেখা দেখা দিল। জিরো-কাকা ইহা দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন।

৬

কামিই অপেরা দেখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। গায়ক, অভিনেতা, দর্শকবৃন্দ সকলেই যেন তাহাকে বলিতেছে "আমরা কথা কই, তুই কথা কইতে পারিসনে! কিছুতেই তোর আমোদ হয় না, কিছুই তুই শুনিতে পাস্‌নে। তুই একটা পুতুল মাত্র, ঈশ্বর-সৃষ্ট জীবের একটা ছায়াসাদৃশ্যমাত্র, জীবন লীলার শুধু দর্শক মাত্র।"

এই বিদ্রূপকারী নাট্যদৃশ্য সকল মন হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশে যখন সে চক্ষু নিমীলিত করিত তখন তাহার মনশ্চক্ষের সমক্ষে তাহার পূর্ব্ব জীবনের ঘটনাসকল আসিয়া উপস্থিত হইত। সে মনে মনে তাহার পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইত, তার মায়ের সুন্দর মুখখানি আবার দেখিতে পাইত। এটা তার চক্ষে একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল! জিরো-কাকা লক্ষ্য করিলেন, তার গাল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। জিরো কাকা ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তাহার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আকার ইঙ্গিতে জানাইত, সে ওখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহে। সে উঠিল, উঠিয়া "বক্সের" দরজাটা খুলিল।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে, একটা কি যেন তার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। একটি সুশ্রী সুবেশী যুবক তাহার নজরে পড়িল। সেই যুবকটি সাদা পেনশিলে একটা ছোট শ্লেটের উপর অক্ষর ও মূর্ত্তি আঁকিতেছিল। মাঝে মাঝে এই শ্লেটটা তাহার পাশের লোককে দেখাইতেছিল। পাশের লোকটি উহার অপেক্ষা বয়সে বড়, সে তৎক্ষণাৎ তাহার কথা বুঝিল এবং এই ধরণে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল। সেই সঙ্গে উহারা উভয়েই চিহ্নের বিনিময় করিল।

কামিইয়ের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য খুবই উদ্দীপ্ত হইল। সে আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল, ঐ যুবকের ঠোঁট নড়িতেছিল না। এখন সে দেখিল, সে যে ভাষায় কথা কহিতেছে সে ভাষা অন্তের নহে; বাক্যের সাহায্য ব্যতীত মনের কথা প্রকাশ করিবার একটা উপায় পাইয়াছে। এই কৌশলটা তার বুদ্ধির অগম্য ও অসম্ভব! সে অপেরা-"বক্সের" কিনারার উপর ঝুঁকিয়া ঐ অপরিচিতের নড়াচড়া খুব মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই যুবক আবার যখন শ্লেটের উপর কিছু লিখিল এবং সেই শ্লেট তাহার সঙ্গীর হাতে অর্পণ করিল তখন কামিই যেন উহা লইতে চাহে, অতর্কিত ভাবে এইরূপ একটা মুখভঙ্গী করিল। ইহাতে যুবকও তাহার দিকে তাকাইল। চারি চোখের মিলন হইল এবং উহারা যেন একই কথা প্রকাশ করিল; "আমাদের দুজনের একই অবস্থা; আমরা দুজনেই বোবা।"

জিরো-কাকা ভাইঝির বহির্বাসটা আনিলেন; কিন্তু তার আর যাইবার ইচ্ছা হইল না। সে আগ্রহের সহিত বক্সের ধারটার সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়াই রহিল।

"এপের" মঠধারী সন্ন্যাসীর নাম তখন সবে জাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মূক ও বধিরের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া এই সাধু সন্ন্যাসী এক প্রকার ভাষা উদ্‌ভাবন করিয়াছিলেন যাহা Leibnitzএর উদ্‌ভাবিত ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তিনি মূক বধির-দিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া আবার মনুষ্য পদবীভুক্ত করিয়াছেন। স্বকীয় ধন ও জীবন মূক বধিরের কল্যাণ সাধনে নিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি একাকী ও বিনা সাহায্যে ঐ দুর্ভাগ্য মানব ভ্রাতাদের জন্য দারুণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

যে যুবকটিকে কামিই নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে এই সাধু সন্ন্যাসীর একজন প্রথম ছাত্র; "মোত্রে" মার্কি-সর পুত্র।

৭

বলা বাহুল্য যে, কি কামিই, কি তার কাকা, উহারা ঐ মঠ সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে কিংবা তাঁর শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। কামিইর মা যদি বেশী দিন বাঁচিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত আবিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু "শার্দ্দনো" গ্রাম প্যারিস হইতে দূরে; শেভ্যালিয়ে "গেজেট" সংবাদপত্র লইতেন না, লইলেও কখনো পড়িতেন না। এই প্রকারে কয়েক ক্রোশের দূরত্ব, একটু আলস্য, কিংবা মৃত্যু, —ইহাদের দ্বারা একই ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

অপেরা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একটি মাত্র চিন্তা কামিইর মনকে দখল করিয়া বসিল। সে তাহার কাকাকে বুঝাইয়া দিল যে তাহার লিখিবার উপকরণ

দরকার হইয়াছে। ভদ্রলোকটি তখন সায়াহ্নভোজনের জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁর ঘরে গিয়া একটা কাঠের তক্তি ও এক টুকরা খড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই দ্রব্যগুলি বাস্তুশিল্পের প্রতি তাঁর পুরাতন অনুরাগের চিহ্নাবশেষ।

কামিই হাঁটুর উপর তক্তিটা রাখিয়া তাহার পর তাহার কাকাকে ইসারা করিয়া বলিল—"তুমি আমার পাশে বসে এই তক্তির উপর কিছু লেখো।" অতি সন্তর্পণে বালিকার বুকে হাত রাখিয়া, জিরো-কাকা বড় বড় অক্ষরে "কামিই" এই নামটি লিখিলেন। সেদিনকার সায়াহ্নের কাযে বেশ সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পর তিনি সায়াহ্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কামিই যত শীঘ্র পারিল, তক্তিটাকে দুই হাতে জাপটিয়া ধরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

তাহার সৌখীন পরিচ্ছদের বিস্তরাংশ পাশে সরাইয়া রাখিয়া ও পিছনের চুল এলাইয়া দিয়া তাহার কাকার লিখিত কথাটা খুব চেষ্টা ও যত্নের সহিত নকল করিতে আরম্ভ করিল। অনেকবার লিখিবার পর এক রকম মোটামুটি অক্ষরগুলা গড়িয়া উঠিল। সেই অক্ষরগুলায় কি কথা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কে বলিবে?

জুলাই মাসের সুন্দর উজ্জ্বল রাত্রি। কামিই তাহার ঘরের জানালাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত কাযের মধ্যে এক একবার একটু থামিয়া বাহিরের দৃশ্য নিতান্ত উজাড় ধরণের হইলেও, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বহির্দেশটা নিরীক্ষণ করিতেছিল। জানালা হইতে একটা অঙ্গন নজরে পড়ে। এই অঙ্গনে গাড়ী থাকে, একটা চালার নীচে পাশাপাশি চার পাঁচখান প্রকাণ্ড গাড়ী ছিল। আর দুই তিনটা গাড়ী অঙ্গনের মধ্যস্থলে ছিল। যেন তাহারা ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আস্তাবলে ঘোড়াদের লাথির শব্দ শুনা যাইতেছে। অঙ্গনটা উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা ও তাহার দরজা বন্ধ।

হঠাৎ কামিই দেখিতে পাইল, একটা বড়-গাড়ীর ছায়াতলে একটা মানুষ পায়চারি করিতেছে। তাহার ভয় হইল। লোকটা একদৃষ্টে জানালার দিকে চাহিয়া আছে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার সাহস আবার ফিরিয়া আসিল। সে ল্যাম্পটা হাতে লইয়া জানলা হইতে ঝুঁকিয়া সেটা এমনভাবে ধরিল যে তাহাতে করিয়া সমস্ত অঙ্গনটা আলোকিত হইল। এই লোকটা আর কেউ নয়—ইনি মোত্রের মার্কিস্। মার্কিস্ যখন দেখিলেন, তাঁহাকে জানলা হইতে একজন দেখিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি, নতজানু হইলেন এবং মুগ্ধ ভক্তির ভাবে কামিইকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং চটুলভাবে দুই তিনখানা মধ্যবর্ত্তী গাড়ীর উপর দিয়া উঠিয়া গিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই কামিইর কামরার মধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে আসিয়া খুব নীচু হইয়া তাহার দিকে মাথা নোয়াইলেন। তাঁহার ভারী ইচ্ছা হইতেছিল, যদি কোন উপায়ে তাহার সহিত কথা কহিতে পারেন। তারপর টেবিলের উপর একটা কাঠের তক্তিতে কামিই এই নামটা লেখা আছে দেখিয়া, তিনি খড়িটা লইয়া, ঐ নামের পাশে তাঁর নিজের নাম "পিয়ের" লিখিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটা ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠস্বর গর্জ্জিয়া উঠিল—ইহা জিরো-কাকার কণ্ঠস্বর। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই অনধিকার প্রবেশকারীর প্রতি গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"তুমি কে? এখানে কি করতে এসেছ?" মার্কিস্ শান্তভাবে তক্তির উপর একটা কি লিখিয়া জিরো-কাকার হাতে দিলেন। জিরো কাকা নিম্নলিখিত কথাগুলি পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলেন, "আমি কুমারী কামিইকে ভালবাসি এবং আমি উঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি। আমি মোত্রের মার্কিস্। আপনি কি কুমারীকে আমার হাতে সম্প্রদান করিবেন?"

কাকার রাগটা কমিয়া আসিল। তাঁহার মনে পড়িল, যুবকটিকে নাট্যশালায় তিনি সেদিন দেখিয়াছিলেন। যুবকটির সম্বন্ধে মনে মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, একেবারে সিধে আসল কথায় আসিয়া, উঁহারা কেমন

চট করিয়া কায শেষ করিয়া ফেলে—আশ্চর্য্য কাণ্ড এই বোবাদের।"

৮

প্রকৃত প্রণয়ের অবাধ গতি এ ক্ষেত্রে এই প্রথম দেখা গেল। এই অতীব বাঞ্ছনীয় বিবাহ সম্বন্ধে শেভ্যালিয়েয় সম্মতি সহজেই পাওয়া গেল। মূকবধিরদিগকে লেখা-পড়া শেখানো যে সম্ভব এই বিষয়টা তাঁকে বুঝাইতে বরং একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন হয়। বিবাহের ২।৩ বৎসর পরে একদিন কামিইর নিকট হইতে এই পত্র খানি পাইলেন—পত্রের আরম্ভেই এই কথাগুলি আছে —"দেখ বাবা! আমি এখন কথা কইতে পারি,— মুখ দিয়ে নয়, কিন্তু হাত দিয়ে।"

সে কিরূপে এইরূপ করিতে শিখিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছে। এই নবজাত ভাষার জন্য সে যাঁহার কাছে ঋণী সেই এপের মঠ সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ করিয়াছে। সে তাহার খুকীর রূপ বর্ণনা করিল এবং তাঁহার মেয়ে ও নাত্নীকে দেখিবার জন্য একবার আসিতে তাঁকে আগ্রহের সহিত অনুনয় করিয়াছে।

এই পত্রখানা পাইয়া শেভ্যালিয়ে অনেকক্ষণ ইতস্তত করিতে লাগিলেন। জিরো-কাকার পরামর্শ চাওয়ায়, জিরো-কাকা এইরূপ বলিলেন—"যাবে বৈকি, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? নাচের মজলিসে তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে বোলে তুমি ক্রমাগত অনুতাপ করিতে? তোমাকে দেখবার জন্য তোমার মেয়ের এত আগ্রহ, তুমি কি সেই মেয়েকেও ত্যাগ করবে? চল, আমরা দুজনে এক সঙ্গে যাই। এই নিমন্ত্রণের ভিতর আমার নাম উল্লেখ করে নি—এর জন্য আমি মেয়েটাকে নেমখারাম মনে করছি।"

শেভ্যালিয়ে মনে মনে ভাবিলেন—জিরো যা বলছে তা ঠিক্। সেই রমণীর শিরোমণিকে আমি অনর্থক কি কষ্টই না দিয়াছি। আমি তার প্রাণ রক্ষা করব, না তাকে ভীষণ মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিলুম—আমি স্বয়ং তার মৃত্যুর কারণ হলুম। কামিইকে দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হবে বটে, কিন্তু এ শাস্তি আমার ন্যায্য পাওনা। আচ্ছা আমি এই তিক্ত সুখ আস্বাদন করব;—আমার মেয়েকে দেখ্‌তে যাব।"

৯

"সাঁ-জেরমাঁ৷ সহরতলীর একটা বাড়ীতে একটি সুন্দর খাস-কামরা (Boudoir)। কামিইর বাবা ও কাকা সেই কামরাতেই কামিই ও পিয়েরকে দেখিতে পাইলেন। টেবিলের উপর কেতাব ও ছবির খাতা রহিয়াছে। স্বামী বই পড়িতেছেন, স্ত্রী শেলাই করিতেছিল, আর খুকী গালিচার উপর খেলা করিতেছিল। শুভাগত সাক্ষাৎকারী দিগের দর্শন মাত্র ম'কিস উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কামিই বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল; বাপ তাকে আলিঙ্গন করিবার সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তারপর শেভ্যালিয়ের সাগ্রহ দৃষ্টি খুকীটির উপর পড়িল। পূর্ব্বে কামিইর ইন্দ্রিয়হীনতার জন্য কামিইর উপর তাঁর যে একটা বিরাগ জন্মিয়াছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই বিরাগের একটু ছায়া যেন তাঁহার উপর আবার আসিয়া পড়িল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, মায়ের হীনতা জন্মসূত্রে এই মেয়ের উপরেও বর্ত্তিয়াছে নিশ্চয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আর একটি বোবা?"

কামিই খুকীকে হাতে তুলিয়া ধরিল। না শুনিয়াও সে সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল। আস্তে আস্তে খুকীকে শেভ্যালিয়ের সম্মুখে আনিয়া, তার ছোট ছোট টুক্‌টুকে ঠোঁটের উপর একটু টোকর দিতে লাগিল;—কথা কহাইবার জন্য সাধ্যসাধনার হিসাবে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই খুকী মার শেখানো কথাগুলি স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিল—"গুড্ মর্নিং পাপা!"

তখন জিরো কাকা বলিলেন—"এখন স্পষ্ট দেখলে ত,—ঈশ্বর সমস্তই মার্জ্জনা করেন এবং চিরকালের জন্য মার্জ্জনা করেন।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছিন্নমালা

(গল্প)

মায়ের শেষ বিদায় দিনে বিশু গৃহে ছিল না। 'রথের মেলা' দেখাইতে মাসী তাহাকে দরিয়াপুর লইয়া গিয়াছিল।

মাসীর ছেলেদের সহিত হাসিয়া-খেলিয়া, 'নাগর দোলায়' দোল খাইয়া, চিতাবাঘের গর্জ্জন শুনিয়া, সাতদিন পর বিশু ঘরে ফিরিয়া দেখিল তাহার মা নাই। যে মা তাহার পদশব্দে শত কায ফেলিয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইত, সেই স্নেহময়ী মমতাময়ী মায়ের অদর্শনে বিশু বিচলিত হইয়া ডাকিল, "মা, মা; কোথায় তুই? সাড়া দিচ্ছিস নে কেন? তোকে ফেলে আমি মাসীর বাড়ী গিয়েছিলাম, তাই বুঝি রাগ করেছিস! আর কখন তোকে ফেলে যাব না মা, তুই এসে আমায় একটু কোলে কর।"

সাত বছরের বালকের মিষ্টি কথায় মা তৈল হরিদ্রায় রঞ্জিত শাড়ীর অঞ্চলটি মাথায় টানিয়া দিয়া, দুইখানি বাহু প্রসারিত করিয়া, রন্ধনশালা হইতে ছেলেকে লইতে বাহিরে আসিল না। "বিশু আমার, ধন আমার, এখন আমার হাত যোড়া, আমি যেতে পারচি না; তুই আমার কাছে আয়।" বলিয়া সাদরে আহ্বান করিল না।

মায়ের অবিবেচনায়, অকরুণ ব্যবহারে বিশুর অভিমানের উৎস শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইল। বেদনায় অশ্রুজল চক্ষের প্রান্ত বহিয়া নিটোল নির্ম্মল অধর দুইটি পরিসিক্ত করিতে লাগিল। মেলা হইতে আনীত বড় সাধের টিনের রথ ও বাঁশের বাঁশী প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়া, বিশু ধরাশয্যার আশ্রয় লইল।

মাসীর বাড়ীর যে কৃষাণ বিশুকে লইয়া আসিয়াছিল, সে এখানকার আকস্মিক ঘটনা কিছুই জানিত না, অবুঝ বালকের অহেতু অভিমানে হাসিয়া বলিল, "এত রাগ কেন মণ্ডলের পো; তোমার বাপ বুঝি খেতের কাযে গেচে, মা জল আন্‌তে গেচে, খালিঘরে রাগ করে করবে কি? বাপ-মা ঘরে ফিরলে যত ইচ্ছা রাগ করো।"

মা ঘাটে গিয়াছে, তাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারে নাই শুনিয়া শিশু শান্ত হইল। মেঘের কোলে রৌদ্রের মত তাহার মলিন মুখখানি হাসির অরুণালোকে দীপ্ত হইয়া উঠিল। বিশু গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া, রথ ও বাঁশীটি ভূমি হইতে তুলিয়া, উদ্বেলিত বক্ষে, উৎসুক নয়নে মার প্রত্যাগমন আশায় বন পথটির পানে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল পর বিশুর মার পরিবর্ত্তে বাপ পরাণও ক্ষেত হইতে ফিরিয়া, ছেলেকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বিশু, তুই এলি তোর মা কোথায়? তোর মাকে নিয়ে আয়। তুই ছিলি না, তাই তোর মা আমায় ফাঁকি দিয়ে গেচে। তাকে ফিরিয়ে আন্ বিশু।"

অকস্মাৎ কি একটা অব্যক্ত অজানা যন্ত্রণায়, বিশুর ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত হইল। সে বাপের আক্ষেপের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাহার মা নাই, চলিয়া গিয়াছে শুধু এই কথাটা বালকের সুকোমল বুকে তীরের ফলার মত বিঁধিয়া রহিল।

বিশু পিতার কোলের কাছটি ঘেঁষিয়া, ডাগর চক্ষু দুইটি মেলিয়া বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কাঁদচ কেন? আমার মা কোথায় গেচে? কবে আসবে?"

বিশুর মা যে আসিবে না, ইহজীবনে তাহার আর আসিবার সম্ভাবনা নাই; পরাণ এতটুকু দুধের ছেলের কাছে তাহা বলিতে পারিল না। দুঃখের সহিত যাহার পরিচয় নাই, মৃত্যুর সহিত পরিচয় নাই, সেই অপাপ-

কিন্তু জ্ঞানহীন বালককে কেমন করিয়া বলা যায় 'তোর মা মরণের শীতল কোলে অনমের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তোর আকুল রোদনে অসীম ব্যথায় তার ঘুম ভাঙ্গিবে না, সে আসিবে না।'

পরাণ বিশুকে বুকে চাপিয়া অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল, "সে কোথায় গেছে, কবে আসবে, সেকথা যে আমি তোকে বল্‌তে পারিনে বিশু। সে যে আমার বলার কথা নয়। আমি কেমন করে কোন্ মুখে বলি তোর মা—তোর মা—"

পরাণের আর আর বলা হইল না। অশ্রুবাষ্পে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। পরাণের ক্রন্দন শব্দে প্রতিবেশীরা অনেকেই আসিয়াছিল। বিমনা বিস্মিত বিশু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল, "তোম্‌রা সবাই বল, আমার মা কোথায় গেচে? কবে আস্‌বে? আমি মার কাছে যাব।"

সরল বালকের ব্যাকুলতায় সকলের চক্ষুই সজল হইল। কেহই বিশুর কথার প্রত্যুত্তর করিল না। এতগুলি লোকের নির্ব্বাকতা বিশুর ভাল লাগিল না। তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন দুরুদুরু করিয়া চোখ জলে ভরিয়া গেল। হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে ভগ্ন কণ্ঠে বিশু বলিতে লাগিল, "তোমরা সবাই চুপ ক'রে রইলে কেন? আমার মা কোথায় গেচে বল না!"

বিশুর সমবয়স্ক ও খেলার সাথী দাসেদের জটাধারী, ঘুড়ি লাটাই লইয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। বন্ধুর স্ফুরিতাধর, ভেজা চোখের ব্যথিত দৃষ্টি বালকের কোমল বুকে আঘাত করিল। ধীরে ধীরে বিশুর সম্মুখে আসিয়া জটাধারী মৃদু সান্ত্বনার স্বরে কহিল "তোর মা যে রাগ করে বাপের বাড়ী গেচে তা তুই জানিস্ না বিশু? রাগ করে গেচে, রাগ পড়লে আবার আস্‌বে। তার জন্যে কান্না কেন? আমার মাও বাবার সঙ্গে রাগ ক'রে বাপের বাড়ী গিয়েছিল, আমি ঠাকুমার কাছেই ছিলাম, একটুও কাঁদিনি একবারও মার কথা বলি নি, খুব লক্ষী হয়ে ছিলাম। ক'দিন পর মা আবার ফিরে এসেচে। বাপের ঘর থেকে আমার জন্যে রেলগাড়ী এনেচে, পাল্কী এনেচে। তোর মা আবার ফিরে আস্‌বে রে, রাগটা পড়লেই হয়। চল ভাই আমরা মাঠে গিয়ে ঘুড়ি উড়াই গে। আজ চলন বিলে জল পড়চে, মাছ ধরার খুব মজা হবে।" বলিয়া জটাধারী বিশুর হাত ধরিল।

অন্ধকারে সহসা যেন বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইল। নিরাশার অকূল পাথারে একটু কূলের আভাস মিলিয়া গেল। এত সহজ কথাটা এতক্ষণ বিশুর স্মরণ হয় নাই ভাবিয়া সে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইল। আগে মনে হইলে এত লোকের ভিতর তাহার তো চোখ দিয়া জল পড়িত না। 'মা নাই' শুনিয়া এমন চমক লাগিত না। সে ঘরে ছিল না বলিয়াই মা রাগ করিয়া যাইতে পারিয়াছে, থাকিলে আর এ সুবিধাটুকু হইত না। একবার মা ফিরিলে হয়! তখন রাগের মজাটা বিশু তাহাকে আচ্ছা করিয়া বুঝাইয়া দিবে। তাহাকে ফেলিয়া বাপের বাড়ী যাওয়া, রাগ করা,—বিশুও রাগ করিতে জানে। বাড়াভাত না খাইয়া, বিছানায় না শুইয়া বিশু মায়ের রাগের প্রতিশোধ দিবে। এইরূপ নানা জল্পনা কল্পনায় বিশু জটাধারীর সহিত যাইতে পারিল না। দিগন্ত প্রসারিত মাঠে, বিচিত্র বর্ণের ঘুড়ি ও জলের মাছ আজ তাহাকে আকর্ষণ করিল না। জটাধারীর হাতের মধ্য হইতে হাতখানা টানিয়া লইয়া বিশু বিজ্ঞের মত গম্ভীর মুখে বলিল "আজ আমি খেল্‌বো না, ভাই, বাবার কাছে থাক্‌বো। এখন আমার খেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না।"

জটাধারী বন্ধুকে খেলায় প্রবৃত্ত করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। একটা কান্নাকাটা হাঙ্গামার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রতিবেশিগণ যে যাহার কাযে প্রস্থান করিল। এত সহজে একটি কথায় বিশুকে শান্ত হইতে দেখিয়া পরাণ আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

ধীরে ধীরে আলো-করা ভুবনের বুকে সন্ধ্যার ম্লান-ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল। মাথার উপরে আকাশ

ভরা তারাগুলি জ্বলিয়া উঠিল। আসন্ন বর্ষার শীতল বাতাস তরুপল্লবে হিল্লোল তুলিয়া বহিয়া গেল।

পরাণ মাটীর প্রদীপটা প্রজ্জ্বলিত করিয়া ডাকিল "বিশু উঠে আয় মুড়ি দিচ্চি খা, আজ আর ভাত রাঁধতে পারবো না; মুড়ি খেয়েই থাক্‌তে হবে।"

বিশু উঠিয়া গিয়া পিতৃ প্রদত্ত মুড়ির সম্মুখে বসিল বটে, কিন্তু খাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। মায়ের হাতের পরিপাটী করিয়া সাজানো গোছানো ঘরখানির এলোমেলো অবস্থা দেখিয়া বিশুর হৃদয়ে পীড়ার সঞ্চার হইল। মায়ের বিছানাটি, মায়ের কাপড়খানি একটি বার আঁকড়িয়া ধরিবার গোপন ইচ্ছায় বিশু চারিদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল "বাবা; মা বুঝি তার কাপড় বিছানা নিয়ে গেছে; কিছুই দেখ্‌চি না।"

খুব সংক্ষেপে "হাঁ" বলিয়া পরাণ গোরু তুলিতে গোয়ালের দিকে চলিয়া গেল।

বিশু ছিন্ন মাদুরটা পাতিয়া তাহারই উপর লুটাইয়া পড়িল। গোধূলির মাতৃহীন বৎসের মত আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন বালকের অন্তরে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

(২)

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর বিশু চক্ষু মেলিয়া দেখিল সে শূন্য গৃহে শূন্য বিছানায় শুইয়া রহিয়াছে। গত রজনীর ঘটনাবলী অস্পষ্ট স্বপ্নের ন্যায় বিশুর মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই ত্রস্তে সে বিছানা ছাড়িয়া মায়ের অনুসন্ধানে তুলসীতলার দিকে অগ্রসর হইল। বিশুর বিলক্ষণ রূপেই জানা ছিল তাহার জননী প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে তুলসীমূল মার্জ্জনা করিয়া অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু আজ মা কোথায়? মার ভক্তি ভালবাসার তুলসীতলা যে আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মূলে যত্ন মার্জ্জিত হাতের চিহ্ন নাই, ক্ষুদ্র প্রদীপটাও নাই। সমস্ত বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। রান্নাঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া মেজের শৃগাল গর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাচার লাউ গাছটা গরু খাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাঙ্গণের চারা ফুল গাছক'টি পাড়ার ছাগল আসিয়া নেড়া করিয়া গিয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বহুদিনের বিস্মৃত কাহিনীর মত সব কথাই বিশুর স্মরণ হইল। "মা নাই" ভাবিতেই তাহার চক্ষুর প্রান্ত ভিজিয়া গেল।

পরাণ গোরুর জাব দিয়া গোয়ালের সম্মুখে বসিয়া খড় কুচাইতেছিল, সাহসা ঝড়ের বেগে বিশু ছুটিয়া গিয়া বাপের পিঠে মাথা রাখিয়া সকরুণ কণ্ঠে কহিল "বাবা আমার ভাল লাগ্‌ছে না, কেবলি কান্না পাচ্চে। আমার মাকে এনে দাও। আমি মা চাই। আর আমি মাসীর বাড়ী যেতে চাইব না; আর তেঁতুল চুরী করে খাব না। তোমার সব কথাই শুন্‌বো, মার সব কথাই শুন্‌বো। আমার মা এনে দাও বাবা।"

পরাণ হাতের খড়গুলি মাটীতে ফেলিয়া দিয়া ছেলেকে কোলে লইল। ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে বলিল "বিশু, আমি তোর মা এনে দিতে পারি; কিন্তু তোর মা যেমনটি গেছে তেমনটি আস্‌তে পারবে না। তোর মামার দেশের নদীর জল বড্ড নোনা, সে জলে চান কর্‌লে মানুষের চেহারা, গলার স্বর সব বদ্‌লে যায়। তোর মা সেই জলে চান করে' অন্য রকম হ'য়ে গেচে। সে মা কি তোর পছন্দ হবে, না—ভাল লাগবে?"

মা আবার নাকি ভাল লাগেনা! মা সে মধু দিয়া মাখানো, মিছরী দিয়া গড়া, সেই মা নাকি ভাল লাগিবে না! অবোধ বালক বাপের রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিল না। বাবা মাকে যে আনিয়া দিতে পারে—এই কথাটুকু তাহার হৃদয়ের নিভৃতে আনন্দরস বিকীর্ণ করিল, এবং দুই হস্তে তালি বাজাইয়া উল্লাস ভরে বলিল, "মাকে আমার খুব ভাল লাগে বাবা, তোমার চেয়ে বেশী ভাল লাগে। করুকগে সে নোনা জলে চান্‌, হোক্‌গে সে ধুলো কাদায় ভূত, তাতে

আমার বয়েই গেচে! তুমি এখুনি আমার মাকে আন্‌তে যাও বাবা।"

পরাণ ক্ষণকাল চিন্তার পর সবিষাদে কহিল, "এত তাড়াতাড়ি করে তাকে আনা যাবে না বিশু! তুই একটু সবুর কর, ক'দিন পরে আমি তোর মা এনে দেব।"

মার জন্য আরও কয়েকদিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে শুনিয়া বিশু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "সবুর করবো কেন বাবা? তুমি আন্‌তে গেলে কি মা আজ আস্‌বে না?"

"না বিশু, এত শীগ্‌গির সে আস্‌বে না। জটাধারীর কাছে কাল তো শুনেচ—রাগ না পড়লে তোমার মা কথ্‌খনো এখানে আসবে না।"

"আমাকে নিয়ে গেলেও কি আমার সঙ্গে মা আস্‌বে না বাবা? মা তো আর কোন দিন এমন রাগ ক'রে না, এবার রাগ কর্‌ল কেন?"

"আমি তাকে বকেছিলাম, তাই সে রাগ করে চলে গেচে। সে যেখানে গেচে—সেটা অনেক দূরের পথ, সেখানে তুই যেতে পারবি না, তোর যাওয়া হবেনা। আমিই একদিন গিয়ে তোর মা আনবো, নিশ্চয়ই মা এনে দেব। এখন তুই কয়েক দিন মার কথা ভুলে বাপের কাছে থাক্ বিশু। তোর মুখে মা কথা আর শুন্‌তে পারি না।" বলিতে বলিতে পরাণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বিশুর সম্মুখেই অশ্রুর উৎস ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রভাত রৌদ্র রঞ্জিত বর্ষাস্নাত বাঁশঝাড়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরাণ ক্রন্দনোচ্ছ্বাস প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিল।

পিতার এ অভাবনীয় হৃদয়োচ্ছ্বাসে কুয়াশা ঢাকা প্রভাতের মত বালকের অপরিস্ফুট হৃদয়ে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার বাষ্পে ভরিয়া গেল। মায়ের আলোচনায়, বাপের এত অধীরতার কারণ কিছুতেই সে বুঝিতে পারিল না। অথচ যাহা পিতার নিকটে ক্লেশদায়ক তাহাই যে তাহার বড় প্রীতিপ্রদ। শত-বার মায়ের কথা বলিতে, সহস্রবার মায়ের প্রসঙ্গ শুনিতে বিশুর হৃদয় আকুল উন্মুখ। কিন্তু তবু সে আলোচনা সে প্রাণ ভরিয়া করিবার উপায় নাই, করিলে বাপের মুখ ম্লান হইয়া যায়, উপরন্তু শুষ্ক চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। বাপের দুঃখ বিশু সহিতে পারে না। মার কথা না বলিয়া না শুনিয়াও থাকিতে পারে না। তাহার উভয় সঙ্কট। সে এখন কি করিবে? কি উপায়ে বাপকে শান্ত করিয়া মাকে ফিরাইয়া আনিবে? মা নহিলে তাহার চলিবে না, কিছুতেই চলিবে না। বিমূঢ় বিশু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিয়া লইল, তাহার পর ঘুরিয়া পরাণের সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মার কথা বল্লে তুমি অমন হয়ে থাক কেন? তুমি অমন হয়ে থাক্‌লে আমার বড্ড ভয় করে। মা যদি এখন না আসে তা'হলে সব সময় আমায় মার গল্প বল্‌তে হবে।—আচ্ছা বাবা, মা তো তোমার ওপর রাগ করে গেল, যাবার সময় আমার কথা কিছু বলে গেল না? আমার জন্যে কিছু রেখে গেল না?"

পরাণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল, "তোর জন্য মুড়ি ভেজে, নাড়ু করে রেখে গেচে বিশু, আর একটি বকুল ফুলের মালা গেঁথে রেখে গেছে।"

"বকুল ফুলের মালা"!

"হাঁ বিশু, বকুল ফুলের মালা তোর জন্যেই সে গেঁথেছিল, আমি তোর মালা তোকে এনে দিচ্ছি।" বলিয়া পরাণ শয়ন কুটীরে ঢুকিল। তাহার স্মৃতির সাগর মথিত করিয়া অতীতের স্বপ্নময়, সুখময় ছবিগুলি মানস নয়নে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল বিশুকে দরিয়াপুর পাঠাইয়া বাসিনীর কত উৎকণ্ঠা, বিশুরই উদ্দেশে নূতন চারা গাছের বকুল ফুল কুড়াইয়া বিরলে মালা গাঁথা।

মাঠ হইতে ফিরিয়া পত্নীকে নিবিষ্ট মনে মালা গাঁথিতে দেখিয়া, পরাণ পরিহাসের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুই কার জন্যে মালা গাঁথ্‌ছিস বাসিনী? জমিদার বাড়ী

যাত্রা গান শুনে তোরও বুঝি রাধিকার মত মালা গাঁথার সখ্ হয়েচে ? রাধা ঠাকরুণ যেন কেষ্ট ঠাকুরকে দেবে বলে মালা গেঁথেছিল ; তুই কার জন্যে গাঁথ্‌ছিস রে ?"

সুন্দর মুখ খানি হাসিতে হাসিতে উজ্জ্বল করিয়া বাসিনী উত্তর দিয়াছিল, "আমার কেষ্ট বেষ্টর জন্যে মালা গাথ্‌তে হয় না। আমার কেষ্ট বেষ্ট তুই ; নতুন গাছের ফুলগুলো শুধু শুধু নষ্ট হবে, তাই আমি বিশুকে দেবো বলে মালা গাঁথ্‌চি। বকুল বাসি হলেও অনেকদিন গন্ধ থাকে ; সে ফিরে এলে মালাটা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বোল্‌ব 'তোর কথা ভেবে তোর জন্যেই আমি মালা গেঁথে রেখেচি বিশু।"

হায়, বিশুর ফিরিয়া আসা পর্য্যন্তও তাহার সবুর স'হল না। সেই রাত্রেই বাসিনী অসুস্থ হইয়া পড়িল। পরদিন সন্ধ্যার সময় একটি মৃত পুত্র প্রসব করিয়া ; স্বামী ফেলিয়া, পুত্র ফেলিয়া, সাধের সংসার ফেলিয়া বাসিনী চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। শোকে তাপে জ্ঞানশূন্য হইয়া বিশুকে আনার কথাও পরাণের স্মরণ হইল না। বাসিনীর সহিত পরাণের হৃদয় খানি পুড়িয়া গেল। তরুণ জীবনের সুখ, আশা পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল। রহিল শত স্মৃতি, শত চিহ্ন, আর শুষ্ক বকুল মালা।

কৃষকের কুটীরে হস্তাক্ষর নাই ; প্রেমপত্র নাই, এক খানি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিও নাই। তাই পরাণের বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী কয়েকটা—বকুলের শুষ্ক মালা গাছি বুকে লইয়া বড় দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছে। আজ সেই স্মৃতি বিজড়িত অশ্রুজলে ধৌত মালাটা বেতের ঝাঁপির ভিতর হইতে বাহির করিয়া পরাণ বিশুর গলায় পরাইয়া দিল। বকুল শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তার স্নিগ্ধ সুবাস টুকু বিলীন হয় নাই। অনাবিল অমল মাতৃস্নেহের মত বকুলগুলি সেই স্থানটি সৌরভাকুল করিয়া তুলিল।

বিশু গলার মালাটা নাকের কাছে ধরিয়া, মুখের কাছে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "মার হাতের মালা খুব সুন্দর বাবা, খুব গন্ধ ভরা ; আমি কোথায় রাখ্‌বো ? যদি ছিঁড়ে যায়, তা হলে মা এসে কি বল্‌বে ? মা ফিরে এলে এই মালাটা আমি মাকে দেখাবো।"

পরাণ দূর শরবনের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। ছেলের কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। অবশেষে বিশু কিছু অধীর ভাবে পিতার গায়ে হাত নাড়া দিয়া বলিল, "বাবা কথা বলচ না কেন, মালাটা কোথায় রাখবো, যদি ছিঁড়ে যায় ?"

পরাণ বনের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ছেলের মুখের পানে চহিয়া কহিল, "শক্ত সুতো দিয়ে গাঁথা আছে, ও মালা ছিঁড়বে না বিশু। তোর মার বেতের ঝাঁপিতে তুই মালা রেখে দিস। সে যাবার সময় তোকে ঝাঁপিটাও দিয়ে গেচে।"

বহুদিন হইতেই মায়ের ক্ষুদ্র ঝাঁপিটির প্রতি বিশুর লুব্ধ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। কতদিন কাঁদিয়া আব্দার করিয়াও এ দুর্লভ দ্রব্যটি সে মায়ের নিকট হইতে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বাসিনীর বধূ জীবনের এইটা স্বামী প্রদত্ত প্রথম উপহার, সুতরাং অতি আদরের। আজ অযাচিত ভাবে সেই ঝাঁপিটা পাইয়া বিশুর আনন্দের সীমা রহিল না। হর্ষোচ্ছ্বাসে তাহার নীর্ণ নেত্র দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিশু ঝাঁপির ডালা খুলিয়া দেখিল, চুলের দড়ি, সিন্দুর কৌটা, কাঠের চিরুণী খানি, ভাঙ্গা আর্সি খানা পর্য্যন্ত তাহার মা রাখিয়া গিয়াছে। বিশু সবিস্ময়ে ভাবিল রাগ করিলে কি মানুষের চুল বাঁধিতে হয় না, সিন্দুর পরিতে হয় না, সব ফেলিয়া এম্‌নি করিয়াই চলিয়া যাইতে হয় ? এ আবার কোন দেশী রাগ ? এ রাগ তো ভাল নয়। —ভাবিতে ভাবিতে নিমেষের মধ্যে বিশুর আনন্দ-উল্লাস অন্তর্হিত হইল। মার কাছে যাইবার অদম্য ইচ্ছা মাকে দেখার ব্যাকুলতা বালক চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। গলার মালা খুলিয়া সযত্নে ঝাঁপিতে রাখিয়া বিশু ঝাঁপিটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

পরাণ কহিল, আমি তোর জন্যে ভাত চড়িয়ে দেইগে বিশু, তুই ওসব রেখে জটাধারীর সঙ্গে একটু খেলা করে আয়। জটাধারী এখনি তোকে ডাক্‌তে আস্‌বে।

বিশু সবেগে মাথা নাড়িয়া তাচ্ছিল্য ভরে কহিল, "আসুক গে জটাধারী; খেল্‌তে আমার ভাল লাগে না বাবা! মা না এলে আমি কারুর সঙ্গেই খেল্‌তে পারবো না, কোথাও যেতে পারবো না। তুমি সত্যি করে বল কবে আমার মাকে নিয়ে আস্‌বে?" বলিতে বলিতে বিশুর আঁখি কোণ বহিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

পরাণ শান্ত গম্ভীর মুখে ছেলেকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোর কিছু ভাবনা নেই বিশু, আমি সত্যি করেই বলচি তোর মা এনে দেব। শীগ্‌গির করেই এনে দেব।"

৩

এক মাস যাইতে না যাইতেই পরাণের প্রতিশ্রুতি মত বিশুর মা আসিল।

নব বধূর বিবাহের বয়স অনেক দিন পূর্ব্বেই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সচরাচর চাষার ঘরে এত বড় ধেড়ে মেয়ে সহজে মিলিত না। বিধবা মাতার চরিত্রের দুর্নামে ও অর্থাভাবে মেয়েটি এপর্য্যন্ত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাদৃতা হইতে পরে নাই। যাহাকে কোন বরের পিতাই গৃহে আনিতে চাহেন', বধূ করিতে চাহে না, তাহারই প্রতি পরাণের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়া গ্রামের পঞ্চ মোড়ল প্রথমে এ বিবাহে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু পরাণ যখন যোড় হাতে সজল নয়নে জ্ঞাতি গোষ্ঠিদের কাছে মাথা নত করিয়া বলিল, "আমি বৌয়ের জন্যে বংশের জন্যে বিয়ে করচি নে। আমার বিশুকে মা এনে দিতে হবে, মা না পেলে বিশু বাঁচ্‌বে না। বৃন্দাবন দাসের মেয়ে 'সরম' ছাড়া বিশুর মার যুগ্যি মেয়ে আমি কোথায় পাব? ছোট মেয়ে এনে দিলে সে যে মা ভাবতে পারবে না, তাই সরমকেই আমি বিশুর 'মা' করে দিতে চাই।"

সন্তান বৎসল পিতার এ মন্তব্যে কেহ আর আপত্তি করিতে পারিল না। নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে সরমের সহিত পরাণের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরদিন গৃহে ফিরিয়া পরাণ বিশুকে নিবিড় ভাবে বুকে চাপিয়া ধরা গলায় বলিল, "বিশু আজ তোর মা এনেচি; রান্না ঘরের ওদিকে তোর মা রয়েচে তুই তার কাছে যা।"

বিশুর আনন্দ সাগরে সহসা বান ডাকিয়া উঠিল, সে পিতার সহিত একটা কথাও বলিল না। আনন্দে দিশাহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে মায়ের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিল।

পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে নববধূকে ঘিরিয়া নানা বিষয়ের জটলা করিতেছিল। বিশুকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া একটি বর্ষীয়সী ডাকিল—"বিশু এই ধারে আয়, এই তোর মা। বৌ, ঘোমটা সরিয়ে ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নাও! ছেলের জন্যেই পরাণ তোমায় ঘরে এনেচে।"

বধূ নীরবে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, ঘোমটা সরাইয়া ছেলে কোলে লইবার কোন আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না।

মাতৃবক্ষ-বিচ্যুত মাতৃহারা বিশুর অত শত দেখিবার অবকাশ ছিল না। সে এক ছুটে নব-বধূর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অভিমান পূরিত তরল কণ্ঠে বলিল "মা, মা তুই আমায় ফেলে বাপের বাড়ী গিয়েছিলি কেন? আমি তোর জন্যে কত কেঁদেচি।" বলার সঙ্গে সঙ্গে বালকের অভিমান সমুদ্র তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুখের অবগুণ্ঠন তুলিয়া ছল ছল চক্ষে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া বিশু বিষাদে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল! হায়, এ তো তাহার মা নয়! ইহার সহিত মায়ের একটুও সাদৃশ্য নাই। তাহার মাতৃভ্রমে বাবা এ কাহাকে আনিল!

আশাহত ব্যথিত বালক অপরিচিতা তরুণীর গলদেশ হইতে হাত দুটি টানিয়া লইয়া পরাণের কাছে গিয়া কহিল "বাবা, আমার মা কোথায়?

তুমি মা না এনে বৌ আন্‌লে কেন? আমি বৌর কাছে যাব না, মার কাছে যাব। আমাকে মার কাছে দিয়ে এস।"

ছেলের আর্দ্র সকরুণ কণ্ঠস্বরে পরাণের বক্ষ স্পন্দিত হইল। মিথ্যা স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মাতৃহীনের মায়ের ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া সে আজ কি করিয়া বসিল, এ যে ভুল, মহাভুল! এ ভুল করিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। ঝড়ে উড়া মুকুলটিকে সে অন্য একটি স্নেহের বৃন্তে সংলগ্ন করিতে গিয়া মুকুলের কোমল বুকে কীটের বাসা বাঁধিয়া দিল! বৃন্তচ্যুত কীটদষ্ট মুকুল এখন কি উপায়ে সজীব রাখিবে? বিকশিত করিবে? কিন্তু সজীব রাখিতেই হইবে; ছলনার আশ্রয় লইয়া হৃদয়ের স্নেহ সুধা দিয়া পুষ্প কলিটিকে বিকশিত করিতেই হইবে। পরাণ বিশুর কাণের নিকটে মুখ লইয়া চুপে চুপে কহিল "তোর দিদি মায়ের বড্ড অসুখ বিশু, সেই জন্যে তোর মা এখন আস্‌তে পার্‌লে না। আমাদের কায করার, ভাত রাঁধার লোক নেই বলে ওই ও বৌকে তোর মা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

পঞ্জরভেদী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশু জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমায়ের অসুখ কতকালে ভাল হবে বাবা? আর কতদিন পর আমার মা আস্‌বে?"

"বেশীদিন পরে নয় বিশু, বর্ষার দুটো মাস পর পুজোর সময় আমি তাকে নিয়ে আসবো।" বিশু আর কিছুই বলিল না। মাচার উপর হইতে ঝাঁপিটা নামাইয়া কোলে লইয়া, নদীর দিকের বারান্দার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীদের প্রস্থানের পর পরাণ সরমকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল, "আজ থেকে বিশুকে আমি তোমার হাতেই দিলাম। মায়ের ভালবাসা দিয়ে তুমি ওর মার দুঃখ দূর কোর। ও যেন কখ্‌খনো মায়ের অভাব জান্‌তে না পারে। তোমার ঘর তোমার সংসার তুমি আজ থেকে বুঝে নাও।"

নববধূ স্বামীর উপদেশে একটু মুচকি হাসি হাসিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘর দ্বার পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সে দরিদ্রের মেয়ে, অল্প বয়সেই কায কর্ম্মে আর ব্যয়ের হিসাব নিকাসে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল; এখানে পদার্পণ করিয়াই সে বুঝিয়াছিল সে-ই এ সংসারের কর্ত্রী; তাহার মাথার উপর গুরুজনের শাসন নাই, তাড়ন নাই, বড় শান্তির সংসার। মরাই ভরা ধান, ডোল ভরা কলাই, গোয়াল আলো করা এক যোড়া বলদ ও একটি দুগ্ধবতী গাভী। ছোট বড় দুইখানি ঘর, একটি আম কাঁঠালের ক্ষুদ্র বাগান; সবই তাহার, এখন হইতে সে-ই এ সবের অধিকারিণী। আনন্দে গর্ব্বে সরমের বুকখানি ভরিয়া গেল। কিন্তু বিশুর পানে চাহিতেই তাহার অন্তরে কিসের আগুন যেন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। ঐ ছেলেটা, ঐ যে সংসারের প্রধান বাধা; স্বামীর হৃদয়ের সব খানি উহারই অধিকারের মধ্যে। সে বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে বহুবার বহু লোকের মুখেই শুনিল ছেলের জন্যই পরাণ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে; কেন, সরম কি বিশুর সেবাদাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? তাহার কি সুখ নাই, তাহার কি আশা নাই? না—রূপ যৌবনের গৌরব নাই? তাহার সবই আছে। যে হৃদয়টী এখন একমাত্র বিশুরই অধিকারভুক্ত, দিনে দিনে পলে পলে সেই হৃদয়টিকে সম্পূর্ণ জয় করিতে হইবে। জয় যদি নাই করিতে পারা যায় তাহা হইলে নারীর রূপ কিসের? নারীর গুণ কিসের?

সেই দিন হইতেই সরম স্বামীর হৃদয়ের নিভৃতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। হাসি দিয়া, গল্প দিয়া, সেবা দিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পরাণকে মাতাইয়া তুলিল। ঘর দ্বার ক্ষেত জমা এমন কি সংসারের ক্ষুদ্রতম জিনিষটা পর্য্যন্ত সরমের বড় আদরের বড় আপনার হইয়া উঠিল। কেবল আপনার হইতে পারিল না বিশু!

সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতেই বিশু ঘুমাইয়া পড়ে, তাহার জন্ত ত্বরা করিয়া ভাত রাঁধিতে হয়, ধূলা বালিতে বালকের কাপড় বেশীদিন পরিষ্কার থাকে না, ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া ঘন ঘন কাপড় কাচিয়া দিতে হয়; কত উপদ্রব, কত উৎপাত! ইহা কি মানুষের ভাল লাগে? কাযেই বিশু দিন দিন চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিল। ছেলের প্রতি পরাণের গভীর স্নেহ সরমের ভাল লাগে না। ছেলের সহিত স্নানাহার সরমের ভাল লাগে না। রাত্রে পরাণ বিশুকে কোলের কাছে লইয়া শয়ন করে তাহা সরম সহিতে পারে না। স্বামিগৃহে প্রথম পদার্পণ করিয়া বিশুকে দেখিয়া সরমের হৃদয়ে যে মেঘোদয় হইয়াছিল, দিনে দিনে সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড তাহার সমস্ত অন্তরাকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল।

ভালবাসার ভাব গতিক বালক বালিকারা যত সহজে বুঝিতে পারে, পরিণত বয়স্কেরা বোধ হয় তেমন পারে না। বিমাতার স্নেহহীন বিরাগ দৃষ্টি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়া, সে একটা অজানা আতঙ্কে ভীত হইল। মায়ের চিরন্তন অধিকারের ভিতর নবাগতার নূতন উদ্যমে অধিকার স্থাপনের প্রয়াস দেখিয়া তাহার যাতনা-কাতর হৃদয়খানি অসহ্য যন্ত্রণায় টন টন করিতে লাগিল।

পরাণ ঘরে না থাকিলে বিশু ঘরে থাকিতে পারিত না। মুখ তুলিয়া বড় গলায় সরমের সহিত দুটি কথা বলিতে পরিত না। ক্ষুধায় অন্ন চাহিতে পারিত না। মায়ের ঝাপিটা বুকে চাপিয়া, মালা গলায় পরিয়া উদ্ভ্রান্ত বালক নদীর ধারে বসিয়া থাকিত। নদী বাহিয়া নৌকায় চড়িয়া তাহার মা আসিবে; এই আশার ক্ষীণ আলোটুকু মুগ্ধ পতঙ্গের মত প্রতিদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিশুকে নদীতীরে বটবৃক্ষ তলায় আকর্ষণ করিয়া আনিত। ক্রমে ক্রমে তাহার খেলা-ধূলা বন্ধ হইয়া গেল, সঙ্গী সাথী বিরল হইয়া আসিল। হাসি-বিহীন গল্প-বিহীন স্তব্ধ মধ্যাহ্নের মত এই গম্ভীর ছেলেটির কাছে বালক বালিকারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না। কেবল জটাধারী মাঝে মাঝে কাছে আসিয়া বসিত, বিশুর মায়ের কথা বলিত, মনোযোগ সহকারে নৌকাগুলি নিরীক্ষণ করিয়া আসন্ন পূজার দিন গণনায় দুই বন্ধু মাতিয়া উঠিত। নদীবক্ষে কত নৌকা ভাসিয়া যাইত, কোনখানি ক্ষুদ্র, কোনখানি বৃহৎ, কোনখানি শূন্য, কোন খানি বোঝাই, নৌকার সাদা পালটা কেমন উড়িতেছে, পড়ন্ত রৌদ্র-কিরণে হালের উপর সোনা জ্বলিতেছে। ইহাই দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিত, বাঁশবনের মাথায় চাঁদ দেখা দিত। ঝোপের মধ্য হইতে শৃগাল তান ধরিত। খেয়া নৌকার মাঝি দিনের শেষ খেয়া দিয়া, পরপারে গৃহের উদ্দেশে নৌকা ভাসাইয়া গান ধরিত—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি, আর বাইতে পারলেম না।"

তাহাই শুনিতে শুনিতে ক্ষেত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত পরাণের সহিত বিশু ঘরে ফিরিত। রজনীর পর আবার প্রভাত, প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্নের পর সেই সন্ধ্যা, সেই রাত্রি। এমনি ভাবে বিশুর দুইটি মাস অতিবাহিত হইল।

৪

বর্ষান্তে শরৎ আসিল। শরতের সোণার রৌদ্রে ভুবন ভরিয়া গেল। সন্ধ্যার ধীর সমীরে আন্দোলিত কাশগুচ্ছ, শেফালীর স্নিগ্ধ গন্ধ ও চন্দ্রকরোজ্জ্বল গগন পটে শুভ্র মেঘের লুকোচুরী খেলা গৃহে গৃহে শরতের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল।

পূজা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, বিশু ততই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু পুত্রের এ আনন্দে এ উৎসাহে পরাণ প্রীত হইতে পারিল না। বারবার কেমন করিয়া সে বিশুকে ভুলাইয়া রাখিবে? নিষ্ঠুর হইয়া, নিদারুণ হইয়া বালকের কোমল বুকে কতবার আশাভঙ্গের বেদনা দিবে?

আউশ ধান কাটার পর, পরাণের ক্ষেতের কায তেমন ছিল না। এখন দীর্ঘ অবসর, তবু অবসর উপভোগ করিবার উপায় ছিল না। বিশুর ভয়ে বাধ্য হইয়া তাহাকে বিনা কাযে বিনা প্রয়োজনে অন্যত্র কাটাইয়া দিতে হইত। সন্ধ্যার পর বিশু না ঘুমান পর্য্যন্ত পরাণ ঘরে ফিরিত না। কিন্তু ছেলেকে এড়াইয়া এ ভাবে গা ঢাকা দিয়া থাকা তাহার বেশী দিন চলিল না।

সেদিন শিশির-সিক্ত প্রভাতে পরাণ এক ছিলিম তামাক খাইয়া, ভুরে গামছা খানি স্কন্ধে ফেলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেছিল, এমন সময় বিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিশু বিছানা ছাড়িয়া, বাপের কাপড়ের খুঁটটা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ বাবা, এত সকালে রোজ রোজ তুমি কোথায় যাও? এখন তো ভাত খাবার সময় তুমি আমায় ডাকো না, চান করিয়ে দাও না? রাতে আমার একলা বিছানায় ঘুমুতে বড্ড ভয় করে; তবু তুমি সন্ধ্যাবেলা এস না কেন বাবা?"

এ 'কেন'র উত্তর পরাণ চট্ করিয়া দিতে পারিল না। খানিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। অনেকক্ষণ পর অপরাধীর ন্যায় ম্লান কণ্ঠে কহিল, "কাযের জন্যে ঘরে থাকতে পারি নে বিশু। যখন তাড়াতাড়ি ছুটে খেতে আসি, তুই তখন নদীর ধারে বসে থাকিস, তাই না ডেকেই—। তা বৌ তো তোকে চান্ করিয়ে দেয়, ভাত খেতে দেয়, সন্ধ্যাবেলা কাছে বসে। সেই জন্যেই আমি একটু দেরী করে আসি বিশু।"

বিশু অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বৌ আমার ছাই করে। ও আমায় একটুও ভালবাসে না বাবা; কেমন করে যেন তাকিয়ে থাকে, আর চুপে চুপে দুর দুর ক'রে। আমি বৌয়ের কাছে আর থাকবো না। তুমি এখনি মাকে আনতে যাও। মার আসার যে সময় হয়েচে বাবা, পুজো এসেচে।"

যে ব্যাকুল অনুরোধের ভয়ে পরাণ পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়, সেই কোমল কণ্ঠের করুণ নিবেদনে পরাণের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু সে জল অধিক কাল স্থায়ী হইল না। সরমকে এই দিকে আসিতে দেখিয়া পরাণের সজল কোমল ভাব সহসা অন্তর্হিত হইল, সমস্ত চিত্ত ব্যাপিয়া ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। সরমের মুখের প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটা প্রসারিত করিয়া পরাণ বলিল, "আজ এ সব কি শুনছি? যাকে কেউ ফিরে পোছে নি, ঘরে নেয় নি, তাকে আদর করে আনার বুঝি এই দক্ষিণা দেওয়া হচ্ছে? আমি কি বৌয়ের দুঃখে বিয়ে করেচি? তা নয়, বিশুর জন্যেই তোমাকে আমার ঘরে আনা। তুমি যদি বিশুকে দুর দুর কর, বিশুকে দেখতে না পার, তা'হ'লে তোমায় নিয়ে আমি কি করব? তোমাকে যেখান থেকে এনেচি সেইখানেই রেখে আসবো।"

সরম স্বামীর মুখে এতটা শুনিবার আশা করে নাই, ইহা তাহার কল্পনার অতীত, ধারণায় বহির্ভূত। স্বামীর কঠোর তিরস্কারে সরম মনে মনে আহত হইয়া শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল, "আমি আবার ওকে দুর দুর করলাম কখন? ছেলে যা বলবে তাই সত্যি হবে বুঝি? ছেলের কোন কাযটা না আমি করচি? তবু কারুর মনই ওঠে না। যেখানে এতকাল ছিলাম সেখানে রেখে এলে আমি জলে পড়বো না।"

পরাণ কহিল, "জলে পড় আর না পড়, দরকার হ'লে সেখানেই তোমায় পাঠাতে হবে। সাবধান হয়ে থেকো, সে দরকার যেন না হয়। আর বিশুর নামে মিথ্যে বলতে তুমি একটু ভেবে বোল; তোমার চেয়ে বিশুকে আমি বেশী জানি, বেশী চিনি, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে তাও আমার অজানা নেই।" বলিয়া পরাণ বিশুকে কোলে করিল।

অগ্নিভরা চোখে সরম বিশুর পানে চাহিতে চাহিতে আরব্ধ কার্য্যে প্রস্থান করিল। পরাণের প্রতি তাহার অভিমান হইল কিন্তু রাগ হইল না। যে স্বামী এ পর্য্যন্ত তাহাকে একটি কঠিন কথা বলে নাই, ভ্রমেও ক্রোধ প্রকাশ করে নাই, সেই যে আজ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এত বাক্যবাণ বর্ষণ করিল, ইহার মূলাধার কে?

মূলাধার বিশু! বিশুর প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে সরমের অন্তরাত্মা গর্জ্জিতে লাগিল, কিন্তু সে নীরব গর্জ্জন পরাণ দেখিল না, জানিল না। সে নাপিত ডাকাইয়া বিশুর চুল ছাঁটাইল। আপনার হাতে সোডা দিয়া তাহার মলিন বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া দিল। বাজার হইতে নগদ চারি পয়সা দামের একখানা ভাসা সাবান কিনিয়া বিশুকে স্নান করাইয়া সাথে বসিয়া ভাত খাইল। কয়েক দিনের অযত্ন অবহেলার পর প্রচুর স্নেহ দানে পরাণ বিশুকে পরিতৃপ্ত করিল।

ছেলেকে কোলের কাছে শোওয়াইয়া শরতের অলস মধ্যাহ্নটা পরাণের নিদ্রার ভানে কাটাইতে হইল। কারণ সে জাগ্রত আছে জানিলেই বিশু মাকে আনিবার দাবী করিবে, শতবার সহস্রবার মায়ের আলোচনা চালাইবে। মিথ্যা দিয়া পরাণ সত্যকে কত ঢাকিবে? ছেলের সহিত আর কত প্রতারণা করিবে? তাহার মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করিয়া সত্য যে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশমান হইতে উদ্যত হইতেছে, এখন সত্যকে ঠেকাইয়া রাখা পরাণের দায় হইয়া উঠিয়াছে।

পরাণ নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকিলেও বিশু অধিকক্ষণ নীরবে থাকিতে পারিল না। দিবসের তাপ-দাহ স্নান হইতে না হইতে বাপের গা ঠেলিয়া ডাকিল "বাবা আর কত ঘুমুবে; বেলা যে পড়ে এল! আজ তুমি হাটে যাবে না? হাটের সময় যে হয়ে গেচে।"

পরাণের উঠিতেই হইল। চোখে মুখে জল দিয়া, পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কেমন কাপড় চাস্ বিশু, আমি আজ হাট থেকে তোর পুজোর কাপড় এনে দেব।"

বিশু কি যেন ভাবিয়া জবাব দিল, "আগে মাকে এনে পরে পুজোর কাপড় এনো বাবা। কেমন কাপড় হ'বে তা মা এসেই বলে দেবে। কবে মাকে আন্‌তে যাবে বাবা?"

"যাব, যাব। তা—আমার যেতে হবে না। তারাই—তোর মামা, তাকে শীগ্‌গির সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌ছে, আমাকে খবর পাঠিয়েছে। বল বিশু তোর জন্তে কি কাপড় আনবো? তোর মা আসার আগেই আমি তোকে কাপড় কিনে দিতে চাই।" বলিয়া পরাণ অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিল।

মা শীঘ্র আসিতেছে শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশু বলিল "আমায় একখানা লাল ফুল পেড়ে কাপড় কিনে দিও বাবা। মা ফুল পেড়ে কাপড় খুব ভাল বাসে।"

"আচ্ছা ফুল পেড়ে একখানা কল্কা পেড়ে একখানা দু'খানা কাপড় তোকে এনে দেব বিশু। আর তুই তো কখনো কোট গায়ে দিস নি, এবার তোকে আমি খুব ভাল দেখে একটা কোটও কিনে দেব।"

কোটের উল্লেখে বিশু সানন্দে ঘাড় নাড়িল। পরাণ চাদরের প্রান্তে কয়েকটা টাকা বাঁধিয়া হাটে চলিয়া গেল।

কখন কাপড় আসিবে, কোট আসিবে এই আশায় আশায় এবেলা বিশুর নদীর ধারে বসিয়া নৌকা দেখা হইল না। যেখানে আর্সীর সম্মুখে বসিয়া সরম চুল বাঁধিতেছিল, বিশু সেইখানে গিয়া তাহার ঝাঁপিটা খুলিয়া সযত্নে সস্নেহে মায়ের দ্রব্যগুলি পুনরায় গুছাইতে বসিল। ক্ষুদ্র ঝাঁপির ইতিহাস সরমের অবিদিত ছিল না। সপত্নী একদিন যাহা স্বামীর নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে জিনিষটা নগণ্য তুচ্ছ হইলেও তাহার প্রতি সরমের লুব্ধ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। সরম চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল "আমায় ঝাঁপিটা দিবি বিশু? আমি চুলের দড়ি রাখবো।"

"এ যে আমার মার ঝাঁপি, এ আমি দিতে পারবো না। মা এসে আমায় বকবে। এর ভেতর আমি মালা রাখি।" বলিয়া বিশু ঝাঁপিটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মালা গলায় পরিতে উদ্যত হইল।

কিসের আবেগে অকস্মাৎ সরমের চোখ দুটি চক্ চক্ করিতে লাগিল। অধরোষ্ঠে কেমন যেন নির্ম্মম কুটিল হাস্য রেখা খেলিয়া গেল। সরম প্রসারিত হস্তে মালাগাছি মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া ঘৃণা মিশ্রিত

বিদ্রূপ পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "তোর লাখ টাকা দামের মালাটা আমায় দে না, আমি খোঁপায় পরি। সম্পত্তির মধ্যে এক মালা হয়েচে, তাই নিয়ে সারাদিন কাটান হয়, আর আমার নামে লাগান হয়। আমার নামে যে তুই লাগাতে যাস—তোর ভয় হয় না?" বলিতে বলিতে সরম মালা-গাছি নিজের দিকে টানিতেই, মালার সূত্র ছিঁড়িয়া শুষ্ক ফুলগুলি ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া বিশুর বক্ষে হাতুড়ীর ঘা মারিল। বিশু বিবর্ণ মুখে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "তুমি আমার এ কি কল্লে? আমার মালা, মার হাতের গাঁথা মালা এম্‌নি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্লে?"

"খুব করেচি, বেশ করেচি! আমার নামে আবার লাগাতে যাবে? লাগানোর মজাটা দেখাচ্চি।" বলিয়া সরম ছিন্ন মালা গাছা পদ দ্বারা দলিয়া পিষিয়া, আবর্জ্জনা স্তূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এ দৃশ্যে বিশু আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া সরমের দর্পণখানা ও চুল বাঁধার সরঞ্জামগুলি টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া কহিল "তুমি আমার মালা ছিঁড়লে কেন? মালা এনে দাও, দিতে না পাল্লে তোমার আমি চুল ছিঁড়ে দেব।"

"অ্যাঁ, এত বড় কথা, চুল ছিঁড়ে দিবি, কে কার চুল ছেঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া সরম নির্দ্দয় ভাবে বিশুর ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া দিল। দুর্ব্বল শীর্ণ বালক এ বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না। বারান্দা হইতে গড়াইয়া প্রাঙ্গণে গাছের গুঁড়ির উপর পড়িয়া গেল। ভূপতিত বালকের করুণ কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইল "মা—মা।"

পুত্রের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অধিক মূল্য দিয়া পূজার কাপড় জামা কিনিয়া, তাহার হাসিমুখখানি মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে পরাণ গৃহে ফিরিয়া দেখিল, বারান্দায় দাঁড়াইয়া সরম তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। বারান্দার নীচেই শুষ্ক গাছের গুড়ির উপর মুখ গুঁজিয়া বিশু পড়িয়া রহিয়াছে। হস্তের দ্রব্যগুলা বিশুর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া, পরাণ সসব্যস্তে ছেলেকে কোলে লইতে গিয়া দেখিল, জ্ঞান শূন্য অসাড় বালকের নাক মুখ বহিয়া রক্তের ধারা ছুটিয়াছে। গুরুতর আঘাতে কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে। অভিভূত পরাণের মুখ হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ হইল না। একমাত্র হৃদয়ানন্দ পুত্রের শোচনীয় অবস্থায় পিতার চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিল না। সযত্নে বিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া পরাণ নিমেষের জন্য সরমের মুখের পানে চাহিল। সেই ক্ষমাহীন নীরব ক্রোধানলে সরমের ইহ জীবনের আশা ভরসা চিরতরে দগ্ধ হইয়া গেল।

* * * *

তিন দিন পর বিশু চক্ষু মেলিয়া অস্ফুট ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল "মা", তিন দিন পর বালক এই প্রথম কথা বলিল, প্রথম চাহিয়া দেখিল। এ তিন দিন কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে পরাণের কাটিয়া গিয়াছিল তাহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবে না। পুত্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া তাহার 'মা' ডাকের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া পরাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। প্রলয়ের বিষাণ ধ্বনির মত, কাল বৈশাখীর মেঘ গর্জ্জনের মত জেলার বড় ডাক্তারের মন্তব্য পরাণের কর্ণকুহরে ধ্বনিতে লাগিল—"মাথায় সাংঘাতিক চোট লাগিয়াছে, বুকের শিরা ছিড়িয়া গিয়াছে, বাঁচিবার আশা নাই। শেষ সময় হয় তো একটু জ্ঞান হইতে পারে।"

এই কি শেষ সময়? পরাণের অন্ধকার জীবনের একমাত্র ক্ষীণ প্রদীপ শিখাটি নিবিবার এই কি পূর্ব্বক্ষণ? পরাণ তাড়াতাড়ি দুই করতলের মধ্যে মুখ ঢাকিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ষষ্ঠীর খণ্ডচন্দ্র মধ্যা-কাশে বসিয়া রজত কিরণ ধারায় ধরাতল প্লাবিত করিল। নৈশ সমীরণ প্রবাহে চতুর্দ্দিক হইতে মিশ্র পুষ্প সৌরভ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পূজা বাড়ী হইতে তুমুল শব্দে বোধনের ঢাক বাজিয়া উঠিল। রহিয়া রহিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া শানাই তান ধরিল—

"পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই।"

চারিদিকের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে বিশু পুনরায় সচেতন হইয়া কাহার প্রত্যাশায় যেন ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আস্তে আস্তে কহিল "বাবা, আমার মা কোথায়? মার মালা কোথায়? মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দাও।"

বিশু চেতনা লাভ করিয়া যদি মালার কথা বলে, তাই বকুলের পরিবর্ত্তে পরাণ জটাধারীকে দিয়া এক গাছ সেফালীর মালা গাঁথাইয়া রাখিয়াছিল। বেড়ার গা হইতে বাসি সেফালীর মালাটা আনিয়া পরাণ গাঢ় স্বরে বলিল, "বিশু, বাবা আমার, এই যে তোমার মালা, আমি তোমায় মালা পরিয়ে দিচ্ছি।"

বিশু মুদ্রিত নেত্রেই বুকের মালা গাছা হাতে লইয়া, নাকের কাছে ধরিয়া—কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "আমি এ মালা চাই না, এ শিউলির মালা। আমার বকুল মালা নেই, আমার মা নেই। আমি এখানে থাক্‌বো না, মার কাছে যাব।"

ইহার পর, বালকের কণ্ঠস্বর চিরতরে নীরব হইয়া গেল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

সার আশুতোষের ধর্ম্মবিশ্বাস

সার আশুতোষের মৃত্যুকে সত্যই ইন্দ্রপতনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হয় নাই এমন ব্যক্তি বোধহয় কেহই নাই। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বেশী কিছু এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। এ নিমিত্ত আমি কয়েকটী ঘটনা এস্থলে প্রকাশ করি; তাহা হইতে সকলেই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন।

১। সার আশুতোষ যেবার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে আহূত হইয়াছিলেন সেইবার তথন কলেরায় বহুলোক মরিতেছিল। তাঁহার আবাস স্থলের নিকট দিয়া প্রতিদিন ১০।১৫টী শব লইয়া যাওয়া হইতেছিল। অথচ তিনি জামাতা ও পুত্রসহ গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন দুঃসাহসের কার্য্য কেন করলেন?" তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আপনি কি নাস্তিক? ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন।" এই উত্তর হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে তিনি ঈশ্বরে অত্যন্ত নির্ভরশীল। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতেন যে মঙ্গলময় ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই নতশিরে গ্রহণ করা উচিত। মৃত্যুভয়ে কর্ত্তব্য হইতে বিরত হওয়া ধর্ম্ম নহে বরং অধর্ম্ম।

২। যে দিবস তিনি হাইকোর্টের জজিয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, সেই দিবস সন্ধ্যার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কোন্ কার্য্য আপনার প্রধান কার্য্য হইবে?" কিন্তু তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমি কতিপয় কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিলাম, এবং নির্ব্বন্ধসহকারে বলিলাম যে, সেই সকল কর্ম্মই এখন তাঁহার প্রধান কর্ম্ম হওয়া উচিত। তিনি একটু নীরব থাকিয়া, ঈষৎ হাস্য করতঃ উত্তর দিলেন, "শশধর বাবু, কোন্‌দিন দেখবেন যে আশু মুখুয্যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাশীবাস কত্তে গিয়েছে।" এই এইভাবে আরও কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন; তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। আমি তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ গভীর বিশ্বাস আছে এবং

বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাস করা অপেক্ষা হিন্দুর আর উৎকৃষ্ট পন্থা নাই একরূপও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। আমি একথাও বুঝিয়াছিলাম যে আমরণ ইহকালের কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকা মানুষের সঙ্গত নহে। শেষ বয়সে সকলেরই পরমার্থ চিন্তা করাই উচিত; এইরূপ তাঁহার মনে গভীর বিশ্বাস ছিল।

৩। সকলেই জানেন যে, তিনি বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই কার্য্য দৃষ্টে কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি কি ব্রাহ্ম ছিলেন? এ ভ্রান্ত সংস্কার কাহারও থাকা উচিত নহে। তিনি বর্ত্তমান কালের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতেন না; কিন্তু তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। যেবার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রঙ্গপুরে অধিবেশন হয়, সেইবার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর অনুরোধে আমি তাঁহাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলি এবং তাঁহাকে রঙ্গপুরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি। তিনি প্রথমতঃ উত্তর দেন যে, তখন তিনি যাইতে পারিবেন না, কারণ তাঁহাকে স্বয়ং তাঁহার পুত্রের উপনয়ন দিতে হইবে; আচার্য্যগুরুর কার্য্য তিনি নিজে করিবেন। এই উপলক্ষ্যে আরও অন্যান্য কথা যাহা বলেন তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আজি কালিকার অনেক ব্রাহ্মণের মত উপনয়ন সংস্কারকে তিনি একটী প্রথা প্রতিপালন করা মাত্র বিবেচনা করিতেন না। ইহাও তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসের পরিচায়ক।

৪। হিন্দুসমাজের মূলভিত্তি জাতি বিভাগ তিনি স্বীকার করিতেন। কিন্তু আমার ধারণা এইরূপ যে, তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, আধুনিক গোঁড়ামীর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন।

৫। লর্ড লিটনের পত্রের উত্তরে তিনি যে পত্র লেখেন তাহা দেশবিখ্যাত হইয়াছে। যে সময় ঐ পত্র লেখেন সে সময় তাঁহার কন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। অথচ তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, যদিও ঐ কন্যাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইহাতে তাঁহার ঈশ্বরে নির্ভরশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

৬। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি সাত আট দিন তাহার জীবনের আশাই ছিল না। এ ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ মরণোন্মুখ হইয়াছিলেন। এই দুই সময়েই আশুবাবুর মুখ মলিন দেখা যায় নাই। সকলের সঙ্গেই পূর্ব্ববৎ কথাবার্ত্তা বলিতেন। এতদুভয় ঘটনাতেই ভগবানের বিধানে তাঁহার একান্ত নির্ভরতা এবং ঐ নির্ভরতা জাত হৃদয়ের পরম শান্তি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে গভীর বিশ্বাস না থাকিলে এবং ভগবানে একান্ত নির্ভরতা না থাকিলে মানুষের মনে কখনই তাদৃশ শান্তি আসিতে পারে না। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা এবং তিনি যে কোন বাধাতেই বিচলিত হইতেন না তাহা ঈশ্বর নির্ভরতার পরিণাম ফল এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল।

বাঙ্গালী আজি নানা দিক্ দিয়া অশান্ত চিত্তের পরিচয় দিতেছে। বাঙ্গালী আজি অনেক বিষয়েই অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। তাই বাঙ্গালীর ভাবের স্থিরতা নাই; কর্ম্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাই; বরং যথেষ্ট চঞ্চলতা আছে। স্বনামধন্য ক্ষণজন্মা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী বাঙ্গালীর আদর্শস্থল। ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে শান্তি সংযম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কখনই লাভ করা যায় না। ইহা বাঙ্গালী যত শীঘ্র বুঝে তত শীঘ্রই এই পতিত দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

কুসুমকুমারী

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাসর ঘর।

এত অবগুণ্ঠন, এত উপদেশ, সকলই বৃথা হইল।—এগার বৎসরের বালিকা কুসুমকুমারী তথাপি লজ্জা সরমের ধার ধারিল না; ঘোমটার ভিতর হইতে কুড়ি বৎসরের বরের দিকে জলজলিয়া চাহিয়া রহিল। যাহারা পরের বরকে কৌতুক কথায় তুষ্ট করিয়া হাসিমুখে ও বিভোর কটাক্ষে দেখিবার জন্য আলোকোজ্জ্বল বাসরঘরে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা কুসুমকুমারীর এই মহা অপরাধ ক্ষমা করিল না; আপন বরকে নিবিষ্ট চিত্তে নিরীক্ষণ করায় তাহারা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া, অভিমত প্রচার করিল, 'এমন বেয়াড়া বেহায়া মেয়ে ত কখনও দেখি নি, যেন বরকে গিলে খাবে।' কিন্তু কুসুম-কুমারী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সেই যে বরকে দেখিয়াছিল, তাহা কখনও ভুলে নাই; পাষাণে উৎকীর্ণ দেবমূর্ত্তির ন্যায়, চিরদিন হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভবিষ্যতে, তাহার এই স্মরণ শক্তিই তাহাকে মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

এই বরের নাম সুধীরকুমার বসু। সে মেধাবী বালক; সে বিশ বৎসর বয়সেই বি-এ পাশ করিয়াছিল।

বিবাহের বাজারে, পুত্র দর বাড়িবে বলিয়া, পুত্রের পিতা এই বি-এ পাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কোন পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতার এক ভাড়াটে বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া কোনও অফিসে দুই শত টাকা বেতনে চাকুরী করিতেন। কিন্তু তিনি গৃহ ক্রয় জন্য, নগদ চারি হাজার টাকা পণ লইয়া পুত্রের বিবাহ দেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, পুত্রের শিক্ষোন্নতির জন্যই পণের অর্থ ব্যয় করেন।

কুসুমকুমারীর পিতা তাঁহারই মত অবস্থাপন্ন। তিনিও পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। ঐ ভাড়াটে বাড়ীতেই কুসুমকুমারীর বাসর ঘর রচিত হইয়াছিল। তিনি গোপনে, বরের পিতার একটী সাধু উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া, কন্যাকে নিরাভরণা রাখিয়া হৃষ্টচিত্তে, চারি হাজার টাকা পণ, নগদ দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিতার সৎপরামর্শ।

আমাদের এই গল্প বুঝিতে হইলে, উপরিউক্ত বিবাহের পূর্ব্বের কথা শুনিতে হইবে।

সুধীরকুমার বসুর এক বাল্যবন্ধু ছিল; এবং আজ কালকার ছোট গল্পের রীতি অনুযায়ী তাহার এক কিশোরী—অর্থাৎ ১৩।১৪ বৎসর বয়স্কা—ভগিনী ছিল। বন্ধুর নাম সুধাংশুভূষণ রায়, বন্ধুর ভগিনীর নাম যূথিকা। তাহাদের পিতা সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ কে, এল, রায়।

সুধাংশু ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাইত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে ম্যাট্রিক্ পাশ করিতে না পারায় মিঃ রায় তাহাকে বিলাত পাঠান নাই। সুধাংশু খুব ইংরাজী বলিতে পারিত বটে, কিন্তু পাশকরা তাহার ভাগ্যে লেখা ছিল না। সুধীরকুমার তেমন ইংরাজী বুলি বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু পরীক্ষাগুলি অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, এবং বৃত্তি লাভ করিত। এইরূপে সম্মানের সহিত সে যখন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন বন্ধু সুধাংশুভূষণ চারি বার অকৃতকার্য্যতার পর পঞ্চম বারে কষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল।

সুধাংশুভূষণের পিতা পুত্রের বন্ধুর পরিচয় জানিতেন; এবং তাহার গুণপনায় তাহার উপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন;

বুঝি তাহাকে একটু স্নেহও করিতেন। সুধীরকুমার সুধাংশুভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, মিঃ রায় তাহাকে পরিবারগণের মধ্যে লইয়া নানাবিধ গল্প করিতেন, এবং কিছু জলযোগ না করাইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। সুধীরকুমারও বিলাত ফেরত বলিয়া তাহাদের বাড়ীতে আহার করিতে কোনও আপত্তি করিত না। বাড়ীতে গিয়া সে মাতাপিতার নিকট এই উপাদেয় জলখাবারের বিষয় গল্প করিত; এবং মধ্যে মধ্যে সেই জলখাবারের গল্পের সঙ্গে যূথিকার প্রসঙ্গ আপনি আসিয়া পড়িত।

সুধাংশুভূষণের মাতা মিসেস্ রায় ক্রমে, সুধীরকুমারের প্রতি স্বামীর স্নেহের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। বুঝিলেন, যদি এই মেধাবী বালক, বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারে, তবে, কালে সে কন্যার পতিত্ব লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যূথিকা তাহার এই চৌদ্দ বৎসর বয়সেও বুঝিতে পারে নাই যে, ভ্রাতার এই দরিদ্র ও ধুতি পরা বন্ধুর সহিত কখনও তাহার প্রণয় বা পরিণয় ঘটিতে পারে। ইহা বুঝিতে না পারিলেও, সে সুধীরকুমারের সহিত দুই একটা কথা কহিত; এবং তাহার কোমল কৈশোর-শোভা বিস্তার করিয়া সুধীরের নবীন প্রেমদীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে বসিয়া থাকিত।

যূথিকা প্রেমের কোন ধার না ধারিলেও, এবং তাহার নিতান্ত তরুণ প্রেমের অতি ক্ষীণ আলোক উদ্ভাসিত না হইলেও, বিংশবর্ষীয় যুবক সুধীরকুমারের প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল, এবং তাহার প্রেমময় দৃষ্টিতে, যূথিকার প্রত্যেক কথাটি প্রেমের বিচিত্র বিকাশ বলিয়াই অনুমিত হইত। সে মনে করিত, যূথিকার হৃদয় বুঝি তাহারই প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

সুধাংশুভূষণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবশেষে উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া মিঃ কে, এল, রায় একদিন সুধীরকুমারের সম্মুখে প্রস্তাব করিলেন, "আমি ইচ্ছা করেছি, সুধাংশুকে শীগ্‌গির বিলাতে পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকে যদি ও ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসতে পারে, তবেই ওর কিছু হ'বে। নইলে, এখানে থেকে ওর কিছু হবে না।' পরে সুধীরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার বাবার যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তুমিও এই সঙ্গে যাও না।"

সুধীরকুমার বলিল, "বাবার বোধ হয়, আমাকে বিলাতে পাঠাতে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি ত বিলাত যাওয়ার অত খরচ দিতে পার্ব্বেন না।"

মিঃ রায় বলিলেন, "টাকার জন্যে আটকাবে না। তোমার বাবা যদি চার পাঁচ হাজার টাকা দেন, বাকী টাকা আমি দেব।"

সুধীর পিতার নিকট সমাগত হইয়া সকল সংবাদ দিল।

শুনিয়া, সুধীরের পিতা আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসতে পারলে, আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। আর আজ কাল এই কল্‌কাতা সহরে কারও বিলাত যাওয়ার জন্যে জাত যায় না; বিশেষতঃ, আমাদের কায়স্থ সমাজে, বিলাত ফেরতায় সঙ্গে আদান-প্রদানও চলেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি সেই এগার বছরের মেয়েটিকে সত্ত্ব বিয়ে না করলে আমি এই চার পাঁচ হাজার টাকাও যে যোগাড় কর্ত্তে পারব না।"

সুধীরকুমার ভাবিতে লাগিল। সে যূথিকার প্রেমে বিভোর হইয়া, এতদিন পূর্ব্বোক্ত একাদশ বর্ষীয়া বালিকা কুসুমকুমারীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। পিতা বলিয়াছিলেন বটে যে, কুসুমকুমারী অতিশয় সুন্দরী; কিন্তু সে ত তাহার যূথিকার মত প্রেমিকা নয়। অন্য বিবাহের কথা মনে হইলেই, যূথিকার প্রেম-ললিত মুখ খানি তাহার হৃদয় সরোবরে, প্রফুল্ল শতদলের মত ভাসিয়া উঠিত।

পুত্রকে চিন্তান্বিত দেখিয়া, পিতা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমি বলি, তুমি ঐ বিয়েটা করে ফেলে, টাকাটা হস্তগত কর। মিঃ রায়ের কাছে আপাততঃ এই বিয়ের কথা গোপন রেখ। তাহলেই, তোমার বিলাত যাওয়ার বাকী খরচ দিতে তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না। তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ, তিনি তোমাকে

জামাই করবার জন্যেই, ব্যারিষ্টার হ'বার জন্যে এত খরচ পত্র করে বিলাতে পাঠাচ্ছেন।"

সুধীরকুমার চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, "এটা ত একটা প্রবঞ্চনা হ'বে।"

পিতা বলিলেন, "কিন্তু এ প্রবঞ্চনাটুকু না করলে, তোমার বিলাত যাওয়া হবে না, আর ব্যারিষ্টার হওয়াও হ'বে না। তা' ছাড়া তুমি যদি মিঃ রায়ের জামাই হওয়ার আশা করে থাক, সে আশাও ফলবে না। আর এটা ঠিক প্রবঞ্চনাও হবে না। মিঃ রায় যদি স্পষ্ট ক'রে বলতেন যে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যেই, তোমাকে বিলাতে পাঠাচ্ছেন, তাহলে—"

সুধীরকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কিন্তু অন্য মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেলে, তিনি ত আর বিয়ে দেবেন না।"

পিতা বলিলেন, "সে জন্যে এখন ব্যস্ত হ'বার দরকার নেই। তুমি ব্যারিষ্টার হ'য়ে দেশে ফিরে আসতে এখনও তিন চার বছর দেরী। যাকে বিয়ে ক'রে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করবে, সে সেই ম্যালেরিয়ার দেশে, তিন চার বছর বেঁচে নাও থাকতে পারে; আবার মিঃ রায়ের মেয়েও বয়স্থা হলে, তোমায় বিয়ে না করে, আপন মনোমত অন্য কোন বরও খুঁজে নিতে পারে।"

সুধীরকুমার পিতার শেষ উক্তিটা পছন্দ করিল না। কিন্তু পিতার উপদেশ মতই চারি হাজার টাকা পণ লইয়া কুসুমকুমারীকে বিবাহ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাত যাত্রা।

একাদশবর্ষীয়া বালিকা কুসুমকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল। বধূ কয়েক দিন মাত্র শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া, আবার পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমতী শ্বশুরকুলের যাবতীয় সংবাদ এবং বরের বিলাত যাওয়ার গোপন সংবাদ জানিয়া গেল।

সৌভাগ্যের বিষয়, এই সময়টা মিঃ রায় সপরিবার বোম্বাই গিয়াছিলেন। পুত্রকে জাহাজে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে, তিনি তিন সপ্তাহ কাল বোম্বায়ে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার বিলাত যাত্রী দুই একটি বন্ধুর সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সঙ্গে তিনি সুধীরকুমারকেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু সুধীরকুমার তখন আসন্ন বিবাহ কার্য্য-সমাধা না করিয়া, যাইতে পারেনা। কাযেই সে বলিয়াছিল, 'আমার কাপড় চোপড় তৈরী করে নিতে, আর অন্যান্য বন্দোবস্ত করতে, দিন কতক দেরী হবে। আপনার টেলিগ্রাম পেলেই আমি বোম্বাই গিয়ে আপনাদের ধরব।'

বলা বাহুল্য, এই দিন কয়েকের মধ্যেই সুধীরকুমার কুসুমকুমারীকে বিবাহ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল; আবশ্যক মত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল; এবং আবশ্যক বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়াছিল। পরে সে মিঃ রায়ের টেলিগ্রাম পাইয়া বোম্বাই আসিয়া রায় পরিবারের সহিত মিলিত হইল।

সুধীরকুমার নবীন প্রেমিক; সে তিন সপ্তাহ বিচ্ছেদের পর, যূথিকার সহিত যেরূপ আগ্রহপূর্ণ মিলনের প্রত্যাশা করিয়াছিল, সেরূপ কিছুই ঘটিল না। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আশঙ্কায় যূথিকা তখন বিহ্বলা ছিল; সে হাসিমুখে ভ্রাতার বন্ধুর সহিত কথা কহিতে পারিল না। ইহাতে সুধীর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, এবং কিয়ৎ কালের জন্য মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিলে, সমুদ্রের শীতল ও মুক্ত বাতাসে, সুধীরের মন হইতে সমস্ত অশান্তি উড়িয়া গিয়াছিল; জাহাজের দোলনে তাহার উদর হইতে সমস্ত প্রেম ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

বিলাত পৌঁছিয়া কিছু দিনের মধ্যেই, তাহারা দুই বন্ধুতেই Grey's Innএ প্রবিষ্ট হইল। সুধীরকুমার আইন পাঠে মনোনিবেশ করিল, সুধাংশুভূষণ আমোদ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার ফল ফলিল। তিন বৎসর পরে সুধাংশুভূষণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল; সুধীরকুমার কৃতকার্য্য হইল।

সুধীরকুমারের কৃতকার্য্যতার সংবাদ যখন ভারতে

পৌঁছিল, তখন তাহাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিবার তাহার কেহ ছিল না। মিঃ রায় আপনার পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় এত বিমর্ষ হইয়াছিলেন যে সুধীরের শুভ সংবাদে খুসী হইতে পারিলেন না। মিসেস্ রায় কখনও কিছুতে আনন্দিত বা দুঃখিত হইতেন না; আজও হইলেন না। সুধীরকুমারের পিতা মাতাও এ আহ্লাদ উপভোগ করিতে পারিলেন না;—তাঁহারা কেহই এ শুভ সংবাদ বিধাতার ইচ্ছায় শুনিলেন না। আর কুসুমকুমারী?—কিন্তু সে এখন কোথায়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্রয়হীনা।

সুধীরকুমারের পিতা মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্রবধূ ম্যালেরিয়ার দেশে বাস করিয়া, তিন বৎসর কাল বাঁচিবে না; ঈশ্বর না করুন, কিন্তু পুত্রবধূ গতায়ু হইলে, মিঃ রায়ের ন্যায় ধনী ব্যারিষ্টারের কন্যাকে দ্বিতীয় পুত্রবধূ করিবার আর কোনও বিঘ্ন থাকিবে না। কিন্তু মানুষ যাহা মনে করে, বিধাতার বিধানে তাহা ঘটে না; বরং সময় সময় তাহার ঠিক বিপরীতই বিহিত হইয়া থাকে। বিধাতার বিধানে, বধূ এই ম্যালেরিয়ার দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, এবং শত দুঃখের মাঝে বাস করিয়াও মরিল না; বিবাহ-সলিল-সিক্ত অঙ্গ, চন্দ্রকলার ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বরং সুধীরকুমারের পিতাই, পুত্রের ব্যারিষ্টার হইবার শুভসংবাদ ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, অল্পদিনের রোগে, ভবলীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন; কাযেই পুত্রের শুভ সংবাদে তিনিও আহ্লাদিত হইতে পারেন নাই। সুধীরকুমারের মাতাও স্বামিহীনা হইয়া, দুরবস্থায় পড়িয়া এ শুভ সংবাদ শুনিলেন না। আর কুসুমকুমারী?

কিন্তু আমরা আগে তাহার মহা দুঃখের কথা বিবৃত করিব।

তাহার বিবাহের দুই বৎসর পরে, তাহার পিতা রোগজীর্ণ নশ্বর দেহটী অকালে ত্যাগ করিলেন। মাতা পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিয়া এবং স্বামীর চিকিৎসা করাইয়া নিরাভরণা ও নিঃসম্বলা হইয়াছিলেন; এক্ষণে স্বামিহীনা হইয়া, কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া কলিকাতায় বাস করিতে পারিলেন না। পল্লীগ্রামে যাইয়া, বহুকালের পরিত্যক্ত, সংস্কারবিহীন বাটীতে কন্যাসহ বাস করিতেন। নিতান্ত সহায়হীনা হইবেন বলিয়া, অত্যন্ত দুরবস্থাতে পড়িয়াও কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি অধিক দিন বাঁচিলেন না। স্বামিশোকাচ্ছন্না পল্লীবাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না; স্বামী বিয়োগের ছয় মাস পরেই, তিনি মরিয়া জ্বালা জুড়াইলেন। এইরূপে পিতৃহীনা কুসুমকুমারী মাতৃহীনা হইল।

গ্রামের লোকে তাহার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার শ্বশুরকে পত্র দিল। কিন্তু তিনি অন্তিম শয্যায় শুইয়াছিলেন; পত্রের উত্তর দিবার সামর্থ্য তখন তাঁহার ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পরও কুসুমকুমারী তৎসংবাদ অবগত হইতে পারে নাই; সেই অজানিত পাড়াগাঁয়ে কে তাহাকে সংবাদ দিবে?

কুসুমকুমারী কাঁদিল। কাঁদিয়া ভাবিল, এই জনশূন্য ভগ্ন পুরীতে সে কিরূপে একাকিনী বাস করিবে? বাস করিয়া, খাইবে কি? স্বামীর যে মূর্ত্তি সে বাসর ঘরে অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিয়াছিল, এ যাবৎ যে মূর্ত্তি, প্রত্যেক বিপদে, তাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহা তাহার আবার মনে পড়িল। সে মনে করিল, তাহার স্বামী আছেন, তাহার আর ভাবনা কি? তাহার স্বামী বিদ্বান;—ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গিয়াছেন; তবে সে ভাবিবে কেন? তিনি বিলাত হইতে ফেরত আসিলে নিশ্চয় তাহাকে লইয়া যাইবেন, তখন তাহার কোনও কষ্ট, কোনও ভাবনা থাকিবে না। দয়াময়, কুসুমকুমারীর কষ্ট ও ভাবনা দূর করিবার জন্য তাহার বিদ্বান ও ব্যারিষ্টার স্বামীকে আনিয়া দাও। কুসুমকুমারী অনেক দিন অপেক্ষা করিল। কিন্তু দয়াময় ত দয়া করিলেন না। ক্রমে তাহার আহার সামগ্রী ফুরাইয়া আসিতে লাগিল; তাহার মাতার বাক্সের অর্থও ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া আসিতে লাগিল।

আর দুই এক মাসের মধ্যেই তাহার সকল সংস্থান ফুরাইবে। তাহার পর? দয়াময়, তোমার রাজ্যে কি সে উপবাস করিবে?

রাত্রে, কাছে শয়ন করিবার জন্য, কুসুমকুমারী এক দরিদ্রা ও বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীকে মাসিক আট আনা পয়সা দিত। সে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কুসুমকুমারীর জীর্ণকক্ষে শুইতে আসিলে, কুসুমকুমারী তাহাকে আপন দুঃখের কথা বলিত। একদিন বৃদ্ধা তাহার দুঃখ অবসানের এক উপায় বলিয়া দিল।

তাহা শুনিয়া, নম্রা, দারিদ্র্য-নিপীড়িতা কুসুমকুমারীর পদ্ম সদৃশ চক্ষুর্দ্বয় সেই নিবিড় অন্ধকারে জলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিল, ভর্ৎসনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল; এবং গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া অন্ধকার কক্ষ মধ্যে আপন মলিন শয্যায় শুইয়া রহিল। শুইয়া সারা রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া, সে স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিল। স্বামি-প্রেম-বিরহিতার এই স্বামী ভক্তি দেখিয়া, তোমরা বিস্মিত হইও না; এখনও তোমাদের এই পবিত্র দেশে, দরিদ্রের গৃহে, এইরূপ পবিত্র স্বামী-প্রেম বিরল নহে। এই পবিত্রা প্রেমিকারা, স্বামীকে মানুষ ভাবে না, দেবতা মনে করিয়া, তাহার পূজা করে। পার যদি, হে আমার সুশিক্ষিতা পাঠিকাগণ, তোমরাও তোমাদের মানুষ-স্বামীকে দেবতা করিতে চেষ্টা করিও; দেখিবে, দেবতার স্থান বলিয়া, তোমাদের গৃহও স্বর্গ হইবে।

যামিনী প্রভাত হইলে, কুসুমকুমারী মালতী নাম্নী এক বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। মালতী তাহা অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োধিকা; এবং প্রতিবেশী। কুসুমকুমারী মনে করিয়াছিল. মালতী তাহার দুঃখের কথা শুনিলে, সে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবে।

কিন্তু তাহার দুঃখের কথা মালতীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না। সেই দিন মালতীর স্বামীর আসিবার সংবাদ ছিল; সেই সংবাদে তাহার হৃদয় এতই পূর্ণ হইয়াছিল যে সেখানে অন্যের দুঃখ কথার স্থান ছিল না।

মালতী তখন পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছিল। মালতীর মাতা নিরাশ্রয়া কুসুমকুমারীকে মালতীর নিকট বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, মনে মনে এক সুযোগের বিষয় চিন্তা করিয়া লইলেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ কৌশলাবলম্বন করিয়া, তাহাকে বলিলেন, "বাছা তুমি বুড়ীকে রাত্রে বাড়ীর বার করে দিয়ে ভাল করনি। সে কাল রাত্রি থেকেই গ্রামে গ্রামে এমন সব কথা রটিয়েছে, যাতে তোমার এ গ্রামে বাস করা চল্‌বে না।"

কুসুমকুমারী বলিল, "সে কি কথা রটিয়েছে, তা' আমার জানবার দরকার নেই। আমি নিজেই এ গ্রাম ছেড়ে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"যেখানে চাকুরী পাব। আমি লোকের বাড়ীতে দাসী হ'য়ে থাকব।"

"ছি, ছি! অত বড় লোকের মেয়ে হ'য়ে, এই সোমত্ত বয়সে, কোথায় চাকুরী কর্ত্তে যাবে?"

"কিন্তু তা না করলে খাব কি? আমার যে আর কোনও উপায় নেই।" কুসুমকুমারী এই বলিয়া আর অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

মালতীর মাতা তাহার বিগলিত অশ্রুধারা আপন করুণার্দ্র অঞ্চলে মুছাইয়া কহিলেন, "আমি যা বলি, তা' যদি কর, তাহলে, তোমাকে এ গ্রামেও থাকতে হয় না, খাবার পর্‌বার ভাবনাও ভাবতে হয় না। আমার জামাই পশ্চিমে পাটনা সহরে থাকে, মস্ত চাকুরী করে; সে আজ মালতীকে নিতে আসবে। আমি বলি কি, তুমি মালতীর সঙ্গে পাটনায় যাও। বেশ দু'টী বোনের মত থাকবে। কোনও কষ্টই হবে না। চাকর বামুন আছে; তারা কায কর্ম্ম করবে, রাঁধবে। তোমরা খালি হেসে খেলে বেড়িয়ে বেড়াবে।"

কুসুমকুমারী করুণাময়ীর এই সদয় প্রস্তাবে সহজেই সম্মতা হইল।

জামাতা মালতীকে লইয়া যাইবার জন্য সমাগত হইলে, মালতীর মাতা তাহাকে আহারে বসাইয়া, নিজের বুদ্ধির এবং চাতুরীর নিজেই অসম্ভব রকম প্রশংসা করিয়া, কহিলেন, "দেখ, বাবা! তুমি একটি ঝিয়ের কথা

লিখেছিলে। ঝি ত আমাদের দেশে সহজে পাবার যো নেই। আমি কত কষ্টে একটা ঝি ঠিক করেছি। মাহিনা কিছু দিতে হ'বে না; শুধু ভাত কাপড় দিলেই চলবে। বয়সটা কিছু কাঁচা; তাতে কিছু এসে যাবে না; হাট বাজারে যেতে না দিলেই হ'ল। খুব গতর আছে; আর আমাদেরই কায়স্থের মেয়ে; রান্না বান্না, আর এ দিককার সব কাযই ওকে দিয়ে চলবে।"

মালতীর মাতা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারই চাতুরীর কৌশলে, কুসুমকুমারীকে কন্যার সহিত পাটনায় যাইতে বাধ্য করিলেন। হায়! তিনি ত জানিতেন না যে, কুসুমকুমারীকে পাটনায় তিনি পাঠান নাই, ইহা চতুর চূড়ামণি বিধাতার অসংখ্য খেলার মধ্যে একটী খেলা মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন।

মিঃ রায় সুধাংশুভূষণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সুধীরকুমারের পিতৃবিয়োগের সংবাদ ছিল। কিন্তু সে, সে কথা সুধীরের নিকট গোপন রাখিল। তাহার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, এই সুদূর বিদেশে সঙ্গহীন জীবন অতিবাহিত করা; এবং পুনরায় একাকী ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া, তাহার পক্ষে বড়ই শক্ত কায হইবে। সে আর এক বৎসর সুধীরকুমারকে চায়। সুতরাং সে তাহাকে তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ দিয়া, তাহার তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিবার কারণ ঘটাইল না। বরং আরও এক বৎসর সুধীরের খরচ দিবার জন্য পিতাকে কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক সে পত্র লিখিল। সুধীরকুমারকেও আরও এক বৎসর থাকিবার জন্য সে বিশেষ রূপ অনুরোধ করিল।

সুধীরকুমারও পিতার মৃত্যু সংবাদ অনবগত থাকিয়া, থাকিতে স্বীকৃত হইল। বলিল, "তোমরা খরচ যোগালে থাকব না কেন; বরং এই সময়ের মধ্যে ফরাসী ভাষাটা শিখে নিতে পারব।"

অতঃপর সুধীরকুমার ফরাসী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিল; সুধাংশুভূষণ পুনরায় আইন পরীক্ষা দিবার জন্য, আইন পুস্তক পাঠ না করিয়া, নূতন আমোদের সন্ধানে ফিরিল। মিঃ রায় যুবকদ্বয়ের খরচ যোগাইতে লাগিলেন।

কিন্তু সুধীরকুমারের মনে শান্তি ছিল না। সে পিতাকে পত্র লিখিত, তাহার একখানিরও উত্তর পাইত না। বহুবার অকৃতকার্য্য হইয়া, অবশেষে সে সুধাংশুভূষণকে বলিল, "তোমার বাবাকে পত্র লিখে, আমাদের বাড়ীর সংবাদটা এনে দাও। না হলে, আমি স্থির হয়ে থাকতে পারছিনে।"

সুধাংশুভূষণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। পিতাকে পত্রও লিখিল, কিন্তু বন্ধুর অনুরোধের বিষয় জানাইল না।

সুধীরকুমার কিছুকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবার কাছ থেকে আমাদের বাড়ীর কোনও খবর পেলে?"

সুধাংশুভূষণ কহিল, "না, কোনও কথা লেখেন নি। বোধ হয়, ব্যস্ত ছিলেন বলে, খবর নিতে পারেন নি। আমি আবার তাঁকে বিশেষ ক'রে লিখব।"

বলা বাহুল্য, এবারও সুধাংশুভূষণ কোনও কথা লেখে নাই। কিন্তু এই রকমে, একবৎসর সময় অতিবাহিত হইল। সুধীরকুমার ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিল; সুধাংশুভূষণ আবার আইন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল। সংবাদ পাইয়া মিঃ রায় পুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য, কিছু দিনের জন্য, দেশে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত পত্র লিখিলেন।

সেই পত্র পাইয়া সুধাংশুর সহিত, মহা চিন্তান্বিত সুধীর স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ট্রেণ হইতে নামিয়াই সুধীর আপন জিনিষ পত্রের ভার সুধাংশুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্রথমেই আপনাদের বাড়ীতে গেল। দেখিল, সেখানে তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি কেহই নাই। সে বাড়ী অন্য অপরিচিত ভাড়াটীয়াগণ দখল করিয়াছেন। সে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাঁহারা প্রায় এক বৎসর কাল

আগে হইতে ঐ বাটী ভাড়া লইয়াছেন, পূর্ব্বের ভাড়াটীয়াগণ কোথায় গিয়াছেন, সে তথ্য তাঁহারা অবগত নহেন। সুধীর ভাবিয়া দেখিল যে, তাহার শ্বশুর বাড়ীতে যাইলে, বোধ হয় তাহার পিতা মাতার সংবাদ পাইতে পারিবে। সেখানে যাইয়া সে অবগত হইল যে, তাঁহারাও আর কেহই সেই বাটীতে বাস করেন না। সুধীরকুমার মহা চিন্তিত হইল; সে তাহার আত্মীয় স্বজনকে কোথায় কিরূপে খুঁজিয়া পাইবে? একবার মিঃ রায়ের কথা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু না; তিনি নিশ্চয় তাহাদিগের কোন তথ্যই জানিতে পারেন নাই; তাই তিনি সুধাংশুর পত্রোত্তরে তাহাদিগের সংবাদ দিতে পারেন নাই। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সে আপনাদিগের পূর্ব্ব বাটীর নিকট ফিরিয়া আসিল। ঐ বাটীর নিকটে এক মুদীখানার দোকান ছিল; ঐ দোকান হইতেই তাহাদের রন্ধনোপকরণ ক্রয় করা হইত। হঠাৎ সেই দোকানখানি নয়নপথে পতিত হওয়ায় সুধীর ভাবিল, ঐ দোকানদারের নিকট সন্ধান লইলে বোধ হয়, সে সঠিক সংবাদ দিতে পারিবে।

বাস্তবিকই দোকানী সন্ধান দিল; বলিল, 'ঐ বাড়ীর বাবু এক বছর আগে হঠাৎ মারা যান। তিনি মারা গেলে, গিন্নী অত ভাড়ার বাড়ী রাখতে না পেরে, ঐ গলির ভিতর ৭৪নং ছোট একতলা বাড়ীতে উঠে গেছেন।'

পিতার মৃত্যু সংবাদে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গলির মধ্যে ৭৪নং বাটী সুধীরকুমার খুঁজিয়া বাহির করিল।

তাহাকে সমাগত দেখিয়া তাহার বিধবা মাতা এবং ভ্রাতা ভগিনী হাহাকারে কাঁদিয়া উঠিল।

কয়েকদিন সেই বাটীতে অবস্থিতি করিয়া সে সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইল। শুনিল যে, তাহার পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পরই তাহার এক ভ্রাতা মিঃ রায়ের বাটীতে গিয়া তৎসংবাদ তাঁহাকে দিয়া আসিয়াছিল, এবং তাহাকেও জানাইবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছিল। শুনিল যে, তাহার পরিণীতা পত্নী পিতৃহীনা হইয়া এক্ষণে তাহাদের পল্লীগ্রামের বাটীতে বাস করিতেছে; ঐ পল্লীগ্রামের নাম তাহার স্বর্গীয় পিতা অবগত ছিলেন; কিন্তু তাহার মাতা কিংবা বাটীর অন্ত কেহ তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিলেন না। সুধীর কুমার আপাততঃ পত্নীকে খুঁজিবার জন্ম ব্যস্ত হইল না। তথাপি সেই পিতৃহীনার প্রতি একটুখানি সমবেদনা তাহার হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

দুই চারি দিন পরে, সে আপন দ্রব্য সমগ্রী সুধাংশুভূষণের নিকট হইতে আনিবার জন্ম মিঃ রায়ের বাটীতে গেল। সুধাংশু তখন বাটীতে ছিল না। মিঃ রায় তাহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তাহার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর, সুধীরকুমার মিঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি বিলাতে থাকতে, আমার বাবার মৃত্যু সংবাদ পাইনি।"

মিঃ রায় বলিলেন, "কেন, তোমাদের বাড়ী থেকে খবর পেয়েই আমি, তোমাকে জানাবার জন্যে সুধাংশুকে পত্র লিখেছিলাম।"

সুধীর বলিল, "সুধাংশু, বোধ হয়, কোনও রকমে ঐ পত্র পায়নি।"

মিঃ রায় বলিলেন, "না; সে যে সেই পত্রের উত্তর লিখেছিল, আমার বেশ মনে আছে। সে লিখেছিল যে, পিতৃশোকে তোমায় অভিভূত করতে পারে নি। তুমি ভালই আছ; এবং আর এক বছর সেখানে থাকবার জন্যে আমার অনুমতি চেয়েছ।"

এই সময় মিসেস্ রায় কক্ষদ্বারে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করায় সেই প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সুধীর আহূত হইয়া অন্য কক্ষে গেল।

সেখানে যূথিকা বসিয়া ছিল। সে এখন পূর্ণা যুবতী; যৌবনরাশি যেন তাহার দেহে আর ধরিতেছিল না, উছলাইয়া পড়িতেছিল। এই অভিনব সৌন্দর্য্য সুধীরকুমার নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিল; তাহার হৃদয় এই রমণীর যৌবনোচ্ছ্বাসে কাণায় কাণায়

পূর্ণ হইল; সে অতি সম্ভ্রমে যুবতীকে অভিবাদন করিল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া সুধীরকুমার কিছু বিস্মিত হইল।—সুন্দরী যূথিকার পরিধানে আর পূর্ব্বের ন্যায় শাটী নাই; সে এক্ষণে গাউন পরিধান করিয়াছিল;—তাহাতে গাউনের জন্ম যেন সার্থক হইয়াছিল। এই গাউন পরিহিতা পূর্ণা যুবতীর কাছে, সে ধুতি পরিয়া আগমন করায়, সে যেন কিছু লজ্জা অনুভব করিল।

লজ্জার কারণ ছিল। যূথিকা সেই ধুতির দিকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; এবং অপ্রসন্ন মুখে তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল।

মিসেস্ রায় যুবক যুবতীদের—বিশেষতঃ নির্ব্বাচিত জামাতার,—সুদীর্ঘ চারি বৎসরের পরে, মিলনের মিষ্ট কথাবার্ত্তার সুবিধার জন্য, সেই কক্ষে অল্পকাল অপেক্ষা করিয়া, কোনও কার্য্যের ব্যপদেশে কক্ষান্তরে উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু সেই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠেও যূথিকার মুখ আর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল না। তাহার মিষ্ট আলাপনেও সুধীরকুমারের বিরহতপ্ত হৃদয়ে আর সুখের বন্যা বহিল না। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে যূথিকার হৃদয়ে তাহার জন্য এতটুকু প্রেম নাই।

বন্ধুর মিথ্যা আচরণে এবং যূথিকার প্রেমহীন ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইয়া বাটী ফিরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়া।

মালতীর সহিত পাটনায় আসিয়া কুসুমকুমারী বুঝিল যে, সে মালতীর সখী নহে; প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের পাচিকা এবং পরিচারিকা দুইই। তাহাদের বর্ণিত ভৃত্য বা পাচক কিছুই ছিলনা; মালতীর স্বামীও মস্ত চাকুরী করে না, সামান্য বেতনের চাকুরী করিতেন; তাঁহার চাকর বামুন রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। ইহাতে কুসুমকুমারী দুঃখিতা হয় নাই; বরং পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পাওয়ায় সুখীই হইয়াছিল। সেই অল্প কায সে সহজেই সম্পন্ন করিতে পারিত।

এইরূপে, একপ্রকার স্বচ্ছন্দেই, প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইল।

মালতী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। জননী হইবার পর, অন্যান্য প্রসূতিদিগের অন্তর মধ্যে স্নেহরস সঞ্চারিত হয়, কিন্তু মালতীর তাহা হইল না। তাহার অন্তর মধ্যে তীব্র হলাহল সঞ্চারিত হইল। সূতিকাগার হইতেই সে মাঝে মাঝে এই হলাহল উদ্গীরণ করিয়া, তাহার শান্তস্বভাব, নিম্নদৃষ্টি ও নিতান্ত বেচারা স্বামীকে, বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত করিয়া দিত। কুসুমকুমারী দেখিল যে, মাঝে মাঝে তাহার স্বামীর নামের সহিত তাহার নাম বিজড়িত করা হয়। দেখিয়া নিরাশ্রয়া, নিতান্ত ম্রিয়মাণা ও মর্ম্মহতা হইয়া রহিল।

কিন্তু মালতীর হৃদয়মধ্যে অকারণ বিষ সৃষ্ট হয় নাই। এই বিষের সৃষ্টির জন্য সে দগ্ধ বিধাতাকেই সব চেয়ে বেশী দায়ী করিত। বিধাতা সব রমণীকেই সুন্দরী করেন; মালতীকে বোধ হয় অন্য রমণী অপেক্ষা বেশী সুন্দরী করিয়াছিলেন;—কৃষ্ণবর্ণ দেহের এমন শোভা কার? উচ্চ দাঁত গুলিতে যেন তাহাকে সর্ব্বদা হাস্যময়ী করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা কুসুমকুমারীকে রূপ না দিয়াও—কটা রং, কাঠির মত দেহ ও ফ্যাল ফ্যালে চক্ষু দিয়া—অগ্নিশিখারূপিণী করিয়াছিলেন কেন? মলিন কর্কশ বসনে যে এ অগ্নি ঢাকিতে পারা যায় না;—শৈবালমধ্যবর্ত্তিনী নলিনীর ন্যায়, অন্ধকারমধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায়, এ যে ঝলকে ঝলকে শোভা বিকাশ করে, তাহার উপর বিধাতার আরও দোষ ছিল; তিনি কেন এই অগ্নিরূপিণীকে সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী করিলেন; আর মালতীকে কেন বিংশতিবর্ষীয়া লোলদেহা প্রসূতি করিলেন?

আমাদের বলিতে হইবে না যে, মালতীর স্বামীর ইহাতে কোন দোষ ছিল না। কুসুমকুমারীর [illegible] কেন, সে কোনও রমণীর প্রতি কখনও উচ্চ [illegible] দৃষ্টিপাত করে নাই। প্রেমালাপ দূরে থাকুক, কোনও নারীর

সহিত কথাও কহে নাই; সে ক্ষমতাই তাহার ছিল না। সে যতক্ষণ বাটীতে থাকিত, ততক্ষণ আর কিছু করিবার তাহার অধিকার ছিল না, কেবল হেঁটমুখে যুবতী স্ত্রীর মুখনিঃসৃত মিষ্ট গালাগালি খাইতে হইত; এবং গালাগালি খাইতে খাইতে আফিসে যাইয়া, বড়বাবু গালাগালি খাইতে হইত। শুধু গালাগালি কি? ইদনীং দুই এক জন বিদুষী, মার্জ্জিতরুচি মহিলা তীক্ষ্ণ লেখনী ধারণ করিয়া, সরলা সাধ্বীগণের প্রতি স্বামীগণের অকথ্য অত্যাচার কাহিনী, দীপ্ত ভাষায় বিবৃত করিলেও, আমাদের মনে হয়, কখন কখনও স্বামীরাও উৎপীড়িত হইয়া থাকে! অন্ততঃ আমাদের সাধ্বী সতী শ্রীমতী মালতী, কখন কখন স্বামীর কর্কশ অঙ্গ,—অবশ্য তাহার কল্যাণের জন্যই—সুকোমল সম্মার্জনীর দ্বারা কোমল হস্তে চর্চ্চিত করিতে বাধ্য হইত; এবং অবোধ স্বামী যদি ইহাতে আপনাকে নির্জ্জিত মনে করিত, তাহা হইলে মিষ্টভাষিণী মালতী তাহাকে বুঝাইয়া বলিত, 'খুব করেছি, বিষ ঝেড়ে দিয়েছি।'

মালতীর এই 'বিষ ঝাড়া' ব্যাপারে কুসুমকুমারী অস্থির হইয়াছিল। সময় সময় তাহাকেও বিষঝাড়ানর ভয় দেখান হইত; শ্রবণ-অযোগ্য ভাষায় তাহার প্রতি নিত্য ব্যবহার করা হইত—তাহা যেন তাহার শরীরের ভূষণ হইয়াছিল। অসহায়া নিরাশ্রয়া কি করিবে? সে অশ্রুপ্লাবিত হইয়া নীরবে আপনার মনোব্যাথা গোপন করিত। যখন বাক্যবাণে সে জর্জ্জরিত হইয়া, অস্থির হইয়া উঠিত, তখন সে এক একবার ভগবানকে ডাকিত। কিন্তু ভগবান কি মানুষের কথা, বিশেষতঃ দুঃখিনী অবলার কথা শুনেন? হা, শুনেন বই কি! কিন্তু মানুষে সকল সময়, শোনা বুঝিতে পারে না। তাহার মাঝে, কুসুমকুমারী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

সেই দিন, নিজের দুরবস্থা চিন্তা করিতে করিতে কখন্ বেলা অবসান হইয়াছিল, কুসুমকুমারী তাহা বুঝিতে পারে নাই। মালতী তাহাকে রাত্রের রন্ধনের জন্য ডাকিতেছিল। কিন্তু ঠিক পূর্ব্বেই মালতীর স্বামী আফিস হইতে ফিরিয়া, বিধুমুখী পত্নীর সাক্ষাৎ লালসায়, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং তথায় কুসুমকুমারীকে আলুথালু বেশে আসীনা দেখিয়া, অতি সত্বর কক্ষের বাহিরে আসিতেছিল। মালতী কুসুমকুমারীকে ডাকিতে আসিয়া, ঠিক সময়ই স্বামীকে দেখিল; সে স্বামীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখে নাই; কেবল দ্রুত পদে বাহির হইতেই দেখিল; সে মনে করিল যে, তাহার পদশব্দ পাইয়াই ধূর্ত্ত ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তীরবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কুসুমকুমারী, হঠাৎ মালতীর স্বামীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, আপন অসংযত বেশ সংযত করিয়া লইতেছিল। মালতী তদবস্থায় কুসুমকুমারীকে দেখিল; কেন তাহার রন্ধন কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, তাহার গুপ্ত কারণটা মালতী যেন অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে পারিল।

তাহার পর কি হইল, আমরা তাহার বর্ণনা করিব না;—তাহার বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, সে চিৎকার, সে হুঙ্কার, সে দুর্জ্জয়ভাব একমাত্র ডাকিনীতে সম্ভব, তাহা অবলাগণের অনুকরণীয় নহে। তোমরা যদি কখন সেই ভাষা শুনিয়া থাক, তবেই তাহা কল্পনায় আনিতে পারিবে।

হিতাহিত জ্ঞান বিরহিতা মালতী অবশেষে এক দীর্ঘ সমার্জ্জনী লইয়া, কক্ষকুট্টিমে প্রচণ্ড বেগে আছড়াইতে লাগিল। তাহার সেই রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিয়া, কুসুমকুমারী প্রহার ভয়ে অস্থির হইয়া, ধীরে ধীরে ম্লান মুখে কক্ষের বাহিরে আসিতেছিল। মালতী তাহা দেখিয়া সমার্জ্জনী আঘাতের তালে তালে, তাহার দীর্ঘ দন্ত বিকশিত করিয়া কহিল, "যা, যা, বেরো, বেরো, এক্ষুণই বেরো, বাড়ী থেকে একবারে বেরিয়ে যা; নইলে, এই ঝাঁট দেখিছস, ঝেঁটিয়ে বের করব।" বলিতে বলিতে ক্ষিপ্তপ্রায় মালতী দাঁড়াইয়া উঠিল।

কলঙ্কিনী না হইয়াও, কলঙ্কের গুরু বোঝা মাথায় বহিয়া, ক্রন্দনমানা কুসুমকুমারী নীরবে বাটী হইতে

বাহির হইয়া গেল। হায়! সন্ধ্যার অন্ধকারে নিরাশ্রয়া সহায়হীনা বালিকা কোথায় যাইবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাটনার ব্যারিষ্টার

সুধীরকুমার ভাবিল, হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিতে হইলে, প্রথমেই অফিস আদি খুলিতে কিছু অর্থের আবশ্যক। কিন্তু এই অর্থ সে কোথায় পাইবে? মিঃ রায় তাহার জন্য যে ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ যূথিকার রূঢ় ব্যবহারের পর, তাঁহার নিকট আর অর্থ চাওয়া অসম্ভব। মাতা তাঁহার সামান্য অলঙ্কারগুলি দিতে চাহিলেন। কিন্তু সুধীরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে বিধবা মাতার নিকট কিছু লইবে না;—আহা! দুঃখিনীর ঐ অলঙ্কার কয়েকখানিই শেষ সম্বল।

সুধীর যখন অর্থ চিন্তায় ব্যাপৃত, তখন মিঃ রায়ের দ্বারবান আসিয়া, হঠাৎ একদিন তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র মিঃ রায় লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই কয়েকটি কথা মাত্র লিখিত ছিল!—"আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি। যত শীঘ্র সম্ভব, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

কৃতজ্ঞ হৃদয় সুধীরকুমার উপকারকের বিপদের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আসিল।

মিঃ রায়, বোধ হয়, কাঁদিতেছিলেন। তিনি লোচন প্রান্ত মুছিয়া, কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। বস, তোমায় সকল কথা বলছি; আর তোমার সাহায্য চাচ্ছি। আমি মনে করেছিলাম সুধাংশু বিলাত গিয়ে কিছুই শেখেনি। তা' নয়। এখন দেখছি, সে আইন শিখতে পারেনি বটে, কিন্তু বিলক্ষণ মদ খেতে শিখেছে। কাল ক্লাবে গিয়ে, অত্যন্ত মাতাল হয়ে কতকগুলা বোতলের উপর পড়ে যায়; ভাঙ্গা বোতলের টুকরায় তার মুখের অনেক যায়গা কেটে যায়। তাতে অতিরিক্ত রক্ত পড়ায়, ক্লাবের সেক্রেটারী তাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে, আমায় খবর দেয়। তখন রাত প্রায় দুটো। কর্ক নামে এক ছোঁড়া ইংরেজকে বছর দুই হ'ল, আমি সোফার নিযুক্ত করেছিলাম; কিন্তু সেই রাত্রে তাকে বা মোটর গাড়ী খুঁজে পেলাম না। কাযেই আমাকে হেঁটেই হাঁসপাতালে যেতে হল। যখন আমি সেখানে পৌঁছিলাম তখন সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান; একজন ডাক্তার তার মুখের ক্ষতগুলা পরীক্ষা করছেন। সকাল বেলা পর্য্যন্ত থেকে, তার একটু জ্ঞান হওয়া দেখে এসেছি বটে, কিন্তু ডাক্তারেরা বলছেন, তার একটা চোখ একবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে।

সুধীরকুমার কিছু বিচলিত হইয়া, আসন ত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত হইয়া কহিল, "আমি এখনই হাঁসপাতালে গিয়ে তার ভালরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো, আর আপনাকে তার খবর এনে দেব।"

মিঃ রায় বলিলেন, "না, না; তুমি যেও না; বস। তোমাকে এখনও আমার সকল বিপদের কথা বলা হয় নি। কর্ক নামে সেই ইংরাজ সোফারটা আমার মেয়েকে মোটরে করে প্রত্যহ কলেজে নিয়ে যেত, আর কলেজের ছুটি হ'লে বাড়ী নিয়ে আসত; কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতেও নিয়ে যেত। বেটা এই সুযোগ নিয়ে যূথিকাকে ফুস্‌লে রেখেছিল। আমি হাঁসপাতাল থেকে ফেরত এসে খবর পেলাম যে, সে মোটরে যূথিকাকে নিয়ে, কাল রাত প্রায় আটটার সময় বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরত আসেনি। আরও আমার মুখে শুনলাম যে, যূথিকার ড্রয়িং রূম থেকে তার তিনটি বড় বড় ট্রাঙ্কও অন্তর্ধান করেছে।"

সুধীরকুমার বলিল, "আপনি কি ভয় করেছেন যে, তারা বিলাত চলে গেছে?"

মিঃ রায় বলিলেন, "নিশ্চয়ই। পরশু বৃহস্পতিবার—বম্বে থেকে "সার্ডিনিয়া" ষ্টীমারখানা ছাড়বে। তারা কাল বম্বে মেলে গেছে; ঠিক বম্বে মেলের সময়ই তারা বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল।"

সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তারা অপর কোন জায়গায় যায় নি ত?"

মিঃ রায় বলিলেন, "না না। মোটরখানার সন্ধান নেবার জন্যে, আমি হাওড়া ষ্টেসনে একটু আগে টেলিফোঁ করেছিলাম, তাঁরা জানিয়েছেন যে, মোটরখানা পুলিশের জেম্মায় আছে। বম্বে যাবার উদ্দেশ্য না থাকলে, কেউ ঠিক বম্বে মেলের সময়ই হওড়া ষ্টেসনে যায় না। একটা কথা ভাববার আছে; কাল সন্ধ্যার সময় যখন তারা বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, তখন তাদের সঙ্গে অন্য কোনও জিনিষ ছিল না, আমি ভাবছি ট্রাঙ্কগুলা নিয়ে গেল কি করে?"

সুধীরকুমার কহিল, "বোধ হয়, দুপুর বেলা, চাকর বাকর যখন খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করছিল তখন মুটে ডেকে, সে গুলাকে সরিয়ে, মোটরে করে ষ্টেসনে নিয়ে গেছে; আর নিজেদের টিকিট কিনে, সে গুলোকে বুক করে এসেছে। কিন্তু দুজনের লণ্ডন যাওয়ার ভাড়া ত কম নয়? তা' কি করে সংগ্রহ করলে?"

মিঃ রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "প্রথমতঃ কর্কের হাতে যূথিকার হাতে, বোধ হয়, নগদ চার পাঁচশ' টাকা আছে। তার পর, আমি সেবার তোমাদের জাহাজে তুলে দিতে বোম্বে গিয়ে শুনলাম যে, 'অ্যাংলো অ্যামেরিকান' ব্যাঙ্কটা বেশ চলছে। মেয়ের বিয়ের যৌতুকের জন্যে, আমি, টু'পারসেণ্ট সুদে, এক হাজার পাউণ্ড মেয়ের নামেই জমা দিই। পরে তোমরা, দেশে ফিরলে, সেই দিন তার মনস্তুষ্টির জন্যে, সুদ জমার খাতাখানা আর ব্যাঙ্কের রসিদখানা তারই হাতে দিই। তখন ত মনে কোন সন্দেহই ছিল না।" মিঃ রায় তাহার পর আরও অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার পর সেই দিন রাত্রেই, সংসারের ভার মিসেস্ রায়ের উপর, এবং অফিসের ও পীড়িত পুত্রের ভার সুধীরকুমারের উপর ন্যস্ত করিয়া, নিরুদ্দেশ কন্যার উদ্দেশে বোম্বাই যাত্রা করিলেন; এবং সেখানে কোনও সন্ধান না পাইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। চারি মাস পরে কর্ক কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু কন্যাসহ ট্রাঙ্কগুলি বা ব্যাঙ্কের খাতা কিছুই ফিরিল না।

চারি মাস কাল, মিঃ রায়ের ধনী মক্কেলদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সুধীরকুমার প্রভূত সুখ্যাতি লাভ, এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিল। সে এই অর্থ মিঃ রায়কে সমর্পণ করিতে যাইলে তিনি তাহা কোন ক্রমেই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। বোধ হয়, তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই দরিদ্র পুত্র তাঁহার অনেক করুণার কথা মনে করিয়া কৃতজ্ঞতাভারে, আবার তাঁহার কন্যাকে সুদৃষ্টিতে দেখিবে।

কিন্তু সুধীরকুমার আর তাহাকে ফিরিয়াও দেখিল না। এবং পাছে তাহার সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ ঘটে, এজন্য, মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীদের একটা বন্দোবস্ত করিয়া, পাটনার নূতন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে গেল। সেখানে অল্পকাল মধ্যে তাহার বিলক্ষণ পসার হইল। এবং ময়দানের ধারে সুন্দর বাটী কিনিয়া, গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনে একটুও শান্তি ছিল না; সে কেবলই ভাবিত, তাহার পরিণীতা পত্নী এখন কোথায়, কি ভাবে আছে? সে কত বড় হইয়াছে, কেমন সুন্দর হইয়াছে? সে কি তাহার কথা ভাবে? সে তাহার বহু অনুসন্ধান করিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও সন্ধান পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিলন

সন্ধ্যার অন্ধকারে, গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া, দুঃখিনী কুসুমকুমারী সজল নয়নে রাজ-পথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজপথের পরপারে ময়দান। ময়দানের পরপারে এই সুদৃশ্য প্রসাদটি কাহার? ঐ স্থানে কেহ করুণা করিয়া, এই নিরাশ্রয়াকে কি একটু আশ্রয় দিবে না?

দেখ, দেখ, ও কাহার গাড়ী আসিতেছে? কি সুন্দর ঘোটক! কুসুমকুমারীর মনে হইল, ঐ সুন্দর ঘোটকের পদতলে পড়িলে, তাহার জীবন সার্থক হইবে। সে

গাড়ীর তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইল। গাড়ীর ভিতর কে ও? তাহার ত আত্মহত্যা করা হইল না—ছয় বৎসর আগে বাসর ঘরে বাসরসঙ্গিনীগণের বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া, যাহাকে একাগ্র নয়নে দেখিয়াছিল; এতদিন, দিবারাত্র সে যে মূর্ত্তির পূজা করিয়াছে, আজ বুঝি সেই দেখা, সেই পূজা সার্থক হইল। গাড়ী বেগবান অশ্বের দ্বারা চালিত হইয়া, তাহার নয়নপথ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইলেও, সে গাড়ীর আরোহীকে চিনিল;—সে যে তাহারই স্বামী সুধীরকুমার! সে শকটের দিক হইতে চক্ষু ফিরাইল না; সেই চক্ষু সন্ধ্যার অন্ধকারে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

গাড়ীখানা সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোক একবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধবৃত্তাকার রাজপথ অতিক্রম করিয়া, ময়দানের পরপারে সেই সুদৃশ্য বাটীর গাড়ী-বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

কুসুমকুমারীও, মলিন ও ছিন্ন বসনে, আপনার অনিন্দ্য ও যৌবনদীপ্ত দেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই জনহীন তৃণক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সেই বাটীতে উপস্থিত হইল। দ্বারে দ্বারবান ছিল। তাহার নিকট সে ব্যারিষ্টার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা জানাইল।

দ্বারবান সুধীরকুমারের অফিসঘরে যাইয়া, তাহাকে খবর দিল যে, একজন স্ত্রীলোক তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে; এবং সে নিজ নাম বলে নাই।

কোন মকর্দ্দমা আছে মনে করিয়া, সুধীরকুমার স্ত্রীলোকটিকে অফিস ঘরেই আনিবার জন্য আদেশ দিল।

যখন কুসুমকুমারী সেই কক্ষে আনীত হইল, তখন সে স্বামী সন্দর্শন লালসায় এত বিহ্বল হইয়াছিল যে, কোন প্রকার দুর্ভাবনার কথা, তাহার পবিত্র অন্তরমধ্যে স্থান লাভ করে নাই। কিন্তু এক্ষণে স্বামীর সম্মুখে আসিয়া, তাহার হৃদয়মধ্যে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল।—যদি তিনি তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া, অন্য কোনও সুশিক্ষিতা সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া থাকেন; যদি দীর্ঘকাল অসহায় অবস্থায় বাস করায়, তাহাকে গ্রহণযোগ্য মনে না করেন? কিন্তু সাধ্বীদের মনে কোন আশঙ্কাই বেশীক্ষণ স্থান পায় না। কুসুমকুমারীরও মনে কোন ভয় স্থান পাইল না।

রমণী তাহার পদধূলি গ্রহণ করায় সুধীরকুমার কিছু সংকুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই—"

কুসুমকুমারী স্বামীর পদপ্রান্ত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুধীরকুমার তাহার মলিন ছিন্ন বসনের ভিতর দিয়া তাহার অপূর্ব্ব রূপের দীপ্তি দেখিল; কিন্তু তাহার বসনের মলিনতা দেখিয়া, তাহাকে কোন দরিদ্রা বঙ্গনারী মনে করিয়া তাহাকে 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করিল। সে করুণপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আবার বলিল, "তুমি বস। বসে' তোমার কি দরকার আছে বল।"

কুসুমকুমারী দেখিল, তাহার স্বামীর কথাগুলি করুণায় আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। সে স্বামীকে করুণাময় জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল। এবং স্ত্রীজন-সুলভ কৌশল অবলম্বন করিয়া কহিল, "আমার দুঃখের কথা আপনার স্ত্রীর কাছে বলবে।"

সুধীরকুমার বিস্মিত হইয়া, কুসুমকুমারীর দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আমার স্ত্রী?"

কুসুমকুমারী আপন কথার উত্তর শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। বুঝিল, স্বামী অন্য বিবাহ করেন নাই। কহিল, "কেন, আপনার কি স্ত্রী নেই? আপনি কি এখনও বিয়ে করেন নি?"

সুধীর। আমি ছ'বছর আগে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু আমার দোষে আমি সে স্ত্রীকে খুঁজে পাচ্ছিনে।

কুসুম। কেন? আপনি বকেছিলেন বুঝি? তাই তিনি পালিয়েছেন?

সুধীর। না, না। কলকাতাতে আমাদের বিয়ে হয়। তারপর, আমি যখন বিলাতে ছিলাম, তার বাপ মারা যাওয়ায়, সে তার মার সঙ্গে তাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে যায়। সেই পাড়াগাঁ কোথায়, বা তার নাম কি, আমরা জানিনা। কিন্তু আমার সে দুঃখের কথা

আর আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না। এখন তোমার কি দরকার বল।

কুসুম। আমার দরকার? আমি আশ্রয়হীনা; আমার স্বামী আমাকে গ্রহণ করেন না। আমি আশ্রয় চাই, স্বামী চাই।

সুধীর। ওঃ!—Restitution of conjugal right!—বুঝেছি! তা' এখন যাও। কাল সকালে কাগজ পত্র সাক্ষী টাক্ষী নিয়ে এস। নালিশ রুজু করতে হবে। তোমার স্বামী যদি তোমায় নিয়ে বসবাস করতে না চান, তাঁকে অন্ততঃ তোমার খোরাকী দিতে বাধ্য করব। আর দেখ, তোমার কাছ থেকে আমি এক পয়সা কি নেব না।

তথাপি কুসুমকুমারী দাঁড়াইয়া রহিল, এবং চলিয়া যাইবার কোন উদ্যোগই করিল না।

তাহা দেখিয়া সুধীরকুমার আবার বলিল, "তাহলে আজ যাও। কাল আবার এস।"

কুসুমকুমারী বলিল, "কোথায় যাব? আমি ত বলেছি, আমি আশ্রয়হীনা। আপনি আমায় আশ্রয় দিন।"

কুসুমকুমারী তাহার কোমল কণ্ঠস্বরে কি মিশাইয়া দিয়াছিল, জানি না; কিন্তু তাহাতেই সুধীরকুমারের শুষ্ক অন্তর ভিজিয়া গেল। সে আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, "তুমি পুরুষ হ'লে, তোমাকে আশ্রয় দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তুমি যে মেয়েমানুষ। পুরুষের এই স্ত্রীলোকহীন বাড়ীতে, অপরিচিতা তোমাকে কি করে আশ্রয় দেব?"

কুসুমকুমারী বলিল, "আপনি আমার খুব পরিচিত। আমি আপনাকে খুব জানি বলেই, আপনার আশ্রয়ে থাকতে চাই। আমি আপনার বাসন মেজে দেব, ঘর ঝাঁট দেব, কাপড় কেচে দেব; আর বলেন যদি, আপনার রান্না বান্নাও করবো।"

সুধীরকুমারের মনে কি একটা সন্দেহের উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার কি জান?"

কুসুমকুমারী বলিল, "আমি সব জানি; শুনবেন?" এই বলিয়া কুসুমকুমারী সুধীরকুমারের সকল পরিচয় প্রদান করিল। এমন কি, সে যে তারিখে, বিলাত যাইবার জন্য বোম্বাই গিয়াছিল, তাহাও বলিল।

শুনিয়া সুধীরকুমারের সন্দেহ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বল, কে তুমি? তুমিই কি কুসুমকুমারী?"

কুসুমকুমারী বলিল, "যদি তাই হই, আপনি কি আশ্রয় দেবেন?"

সুধীরকুমার হর্ষ ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া বলিল, "কেন দেব না? তাহলে যে এই বাড়ীই তোমার হবে।"

কুসুমকুমারী স্বামীর হর্ষোৎফুল্ল মুখ বিহ্বল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এতদিন কোথায় কি ভাবে......'

সুধীরকুমার বাধা দিয়া বলিল, "কিছুই জানতে চাইনে।—কোনও বিপথগামিনী স্ত্রীলোক এরকম ময়লা আর ছেঁড়া কাপড় পরে, স্বামীর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসে না, আর তার দাসী রাঁধুনী হতে চায় না। এস, এস, উপরে এস।'

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ঋতু-মঙ্গল

প্রথম বসন্ত দিনে মুকুলিত বনবীথিকায়
রোমাঞ্চিত কিশলয়ে, মুঞ্জরিত তরুলতিকায়,
আধ-জাগা কোকিলের কণ্ঠলীন অস্ফুট ঝঙ্কারে,
সলাজ-কুণ্ঠিত-গতি মলয়ের মৃদুল সঞ্চারে,
প্রথম-চুম্বন-নত থরথর মৌন লজ্জাবাসে
ফোট ফোট' কলিকায় অরুণিত সরম-আভাষে,
তোমারে হেরিয়াছিনু ব্রীড়াময়ী নবীনা কিশোরী
আধ-স্বপ্ন-জাগরণে ছায়াময় স্বপন-মাধুরী ;
সরম-নিমীল আঁখি, দ্বিধাভয়-দুরুদুরু হিয়া,
সে আনন্দ-শিহরণ ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া !

নিদাঘে বাঁধনহীন ঝটিকার উন্মাদ হিন্দোল,
তৃপ্তিহীন তিয়াসায় মদিরার অধীর হিল্লোল ;
উদ্দাম চপল বায়ে বনে বনে আকুল মর্ম্মর,
শুব্ধ অলি-গুঞ্জরণ, ভাষাহীন পিককণ্ঠস্বর ;
বিলুণ্ঠিত বনানীর কবরীর মঞ্জরী-পরাগ,
শিথিল গুণ্ঠন-বাস, লুপ্ত চারু অলক্তক-রাগ ;
ঝটিকা-দোদুল ক্ষুব্ধ বারিধির তীব্র হাহাশ্বাস,
ঝাঁপায়ে সিকতা-বুকে শ্রান্তিহীন তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস,
অধীর সে ঝঞ্ঝাদোল নিরন্তর বক্ষ বিমথিয়া,
সে আবেশ, সে হিন্দোল ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া !

বরষায় মুহুমুহু লুকোচুরী মান অভিমান,
চকিতে বিজলী-জ্বালা, কভু হাসি, সজল নয়ান ;
কভু বা মানিনী বসি মেঘ-ছায়া-আঁধার আননে
ছড়ায়ে কুন্তলরাশি আকাশের নীল বাতায়নে,
নিরোধি হিয়ার তলে দুরুদুরু কাঁদন চঞ্চল,
পলকে অশ্রুর ধারা চোখে ঝাঁপি বসন-অঞ্চল !
কভু বা কৌতুকময়ী চোখে জল মুখে মৃদুহাসি,
চপলা বালিকা সম বিলুণ্ঠিত বক্ষোপরে আসি,
ভাষাহীন আলাপন সুনিবিড় বাহুতে বাঁধিয়া,
সে হাস অশ্রুর লীলা ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া !

শরতের ঝলমল মেঘহীন নভোনীলিমায়
প্রথম হেরেছি তোমা নারীত্বের দীপ্ত গরিমায় !
প্রশান্ত মধুর হাসি, করুণায় মেদুর নয়ন,
গোপন অন্তরতলে জননীর নব জাগরণ !
ভাদরের ভরা নদী অবিক্ষুব্ধ অলস মন্থর,
অজানিত স্বপ্নাবেশে ঢলঢল লাবণ্য সুন্দর।
সেবাস্নেহে দশভুজা, কাঙ্গালের চিরমাতৃসমা,
নিখিল কল্যাণময়ী, মূর্ত্তিমতী শারদ-সুষমা,
হসিত শেফালী দামে কাশপুঞ্জে আনন্দ অমিয়া,
সে মাধুরী, সে মহিমা ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া !

হেমন্তে নেহারি আজ গৃহদেবী সন্তান-জননী,
সহনে ধরিত্রীসমা, করুণায় বিশ্ববিমোহিনী।
শস্যক্ষেত্রে ভরপূর শ্যামাঞ্চলে বিভব-ভাণ্ডার,
উৎসারিত নদীস্রোতে সঞ্জীবন স্তন্যসুধাধার,
স্নেহশঙ্কা-ম্লান আঁখি ছলছল কুহেলি-ছায়ায়,—
দাঁড়ায়ে গৌরবময়ী জননীর মৌন মহিমায় !
—বসন্ত সার্থক আজি, শরতের স্বপন সকল,
আকুল নিদাঘ-তৃষা, বরষার হাসি অশ্রুজল !
চিরপ্রেম-কোজাগর-পূর্ণিমায় অন্তরে জাগিয়া
সে স্মৃতি-স্বপন আজি ভুলি নাই—ভুলি নাই প্রিয়া !

এবার আসিছে শীত শুভ্র কেশ শিথিল চরণ,
জড়িমা-কুহেলি-বাসে আবরিয়া বিশীর্ণ যৌবন।
ঝরিত বল্লরীতরু, ফুটে-ওঠা ফুরালো এবার,
বুনে যাব বন ভরি' বসন্তের স্বপন আবার !
অনন্তের যাত্রাপথে পান্থ দুটি দাঁড়াইব ফিরে
ধরণীর পানে চাহি' অন্ধকার মহাসিন্ধুতীরে।
কে বলে হারায়ে যাব ?—জাগিব গো নব রূপ গানে
নব নব মধুমাসে নিখিলের যুগল পরাণে ;
অসীম গগনপথে দুটি তারা রহিব চাহিয়া,
কব কথা কাণে কাণে,—ভুলি নাই—
ভুলি নাই প্রিয়া !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

সেজদার চিকিৎসা

(গল্প)

পাড়ার লোক তাকে 'বুলি' বলে ডাকতো। ইংরাজী 'bully' শব্দ থেকে তার নামকরণ হয়নি, কারণ ও-শব্দের মানের সঙ্গে তার স্বভাবের কোন সাদৃশ্য ছিলনা। কে প্রথম ঐ নাম দেয় এবং কেন দেয়, তা কেউ-ই বলতে পারে না। যদিও কেউ একজন দিয়েছিল তা নিশ্চয়। কেন সে নাম সকলে বিনা ওজরে গ্রাহ্য করে নিলে, বা কি করে সে নাম সকলের মুখে চল্‌লো, তাও বলা কঠিন। পায়ে পায়ে সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে যেমন একটা হাঁটা পথ তৈরী হয় অথচ কেউ-ই জেনে শুনে ইচ্ছা করে' তাতে সাহায্য করেনা, এও অনেকটা সেম্‌নি।

বুলি ছিল কুকুরদের মধ্যে হরবোলা। সে নানান্ সুরে ডাকতে পারতো। সে চেনা লোক দেখলে যে রকম শব্দ করতো, ভিখারী দেখলে তা করতো না এবং ইতর প্রাণী দেখিলে সম্পূর্ণ অন্যরকম শব্দ করতো। ভোরবেলা ছাই-গাদার উপর দাঁড়িয়ে সে যখন ক্রমান্বয়ে তার সমুখের ও পিছনের পা দু'টোকে লম্বা করে দিয়ে হাই তুলতো, তখন তার মুখ দিয়ে বেরোত এক 'সংসার-অসার' সূচক উদাস সুর। দুপুরবেলা কোন অভদ্র পুরুষ-কুকুরের সঙ্গে ভোজনকালীন বাগ্‌বিতণ্ডার পর যখন সে তার লেজটাকে পেটের দিকে ঘুরিয়ে শুয়ে পড়তো, তখন তার মুখ দিয়ে বেরোত এক মর্ম্মস্পর্শী করুণ সুর—এবং গভীর রাতে গাছের পাতার খস্‌খস্ শব্দ শুনে সে যখন ঘুমের ঘোরেও কাণ খাড়া করে' উঠে বসতো, তখন তার মুখ দিয়ে বেরোত এক সগর্ব্ব 'যুদ্ধং দেহি' সুর।

বুলিকে কেউই কোনদিন পোষেনি, অথচ সে পাড়ার সকলেরই পোষ মেনেছিল। কোনো নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কারণের বশবর্ত্তী হ'য়ে সে সকলকেই আত্মীয়ের মত দেখতো কিনা জানিনা, তবে সে যে সাধারণ কুকুরের চেয়ে সামাজিক ও পরোপকারী বেশী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবল পেটের দায়ে মানুষের সেবা-ব্রত নিয়ে সে নিজের স্বাধীন জীবনকে আবদ্ধ ও ভারগ্রস্ত করেনি।

জগতে পরোপকার মানেই কতকগুলি লোকের উপকার। সকলের উপকার কেউই কখনো করতে পারেনা। কারণ, যাদেরই উপকার করতে যাও, তাদেরই অপকারীর অপকার করতে হয়। এই হিসাবে বুলি মাঝে মাঝে যা দু' একটা কায করে' বসতো, তাকে বৈষ্ণব ভাষায় অহেতুকী এবং গীতার ভাষায় নিষ্কাম হিংসা ভিন্ন কিছুই বলা যায় না।

সে নিজে স্ত্রী হলেও স্ত্রীজাতিকে বড় একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না। কিন্তু এজন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সে নিজেকে কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হ'তে দেয়নি—সুতরাং যারা তা দেয় তাদের উপর তার বিদ্বেষ ত স্বাভাবিক। প্রাচীন যুগের অনেক পুরুষও প্রভুর নামাঙ্কিত লোহার বালা গলায় পরতো; কিন্তু সে একটা চামড়ার বকলস দিয়েও কোনদিন তার গলা ঢাকেনি। তার অলঙ্কার-কুণ্ঠা এতই বেশী ছিল যে, সে চেন পর্য্যন্ত পরতে আপত্তি করতো।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কর্পোরেশন থেকে বগ্‌লসহীন কুকুর মারার হুকুম হল। সে দেখলে, গলা বাঁচাতে গেলে মাথা বাঁচানো দায়। সে দিনকতক সদর রাস্তা ছেড়ে চোর গলি দিয়ে ঘুরে বেড়ালে, তারপর একেবারেই নিরুদ্দেশ।

কিছুকাল তাকে আর দেখা গেলনা। পাড়ার লোক তার আশা ছেড়ে দেওয়া দূরে থাক, তাকে একরকম ভুলেই গেল। হঠাৎ সাত মাস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় সে ফিরে এল; তার সঙ্গে চারটী ছোট ছোট বাচ্চা।

হোক সে কুকুর, তারও মাতৃত্বের গৌরব তার শীর্ণ

দেহখানিকে যেন উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। সে নিজে আধপেটা খেয়েও যখন বাচ্চাগুলিকে প্রসন্নমুখে দুধ দিত, বা তাদের অকারণ অত্যাচার নীরবে সহ্য করতো, তখন মনে হতো তার ভিতর গান্ধারীর অপত্যস্নেহ ও নাইওবির সহিষ্ণুতা যুগপৎ বর্ত্তমান।

কিন্তু এ সত্ত্বেও সে ঠিক তার পূর্ব্বের আদর পেলেনা। অতীত যদি বড় হয়েও বর্ত্তমানে ফিরে আসে তবু সে তার পূর্ব্বের জায়গাটি আর দখল করিতে পারেনা। বুলিও তার সাবেক ছোট পরিসরটি ভর্ত্তি করতে পারলেনা; অনেকটা খালি থেকে গেল।

এই গরমিলের ধাক্কা সে যেন ঠিক সামলাতে পারলে না। তার শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগলো। সে তার নিজের জায়গায় বাচ্চাগুলিকে বহাল করে' দিয়ে, চেষ্টা করতে লাগলো পিছিয়ে পিছিয়ে জীবনের আসরের বাইরে চলে যেতে—কারণ তখন তার উপর এমন কারোই চোখ ছিলনা, যে তাকে ঠেকিয়ে ধরে রাখে।

তার বাচ্চাগুলির সঙ্গে তারা কোনই মিল ছিলনা—কি আকৃতিতে কি প্রকৃতিতে। তারা যেন heredityর সমস্ত নিয়ম ব্যর্থ করেই জন্মেছিল। বুলির মেটে-হলদে রং যে কি করে তার বাচ্চাদের গায়ে একটী আঁচড় রাখলে না তা বলাও যেমন শক্ত, তার নিরীহ ঠাণ্ডা মেজাজ যে কি করে উগ্র হঠকারিতায় পরিণত হলো তা বলাও তেম্‌নি।

বুলির একটী বাচ্চার রং ছিল সাদায় কালোয় মেশানো। তার পিঠ, লেজ, একটা কাণ ও একটা পা ছিল কালো, বাদবাকি সবই সাদা। তার মনটাও ছিল অনেকটা ঐরকম—খানিকটা বজ্জাতি আর খানিকটা সাধুতায় মেশানো। এককথায় সে ছিল ভিতরে বাইরে চকরা-বকরা।

গোড়াগুড়ি থেকেই আমি তাকে ভাল দেখতুম, তাই গোড়াগুড়ি থেকেই তার উপর আমার নজর ছিল। সে সব চেয়ে ছোট হ'লেও সব চেয়ে বেশী জোরালো, আর তার এতটা ফুর্ত্তি যে, সব ভাই-বোনেরা ঘুমোলেও সে নিজের মনে বসে খেলা করতো।

একদিন সে একটা অন্যায় কায করে বসলে। দুপুর বেলা সকলে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন সে নিঃশব্দে তার মায়ের সমস্ত দুধটুকু চুষে খেয়ে তার ঘুমন্ত মুখের পানে চুপ করে চেয়ে বসে' ছিল। বোধ হয় মায়ের সেবা করবার একটা বলবৎ ইচ্ছা তার মনের মধ্যে গজিয়ে উঠেছিল, কিন্তু কি প্রণালীতে কায করা উচিত তা বুঝতে না পেরে সে তার ছোট থাবাটীকে মায়ের নাকের উপর দু'তিন-বার বুলিয়ে দিলে। সমস্ত নাকটাকে কুঁচকে এবং দু'একবার সশব্দে ঝেড়ে নিয়ে বুলি ধচ্‌ মচ্‌ করে' উঠে বসলো। তখনো বাচ্চা তার থাবাটীকে উঁচুতে ধরে রেখেছিল। সুতরাং বুলির বুঝতে বাকি রইলো না কে তার বিশ্রামসুখ ভঙ্গ করেচে। সে তৎক্ষণাৎ একটা ছোট্ট খ্যাক্‌ম্যাক্‌ শব্দ করে বাচ্চার কাণের উপর তার ডা'ন হাতটা এমন জোরের সঙ্গে ফেললে যে বাচ্চাকে শুয়ে পড়তে হলো। সঙ্গে সঙ্গে বুলিও আবার শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঐ দুরন্ত বাচ্চাকে বোধ হয় ঘুম পাড়াবার জন্যেই তার মাথাটাকে অনেকক্ষণ হাত দিয়ে চেপে ধরে রইল। বুলি শুয়ে শুয়ে মধ্যে মধ্যে নাকটাকে মাটিতে ঘষতে লাগলো এবং বাচ্চা তার পেটের মধ্যে নিজেকে জড়সড় করে এবং তার এক দাদার পায়ের উপর একখানি হাত তুলে দিয়ে বোধ হয় অভিমানের বশেই 'ঘড় ঘড়' শব্দ করতে লাগলো।

এই ঘটনার পরদিনই আমি ঐ বাচ্চাটিকে নিজের বাড়ীতে এনে পুষতে লাগলুম। দেখলুম বুলি তাতে খুসীই হল। আমি বাচ্চাটির নাম দিলুম 'টম'। কেন এই টম নামটা তখন আমার পছন্দ হল তা মনে নেই, তবে তখন আমি টমটমে চড়তে ভালবাসতুম আর 'টম কাকার কুটীর' সবে পড়ে শেষ করেছি।

টমের চেহারা খুব নোদল-কোঁদল হয়ে উঠলো। তাকে আমি নিজে হাতে করে মাংস রেঁধে খাওয়াতুম, কারণ তার জন্যে স্বতন্ত্র পাচক রাখবার কথা বাড়ীতে পাড়তে সাহস হয়নি।

তার শক্তি ক্রমশ বাড়চে কি না তার পরীক্ষা আমি

প্রত্যহই করতুম, যদিও সে পরীক্ষা কতটা নিষ্ঠুরতার কাছ ঘেঁসে যেতো, তা তখন বুঝতুম না।

কিন্তু আমি, তাকে ভালবাসতুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে আদর্শ কুকুর তৈরী করা। সে-ও আমার শিক্ষা ও পরীক্ষার কঠোরতা উপযুক্ত শিষ্যের মত নীরবে সহ্য করতো।

আমার এক খুড়তুতো ভাই ছিলেন। তিনি দাদা হলেও মিত্র, কারণ তাঁতে আমাতে একক্রিয় ছিলুম। ঘর সাজানো, বাগান নিড়ানো, এ সব কাযে তিনি ভিন্ন কেউ আমাকে হাতে কলমে সাহায্য করতো না। তিনি টমকে মুখে করে' লণ্ঠন নিয়ে যাওয়া, সাঁতার কেটে বল কুড়িয়ে আনা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত করবার প্রস্তাব করলেন। আমি সম্মত হলুম। আমাদের সমবেত চেষ্টায় টম তিন চার মাসের মধ্যেই ঐ সমস্ত গুণ আত্মসাৎ করে ফেল্‌লে। দেখে শুনে আমাদের আনন্দ ও উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল।

টম নিজে নিজেই একটু আধটু শিকার করতে শিখলে। সে প্রথমত আরসোলা ও পরে গিরগিটী, শিকার করে নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিলে। সেজদা বল্লেন, "ওকে ম্যাষ্টিফ্ তৈরী করবো।" আমি বল্লুম—"না, সেণ্টবার্ণার্ড। সেণ্টবার্ণার্ডের গায়ে এত জোর যে ঘুমন্ত মানুষকে পিঠে করে নিয়ে চলে যায়।" সেজদা বল্লেন, "কিন্তু ম্যাষ্টিফের মত সাহস কারোই নেই—দস্তুরমত বাঘের সঙ্গে লড়ে।" অতঃপর অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হলো যে, ও দুয়ের কেউই কম নয়—টমকে ও দুই-ই হ'তে হবে।

একদিন কোথেকে দুটো বড় বড় অচেনা কুকুর আমাদের খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ীর উঠোনে ঢুকে পড়লো। সেজদা টমের গলার শিকল খুলে দিতে দিতে বল্লেন 'লুঃ টম—লুঃ'। বিদ্যুদ্বেগে টম তাদের দিকে ছুটে গেল—আমরাও পিছনে পিছনে ছুটলুম। সে কুকুর দু'টো কি জন্যে জানিনা কোনো প্রতিবাদ না করে পালিয়ে গেল। যাবার সময় টমের দিকে না চেয়ে আমাদের দিকেই দু একবার ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে গেল। টম নিজের কোর্টের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে পলাতকের উদ্দেশে একটা অশ্রুত-পূর্ব্ব বিদ্রূপের স্বর উচ্চারণ করলে। সেজদা চমকে উঠলেন। আমি বল্লুম, "ওর রূপোর চেন বক্‌লস করে দিতে হবে।"

সেজদা বল্লেন, "কিন্তু ওটা ত ভাল নয়।"

আমি বল্লুম "কোনটা?" "কেন, ঐ 'ভৌ' ডাক—ঐ ডাকাই ত এরপর 'ঘেউ' হয়ে যাবে।"

"বল কি?"

"বঃ, বিলাতী কুকুরের ডাক শোন নি? তাদের ডাক হচ্চে ভাক্, ভাক্।"

আমি চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "তা হলে উপায়?" সেজদা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"ন্যাজ কাটতে হবে আর কি,—ন্যাজ না কাটলে শোধরাবে না।"

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, "তাই নাকি?"

সেজদা গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন—"তা নয়?" সেজদার এই শেষ উত্তরটা গঠন হিসাবে প্রশ্ন-মূলক হলেও আমার সমস্ত প্রশ্ন ও সন্দেহকে নিরাশ করে দিলে। আমি তাঁর অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করলুম।

ন্যাজ কাটার পর টমের স্বভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হল বলে আমার মনে হল। আমি সেজদাকে বল্লুম, "আচ্ছা সেজদা ও ত আর আজকাল তেমন ডাকেনা।"

সেজদা সমজদারের মত মাথা নেড়ে বল্লেন, "ঐ ত বিলিতি কুকুরের দস্তুর।"

"কিন্তু ও একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়না?"

সেজদা একটু বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন—"তুমি কি চাও ও হাসবে নাচবে গাইবে?"

এর পর আর কোন কথা চলেনা বটে, কিন্তু আমার মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো।

একদিন সেজদা একটা বেড়ালের পিছনে লেলিয়ে

দিলেন। বেড়াল সর্‌সর্‌ করে একটা কুলগাছের উপর চড়ে' গা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—টম নীচে দাঁড়িয়ে 'উ উ' শব্দ করে সমুখের পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর টম একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। সেই ফাঁকে বেড়ালটা গাছ থেকে নেমে একদিকে চোঁচা দৌড় দিলে। টম ছুলাফেই তাকে ধরে ফেল্লে দেখে সে একটা কোণ নিলে। টম কি করবে বুঝতে না পেরে সেজদার মুখের দিকে চাইলে। সেজদা হাত নেড়ে ইসারা করলেন। টম বেড়ালের গায়ে হাত দিলে। বেরাল ফ্যাঁস্‌ করে টমের মুখে এমন ভয়ঙ্কর থোবনা মারলে যে টমের চোখের কোণ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি টমকে ধরে টেনে আনলুম বটে, কিন্তু আমার মনটা বড়ই ছোট হয়ে গেল।

সেজদা বল্লেন, "তা, ওর দোষ কি? বেড়ালের সঙ্গে কে পারে? বাঘও নয়। নৈলে বেড়ালকে বাঘের মাসী বলবে কেন?"

আমার ইচ্ছা হল বলি, "তাই যদি জানো তবে লেলিয়ে দিলে কেন?" কিন্তু চুপ করে গেলুম।

এরপর আমি নিজেই টমের বীরত্ব পরীক্ষা করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম। একদিন দুপুর বেলা আমাদের ডোবাটার ধারে একটা গো-হাড়গেল দেখতে পেলুম। ঐ জাতীয় জীবকে দেখলেই মনে কেমন একটা রাগ হয়—ওরা যেন কাকেও গ্রাহ্য করেনা। আমি "আ-তু" বলে টমকে ডাকলুম। টম দূর থেকে সাড়া দিয়ে তীরের মত বেগে ছুটে এল। পাছে ঝোঁক সামলাতে না পেরে আমার গায়ের উপর লাফিয়ে ওঠে, তাই আমি সরে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে গো-হাড়গেলকে দেখিয়ে দিলুম। টম আগে থেকেই তাকে দেখতে পেয়েছিল—কিন্তু যেই সে ধনুকের মত বেঁকে তার দিকে সাঁই সাঁই করে এগিয়ে গেল, অমনি গো-হাড়গেলটা ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং একডুব দিয়ে ওপারে উঠে যে কোথায় গেল তা দেখতে পেলুম না। টম কিন্তু ঠিক দেখেছিল। সে বোঁ করে পুকুরের পাড় দিয়ে ঘুরে গিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে পিঠ গলিয়ে, খড়ের গাদার চারদিকে ছুটোছুটি করে এবং কতকগুলো শুকনো খেজুর ডাল লাফিয়ে পার হয়ে একেবারে ফুলবাগানের মধ্যে উপস্থিত। সেখানে সে গো-হাড়গেলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েচে। আমি গিয়ে দেখি, টম তাকে আগল্‌চ্চে আর সে ফোঁ ফোঁ শব্দ করে প্রকাণ্ড দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেচে। আমাকে দেখেই টম সাহস পেয়ে তার গায়ে কামড় দিতে গেল কিন্তু সে তার কাঁটা কাঁটা লম্বা ল্যাজটাকে মাটির উপর আছড়ে এমন 'খড় খড় খটাং' শব্দ তুললে টমকে পাঁচ হাত পিছিয়ে দাঁড়াতে হল। মোটের উপর সে যুদ্ধে টম তার কিছুই করতে পারলেনা; সে অক্ষত দেহে একটা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

আমার একটু রাগ হলো। বাড়ীতে এসেই টমের পিঠে একটা ঝাঁটার কাঠির চাবুক কসিয়ে দিলুম। সে—'আঁউ' করে ডেকে উঠলো। সে ডাকের ভিতর যেন একটু বিদ্রোহের আভাস ছিল। তাই ফের আর এক ঘা চাবুক সপাং করে মারতেই সে ঘাড় কাৎ করে', একটা পা উপর দিকে বেঁকিয়ে এবং কাটা ল্যাজটাকে যতটা সম্ভব পেটের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে কাতর সুরে ডাকলে 'কিঁউ'। অমি আমার দুঃখ হল। তার গা ঝেড়ে দিয়ে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম, কারণ বুঝতে পারলুম সে বাধ্যতার সীমা অতিক্রম করেনি।

সেদিন সেজদা সমস্ত ব্যাপার শুনে বল্লেন, "দেখা যাচ্চে, ওর আর একটু তেজ হওয়া দরকার।"

আমি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি করলে হয়?" কারণ এ বিশ্বাসটুকু আমার ছিল যে এসব বিষয়ে তিনিই একমাত্র লোক যে একটা নির্ঘাৎ উপায় বাৎলাতে পারে।

নখ কামড়াতে কামড়াতে সেজদা বল্লেন, "করা যায়। সাত দিন অন্ধকার ঘরে পুরে রেখে দিলেই হল।"

"অন্ধকারে রাখলে তেজ বাড়ে?"

"নিশ্চয়ই; অন্ধকারই ত ভয়ের গোড়া। যার অন্ধকার সয়ে গেছে সে আর কিছুতেই ভয় পাবে না।"

এমনি অকাট্য যুক্তি সেজদার মুখেই সম্ভব। তাঁরই রায়ে সায় দিয়ে টমকে একটা অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে পূরে ফেললুম। সেজদা রোজ তাকে খাবার দিয়ে আসতেন।

সাতদিন পরে যখন টম বাইরে এল, তখন তার মুখের ভাব দেখে আমি আঁৎকে উঠলুম। সে মুখ যার পর নাই ঘোরাল এবং গম্ভীর হয়েচে। তার কপালে চিন্তার এবং আরও কি একটা দুর্ব্বোধ ভাবের রেখা পাশাপাশি ফুটে উঠেচে।

আমি সেজদাকে বল্লুম, "সেজদা, ব্যাপার ভাল বোধ হচ্চে না, ও যে ক্রমেই গম্ভীর হচ্চে।"

আমার কথায় কিছুমাত্র কাণ না দিয়ে সেজদা নিপুণভাবে টমকে নিরীক্ষণ করে বল্লেন, "এ রে!"

"কি সেজদা, কি হয়েচে?"

"কান খাড়া হয়ে যাচ্চে।"

"কাণ খাড়া হ'য়ে গেলে কি হয়?"

"দেশী হয়ে যায়। বিলিতি কুকুরের সঙ্গে ঐ খানেই ত তফাৎ। বিলিতি কুকুরের কাণ ভাঙাই থাকে।"

"তাই ত; এর কিছু করা যায় না?"

"যাবে না কেন? কাণ কাটতে হবে?"

"কাণ কাটাতে হবে!"

"হাঁ, একটা শির কেটে দেওয়া মাত্র।"

"আরো গম্ভীর হ'য়ে যাবে না ত?"

"হোক্ না। দেখেছ ত বুলডগ?—কি ভারিক্তিক চেহারা!"

"কিন্তু কোন্ দিন না কিছু করে' বসে।"

একথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে, সেজদা তখন ছুরী নিয়ে এলেন। আমাকে বল্লেন "টমকে ধরে বসে থাক।"

সেজদার ছুরী বোধ হয় একটা শির কাটতে গিয়ে দুটো কেটে ফেলেছিল, তাই টম একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার করে' তার এক পাশের ঠোঁটটাকে উপর দিকে তুলে ফেল্লে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার লাল মাড়ীর নীচ থেকে একটা লম্বা সাদা দাঁত ঝক্ ঝক করে উঠলো।

"আহাহা, ছেড়োনা ছেড়োনা" বলে সেজদা শাসিয়ে উঠলেন; "আর একটুখানি—এই কাণটা হলেই হয়।"

আমি আবার জোর করে টমকে ধরে' বসলুম। কিন্তু এবার যেই ছুরী চালানো অমনি টম আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার হাতের উপর তার সেই ঝক্‌ঝকে লম্বা দাঁতটাকে এমনি জোরে বসিয়ে দিলে যে, হাত দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো। ছুরি ফেলে লাফিয়ে উঠেই সেজদা টমকে চাবুক মারতে গেলেন, কিন্তু টম তাঁর দিকে এমন মূর্ত্তি ধরে' ছুটে গেলে যে, তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সেজদা ধুলো পড়া দিয়ে আমার হাতের রক্ত বন্ধ করতে করতে বল্লেন—"যা ভেবেছিলুম, তা করতে পারলুম না।"

আমি অত্যন্ত রেগে বলে উঠলুম—"ও হিংস্র হয়ে উঠেছে। ওকে আজই তাড়িয়ে দেব। আমি তখনই বলেছিলুম ওর ভাবগতিক ভাল নয়।"

সেজদা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"তাই দেখচি।"

"এ তোমারই চিকিৎসার ফল।"

"পাগল। ও যে আসলেই বিলিতি কুকুর নয়। বুলির বাচ্চা ত!"

আমার কান্না আসছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি হেসে উঠে বল্লুম—"তা বটে, খুব মনে করিয়ে দিয়েছ।"

তাড়িয়ে দেবার অপেক্ষা না করে টম নিজেই কোথায় সরে পড়েছিল; কিন্তু কি ভাগ্যি তখন অত জানতুম না, নৈলে কসৌলি কি গোঁদলপাড়ায় ছুটতে হতো। তবে এ কথা বলে রাখি যে টমের শেষ চিকিৎসার পর আঠারো বছর কেটে গেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

বঙ্গে শারদীয় সাহিত্য সম্মিলন

সভানেত্রী—শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবী।

আজ বাঙ্গালীর আনন্দের সীমা নাই। বঙ্গবাসীর সাধনের ধন বঙ্গ সাহিত্য স্বর্গরাজ্যে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সমগ্র বঙ্গের সাহিত্যিক মণ্ডলীর এক বিরাট্ সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাতে স্বয়ং বীণাপাণি সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিতে সম্মতা হইয়াছেন। শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে বোধনের দিন অপরাহ্ণে বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা নগরীর বিডন উদ্যানে এক বিশাল চন্দ্রাতপতলে সভার অধিবেশন হইবে। শরৎকাল-সুলভ পুষ্পপল্লবে এই সারস্বতকুঞ্জ সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছে। তাহার একাংশে কমল মালাবিলম্বিত মণিময় প্রকোষ্ঠে শতদল মণ্ডিত একটি রত্ন সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই দেবী ভারতীর আসন।

দেখিতে দেখিতে বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক মণ্ডলী দ্বারা সভাস্থল পরিপূর্ণ হইল। সকলের মুখই হর্ষোৎফুল্ল, সকলেই বীণাপাণির প্রসাদ লাভে কৃত কৃতার্থ। অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় অকস্মাৎ সভামণ্ডপ তীব্রোজ্জ্বল লোহিতালোকে উদ্ভাসিত হইল। সভাস্থ সকলে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই আবার তাঁহারা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ভগবতী বীণাপাণি রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বাগ্দেবীর দর্শনলাভে সভাস্থল আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইল, সরস্বতীর জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইল, এবং সভাস্থ গায়কমণ্ডলী ঐকতান বাদনের সহিত ধ্রুপদ রাগে বাগ্দেবীর আবাহন গীতি গান করিলেন।

নমস্তে নমস্তে নমস্তে।
জয় মা সরস্বতী, মহাদেবী ভারতী
জয় ব্রহ্ম সনাতনী নমস্তে।
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, বেদ প্রকাশিল
জয় তব মহিমা নমস্তে॥
কাব্য সঙ্গীত সুধা, শিল্প ললিত কলা
তব দিব্য বিভূতি নমস্তে।
ভক্ত হৃদি 'পরে কল্পলতিকা সম
অধিষ্ঠান কর এবে নমস্তে॥

সঙ্গীত শেষে সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বীণাপাণিকে নমস্কার করিলেন। সভানেত্রী দেবী ঈষৎ ম্লান হাস্যের সহিত তাঁহাদের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লোকেশ্বর সাহিত্যাচার্য্য গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

"আজ বাঙ্গলার কি শুভদিন। এই মর্ত্ত্যভূমে আজ স্বর্গের সুষমা বিকশিত হইয়াছে। আজ সুরাসুর নরের বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্রিলোকপূজ্যা মহাদেবী সরস্বতী আমাদের কাতর প্রার্থনায় সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদের চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছেন। চতুরানন ব্রহ্মা যাঁহার কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইয়া চারিবেদ প্রকাশ করিয়াছেন, সুরপতি ইন্দ্র নন্দন কাননে মন্দাকিনী বারি দ্বারা যাঁহার চরণযুগল ধৌত করিয়া পারিজাত পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা যাঁহার অভ্যর্থনা করেন, আমরা মর্ত্ত্যের মানবমণ্ডলী আজ কি দিয়া তাঁহার পূজা করিব? মাতঃ তোমার এই দীন সন্তানগণের একমাত্র সম্বল অশ্রুজল, আমরা সেই অশ্রুজলে তোমার ঐ রাজীব চরণ ধৌত করিতেছি।

"মাগো! তুমি বাল্মীকি ব্যাস, হোমর সেক্ষপীয়র, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি বিশ্ব-বরেণ্য মহাকবিকুলের জননী। এক সময়ে এই বঙ্গদেশে চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস,

কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ তোমার বর পুত্রগণ তোমার সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়া ভূভারতে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রিয়কবি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সেই গৌরবের সমধিক উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাও তোমার অসাধারণ কৃপার ফল সন্দেহ নাই। সেই বিশ্বকবি সংপ্রতি সুদূর চীন জাপান দেশে ভারতের বাণী প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়া আসিয়াছেন।

"ভারতের সেই বাণী এক সময়ে এই পুণ্যভূমি ভারতের অরণ্য হইতে ঋষির মুখে সামগানের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—"যদি আমি অমৃতত্ব লাভ না করিতে পারি তবে পৃথিবীপূর্ণ ধন লইয়া আমি কি করিব?" ইহাই ভারতের বাণী, ইহা বৈরাগ্যের কাহিনী, নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুজাতি এই নিবৃত্তিমার্গে চলিয়া এখন পৃথিবী হইতে একেবারে নির্ব্বাণ লাভের দাখিল হইয়াছে। তাই এখন ইহাদিগকে সেই নিবৃত্তিমার্গ ছাড়িয়া প্রবৃত্তিমার্গে চলিতে হইবে। অর্থাৎ চীন ও জাপানের পক্ষে এখন যাহা ঔষধ, ভারতের পক্ষে তাহা বিষ। আমরা সময় বুঝিয়া ভারতবাসীকে এই আসন্ন মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আত্মার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া যাহা মানুষকে নিয়ম সংযমের নিগড়ে বাঁধিয়া রাখে, আমরা সেই সকল প্রাচীন রীতি নীতি বর্জ্জনের পক্ষপাতী। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা "সবুজসংঘ," "নবযৌবনের দল" গঠন এবং সবুজসাহিত্য রচনা আরম্ভ করিয়াছি। এই সকল নবীন যুবক দল সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সমাজের আইনকানুন পদদলিত করিয়া ফুর্ত্তি করিয়া নাচিয়া বেড়াইবে। তাহাদের আমোদের জন্য নব বর্ষাধারায় জীবন প্রাপ্ত ব্যাঙের ছাতার ন্যায় সবুজসাহিত্য কাব্যে উপন্যাসে গল্পে রাশিকৃত গজাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু একদল লোক জুটিয়াছেন যাঁহারা ইহাকে কুলক্ষণ বলিয়া মনে করেন।

"কবির স্বাধীন আত্মপ্রকাশের আনন্দ হইতে রসের সৃষ্টি। ইহারই অন্য নাম আর্ট (art)। এই আর্ট বস্তুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরঙ্কুশ। তাহাকে রাশ পরাইয়া সংযত করিলে, তাহাকে গলা টিপিয়া মারা হয়। এই কারণে রসসৃষ্টির বেলায় সুনীতি কুনীতির কথা আদৌ উঠিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় উল্লিখিত প্রাচীনপন্থিদল কাব্য ও কথাসাহিত্যের মধ্যে নীতিশিক্ষার কথা টানিয়া আনিয়া আর্টকে জবাই করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান, নীতিজ্ঞানের কোন ধরাবাঁধা মাপকাটি নাই। প্রাচীন কালে যাহা দুর্নীত বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহা সুনীতি হইতে পারে। আবার প্রাচীনকালে যাহা সুনীত ছিল, এখন তাহা দুর্নীতি। এক স্ত্রীর পঞ্চস্বামী মহাভারতের সময়ে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয় নাই, এখন এক সময় পাঁচটি স্বামী নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একটির পরে আর একটি হইলে তাহাতে দোষ নাই। সতীত্ব বলিয়া একটা জিনিষ সীতা সাবিত্রীর আমলে খুব আদরণীয় ছিল, কিন্তু এই উন্নতিশীল যুগে উহাকে sancrosanct অর্থাৎ একটি অপরিবর্ত্তনীয় পবিত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সতীত্বরূপ কুসংস্কার হিন্দুসমাজে নারীজাতির মনুষ্যত্ব লাভের এক প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুগে যুগে নীতি ধর্ম্মের মূল্য বাড়ে ও কমে। "Revaluation of values"—অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রচলিত নীতির নূতন করিয়া দর কসা একান্ত আবশ্যক। আমরা কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই দর কসাকসি আরম্ভ করিয়াছি। আবশ্যক হইলে প্রাচীন মতরূপ শালগ্রামশিলাকে লগুড়াঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে সারবস্তু আছে কি না তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। আমরা ইন্দুরের ন্যায় সমাজের ভিত্তি খুঁড়িয়া সেখানে কোন সমাজ-সমস্যা লুকানো আছে কি না তাহা বাহির করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিতেছি। এইরূপে খুঁড়িতে খুঁড়িতে আমরা দেখি-

তেছি, সমাজের আবেষ্টনের ভিতরে প্রচলিত নীতির কোন পাকা ভিত্তি নাই, কেবল হাওয়ার উপর সমাজ এতদিন দাঁড়াইয়া আছে।

"আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা যে সকল সমস্যার অবতারণা করিতেছি, বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, তাহা বিলাত হইতে আমদানী। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে দেশের বার আনা লোক এমন সাহেব বনিয়া গিয়াছে। কারণ তাহারা রেলে ষ্টীমারে যাতায়াত করে, সার্ট কোট প্যান্ট পরিয়া বেলা দশটা পাঁচটায় আফিস আদালতে যায়, আফিসে গিয়া চেয়ার টেবিলে বসিয়া ইংরাজী ভাষায় লেখাপড়া করে। তাহাদের অন্তঃপুরবাসিনীরাও শাড়ীর নীচে সায়া সেমিজ পরেন। শাড়ী পরা মেম সাহেব এক হিসাবে এখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। সুতরাং তাহারা বিলাতী ফ্যাসনে প্রেম করিবে না কেন? আবার বালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে, রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে একটা খিচুরী সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। লণ্ডন যেমন পৃথিবীর কেন্দ্র, এই বালিগঞ্জ হইতেছে বাঙ্গালীসমাজের কেন্দ্র—যেখান হইতে নূতন নূতন ভাব ও নূতন নূতন সামাজিক আদর্শ অর্থাৎ ফ্যাসন বিকীর্ণ হইয়া বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সুতরাং নরনারীর প্রেমটা যে এখন সম্পূর্ণ বিবাহমূলক না হইয়া চায়ের টেবিলে সাহিত্য সঙ্গীত চর্চ্চার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিবে এবং একবার ভাঙ্গিয়া flirtation, coquetryর মধ্য দিয়া আবার গড়িয়া উঠিবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমরা সামাজিক উন্নতির অগ্রদূত স্বরূপ কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগের এই মহাবাণী প্রচার করিয়া সমাজ বিবর্ত্তনের সহায়তা করিতেছি, যথা—সুচিক্কণ পালিস্‌করা সুসভ্য উপায়ে স্বাদেশিকতা ও সাহিত্য সঙ্গীত-কলার মধ্য দিয়া পরপুরুষ অথবা পরনারীর সহিত প্রেম করা সম্পূর্ণ বৈধ, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। এ সংসারে প্রেমের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। পদ্মফুল যেমন কাদার মধ্যে ফুটিলেও তাহার গৌরবের হ্রাস হয় না, সেইরূপ প্রেমও অস্থানে কুস্থানে যেখানে সেখানে বিকসিত হইলেও তাহার পবিত্রতার হানি হয় না। সেই জন্য আমরা সকল অবস্থাতেই নরনারীর প্রেম ঘটাইয়া প্রেমের অপরাজেয়তা প্রতিপন্ন করিতেছি। কিন্তু একজন নীতিবাগীশ তথা রুচিবাগীশ তাহাতে সাহিত্যের স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া বায়সের ন্যায় কর্কশ চীৎকারে সারস্বত কুঞ্জের শান্তিভঙ্গ করিতেছে।

"সাহিত্যে রসসৃষ্টিই হইতেছে আসল কথা, তবে সে রস সুধার রস হউক বা সুরার রস হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বরং সুরার রসেই আনন্দের আতিশয্য, সুতরাং সাহিত্য-চর্চ্চার সার্থকতা অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হয়। কিন্তু এই সকল নীতি-বাদীর রসবোধ কিছুমাত্র নাই। সংপ্রতি কবীন্দ্র রবীন্দ্র-নাথ এবিষয়ে একটি গল্প বলিয়াছেন। অনাথ পিণ্ডদ নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধদেবের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিলেন। ধনীরা তাঁহাকে ধন আনিয়া দিলেন, শ্রেষ্ঠীরা তাঁহাকে বস্ত্র আনিয়া দিলেন, রাজ বাটীর বধূরা তাঁহাকে হীরা মুক্তার কণ্ঠী দিলেন। তিনি তাহার কিছুই ভিক্ষার ঝুলিতে গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে বেলা অবসানে একটি ভিক্ষুক মেয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার পরিধানের জীর্ণ চীরখানি প্রভুর নামে দান করিল। অনাথপিণ্ডদ তাহা প্রভুর উপযুক্ত দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ নীতিবাগীশও আছেন, যিনি এই গল্প শুনিয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়, কি করিলেন? ইহাতে যে সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হইল!" রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।" বাস্তবিকই উক্ত নীতি-বাগীশের যদি কিছুমাত্র রসবোধ থাকিত, তবে সেই ভিক্ষুক রমণী বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া আব্রু রক্ষা না করিয়া রাস্তার উপরে উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দান করিলেও তিনি কোন আপত্তির কারণ পাইতেন না। বরং

কবিবর নিজেই তাহাকে গাছের আড়ালে দাঁড় করাইয়া তাহার আব্রু রক্ষা করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যেরও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নীতিবাগীশের ইহাতেও সন্তোষ নাই। কবে ইহারা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গোপীদিগের বস্ত্র-হরণ ব্যাপারেও দুর্নীতি বলিয়া লজ্জায় চোক ঢাকিবেন!

"এইরূপে রস-সাহিত্যের বর্ত্তমান ধারা আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। এখন ভারতবর্ষে উপনিষদের সেই প্রাচীন নিবৃত্তি মার্গের বাণী আর খাটিবে না। এখন সবুজ-সাহিত্যের বাণীই ভারতকে উন্নতির সোপানে লইয়া যাইবে। সুখের বিষয় এখন বঙ্গের অনেক কৃতবিদ্য সাহিত্যিক এই জন্য সবুজ সাহিত্য সৃজনে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা আশা করি, আপনার করুণাবলে বঙ্গ-সাহিত্য তথা ভারতবর্ষ অচিরে উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিবে। মাতঃ ভারতি! আপনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় এই অভ্যর্থনা পাঠ করিয়া সভ্যমণ্ডলীর ঘন ঘন করতালির মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন সভাস্থ সমস্ত লোকের দৃষ্টি সভানেত্রীর সিংহাসনের প্রতি নিবদ্ধ হইল।

সভানেত্রী দেবী সরস্বতী তখন অতি মিহি সুরে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"আমার প্রিয় সন্তানগণ! আমি তোমাদের অভ্যর্থনায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। আমি তোমাদের ঐকান্তিক কামনায়, তোমাদের প্রবল ইচ্ছা শক্তির বলে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছি। সাধকদিগের হিতের জন্য নিরাকার ব্রহ্ম কখন কখন রূপ পরিগ্রহ করেন। আমিও সেইরূপ তোমাদের তীব্রসাধন বলে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত রূপ ধারণ করিয়াছি, এক কথায় আমি তোমাদেরই মনঃকল্পিত মানসী দেবতা। তোমরা যে প্রকারে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান করিতেছ তাহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর। কিন্তু আমি আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেছি না। দেবী ভগবতীর বোধন কাল উপস্থিত। তিনি অবিলম্বে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। স্বয়ং বীণাপাণি এখন তাঁহার সঙ্গে আগমন করিবেন। তিনিই "ভাল সরস্বতী।" আমার প্রকৃত নাম "দুষ্টা সরস্বতী।" আমি এখনই বিদায় লইতেছি।"

এই বলিয়া সভানেত্রী অন্তর্হিত হইলেন। এই সময়ে চারিদিকে বোধনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। নেত্র তৃপ্তিকর সুস্নিগ্ধ দিব্যজ্যোতিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল। দিঙ্মণ্ডল স্বর্গীয় পবিত্র ধূপধুনা চন্দন গন্ধে আমোদিত হইল। সাহিত্যিক সভ্য বৃন্দ ভগবতীর উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

স্পর্শমণি

(গল্প)

কাঞ্চনপুরের জমীদার কুমারনাথ রায়ের ছোট মেয়ে পুষ্পরাণীর যে রাত্রে বিবাহ হইবে, বর বিবাহ সভা হইতে উঠিবামাত্র পুরনারীরা সকলে একবাক্যে বলিল —"হাঁ। জামাই বেশ, তবে আগের তিনটি জামাই, বলতে নেই, যেমন হয়েছে তেমন নয়।" জামাই ছাদ্‌নাতলায় পৌঁছিবার আগেই চুপি চুপি অনেকেই বলা কহা করিল—"জামাই কেমন যেন কাটখোট্টা ধরণের, তার উপর রং কালো তো আছেই। জামাই হবে পাকা

জলার্থিনী।

(কমলিনী সাহিত্য-মন্দিরের সৌজন্যে)

Bengal Art Press, 41, Shikdar Bagan St

সোণার বর্ণ, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, তবে না?" পুষ্পরাণীর মেজদিদির কাণে কথাটা যাইবামাত্র সে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"এখন থেকে আপনারা ওসব কথা কেন বলাবলি কচ্ছেন? পুরুষের একটু রং ময়লা হলে কোন দোষ হয় না। জামাইয়ের গুণ তো আপনারা জানেন না। এমন গুণের জামাই হয় না।"

ইহার পরে কথাটা তখনকার মত বন্ধ হইল, এই মাত্র।

পুষ্পরাণী এ সব কথাবার্ত্তা সব শুনিয়াছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠা বলিয়া সে বাবার অতিরিক্ত আদর পাইয়া আসিয়াছে; তাহার রূপের প্রশংসাও সে সকলের মুখে শুনিয়াছে; পিতাও অনেকবার আদর করিয়া বলিয়াছেন পুষ্পের বর সব চেয়ে ভাল আনিতে হইবে। সেই বর সম্বন্ধে এই সব আলোচনা শুনিয়া তাহার মন, বরকে না দেখিবার আগেই, বরের উপর বিরূপ হইয়া রহিল।

শুভদৃষ্টির সময় মনের সে বিরাগ বাড়িল বই কমিল না। একবার মাত্র চাহিয়া সে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়াছিল।

বাসরঘরেও বর কোনও ললনার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইল না। বর গান গাহিতে জানে না, আপনি তো রসিকতা করিতে পারেই না, অপরে রসিকতা করিলে তাহার মূল্যও যে বুঝিতে পারে তাহার ভাবে এটুকুও বুঝাইল না।

বরের পরণে কৌষের বসনের পরিবর্ত্তে সাদাসিদা সূতার কাপড় ছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া পাড়ার একটি সুসজ্জিতা যুবতী বলিল—"আচ্ছা, আপনি বে'র দিন সাদা কাপড় পরে এলেন কি বলে?"

বর বলিল—"এমনি, কোন বিশেষ কারণ নেই।"

যুবতী বলিল—"তবু? কারণ বিনা কি কার্য্য হয়?"

বর বলিল—"আমার সাদা কাপড়ই ভাল লাগে।"

"তাই জন্যে বের দিনও সাদা কাপড়ে আসতে হবে? এমন একটা শুভ কায তার কোন মর্য্যাদা নেই? আপনি বোধ হয় আমাদের পুষ্পরাণীরও মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারবেন না।"—যুবতী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল।

বর অতি মৃদু হাসিয়া বলিল—"ভয় পাবেন না, আমি বিবাহের কোন অমর্য্যাদা করিনি এবং আপনাদের পুষ্পরাণীরও কোন অমর্য্যাদা করব না,—অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত তো সে রকম কোন দুরভিসন্ধি নেই।"

এক যুবতী বলিল—"এই যে বর কথা কইতে জানে লো।"

অপরা বলিল—"ক্রমশঃ বুলি ফুটছে।"

পুষ্পরাণীর তিন দিদিই বাসর ঘরে উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পের মেজদিদির এই রকম কথাবার্ত্তা ভাল লাগিতেছিল না। সে বলিল—"তা ঠিক কথা বলেছেন; তার জন্যে কেন তোমরা এত সব ঠাট্টা কর্‌ছ?"

তখন কেহ বলিল—"এরি মধ্যে এত দরদ! দেখিস ভাই—"

বলিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তাহার অর্থ আরও বাড়াইয়া দিল।

কেহ বলিল—"তোমার ভগ্নিপতির আমরা কোনো অঙ্গহানি করিনি, বেশ করে বাজিয়ে নাও ভাই।"

একজন ইহাও বলিল—"তোর আপনার জন তুই কথা ক, আমরা না হয় উঠি।"

"এ জানিনে যে বাসর ঘরে বরের সঙ্গে শালীকে ছাড়া আর কাউকে কথা কইতে নেই।" বলিয়া অপর একজন এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিল; কারণ ইহার পরেই পুষ্পের মেজদিদি অত্যন্ত বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পরিহাস-কারিণীরাও রাগ করিয়া উঠিতেছিলেন; কিন্তু পুষ্পের বড়দিদি ও সেজদিদি তাঁহাদের অনুরোধ উপরোধ করিয়া বসাইল, মিষ্ট কথায় তাঁহাদের ক্রোধ শান্ত করিল।

একজন বলিল—"কি এমন অন্যায় কথা বলেছি বল তো ভাই।"

বড়দিদি বলিল—"দুর্গার ঐ এক ধারা। ঠাট্টা তামাসা বোঝে না।"

তখন নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিল।

"এবার হতে তাহলে বাসরঘরে শুধু গীতা পাঠ করানো হবে।"

"গীতা কি ভাই ?"

"যেমন রামায়ণ মহাভারত আছে না, সেই রকম একখানি ধর্ম্মের বই সংস্কৃতে লেখা।"

"তুইও তো ভাই কম লেখা-পড়া শিখিস্‌নি—তোর তো দুর্গার মত অত ঢং নেই।"

"ঢং যার থাকে তারই থাকে—সবারই কি হয় ?"

"এ যেন বাসর ঘর বলেই মনে হচ্ছে না। গা ভাই বিমলা তুই একটা গান গা। বর তো শোনালে না, তুই-ই একটা বরকে শুনিয়ে দে।"

তারপর অনেকবার 'না' বলিয়া, অনেক অনুরোধ ও প্রশংসা উপভোগ করিয়া বিদুষী বিমলা কয়েকটি নিছক প্রেমের গান গাহিয়া বাসর ঘরের মান রক্ষা করিল।

পুষ্পরাণী ঘোমটার মধ্য হইতে বরের অকর্ম্মণ্যতা ও রূপহীনতার জন্য মনে মনে চটিতেছিল। সে যে এই স্বামীকে কিছুতেই ভালবাসিবে না তাহা ইহারই মধ্যে এক রকম প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছিল।

(২)

পুষ্পরাণীর বড় তিন বোনের নাম যথাক্রমে শ্যামা, দুর্গা ও তারা। তারপর তিন ভাই তাহাদেরও সব ঠাকুর দেবতার নাম। গৃহিণীর কনিষ্ঠ পুত্র জন্মাইবার পর ৬।৭ বৎসর আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সকলেই যখন ভাবিয়াছিল আর সন্তান হইবে না ; এমন সময় পুষ্পরাণীর জন্ম হয়। গৃহিণীর সাধ হয় এই মেয়েটির একটু সৌখীন গোছের নাম রাখা হয়। তার পর নবীন ও নবীনাদের সহিত পরামর্শ ও গবেষণাদি করিয়া মেয়ের নাম পুষ্পরাণী রাখা হয়।

বলা বাহুল্য এসব ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে—মেয়েটিকে যথেষ্ট আদর দেওয়া হইয়াছিল। জমিদারের মেয়ে—বাপের ঐশ্বর্য্য, মায়ের আদর, দাস দাসী ও আশ্রিত আশ্রিতাদের বহু চাটুবাক্য ও ভবিষ্যদ্বাণী মেয়েটিকে যথেষ্টই বিচলিত করিয়াছিল। তাহার অনিন্দ্য রূপ ও উদীয়মান যৌবনও এবিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মাষ্টার রাখিয়া মেয়েটিকে লেখা-পড়াও কিছু শেখান হইয়াছি। কুমারনাথ মেয়েটির জন্য সর্ব্বাংশে গুণবান্ পাত্রই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে রকম পাত্র পাওয়া যায় না বলিয়াই হউক্ বা পুষ্পের অদৃষ্টে সে রকম পাত্র নাই বলিয়াই হউক বর্ত্তমান বরের চেয়ে ভাল পাত্র পাওয়া গেল না। এই অনুসন্ধানের ফলে মেয়ের বয়সও ষোল হইয়া গিয়াছিল। এই পাত্রটির দোষের মধ্যে এই যে ইহার রং একটু ময়লা আর 'বাবু বাবু' গোছের চেহারা মোটেই নয়।

'একেবারে রাজপুত্রের মত জামাই লইয়া আসিব' এই কথা সকলে বার বার বলিয়া মেয়েটির মাথা খারাপ না করিয়া দিলে এবং বিবাহের রাত্রে ইহা লইয়া সমালোচনা না করিলে মেয়েটি স্বামীর কোনই দোষ বাহির করিতে পারিত না। পরদিন প্রভাতে যাত্রার সময় পুষ্পরাণী কাঁদিয়া ভাসাইল। বাপ মায়ের চোখে তো জল আসিয়াছিলই কিন্তু পুষ্পকে অত কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহারা আরও কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতে পারেন নাই যে তাঁহাদের পুষ্পরাণীর অশ্রুজলে কতটা রাগ, কতটা বা দুঃখ আছে। পুষ্পরাণীর মনে হইতেছিল যে পিতা, মাতা, বিশেষ করিয়া পিতা তাহাকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। কোথায় কয় বোনের মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে সব চেয়ে ভাল, সকলে বলিবে হাঁ। পাত্র বটে, যদি মেয়ের বিবাহ দিতে হয় তো এই রকম বিবাহই যেন লোকে দেয় ;—তা নয় এমন স্বামীর হাতে বাবা সমর্পণ করিলেন যাহাকে দেখিয়া বিবাহ রাত্রেই লোকে মুখ সিঁটকাইল। কোথায় সবাই তাহার ভাগ্যে ঈর্ষা করিবে, না সবাই তাহাকে সহানুভূতি দেখাইতেছে ;—কেবল মেজদিদি ছাড়া। তা অমন সুন্দর রূপবান্ স্বামী পাইলে সকলেই মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিতে পারে।

পুষ্প সকালে বাহির হইয়া অপরাহ্ণে স্বামীর সহিত

শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইল। বারাসতে তাহার শ্বশুরবাড়ী। বাড়ীটি দ্বিতল ও সম্পূর্ণ বাসোপযোগী হইলেও পুষ্পরাণীর তাহাতে মন উঠিল না। রাজপুত্রের মত স্বামী হইলে বাড়ী খানি কি রকম হয় তাহার যে ধারণা পুষ্পরাণী এত দিন ধরিয়া মনের মধ্যে পোষণ করিয়াছিল, সে ধরণাতে তাহার অনেকখানি আঘাত লাগিল। স্বামী ত রাজপুত্রের মত নয়ই, অন্ততঃ বাড়ীখানাও যদি রাজবাড়ীর মত হইত তাহা হইলেও পুষ্প হয়ত কতকটা সান্ত্বনা পাইত; কিন্তু তাহা হইতেও সে বঞ্চিত হইল।

পুষ্প দেখিল, তাহার স্বামী দেবদাসের কাহারও উপর প্রভুত্ব নাই; বরং বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই আব্দার হুকুম যা কিছু সব তাহার স্বামীর উপরেই। বাপমায়ের সেবা করা উচিত বটে কিন্তু তাঁহাদের কখন কি দরকার হইবে তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকা, দরকার জানিবামাত্র যেন তাহা করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাওয়া ইহা পুষ্পের কাছে চাকরের চেয়েও হীন হইয়া থাকা বলিয়া মনে হইল। ভাগিনেয়ের জ্বর হইয়াছে কাহারও কাছে থাকিতেছে না, দাও তাহাকে দেবদাসের কাছে ফেলিয়া। ছোট দেবর মাষ্টারের কাছে পড়িতেছে না, দাও তাহাকে দেবদাসের কাছে পাঠাইয়া। শ্বশুরের হঠাৎ দাস্ত বমি হইল, শাশুড়ীকে সরাইয়া দিয়া তাহার স্বামী স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া, ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ আনাইয়া, রাত্রি জাগিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া হাসিমুখে আসিয়া সংবাদ দিল আর কোন ভয় নাই। বিবাহ বাড়ীতে বেশীরকম খাইয়া ঝির ছেলেটার কলেরার মত হইল, দেবদাস কি না স্বেচ্ছায় গিয়া তাহারও সেবার ভার লইল। সেই কথা আবার তাহার শাশুড়ী সবারই কাছে গর্ব্ব করিয়া বলিয়া বেড়াইলেন, আর চোখের জল ফেলিতেও কসুর করিলেন না। ইহাতে চোখের জল কিসে আসে পুষ্প তাহা খুঁজিয়া পাইল না। ঝি মাগিটারই কি স্পর্দ্ধা কম! সেও বলে কি না— আহা দেবু বাড়ীতে না থাকলে আমরা চোখে অন্ধকার দেখি। বল্লাম, বাবা তুমি ওঠ, আমি ওসব পরের করে দিই; তা বাবা হেসে বল্লে কি—সত্যর অসুখ হলেও আমি যা করতাম এর জন্যেও তাই করব; তুমি যাও দেখি, মাসী, অন্য কাজ দেখ গে।" ঝি আবার মাসী! লজ্জাও করেনা এদের। পুষ্পকে আবার ঝি একদিন বলে কি না—"তোমাকে আর কি বলব বৌমা—তুমি যেন আমার দেবুর যুগ্যি হোয়ো।"

পুষ্প শুনিয়া খুব চটিয়া গেল। কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। মনে মনে করিল—ঝিয়ের বুদ্ধি আর ইহার চেয়ে কি বেশী হইবে? দেবুর যুগ্যি হোয়ো মানে দেবু যেমন বাড়ীসুদ্ধ লোকের চাকর তুমি তেমনি বাড়ীসুদ্ধ লোকের ঝি হোয়ো। মরণ আর কি!

এ কথাটি পুষ্পের অনেকবার মনে হইল যে, তাহার স্বামীর নামটা দেবদাস না হইয়া মনুষ্যদাস হইলেই মানাইত ভাল।

রাত্রে সকলের আহারাদি হইয়া গেলে পুষ্প ঘরে আসিত। তাহার ইচ্ছা হইত অন্য ঘরে গিয়া পৃথক শয়ন করে। কিন্তু বিবাহের বধূ আসিয়া সেটা করিলে ভাল দেখায় না বলিয়া পুষ্প চাপিয়া যাইত। ঘরে আসিয়া দেখিত তাহার স্বামী পিছনের দিকে আলো রাখিয়া একখানা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া বই পড়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এক রাত্রে হাসিমুখে তাহার স্বামী হাত ধরিয়া অভ্যর্থনা করিয়া খাটের উপর বসাইতে আসিয়াছিল, পুষ্প সবেগে আপনার হাতখানি সরাইয়া লইয়া শয্যার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর হইতে দেবদাস সুধু হাসিমুখে পুষ্পকে অভ্যর্থনা করিত। বলিত—তুমি সেদিন রাগ করিয়াছিলে তাই বসিয়া বসিয়াই তোমাকে আহ্বান করিতেছি। কিন্তু এ রাগ তোমার বেশীদিন থাকিবে না।

পুষ্প ভাবিত, তাহার স্বামীর লজ্জা বা ঘৃণা কিছুই নাই। স্বামীও যদি পুষ্পের উপর উল্টা রাগ করিত তবে হয়ত পুষ্প তাহার মধ্যে একটা মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া পাইত। স্বামীর উপর পুষ্পের প্রায় একটা ঘৃণাই জন্মিল।

অনেক রাত্রে যদি কোনদিন ঘুম ভাঙ্গিত, পুষ্প

দেখিত স্বামী সেই একইভাবে পড়িয়া যাইতেছে। যে শুধু পড়া আর সকলের সেবা, এই দুটা জিনিষ ছাড়া আর কিছু জানে না, সে আবার মানুষ! পুষ্প তারপর ঘুমাইয়া পড়িত। দেবদাস গভীর রাত্রে কখন আলো নিভাইয়া শয্যার একপাশে আসিয়া শুইয়া পড়িত তাহা পুষ্প জানিতেও পারিত না। সকালে যখন পুষ্পের ঘুম ভাঙ্গিত তাহার আগেই দেবদাস কখন বাহির হইয়া যাইত।

শ্বশুরের ইচ্ছাক্রমে প্রথমবার আসিয়াই পুষ্পকে শ্বশুরবাড়ী একুশ দিন থাকিতে হইল। শ্বশুর পুষ্পের পিতাকে লিখিয়াছিলেন—"দেবদাস হয় ত আবার কতদিন পরে আসিবে সেজন্য বধূমাতাকে একুশ দিন রাখিব। ঠিক একুশ দিন পরে দেবদাসই বধূমাতাকে ও বাটীতে পৌছাইয়া ওখানে দিন ৪৫ থাকিয়া কার্য্য স্থানে যাত্রা করিবে। আপনি বধূমাতার জন্য চিন্তিত হইবেন না।'

একুশ দিন পরে যখন দেবদাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, পুষ্প দেখিল বাড়ীর মধ্যে যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিতে বসিয়াছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ী হইতে বাড়ীর ঝি চাকর দ্বারবান পর্য্যন্ত সবারই ম্লান মুখ, সকলেরই চোখে জল। তাহার স্বামীর চক্ষুও শুষ্ক নহে। পুষ্প ভাবিল, বিনা মাহিনায় এমন ভৃত্য প্রায় পাওয়া যাইবে না তাই সকলেরই এতখানি আপশোষ! ইহার যে অপর কোন দিক থাকিতে পারে তাহা পুষ্পের মাথায় আসিল না।

যাত্রার সময়ে শ্বাশুড়ী পুষ্পের চিবুকে হাত রাখিয়া সজল নয়নে বলিলেন—"আবার শীগ্‌গির এস মা। দেবুর পূজোর ছুট হইলেই আবার তোমাকে নিয়ে আস্‌ব।"

পুষ্প মনে মনে ভাবিল—হ্যাঁ সে এবার ভাল করিয়াই আসিবে। এ বাড়ীতে আসিয়া দাস্যবৃত্তি করা তাহার পোষাইবে না।

পুষ্প গাড়ীতে উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

(৩)

দেবদাস ভাগলপুরের এক বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। বাড়ীতে দেবদাসকে দেখিলে পরিচয় না জানিলে কেহ মনও করিতে পারিত না যে এই সর্ব্ববিধ আড়ম্বরশূন্য অত্যন্ত সাদাসিদা লোকটি অতবড় দায়িত্ব পূর্ণ কায করিয়া থাকে। পিতামাতা বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, সে জন্য দেবদাস বামুন চাকর ও কতকগুলি ছাত্র লইয়া থাকে। বড় ছুটি পাইলেই বাড়ী যায়। দেবদাসের বিবাহ এক বৎসরের উপর হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে পুষ্পের মনের ভাব বদলায় নাই। ভাগলপুরে সে একবারও আসে নাই।

পুষ্পের শ্বশুর শ্বশুড়ী এই এক বৎসরে এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে পুষ্প দেবদাসের মর্য্যাদা বুঝে নাই। অমন সর্ব্বগুণে গুণান্বিত পুত্র তাঁহাদের দোষে অসুখী হইবে ইহা তাঁহাদের প্রাণে বড়ই বাজিয়াছিল। কারণ তাঁহারাই তো পছন্দ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

তখন অগ্রহায়ণ মাস। কর্ত্তা গৃহিণী পরামর্শ করিয়া দুইজনে মিলিয়া বৈবাহিকের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈবাহিককে সব কথা বলিয়া তাহার পরদিনই পুষ্পকে লইয়া তাঁহারা ভাগলপুরে রওনা হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে কেবল পুত্রকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন—বৌমাকে লইয়া আমরা যাইতেছি, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক রাখিও।

পুষ্পের না বলিবার উপায় ছিল না, তাই আসিতে হইল। পিতার অনিচ্ছা সত্বেও তাহার মা নানা অজুহাত দেখাইয়া এতদিন শ্বশুর বাড়ী না পাঠাইয়া পারিয়াছিলেন। এবারেও তাহার কান্না দেখিয়া তাহার মা একটু সুর তুলিয়াছিলেন। তাহার পিতার কাছে বলিয়াছিলেন, "একেবারে অতদূরে জামাইয়ের কাছে একা যাবে মেয়ে!" পুষ্পের পিতা আগে হইতেই এই সব লইয়া একটু বিরক্ত ছিলেন। একথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমার মেয়ের চেয়ে ঢের অল্প বয়সের মেয়ে ওর চেয়ে দূরেও যাচ্ছে, আর জামাইয়ের কাছে লোকে মেয়েকে পাঠিয়েই থাকে, সেটা এমন বিশেষ অন্যায় কায নয়।"

তারপর পুষ্প অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, আনিবার জন্য

মাকে মাথার দিব্য দিয়া স্বামীর কাছে যাত্রা করিয়াছিল। দেবদাস অল্প সময়ের মধ্যেই সব সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। বামুন চাকর ছিলই, টেলিগ্রাম পাইবামাত্র একটা দাই ঠিক করিয়া যথাসময়ে আপনি ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাগলপুরে আসিয়া পুষ্পের মন্দ লাগিল না। গঙ্গার ধারে সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ, কোন কিছুর অসুবিধা নাই, সকলেই তাহার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত—এগুলি পুষ্পের ভালই লাগিয়াছিল। পুষ্প লক্ষ্য করিয়া দেখিল, প্রায় দুই বৎসরে তাহার স্বামীর কোনই উন্নতি হয় নাই—না আকৃতিতে, না আবরণে। এখানে আসিয়া পুষ্প আর একটা উৎপাত দেখিল—তাহা যখন তখন ছেলের দলের উৎপাত। এ যেন তাহাদেরই ঘর বাড়ী! পুষ্প শুনিল, আগে তাহারা বাড়ীর ভিতরেই আসিত, সে আসার পর হইতে ভিতরে আসা বন্ধ করিয়াছে। এক পাল ছেলে ত বাহিরের একটা অংশে মন্দির চূড়ায় অশ্বথ গাছের মত বাসা বাঁধিয়াছে। বাড়ীটাকে ভূমিসাৎ না করিয়া তাহারা আর নড়িবে না।

তারপর এদিকে পিতৃমাতৃসেবার তো সীমা নাই। সকলের সামনে নিজহাতে পিতাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেও তাহার স্বামীর মনে লজ্জা হইল না। সকলের সম্মুখে গর্ব্ব করিয়া সে কি পরিচয় দেওয়া! স্বয়ং নারায়ণ যদি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া দু এক দিনের জন্ম ভক্তের আলয়ে আসেন তাহা হইলে সে ভক্তও বোধ হয় তাহার দেবতার জন্য অত ব্যস্ত হয় না!

পুষ্পের জন্যও দেবদাস কম ব্যস্ত হইত না। কিন্তু সেটা তাহার কাছে খুব বেশী বলিয়া মনে হইল না। পুষ্পের চা খাওয়া অভ্যাস, তাই বিবাহের সময়েই পুষ্পের পিতা ষ্টোভ চা পেয়ালা ইত্যাদি চায়ের সরঞ্জাম কন্যার সহিত দিয়াছিলেন। দেবদাস পুষ্পের আসার সংবাদ পাইবামাত্র ঐ সমস্ত সরঞ্জাম এক প্রস্থ নিজে বাজারে গিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। পুষ্প কিন্তু আসিয়া অবধি নিজের জিনিষই সব ব্যবহার করিতে লাগিল।

অসন্তোষের কোন কারণ না থাকিলেও পুষ্প মুখ ভার করিয়া থাকিত, পুষ্পকে সুখী করিবার চেষ্টাতেই সে নিজে সুখী হইত। নিজে বিলাসিতার দিক দিয়া না গেলেও পুষ্পের জন্ম সে কোন জিনিষের অপ্রতুল রাখিল না। সর্ব্বোপরি তাহার হৃদয়ের নির্ম্মল ভালবাসা দিয়া সে পুষ্পকে অভিনন্দিত করিয়া লইল। পুষ্পের সুন্দর মুখ দেখিয়া তাহাকে কাছে পাইয়াই দেবদাসের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পুষ্পের যে কোন ক্ষোভ বা বিরক্তির কারণ থাকিতে পারে তাহ দেবদাসের মনেও হইল না।

দেবদাসের পিতামাতার চক্ষু কিন্তু পুষ্প এড়াইতে পারিল না। পুত্রের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ দেখিয়া মাতা নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, এমন স্বামী লইয়া যে নারী সুখী হইতে পারিল না তাহার অদৃষ্টে কি আছে বিধাতাই জানেন।

ঠিক এক সপ্তাহ থাকিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া তাঁহারা গৃহযাত্রা করিলেন।

দেশের আত্মীয়, পরিজন, বৈষয়িক কার্য্য তদুপরি বিগ্রহের সেবা ফেলিয়া তাঁহাদের বেশী দিন থাকিবার উপায় ছিল না। সজল চক্ষে দেবদাস পিতামাতাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে দেবদাসের পিতা বলিলেন, "দেখেছ—দেবু এখনও যেন ঠিক সেই বালক আছে, এখনও আমাদের ছেড়ে থাকতে ওর কষ্ট হয়। এমন ছেলে হয় না!"

দেবদাসের মাতা অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"বৌমাকে তো রেখে গেলে। কোন সুফল কি হবে এতে? আমার ত ভয় হয় শেষে ভালর বদলে মন্দ না না হয়।"

দেবদাসের পিতা গৃহিণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"কোন মঙ্গলে সন্দেহ করতে নেই। মাসখানেক দেবদাসের কাছ থেকে দেবদাসের বশ হয় না এমন কাউকে ত দেখিনি। দেবদাস স্পর্শমণি। দেবদাসের সংস্পর্শে বৌমাও সোণা হবেন—তুমি ভেবো না।"

(৪)

দেবদাসের পিতামাতা চলিয়া যাওয়ার পর, দিন

পনের হইয়াছে। সকলে দেবদাস আপনার ঘরে বসিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের শান্ত গঙ্গাবক্ষ পানে চাহিতেছে। পাশের একটা ঘর হইতে ষ্টোভ জলার শব্দ আসিতেছে। দেবদাস বুঝিল, পুষ্পরাণী চা তৈয়ারী করিতেছে। দাই, চাকর, বা বাবাজীর (পাচক) হাতের চা তাহার মনঃপুত হয় না—সে জন্ত পুষ্প নিজে হাতে চা প্রস্তুত করে।

হঠাৎ দাই বাবু বাবু করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের আর্ত্তচীৎকার শুনা গেল। হাতের পুস্তক ফেলিয়া দেবদাস সেই ঘরের দিকে ছুটিল। গিয়া দেখিল পুষ্পের পশ্চাৎ দিককার শাড়ী ও সেমিজ জলিয়া উঠিয়াছে। আতঙ্কে পুষ্প সেই কক্ষের মধ্য ছুটাছুটি করিতেছে—দাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তের জন্ত দেবদাস কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিল। পরমুহূর্ত্তে এক লম্ফে পুষ্পকে ধরিয়া ফেলিয়া তাহার গায়ের জ্যাকেটটা দ্রুত হস্তে খুলিয়া দিয়া নীচের সেমিজটা ক্ষিপ্রহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দগ্ধাবশিষ্ট শাড়ীখানা খুলিয়া ফেলিয়া দিল। তখন দেবদাস অতি সাবধানে পুষ্পের দেহ বহন করিয়া শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল, পুষ্প তখন ভয়ে ও যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইল। ডাক্তার আসিলেন। পায়ের নীচের দিকে সামান্ত পুড়িয়াছিল; কিন্তু দুই উরুদেশই অত্যন্ত বেশী পুড়িয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ঔষধাদি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন। দেবদাস সর্ব্বক্ষণ স্ত্রীর কাছে বসিয়া রহিল। পরদিন হঠাৎ ১০৫ ডিগ্রি জ্বর দেখা দিল। জ্ঞানের পর্য্যন্ত বৈলক্ষণ্য ঘটিল। ডাক্তার চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন ইহার উপর ঘা যদি বাড়িয়া উঠে ত রোগিণীকে বাঁচান দায় হইবে।

দেবদাস বলিল—"আপনি যে সেদিন Skin grafting এর কথা বলিতেছিলেন তাহা এক্ষেত্রে করিলে কোন ফল হয় না?

ডাক্তার বলিলেন—"তা হয় বই কি। কিন্তু এতখানি তাজা চাম কোথায় পাওয়া যায়? পেলে ত অনেকটা বিপদ কেটে যায়।"

দেবদাস বলিল—"তা বেশ, আপনি আমার গা থেকে নিন।"

ডাক্তার বলিলেন—"একেবারে এতখানি চাম নেওয়াতে আপনার যে কষ্ট হবে।

"তা হ'ক্ আপনি নিয়ে নিন। ঐটুকু দিলেও আমার শরীরে ঢের চাম থাকবে। পুষ্পকে এখন কোন রকমে বাঁচান্ ডাক্তার বাবু।"

তৎক্ষণাৎ একজন লেডী ডাক্তার ও আর একজন সহকারী ডাক্তার ডাকান হইল। দেবদাসকে ক্লোরোফরম করিয়া তাহার উরুদেশ হইতে ক্ষুর দিয়া একজন চর্ম্ম উঠাইতে লাগিলেন, লেডি ডাক্তার পুষ্পের উরুদেশে তাহা ক্ষিপ্রহস্তে লাগাইয়া দিতে লাগিলেন। দেবদাসের দুটি উরু হইতে চর্ম্ম লইতে হইল, কারণ পুষ্পের উভয় উরুদেশেই অনেকখানি করিয়া পুড়িয়াছিল। চর্ম্ম তোলা শেষ হইবামাত্র পিক্রিক্ লোশন দিয়া দেবদাসের উরুদেশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

পরদিন হইতে পুষ্প সুস্থ হইতে লাগিল। দুইদিনের মধ্যেই জ্বর ত্যাগ হইল। পাঁচ দিন পরে পুষ্পের পায়ের ব্যাণ্ডেজও খুলিয়া দেখা গেল পা প্রায় সুস্থ হইয়া আসিয়াছে। পাচ ছয় দিন পরে দেবদাসের পায়ের ব্যাণ্ডেজও খুলিয়া দেওয়া হইল। বাহিরের কেহই এ ব্যাপার জানিতে পারিল না। দাই কেবল ইহা দেখিয়াছিল। তাহাকে দেবদাস বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিল যে এ সব কথা সে যেন কাহাকেও না বলে।

দেবদাস এই সময়ে নিজের পিতামাতা ও পুষ্পের পিতামাতাকেও খবর দিল। পুষ্পের ইচ্ছানুযায়ী —ছাপরায় তাহার সেজদিদি দুর্গার কাছেও তার গেল।

দুই দিনের মধ্যেই ছাপরা হইতে স্বামীর সঙ্গে তাহার মেজদিদি ও দেশ হইতে পুষ্পের পিতামাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবদাসের পিতা পুত্রবধুর নিয়মিত

সংবাদের জন্য রোজ টেলিগ্রাম করিতে লাগিলেন। বলিয়াছিলেন কাযে ব্যস্ত থাকিলেও, আবশ্যক হইলেই তিনি আসিবেন। পাছে তাঁহার আগমনে বৈবাহিক বৈবাহিকা কিছু অসুবিধা ভোগ করেন সেই জন্য তিনি ইচ্ছাসত্ত্বেও আসিলেন না।

আরও কয়েকদিন শয্যাগত থাকিয়া পুষ্প সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। পিতামাতা ও দিদিকে পাইয়া সে খুব খুসীই হইল।

এত শীঘ্র নিখুঁত ভাবে কি করিয়া পোড়া ঘা সারিয়া গেল সে কথাটা একজন ছাড়া কাহারও মনে হইল না। যাহার মনে হইল সে পুষ্পের মেজদিদি। গোপনে দাইয়ের কাছে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এবং সেই স্বামীর প্রতি তাহার ভগিনীর ভালবাসার অভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। দুর্গা মনে মনে ভাবিল—যদি সম্ভব হয় ইহার একটা প্রতীকার করিয়া যাইবে। স্বামীকে বলিয়া কহিয়া আরও কয়েকদিন থাকিতে রাজী করা হইল। কথা রহিল, যেদিন তাহাদের পিতামাতা দেশে ফিরিবেন তাহারাও সেদিন ছাপরায় রওনা হইবে।

আর তিন দিন পরেই পুষ্পের পিতামাতা দেশে ফিরিবেন স্থির হইয়াছে। পুষ্পও এই সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছে। পুষ্পের মাতা দেবদাসকে সে কথা বলিবামাত্র দেবদাস মত দিয়াছে।

তাহাদের দেশে যাইবার একদিন আগে নির্জ্জনে দুই বোনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। পুষ্প দুঃখ করিতেছিল যে তাহার দুইটা উরুই পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে।

দুর্গা বলিল যে পুড়িয়া ও রকম কালো হয় না। তাহাতে চামড়া কুঁচকিয়া গিয়া চিরদিনের মত একটা অত্যন্ত কদাকার ক্ষতচিহ্ন রহিয়া যায়। পুষ্পের উরু কালো হওয়ার অন্য কারণ আছে যাহা কোন দেশের রাণীর ভাগ্যে ঘটিলেও তিনিও তাহা অশেষ সৌভাগ্য বলিয়া মানিতেন, অন্ততঃ তাহার মেজদিদি তো মানিতই।

পুষ্প কথাটা ভাল না বুঝিয়া দুর্গার পানে চাহিয়া রহিল। দুর্গা তখন নারীসুলভ চতুরতার সহিত সব কথা প্রকাশ করিল। শেষে বলিল—"যদি বিশ্বাস না হয় রাত্রে দেবদাস ঘুমালে তার উরুর কাপড় তুলে দেখিস্ তা হলে আর সন্দেহ থাকবে না।"

পুষ্প সমস্ত দিনটা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল। অধীর ভাবে সে রাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিল। দেবদাস ঘুমাইলে অতি সন্তর্পণে তাহার উরুদেশের কাপড় তুলিয়া দেখিল তাহার মেজদিদি যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক!

বাকী রাতটুকু সে আর ঘুমাইতে পারিল না। দেবদাসের ভালবাসা যে কত রকম মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সেবা করিয়াছে, তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য তাহার স্বামীর কি অপরিসীম আগ্রহ, তাঁহার মহত্ত্ব ও একনিষ্ঠ প্রেম, যাহা এতদিনকার তাচ্ছিল্যেও বিন্দুমাত্র কমে নাই —সে সমস্ত আজ তাহার বিনিদ্র নয়নের সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিতে লাগল।

তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। এতদিনে পাষাণ গলিল।

পরদিন প্রভাতেই যাইবার কথা। সে প্রত্যূষে মাকে আসিয়া বলিল যে এ সঙ্গে সে যাইবে না। মা বিস্ময়ে কন্যার মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন—"সে কিরে! সব ঠিকঠাক্ এখন তুই যাবিনে বল্‌ছিস্। কেন কি হ'ল আবার!"

কিন্তু কি যে হইয়াছে তাহা পুষ্প মাকে বলিল না। তাহার মেজদিদিকে গোপনে প্রণাম করিয়া সে কথা জানাইল। বলিল—"মেজদি তোমার ঋণ আমি সাত জন্মে শোধ দিতে পারব না। তুমি আমার গুরু—আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ।"

দুর্গা হাসিয়া চোখের জল ফেলিয়া পরমানন্দে পুষ্পকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"তা ভাই কিছু ঋণ থাকা ভাল; কিন্তু আমাকে গুরু বলিস্‌নে; তাতে ব্যাকরণের দোষ হয়।"

সকলেই মনের আনন্দে ফিরিয়া গেলেন। কেবল

পুষ্পের মা একটু অপ্রসন্ন রহিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—বিবাহ হলে মেয়ে আর মায়ের থাকে না।

সকলকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া দেবদাস পুষ্পের ঘরে আসিয়া দেখিল পুষ্প কাঁদিতেছে। ক্ষুব্ধ হইয়া দেবদাস বলিল—"কাঁদ্‌ছ কেন, আমি তো তোমাকে যেতে বলেছিলাম।"

পুষ্প চক্ষু মুছিয়া বলিল—"আমি যেতে পাইনি বলে কাঁদিনি। তোমাকে একা রেখে যেতে চেয়েছিলাম তাই চোখে জল এসেছিল।"

তারপর দেবদাস দ্বিতীয় কথা বলিবার আগেই পুষ্পরাণী স্বামীর পদতলে প্রণাম করিয়া কহিল—"আমাকে ক্ষমা কোরো আমি এতদিন তোমার মর্য্যাদা বুঝিনি।"

দেবদাস সাদরে দুই হাতে পুষ্পকে উঠাইয়া বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিল ও অপলকনেত্রে তাহার অশ্রু-প্লাবিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

ত্রিবেণী মহাশ্মশান

ত্রিবেণী মুকুন্দদেবের ঘাটের উত্তরদিকে যে শ্মশানটি আছে তাহা ত্রিবেণী মহাশ্মশান নামে পরিচিত। এ মহাশ্মশান সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ঘটনার কথা লোক পরম্পরায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে দুই একটী গল্প এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে বহু চতুষ্পাঠী বা টোল ছিল। ত্রিবেণী সরস্বতী তীরে অবস্থিত বলিয়া তখনকার দিনে অধ্যাপক ও শিষ্যমণ্ডলী গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে তাঁহারা মা সরস্বতীর ক্রোড়ে বসিয়া আছেন। সরস্বতী পার হইয়া কোনও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের যাইবার যো ছিল না। সরস্বতীকে কেহ কি ডিঙ্গাইয়া পণ্ডিত হইতে পারেন? তখন বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে পণ্ডিতেরা দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইতেন ও দেশ-বিদেশে বিচার করিয়া বেড়াইতেন। যিনি সকল পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত করিতে পারিতেন তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। ত্রিবেণীতে সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন জন্মিবার পূর্ব্বে সাধক জগন্নাথ নামে এক মহা-পণ্ডিত ছিলেন। একবার ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ নামে এক পণ্ডিত ত্রিবেণীতে বিচার করিতে আসেন। তিনি সাধক জগন্নাথকে বিচারে আহ্বান করেন। মুকুন্দ দেবের ঘাটের উপর বিচার আরম্ভ হয়। তখন বিচারকালে বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত—এ ক্ষেত্রেও হইয়াছিল। দুই দিন দুই রাত্রি ক্রমাগত বিচার চলিল, উভয়ে বিচারে উন্মত্ত, আহার নিদ্রা বন্ধ। ব্রাহ্মণদ্বয় দুই দিন ধরিয়া উপবাসী শুনিয়া বাঁশবেড়িয়ার দেব দ্বিজ ভক্ত রাজা গোবিন্দদেব রায় মহাশয় বিচার স্থলে আসিয়া একরূপ জোর করিয়া বিচার বন্ধ করিয়া দিলেন ও পণ্ডিতদ্বয়কে স্নান আহার করিতে বাধ্য করিলেন ও পরবর্ত্তী বিচার আহারনিদ্রার অবসরকালে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সাতদিন বিচারের পর অপরাহ্ণে জগন্নাথ পরাজিত হইলেন। ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ জয়লাভের পর অপর পণ্ডিতগণের অধিক মনঃ কষ্ট হইবে ভাবিয়া সরস্বতী পার না হইয়া বর্দ্ধমানাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল জগন্নাথ বাটীতে প্রত্যাগমন না করায় তাঁহার ভৃত্য রামদাস চঙ্গ তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য আসিল। জগন্নাথের পরাজয় সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। জগন্নাথ বিষণ্ণ বদনে ঘাটে বসিয়া-ছিলেন—পরাজয়ে বৃদ্ধবয়সে তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছিল। তিনি রামদাসকে দেখিয়া বলিলেন যে
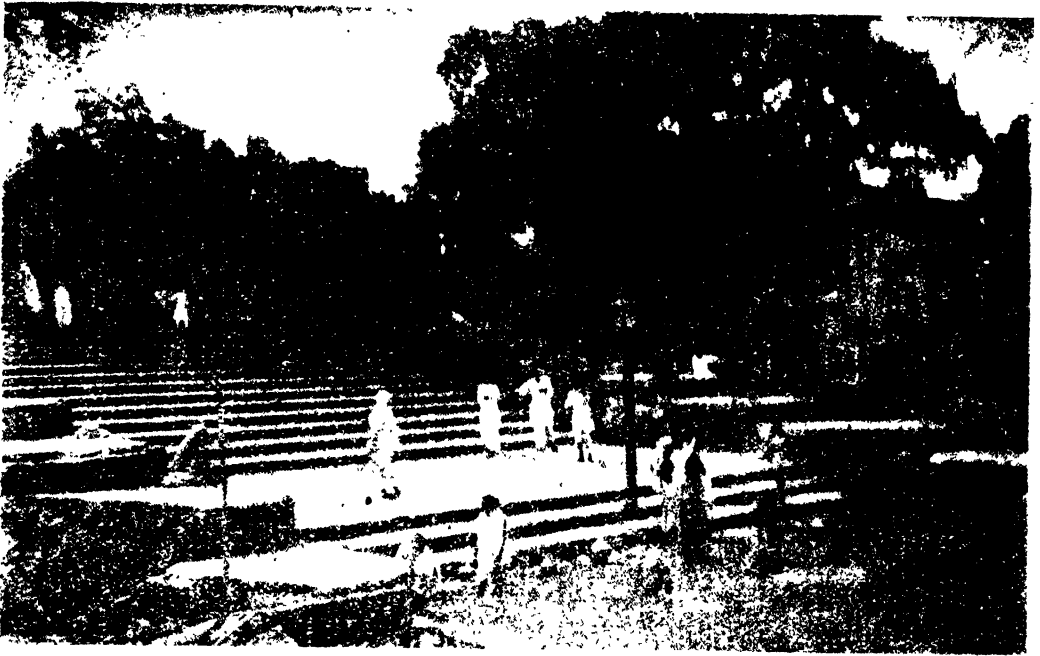
ত্রিবেণী মহাশ্মশান ও মুকুন্দদেবের ঘাট

তিনি আর গৃহে ফিরিয়া যাইবেন না, সেইখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবেন—আর জনসমাজে মুখ দেখাইবেন না! তারপর প্রভুভক্ত রামদাসকে শপথ করাইয়া তাহাকে একটী গুরুকার্য্যের ভার দিলেন। রামদাস তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত—সে তাঁহার অভিলা মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাঁহার আদেশে রামদাস গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে তিনি তাহার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখ রামদাস, আজ হইতে আমি গুরু ও তুমি শিষ্য। বিচারে হারিবার কারণ আমি গণেশসিদ্ধ, আর কণ্ঠাভরণ মহাবিদ্যা তারাসিদ্ধ। গণেশ, মা অপেক্ষা বড় হইবেন কি করিয়া? কাযেই আমার পরাজয় হইল। ইহার প্রতিশোধ না লইলে আমার তৃপ্তি হইবে না। তুমি জান আমার ব্রাহ্মণীর গর্ভাবস্থা, তাঁহার পুত্র সন্তান হইবে। তুমি সেই পুত্রকে মানুষ করিবে। তাহার উপনয়নের পর, আমি যে মহামন্ত্র তোমায় দিলাম, সেই মহামন্ত্র তাহাকে উপদেশ করিবে। পরে উপযুক্ত সময়ে ত্রিবেণীর এই মহাশ্মশানে ঐ মন্ত্রবলে উত্তর-সাধক হইয়া আমার পুত্রকে মহাবিদ্যা কালীসিদ্ধ হইবার জন্য শব সাধনা করাইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা দুইজনেই সিদ্ধ হইবে। আমার আত্মা সতত তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ভগবতীর নিকট বরলাভের পর, কণ্ঠাভরণকে এই ত্রিবেণীর ঘাটে আহ্বান করিয়া আনিবে। আমার পুত্র বিচার করিয়া যেদিন সেই পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবে, সেই দিন আমার আত্মার শান্তি হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে।" এই বলিয়া জগন্নাথ রামদাসের কর্ণে কর্ণে আরও কত কি কথা বলিলেন। গভীর রাত্রে ব্রাহ্মণী আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন। জগন্নাথ, পরদিন প্রাতে সঙ্কল্প করিয়া প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। যথাকালে তাঁহার আত্মা জড়দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তলোকে চলিয়া গেল।

রামদাস গুরুর আদেশ পালনে যত্নবান হইল। শিশু জন্মগ্রহণের পর হইতে সে তাহাকে লালন

পালন করিতে লাগিল। সে শিশুকে লইয়া এই শ্মশানে খেলা দিত, শিশু বড় হইলে সে শ্মশানে উপুড় হইয়া শুইত, অন্ধকার রজনীতে শিশুকে পৃষ্ঠে বসাইয়া কালীনাম জপ করাইত। সে এইরূপে শিশুর তরুণ হৃদয়ে শ্মশানভীতি স্থান পাইতে দিল না। উপনয়নের পর রামদাস বালককে মহামন্ত্র দিল। তারপর রামদাস বার তিথি-নক্ষত্রাদি অনুকূল দেখিয়া এক অমাবস্যা নিশা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিল। সেদিন উভয়ে উপবাস করিয়া রহিল। সন্ধ্যার পর আকাশ ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। ক্রমে বারিপাত হইতে আরম্ভ হইল—অশনি সম্পাতে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ঘোরান্ধকারে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। সেই তমিস্রাময়ী ঘোরা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া রামদাস চক্র পূজার দ্রব্যাদি ও বালককে লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে আকাশে নীল বিদ্যুৎ চমকাইল, সাধক জগন্নাথের মত একটি ছায়া রামদাসের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। ত্রিবেণীর মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়া রামদাস শাস্ত্রমত যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিল। তারপর সে উপুড় হইয়া শুইল, বালককে পিঠে বসাইয়া মহামন্ত্র জপ করিতে বলিল ও তাহাকে নানারূপ উপদেশে উৎসাহিত করিয়া, তীক্ষ্ণধার ক্ষুর প্রয়োগে স্বীয় কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া ফেলিল। শোণিত ধারায় শ্মশানভূমি রঞ্জিত হইল। রামদাস তখন শব—চণ্ডালের শব। বালক একাগ্রচিত্তে মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিল। রামদাসের শব দুলিতে লাগিল—বালককে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—বালক দৃঢ় হইয়া বসিল। তারপর সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, বটুকভৈরব, যোগিনী দেখা দিয়া ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

"বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে
কালীর চরণ ক'রে ঢাল।

গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গম

শূন্য হইতে স্তূপাকার রমণীর কেশরাশি পতিত হইল। কোথা হইতে পর্য্যুসিত শবমাংস পতিত হইল—দুর্গন্ধে বালককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বালকের মাতৃরূপ ধারণ করিয়া কে যেন তাহাকে জপ করিতে নিষেধ করিল—বাড়ী ফিরিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, বালক রামদাসের উপদেশ মত সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না—কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রহিল। ক্রমে রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। শুকতারা উঠিবার সময় হইয়া আসিল। সহসা পূর্ব্বদিক অরুণোদয়ের মত উজ্জ্বল হইল—মৃদুমন্দ মলয় পবন বহিতে লাগিল। প্রকৃতি দেবী বসন্ত সমাগমের মত রূপ ধারণ করিলেন। দূরে পিকধ্বনি ও নিকটে ভ্রমরগুঞ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বালক দেখিতে পাইল পূর্ব্বাকাশে একখানি গাঢ় নীল কাদম্বিনী প্রকাশিত হইল। সহসা কাদম্বিনীর মধ্যস্থল হইতে কোটী-সূর্য্য সমুজ্জ্বল অথচ কোটী-চন্দ্র সুশীতল অপরূপ মনোরম জ্যোতিঃ সাগরে ভাসমানা মহাকালী-মূর্ত্তি ধীরে ধীরে প্রকটিত হইল। বালক তখন দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, চৈতন্য দেহ লাভ করিয়াছে। সে উঠিয়া মায়ের পদতলে গড়াগড়ি দিল। বালকের আনন্দাতিশয্যে কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল, জগজ্জননী তখন বালককে বর লইবার জন্য আদেশ করিলেন। বালক তাহার রামদাদাকে বর দিবার জন্য বলিল। জগদম্বা বলিলেন সে যে মরিয়াছে, কেমন করিয়া বর লইবে। তখন বালক রামদাদাকে বর না দিলে সে বর লইবে না জানাইল। জগদম্বা বালকের দৃঢ়তা দেখিয়া রামদাসের মস্তক শিববাঞ্ছিত বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন—

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি যোগনিদ্রাং পরিত্যজ।
পশ্য মে পরমং রূপং যথেপ্সিতং বরং বৃণু॥

রামদাস উঠিয়া জগন্মাতাকে দেখিল—আনন্দনীরে তাহার বক্ষস্থল আপ্লুত হইল। সে ভূতলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মায়ের স্তব করিতে লাগিল। তারপর বালক সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী ও বিচারে অজেয় হউক এই বর চাহিয়া লইল। মা তথাস্তু বলিয়া নববৃন্দাবনচারী অষ্টম বর্ষীয় বালককে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। হরি হর ব্রহ্মা যাহা সর্ব্বদা বাঞ্ছা করেন, বালক সেই স্তন্য পীযূষ পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিল। মা তখন আশীর্ব্বাদ করিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া গেলেন। জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সরস্বতী তীর

তারপর রামদাস, ভোলানাথ কণ্ঠাভরণের নিকট গিয়া ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া বালকের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করিল। ভোলানাথ বালককে দেখিয়া বলিলেন, "বিচারে কায কি আমি পরাজয় পত্র লিখিয়া দিতেছি।" অবশেষে নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি বালকের তুষ্টির

জন্ত ত্রিবেণীতে আসিলেন। যথাকালে সেই মুকুন্দ দেবের ঘাটে আবার বিচার আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য ভোলানাথ বর্ণ্ঠাভরণ এবার বিচারে পরাজিত হইলেন। এতদিনে সাধক জগন্নাথের আত্মার তৃপ্তি সাধিত হইল।

সতীদাহ।

পূর্ব্বে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল—ত্রিবেণীর মহাশ্মশান কত সতীদেহের ভস্মাবশেষে পবত্রীকৃত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক এক-দিন সারি সারি চিতায় ৮১০টি সতীদাহ হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই তখনকার দিনে স্বেচ্ছায় পতির চিতানুগমন করিত। এরূপ কয়েকটী ঘটনার কথা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট বহুকাল পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে একটির কথা লিখিতেছি। বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহ দেব রায় মহাশয়ের দুই রাণী ছিলেন—কনিষ্ঠা সুবিখ্যাত রাণী শঙ্করী। তিনি স্বামীর আরব্ধ ৺হংসেশ্বরী মন্দির সম্পূর্ণ এবং অন্যান্য শুভানুষ্ঠান বজায় রাখিবার জন্ম স্বামীর আদেশে সহমৃতা হন নাই। কিন্তু বড়রাণী ভবসুন্দরী স্বেচ্ছায় সানন্দচিত্তে স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন। তখন অসূর্য্যম্পশ্যার যুগ। গড়বাড়ী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে বস্ত্রের কানাত পড়িয়াছিল। রাস্তায় শ্বেতবস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বড় রাণী পদব্রজে স্বচ্ছন্দ পদবিক্ষেপে নূতন শাঁখা শাড়ী পরিয়া সীঁথায় সিন্দূর লেপন করিয়া ভাগীরথীতীরে গমন করিয়া স্বামীর চিতা প্রদক্ষিণ করতঃ "তোরা সব হরিনাম কর" বলিয়া জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করেন ও অচিরে ভস্মাবশেষে পরিণত হন।

সকল স্থলে কিন্তু এরূপ ঘটিত না। কেহ কেহ শেষ মুহূর্ত্তে বিচলিত হইত, কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে স্বামীর সহিত বাধ্য হইয়া সহমৃতা হইত। এরূপ একটি ঘটনা ত্রিবেণী মহাশ্মশানে ঘটিয়াছিল। এটি সতীদাহ নিবারণের অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা। গল্পটি এই—প্রায় মধ্যে মধ্যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর ত্রিবেণীর মহাশ্মশান হইতে একটা প্রবল ঝড় উঠিত ও সেই ঝড়টা বরাবর উত্তরদিকে বান্দাপাড়ার দিকে এমন কি নশরাই পর্য্যন্ত যাইত। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট চীৎকার শুনা যাইত। ঐ চীৎকারটি একটি কঠোর কর্কশ বীভৎস গোঙানীর মত। লোকে ভয়ে কাঠ, সন্ধ্যার পর ও রাস্তায় চলাফেরা তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছিল। যে কেহ ঐ দ্রুতগামী ঝড়ের নিকট পড়িত সে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইত। লোকে ভয়ে ঘরের বাহির হইত না। এই সময় ত্রিবেণী মহাশ্মশানে
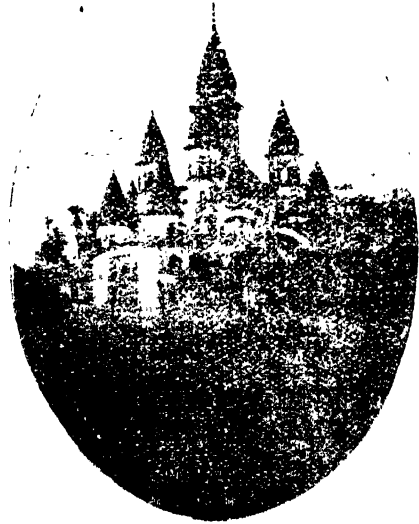
বাঁশবেড়ীয়া ৺হংসেশ্বরী মন্দির।

এক অঘোরপন্থী সন্ন্যাসী আসেন। ইহার প্রতিবিধানের উপায় করিবার জন্য গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁহাকে সকাতরে অনুরোধ করে। সন্ন্যাসী ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন এই ডাকিনীর তারাগুণ গ্রামে বাস ছিল। সে তাহার পতির সহিত সহমৃতা হইতে আসিয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে কিন্তু তাহার সাহসে কুলায় নাই। কিন্তু তখন উপায় ছিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্নিদগ্ধ হইয়া তাহার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ণ ইচ্ছায় সহমরণে না যাইলে পরলোকে স্বীয় স্বামীর

সহিত দেখা হয় না। তিনি গয়ায় তাহার পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা করেন। তাহার পর হইতে আর ঐরূপ শব্দ শুনা যায় নাই।

বঙ্গদেশের প্রথম ছোটলাট সার ফ্রেডরিক হ্যালিডে (Sir Frederick Halliday) যখন হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে এক সতীর সহমরণ দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সহমরণ প্রথা রহিত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে আমি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। একদিন আমি সংবাদ পাইলাম ভাগীরথী তীরে একজন হিন্দুরমণী সহমরণে যাইতেছেন। সে সময় মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ওয়াইজ সাহেব ও বড় লাটের পাদরী সাহেব আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সহমরণ দেখিতে উৎসুক হইলেন।

"আমরা সকলে ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম চিতা সজ্জিত। তথায় বহুলোক সমবেত হইয়াছে। সহমরণোন্মুখ রমণী মাটীতে বসিয়া রহিয়াছে। আমরা কয়েকখানি কাষ্ঠাসন আনাইয়া রমণীর নিকটে উপবেশন করিলাম। আমার সঙ্গী ডাক্তার ও পাদরী সাহেব রমণীটিকে সহমরণে যাইতে নানাপ্রকারে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা ইংরাজীতে যাহা যাহা বলিলেন আমি বাঙ্গলাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি সকল কথা বুঝিলেন কিন্তু কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি ধীর স্থির ও প্রশান্ত ভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প অটল রহিল, কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি চিতারোহণ করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া পাদরী সাহেব পুনরায় নিষেধ করিয়া বলিলেন—"আপনি কি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন তাহা বোধ হয় আপনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।" সতী আমার সম্মুখেই বসিয়াছিলেন, পাদরীর কথা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে আমার দিকে চাহিলেন।

"সতীর প্রশান্ত মুখজ্যোতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি একটী প্রদীপ আনিতে বলিলেন। প্রদীপ আসিলে সতী স্বয়ং ঘৃত দিয়া সলিতা জ্বালিলেন। যখন প্রদীপ বেশ জলিয়া উঠিল তখন সতী প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া জলন্ত অগ্নিশিখায় অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। অঙ্গুলি দগ্ধ হইয়া ঘোরকৃষ্ণ বর্ণ হইল। পেন কলম বাতির আলোয় পুড়িলে যেরূপ হয় সতীর অঙ্গুলি কতকটা—সেইরূপ দেখিতে হইল। সতীর মুখে কোনও রূপ বিকৃতির চিহ্ন দেখিলাম না। তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও অঙ্গুলি নাড়িলেন না। যেরূপ নিশ্চলভাবে বসিয়াছিলেন সেই রূপই রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আমাকে কহিলেন—"এইবার আপনার বিশ্বাস জন্মিয়াছে? আমাকে যাইতে অনুমতি করুন।"

"আমি অনুমতি দিলাম। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে সুসজ্জিত চিতার নিকট গমন করিলেন। চিতা তিন হস্ত উচ্চ এবং প্রস্থে দুই হস্ত। কাষ্ঠরাশির দ্বারা চিতা সুসজ্জিত। সতী তিন চারিবার চিতা প্রদক্ষিণ করতঃ চিতারোহণ করিলেন। তিনি স্বীয় ভুজে মস্তক স্থাপন করিয়া একপার্শ্বে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—যেন প্রশান্তভাবে নিদ্রিত। তাহার উপর কাষ্ঠ স্থাপন করা হইল। তাঁহার আত্মীয়গণ বংশ খণ্ডের সহিত তাঁহাকে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিল। আমি নিষেধ করিলাম। তাহারা অনিচ্ছাপূর্ব্বক আমার কথা শুনিল কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিল না। চিতার নিকট সতীর ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে চিতায় অগ্নি প্রদান করিতে বলা হইল। অনেক সময় দূরদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাদি আনিয়া সতীর চিতায় স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রেও সেইরূপ করা হইয়াছিল। চিতায় অগ্নি প্রদান করা হইল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে ঘৃত ও ধুনা দেওয়া হইতে লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"আমি চিতার নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলাম। অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া আসিলাম। চিতা হইতে কোনও রূপ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। চিতাভ্যন্তর নিশ্চল, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য

একবার কাষ্ঠস্তূপ ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পর সব স্থির ও নিষ্কম্প হইল। যতক্ষণ চিতা জ্বলিতেছিল, সতীর পুত্র চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। যখন সব শেষ হইল, যখন সতীদেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, তখন পুত্র করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।"

বোধ হয় হুগলী জেলায় বা বঙ্গদেশে এই শেষ সতীদাহ। বড় লাট বেণ্টিক মহোদয়ের আদেশে সতীদাহ রহিত হইয়াছে বটে কিন্তু বঙ্গদেশে সতীর অপ্রতুল নাই।

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়।

মর্য্যাদা

(সংস্কৃত হইতে)

বায়ুবশে হে চাতক! নিপতিত হায় তুমি এই গঙ্গাজলে
অফুরন্ত পাপনাশী পবিত্র সলিললাভ বহু ভাগ্যফলে
আকণ্ঠ করহ পান, স্বচ্ছ শীত বারি, চির—মিটুক পিপাসা
শমন শিয়রে তব—ভাবনায় ফল কিবা? নাহি জীবনাশা!

শুনিয়া অপ্রিয় কথা, ব্যথা পেয়ে মনে অতি মুদিতনয়ন,
কহিলা চাতক দুঃখে ক্ষোভে তুলি শির, ক্লান্ত-গর্ব্বিতবচন।
দৈব যার প্রতিকূল বিফল প্রয়াস তার, সে অবলম্বন—
যায়দূরে; বহুকরে আঁকড়িতে চায় যবে অস্তগ-তপন।

চরম দুর্ভাগ্য বশে পতিত হ'য়েছি আমি যে সলিলে আজ,
ভুলেও না হয় মনে ছুঁয়েচে কখনো ইহা আমার সমাজ;
তুচ্ছ মৃত্যুভয়ে আমি উচ্চশির করি নত ভুলে গিয়ে সব,
গঙ্গাজল করি পান ডুবাব কি চিরতরে জাতীয় গৌরব?

শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

হকের ধন

(গল্প)

গৌরগঞ্জে একখানি প্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া এক ব্যক্তি ডাকিল, "বাচস্পতি ঠাকুর বাড়ীতে আছেন নাকি?"

প্রায় মিনিটখানেক পরে ভিতর হইতে শব্দ আসিল, "কে?" এবং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার খুলিয়া এক কৃশকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি বাহির হইতে বলিলেন, "নিতাই নাকি? এস এস। ঘরে এসে বসবে চল। আমি এই তোমারই কথা ভাবছিলাম।"

উভয়ে যাইয়া ঘরের মধ্যে একখানি তক্তপোষে বসিল। 'বাচস্পতি ঠাকুর' ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, কি খবর বল দিকিনি নিতাই? আমি তো বিকেল থেকে তোমার কথা ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছি।"

এই ব্যক্তির নাম ত্রিলোচন আচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতি। গ্রামের মধ্যে ইঁহার প্রচলিত নাম জ্যোতিষী-ঠাকুর অথবা বাচস্পতি ঠাকুর। ইঁহারা ভট্টাচার্য্য, কিন্তু আচার্য্য-

ক্ষেত্রে 'আচার্য্য' শব্দটাই ব্যবহার করা ভাল মনে করিয়া ইনি 'ভট্ট' অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছেন। "বিদ্যাবাচস্পতি" উপাধিটা গত বৎসর কলিকাতার কি একটা স্থান হইতে পাইয়াছেন। তজ্জন্য সামান্য কয়েকটা টাকা ফিঃ দিতেও হইয়াছিল।

আচার্য্য মহাশয়ের পেশা অনেকগুলি। কোষ্ঠী প্রস্তুত, কোষ্ঠী বিচার, নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার, শ্রাদ্ধ শান্তির ব্যবস্থা দান, শান্তি স্বস্ত্যয়ন এসব তো আছেই। তার উপর শুনিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার যৌবনে নাকি কিছুকাল তিনি মোক্তারিও করিয়াছিলেন। তাৎপর সার্টিফিকেট লইয়া কি একটা গোলমাল হওয়ায় উহা ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছেন। এখন কৃষকগণকে মামলা মোকর্দ্দমার পরামর্শ দেওয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির করা ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যেও তিনি লিপ্ত আছেন। কিন্তু এমনই দিনকাল পড়িয়াছে যে তাহাতেও এই পল্লীগ্রামে স্বচ্ছলভাবে দিন গুজরাণ হয় না।

ত্রিলোচনের প্রশ্নের উত্তরে নিতাই বলিল, "খবর এক রকম মন্দ নয়। কায প্রায় বাগিয়ে ফেলেছি বল্লেই হয়।"

ত্রিলোচনের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম বল দিকি?"

নিতাই বলিতে লাগিল, "বাবু কি সহজে রাজি হন! তিনি হলেন একেবারে চশমখোর গোঁফকামানো ইংরাজী ক্যাসানের লোক। তিনি বলেন যে, ছেলের কুষ্ঠী আবার কি করাব! ওসব কুষ্ঠী ফুষ্ঠী আমি মানি নে। ওসব যত বাজে বুজরুকী।"

ত্রিলোচন বলিলেন, "তাই তো! বাজে বুজরুকী বৈ কি? জ্যোতিষ শাস্ত্র আছে তাই জগৎ চলছে! তা হলে দিন রাত্তিরও বাজে বুজরুকী। চন্দ্র সূর্য্যও—!"

নিতাই বলিল, "সে সব কথা আমি বলেছি ঠাকুরমশাই। আমি কি আপনার জন্তে বলতে আর কসুর করেছি? যৎপরোনাস্তি বলেছি। শেষে যখন দেখলাম যে বাবুর কাছে বলে' আর কোন ফল হবে না, তখন বাড়ীর ভেতর গিয়ে একেবারে গিন্নীকে ধরলাম। তাঁকে অনেক জপিয়ে তবে রাজি করেছি।"

ত্রিলোচন উৎসুক হইয়া উঠিলেন, "রাজি করেছ?"

নিতাই সদর্পে বলিল, "নিশ্চয়। রাজি না করে' কি আর আপনার কাছে এসেছি?"

ত্রিলোচন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুর অমত হবে না তো শেষে?"

নিতাই বলিল, "স্বয়ং গিন্নীঠাকরুণ মত করেছেন, তাতে আবার বাবু অমত করবেন? তিনি বলেছেন যে বাবু যদি টাকা না দেন তা হলে তিনিই টাকা দেবেন। আজ রাত্তিরেই তিনি বলে' কয়ে বাবুর মত করাবেন কথা আছে।"

ত্রিলোচন খুব আমোদের সহিত বলিলেন, "সাবাস নিতাই, সাবাস! বেশ! বাহাদুর বটে! এই ডানাপাটা বন্ধ করে দিয়ে লাগাও এক ছিলিম। আমি রূপোর কল্কেটা বার করি। তোমাকে আজ রূপোর কল্কের প্রসাদ দেবো।"

জ্যোতিষী ঠাকুরের আদেশানুযায়ী নিতাই গঞ্জিকার সজ্জায় প্রবৃত্ত হইল। ত্রিলোচন বলিলেন, "টাকা কড়ির কথা কিছু হল না কি?"

নিতাই গাঁজা ডলিতে ডলিতে বলিল, টাকার কথা না কয়ে আমি এসেছি, আমাকে কি এমনই বোকা ছেলে ঠাওরান? সমস্ত কথা পাকা করে আপনাকে জানাতে এসেছি। কাঁচা কায কখনই নিতাই শর্ম্মার দ্বারা হয় না।"

কলিকাটী ত্রিলোচনের হাতে দিয়া নিতাই বলিল, "পঞ্চাশ টাকায় রফা হয়েছে। বাবুর ছেলের একখানি ভাল কুষ্ঠী একেবারে কমপ্লিট করে দেবেন, আর পঞ্চাশ টাকা হার্ড ক্যাশ। তার মধ্যে আমাকে দিতে হবে কুড়িটী টাকা, বাকী ত্রিশ আপনার।"

ত্রিলোচনের স্ফূর্ত্তি কমিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "কুড়ি যে বড্ড বেশী হল! তার উপর মেহনত করে কুষ্ঠীখানা যা হোক একটা তৈরী তো করতে

হবে। তুমি বরং দশ টাকা নিও। বুঝলে? বড় লক্ষ্মী ছেলেটী আমাদের নিতাই।"

কিন্তু নিতাই 'লক্ষ্মীছেলের' ভাব কিছুমাত্র না দেখাইয়া বলিল, "না মশাই, ওর কমে আমি পারবো না। টাকা কড়ির ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতেও পিছপা হবো না, এই হল সাদা কথা। পঞ্চাশ টাকার কুড়ি টাকা আমাকে দিতে হবে বাকী ত্রিশ আপনার। তাই কি কম হল মশাই? আজকালকার বাজারে ত্রিশটাকা কি সোজা কথা? কম কষ্ট করে কি এটা আমাকে গিন্নীর 'ছ্যাকসেন' করাতে হয়েছে? আপনি না রাজি হন, ওপাড়ার নীলকণ্ঠ মুখুয্যেকে দিয়ে করালে সে নিজে মোটামুটি কুড়ি টাকা নিয়ে বাকী ত্রিশ আমাকে সোণাহেন মুখ করে দেবে।"

একটু থামিয়া, নিতাই আবার বলিতে লাগিল, "বড়লোকের ছেলের কুষ্ঠী তৈরী করবেন, কত রকম দাঁও এর পরে রয়েছে, আরও কত রকমে আপনাকে পাইয়ে দেব, এখন কি আর এই সামান্য দশ টাকা নিয়ে তর্ক করা ভাল দেখায় বাচস্পতি ঠাকুর?"

ভবিষ্যতে যে কিছু আশা আছে এ কথা ত্রিলোচন ভালরূপে জানিতেন। কাযেই জমিদারের এই চতুর কর্ম্মচারীটীকে প্রথমেই হাতছাড়া করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া,মুখখানি একটু ম্লান করিয়া বলিলেন, "তোমাকে তো আর পেরে ওঠবার যো নেই। তা নেহাৎ ছেলেমানুষ যখন আবদার ধরেছ, তখন না হয় আর পাঁচটা টাকা বেশী নিয়ে ওই পুরোপুরি পনেরো করে নিও। কিন্তু আমাকে দিয়ে আরও পাঁচটা কায করাতে হবে বাপু। দিনকাল দেখছো তো, সংসার চালানই সুকঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে।"

(২)

নিতাইকে বাহাদুর বলিতে হইবে বৈ কি! গৌরগঞ্জের জমীদার ভবেন্দ্র বাবু সম্পূর্ণ আধুনিক কালের লোক। তাঁহার প্রিয় খানসামা রসিক প্রতিমাসে বাবুর বৈঠকখানা হইতে খালি বোতল বিক্রয় করিয়াই নিতান্ত মন্দ রোজগার করে না। তিনি যে তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য পল্লীগ্রামের একটা সামান্য ব্যক্তিকে ৫০৲ টাকা দিয়া কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাস করিবার কথা নহে। কিন্তু নিতাই এমনিভাবে ভবেন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে নানা কথায় বুঝাইয়াছিল যে, স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শেষে ভবেন্দ্র বাবুকে সম্মতি দিতেই হইল।

পরদিন প্রত্যুষে ভবেন্দ্র বাবুর একজন বরকন্দাজ জ্যোতিষী ত্রিলোচন আচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতিকে তাহার প্রভুপত্নীর আহ্বান জানাইল।

ত্রিলোচন দীর্ঘকাল পরে তাঁহার বিবাহের চেলিখান বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। কাপড় খানি অত্যন্ত সন্তর্পণে পরিধান করিতে হইয়াছিল, কারণ চল্লিশবৎসর পূর্ব্বেকার নির্ম্মিত সেই ক্ষৌমবস্ত্রখানির সূত্রগুলির বার্দ্ধক্যদশা আসিয়া পড়িয়াছিল। দেহবেষ্টন করিবার শক্তি তাহার মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়।

মাথার বাবরী চুলগুলিকে আঁচড়াইয়া, কপালে সিঁদুরের দীর্ঘ ফোঁটা পরিয়া; গলায় কতকগুলি রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়া, খড়ম পায়ে দিয়া, ত্রিলোচন ঠাকুর বাবুদের অন্তঃপুরে ভবেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, নিতাই সেখানে বসিয়া আছে। একটী হৃষ্ট পুষ্ট বালক একটা কাঠের ঘোড়া লইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছে।

গৃহিণী দুইটী টাকা দিয়া ত্রিলোচনকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ক্রীড়ারত শিশুর মস্তকে বুলাইয়া খোকার দুষ্টামির নানা কথা উল্লেখ করিয়া জানাইলেন যে, ছেলটীর একখানি বিস্তৃত জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

ত্রিলোচন মুখখানিকে খুব গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, শুনলাম এই নিত্যানন্দের কাছে। তা মা, তোমার ছেলের কুষ্ঠী তৈরী করে দেবো, এর আর বাহুল্যটা কি বল? এতো আমাদেরই কায। তা বেশ, জন্ম লগ্নটা, তারিখটা আমাকে দিলেই পনের দিনের

মধ্যেই তৈরী করে দেব। তারা! তারা-ব্রহ্মময়ী!" বলিয়াই খোকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখি খোকা বাবু, এদিকে এসো তো লক্ষ্মী সোণাটী।"

খোকা ভয়ে পিছাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে আনিয়া ত্রিলোচনের সম্মুখে ধরিলে ত্রিলোচন তাহার কপাল একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া, নিজের ভ্রূদ্বয় একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হুঁ, পরমায়ু দেখছি একাশী বৎসর। দেখি হাতের তেলোটা! বাঃ! এই যে মৎস্য রেখাও রয়েছে।"

তার পর বালকের প্রসারিত করতলের প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "বড় ভাগ্যিমানি তুমি মা। এ বড় সুলক্ষণযুক্ত ছেলে। যদিও জন্ম লগ্নটা না পেলে ঠিক বলতে পারছি নে, কিন্তু হাতের রেখা দেখে যতটা বুঝছি তাতে এ রকম সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। তারা ব্রহ্মময়ী মা!" বলিয়া নিজের কপালের সিঁন্দুরের দীর্ঘ ফোঁটা হইতে একটু সিঁদুর মুছিয়া বালকের কপালে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা যাও, খেলা করগে খোকা বাবু।"

পাছে এইবার টাকাকড়ির কথা আসিয়া পড়ে, সেই জন্য নিতাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "টাকা কড়ির কথাও এঁকে সবই বলেছি মা। তুমি যা বলেছ তাতে উনি কি সহজে রাজি হন? অনেক বলে কয়ে তবে ওঁকে রাজি করিয়েছি। তা হলে ঠাকুর মশাই, আমি ও বেলা খোকাবাবুর জন্ম নক্ষত্র নিয়ে আর অর্দ্ধেক টাকা আগাম নিয়ে যাব।"

মুখখানি আরও গম্ভীর করিয়া হাতের রুদ্রাক্ষ মালাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ত্রিলোচন বলিলেন, "তথাস্তু। তা হলে সন্ধ্যার মধ্যেই যেও বাবা নিত্যানন্দ। রাত্তিরে আজ আমার দেখা পাবে না। মড়ি ঘাটার শশ্মানে আমাকে আজ শশ্মান জাগাতে হবে তা তো তোমাকে সেদিন বলেছিলাম।"

নিতাই বলিল, "ওহো হো, ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। আমার আবার পাঁচ ঝঞ্ঝাট। আচ্ছা, আমি সকাল করেই যাব।"

ত্রিলোচন চলিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে নিতাই হয় তো আরও বেশী টাকায় গৃহিণীর সহিত রফা করিয়াছে এবং সেই জন্যই চেষ্টা করিয়া টাকার কথাটা উত্থাপন করিতে দিল না।

৩

সন্ধ্যার পর নিতাই ত্রিলোচনের বাড়ী যাইয়া দেখিল তিনি বাহিরের ঘরের দ্বারটী ভেজাইয়া দিয়া একটী বোতল ও একটী কাঁচের গেলাস হাতে করিয়া বসিয়া আছেন।

নিতাই বলিল, "মড়িঘাটার শ্মশান যে এই খানেই জাগিয়ে তুলেছেন দেখছি।"

ত্রিলোচন হাসিয়া বলিলেন, "এসো, বসো। এ বেলা। ও বেলা দুটো টাকা প্রণামী পাওয়া গেল, তাই থেকে একটা টাকা দিয়ে হাজরা মুচিকে দিয়ে আনালাম। নাও একটু চেকে দেখ। বলিয়া বোতল ও গ্লাসটা নিতাইয়ের হাতে দিলেন।

নিতাই বলিল, "কিই বা আর এতে রেখেছেন?"

ত্রিলোচন বলিলেন, "আচ্ছা নিতাই, টাকাটা চেষ্টা করে আর একটু বেশী করে তুলতে পারলে না? পুরো পুরি একশো টাকা হলে বেশ ফাষ্টো কেলাস হোত।"

নিতাই বলিল, "খেপেছেন মশাই, তাও কি হয়? টাকা জিনিষটী কি খোলাম কুচি? এই টাকা রাজী করাতেই যে কত বেগ পেতে হয়েছে তার আর কি বলবো। টাকা দেবে তো ঐ ভবেন মিত্তির। সে কি তন্ত্রের লোক তা তো জানেন?"

ত্রিলোচন বলিলেন, "থাক, আর চারা নেই যখন, তখন আর কি হবে বল? কিন্তু বাপু, আর একটা ফন্দী আমি বলি, তাতে আমাকে বেশ মোটা রকম কিছু পাইয়ে দিতে হবে।"

নিতাই বলিল, "কি বলুন। আর আপনাকে পাইয়ে দিতে পারলেই—তো আমার লাভ। কি ফন্দী বলুন দিকিনি।"

"জন্ম নক্ষত্র তারিখ সব এনেছ নাকি ?"

"হ্যাঁ, এই যে।" বলিয়া একখানি পঞ্জিকার ছিন্ন পৃষ্ঠা নিতাই ত্রিলোচনের সম্মুখে ধরিল। তাহার একদিক কার পৃষ্ঠার একটী তারিখে লাল দাগ দেওয়া ছিল, এবং লাল কালীতে এক পার্শ্বে কি লিখিত ছিল।

সেখানা দেখিয়া ত্রিলোচন বলিলেন, "হুঁ। খোকার বয়স এখন হচ্ছে তা হলে চার বছর আট মাস। হুঁ।"

নিতাই বলিল, "কি ফন্দীর কথা বলছিলেন ?"

মাথার চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে ত্রিলোচন বলিলেন, "ছেলেটাকে কাছাকাছির মধ্যে গোটা দুয়েক ফাঁড়া দিয়ে দেওয়া যাক্। কি বল ? একটা দিয়ে দিই শীগ্‌গিরই, এই পাঁচ কিম্বা সাড়ে পাঁচ বছরে। আর একটা দেওয়া যাক দশ এগার বছর বয়সে। কেমন ?"

নিতাই হাতের বোতল ও গ্লাসটা তক্তপোষের তলায় রাখিয়া বলিল, "বেশ তো ভাল কথা। যত ইচ্ছে ফাঁড়া দিন তাতে—"

ত্রিলোচন বলিলেন, "না হে, ঐটুকুই তো কথা। এই দুটি ফাঁড়ার জন্যে একটা বড় রকমের শান্তি স্বোস্তেন যদি করাতে পার, তা হলে বলবো, যে হাঁ, নিতাইচাঁদ একটো চিজ হায় বটে।"

নিতাই চলিয়া গেলেও অনেক রাত্রি অবধি ত্রিলোচন এই কথাটী মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

(৪)

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে কোষ্ঠী প্রস্তুত সমাধা করিয়া, সেই জন্ম পঞ্জিকা খানি লইয়া, পূর্ব্বেকার মত বেশ ভূষা করিয়া ত্রিলোচন আচার্য্য পুনরায় ভবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে পদধূলি দিলেন। পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, সেদিনও গৃহিণী দুইটী টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন।

ত্রিলোচন কোষ্ঠীখানি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "সেদিন তো বলেছিলাম মা হয়েছ সার্থক তুমি, তাই এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করেছ। মি তো যে সে ব্যক্তি নও মা, তুমি, যে স্বয়ং কৌশল্যা। তাই এমন রামচন্দ্রকে কোলে পেয়েছ মা।"

পুত্রগর্ব্বে মাতার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি ঠাকুরের পদধূলি লইয়া পুত্রের মাথায় স্পর্শ করাইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এমনি দুষ্ট হয়েছে যে আর বলবার কথা নয়।"

মৃদু শিরঃসঞ্চালন করিয়া ত্রিলোচন বলিলেন, "তা তো হবেই মা। যশোদাকে কৃষ্ণ কি কম জ্বালাতনটা করেছেন! দ্বাপরের কথা ছেড়ে দিই, আমাদের এই কলিযুগে ? শ্রীচৈতন্য কি কাণ্ডটা করেছেন ? ঠাকুরের নৈবিদ্যি পর্য্যন্ত যে এঁটো করে দিয়েছিলেন।"

কোষ্ঠীখানির আর খানিকটা জড়ান অংশ খুলিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু মা, মা কালীর যে কেমন বিচার তা তো বলতে পারিনে। অমন যে সুন্দর চাঁদ, তাতেও কলঙ্ক সৃজন কল্লেন। গোলাপফুল সৃষ্টি করলেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার তলায় কাঁটাও বসিয়ে দিলেন! সেই ক্ষেপা বেটীর রকম দেখে মা হেসে বাঁচিনে।"

গৃহিণী নিস্তব্ধভাবে ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ত্রিলোচন বলিতে লাগিলেন, "তাই বলছিলাম যে মা, তোমার এমন সুলক্ষণযুক্ত পুত্র, এর তো কোন দোষ নেই, কিন্তু জন্মান্তরে লীলা করতে করতে হয়তো কোন একটু ক্রটী করে বসেছে, আর নিস্তার নেই, অমনি শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওরে ক্ষেপী, নিজে তো মহাদেবের বুকে চড়ে তাকে তো খুব শাস্তি দিলি, কিন্তু মানুষের উপর তোর এ আক্রোশ কেন রে মাগী! ইচ্ছে করে, বুঝলে মা, যে একখানা ছুড়ি নিয়ে বেটীর লাল টুকটুকে জিবটে কুচ করে কেটে নিই।"

গৃহিণী কিছুই বুঝিলেন না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ত্রিলোচন বলিলেন, "বেশী নয়, ফাঁড়া আছে দুটি দেখছি। একটী হচ্ছে পাঁচ বছর তিন মাসের সময়, আর একটী হচ্ছে আট বছরের পরেই। আর কিছুই নেই, কেবল পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে

শনি বেটার একটু তীব্র দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু সে একটা শনি কবচ করে দিলেই সেরে যাবে। কেবল এই ফুটোর কথাই আমি তো ভেবে সারা হচ্ছি। খোকার বয়স বুঝি হোলো গিয়ে ৪ বৎসর ৮ মাস?"

এতক্ষণে আসল কথাটা বুঝিতে পারিয়া গৃহিণীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ ঠাকুর মহাশয় ইঙ্গিতে এই কথাই বলিতেছিলেন পাঁচবছর তিনমাসের সময় একটা ফাঁড়া! সে তো আর সাত মাস পরেই!

গৃহিণী ব্যাকুল চিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে কি উপায় হবে বাবা!"

ত্রিলোচন বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উপায় করতে হবে বৈ কি মা। ঐ বুধটার জন্যেই যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কি না। ও বেটা এসে ঢুকেছে এর মধ্যে। সেই ঠোকাঠুকিতেই তো ফল আঘাত। বুধের একটা স্বস্ত্যয়ন করলেই মিটে যাবে, গ্রহ রুষ্ট আছেন, তাঁকে তুষ্ট করতে হবে। তার পর আট বছরের ফাঁড়াটারও ব্যবস্থা এই সঙ্গেই করে রাখা ভাল। যখন করতেই হল, তখন আমার মতে তো এক সঙ্গেই করা ভাল। কি বল মা, ভাল নয় কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "যা ভাল হয় করুন, বাবা, আমি মেয়েমানুষ, আমি আর কি বলবো। হ্যাঁ বাবা, লোচন আমার বাঁচবে তো?"

ঈষৎ হাসিয়া ত্রিলোচন বলিল, "ভাল রকমে ক্রিয়া করতে পারলে কি আর কোন অনিষ্ট হবার যো আছে! এতো আর যে সে শাস্ত্র নয় মা, এ যে আমদের হিন্দুশাস্ত্র! পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিং—খোঁড়া যে-সেও টপাটপ করে পাহাড়ের ওপর লাফ দিয়ে চলে যায়। তারা ব্রহ্মময়ী!"

গৃহিণী অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত বলিলেন, "তা হলে বাবা, এর যা ব্যবস্থা—"

ত্রিলোচন বলিলেন, "হ্যাঁ, কি কি করতে হবে আমি কাল সকালে নিত্যানন্দকে দিয়ে বলে পাঠাব। ভয় কি? আমি থাকতে কি আর কোন অনিষ্ট হতে দেব? তা দেবনা। কুষ্ঠীখানা ভাল করে, তুলসীপাতা দিয়ে তোরঙ্গে তুলে রাখ মা। তারা! তারা!" ত্রিলোচন গৃহিণী ও খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৫

কয়েক দিন পরেই নিতাই আসিয়া ত্রিলোচন আচার্য্যের নিকট বলিল, "এবার বুঝি মোকর্দ্দমা ফাঁসে।"

ত্রিলোচন চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বল কি হে নিতাই? মোকর্দ্দমা ফাঁসে কি হে?"

নিতাই মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। একদম ফেঁসে গেল। এবার আর কিছুতেই বাগাতে পাল্লাম না। অদৃষ্টের ফের মশাই।"

ত্রিলোচন বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি ব্যাপারটা বল দেখি?"

নিতাই বলিল, "আর মশাই, ব্যাপার! সেই সব হবে, স্বস্ত্যেনও হবে, হোমও হবে, ফাঁড়া কাটাবার সব ব্যবস্থাও হবে, কিন্তু আপনাকে দিয়ে নয়।"

"তার মানে?"

"ওপাড়ার নীলকণ্ঠ মুখুয্যে স্বস্ত্যেন করবে। খুব ভারি হোম হবে।"

ত্রিলোচন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কি বলছো নিতাই, কুষ্ঠী কল্লাম আমি, দুপয়সা পাবার পিত্যেশেই তো ফাঁড়ার সৃষ্টি কল্লাম আমি, আর সেই ফাঁড়া কাটাবার স্বস্ত্যেন করবে নীলে মুখুয্যে! সেই নীলে শালা—! সে কি করে জুটলো!"

নিতাই বলিল, "সেইটেই তো হল কথা, মশাই। আপনি চলে আসবার পরেই নাকি নীলকণ্ঠ মুখুয্যে বাবুর হাতে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলো। কি সমাচার! না খোকার কুষ্ঠী তৈরী হবে শুনেছি, কুষ্ঠীখানা আমাকে দিয়েই করাতে হবে। তারপর যখন বলা গেল যে সে কায খতম, কুষ্ঠী তৈরী হয়ে গেছে, তখন তার আফশোষ দেখে কে! শেষে স্বস্ত্যেনের কথা উঠতে বল্লেন যে তবে গ্রহশান্তির স্বস্ত্যেনটা আমি

করবো। বাবুর তো ব্যাপার জানেন! নেশার ঘুমে যা খেয়াল হবে তাই করবেন। কাযেই নীলু মুখুয্যে কায বাগিয়ে নিলে। বাবু রাজী হলেন।"

"তুমি বল্লে না কেন?"

"তা কি আর বলিনি! আমি বল্লাম যে কুষ্ঠী কল্লেন তিনি, আর গ্রহশান্তিটে যদি তিনি না করেন, তাহলে আবার হিতে বিপরীত ঘটবে না তো? তাতে নীলকণ্ঠ মুখুয্যে বলে যে ওইতো, সেবার বোসেদের মেয়েদের স্বস্ত্যেন ত্রিলোচন আচার্য্যি করেছিল, তা সে বৌটা ত দশ দিন না কাটতেই মরে গেল। বাবু অবশেষে বলেন যে, আল্‌রাইট! কুষ্ঠী তো ত্রিলোচন ঠাকুর করেছেন, গ্রহশান্তিটা নীলকণ্ঠ ঠাকুরই করুন। এতে আর কি বলবো মশাই।"

ত্রিলোচন নিজের ওষ্ঠ দংশন করিয়া বলিলেন, "একবার গিন্নীকে ধরে দেখলে না কেন?"

"ধরেছি বৈ কি! শুধু ধরা নয়, বলেছি যে এরকম কল্লে হয় তো গ্রহ রুষ্ট হয়ে গিয়ে একটা উল্‌টো উৎপত্তিও হতে পারে। কিন্তু গিন্নী বলেন যে কি করবো নিতাই, কর্ত্তা বলেন যে ও ব্রাহ্মণ হাতে পৈতে জড়িয়ে বল্লে, ওকেও তো কিছু দেওয়া চাই। সেই জন্যেই উনিই ক্রিয়া করবেন।"

ত্রিলোচন মুখ ভেঙ্গচাইয়া বলিলেন, "হাতে পৈতে জড়িয়ে ধল্লে! ব্রাহ্মণ! ভারি ব্রাহ্মণ! মুর্গী না হলে আহার হয় না—উনি ব্রাহ্মণ! বেটা চাঁড়াল কোথাকার! আচ্ছা, নিতাই, গিন্নীর কাণে তুলতে পারো যে নীলু মুখুয্যে মুর্গী খায়!"

নিতাই বলিল, "আর মশাই সে সব কথা তুলে আর কায কি বলুন। এবারটা আপনার দাঁও ফস্কালো, তার জন্যে ভাববেন না। আবার আসবে।"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ত্রিলোচন বলিলেন, "আর এসেছে। আচ্ছা নিতাই কত টাকায় রফা হল?"

নিতাই বলিল, "চল্লিশ টাকা না কত বুঝি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ত্রিলোচন বলিলেন, "হুঁ। তুমি কত পেলে নিতাই? কি দিলে নীলে মুখুয্যে!"

নিতাই একটু হাসিয়া বলিল, "আর মশাই সে কথা জিজ্ঞেস করেন কেন? আচ্ছা আসি এখন। 'প্রণাম"—বলিয়া দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলিয়া নিতাই চলিয়া গেল।

ত্রিলোচন বলিলেন, "আচ্ছা আমিও দেখে নোব। কত ধানে কত চাল তা দেখিয়ে দেবো তবে ছাড়বো। শেষে এই ত্রিলোচন আচার্য্যির পায়ে ধরে এসে কত খোসামোদ করতে হবে তবে আমার নাম।"

৬

প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল গ্রহ শান্তি ও ফাঁড়া কাটাইবার জন্য স্বস্ত্যয়ন নহে, সেই নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারাই ভবেন্দ্র বাবু পুত্রের হাতে খড়িও খুব সমারোহ করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, এবং সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছে। বাড়ী হইতে পাঠশালা বেশী দূরে নহে, গ্রামের বাহিরে নদীর ধারেই, একজন চাকর প্রত্যহ খোকাকে পাঠশালায় পৌঁছিয়া দিয়া যায় এবং পুনরায় বাড়ী লইয়া যায়।

হাতের দাঁও ফস্কাইয়া যাওয়াতে ত্রিলোচন নীলকণ্ঠকে ভয় দেখাইয়াছিলেন, ভবেন্দ্র বাবুর সংসার উচ্ছন্ন দিবেন এমন প্রতিজ্ঞাও মধ্যে একদিন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। এখন তিনি বাহিরে বেশ শান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলেই বোঝা যায় তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে কি একটা চক্রান্ত ধূমায়িত হইতেছে।

একদিন অপরাহ্নে ত্রিলোচন নদী হইতে মাছ ধরিয়া ছিপ হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। ব্যাঘ্র যেরূপভাবে তাহার শিকারের প্রতি খর এবং লোলুপ দৃষ্টিতে চাহে, তিনিও সেই বালকের প্রতি সেইরূপে একবার চাহিয়া নিজের পথ ধরিলেন।

আরও কিছুদিন গেল। এমন সময়ে একটি কাণ্ড ঘটিল। একদিন বৈকালে খোকা তাহার চাকরের

সহিত স্কুলের ফেরত বাড়ী আসিতেছিল, জলখাবার খাইতে একটু দেরী হওয়ায় অন্যান্য ছেলেরা অগ্রসর হইয়াছিল, এবং সে একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। স্কুল হইতে খানিক দূর আসিতেই রাস্তার ধারেই একটা ঝোপের পাশে দুইটী নারিকেলগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, খোকা তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হঠাৎ বোঁটা সমেত একটি নারিকেল সজোরে আসিয়া প্রায় তাহার মাথার উপরেই প'ড়ল। সে বিকট চীৎকার করিয়া সেই-খানেই লুটাইয়া প'ড়ল। সঙ্গের চাকরটা প্রথমে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার কাঁধের রক্ত মুছাইতে মুছাইতে বাড়ীর দিকে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

কি করিয়া যে এই কাণ্ডটি ঘটিল তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না।

৭

ইহা লইয়া গ্রামের মধ্যে মস্ত এক সোরগোল হইল। ইহা যে কোন লোকের দুরভিসন্ধির ফল, তাহা সকলেই একবাক্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, কিন্তু খোকার সঙ্গে যে কাহার শত্রুতা থাকিতে পারে ইহা কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলন না।

পরদিন প্রাতঃকালে নিতাই আসিয়া ত্রিলোচনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। হুঁকায় ২।১টি টান দিয়া সে বলিল, "বাম্পতি ঠাকুর, এ কাযটি যে কার, তা অন্য লোক বুঝতে না পারলেও আমার চোখে তো আর ধুলো দিতে পারবেন না। আমি তো ভেতরের কথা সবই জানি। ওঃ যা মজা কাল রাত্তিরে হল।"

ত্রিলোচন সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মজা হল?"

নিতাই বলিল, "কাল রাত্তিরে ব্যাপার দেখে বাবু তো মহা খাপ্পা। বোধ হয় কালকে একটু ডোজও চড়িয়েছিলেন। হুকুম দিলেন বোলাও নীলকণ্ঠকো।"

ত্রিলোচন ব্যাগ্রভাবে বলিলেন, "তার পর?"

"বাবু বলতে লাগলেন যে, যত সব বুজরুক জোচ্চোর সব এসেছে। কতকগুলো টাকা মিছি মিছি করে স্বস্ত্যয়ন করবো বলে নিয়ে, তার মাথা করলে। সবই তো তাতে হল! এই তো সেই ফাঁড়াই ঘটলো। ত্রিলোচন আচায্যি তো ঠিক কুষ্ঠী করেছে! বোলাও নীলকণ্ঠকো। দেখেঙ্গা হাম উস্কো।"

ত্রিলোচন বলিলেন, "নীলে এলো?"

"পাগল হয়েছেন। সে কখনও আসে? সন্ধ্যেবেলা খোকার এই কথা শুনেই শ্বশুরবাড়ী লম্বা দিয়েছে। এখন কিছুকাল আর আসছে না। যোদ্ধা, বাহাদুর আপনি যে রকম বড়ের চাল চাল্‌লেন, সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙ্গল না বলে না!"

ত্রিলোচন বলিলেন, "চুপ, চুপ নিতাই, এখানে নয়, বাড়ীর ভেতর এস, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

বাড়ীর মধ্যে এক নিভৃত কক্ষে যাইয়া উভয়ে অনেকক্ষণ গোপন পরামর্শ হইল। তার পর নিতাই চলিয়া গেল।

৮

পরদিন প্রাতে ভবেন্দ্র বাবুর বাড়ী হইতে আবার ত্রিলোচন আচার্য্যের আহ্বান আসিল। তিনি আবার রুদ্রাক্ষমালা হাতে করিয়া কপালে দীর্ঘ সিঁদুরের ফোঁটা কাটিয়া, সেই চেলির কাপড় পরিয়া সেখানে পদার্পণ করিলেন।

গৃহিণী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন, "বাবাঠাকুর! আমার খোকনকে বাঁচাও।"

ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা আনিয়া ত্রিলোচন বলিলেন, "ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কি আর চালাকি চলে মা! গ্রহ শান্তির ব্যাপার, এসব কি আর বেগার ঠেলা করে করালে চলে? আমি তখনই বলেছিলাম যে, আমি স্বস্ত্যেনটা করে দিই। কিন্তু তখন আপনারা গ্রাহ্য করলেন না। কাযটা করালেন গিয়ে নীলে মুখুয্যেকে দিয়ে। আহাঃ নীলে আবার পণ্ডিত হল

করবে ? আমরা যখন গুরুর কাছে শিক্ষে নিতাম, নীলে তখন তাঁর তামাক সাজতো।"

গৃহিণী বলিলেন, "যা হয়ে গিয়েছে তো আর চারা নেই বাবা। এখন এর কি উপায় তাই বলুন।"

ত্রিলোচন বলিলেন, "আমার কুষ্ঠী কি ভুল হবার যো আছে মা! বলেছিলাম যে ৫ বৎসর তিন মাসে একটা ফাঁড়া আছে, সেটা ভাল করে গ্রহশান্তি করলেই কেটে যেত, কিন্তু সেটা না হওয়ার দরুণ এই ভোগটা ভুগতে হোল। তবুও নিজের গুমোর কত্তে নেই মা, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তবু সেই পাগলী বেটীকে জবাফুল দিয়েছিলাম, তাই প্রাণের হানিটে আর হোল না। নইলে কি যে হোত, তা আর—"

গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আর বোলো না বাবা। এখন আর একটা ফাঁড়ার যে কি করা যায়, তার ব্যবস্থা বাবা তোমায় কর্ত্তেই হবে। আমার খোকাকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিলাম, এখন যা হয় তা করো।"

ত্রিলোচন বলিলেন, "থাক আর কোন চিন্তা নেই। যা যা দরকার, সব আমি ফর্দ্দ করে এখনি নিত্যানন্দের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া একটা রুদ্রাক্ষ বাহির করিয়া বলিলেন, "এইটে একটা লালসুতো দিয়ে ছেলের কোমরে বেঁধে দাও। ব্যস্, সর্ব্বসিদ্ধি! মন্ত্রী তারা সর্ব্ব সিদ্ধি করিষ্যন্তি।" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

* * *

সন্ধ্যাবেলা নিতাই আসিল। ত্রিলোচন বলিল, "কি রকম ? মুখখানা যে বড় হাসি হাসি দেখছি।"

নিতাই বলিল, "এবারে পুরোপুরিই 'এডভান্স পেমেণ্ট।' আপনি একশো টাকার ফর্দ্দ দিয়েছিলেন, একশোই মঞ্জুর। কেবল কাগজে কলমে মঞ্জুর নয়। টাকা এই আমার ফতুয়ার পকেটে। এই দেখুন।" বলিয়া নিতাই নোটের অগ্রভাগ দেখাইল।

ত্রিলোচন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বহুৎ-আচ্ছা বাপ্। বাঁচে যাও হিঁয়া। এবার—"

নিতাই বলিল, "এ টাকা আপনার হকের ধন, এ কি ফাঁকি দেওয়া যায় ? নীলে মুখুয্যে ছেড়ে তার বাবা এলেও কিছু করতে পারবে না। আমাকে কিন্তু এইবার শিষ্য করে নিতে হবে, তা বলে রাখছি। ভেবে চিন্তে দেখলাম যে করতে পারলে এর মত লাভের ব্যবসা আর নেই। তাই এবার চাকরী ছেড়ে দিয়ে আপনার শিষ্য হয়েই পড়বো। সেই জন্যেই এবার ষাট টাকা আপনাকে দিয়ে নিজে আর চল্লিশের বেশী নিলাম না।"

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

একশত বৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসবের খরচ

একশত বৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসবে কিরূপ খরচ হইত তার একটি অবিকল নকল নীচে দেওয়া হইল। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের মূল্য তদপেক্ষা কতগুণ বাড়িয়াছে এবং কেনই বা পূর্ব্বের ন্যায় ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব করা অধিকাংশ বাঙ্গালীর পক্ষে বর্ত্তমানে অসম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে দুর্গাপূজা অনেক হয়, কিন্তু প্রকৃত দুর্গোৎসব অতি অল্পই হয়। মায়ের পূজার তিন দিন অকাতরে অন্নদান বস্ত্রদান ইত্যাদি যাহা দুর্গোৎসবের প্রধান অঙ্গ, তাহা কয়জনের পক্ষে বর্ত্তমানে সম্ভব ?

ইহা কলিকাতা ১৯নং নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের ৺রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ীর খরচ। তাঁহারই বংশধর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

মহাশয় তাঁহাদের সেরেস্তার পুরাতন খাতা হইতে ইহা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই হিসাব দেখিবার সময় পাঠক মনে রাখিবেন, ইহা কলিকাতার দর এবং 'লগনসা'র সময়ের দর।

সন ১২৩০ সাল। আশ্বিন।

দুর্গাপূজার খরচ—

কাটাম—

তক্তা ১খানা, বাঁশ, দড়ি, পেরেক, মাটী,	
দিঃ মোট চুক্তি—	৫৲
কুমরদিগের একমেটের খোরাকী—	২॥৫
দোমেটের খোরাকী—	১৸/৫
আচার্য্যদিগের খোরাকী—	১|৵০
" দক্ষিণা —	৪৲
" সিদা	|৵০

ঠাকুরের গায়ে বসাবার কাপড় —

১০॥০ হাত—	৸৵০
৬॥ হাত—	॥/১০
রং করা মোট চুক্তি—	৪॥০
ঠাকুরগড়া মোট চুক্তি—	২৫৲
সাজ দক্ষিণা—	৪১৲

কাপড়—

গজী ৮ থান—	৭৸০
লালপেড়ে ধুতি ১০ জোড়া—	৯/০
সাদা জোড় ৩টী—	২৸৵১০
গামছা ৪খানা—	১৸০
কার্ত্তিক গণেশের শান্তিপুরের জোড় ২টী—	৩৲
চেলীর সাড়ী ৬খানা—	১৯॥০
বর্ণের জোড় তসর ৩টী—	১৫৲
কাপড় ২৭ জোড়া—	৭৪/১০
শান্তিপুরের ২ জোড়া—	৩৲
সাড়ি ২৪ খানা—	৩৯৶১০
ভুনি * ১৬ খানা—	২৮৶৫
ঢাকাই ধুতি ১০খানা—	৫৯৲

চাউল—

কামিনী আতপ ২০/ মন ২॥০ হিঃ—	৫০৲
মুগী চাউল ৯/ মণ ২৲ হিঃ—	১৮৲
দাদখানি ১/ মণ ৩৲ হিঃ—	৩৲
কালীকলাই ৸০ সের—	১৶১০
সোণামুগ ১।০ মণ—	৪৵৫
পাটনাই বুট ।৫ সের—	॥৵১০
লাল বুট ।৫ সের—	৸০
অরহর ডাল ১/ মণ—	৩৶০
শাদা বুট ।৫ সের—	৸/৫
খ্যাসারি ॥০ মণ—	৸৶০
বড়বটী ।০ সের—	১॥০
হারীমুগ ॥০ মণ—	১|৵০
লবণ ৸০ সের—	৩|৵০
গুড় ৪ ২॥০ সের—	১৭৸০
ধান্য ৫/ মণ—	৬৸৵০
মিছরী—	২॥১০
সর্ব্বপ্রকার ঝালমশলা ও গরম মশলার মোট খরচ—	৬৵৫
মোমবাতি ১২৯টা ওজন আধমণ ৭৯৲ হিঃ—	৩৯॥০
দধি ৯/৮ সের ৩৲ হিঃ—	৬॥/১৫
দুধ ১॥৫ মণ ৪৲ হিঃ—	৬॥০
খাসা সন্দেশ ৩/৪৵০ মণ ১৫৲ হিঃ—	৪৬৸/৫
রসকরা ॥১॥০ ৯৲ হিঃ—	৪৸/৫
চিনী /৸০	৵১৫
ময়দা ২॥২ সের ৪॥০ মণ হিঃ—	১১৶১৫
ব্যসম ।৫ সের ৫৲ হিঃ—	১৸৵৫
সুটী ।৫ সের ৫৲ হিঃ—	১৸৵৫
ঘৃত ১৸৭৵ মণ ২৮॥০ হিঃ—	৫৪৸৵১০
পাঁটা ৬টা—	৯৶১০
বলিদানের দক্ষিণা—	২৲

* বিধবাদের উপযুক্ত শাদা থান (যাহাতে শাদা পাড়ও থাকিবে না, তাহাকে ভুনি বলিত।

সিধে—	।৵০
আতর ২ তোলা—	২৲
গোলাপ জল /২৷৷০ সের	১৸৵০
নারিকেল তৈল ১/ মণ ১৫ হিঃ—	১৫৲
সরিষার তৈল ১৸৫৷৷০ ৪৷৷০ হিঃ	৮৷৷৫
জ্বালানি কাঠ ৪৯ মণ	১৮৵৫
গাড়ু /২৷/০ ১৵০ হিঃ—	২৷৷/০
বাটা /১৵১০ ছটাক ১৷৷০ হিঃ—	১৷৷৶.৫
পিতলের বাটী /১৷৷/১০ ছটাক ১৵০ হিঃ—	৷৷৵১৫
কাঁসার বাটী /১৶১০ ছটাক ২৲ হিঃ—	২৶০
গেলাস ১৩টা ৸০ হিঃ—	৯৸০
দক্ষিণা—	৪৲
চণ্ডীপাঠ—	৪৲
দুর্গানাম—	৩৲
বরণ দক্ষিণা—	২৲
হোমের দক্ষিণা—	।০
কুমারী ভোজনের সাড়ী ৩ খানা —	১৸০
তাষাওয়ালা * —	৫৲
ঢুলি ২জন-	৫৲
যাত্রাওয়ালা (৩ রাত্রি)—	১০২৲
পেলা—	৩০৲
খোরো ৪ হাত—	৷৷০
গোটা ২০ হাত—	১৪৲
নিরঞ্জনের বেহারা—	১৫৷৷০
তামাক ৷৷৪৸০ /৬৷৷০ হিঃ—	৫৸/৫
অম্বরী তামাক /৪৵০ /৩ সের হিঃ—	১৵০
মৎস্য ১৷৷৬ ১৩৲ হিঃ—	২১৷৶৫
	৯৩৪।/১৫

* তাষা—বাদ্যবিশেষ।

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে একশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন সম্ভ্রান্ত জমিদার বাড়ীতে দুর্গোৎসব বেশ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল ৯৫০৲ টাকার মধ্যে। উল্লিখিত ফর্দ্দ অনুযায়ী বর্ত্তমানে দুর্গোৎসব করিতে গেলে বোধ হয় উহার ৪.৫ গুণ খরচ পড়িবে। একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, কেরোসিন তৈল বা কয়লা, বা চা চুরট প্রভৃতির কোনও উল্লেখ নাই।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শরতের গান

হাল্কা মেঘের ভেলায় ভেসে শরৎ এল বর্ষ পরে,
দীঘির জলে ঘোমটা ঢেকে কুমুদ হাসে রঙ্গ ভরে।
গন্ধে বিভোর শিউলী শাখে
মনের সুখে দোয়েল ডাকে
চক্রবাকের মিলন গানে আজকে ভুবন মুখর করে।

মধুর মাতাল ভ্রমর ভ্রমে কুসুম রেণু অঙ্গে লয়ে;
করুণ সুরে পাপিয়া ওরে দুঃখের কথা যাচ্ছে কয়ে।
রঙের নেশা সঙ্গোপনে
লাগছে ধবল কাশের বনে,
নীল আকাশে মরাল দলে প্রেমের নিশান চলছে বয়ে।

হরিৎ ধানে পল্লী মায়ের তরল শ্যামল অঙ্গখানি,
বেতস বনে পাগল বায়ু শুনায় কত মর্ম্মবাণী।
তরুর শিরে বকের ঝাঁকে
প্রভাত-রবির কিরণ মাখে
ফুলের মালায় শিউলি তলায় সাজায় স্নেহে বনের রাণী।

বিশ্বমাতার বন্দনা গান বাজছে বিশাল জগৎ জুড়ে,
কলধ্বনির সঙ্গে আবার হর্ষ জাগে হৃদয়পুরে।
আজ প্রবাসীর ক্ষণে ক্ষণে
প্রিয়ার আনন পড়ছে মনে—
চোখ চেয়ে রয় গগনপানে মন টানে তার কোন সুদূরে।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৬ বৎসর বয়ক্রম কালে ৺রামকৃষ্ণ দেবের ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তিনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ে শিবরাত্রিতে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র তিনি সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন বলিয়া কথিত আছে।

স্বামীজী পদব্রজে সমগ্র ভারত ভ্রমণ ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। হৃষীকেশে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রাম করেন। মাধুকরী করিয়া আহার করিতেন। জ্বরাক্রান্ত হইয়া সে বার তিনি ছয় মাস শয্যাগত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তার পর বরাহনগর মঠে আসিয়া তিনি অহোরাত্র ও ধ্যান, জপ, তপস্যায় রত থাকিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। কিন্তু এই সময় মৎস্যমাংস আহার করেন নাই।

১৮৯৬ সালে লণ্ডনে বিপুল উদ্যমে স্বামীজী প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে স্বামী অভেদানন্দ ও সারদানন্দের উপর ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয় স্থলের প্রচার কার্য্য এবং 'বেদান্ত সোসাইটির' পরিচালনের ভার দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তারপর বিবেকানন্দের অনুরোধে সারদানন্দও, অভেদানন্দের উপর আমেরিকার যাবতীয় কার্য্যের ভার দিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় প্রচার কার্য্যের জন্য স্বামীজী সমগ্র আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৮৯৮ সালে বিবেকানন্দ পুনরায় আমেরিকা গমন করিয়া অভেদানন্দের বেদান্ত

স্বামী অভেদানন্দ

প্রচার কার্য্যে অসাধারণ সাফল্য ও প্রাণপণ পরিশ্রম দেখিয়া পরম সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় বেদান্ত সমিতির স্থায়ী বাটীলাভ হয়। সেই সময় তাঁহার আর একটী মহৎ কার্য্য "Children Class" খুলিয়া বালক বালিকাদের হিতোপদেশ দান।

স্যানফ্রান্সিস্কো হইতে এক শত মাইল দূরে মাউন্ট হ্যামিল্টন নামক স্থানে তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্য হইতে ১৬০ একর ভূমি লাভ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ১২ জন শিক্ষার্থীর সাহায্যে ঐ জমীর উপর "শান্তি আশ্রম" স্থাপন করেন।

১৯০২ সালে স্বামী অভেদানন্দের প্রচার কার্য্য নিউইয়র্কে প্রবল ভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং একা সমস্ত কায না পারার জন্য তুলসী মহারাজের সাহায্য গ্রহণ করেন।

১৯০৫ সালে স্বামীজী Vedanta Monthly Bulletin নামক একখানি বেদান্ত বিষয়ক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রায় দশ বৎসর কাল এইরূপ উদ্যমের সহিত আমেরিকা, লণ্ডন ও প্যারিসে প্রচার করিয়া স্বামীজী ১৯০৬ সালে ভারতে অল্পদিনের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন; পরে স্বামী পরমানন্দ সহ লণ্ডন ও নিউইয়র্কে গমন করেন। বোষ্টন সহরে বেদান্ত আশ্রমে বৃক্ষতলে স্বামীজী গীতা, বেদ, উপনিষদাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন।

নিউইয়র্কে বেদান্ত সমিতির ভার স্বামী বোধানন্দের উপর অর্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ কানাডা, আলেস্কা এবং মেক্সিকো পর্য্যন্ত ভ্রমণ ও নানা স্থানে বেদান্তের বীজ বপন করিয়া স্যানফ্রান্সিস্কো ও লস এঞ্জেলেসে নূতন বেদান্ত আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রচারকের অভাবে ঐ সমস্ত কেন্দ্র স্বামীজী স্থায়ী করিতে পারেন নাই। সেই অভাব দূর করিবার জন্য তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়াছেন এবং কলিকাতায় এক শিক্ষালয় খুলিয়াছেন, যাহাতে ঐখানে শিক্ষিত হইয়া প্রচারকগণ ভবিষ্যতে নানাস্থানে প্রচার কার্য্য করিতে সমর্থ হন।

অমরনাথ

হিন্দুর প্রধান তীর্থ অমরনাথ ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অতি দুর্গম কোণে নিজ পবিত্রতা লুকাইয়া রাখিয়াছে। এই তীর্থস্থানটী দেখিবার একটী দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা আমার বহুকাল হইতেই ছিল, কিন্তু সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছিল না। আমাদের একটী আত্মীয় বৃদ্ধ 'প' বাবু শ্রীনগরে ছিলেন, তিনি অমরনাথ দর্শনে যাইবেন জানিয়া আমি তাঁহার সহিত গিয়া জুটিলাম।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইতেছে যে সাধারণতঃ হিন্দু যে উদ্দেশ্য লইয়া, যেরূপ আপনা ভুলিয়া তীর্থের দিকে ছুটিয়া যায়, "অযুত ঋষি পদ রজ পূত' তীর্থ ধূলি মস্তকে ধারণ করিবার জন্য যেরূপ লালায়িত হয়, আমার মধ্যে তাহার কিছুই ছিলনা। আমি ভারতের বহু তীর্থই ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু তাহা আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-লালসা ও কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য। কি আকর্ষণে ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারী তীর্থ দর্শনের জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয় তাহা আমার নিকট বরাবরই একটা জটিল সমস্যা বলিয়া বোধ হইত। সেই সমস্যা পূরণের জন্যই আমার তীর্থ যাত্রা। স্বীকার করিতে হইবে যে, হিমালয় হইতে কুমারিকা ভ্রমণ করিয়াও এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি নাই। তবে যখনই কোন তীর্থ স্থলে গিয়াছি, তখনই কে যেন অদৃশ্য হস্তে এই পিপাসা-পঙ্কিল শুষ্ক অন্তঃকরণে 'মোহন তুলিকা বুলাইয়া' তাহার গভীর কালিমা আবৃত করিয়া দিয়াছে।

'অমরনাথ' তীর্থ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে

১০০ মাইল দূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বত গুহা। বৎসরে একদিন মাত্র অমরনাথ দর্শন লাভ সম্ভব হয়। প্রতি শ্রাবণ পূর্ণিমাতে অমরনাথের যোগ। এই সময় দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রী মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া এই সঙ্কটময় জনপ্রাণী-বৃক্ষলতা বিবর্জ্জিত পথে দর্শন করিতে আসে। কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুর এই সময় দর্শনে যান, সুতরাং যাত্রীদের জন্যও আহারাদি পাওয়া যায়। তথাপি প্রত্যেকেই পৃথক আহারাদির

অমরনাথের পথে

ব্যবস্থা রাখিয়া থাকে। পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক স্থলে উচ্চ পর্ব্বতের গাত্রে দুই ফুট চওড়া রাস্তা, নিম্নে হাজার দুই হাজার ফুট খাদ!

যাহা হউক বৃদ্ধ 'প' বাবু আমার মত বলিষ্ঠ সঙ্গী পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। আমাদের দলের নেতা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ 'প' বাবু স্বয়ং, সহযাত্রী মিষ্টার ঘোষ, একটী ডোগরা বন্ধু মিষ্টার "জে", জনৈক উড়িয়া বালক ভৃত্য ও একটী পাণ্ডা। নেতা ও ভৃত্যটী স্বর্গের পাথেয় সংগ্রহের নিমিত্ত; পাণ্ডাটী পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত, আর আমরা তিন বন্ধু একটী উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। দুটী ক্ষুদ্র তাঁবু, খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে চাল, ডাল, মুগ, তরি তরকারী, ঘি ও চিনি। কাঠ লইতে হইল না কারণ সরকার হইতে এ সময় তাহা দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্রব্যাদি সমস্ত এক কিস্তি (নৌকা) যোগে 'মাটনে' পাঠাইয়া দিয়া ১১ই জুলাই আহারাদির পর আমরা সদলবলে শ্রীনগর হইতে রওনা হইলাম। এক বন্ধুর মোটর কার পাওয়া গিয়াছিল। সাড়ে দশটায় রওনা হইয়া আমরা সেই জগৎ প্রসিদ্ধ সফেদা বৃক্ষ শ্রেণী শোভিত রাস্তা দিয়া ৩৪ মাইল গিয়া প্রায় ১১টায় 'মাটন' বা মার্ত্তণ্ড ভবনে পাণ্ডার বাড়ী পৌছিলাম। এখান হইতে আমাদের জন্য ঘোড়া, বৃদ্ধ 'প' বাবুর জন্য ডাণ্ডি ও মাল পত্রের জন্য কুলী ইত্যাদি "ওজির ওজারৎ" (City Magistrate) এর নিকট দরবার করিয়া সংগ্রহ করিতে ২৩ ঘণ্টা লাগিল। ঘোড়া ইত্যাদি 'গণেশ পুরা' রওনা করিয়া দিয়া আমরা চা পানান্তে পুনরায় মোটরে উঠিয়া বসিলাম।

ভুল ক্রমে চালক গণেশ পুরা ছাড়াইয়া গিয়াছিল পুনরায় ফিরিয়া আসিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল। তখনও আমাদের মাল পত্র ঘোড়া ইত্যাদি পৌছে নাই। ডাক বাংলাতে কোনরূপে একটু স্থান পাইয়া সেইখানে রান্না ও আহারাদি করিয়া লইলাম। রাত্রে ভাল রূপ নিদ্রা হইল না। এখান হইতেই প্রকৃত রাস্তার কষ্ট আরম্ভ হইবে ভাবিয়া Mr Ghosh যেন একটু ম্রিয়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু আমার 'কাশ্মীর ভ্রমণের' প্রধান সহকারী ডোগরা যুবক Mr J র উচ্চহাস্যে সমস্ত চিন্তাই ভাসিয়া গেল।

ঘোড়াগুলি আসিয়া পৌছিলে ঘোড়ার পিঠে কতক মাল চাপাইয়া তাহার উপর এক একজন করিয়া বসিলাম। 'প' বাবু ডাণ্ডিতে উঠিলেন।

'গণেশপুরা' একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা 'জনকপুরা' বা "আয়েস মোকাম" হইতে দুই মাইল দূরে। জনকপুরায় এখন

পহিল গাঁও

তেমনি সমস্ত লীদার উপত্যকার মানব বাসভূমির মধ্যে এই 'পহিলগাঁ' সুন্দর। বেড়াইতে গিয়া অবাক হইয়া এই অনন্ত অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়।

১৫ই জুলাই অতি প্রত্যুষে পাহিলগাঁ হইতে আমরা যাত্রা আরম্ভ করি। প্রায় ৪০০০ যাত্রী জমায়েৎ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র ২০টী বাঙ্গালী। প্রায় ২০০ সন্ন্যাসী ছিলেন,

আর কোন হিন্দু-কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায় না, তবে মুসলমান সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান।

বেলা ১২টায় আমরা 'পহিল গাঁও" অভিমুখে রওনা হইলাম। এই স্থানটী গণেশপুরা হইতে ২০।২১ মাইল দূরে। পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত সুন্দর ক্ষুদ্র গ্রাম নেনসপুরা হইতে নামিয়া আমরা একটী খাল অতিক্রম করিয়া খানিকটা যাইয়া 'লীদার' নদীর উপত্যকার রাস্তা ধরিয়া ক্রমেই এক স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মধ্যে লীদার উপত্যকার মত সুন্দর স্থান অনেকই আছে। লীদারের বিশেষত্ব অগণিত 'পাইন' জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণী, সুধু সফেদা চেনার নহে। সমস্ত উপত্যকাটিই ফুলে ফলে যেন নন্দন কাননের শোভা ধারণ করিয়াছে। "পহিল গাঁয়ে" পৌছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এখানে আমাদের ২ দিন ৩ রাত্রি অপেক্ষা করিতে হইল। দেশ বিদেশ হইতে যাত্রীরা এখানে আসিয়া জমায়েৎ হয়, পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে একত্র এখান হইতে রওনা হইতে হয়। সুতরাং যাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে পৌছে তাহাদিগকে এখানেই অপেক্ষা করিতে হয়। আর, এ অপেক্ষা করিবার মত স্থানও বটে!

যেমন সমস্ত কাশ্মীরের মধ্যে লীদার উপত্যকা সুন্দর,

আগে সন্ন্যাসীরা ছড়ি ও পতকা লইয়া রওনা হইলেন, তাহার পর অন্যান্য যাত্রীরা দলবদ্ধ হইয়া চলিল। খানিকটা যাইয়া আমরা সেতুর উপর দিয়া 'লীদার' পার হইলাম এবং আর একটু গিয়া 'হাওয়া জালের' রাস্তায় পড়িলাম। এই রাস্তার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। 'হাওয়া জাল' পৌছিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। আমরা সাধারণ যাত্রী হইতে একটু স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে ভৃত্যেরা গিয়া তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছিল, পৌছিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

পরদিন সকাল বেলা আমরা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। খানিকটা গিয়াই এক গভীর অরণ্য। ঘোর অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু কোন প্রকারে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তা হারাইয়া ক্রমেই আরও গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। আর চলিবার উপায় নাই। হঠাৎ শব্দ শুনিয়া বন্য জন্তু ভ্রমে মহা ভীত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু একটু মনোযোগ দিতেই শুনিতে পাইলাম এক সন্ন্যাসী বলিতেছেন, "তুম লোক গলৎ কিয়া, ডাইনা তরফ যাও।" তখন তিন বন্ধু ডাইনা তরফ হাতড়াইতে হাতড়াইতে পুনরায় রাস্তায় পড়িলাম। বেলা ৮টার সময় আমরা পিশুঘাটি অর্থাৎ পিছল পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এই পর্ব্বত, সাগর সমতল হইতে

১১০০০ হাজার ফিট উচ্চ এবং এত চড়াই যে একটু বৃষ্টি কিংবা বাতাস হইলে আর চলিবার উপায় নাই। ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি না হওয়ায় আমরা প্রায় এক ঘণ্টা ক্রমাগত উঠিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইখানে পুনরায় 'প' বাবুর সহিত দেখা হইল। আমরা দল ছাড়াইয়া রাস্তা হারাইয়াছিলাম শুনিয়া তিনি মৃদু তিরস্কার করিলেন।

পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে পাদদেশে "শেষ নাগ" হ্রদ দেখা যাইতেছে—আর দারুণ শীতে জমিয়া যাইবার সম্ভাবনাও বাড়িয়া উঠিতেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা হ্রদের তীরে পৌঁছিলাম। হ্রদটি প্রায় দুই মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া। অপর পার্শ্বেই বিরাট উন্নত পর্ব্বত "কোণেই" চিরতুষারে আবৃত! সেই তুষার রাশি বা গ্লেসিয়ার প্রায় হ্রদের জল স্পর্শ করিয়াছে। এই হ্রদ নাগরাজ বাসুকীর আবাসস্থল বলিয়া সকল যাত্রীই এখানে স্নান দান করে। 'প' বাবু এই তুষার-শীতল জলে অবগাহন করিলেন। আমরা বিকল্পে স্নান সারিয়া লইলাম। ডোগরা বন্ধু তীরে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে, একটি উন্নত মস্তক বহু ফণাবিশিষ্ট সরীসৃপের মত প্রাণীকে তিনি দূরে সন্তরণ করিতে দেখিয়াছেন। আমি কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ঘোষ মহাশয় গম্ভীর হইয়া গেলেন—নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে ডোগরা বন্ধু নাগরাজের দর্শনলাভ করিয়াছেন। 'প' বাবুরও সেই বিশ্বাস। Mr J র পশার বেজায় বাড়িয়া গেল। আমি কুটিল কটাক্ষের সহিত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ইসারা করিলাম, কিন্তু তাঁহার কোন ভাবান্তর হইল না।

সেই তুষার পর্ব্বত বা গ্লেসিয়ার ডানদিকে রাখিয়া আমরা পুনরায় পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। এই পাহাড়

পহিলগাঁও মোটরের পথ

অতিক্রম করিয়াই সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা শিবির সন্নিবেশ করিলাম।

পর দিন ১৭ই প্রত্যুষে আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখন চারিদিকেই বরফ, কিন্তু রাস্তায় বরফ পড়িতেছে না। দারুণ শীতে হাত পা জমিয়া যাইতেছে। প্রায় ১২টায় আমরা "পঞ্চ তরণী" পৌঁছিলাম। একটি মাঠের মত বিস্তৃত উপত্যকায় ৫টি পার্ব্বত্য নদী ছুটাছুটি করিতেছে, এই পঞ্চ তরণী। আমরা ক্রমে ৫টি নদীই পার হইয়া গেলাম। কি মহান্ দৃশ্য। চারিদিকেই তুষার মণ্ডিত উন্নত পর্ব্বতশ্রেণীর তুঙ্গ শৃঙ্গ, আর মধ্যে মধ্যে সেই সীমাহীন তুষাররাজি বিগলিত হইয়া বিশাল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিতেছে। জনপ্রাণী বৃক্ষলতার চিহ্নও নাই। হাস্য পরিহাসের ইচ্ছা আর কাহারও ছিল না। কে যেন মস্তক অবনত করিয়া দিতেছিল। এই পঞ্চতরণী উপত্যকা সাগর সমতল হইতে ১৩০০০ হাজার ফিট উচ্চ। শেষ নদীটির নামও পঞ্চতরণী—তাহার তুষার শীতল স্বচ্ছ জলে সকলেই স্নান দান করিলাম। মনে করিয়াছিলাম জমিয়া যাইব, কিন্তু স্নানান্তে যেন অপেক্ষাকৃত আরাম বোধ হইল। এইখানেই আজ রাত্রিবাস। কাঠও পাওয়া গেল না।

তখন কয়েক বন্ধু বাহির হইয়া অতি কষ্টে একরকম ক্ষুদ্র ঝাউগাছ যোগাড় করিলাম, তাহা দিয়াই আগুন জ্বালিয়া কোনরূপে রাত্রি কাটাইলাম।

পর দিন (১৮ই) প্রভাতে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া রওনা হওয়া গেল। সম্মুখেই এক বিরাট পর্ব্বতপ্রাকার। প্রায় ৩০০০ ফুট উঠিয়া আমরা তাহার শৃঙ্গ পাইলাম। এই ১৬ হাজার ফুটেও কোন বরফ নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না। এখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড়ই গম্ভীর। অগণিত তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর প্রভাত সূর্য্যের কিরণে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় ১০০০ হাজার ফিট নামিতেই সমস্তই বরফ। অমরা বরফের উপর দিয়াই চলিলাম। নীচে বরফ গলিয়া জল হইয়া ছুটিতেছে। প্রায় দুই মাইল এইরূপ গিয়া আমরা তীর্থযাত্রীর পরম ধাম 'অমরনাথ' পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। সহসা সহস্র নরনারী সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন সমস্ত অহঙ্কার সমস্ত অবিশ্বাসের বাঁধ হেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ হইতে জয়ধ্বনি নির্গত হইল!

এখানে স্নান দানে অশেষ পুণ্য। উপর হইতে বরফ গলিয়া ঝরণা পড়িতেছে, নাম "অমর গঙ্গা"। আমরা সকলেই জল লইয়া মস্তকে স্পর্শ করাইলাম, কিন্তু সঙ্গী 'প' বাবু সেই বরফের জলে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে আমাদের সহিত উপরে উঠিতে লাগিলেন—সে দারুণ শীত ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এই তো তীর্থ মাহাত্ম্য। প্রায় ২০০ফিট উপরে উঠিয়া হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ—'অমর নাথ' গুহাদ্বার। দ্বার অবারিত। ধনী দরিদ্র কাহারও প্রবেশ নিষেধ নাই। প্রকাণ্ড গুহা প্রায় ১৫০ ফিট×১৫০ ফিট এবং উচ্চতাও প্রায় ঐ রূপই হইবে। গুহায় প্রবেশ করিয়া অসীম আগ্রহের সহিত দেব মূর্ত্তির সন্ধানে ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখি, প্রবেশ দ্বারের বিপরীত দিকে দেয়ালের ২।৩ ফুট দূরে ৮।৯ ফুট উচ্চ ও ১০।১২ ফুট চওড়া এক বিশাল বরফের লিঙ্গ মূর্ত্তি। ইনিই অনাদি অলোকসম্ভব, হিন্দুর সাধনার ধন "অমরনাথ।" এখানে কোন প্রস্তর বা ধাতুমূর্ত্তি নাই। এই বরফের লিঙ্গ মূর্ত্তি কোথা হইতে কিরূপে আসিল এবং কেমন করিয়াই বা শতাব্দীর পর শতাব্দী এই নির্জ্জন জলহীন বৃক্ষলতা বর্জ্জিত পর্ব্বত গুহা মধ্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ আজ পর্য্যন্ত কেহই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় কারণান্বেষণ করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অসীমের সান্নিধ্যে কি এক যাদুমন্ত্রে যেন প্রস্তর পুত্তলিকার মত নির্ব্বাক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম—ভাবিবার শক্তিও বোধ হয় ছিল না। শাস্ত্রের মতে নিষ্ঠাবান 'প' বাবু শিশুর মত উলঙ্গ হইয়া এই লিঙ্গ মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিলেন।

সকলের পূজা দানাদি হইলে আমরা আবার ফিরিয়া আমাদের পঞ্চতরণীর তাঁবুতে আসিলাম। তখন বেলা প্রায় আড়াইটা। তাঁবু তুলিবার হুকুম দিয়া আমরা রওনা হইলাম। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও শ্বাশবাটি পর্ব্বতের মস্তকে (৪০০০ হাজার ফিট) পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একটী ক্ষুদ্র হ্রদ (হত্যা তলাও) ডানদিকে রাখিয়া আমরা আবার নামিতে লাগিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ হঠাৎ চারিদিকে কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাত আরম্ভ হইল। মেঘের উপর মেঘ নীচ হইতে উঠিয়া রাস্তা ঢাকিয়া ফেলিল। এ দুর্য্যোগে আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম। অসহ্য শীতে হাত পা অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, আর সেই বরফগুলি ঝড়ের বেগে তীরের ফলার মত চোখে মুখে বিঁধিতেছিল। 'প' বাবুর ডাণ্ডির একটী বাহক অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল; আর দুইটী বাহক তাহাকে টানিয়া লইতে লাগিল। 'প' বাবুও বাধ্য হইয়া নামিয়া অতি কষ্টে সেই পিচ্ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ধীরে ধীরে আবার চলিতে লাগিলেন। আর একটু যাইতেই তাঁহার হাত পা অসাড় হইয়া ক্রমে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। একটী বাহক ও আমি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। বাহকটী মুসলমান, সে "আল্লা বাঁচাও" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। আমি তাঁহার হাত পা রগড়াইতে লাগিলাম। ২।৩ মিনিট পরে তাঁহার জ্ঞান হইল। এমন সময় বালক ভৃত্য হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে ডোগরা বন্ধুর পা অসাড় হইয়া

গিয়াছে এবং ঘোষ মহাশয় অশ্ব হইতে পতিত হইয়া আহত হইয়াছেন। সে আরও বলিল যে সংবাদ দিবার বা লইয়া আসিবার পথে একটী ঘোড়া ও দুটী মানুষের মৃত দেহ দেখিয়াছে। স্থানটীর নাম "হত্যা তালাও" রাখিবার সার্থকতা আছে।

এই খানে সকলে আবার দলবদ্ধ হইয়া, আরও ২.৩ হাজার ফুট নামিয়া রাত্রি প্রায় ৮টায় "অস্তাল মার্গ" (১১০০০ ফিট) পৌছিলাম। চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত এই অতি ক্ষুদ্র উপত্যকা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নালার সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। আমাদের তাঁবু তখনও পৌছে নাই অথচ আমরা অতিশয় পরিশ্রান্ত। একটু দূরে ৩টী তাঁবু'তে আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া সেই দিকে গেলাম। ভিতরে ১৫।২০টী লোক আছে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য একটু আশ্রয় ও আগুন ভিক্ষা করিলাম, কিন্তু সেই পাঞ্জাবী বীর বৃন্দ আমাদিগকে হাঁকাইয়া দিয়া দিব্য আনন্দে গল্প গুজব করিতে লাগিলেন। 'প' বাবু, Mr J ও ঘোষ মহাশয় সকলেই অতিশয় অসুস্থ। কিন্তু উপায় নাই। এক ঘণ্টা মৃত্তিকাসনে থাকিবার পর তাঁবু ও লোক জন পৌছিল। আমি অতি কষ্টে আগুন করিলাম। অনাহারে অনিদ্রায় সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

সূর্য্যোদয়ের সহিত আমরা তাঁবু গুটাইয়া রওনা হইলাম। তখন আর মেঘ বৃষ্টি নাই। আকাশ পরিস্কার হইয়া গিয়াছে, বন্ধুগণও অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন। এবার আমরা বিভিন্ন পথে চলিয়াছি। সমস্ত দিন ও রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত চলিয়া আমরা অতি দুর্গম পর্ব্বত পথে পহিল গাঁও ছাড়াইয়া একেবারে গণেশপুরায় পৌছিলাম। সমস্ত দিন অনাহারের পর, রাত্রি ১২টার সময় আমাদের আহার হইল। এই বারে মনে হইল যে এ যাত্রায় প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। ডোগরা বন্ধু বলিলেন এ আনন্দে আজ

অমরনাথ

রাত্রিতে নিদ্রা না গিয়া সঙ্গীতালাপ করা যাউক। পরিশ্রান্ত ঘোষ মহাশয় জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বন্ধু কিছুতেই ছাড়েন না—গোলযোগে 'প' বাবু আসিয়া তাঁহাকে নিজের ঘরে ধরিয়া লইয়া গেলেন। আমাদের নিদ্রার উপায় হইল।

পর দিন (২০শে) গণেশপুরা হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ৩টায় আমরা মাটনে পাণ্ডার বাড়ী পৌছিয়া চা পান ও জলযোগ সারিয়া সন্ধ্যায় "খানাবল" পৌছিলাম। সেখান হইতে Mr J টঙ্গায় শ্রীনগর রওনা হইলেন কারণ তাঁহাকে পরদিন আফিস করিতে হইবে। আমরা 'ডুঙ্গা' বা নৌকায় রওনা হইয়া রাত্রিতে নদীবক্ষেই নিদ্রা গেলাম।

সকাল বেলা (২১শে) উঠিয়াই দেখি সে এক অনন্ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়াছে। ঝেলমের বাঁকে বাঁকে নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আহারের বিষয় ভুলিয়া গেলাম। ৯টার পর 'পামপুর' পৌছিয়া আহারাদির ব্যবস্থা হইল। প্রায় ৫টায় শ্রীনগরে ফিরিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে সুস্থ শরীরে ফিরিতে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

সেবিকা

(গল্প)

হরকুমার সদরের একজন নামজাদা উকিল। তাঁহার মাসিক উপার্জ্জন পাঁচ ছ' শ টাকার কম নহে। গত কল্য তাঁহার পত্নী স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া তিনটি পুত্র একটি বিধবা ও একটি কুমারী কন্যা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। হরকুমার প্রবীণ হইয়াও নবীনের মত পত্নীশোকে নিরতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

রাত্রি প্রায় বারোটায় হরকুমারের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ভোরের কিছু পূর্ব্বে দাহ শেষ করিয়া শ্মশান বন্ধুরা ফিরিয়া আসিয়াছে। হরকুমার প্রায় এক ঘণ্টা স্ত্রীর মৃতদেহ জড়াইয়া উঠানেই পড়িয়া ছিলেন, তার পর কাহারও নিষেধ না মানিয়া শ্মশানেও গিয়াছিলেন। তিনি শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর অন্দরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, বৈঠকখানার একটা আরাম চৌকিতে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ফীত রক্ত চক্ষুর শূন্য উদাস দৃষ্টি উর্দ্ধে কড়িকাঠে বদ্ধ রহিল।

হরকুমার একজন বড় উকিল, সুতরাং তাঁহার বন্ধু বান্ধবের অভাব ছিল না। প্রভাতে বন্ধুরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার বৃহৎ বৈঠকখানা ভরিয়া তুলিতে লাগিল। ইঁহাদের অনেকেই সংবাদটা রাত্রে শুনিলেও, সমবেদনা প্রকাশের জন্য তত রাত্রে উঠিয়া আসিতে পারেন নাই।

অতুলবাবু হরকুমারকে সম্বোধন করিয়া সহানুভূতি সূচক স্বরে বলিলেন, "ভোর বেলা এই দুঃসংবাদ শুনলাম। শুনে যে কি পর্য্যন্ত হয়ে হয়ে গেছি, তা আর কি বলব! যদি কোন রকমে রাত্তিরে শুনতে পেতাম তা হলে—"

তাহা হইলে তিনি যে কি করিতেন, তাহা আর বলিলেন না। কিন্তু গিরিশ বাবু যেন তাঁহার হইয়াই বলিলেন, "আমরা সবাই এসে তাঁকে একবার শেষ দেখা দেখে যেতাম। একাধারে এতটা রূপ গুণ বুদ্ধি ত আর দেখব না।"

পরেশবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "মশায়, শুধু রূপ গুণ বুদ্ধি? এমন সৌভাগ্যই বা ক' জনের হয়? খবরটা শুনে আমাদের ওঁরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, 'আহা-হা, কি ভাগ্যি! আমি যদি অমনি করে তোমার পায়ে মাথা রেখে ছেলেদের দেখতে দেখতে মরতে পাই, তা হলে আর কিছুই চাই নে।"

এই সকল কথা শুনিয়া আবার হরকুমারের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিলেন।

বিনোদবাবু এতক্ষণ নীরবে একধারে বসিয়া সব শুনিতেছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যা-শিক্ষার সীমা 'হিতোপদেশ' পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার এক অধ্যায় পাঠ করিতেন। গীতার অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ। অবসর মত তিনি গীতার বাঙ্গলা অনুবাদও পড়িতেন। তিনি হরকুমারের নিকটতম প্রতিবেশী এবং তাঁহাকে দাদা বলিতেন। তিনি বলিলেন, "দাদা, চোখের জল ফেলবেন না। শ্রীভগবান বলেছেন—

'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

আপনি শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি,—আপনার কি এমন অধীর হওয়া, এতটা শোক করা সাজে? জানেন তো যে,—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

দেহটার জন্তে এতটা শোকই বা করছেন কেন? আত্মার ধ্বংস ত নেই।"

হরকুমার বলিলেন, "সবই জানি বিনোদ, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মনকে যে বোঝান যায় না। পঁচিশ বছর যাকে নিয়ে ঘর করেছি"—হরকুমারের আর কণ্ঠ ফুটল না। কিন্তু সেই বাষ্পরুদ্ধ বেদনার্ত্ত কণ্ঠ উপস্থিত সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করিল।

অতুলবাবু বলিলেন, "যা বলছেন হরকুমার বাবু তা ঠিক। পঁচিশ বছর সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে যাকে নিয়ে ঘর করা যায়, গীতার দুটো শ্লোক শুনেই তাকে ভুলে যাবেন? প্রিয়জনের অভাব যখন চারিদিক থেকে দৈত্যের মত গিলতে আসে, বুক যখন জ্বলে ওঠে, মন যখন হাহাকার করে, তখন গীতা উপনিষদ কিছুই মনে থাকে না। পরের বেলায় গীতার শ্লোকে যতই সান্ত্বনা প্রলেপ হোক না কেন, নিজের বেলায় ওর মধ্যে কোন সান্ত্বনাই অ মরা পাইনে।"

এই স্পষ্ট কথায় বিনোদবাবু কতখানি তৃপ্তিলাভ করিলেন, বলা যায় না; কেন না তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। পরেশবাবু বলিলেন, "ভগবানের বিচারের যখন আপিল চলবে না, তখন আর কি করা? তাঁর বিধান মাথা পেতে নিতেই হবে। ভাগ্যবতী চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র স্মৃতি রয়েছে, তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যেও তিনি আপনাকে আংশিক ভাবে রেখে গেছেন। এই নিয়েই এখন হরকুমারকে থাকতে হবে। আর কি উপায় আছে?"

সকলেই পরেশবাবুর কথা সমর্থন করিয়া মৃতার গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজেদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। তারপর বাবুদের কেহ বা হাতের কেহ বা পকেটের ঘড়ি দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেরই আফিস আদালত আছে যে। তাঁহারা একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া "ও-বেলা আবার আসব" বলিয়া একে একে চলিয়া গেলেন। চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু দু' তিন জন জুনিয়র উকীল বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের কেহ বা ব্যবসা সম্বন্ধে হরকুমারের নিকট উপকৃত, কেহ বা উপকারের আশা রাখেন। কাছারি যাওয়ার গরজও তাঁহাদের খুব বেশী ছিল না। গাউন কাঁধে ফেলিয়া তাঁহারা প্রতিদিন আদালত-তীর্থ দর্শনে গেলেও, গল্পগুজব এবং সংবাদ পত্র পাঠে অধিকাংশ সময় বার লাইব্রেরীতেই অতিবাহিত করিতেন।

জুনিয়র উকিলদের সকাতর অনুরোধে অবশেষে হরকুমার অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে মাতৃহারা শোকবিহ্বল ধূল্যবলুণ্ঠিত পুত্র কন্তা এবং শূন্ত মন্দির দেখিয়া তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; উকীলদের উপস্থিতি সত্বেও তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

২

হরকুমার ও বিনোদ বাবুর বাসার মাঝখানে একটি প্রাচীর মাত্র ব্যবধান। উভয় বাসার লোকের যাতায়াতের জন্ত প্রাচীরের গায়ে একটি দরজা।

রবিবার মধ্যাহ্নে বিনোদবাবু বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন হরকুমারের বড় মেয়ে অনিমাকে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে সহসা উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "এস মা, এস।"

অনিমার বয়স সতেরো আঠারো হইবে। বছর দুই হয় সে বিধবা হইয়াছে। বাড়ীর বাহির সে বড় হইত না, পূজা আহ্নিক লইয়াই ঘরের মধ্যেই থাকিত। মা বাবা তাহাকে শ্বশুরবাড়ীও পাঠাইতেন না। মাতৃবিয়োগে এই মেয়েটির ক্ষতি সব চেয়ে বেশী হইয়াছে মনে করিয়া বিনোদবাবু তাহার অত্যন্ত ম্লানমুখ, খাটো করিয়া কাটা রুক্ষ চুল, এবং নিরাভরণ দেহপানে চাহিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "এমন সময়ে কেন মা?"

অনিমা চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কাকা, আপনার কাছে বড্ড দরকারী কাযে এসেছি। মাকে ত হারিয়েছি, বাবাকেও বুঝি—" বলিয়া সে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অনিমার চোখের জল দেখিয়া বিনোদ বাবুর গীতার

কথা মনে পড়িল না। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার বাবার কি হয়েছে অণিমা ?"

অণিমা চোখের জল মুছিয়া স্থির হইয়া বলিল, "তিনিও আমাদের মত হবিষ্যি করছেন, শুধু কম্বল পেতে রাত্রিতেও মেঝেয় পড়ে থাকেন। জামা, জুতো, গরম কাপড় কিছু ব্যবহার করেন না। পরশু তাঁর জ্বর হয়েছে। এই দারুণ শীতে এই রকম করলে তাঁর শরীর ক'দিন টিকবে আর ?"

বিনোদ বাবু দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "আহা, শরীরটা এমন করে ধ্বংস করছেন ! আচ্ছা তুমি যাও মা, আমি এখনি যাচ্ছি।"

"শীগ্‌গিরই আসবেন কাকা, বাবা আমাদের কথা শোনেন না। আপনি বল্লে যদি শোনেন।"—বলিয়া অণিমা চলিয়া গেল।

বিনোদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মিন্সেদের ঢং দেখে আর বাঁচিনে !"

বিনোদবাবু বলিলেন, "কেন বল দেখি ? বিধবারা স্বামীর জন্যে কত ত্যাগ করে; কৈ তাতে তো কিছু বল না। স্ত্রীর জন্তে স্বামী কিছু করলেই ঠাট্টা কর কেন ? স্বামী কি স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে না ?"

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া জবাব দিলেন, "তুমিও তো পুরুষ মানুষ। তোমাকে আমার কথা বোঝাতে পারব না, কোনও মেয়েমানুষ হলে আমার কথা বুঝতো।"

"বিধাতা আমাকে পুরুষ করেছেন, কি আর করব বল ? তোমার কথা এ জন্মে আর আমার বোঝা হ'লো না। যাই একবার হরকুমার দাদার কাছে।" বলিয়া বিনোদবাবু বিশ্রাম শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

ভূমিতলে কম্বল বিছাইয়া হরকুমার বিনা উপাধানে শয়ন করিয়া ছিলেন। পুত্র কন্যারা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। সকলেরই শোক বেশ, ম্লান গম্ভীর মুখ। তাহারা যেন তাহাদের সুখ ও আরাম মায়ের তর্পণে নিবেদন করিয়া দিতেছিল। বিনোদবাবু আসিয়া ইহা দেখিলেন। দৃশ্যটি তাঁহার অতিশয় পবিত্র ও মধুর বলিয়া মনে হইল। সে কক্ষে খাট চৌকি প্রভৃতি কিছুই ছিল না। মনিবের আদেশে ভৃত্য আসিয়া বিনোদবাবুর জন্য একখানা বেতের চৌকি রাখিয়া গেল। বিনোদবাবু তাহাতে বসিয়া কক্ষের সংযম-পবিত্রতা অপচিত করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, কম্বলের উপরই উপবেশন করিলেন। তাঁহার আগমনে অণিমার ইঙ্গিতে ছেলে মেয়েরা উঠিয়া গেল, অণিমা নিজেও উঠিল।

হরকুমার ঘণ্টা খানেক বসিয়া বিনোদবাবুর কাছে স্ত্রীর কথাই বলিলেন। স্ত্রী কবে কি বলিয়াছেন, কবে কি করিয়াছেন—এই সব কথাই হইল। পরিশেষে বিনোদবাবু বলিলেন, "অণিমার কাছে যা শুনলাম, তাতে আপনার শরীর বেশী দিন টিকবে না। আপনার এই সব আচরণে ছেলে মেয়েরাও তো কম দুঃখ পাচ্ছে না। আপনার কথা বলতে গিয়ে অণিমা তো কেঁদেই ফেল্‌লে। আপনার স্বর্গগতা স্ত্রী আপনার কষ্ট দেখে কি তৃপ্তি পাচ্ছেন ?"

হরকুমার বলিলেন, "এ তো তাঁর তৃপ্তির জন্তে নয় ভাই, এ আমার নিজের জন্তে। তাঁর জন্তে এই কষ্ট টুকু স্বীকার ক'রে মনে মনে একটু তৃপ্তি পাচ্ছি।"

এই কথার উপর কথা বলা অনুচিত বুঝিয়াও বিনোদবাবু অণিমার চোখের জল স্মরণ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু মনের সঙ্গে দেহের সব সময়ে ঐক্য থাকে না বোধ হয়। নইলে আপনার জ্বর হ'লো কেন দাদা ?"

হরকুমার ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "চমৎকার বিছানায় শুয়ে, ঢের গরম কাপড় গায় দিয়েও জ্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ভায়া হে, ওটা হচ্ছে শরীরের ধর্ম্ম; ওটাকে কিছুতেই ঠেকান যাবে না।"

বিনোদবাবু কিছুক্ষণ অন্য কথা বার্ত্তার পরে উঠিয়া গেলেন।

হরকুমার আবার ছেলে মেয়েদের ডাকাইয়া কাহারও গায়ে, কাহারও মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলেন। অপরিসীম স্নেহাদরের আবরণে ঢাকিয়া এই মাতৃহারাদের অভাব কি তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না? ভাগ্যবতী ইহাদের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব রাখিয়া গিয়াছেন। ইহারা কিছু সময়ের জন্ত চোখের আড়াল হইলেও হরকুমার অস্থির হইয়া উঠেন।

অশৌচান্তে হরকুমার মহা সমারোহে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শ্রাদ্ধের দান ও ভোজন ব্যাপারে ছেলে মেয়েরা পরম তৃপ্তি লাভ করিল। পুত্রকন্তার তৃপ্তিতে তাহাদের মায়ের তৃপ্তি অনুভব করিয়া হরকুমার নিজেও অতৃপ্ত রহিলেন না। নিমন্ত্রিত ভদ্র এবং অনিমন্ত্রিত ইতর দরিদ্র দিগের ভোজন হইয়া গেলে, তিনি গভীর রাত্রে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষ প্রাচীরে তাঁহার স্ত্রীর তৈলচিত্র পুষ্প-সজ্জিত হইয়া যেন হাসিতেছিল। এ ছবিখানা তাঁহার যৌবনের। হরকুমার পলকহীন নেত্রে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। ঢলঢলে হাসি হাসি সুন্দর মুখ-খানি ভাসা ভাসা চোখ দু'টির সপ্রেম দৃষ্টিদ্বারা যেন স্বামীকে অভিনন্দিত করিতেছিল। পলকে হর-কুমারের বিবাহিত জীবনের কত কথা মনে পড়িয়া গেল। সহস্র সুখের স্মৃতি মণ্ডিত সেই কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া তিনি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

৩

ছয়মাস চলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধিমতী অণিমার মধুর সংযত স্বভাবে এবং গৃহিণীপনায় হরকুমারের সংসার পূর্ব্ব নিয়মেই চলিতেছিল; কিন্তু কিছুদিন হইল তাহাকে শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইয়াছে। শ্বশুর মৃত্যু-কালে অণিমাকে একটা সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় হাজার টাকা। শ্বশুর-গৃহে বসবাস করিলে অণিমা ইহা ভোগ দখল করিতে পাইবে, নহিলে নয়। কাযেই হরকুমার মেয়েকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়াছেন। অণিমা স্বয়ং বিষয়ের প্রয়োজন খুব বেশী অনুভব না করিলেও, বৈষয়িক পিতার যুক্তি এবং উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই।

গৃহে এখন সর্ব্বত্রই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। হরকুমার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। সম্প্রতি তিনি পিতৃ-মাতৃ হারা দু'টি শিশু ভাগিনেয় লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আর সহিতে না পারিয়া এক-দিন বিনোদ বাবুকে বলিলেন, "এখন কি করি বল তো? গৃহ যে আমার অরণ্য হয়ে উঠেছে। অসুখ হলে একটু সেবা পথ্য পাইনে। সুস্থ শরীরে রোজ আধসেদ্ধ তরকারী খেয়েই কাছারি যেতে হয়। কাছারি থেকে খেটে খুটে এসে জল খাবার প্রায় পাওয়া যায় না; কেননা জল খাবার রাখতে এদের ভুল হয়। যদি বা ভুল না হয়, তবে যা খাবার রাখে, তা মুখে দেওয়া যায় না। কাপড় চোপড় কত যে ইঁদুরে কাটে, কত যে হারিয়ে যায়, তার ঠিক নেই। আগে যা চাল, ডাল, তেল, ঘি, কাঠ কয়লা আনা হতো, এখন তার দ্বিগুণ আনা হয় তবু কুলোয় না। কি করি বল তো?"

বিনোদবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাই তো!"

হরকুমার সহাস্তে বলিলেন, "এসম্বন্ধে তোমার গীতায় কোন উপদেশ নেই?"

বিনোদ মনে মনে বলিলেন, "আছে বৈ কি; কিন্তু আমরা তা পালন করতে পারি কৈ? আবশুক হ'লে শোক বরং ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু ওটা পারিনে!" প্রকাশ্যে বলিলেন, "এ সময়ে অণিমাকে—"

"সে হবে না। দেখ, আমার তিনটি ছেলে একটি অবিবাহিতা মেয়ে; তার ওপর ভাগনে দু'টি এসে জুটেছে। অণিমার জন্তে যে আমি কিছু রেখে যেতে পারি, এমন সম্ভাবনা নেই। অথচ আমার সুবিধার জন্তে তার শ্বশুরের সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করব কোন্ অধিকারে? কে বা ভাগনে দু'টি মানুষ করবে? হা ভগবান, আমায় এমন বিপদে ফেলে!"

বিনোদবাবু বহু চিন্তা করিয়াও হরকুমারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না।

বৈকালে হরকুমার টম্ টমে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন, পথে পরেশবাবুকে দেখিতে পাইয়া টম টমে তুলিয়া লইলেন। তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে নিজের দুর্দ্দশার ইতিহাস বন্ধুকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই করুণ ইতিহাস শুনিয়া পরেশবাবু ললাট কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "বড়ই মুস্কিলে পড়েছ তুমি! কি যে করা, ভেবে পাইনে। তোমার বড় ছেলের বয়স একুশ হবে। তার এখন বিয়ে দিতে পার বটে, কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে দেওয়া আমি উচিত মনে করিনে। বিয়ে দিলেও সেই বৌ এসে যে তোমার সেবা, ভাগনে দু'টির পালন এবং সংসার দেখা শোনার সম্পূর্ণ ভার নিতে পারবে, আমার তো তা মনেই হয় না। স্ত্রীর অভাব কেউ পূর্ণ করতে পারে না, বিশেষতঃ এই বয়সে। এখন দেহটা একটু নিরিবিলি আরাম চায়, সেবা চায়।"

হরকুমারের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যেন একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল। তিনি কথা কহিলেন না।

পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স বোধ-হয় আটচল্লিশের বেশী হয়নি, নয় হয়?"

"তা না হতে পারে, তাতে কি হলো? বাঙ্গালীর বয়স ও স্বাস্থ্যের পক্ষে একে বার্দ্ধক্য বলা যেতে পারে। এই বয়সে কি আমার এত দুঃখ অসুবিধা সয় ভাই? এখন সেবা চাই।"

"তা ঠিক, তা ঠিক্। তোমার এখন একজন যথার্থ দরদী সেবক বা সেবিকার প্রয়োজন। আমি বলি কি, একটি ডাগর দেখে মেয়ে যদি তুমি নিজে বিয়ে কর—"

হরকুমার আঁৎকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বল কি তুমি! এই বয়সে বড় বড় ছেলে মেয়ের সামনে আমি কি এখন টোপর মাথায় দিয়ে বর সাজতে পারি?"

পরেশবাবু বলিলেন, "যা বলছ, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু এও বলি, এখন প্রণয়ের জন্যে স্ত্রীর প্রয়োজন না থাকলেও, সেবার জন্যে একটি সেবিকার প্রয়োজন খুবই আছে; তা তুমি অস্বীকার করতে পার না।"

হরকুমার স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করিলেন না। সেদিন আর এ আলোচনা হইল না। পরেশ বাবু পরদিন সুযোগ বুঝিয়া কথাটা আবার পাড়িলেন। হরকুমার সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু পরেশ বাবু তাহাতে দমিলেন না, উপর্য্যুপরি কয়েক দিন কথাটা উত্থাপন করিলেন। হরকুমার রাজি হইলেন না। কিন্তু শেষ দিন তাঁহার হাস্যের উচ্চতা এবং আপত্তির তীব্রতার কিছু হ্রাস হইল। পরেশ বাবুর যুক্তি অত্যন্ত জোরালো। তিনি বলেন, "সেকালে চব্বিশ বছরের বর আট বছরের কনের পাণিপীড়ন করত; তার কারণ, তখন কনের বাজার আক্রা ছিল। এখন যদি চল্লিশ বছরের বর ষোল বছরের কনের পীড়ন করে, তবে এমন কি অন্যায় হয়? 'বরের বাজার' এখন আক্রা, কাযেই এ রকম হতেই হবে। তা ছাড়া, স্ত্রী ব্যতীত আর কার কাছে নিঃসঙ্কোচে সেবাপ্রার্থী হওয়া যায়? সব রকমের অভাব কে তার পূরণ করতে পারে? সংসারের উন্নতির জন্যে কে আর প্রাণ-পণ করতে যাবে, কার এমন দায় পড়েছে? তোমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর ছাড়া তার কারো স্বার্থ সমান ভাবে জড়িত থাক-বার কথা নয়।"

পরেশ বাবু রবিবার আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া হর-কুমারকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করিল একটি ষোল বছরের মেয়ে। আহা-রাদির পর পরেশ হরকুমারকে বলিলেন, "যে মেয়েটি ভাত দিলে, দেখলে তাকে? ওটি আমার পিসশাশুড়ীর মেয়ে। তিনি ওকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। এখনো মেয়েটির বিয়ে হয়নি। বল যদি, মেয়েটি তোমার জন্যে রেখে দিই।" বলিয়া তিনি মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মপটুতার অনেক প্রশংসা করিলেন।

ভাত দেওয়ার সময়ে হরকুমার মেয়েটির দিকে তেমন ভাবে চাহিয়া দেখেন নাই ; কিন্তু সে যখন আবার পান লইয়া আসিল, তখন বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়া লইলেন। মেয়েটির রূপ চলনসই, কিন্তু দেহটি নিটোল স্বাস্থ্য পূর্ণ। তরুণ যৌবনের লাবণ্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছিল। একটু বিশ্রামের পর হরকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। তারপর তিন চার দিন ধরিয়া পরেশচন্দ্র কথিত বিবাহের অনুকূল যুক্তির কথাগুলি ভাবিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিন পরেশবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হর, কি স্থির করলে ? পিসিমা তো শীগ্‌গিরই চলে যাচ্ছেন, দেশে গিয়েই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করবেন। তোমার কথা বলব তাঁকে ? জানাশোনা এমন ভাল মেয়ে, এমন নিপুণ সেবিকা সব সময়ে পাওয়া যাবে না।"

হরকুমার অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আমার পক্ষে এখন ভালই বা কি, মন্দই বা কি, তা আমি বুঝতে পারছিনে ভাই পরেশ।"

পরেশবাবু হরকুমারের কাঁধে হাত রাখিয়া স্নেহের সুরে বলিলেন, "সে তোমার বুঝে কাযও নেই। বোঝবার ভার আমাকে দাও।"

হরকুমার কথা কহিলেন না।

পরেশবাবু তৎক্ষণাৎ বাসায় যাইয়া পুরোহিত ডাকিয়া পাঁজি ঘাঁটিয়া আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে. শ্রীমতী অরুণলেখার সহিত হরকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহ রাত্রির ভোজটা বেশ জাঁকালো রকমের হইল। কাযটা পরেশবাবুর বাড়ীতে হইলেও, খরচটা হইল হরকুমারের পকেট হইতে। ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া অতুলবাবু বিনোদবাবু প্রভৃতি গল্প করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পথ চলিতে চলিতে বিনোদবাবু বলিয়াছিলেন, "পরেশবাবু শ্যালীটিকে পার করবার জন্যেই বুঝি কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ কাযটা ক'রে ফেল্লেন! হরকুমারবাবুকে একটু ভাবতেও সময় দেন নি, পাছে তিনি দ্বিমত করেন।" অতুলবাবু মুচকি হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন, "আপনার সন্দেহ অমূলক কি সমূলক বলা কঠিন।"

বিনোদবাবু বাসায় আসিয়া এই বিবাহ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "এ আর আশ্চর্য্য কি ? এ তো সবাই করছে, দরকার হলে তুমিও করবে। কিন্তু বৌ মর্‌লে এরা যখন ঢঙ্ করে, তখন আমি আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারিনে।" বিনোদ ইহার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরকুমার বাবুর ছেলে মেয়েরা আজ কি করছে ?"

"করবে আর কি ? মার জন্যে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। এতক্ষণ আমি তোদের কাছেই তো ছিলাম।"

৪

হরকুমার সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কক্ষ শূন্য। তিনি অপ্রসন্ন হইয়া ছোট মেয়েকে ডাকিলেন, "লতি'—অ লতি।"

পিতার উচ্চ কণ্ঠ শুনিয়া লতিকা ছুটিয়া আসিল। বলিল, "বাবা, কেন ডাকছেন ?"

"তোর মা কোথায় ?"

"রান্নাঘরে।"

"রান্নাঘরে এখন কি করছেন ?"

"হরি ননীকে খাওয়াচ্ছেন।"

"শীগ্‌গির তাঁকে ডেকে দে, কায আছে।"

হরি ও ননী হরকুমারের ভাগিনেয়। লতিকার মুখে স্বামীর আহ্বান শুনিয়া অরুণলেখা তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া শয়ন কক্ষে আসিল। হরকুমার স্ত্রীকে বলিলেন, "অরু, ঘরে এসে রোজই তোমাকে খোঁজা খুঁজি করতে হয়, তুমি এমন দুর্লভ হয়ে উঠলে কেন ?"

অরুণলেখার ঠোঁট দুটি সলজ্জ মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "হরি ননীকে—"

"সে জানি। কিন্তু ওদের হাত দিয়েও খেতে দিও। নইলে শীগ্‌গির খেতে শিখবে না, খারাপ অভ্যাস হয়ে যাবে।"

"লতু বল্লে, কি দরকারী বসে আছে নাকি?"

"কায না থাকলে আমার কাছে কি তোমার আসতে নেই?"

"আমি তাই বলছি নাকি? শুধু জিজ্ঞেস করছি বৈ তো নয়।"

"একদিনও তো তোমাকে ভাল কাপড় পরতে দেখলাম না। কাপড়গুলি কিনে দিয়েছি কি জন্যে?"

"কাপড় ছেড়ে আসছি।" বলিয়া অরুণলেখা চলিয়া গেল এবং কাপড় ছাড়িয়া, কিছু প্রসাধন করিয়া যথা সম্ভব সত্বর ফিরিয়া আসিল।

হরকুমার উঠিয়া স্ত্রীকে নিজের আসনের একপাশে বসাইয়া আদর করিয়া বলিলেন, "লেখা, আমি নিতান্তই তোমার প্রসাদভিক্ষু, অনন্যগতি। তোমার 'সযত্ন ওজন করা বিন্দু বিন্দু কৃপা'য় আমার আর চলছে না। কাল থেকে যেন কাছারি ফেরত, আর সন্ধ্যার পরে এসে তোমাকে এ ঘরে দেখতে পাই। গরিবের আর্জ্জি মনে থাকবে তো? কথা বলছ না কেন? বল, থাকবে। বল, বল।"

অরুণলেখা নিরুপায় হইয়া নত নেত্রে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "থাকবো।"

"বাইরে মক্কেল বসে আছে। আসি এখন।" বলিয়া হরকুমার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

অরুণলেখার বাপ ছিলেন অত্যন্ত গরিব। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে রাখিয়া বছর তিনেক হইল তিনি মারা গিয়াছেন। অভাব ও পরিশ্রমের আতিশয্যের মধ্যেই অরুণলেখা বড় হইয়া উঠিয়াছে। মাস দুই হইল অরুণলেখার বিবাহ হইয়াছে। স্বামীর ঘরে আসিয়া দাস দাসী, গৃহ সজ্জা, বসন ভূষণ প্রভৃতি দেখিয়া স্বামীর বয়সের কথা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। সর্ব্বোপরি স্বামীর আদর সোহাগ। এ রকম তো সে আর কোথাও পায় নাই। সে হাঁটিয়া গেলে যেন তাঁহার বুকে বাজে, পলকে পলকে তাহাকে চোখে হারান। স্বামীর ইচ্ছা, সে সাজিয়া গুজিয়া ফিট ফাট হইয়া থাকে। কিন্তু অত বড় বড় ছেলে মেয়ের সামনে প্রসাধন করিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে কেমন লজ্জা করিত। তাহার মা তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন, "জামায়ের মন বুঝে চ'লো মা। ডাগর হয়েছ, তোমাকে বেশী আর কি বলব, সবই তো বোঝ। তুমি ছাড়াও তার আপনার লোক ঢের আছে, কোন মতে জামাইকে অসন্তুষ্ট ক'রো না।" অরুণলেখা আজ মনে মনে সঙ্কল্প করিল, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য সে সকলই করিবে।

পরদিন সাড়ে তিনটার সময়ে অরুণলেখা সুগন্ধি সাবান ও তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিল। অনেকক্ষণ বসিয়া সে আপনাকে মাজিয়া ঘসিয়া সুন্দর করিয়া, চুল বাঁধিল। তারপর একখানি জড়িপাড় সূক্ষ্ম ঢাকাই শাড়ী পরিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথা সময় হরকুমারের গাড়ীর শব্দ শুনিয়া অরুণলেখা দ্বিতলের বারান্দায় বাহির হইয়া রেলিং-এ ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হরকুমার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া হঠাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সজ্জিত পত্নীকে দেখিয়া যে অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই অরুণলেখা বুঝিল।

হরকুমার উপরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিলেন। অরুণলেখা জল খাবার আনিয়া দিল। হরকুমার আজ অধিকতর পুলকিত চিত্তে জলযোগ করিলেন। জলযোগান্তে বলিলেন, "অরু, আজ তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

অরুণলেখা লজ্জা পাইয়া বলিল, "ছাই দেখাচ্ছে।"

"বটে! দেখবে এস" বলিয়া হরকুমার স্ত্রীকে আয়নার সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইলেন। বলিলেন, "তোমার পাশে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে জান? রাণীর পাশে—"

স্বামীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অরুণলেখা বলিল,—"ঠিক রাজা।"

"না। ঠিক যেন দাস।"

"দূর! ও-কথা বলতে নেই।"

"নেই কেন লেখা? আমাদের শাসন করতে, আমাদের ওপর প্রভুত্ব করতেই তো তোমাদের জন্ম।"

"কি জানি? আমি ও-সব বুঝিনে।"

"ক্রমে সব বুঝবে। আপাততঃ তুমি আমার কাছে বসে এই বইটা আমায় পড়ে শোনাও দেখি। আজ আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করছে না।"

ইতিপূর্ব্বে হরকুমার বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িতেন না। উপন্যাস পড়িতে হইলে ইংরেজি উপন্যাস পড়া উচিত, এই মত তিনি ব্যক্ত করিতেন। অরুণলেখা পড়িয়া শুনাইতে পারিবে বলিয়া আজ এক খানা বাঙ্গলা উপন্যাস তিনি তাহার হাতে দিলেন। অরুণলেখা পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সেই বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হরকুমার বলিলেন, "উঠলে কেন?"

অরুণলেখা বলিল, "এ বেলায় কুটনো কুটে দেবো না?"

"সে সব কাযের জন্যে ঝি চাকরই তো রয়েছে।"

"তবে আমি সারাদিন কি করব?"

"শুধু দাস দাসীর কায দেখবে, তাদের হুকুম করবে; আর—"

"তোমার সেবা করব?"

"না, সেবা করতে হবেনা। যতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে থাকি, ততক্ষণ তুমি আমার কাছে থাকলেই আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হব।"

ঝি আলো দিয়া গেল। অরুণলেখা রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত পড়িয়া বইটা শেষ করিল। কয়েক খানা বটতলার উপন্যাস ছাড়া অরুণলেখার আর কিছু পড়া ছিল না। সদ্য পঠিত বইটার সে খুব প্রশংসা করিল। বইটা একজন আধুনিক লেখকের। হরকুমার বইখানা হাতে লইয়া লেখকের নাম পড়িয়া বলিলেন, "এঁর লেখা সব বই তোমাকে আনিয়ে দেব। কালই কলকাতায় অর্ডার দেব।"

৫

দুই বছর পরের কথা।

লতিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হরকুমারের বড় ছেলে মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেছে, মেজ ছেলে অমূল্য এবার প্রশংসার সহিত আই-এস-সি পাস করিয়াছে। হরকুমারের সংসার খরচ এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অরুণলেখার দুই ভাই তাঁহার বাসায় থাকিয়া তাঁহারই খরচে পড়িতেছিল। অরুণলেখার মাকেও মাসে মাসে ২৫, ৩০৲ টাকা দিতে হইতেছিল।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে অমূল্য বলিল, "বাবা, আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে চাই।"

হরকুমার শয়ন কক্ষে বসিয়া একটা মামলার কাগজ দেখিতেছিলেন। সেই কাগজে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি বলিলেন, "খরচ কত বেড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ? এখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের খরচ চালাব কেমন করে? বি-এস-সি, টাতো পাস কর, তার পর যা হয় হবে।"

অভিমান ক্ষুব্ধ অমূল্য বিনাবাক্য ব্যয়ে কক্ষ ত্যাগ করিল। অরুণলেখা মেঝেয় বসিয়া পান সাজিতেছিল। সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "অমূল্যকে যে ইঞ্জিনিয়ারী পড়তে দিতে দিচ্ছনা; এ জন্যে লোকে তো আমাকেই দুষবে।"

হরকুমার বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে দুষবে কেন?"

"হাজার বার দুষবে! বলবে নিজের ভাইদের এনে পড়াচ্ছে, তাই তো ছেলের ইচ্ছামত পড়া হচ্ছে না। আমার নেকলেসের মত লতিকার নেকলেস হয়নি বলে তার শাশুরী আমাকে কত কি বলেছেন। ছেলে মেয়েদের ওপর তোমার যত মমতা ছিল, তাও নাকি আমি কেড়ে নিয়েছি, এ কথাও আমাকে কেউ কেউ বলেছে।"

"বলেছে তো বয়ে গেছে! ও-সব যেতে দাও।"

"আমাকে বলেছে, কাযেই তোমার বয়ে গেছে।

যাক্, পরের কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তোমার খোঁটা তো আমি সইতে পারিনে।"

"আমি তোমাকে কি খোঁটা দিয়েছি?"

"দাওনি? এখনি তো দিলে। আমার ভাইদের পড়াতে হচ্ছে, মাকে সাহায্য করতে হচ্ছে, তাই তো তোমার খরচ বেড়ে গেছে, ছেলেকে পড়াতে পারছ না? তোমার ছেলে তুমি পড়াও। আমার ভাইদের আজই বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। দু বছর আগে যদি তাদের দিন অচল হয়ে না থাকে, তো এখনো থাকবে না।"

"লেখা, ঈশ্বরের দিব্য! তুমি যা বলছ, তা ভেবে আমি অমূল্যকে কিছু বলিনি। মা'র যোগ্য ছেলে নেই, তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর ছেলে পড়ানো, এতো আমাকে করতেই হবে। ভাগনে দু'টিকে মানুষ করতে হচ্ছে, প্রফুল্লকে মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা দিতে হচ্ছে, ঈশ্বরেচ্ছায় ভবিষ্যতে আমার আরো সন্তান লাভের আশা রয়েছে, এই সব ভেবেই আমি ও-কথা বলেছি।"

"মুখে তুমি যাই বলনা কেন, মনে যা ভাব, সে আমি জানি।"

"জানি নাকি?" বলিয়াই হরকুমার স্ত্রীকে বুকে জড়াইয়া তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিলেন, "এই মুখ খানি কতক্ষণ ভাবি, তা জান অরু?"

হাত দিয়া ঠেলিয়া স্বামীর মুখ সরাইয়া দিয়া অরুণ-লেখা বলিল, "বুড়ো বয়সে আর ঢঙ করতে হবে না।"

হরকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে বুড়ো বলছ? আমি কি আর বুড়ো আছি? তোমার সংস্পর্শে যুবা হয়ে গেছি। বসন্তের স্পর্শ শীতের শীর্ণ গাছ পালা কেমন পল্লবিত, মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, দেখনি? তুমি আমার জীবনের বসন্ত।"

এমনি করিয়া নানা কথায় হরকুমার স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটাইয়া অন্য কাযে গেলেন।

সেদিন অরুণলেখা আরাম চৌকিতে শুইয়া একখানা নব প্রকাশিত উপন্যাস পড়িতেছিল। কাচের আবরণ ভেদ করিয়া স্নিগ্ধ আলোক রেখা আসিয়া তাহার স্নিগ্ধ মুখের উপর পরিয়াছিল। অদূরে হরকুমার খাটে শয়ন করিয়া সেই আলোকোজ্জ্বল মুখখানি দেখিতেছিলেন। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই নির্ব্বাক। যখন সেই নীরবতা হরকুমারের দুঃসহ হইয়া উঠিল, তখন তিনি বলিলেন, "লেখা, আমাকে দু'টো পাণ দাও না।"

অরুণলেখা বই হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল, "ঝিকে ডেকে চাও। এই পরিচ্ছেদটা শেষ না ক'রে আমি উঠতে পারছিনে।"

হরকুমার অগত্যা ঝিকে ডাকিলেন। তখন তাঁহার পাণ খাওয়ার ইচ্ছা প্রবলতম না হইলেও পাণ চিবাইতে লাগিলেন।

আবার কক্ষ নিঃশব্দ হইল। আধ ঘণ্টা পরে হরকুমার বলিলেন, "অরু, নতুন ঠাকুরটা কিছু রাঁধতে জানে না; ওকে যদি তুমি একটু দেখিয়ে দিতে। নইলে আজ হয় তো রুই মাছটা অখাদ্য ক'রে রাখবে।"

অরু বলিল, "আজ আমাকে মাপ কর, কাল থেকে দেখিয়ে দেব। এই বইটা আজই শেষ করতে হবে, যার বই তাকে কাল সকালেই ফেরৎ দিতে হবে যে।"

হরকুমার আর কথা কহিলেন না। কিন্তু ননী আসিয়া আবার শান্তি ভঙ্গ করিল। সে মামীর চেয়ার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মিনতির স্বরে বলিল, "মামিমা, মাষ্টার মশায় পড়াতে এসেছেন। আমার কলমটা তো খুঁজে পাচ্ছিনে, আমাকে আর একটা দেবে?"

অরুণলেখা রুষ্ট বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আঃ জ্বালালে! কলম কি আমার মুঠোর ভিতর রয়েছে যে যখন চাইবে, তখনি দেব? খুঁজে দেখগে, কোথায় কলম আছে। এ ঘরে দু'দণ্ড চুপ ক'রে থাকবার উপায় নেই। চার দিক থেকে সবাই আমাকে জ্বালাবে।"

ননী ধমক খাইয়া চলিয়া গেল।

৬

মাস দুই অবধি হরকুমারের শরীরটা ভাল নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া মাসে তাঁহার দুই তিন বার জ্বর হইত।

আজ আবার হরকুমারের জ্বর হইয়াছে। অরুণ-

লেখা তাঁহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তিত ভাবে বলিল, "আবার জ্বরটা হলো!"

হরকুমার স্ত্রীর বাম হাত খানি বুকে চাপিয়া বলিলেন, "হ'লো তো।"

"ডাক্তার বলেছেন, চেঞ্জে গেলে শরীর ভাল হবে।"

"একটু সুস্থ হলে তাই যাব, লেখা।"

"আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না?"

"এই অসুখ শরীরে তোমাকে ছেড়ে কি আমি দূরে থাকতে পারি? তোমার হাতের এই স্পর্শের চেয়ে বড় ওষুধ আমার কিছুই নেই।"

অরুণলেখা চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

হরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবছ অরু? আমার জ্বরের কথা?"

অরুণলেখা খোলা দ্বারপথে বাহিরে দৃষ্টিপ্রেরণ করিয়া বলিল, "না, সে জন্তে তেমন ভাবছিনে। এ জ্বর তো তিন দিনেই সেরে যাবে। আমি ভাবছি কি—"

"কি ভাবছ তবে?"

"আজ মামীমার চিঠি এসেছে। ২৭শে তাঁর ছেলের বিয়ে।"

"নিমন্ত্রণ চিঠি আমিও পেয়েছি। যা পাঠাতে ইচ্ছা, তাই পাঠিয়ে দিয়ে লিখে দাও, আমার অসুখ, তাই তোমার যাওয়া হলো না।"

"কিন্তু তাতে মামীমা খুব দুঃখ পাবেন। তাঁর ঐ একটি ছেলে, ছেলের বিয়েতে আমি যাব বলে কত আশা করেছেন।"

"তুমি কি এখন যেতে পার?"

"তুমি বল্লেই যেতে পারি। প্রফুল্ল অমূল্য দু'জনই এখানে আছে, অসুখও সামান্ত জ্বর বৈত নয়। জ্বর দু' চারদিন পরে সেরে যাবে, মামীর ছেলের বিয়ে তো আবার হবে না।"

"তা ঠিক। আচ্ছা, যাবে যাও।"

"বাঃ, অমনি রাগ হয়ে গেল! আমি যেতে চাচ্ছি নাকি?" বলিয়া অরুণলেখা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেল।

সেদিন সমস্ত ক্ষণই অরুণলেখার মুখ অন্ধকার হইয়া রহিল। পরদিন হরকুমার স্ত্রীকে বলিলেন, "আজ একুশে, দিনও ভাল; আজই মামার বাড়ী রওনা হয়ে যাও।"

অরুণলেখা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি যাব না। তোমার অসুখ, আমি গেলে তোমার সেবা করবে কে?"

হরকুমার উত্তপ্ত নিশ্বাস চপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "এ অসুখে আর সেবার দরকার কি? তুমি যাও।"

"না, আমি কিছুতেই যাবনা।" বলিয়া অরুণলেখা চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। হরকুমার তিন চার ঘণ্টা আর তাহার দেখা পাইলেন না, কিন্তু তাহার আশা-ভঙ্গ জনিত অশ্রুকণা হরকুমারের বুকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। তিনি মুহুরীকে ডাকিয়া কি বলিয়া দিলেন। ঘণ্টা দুই পরে মুহুরী সুদৃশ্য ও মূল্যবান কতক-গুলি জামা কাপড় আনিয়া মনিবের শয়নকক্ষের টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। হরকুমার তখন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ টেবিলের উপর কতগুলো কাপড় ও ব্লাউজ আছে। ও থেকে তোমার যা পছন্দ হয় রেখে, বাকি গুলো ফেরৎ দিয়ে দাও।"

অরুণলেখা বিস্ময়ের সুরে বলিল, "কাপড় ব্লাউজ কি হবে এখন?"

"বিয়ে বাড়ী যেতে হলে নতুন কাপড় ব্লাউজ চাই।"

"আমি তো যাব না।"

"যাবে বৈকি। ছি, লক্ষ্মীটি রাগ ক'রোনা।"

হরকুমারের অনেক সাধ্য সাধনার পর অরুণলেখা একটা ব্লাউজ ও একখানা কাপড় পছন্দ করিয়া আলাদা করিয়া রাখিল, নব বধূকে দিবার জন্তও একখানা কাপড় লইল। তারপর খুসী মনে মামার বাড়ী যাওয়ার আয়োজন করিতে লাগিল।

বৈকালে হরকুমার কোন মতে খিড়কীর দরজায় যাইয়া স্ত্রীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন প্রবল বেগে তাঁহার জ্বর আসিতেছিল।

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

বিপদে সম্পদ

(গল্প)

ফাল্গুন মাস।

বসন্তকালের দখিন বাতাস বিকেল বেলাটার দিকে বইতে আরম্ভ করেছিল।

গলির মোড়ে রকওয়ালা বাড়ীটার নীচের ঘরখানা আমাদের 'তরুণ' কার্য্যালয়ের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তারই ভিতর একটা আরাম কেদারায় বসে বসে আমি একজন নূতন লেখক প্রেরিত একটা গল্প পড়ছিলুম। আর পাশে বসে আমার সহকারী নরেশ, চৈত্র সংখ্যার প্রুফ্ দেখছিল।

আজ পাঁচবছর ধরে 'তরুণের' সম্পাদকতা করে কাগজ খানাকে সম্পূর্ণ সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করছিলুম। আমার কপাল জোরেই হোক কিংবা জনসাধারণের সুমতি ও কৃপালাভের জন্যেই হোক, 'তরুণ' তখনকার অন্যান্য সকল সহযোগী মাসিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

অন্যান্য দিন অনেক সাহিত্যিক আর কবি মিলে ঘরটা সরগরম করে তুলতেন; কিন্তু সেদিন কি জানি কেন তখনও কেউ এসে পৌছন নি। কাযেই নিশ্চিন্ত মনে আমরা নিজের নিজের কায করে যাচ্ছিলুম।

হঠাৎ সহ-সম্পাদক নরেশ বলে উঠল—"নাঃ এত ভুলের সংশোধন করা—ও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রেস না বদলালে আর চলছে না দেখছি।"

কথাটা শুনে হাসি পেল। কিন্তু শুধু 'হুঁ' বলেই আমি গল্পটা যেমন পড়ছিলুম, তেমনি পড়ে যেতে লাগলুম। কেননা জানতুম্ বেশীক্ষণ প্রুফ দেখতে গেলে নরেশের ঐ রকম একটা না একটা মন্তব্য করা অভ্যাস।

গল্পটার এক পাতা পড়েই রাগ ধরে গেল। এ রকম রাবিস লেখা নতুন লেখক হয়ে কি করে যে 'তরুণ' হেন কাগজে পাঠাতে সাহস করে সেই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

গল্পটা কাগজ ফেলা ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলতেই নরেশ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হল?"

"আর বল কেন? যত সব নবীন সাহিত্যিকদের জ্বালায় সম্পাদকতা ছাড়তে হল দেখছি। বাংলা ভাষার ক অক্ষর বিদ্যে নেই অথচ বঙ্কিমবাবু রবিবাবু সাজা চাই! হায় রে!"

নরেশ কিছু না বলে গম্ভীর হয়ে রইল। তার কারণ বুঝলুম। প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা যে আমার মোটেই নেই এইটেই তার বিশ্বাস। কেন না নরেশ একজন ভাল কবি হলেও, সে যখন গল্প লেখার চেষ্টা করতে গেছিল তখন আমিই তার সে চেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। কবিতা তার ভাল হলেও, গল্প তার হাতে মোটেই জমত না।

আমি নরেশের দিকে তাকিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে একটী যুবক ঘরের ভিতর ঢুকল।

যুবকটী দেখতে গৌরবর্ণ—সুশ্রী। ছিপছিপে চেহারা। দেখলেই যেন চটপটে বলে বোধ হয়।

যুবক বললে—"'তরুণে'র সম্পাদক—"

আমি বললুম—"আমি। কি দরকার আপনার?"

"একটু দরকার ছিল প্রাইভেট।"

"আপনি বলুন না। এখানে আর কে আছে?"

যুবকটী নরেশের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে বললে—"একটা গল্প আপনার কাছে পাঠিয়েছিলুম—ছাপাবার জন্যে। পেয়েছেন কি?"

"গল্পের নাম?"

"বিপদে সম্পদ।"

যুবকটীকে আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে

আমি বললুম—"দেখুন, আপনি বোধ হয় এই প্রথম লিখছেন। হাত আপনার বড় কাঁচা। গল্পটা 'তরুণে' প্রকাশ করবার একেবারেই অনুপযুক্ত।"

যুবকের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"তা হ'লে সেটা আপনারা ছাপাবেন না?"

"র‍্যাবিস্ জিনিষ কি করে ছাপাই বলুন?"

আবার তার কাণদুটো লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে তা সামলে নিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞস্বরে বললে—"আপনাকে ছাপাতেই হবে।"

আমি হেসে বললুম—"জোর জবরদস্তি নাকি?"

"হাঁ"—বলে সে বুকের ভিতরের জামা থেকে এমন একটা জিনিস বার করলে, যা দেখে ভয় ও বিস্ময় একসঙ্গে আমার মনটাকে তোলপাড় করে তুললে।

যুবক পিস্তলটা উঁচু করে ধরে বললে—"বৃথা চীৎকার করে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না। শুধু ভালয় ভালয় গল্পটা আমার সামনে বার করে লিখুন—'মনোনীত'; আর শপথ করুন, ওটা চৈত্র সংখ্যা তরুণে আপনারা ছাপাবেন—তা হ'লে আমি চুপচাপ চলে যাব আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে।"

ব্যাপার খানা কি? বটতলার নভেলেও এমন কাণ্ড ঘটেছে বলে ত আজ অবধি শুনি নি। সামান্য একটা গল্পের জন্যে প্রকাশ্য দিনের আলোকে এমন ভাবে পিস্তল নিয়ে আক্রমণ! আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। চোখদুটো রুমাল দিয়ে মুছে আমি বল্লুম—"আমি কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি না কি?"

"স্বপ্ন-টপ্ন নয় মশাই, আর, আমি মজা করতেও আসিনি আপনার সঙ্গে। এখন আমার কথামত শপথ করে আমায় বিদায় দিন। আর এটাও ভুলবেন না যেন, চৈত্রমাসে যদি না বেরোয় আমার গল্পটা—ত হ'লে আপনার জীবন নিরাপদ নয়।"

কোথা দিয়ে যে কি হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমায় শপথ করিয়ে নিয়ে (বলতে লজ্জা করে) যুবকটী যখন নিঃশব্দে চলে গেল তখন মনে হল যেন কোন স্বপ্ন নাটকের এক অঙ্ক অভিনয়ের পর যবনিকা পতন হয়েছে।

নরেশ বললে—"লোকটা পাগল নাকি?"

আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে আমি স্বপ্ন দেখছি নে। নরেশের কথায় অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লুম—"যদি পাগলই হয়, তা হ'লে এরকম ভয়ানক পাগল আমি জীবনে এই প্রথম দেখছি। আচ্ছা এ রকম ব্যাপার শোনা দূরে থাক, তুমি কোন নভেলেও পড়েছ নরেশ?"

এমনি রকম কথাবার্ত্তা আমাদের দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চললো। শেষে নরেশ বললে—"সব ত হল, এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?"

এ কথাটী এতক্ষণ আমার মনেও স্থান পায় নি। নরেশের কথায় একটা অদ্ভুত ও অসম্ভব ভাবনা মাথায় এসে পড়লো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বল্লুম—"ভাই, কি করা যায় বল ত!"

নরেশ বললে—"আপনি কি মনে করেন গল্পটা না ছাপালে আপনার কিছু বিপদ ঘটতে পারে?"

আমি বল্লুম—"ও রকম অসম্ভব কথাটা বিশ্বাস করতেই যেন আমার বুদ্ধিতে আসছে না।"

"তা হ'লে কি করবেন, ছাপাবেন না?"

আমি চুপ করে ভাবছি দেখে নরেশ বললে—"আমি বলি কি, ওটা একটু বদলে সদলে দিন ছাপিয়ে, নইলে কি আছে কপালে কে জানে? আর ও যেরকম ভাবে কথাবার্ত্তা কইলে আর মুখচোখের ভঙ্গীটাও যে রকম উত্তেজিত ও অস্বাভাবিক দেখলুম, তাতে আমার ত মনে হয় কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আজ কালকার ছেলেরা, বুঝেছেন, না পারে হেন কাযই নেই।"

আমি বল্লুম—"কিন্তু এরকম ভাবে গল্প ছাপাবার উদ্দেশ্য কি আমি ত বুঝতে পারছিনে। খুন করে সাহিত্যিক নাম কেনা—এটাও একটা অদ্ভুত ঠেকছে না কি?"

নরেশ চুপ করে রইল।

যাই হোক, অনেকক্ষণ পরামর্শের পর শেষকালে ঠিক হল সংশোধন করে গল্পটা চৈত্রমাসে ছাপানই যাবে।

এই কয়দিনে আর একটা ভাবনাও মাথায় এসে জুটেছিল—ওই রাবিস্ মালটা না ছাপিয়ে পুলিসে ডায়েরী করিয়ে রাখলে হয় না? কিন্তু তাতেই বা কি? পুলিস না হয় একজন দেহরক্ষক কনেষ্টবল পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু, কনেষ্টবলকে ত তারা থোড়াই কেয়ার করে।

চৈত্রমাসের 'তরুণ' বেরুল। এবারকার নির্ব্বাচন খুব ভাল করে করেছিলুম বলে' চারদিক থেকেই প্রশংসা বেরুতে লাগল। কয়েকটি সাপ্তাহিকে চৈত্র মাসের 'তরুণের' অনুকূল সমালোচনা দেখা গেল। কিন্তু সমালোচনার শেষে শুধু ঐ একটা গল্পের জন্তেই এমন গালাগাল খেলুম যা এই পাঁচ বছরের মধ্যে খুব কমই আমার ভাগ্যে ঘটেছে। কেউ লিখেছে—এমন রাবিস্ গল্পও যে 'তরুণের' মত কাগজে বেরতে পারে তা আজ অবধি আমাদের বুদ্ধির অগম্য ছিল। কেউ লিখেছে—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদককে এমন একটা রোগে ধরেছে যাকে চলিত কথায় লোকে বলে ভীমরতি। কেউ লিখেছে—সম্পাদকের সহিত গল্প লেখকের অন্য কোন গুপ্ত সম্পর্ক থাকিলে আমরা এস্থলে মৌনব্রত ধারণ করিব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটা গল্পের জন্যে এরূপ ভাবে অপমানিত হওয়া আমার সম্পাদক জীবনে এই প্রথম।

একটা কায থাকায় সেদিন সকাল সকাল 'তরুণ' আফিস থেকে বাড়ী ফিরে উপরে উঠছি, এমন সময় চাকর ডেকে বল্লে—"বাবু, আপনাকে কে ডাকছে।"

আমি ধড়াচুড়ো না ছেড়েই নেমে এলুম। তারপর বৈঠকখানায় গিয়ে একেবারে আকাশ থেক পড়লুম। সে দিনকার সেই যুবকটী একেবারে আমার ঘরের ভেতর চেয়ারে বসে।

তাকে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে সদ্য পঠিত সমালোচনা গুলোর কথাটা মনে পড়তেই মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। কিন্তু তা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলুম—"অকস্মাৎ ব্যাপার কি?"

হাসতে হাসতে সে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বল্লে—"আজ্ঞে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।"

আমি আশ্চর্য্য হলুম। বল্লুম—"কি রকম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর, এ ঠাট্টা নির্ব্বাক নিঃশব্দ ভাবে হজম না করলেও আবার সেদিনকার মত পিস্তল ওঁচাবে ত?"

চোখদুটী কৃতজ্ঞতায় ভ'রে বিনীতস্বরে সে বল্লে—"বাস্তবিক এ ঠাট্টা নয়, আমি সত্যিই আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি। আপনারা সেদিন যে অত ভয় পেয়ে যাবেন তা জানলে আমি নিশ্চয়ই ও কায করতুম না। ব্যাপারটা তবে শুনুন বলি।" বলে সে যা বলে গেল তার ভাবার্থ হচ্ছে এই :—

তার বোন বয়সে তার চেয়ে ছোট বটে, কিন্তু গল্প লিখতে সিদ্ধহস্তা এবং আমাদেরই 'তরুণে'র একজন নিয়মিত লেখিকা। ভগিনীর এই সাহিত্য চর্চ্চায় তার উকিল ভগ্নীপতি কোনওরূপ অনিচ্ছা প্রকাশ না করাতে তা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়ে উঠেছে। এই রকম বোনের বড় ভাই হয়ে, সে যে কোন মাসিকে নাম বার করতে পারলে না, এরূপ চিন্তায় সে কোন কালেই মাথা ঘামাতে ইচ্ছুক ছিল না যদি না বোন তাকে একদিন এ নিয়ে ঠাট্টা করতো। এম-এ পাশ করাটা যে তার বৃথা হয়েছে এমন অভিমতও বোন প্রকাশ করেছিল। সে যে চেষ্টা করলে তার মত একটা গল্প লিখতে পারে না একথা সে একদম স্বীকার করলে না। এই নিয়ে দুদিন ধরে বেজায় তর্ক চলেছিল। তাইতে তার বোন প্রতিজ্ঞা করেছিল যদি ভাইয়ের কোন রকম লেখা একখানা খেলো মাসিকেও বের'য়, ত সে একটি সোণার রিষ্ট ওয়াচ বাজি হারবে। সে তাতে বলেছিল—খেলো মাসিক ত কা কথা, শ্রেষ্ঠ

মাসিক 'তরুণে'ই তার লেখা বেরুবে এবং তা, সেই মাসেই।

এতদূর অবধি প্রকাশ করে সে একটু হেসে আবার বল্লে—"তারপর আপনাদের কার্য্যালয়ে সে অভিনয়টা যে ভাল করেই করতে পেরেছিলুম, সে কেবল আপনাদের জন্যেই। আপনারা যদি অত ভয় না পেতেন তা'হলে বোধ হয় আমি আর বেশীক্ষণ ও অভিনয় চালাতে পারতুম না।"

জিজ্ঞাস করলুম—"তা হ'লে তুমি যে রিভলভারটা তুলেছিলে, ওটা বাজে ?"

সে হেসে বল্লে—"ফুঃ! রিভলভার কোথায় দেখলেন ? ওটা ত একটা ভাঙ্গা পিস্তল। তাতে না ছিল টোটা, না ছিল কিছু।"

ও হরি! এই রকম ভাবে ঠকান! এমন রাগ হচ্ছিল আমার! কিন্তু তার সেই সুন্দর সরল অমায়িক ব্যবহারে আর কথাবার্ত্তায় বেশীক্ষণ আমার রাগ রইল না। অনেকক্ষণ ধরে একথা সেকথার পরে ওঠবার সময়ে সে আবার বল্লে—"তা হ'লে কখন যাচ্ছেন ?"

আমি বল্লুম—"ক্ষেপেছ তুমি ?"

সে কিন্তু বল্লে আমি যতক্ষণ না রাজি হব ততক্ষণ সে এ ঘর ছাড়বে না। আরও কথা হচ্ছে এই—আমি না গেলে নাকি সে রিষ্ট ওয়াচটা পাচ্ছে না। ওর বোন বলেছে তারই সামনে আমাকেই রিষ্ট ওয়াচটা ওর হাতে পরিয়ে দিতে হবে।

নানান রকম ওজর আপত্তি করেও যখন দেখলুম সে নাছোড়বান্দা, তখন বাধ্য হয়ে রাজি হলুম।

যাবার আগে সে হঠাৎ বল্লে—"হাঁ, আর একটা কথা বড় ভুলে যাচ্ছিলুম। শুধু আপনি নয়, সেদিন কার্য্যালয়ে আর একজন যিনি বসেছিলেন, তাঁকে শুদ্ধ যেতে হবে।" আমি বল্লুম—"তাঁর মন ত আর আমার কাছে বাঁধা নয় আমিই তাঁর হয়ে মতামত যে দেবো।"

সে বল্লে—"তবে অনুগ্রহ করে আপনাকে একটু কষ্ট করে, তাঁর কাছে আমায় নিয়ে যেতে হ'চ্ছে। তিনি ত এখন কার্য্যালয়েই আছেন, কতটা আর পথ, চলুন।" ব'লে সে আবার আমাকে কার্য্যালয়ে টেনে নিয়ে চল্লো।

ভোজনটি বেশ পরিপাটীরূপ হল। নেমন্তন্ন সেরে ট্যাক্সিতে বাড়ী ফেরবার সময় নরেশকে বল্লুম—"দেখেছ হে নরেশ, ছোকরার চালাকি! গল্পটার নাম দিয়েছিল 'বিপদে সম্পদ'। আমাদেরও যে শেষটায় সে রকম বিপদের পর এমন ভূরিভোজনের সম্পদ হবে, সেটা ও আগে থাকতে ভেবেই নিশ্চয় গল্পের ঐ রকম নামকরণ করেছিল। কি বল হে ?

নরেশ কি বল্লে, গাড়ীর ও হাওয়ার শব্দে তা ভাল শোনা গেল না।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বামুন হ'

(সুর—'কিসের শোক করিস ভাই—আবার তোরা মানুষ হ')

কিসের রোগ ভরিস ভাই—আবার তোরা বামুন হ'।
ভরেছে পেট দুঃখ নাই—আবার তোরা বামুন হ'।
পরের ঘরে কাঁটাল কোষ—ঠোকাতে নাই কিছু দোষ
মরিস্ যদি, কি আপশোষ ?—আবার তোরা বামুন হ'।
উড়াতে চাস যদিরে ভাই—বাতাসা, দই, মর্ত্তমান,
বিশ্বময় পাকারে তোল কণ্ঠার ভোজ ও কলার গান।
ঝুলিয়ে খা রে দুগ্ধ সর—কোমর চিলে কাপড় পর
পিত্ত তোর শীতল কর—আবার তোরা বামুন হ'।
শূদ্র হয় হোক না, যদি সেথায় পাস রোহিত ঝোল,
বাহবা দিতে তাহারে শেখ—তাহারি গলে পৈতা দোল।
বিপ্র হোক্—কৃপণ যে, একঘরে তায় করিয়া দে,
চামার মুচি শূদ্র সে—আবার তোরা বামুন হ'।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

নিমেষের ভুল

(গল্প)

এলাহাবাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল বসু মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুধীরের যখন বিবাহ দিলেন, চতুর্দ্দিকে তখন একটা প্রচণ্ড রবরবা পড়িয়া গিয়াছিল যে, তিনি বিনা পণে পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। খুব আড়ম্বরের সহিত বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। পাড়ার প্রতিবেশিনীরা বসু মহাশয়ের নূতন বেহাইয়ের বিবেচনা আক্কেল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কারণ কিছু না লইয়াও বসু মহাশয় পুত্রের বিবাহে ঘর ভরা যৌতুক পাইয়াছেন, সোণার দোয়াত, হীরক খচিত কলমটাও নাকি তাহাতে বাদ যায় নাই, বেহাই হয় তো অমনি বেয়াই হওয়া উচিত, এমন কুটুম্ব পাওয়া শত জন্মের তপস্যার ফল।

দিনের মধ্যে শতবার প্রতিবেশিনীদের প্রত্যেকটী দ্রব্য অলঙ্কার খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা, ও বিশদ আলোচনা শুনিতে শুনিতে বসু-গৃহিণীর ধৈর্য্য রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও তিনি শান্ত প্রকৃতি ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাঁহার শান্ত সহাস্য মুখের আদর আপ্যায়নে সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত। বড়লোকের গৃহিণী হইলেও তিনি নিরহঙ্কার সাদাসিধে মানুষটী ছিলেন। বিবাহের কয়েক দিনের ভিতর তাঁহার বড় মেয়ে সুশীলা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল, তাহাকে লইয়া সকলেই ব্যস্ত হইল। সুধীরের স্ত্রী নূতন বৌয়ের সহিত চির প্রচলিত প্রথানুসারে একটী দাসী আসিয়াছিল, পুরাতন লোক আদব কায়দা জানে, তা ছাড়া বসু সেবা করিতে মন যোগাইতে জানে। সুধীরের শ্বশুর বিচক্ষণ লোক সেজন্য পুরাতন ঝি প্রসন্নকে কন্যা বিমলার সহিত শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়াছিলেন।

সুশীলার পীড়ায় সময় প্রসন্ন দিন-রাত অতিশয় যত্ন-সহকারে সেবা যত্ন করাতে গৃহিণী এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, তিনি প্রসন্নকে আর ছাড়িতে চাহিলেন না। বেয়াইকে বলিয়া কহিয়া তিনি প্রসন্নকে চাহিয়া লইলেন। সেই হইতে ছোট দিদিমণির সহিত সেও বসু গৃহে থাকিয়া গেল। সে ঝি হইলেও গরীব কায়স্থ কন্যা। অল্প বয়সে অদৃষ্ট মন্দ হওয়াতে ভদ্র ঘরের দাসী হইয়াছিল। ছোট দিদিমণি বিমলা যখন আঁতুড় ঘরে সেই সময়ে প্রসন্ন তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছে, সেও যে দেখিতে দেখিতে এক যুগ—বার তের বৎসর হইল।

বসু মহাশয়ের গৃহে দেখিতে দেখিতে প্রসন্নর অনেক দিন কাটিল, প্রায় ১৩ বৎসর। গৃহিণীর প্রসন্ন নহিলে কোন কার্য্যই পছন্দ হইত না। "প্রসন্ন চমৎকার পায়ে হাত বুলাতে জানে। পাকা চুল তুলতে তার মত খাসা হাত আমি তো কারও দেখি নাই। তারপর ছেলে মেয়েদের এমন প্রাণ ঢেলে যত্ন কে করে? সেদিন মায়ার হোচট খেয়ে পা রক্তারক্তি, প্রসন্ন দেখে কেঁদে আকুল, এত মায়া ওর শরীরে।" —গৃহিণী সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে এইরূপে প্রশংসা করিতেন। কখনও কখনও হাসিয়া কহিতেন, "তুই নিশ্চয়ই আর জন্মে আমার মেয়ে ছিলি।" নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার কালে অলঙ্কারের রাশি তাহার হস্তেই পড়িত। বাড়ীতে ফিরিয়া, সকলের খুঁটি-নাটি ভাল করিয়া মায়ের হাতে বুঝাইয়া দিয়া তবে তাহার ছুটী। এমন একটি বিশ্বাসী লোক পাওয়ার জন্য গৃহিণী বেশ গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

২

কয়েক মাস হইতে বসু মহাশয়ের শরীর ভাল যাইতেছিল না। মাঝে মাঝে জ্বর, অবসন্নতা অনুভব করিতেন। একদিন কোর্টে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

গাড়ীতে করিয়া ধরাধরি করিয়া বন্ধুগণ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। প্রায় দুই মাস ডাক্তারদের একান্ত চেষ্টায় তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইল, এবং ধীরে ধীরে সবল হইতে লাগিলেন, উঠিয়া হাঁটিয়া একটু একটু বেড়াইতে লাগিলেন।

বসু মহাশয় আরাম চেয়ারে শুইয়া কি একটা কাগজ তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় গৃহিনী যাইয়া বলিলেন, "দেখ, কাল বেশ ভাল দিন আছে, কলকাতার বাড়ী পরিস্কার করতে কাল সন্তোষকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে বৌমারা থাকুন, আমি কলকাতায় তোমায় নিয়ে কাল যাব। বিজয়রত্নকে না দেখালে তোমার অসুখ কিছুই বুঝতে পারছি না। শরীরটা সারছে না, দুর্ব্বলতা যাচ্ছে না, এতে মনে এক তিল আমার শান্তি নেই। তুমি আমি মারা, আর প্রসন্ন যাবে।"

কলিকাতায় আসিয়া বসু মহাশয় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু দিন ভাল ছিলেন। কিন্তু আবার তাঁহার ক্ষুধাহীনতা ও সামান্য জ্বর অনুভব হইল। পুত্র কন্যাগণ সকলে দেখিতে আসিলেন, বড় বড় চিকিৎসকগণের পরামর্শে হরিদ্বার মুশৌরী প্রভৃতি স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া স্থির হইল। হরিদ্বারে যাইবার দিন স্থির হইয়া গিয়াছিল। বসু মহাশয়ের আবার সেদিন বেশ জ্বর বোধ হইল, গৃহিনী ব্যস্ত হইয়া চিকিৎসকগণকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

স্বামীর পায়ের তলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গৃহিনী কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "আবার তোমার অসুখ হল! এমনি অদৃষ্ট আমার, কিছুতেই তোমায় ভাল করতে পারছিনে, অসুখ যেন সারতেই চাচ্ছে না।"

বসু মহাশয় ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, "পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে এবার নূতন বস্ত্র পরতে হবে গিন্নি! গীতার সেই শ্লোকটা মনে হচ্ছে না তোমার—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা—

"ওকি, অমন করছ কেন? অমন করছ কেন?"—গিন্নি বিছানা হইতে নামিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িলেন, এ পাশ ও পাশ করিতে করিতে, গলার নেকলেসটী খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "বুকের মধ্যে কেমন করছে। ও মাগো!"

বসু মহাশয় চীৎকার করিয়া পুত্র কন্যা ও প্রসন্নকে ডাকিলেন। প্রসন্ন পাখা করিয়া চোখে মুখে জল দিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। গৃহিনী যন্ত্রণা-ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "ওগো তুমি নও, আমিই আগে যাচ্ছি, ও মা যাই মা!"

ধীরে ধীরে সতী লক্ষ্মীর মুখে মৃদু হাসি, ও আশঙ্কাহীন তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিল। পুত্র কন্যা সকলে মা মা করিয়া আকুল স্বরে ডাকিতেছে। ততক্ষণে চিকিৎসকগণ আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। তাঁরা আসিয়া তাঁহাদের পরীক্ষা যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—হার্টফেল।

৩

অভাবনীয় রূপে গৃহিনীর স্বর্গারোহণের পর বসু আরও মহাশয় কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। বড় ছেলে সুকুমার, সতত পিতার সেব যত্ন করিতেন। কিন্তু বসু মহাশয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর মুখে এই আক্ষেপ বাণী সর্ব্বদাই শোনা যাইত, "আহা না বুঝতে পেরে তার বুকে বড় বেদনা দিয়েছিলাম, সতী সাধ্বী হাসতে হাসতে চলে গেল। আমায় যে এমন করে দিন গুণতে হবে, তা কি তখন জানতাম রে!"—পুত্র কন্যাদের কহিতেন "হ্যাঁরে, সে আমায় সেবা যত্ন করে ভাল করে তুলেছিল, তোরা তার জন্যে কিছুই করিতে পারলি নে?" পুত্র কন্যা পরিবারস্থ সকলেই হৃদয়ে অনুশোচনার জ্বালা অনুভব করিত। ১৫.২০ মিনিটের ভিতর কি যেন কি হইয়া গেল, স্পষ্ট অনুভবও যেন কেহ করিতে পারে নাই। সতী গৃহলক্ষ্মীর এ কি ইচ্ছা মৃত্যু? প্রতিবেশিনী রমণীরা হায় হায় করিতেন, আহা এমন মানুষ কি আর হয়! প্রসন্ন একেবারে মনোদুঃখে সর্ব্বদাই ম্রিয়মান হইয়া থাকিত, অমন ভালবাসিতে স্নেহ করিতে মিষ্টি কথা কহিতে আর তাহার কে আছে? সে যেন আর সে গৃহে তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। তাহার

আনমনা হইয়া থাকা, মনের ভুলে কার্য্যের ভুল, সকলেই মনে করিত প্রসন্ন যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছে। সে সর্ব্বদাই কি চিন্তা করে, হঠাৎ কেহ কিছু কহিলে সে চমকিত হয়।

সেদিন বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা মায়ার শ্বশুরগৃহে মায়ার পঞ্চামৃতের নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণে যাইবার সময় বিনু তার বড় বা প্রতিমার গৃহে গিয়া কহিল, "দেখ তো দিদি কি বিপদে পড়লাম। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমার মুক্তোর নেকলেসটার টিপকল ভেঙ্গে গেল, এখন কি করি বল দেখি।"

প্রতিমা কহিল; "কেন তোর তো আরও অনেক হার আছে!"

"ছাই! আমি সেগুলো কিছুতেই পরবো না। এ দিক দিয়ে চুলে এঁটে ধরবে, ও দিক দিয়ে জামার লেসে বিঁধে যাবে। বাবা কি পছন্দ করে দিয়েছিলেন যে! আমার তো কেউ মত নেয় নি, ও সব জবড়জং জিনিষ আবার মানুষে পরতে পারে! আমি না পরে যাই সেও ভাল।"

প্রতিমা কহিল, "তুই আমার হার ছড়া পর না!"

"না দিদি সে হবে না। আচ্ছা দিদি, মার হার ছড়া কি তোমার কাছে নেই? সেটা তো প্লেন অথচ কি চমৎকার গড়ন। আজ না হয় সেটাই পরি।"

"ওমা তাই তো! মার হার গাছার কথা তো আমার একেবারে মনে ছিল না। আর, সে সময় যা হয়ে গেল! এদিকে মা গেলেন, ওদিকে মা নেই জেনে বাবা ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলেন। আমাদের অমন মা ই গেলেন। এখনও আমার তো মনে হলে যেন বুকের মধ্যে ফেটে যায়। তখন কি আর হার কোথায় গেল, তা মনে হয়েছে?"

ক্রমে বাটীস্থ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়াও হারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। প্রত্যেকেই শয্যা পার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে এই পর্য্যন্ত—কে তুলিল কে রাখিল এ সংবাদ কেহ জ্ঞাত নহে।

৪

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাস্তায় গ্যাস গুলি জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। বড় বড় দোকান আলোক মালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র জনপ্রবাহ কর্ম্ম প্রবাহে যেন ছুটিয়া চলিয়াছে। ট্রাম ও মোটর ব'ইতেছে আসিতেছে, বাড়ীগুলি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সান্ধ্য বায়ু সেবনে ধনী উকীল ব্যারিষ্টার মাড়োয়ারী পার্শী প্রভৃতি কত ক্রোরপতি লক্ষপতিগণ বাহির হইয়াছেন।

সৌর জগতের উল্কার মত তাঁরা বায়ুগতি যানে নিমেষের ভিতর ছুটিয়া চলিয়া অন্তর্হিত হইতেছেন। ট্রামে করিয়া কর্ম্মক্লান্ত কেরাণীরা ফিরিতেছে। আরও কত মনুষ্য, কত বিচিত্র দৃশ্য! কে চোর, কে ডাকাইত, কে কাহার পকেট কাটিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিবে, অনুমান করা দুঃসাধ্য। চিৎপুরের প্রসিদ্ধ জুয়েলার্স দাস কোম্পানীর দোকান আলোকে সজ্জায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা কর্ম্মচারিগণ হিসাব নিকাশ শেষ করিতেছেন। দোকানের স্বত্বাধিকারী শিক্ষিত যুবক। ম্যানেজার আছেন, তবুও তিনি সকল বিষয় নিজে তত্বাবধান করেন। অদূরবর্ত্তী ট্রাম হইতে নামিয়া একটী মলিন বাস পরিহিতা রমণী দোকানে প্রবেশ করিল। স্বত্বাধিকারী মুনীন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কি চাও এখানে?"

স্ত্রীলোকটী কহিল, "এখানে কি আপনারা অলঙ্কার কেনেন?"

"হ্যাঁ কেনা বিক্রী গড়ান সবই আমরা করি; তোমার কি প্রয়োজন?"—রমণীর দিকে চাহিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "এক ছড়া সোণার হার আমি বিক্রী করব, টাকার আমার বিশেষ দরকার।"

"আমরা ধারে জিনিষ নিই না। দেখি তোমার জিনিষটী কিরকম?

রমণী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী কাগজে মোড়া দ্রব্য বাহির করিল, এবং মোড়কটি খুলিয়া হার গাছা তুলিয়া ধরিল। উজ্জ্বল আলোকে হার ঝিকমিক

করিতেছিল, কিন্তু রমণীর হাত দুখানি মাঝে মাঝে কাঁপিতেছিল।

সত্বাধিকারী মহাশয় হারগাছি হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন। বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তুমি কোথায় থাক, এটা কোথায় পেলে, এটা কি তোমার নিজের জিনিষ?" রমণী কহিল, "হাঁ আমার, আমি অমুক বোসের বাড়ী কায করি, বাড়ীর গিন্নি আমাকে হার দিয়ে গেছেন। আমার টাকার দরকার হয়েছে, সে জন্যে জিনিষটা বিক্রী করছি।"

অধিকারী ম্যানেজারকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, "তিন বৎসর পূর্ব্বে এই প্যাটানের হার ওঁদের বাড়ীর জন্তে আমিই তইরী করিয়ে দিই, টিপ কলে আমার দোকানের মার্কা আছে, তাছাড়া লকেটের সঙ্গে ওদের নামের মনোগ্রাম রয়েছে। আচ্ছা আমি সুকুমারকে টেলিফোঁতে ডেকে পাঠাই, তাহলে আমার সন্দেহ কিছুই থাকবে না।"

দশমিনিটের ভিতর সুকুমার বাবু বাড়ীর গাড়ীতে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মণীন্দ্রের সহিত এক কলেজে পড়াশোনার জন্য বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। "কি হে মণি, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখাশোনা নেই। হঠাৎ আমাকে টেলিফোনে ডেকে পাঠাল কেন বল দেখি? একি প্রসন্ন যে, দোকানে তোমার কিছু কায আছে নাকি? মাদুলী টাদুলি কিছু গড়াতে দেবে বুঝি?" বলিয়া সুকুমার বাবু হাসিতে লাগিলেন।

মণীন্দ্র বাবু কহিলেন, "না না, এই দেখ এই হার গাছা উনি বিক্রী করিতে এনেছেন। আমি জানি ওটা তোমার মায়ের জন্তে আমার দোকানেই গড়ান হয়েছিল। উনি বলছেন যে জিনিষটা ওঁর নিজের। সেইজন্তে তোমায় ডেকে পাঠালুম।"

সুকুমার মণীন্দ্রের দিকে উদাসীন ভাবে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, ও হার মা প্রসন্নকে দিয়ে গেছেন। বড্ড ভাল বাসতেন কিনা! তা প্রসন্ন, ওটা বিক্রী করিতে এসেছ কেন? টাকার দরকার ছিল, আমায় একটু জানালেই হত। মণি, হারগাছা আমি নিয়ে যাচ্ছি ভাই, থাক আর বিক্রী করার দরকার নেই। প্রসন্ন এস, আমার গাড়ীতে বসে যেতে পারবে।"

প্রসন্ন টলিতে টলিতে দাদাবাবুর অনুসরণ করিল।

গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটল। প্রসন্ন তখন গাড়ীর ভিতর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে আকুল হইয়া বলিতেছে, "ও দাদাবাবু, আমি এ কি কল্লুম গো? আমি যে দু' হাতে করে নিজের মুখে কালী মেখেছি! আমি কেমন করে সকলের কাছে মুখ দেখাব? ও মা! তুমি যে আমায় বড্ড বিশ্বাস করতে, বড্ড ভাল বাসতে মা!"

সুকুমার কহিলেন, "প্রসন্ন, থাম থাম! তুমি এত ব্যস্ত হোয়ো না, আমি এ কথা বাড়ীতে কাউকে জানাব না। মানুষের এমন ভুল হয়েই থাকে। এক মুহূর্ত্তের ভুলে মানুষ কি চিরদিনের জন্তে মন্দ হয়ে যাবে? না তা হবে না, তুমি যেমন আমাদের ঘরের আপনার লোক ছিলে, তেমনি থাকবে।" এই সব নানা কথায় তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া প্রসন্ন নিজের ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ করিয়া পড়িয়া রহিল। প্রভাত হইলে সুকুমার বাবু প্রসন্নর খোঁজ নিতে আসিয়া দেখিলেন, ঘরে প্রসন্নর প্রত্যেক দ্রব্যটি আছে, শুধু প্রসন্ন নাই।

অনেক খোঁজ করা হয়েছিল, কিন্তু প্রসন্নকে সেই দিন হইতে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

শ্রীউষা দেবী।

প্রণয়-পরিণাম

(গল্প)

মধ্যাহ্নে স্কুলের ছুটির ঘণ্টায় বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের বেশ একটি ছায়াযুক্ত স্থানে—যেখানে একটি বৃহৎ তরুবরকে ঘিরিয়া কতকগুলি লতা জড়াজড়ি করিয়া উঠিয়া নির্ভরতার চরম মাত্রা লাভ করিয়াছিল,—প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী উর্ম্মিলা ও তার সঙ্গিনী রেবা সেই স্থানটিতে ঘাসের উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া আগ্রহের সহিত একখানি ইংরাজী গল্পের বই পড়িতেছিল। গল্পটির নাম A Love Tale (একটি প্রণয়কাহিনী)। গল্পের বইখানি আজই তারা হস্তগত করিয়াছে এবং দু' একখানি পাতা উল্টাইয়াই নায়ক নায়িকার বিরহ উক্তির সহিত তাহাদের তরুণ হৃদয়ের অত্যন্ত সহানুভূতি জন্মিয়াছে। তাই ব্যাপারটি আগাগোড়া জানিবার নিমিত্ত তাহাদের আর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ক্লাসে বসিয়া পাঠ্য পুস্তকে কিছুতেই মন নিবিষ্ট হইতে চাহে নাই। ইতিহাসের শিক্ষক আজ অযথা বিলম্বে ক্লাসে আসিয়া অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণেরও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কেবল এই, দুটি ছাত্রী সেই কুড়ি মিনিট অবসরে নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগের বিস্তৃত আখ্যায়িকা পাঠে তৃপ্ত হইয়া শিক্ষককে মনে মনে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছিল। এখন টিফিনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবামাত্র উভয়ে আবার বইখানি লইয়া বিরলে বসিয়া পাঠে মগ্ন হইয়াছে। গল্পাংশে নায়ক যেখানে নায়িকার পিতার নিকট বিবাহ প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, ভগ্ন হৃদয়ে এক চাঁদিনী যামিনীতে, জনহীন দ্রাক্ষাকুঞ্জে নায়িকার চরণে জানু পাতিয়া বসিয়া চির বিদায় প্রার্থনা করিতেছে, সেই স্থানে অদম্য কৌতূহল লইয়া যখন দুটি তরুণ চিত্ত পাঠে নিমগ্ন, ঠিক সেই সময় পঞ্চম শিক্ষয়িত্রী মলিনা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিল—"এখনও পড়চিস্ তোরা? যা, যা, এই সময় একটু কিছু খেয়ে নিয়ে বাগানে ছুটোছুটী করগে যা—রাতদিন বই মুখে দিয়ে থাকা মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল না।"

মলিনা গত বৎসরেও এই স্কুলের ছাত্রী ছিল, এ বৎসর তার হঠাৎ পদ পরিবর্ত্তন হইলেও বয়স্কা ছাত্রীগণ তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিসাবেই দেখিয়া থাকে, শিক্ষয়িত্রীর প্রাপ্য সম্মান তাকে মোটেই দেয় না। সুতরাং রেবা বই হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল—"বইয়ের গল্পটা ভারী চমৎকার মলিনা দি, পড়্‌লে আর শেষ না করে উঠ্‌তে ইচ্ছে হয় না।"

এই সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী সুলতা সেস্থানে আসিয়া মলিনার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল—"তুমি কি মনে করেচ মলিনা দি ওরা পড়বার বই পড়বে? মোটেই না—শিশির দির একখানা ম্যাগাজিন এসেচে সেইখানা পড়চে—ক্লাসে বসেও খাতার মধ্যে ঐ বইখানা লুকিয়ে A Love Tale বলে গল্পটা পড়ছিল।"

বলিয়াই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল। মলিনা বলিল, "ও সব বাজে গল্প পড়ে সময় নষ্ট করিস্ না তোরা; উঠে আয়।" বলিয়া নিজে একদিকে চলিয়া গেল।

উর্ম্মিলা রেবার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"আচ্ছা ভাই, সত্যিই কি এ সব বাজে গল্প? এর মধ্যে কি কিছু সত্যি নেই?"

রেবা উর্ম্মিলার সহপাঠিনী হইলেও বয়সে দুই তিন বছরের বড় ছিল, এবং সেজন্য সে অভিজ্ঞতার কিছু পুঁজি না হউক—অন্ততঃ দাবী তো রাখিত। সে কহিল, "মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত যা ঘটে চলেছে, আর সংসারে নিত্য নূতন যা ঘটচে, তাই নিয়েই বই লেখা হয়। রঙের একটু বেশী কম থাকলেও সাজ সজ্জার কাঠামো সেই একই।

সুতরাং এ গুলি মোটেই নিছক কল্পনা নয়। তবে অনেকে এগুলো পছন্দ করেন না এই যা।" এই সময় হঠাৎ শিসের মত তীক্ষ্ণ একপ্রকার আওয়াজ কাণে আসিতেই, বংশীরবে উতলা শ্রীরাধার ন্যায় উর্ম্মিলা চকিত ভাবে চাহিবামাত্র রেবা তাহার হাতে চিম্‌টি কাটিয়া দিয়া কহিল—"শ্যাম কুঞ্জে এল নাকি? বড্ড অসময়ে, না?"

উর্ম্মিলা মৃদু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সখীর সহিত এমন একটি জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিয়া বই পড়িতে লাগিল, যেস্থান হইতে রাজপথ প্রকাশ্য ভাবে চোখে পড়ে। এই সময় আর একবার সেই শিসের তীক্ষ্ণধ্বনি মধ্যাহ্নের অবসরকে সচকিত করিয়া তুলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইসিকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ও বাইসিকেলের আরোহীর চঞ্চল উৎসুক দৃষ্টির সহিত উর্ম্মিলার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়ের কোনো ব্যাঘাত ঘটিল না। রেবা চকিত কটাক্ষে এই চারি চক্ষুর মিলন দেখিয়া, নতমুখে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিল।

২

দিন দুই পরে—পূজার ছুটির মাত্র তিনদিন বিলম্ব আছে, কিন্তু উর্ম্মিলার বাড়ী হইতে জরুরী তাগিদ আসায় তার সহপাঠিনীরা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহার জিনিষপত্র গুছাইয়া দিতেছে। উর্ম্মিলার জ্যেঠামহাশয় মণিমোহন বাবু অত্যন্ত অসুস্থ, চিকিৎসক তাঁহাকে স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য অবিলম্বে সমুদ্রতীরে বায়ু সেবন করিতে যাইবার ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন, তিনি আজই পুরী রওনা হইতেছেন। উর্ম্মিলা তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী, তাহাকেও সঙ্গে লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পুত্র সুরেশকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুরেশ উর্ম্মিলারই সমবয়স্ক—সে উর্ম্মিলাকে লইতে আসিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

উর্ম্মিলার মন বিকল হইয়া পড়িয়াছে। এক তো পূজনীয় স্নেহাস্পদ জ্যেঠামহাশয়ের অসুস্থতার সংবাদে,দ্বিতীয় সঙ্গিনীদিগকে, বিশেষ করিয়া রেবাকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া, তৃতীয় ছুটির অবকাশ বিদেশে কাটাইবার ইচ্ছা তার আদৌ ছিল না; কেন ছিল না, সে কারণ পরে জানা যাইবে।

যাহা হউক জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া সে যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল,—সখীরা অনেকেই আসিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইল। কেহ কেহ সমুদ্রের ঝিনুক আনিবার জন্য অর্ডার দিল; কেহ বা, সকাল সন্ধ্যা সমুদ্রতীরের অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিস্তৃত বর্ণনা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল।

তারপর সকলে মিলিয়া যখন উর্ম্মিলাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিল, সুরেশ একটু ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সরিয়া গিয়া একেবারে ফুটপাথের ওপারে গিয়া দাঁড়াইল। এ সময় মুখের কথার আদান প্রদান বেশী হইল না—তখন সবারই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, আর অনেকগুলি কোমল হৃদয় এক সঙ্গেই দুলিয়া দুলিয়া যেন আসন্ন বিরহ বেদনাকে অনুভব করিতে লাগিল। উর্ম্মিলা কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া দিল। গাড়ী চলিবার শব্দে সে অশ্রু মুছিয়া যখন চোখ তুলিল, তখন সুরেশ সম্মুখের আসনে বসিয়া হাসিমুখে তার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর অদূরে তরুণীর দল ভিড় করিয়া চলমান গাড়ীর দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইয়া। উর্ম্মিলা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাদিগকে আর একবার বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। গাড়ীও কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই উভয় পক্ষের দৃষ্টির মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধান রচনা করিয়া লক্ষ্যপথে ছুটিয়া চলিল।

সুরেশ এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া কহিল, "ত্যাখ্, উর্ম্মিলা, মেয়েগুলো তোকে এমন করে ফেয়ার-ওয়েল দিতে এসেছিল যেন তুই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস্।"

উর্ম্মিলা মুখ ফিরাইয়া আনিয়া কহিল, "সুরেশ, তুমি ভারী ফাজিল হয়ে উঠ্‌চ দিন দিন।"

সুরেশ ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল—"ফাজ্‌লামীটা কিসে দেখ্‌লি, শুনি? তোর বন্ধুদের দেখে ভয়ের চোটে তো আমি একেবারে রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আর তোর বিয়ের কথা—তা সে তো কিছু মিথ্যে না, আজও সকালে ঘটকী এসেছিল। মা তাকে বিদায় দিলেন। আর শুনেচিস্, আমি যখন তোকে নিতে আসচি,

বাসবের সঙ্গে তখন দেখা। সে বললে—সে তুই ছাড়া কাউকেই বিয়ে করবে না। ভারী মজার কথা উর্ম্মিলা—একেবারে তিন সত্যি করেচে। এদিকে বাবার কথা জানিস্ তো, তার সঙ্গে বিয়ের কথা তুললে কি রকম রেগে ওঠেন।"

"আচ্ছা সুরেশ, বাজে বকা অভ্যেস কি তোর কখনও যাবে না? সাধে কি আর একটা ক্লাসে তোর দু বচ্ছর কাটল।" বলিয়া বিজ্ঞের মত গম্ভীর দৃষ্টিতে উর্ম্মিলা সুরেশের প্রতি চাহিয়া রহিল, যদিও সুরেশের এই বাজে বকুনীর প্রত্যেক শব্দই সে মনোযোগের সহিত কাণ পাতিয়া শুনিয়াছিল—এবং এই ধরণের আরও কিছু বাজে বকুনী এখনো সে শুনিবার জন্য মোটেই উদাসীন নয়।

সুরেশ হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল—"বাজেই তো বটে! তা হলে যা, আর তোকে কিছু বলব না, বাজের মধ্যে কাযের কথা তো এখনো সুরুই করি নি।"

মনে মনে বাজের মধ্যেকার এই কাযের কথা শুনিবার জন্য উর্ম্মিলার যতই আগ্রহ থাক্, প্রকাশ্যে তার কিছুমাত্র আভাস না জানাইয়া উর্ম্মিলা পথচারী যান, আরোহী ও পথিক দিগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। সুরেশ হঠাৎ উর্ম্মিলার আঙুল ধরিয়া ঈষৎ টান দিয়া কহিল—"বেশ আঙটিটি তো! কে দিলে উর্ম্মিলা?"

উর্ম্মিলা গর্ব্বভরে কহিল—"কে আবার দেবে? আমার বন্ধু দিয়েচে। তোর মতন তো আমাদের বন্ধুত্ব নয় যে একটা পেন্সিল নিয়েই গণ্ডগোল বাধবে।"

ইতিপূর্ব্বে কোন সময়ে সুরেশের এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত একটি কপিইং পেন্সিল লইয়া বেশ একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং যদিও তাহা অতীতের অন্তর্গত এবং বর্ত্তমানে সে মালিন্যের এতটুকু চিহ্নও অবশিষ্ট নাই, কিন্তু সংসারের পনেরো আনা মানুষে যে কেবল অতীতের পানেই মুখ ফিরাইয়া থাকে—বর্ত্তমানকে ভাল করিয়া দেখে কৈ?

যাহা হউক—সুরেশ মোটেই অপ্রতিভ হইল না। সে কহিল—"আরে, মেয়েদের মতন তো আমাদের না—এই ঝগড়া, এই মারামারি—এই মিটু মাট! তোদের হল তো খুব ভাব,—নয় তো এমন আড়াআড়ি—যে আর বল্বার নয়। ঐ রেবা বলে তোর যে বন্ধু সেই বুঝি দিয়েচে? তা, তুই তাকে কি দিলি?"

উর্ম্মিলা কহিল—"দিয়েচি কিছু নিশ্চয়, তোকে সব কথা বল্তে যাই কেন?" সব কথা শুনিবার লোভ বেশী না থাকিলেও চতুর সুরেশ বেশ বুঝিল যে, সে ইতিপূর্ব্বে তার কাছে যে গোপন কথার আভাস মাত্র দিয়াছে, প্রকাশ করে নাই, তারই পরিবর্ত্তে উর্ম্মিলার এই খোঁচাটুকু। সে পরম আনন্দে এই খোঁচাটুকু উপভোগ করিয়া কহিল—"আর যদি তোকে বাসবের সেই কথাটা বলে দি তা হলে?"

উর্ম্মিলা মনের চাঞ্চল্য যথাসাধ্য দমন করিয়া উপেক্ষা ভরে কহিল—"বাজে কথা শুন্তে আমার দায় পড়েচে।"

মনস্তত্ত্বে বালকের এখনো অভিজ্ঞতা জন্মায় নাই। উর্ম্মিলার ঔদাসীন্যে সে ভয় পাইয়া গেল। বি-এ কলেজের ছাত্র বাসবের মূল্যবান ফাউণ্টেন পেনটি তার কম লোভের বস্তু ছিল না। মা সরস্বতীর সহিত তেমন সদ্ভাব না থাকিলেও, পেন জিনিষটির প্রতি তার অনুরাগ ছিল, এবং উর্ম্মিলার হাতের এক ছত্র লেখার বিনিময়েই এই দুর্লভ বস্তুটি তার করতলগত হইবে জানিয়া পর্য্যন্ত, প্রতি মুহূর্ত্তেই সে উর্ম্মিলার সঙ্গ কামনা করিয়াছিল। এখন এই শুভ অবসরে সেই উর্ম্মিলাকে বিমনা করিয়া তোলা তো কাযের কথা নয়! সুতরাং সে তৎপর ভাবে পকেট হইতে একটি রঙীন খাম বাহির করিয়া উর্ম্মিলার চোখের সাম্নে ধরিল। খামের উপর লেখা শুধু "উর্ম্মিলা"—বলা বাহুল্য, খামের মুখ আঁটা।

উর্ম্মিলা খাম খানা অনিচ্ছায় ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"কেন জ্বালাস্ ভাই—চিঠি আমি দেখতে চাইনে! যে দিয়েচে তাকে ফিরিয়ে দিস্।"

সুরেশ কহিল—"বাঃ ফিরিয়ে দেবো কি! তোমায় দেবার জন্যে কত মাথার দিব্যি দিয়েচে। নাও, নাও শীগ্গির নাও, বাড়ীর সামনে এসে গেচি—

ঐ দেখ উর্ম্মিলা, বাসব নিজেদের বারেন্দায় দাঁড়িয়ে আছে।"

উর্ম্মিলা সুরেশের নির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিবা মাত্র চারি চক্ষের মিলন হইল। অতঃপর গাড়ী দ্বারসংলগ্ন হইবা মাত্র উভয়ে নামিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য রঙীন খামে মোড়া চিঠিখানা ইতিমধ্যে উর্ম্মিলার অঞ্চল তলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। সুরেশ যখন জিনিষপত্র নামাইতে মনোযোগ দিল, সে ততক্ষণে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া জ্যেঠাইমা, মা, পিসিমার প্রশ্নের উত্তর দিতে নিযুক্ত হইল। এদিকে সুরেশ যখন নিজের কায গুছাইয়া জ্যেঠামশায়ের ও পিসিমার নিকট নিজের কায কর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিয়া, ক্রিকেট খেলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দোতালায় উর্ম্মিলার ঘরে আসিল, উর্ম্মিলা তখন চিন্তার সমুদ্রে প্রায় তলাইয়া গিয়াছে। সুরেশের সশব্দ আগমনে সচকিতে সে তার মুখের দিকে চাহিতেই সুরেশ কহিল—"জবাব লিখেচিস্? দে শীগ্গির।"

উর্ম্মিলা থতমত খাইয়া কহিল, "জবাব? কিসের?"

চিঠিখানা সে সবে মাত্র শেষ করিয়াছে। গভীর গভীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও আকুল আত্মনিবেদনের ভাষা তার চোখের সম্মুখে অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। উপন্যাসের কল্পনার রাজ্যের নায়ক নায়িকার মধ্যে আজ যে তাহারও স্থান—শুধু এই কথাটিই সংসারের সমস্ত ঘটনাকে ছাপাইয়া তার মনের মধ্যে বিরাজ করিতেছে—ইহা ছাড়া আর কোন কথাই তার স্মরণ ছিল না। সুতরাং তার ভাবলোকবিহারী চিঠির উত্তরের জন্য সুরেশের হঠাৎ তাগাদায় কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এ দিকে সুরেশও বুঝিয়াছিল যে এত শীঘ্র উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু কলমটি তার আজই বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং সে অসহিষ্ণু ভাবে পকেট হইতে একটি পেন্সিল ও নোটবুক বাহির করিয়া উর্ম্মিলার হাতে দিয়া কহিল—"শুধু এইটুকু লিখে দে যে চিঠি পেয়েছি—সুরেশের হাতে। আর নামটা সই করে তারিখ লিখে দে।"

এটুকু লিখিতে উর্ম্মিলার আপত্তি হইল না। সুরেশ চঞ্চল প্রকৃতির বালক। বাসব ও তাহার মধ্যে অশরীরী দেবতার খেলা যেটুকু সুরু হইয়াছিল, তাহা শুধু ভাবতন্ত্রের দিক্ দিয়াই—আঁখির ভাষায় যতটুকু অগ্রসর হয় তার অধিক নয়। চিঠি পত্র প্রভৃতি বস্তু তন্ত্রের ইহার মধ্যে স্থান ছিল না, অবশ্য আজিকার দিন ছাড়া। এখন সুরেশ যদি নিজেই পত্রবাহক হইয়া এক সময়ে আবার নিজেই এই কথা লইয়া হৈ চৈ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে বিষম ব্যাপার! সুতরাং সে বিনা আপত্তিতেই সুরেশের নোটবুকে এক ছত্র লিখিয়া দিল—চিঠি পেয়েচি সুরেশের হাতে—উর্ম্মিলা ১২ই আশ্বিন।

সুরেশ নোটবুকখানা পকেটে ভরিয়া বিজয় গর্ব্বে ব্যাটখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

৩

স্থান পুরী, কাল রাত্রি আটটা, উর্ম্মিলা বেড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া জ্যেঠামহাশয়ের ঘরে প্রবেশ করিতে গেল, তখন তাহার নামের সহিত বাসবের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সে নিঃশব্দে এক পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। জ্যেঠাইমা বলিতেছেন—"তা, বাসব কিছু ছেলে মন্দ না, যেথ্তে শুন্তে ভাল, বাপের অবস্থা বেশ, বি-এ পড়চে—ওর সঙ্গে উমির বিয়ে হ'লে ভালই হত। তোমার যে কি জেদ তা বুঝি না। মেয়েও তো বড় হয়েচে, বাসবের উপর ওর মনও ছিল। এখন দেখ দেখি আমাদেরই উপর ওরা সন্দেহ করচে! মর্ মিন্সে—চিঠির খোঁজ দেখ না, আমরা যেন ওঁর কোলের ছেলেকে ধরে রেখেচি।"

জ্যেঠামহাশয় উত্তর দিলেন—"মহেশ ভটচায্যি ভারী চালবাজ লোক। ওর ঘরে মেয়ে আমি কখ্খনো দেবো না। ছেলেটিও এমন ফাজিল যে, ওর হাজার গুণ থাকলেও, ওর হাতে মেয়ে দিতে আমি প্রস্তুত নই। মিথ্যেবাদীর একশেষ! বিদ্যা আর রূপ আর পয়সাই শুধু বড় জিনিষ নয়, বড় গিন্নি! বুকের পাটা ভেতরে যদি দরাজ না হয়, তা হলে সে কি আর মানুষ?

আমি সব সইতে পারি, কিন্তু মানুষ হয়ে যদি মানুষকে ছোট চোখে দেখে সে আমার অসহ্য।"

জ্যেঠাইমা কহিলেন—"ওদের ছেলে না বলে না ক'রে কোথায় পালিয়েচে, ওরা ভাবচে আমরা তাকে এখানে আমাদের ঘরে এনে রেখেচি। এখন এই চিঠির উত্তরে বেশ কড়া জবাব দিয়ে ওদের ভোঁতা মুখ ভোঁতা করে দাও দেখি! আসুক একবার সোমেশ, সে না হ'লে মহেশ ভট্‌চাজ্জিকে দশ কথা শোনাতে আর কেউ পারবে না।"

পাণ্ডার সহিত পিসিমা শ্রীমন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন, এতক্ষণে তাঁহার ফিরিবার পায়ের শব্দে ত্রস্তে উর্ম্মিলা সরিয়া গিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আশ্রয় লইল। সমুদ্রের নিকট হইতে বাড়ী বেশী দূরে ছিল না, এবং রাত্রির শুব্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের অশ্রান্ত কলরোল সহজেই মনের সমস্ত চিন্তাকে জয় করিয়া আপনার অস্তিত্বই প্রবল ভাবে ঘোষণা করিত। উর্ম্মিলা সম্ভবতঃ চিন্তাদেবীর একাগ্র সাধনার জন্যই জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যার মধ্যে আশ্রয় লইয়া, প্রিয় চিন্তায় মন প্রাণ সঁপিয়া দিল। জ্যেঠাইমার কথার আভাসে যাহা বুঝা গেল, তাহা এই—বাসব বাড়ীতে কাহাকেও না বলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার একমাত্র গূঢ় কারণ প্রেম, এবং সেই একনিষ্ঠ প্রণয় সাধনার মূল কারণ সে নিজে—প্রণয়ীর বিরহক্লিষ্ট পলাতক মূর্ত্তিটি স্মরণে যেমন তার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই সঙ্গে নিজের প্রতি বাসবের অপরিসীম প্রণয়ের পরিচয়ে সুখানুভূতিতেও চিত্ত ভরিয়া গেল। হায় সংসার, হায় জগৎ, তোমরা শুধু বাহিরের মারপেঁচ লইয়াই ব্যস্ত—ভিতরের অতুল সম্পদের কোনো চিহ্নই তোমাদের চোখে পড়ে না! তোমাদের এই অবিচারে জগতের কত স্থানে কত সুধারসপূর্ণ কোমল হৃদয় অকালে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—ইত্যাদি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উর্ম্মিলার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। হঠাৎ এই সময়ে তার একটানা চিন্তার গতি বাধা পাইল—পিসিমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—

"ওমা, এ ঘরে যে এখনো সন্ধ্যা পড়ে নি! শুয়ে কে রে? উমি বুঝি?"

উর্ম্মিলা সচকিতে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

পিসিমা কহিলেন—"মন্দির থেকে এসেই শুয়ে পড়েচিস্ বুঝি? মা গো মা, কাঁড়ি খানেক বই-ই শুধু পড়তে শিখেচিস্! ঘর সংসারের কায যদি কিছু জানিস্! একে উড়েনী ঝি—কথা যদি কিছু বোঝে! কেবল আই মাই করে মরে। সেটাকে দিয়ে সাঁঝ বাতি গুলোও তো ঠিক করিয়ে জ্বালাতে হয়।"

উর্ম্মিলা আলো জ্বালিবার জন্য অগ্রসর হইয়া কহিল—"এক কোশ পথ হেঁটে যে পা ব্যাথা কচ্ছিল, তাতেই শুয়ে পড়েছিলাম। তুমি চেঁচিও না পিসিমা, এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

আলো জ্বালিয়া ও রান্নাঘরে জ্যেঠাইমার কাছে প্রয়োজন মত সাহায্য করিয়া দিয়া উর্ম্মিলা যখন দালানে পিসিমার কাছে ফিরিয়া আসিল, দেখিল পিসিমা একটি বৃদ্ধার সহিত মনোযোগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। বৃদ্ধার কোলের কাছে একটি ছয় সাত বছরের সুসজ্জিত বালক বসিয়া আছে। উর্ম্মিলাকে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিলেন—"এইটি বুঝি তোমার ভাইঝি?" পিসিমা কহিলেন—"হ্যাঁ মা—উমি এঁকে প্রণাম কর্। এঁরা আমাদের পাশের বাড়ীতেই কাল এসেচেন—সোমেশের শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোক—পরিচয় হল।"

উর্ম্মিলা প্রণাম সারিতেই বৃদ্ধা তার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"ভাল ঘর-বরে পড়ে' মনের সুখে থাক দিদি। হাঁ বাছা, মেয়ে তো মস্ত হয়েচে দেখচি—এখনো বিয়ে দিচ্ছ না যে?"

পিসীমা কহিলেন—"দেবো বলে তো ব্যস্ত হয়েই রয়েচি মা! ভাইটি অসুখে পড়েই সব গণ্ডগোল বেধেচে। স্কুলে পড়্‌ছিল এদ্দিন—বাপ নেই, জ্যেঠাই মানুষ করেচে, এই হবে এইবার বিয়ে।"

বৃদ্ধা বার দুই 'জগবন্ধু' নাম উচ্চারণ করিয়া কহিলেন—"আজকাল সব ধেড়েকেষ্ট মেয়ে বিয়ে দেওয়া ফ্যাসন হয়েচে বটে। আমার বউ-মা কিন্তু ভারী চালাক মেয়ে। দুটি নাৎনী

আমার, একটি মেয়ের দশে আর একটি এগারোতে পা দিয়েচে, বউ-মা আমার ছেলেকে উঠতে বসতে খেতে শুতে বিয়ের তাগাদা করচে। ছেলে বলে এখুনি কি? মেয়ে বড় হোক্। বউ-মা বলে—মেয়েছেলের বাড় কলা গাছের বাড়—আগে বর তো জোটাও।—আমি দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে হরিনাম করচি। বুঝেচ মা, ধিঙ্গী মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমি ভালবাসি না।"

পিসীমা এ সব মন্তব্যকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। সুতরাং উপস্থিত মনে মনে ভাইঝির বিবাহে ভ্রাতার ঔদাসীন্যের জন্য যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠিয়া, প্রকাশ্যে নিজের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য কহিলেন—"মেয়ের বয়স তো বেশী নয় মা—দেখতে বাড়ন্ত, তাই অত বড় হয়ে উঠেচে। —এই তেরো পেরিয়ে চোদ্দোয় পড়েচে মাত্র।"

উর্ম্মিলা নিজের বয়স দেড় বৎসর কম হইতে শুনিয়া মনে মনে বিষম কুণ্ঠা অনুভব করিতে লাগিল। অতঃপর ঘর গৃহস্থালির কথার প্রসঙ্গে বৃদ্ধা কহিলেন—"সে কর্ম্ম ভোগের কথা আর বল কেন মা! মেয়ের ছেলে আর বউ পুজোর ছুটীতে কটকে এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে আস্‌ছিল—আমি বল্লু ঐ ঠেঁয়েই তো জগবন্ধু আছেন, আমায় দেখিয়ে দিবি চল্। তাতেই ছোট নাতিটি আর নাৎবৌএর এক বোন্ আমার সঙ্গে এল। নাতি নাৎবৌ কটকেতেই নেমে গেছে; একেবারে আমাদের নিতে আসবে। আমার দেওর-পো এসেছে সঙ্গে। এমন এক ঠাকুর নিয়ে এসেচে যে কি বলি—জংলী না ভূত—কথাবার্ত্তা যদি কিচ্ছু বোঝে! রান্নার না জানে মাথা না জানে মুণ্ড, কেবল ফিক্ ফিক্ করে হাসে। সে এক মহা জ্বালায় পড়েচি— দেখ না ঐ আছে বসে।"

আঙিনার এক পাশে যে লোকটি উবু হইয়া বসিয়া ছিল, উর্ম্মিলা এতক্ষণ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। বৃদ্ধার কথায় তার দিকে চাহিবামাত্র তার মন যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মাথায় তার একটি রুমাল বাঁধা, গায়ে গেঞ্জি, বৃদ্ধারই সঙ্গী হইয়া এ বাড়ীতে সে আসিয়াছিল; এবং এতক্ষণ তাহারই সমালোচনা হইতে শুনিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছিল। কাছে আলো ছিল না, জ্যোৎস্নার আলোতে যতটুকু অবয়ব তার দেখা যাইতেছিল তাহাতে বয়স যে চব্বিশের বেশী নয় এ কথা বেশ বোঝা যায়। যাহা হউক, জ্যেঠাইমার আহ্বানে উর্ম্মিলা উঠিয়া গেল। এদিকে পিসীমা বলিলেন—"আপনি যখন একা এসেছেন, তখন ঠাকুর না আন্‌লেও পারতেন—এ তো অন্নক্ষেত্র, এখানে তো আর অন্নের ভাবনা নেই।"

বৃদ্ধা কহিলেন—"আমার জন্যে কি আর ভাবনা মা? কচি ছেলে এই নাতি—ওদিকে দেওর পোটি মাছ না হলে এক গেরাস ভাত মুখে তোলে না। তা ছাড়া বিদেশে একটা লোকবলও তো দরকার! তা দেওর-পোটি আসবার সময় এমন একটি লোক জোগাড় করে আন্‌লে, সে যদি কোনো কাযের! আজ দুখানা মাছ কুটে ধুয়ে নিতে বল্লু, তা বলে কি, মাছ কুটতে জানে না। কোন্ বড় লোকের বাড়ী রাঁধতিস্ রে বাপু—যে কুটনো বাট্‌না কিছুই শিখিস নি?"

বাহির হইতে ডাক আসিল—"কাকীমা, বাড়ী আসুন।"

বৃদ্ধা পা তুলিয়া কহিলেন—"আজ আসি মা, নিশীথ ডাকতে এসেচে। কাল একবার যেও তোমরা—ভাইঝিকে নিয়ে যেও। নাৎবৌয়ের বোন ছেলেমানুষ, একলাটি এসেচে, দোসর পেয়ে খুশী হবে।"

বৃদ্ধার পশ্চাতে ঠাকুরও বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। নিশীথ বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল, সে ডাকিল—"ঠাকুর এসো তো আমার সঙ্গে, কিছু মিষ্টি আর গল্‌দা চিংড়ী কিনে আনি—এই সময় টাট্‌কা বিক্রী হচ্ছে। কাকীমা আপনি গিয়ে ময়দা মাখুন।"

কাকীমা কহিলেন—"শীগ্‌গির আসিস বাছা। আমি আর রাত্তিরে আঁষ ছুঁচ্চি নে, কাতু যদি রেঁধে দেয় তবেই। আর খোকা ঘুমুস নি—দুখানা খেয়ে তবে শুবি।"

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন। নিশীথ, ঠাকুরের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—"কি রে, দেখা হল?"

ঠাকুর কহিল—"আমি দেখেছি বটে, তবে সে দেখেও দেখেনি—অর্থাৎ চিন্‌তে পারে নি। কিন্তু তোর কাকীর বকুনী আর সইতে পারি নে ভাই—পালাই পালাই ডাক্

ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। আবার লোকের বাড়ীতে গিয়েও নিন্দে কচ্ছেন—এমন কি আমার হাসিরও দোষ।"

নিশীথ, ঠাকুরের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল—"কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে ভাই ? এখন নাচতে বসে আর ঘোমটা দেওয়া সাজবে না। যা কর্‌ত চাস চটপট করে ফ্যাল্—ওদিকে তোর জন্যে খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়ে গেছে। কি জানি যদি আবার পেছনে ধাওয়া করে' আসে তাহলেই সব ধরা পড়ে যাবে। সতীন লোক সুবিধে না, গোয়েন্দা-গিরিতে ভারী পাকা, সে যদি পেছনে লাগে—"

ঠাকুরবেশী বাসব কহিল—"আরে, আমার বল-বুদ্ধি সব তুইই তো ভাই—তুই এখন যা বলিস।"

নিশীথ শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া কহিল—"বলা-বলির আর বেশী কিছু নেই। কথাবার্ত্তা সব ঠিক করে নে—তার পর একটা পাণ্ডাকে বলে কয়ে, একটা বামুন ঠিক করে, চুটো ফুল ফেলে কায সেরে নিবি। একবার বিয়ে হয়ে গেলে তো আর ফিরবে না।"

অবশ্য গোড়াতেই এই রকম পরামর্শ আঁটিয়াই চুই বন্ধু শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। বাসব ছোট বেলা হইতে বার দুই প্রেমে পড়িবার পর এই তৃতীয় বার প্রেম বা loveএ পড়িয়াছে। অবশ্য সত্য কথা বলিতে গেলে বাল্যাবস্থায় সে প্রথমবার বউদিদির নয় বছরের বোন ও দ্বিতীয়বার মাসীমার ভাসুর-ঝি চারুর সহিত ভালবাসায় পড়িয়াছিল। বেচারীর সে গোপন প্রেমের কাহিনী কিন্তু কুঁড়ির মধ্যেকার সুগন্ধের ন্যায় অন্তরেই অবরুদ্ধ ছিল, যৌবনের মারুত হিল্লোলে তাহার প্রকাশ সার্থক হয় নাই। কিন্তু আই-এ পাশ করিবার পর যখন তাহারা বেচু চ্যাটার্জীর লেনে নূতন বাসায় উঠিয়া আসে, সেই সময় একদিন সম্মুখের বাড়ীর দোতালার বারান্দায় উর্ম্মিলাকে পায়চারী করিয়া নতমুখে বই পড়িতে দেখিয়া প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়া ফেলে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে এবারকার ভালবাসা বাল্যকালের নিতান্ত ছেলেমানুষী নয়, রোমিও জুলিয়েট, বা শকুন্তলা দুষ্মন্ত কিংবা আধুনিক যুগের জগৎসিংহ আয়েষা, বা হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রণয় পংক্তিতেই এ প্রণয় পাংক্তেয় হইবার যোগ্য। বলা বাহুল্য, সে ধরিয়া লইয়াছিল, নায়িকাও তার প্রেমে আত্মহারা—এবং অবশেষে সুরেশের সাহায্যে সে যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাতে বিশেষরূপে আশ্বস্ত হইয়াছিল যে উর্ম্মিলাও একাগ্রচিত্তে একমাত্র তাহাকেই কামনা করিতেছে। উর্ম্মিলার জ্যেঠামহাশয়ের অন্তঃপুরে বাসবের মাতা ভগিনীর যাতায়াত চলিত, সুতরাং বাসব অচিরেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু বাসবের পিতার সহিত সদানন্দ বাবুর সদ্ভাব ছিল না। তিনি বিবাহের প্রস্তাব কাণে লইলেন না। তাহা ছাড়া উভয় পক্ষেই সামাজিক অন্তরায়ও কিছু কম ছিল না, নানা কারণে বিবাহের কথা চাপা তো পড়িয়া গেলই, মাঝে হইতে দুই পরিবারে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া উভয় পক্ষেরই দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় সদানন্দ বাবু ভাইঝিকে বোর্ডিংএ রাখিয়াছিলেন। বাসব কলেজের ছুটির ঘণ্টায় স্কুল কম্পাউণ্ডের সম্মুখ দিয়া বাইসিকেল আরোহণে চলিবার সময় চকিতের জন্য নায়িকা সন্দর্শন লাভেই সুখী হইয়া দিন কাটাইতেছিল। ইতিমধ্যে সদানন্দ বাবু অসুস্থ হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন, বাসবের পিতামাতা পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পাত্রী অন্বেষণে মন দিলেন। বাসব কিন্তু নাছোড়বান্দা—রোমাণ্টিক কিছু একটা নিজের জীবনে করিবার জন্য তার প্রবল ইচ্ছা। সে বন্ধুবর নিশীথের শরণাপন্ন হইল। নিশীথ বলিল—এ আর বিশেষ কি কঠিন ব্যাপার—পাত্রী যদি সম্মত থাকে তাহা হইলে কিসের বাধা কিসের ভয় ? তারপর সে, কাকীমা পুরী যাইবার সময় বামুন ঠাকুরের খোঁজ করিতেছেন দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ফন্দী আঁটিয়া হাওড়া ষ্টেশনে ঠাকুরবেশী বাসবকে সঙ্গে লইয়া পুরী যাইবার জন্য কাকীমার সঙ্গী হইল। এই তো গেল পূর্ব্বাপর ঘটনা—এখন এর জের মিটবে কোথায় সেই চিন্তায় যুবকদের মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, যে কথা হইতেছিল তাহাই বলি। নিশীথের উত্তরে বাসব কহিল—"কিন্তু কলকাতায় একখানা বড় চিঠি লিখে সুরেশকে দিয়ে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম, তার জবাব কিছুই দেয় নি। শুধু লিখেচে—পেয়েছি—কিন্তু

একটা ভাল রকম উত্তর না পেলে কাযে এগুই কি করে?"

নিশীথ কহিল—"তার জন্যে ভাবনা নেই। সমুদ্রের ধারে বৈকালের দিকে বেড়াতে যায়, একদিন মুখোমুখী দেখা করে ফ্যাল্। আর বিয়ের পর বউকে কোথায় রাথবি সেটাও ঠিক করে নে—যে সদানন্দ বাবু! বিয়ে হয়ে গ্যাচে জানলেও বিয়ে ফিরে নিতে পারে। বিয়ের পর কনেকে সরিয়ে না ফেললে উপায় নেই। তোর তো পুঁজি মাত্র ছশো টাকা—কোথাও বাড়ী ভাড়া করে যে লুকিয়ে রাখবি তারও তো যো নেই—"

বাসবের ভাবপ্রবণ চিত্তে রোমান্সের কল্পনায় এতদিন খুব উৎসাহের সহিত সাড়া দিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ব্যাপার আসন্ন দেখিয়া সে কতকটা ভয় পাইয়া গিয়া বলিল—"তা, জানাজানির দরকার কি ভাই? বিয়ের পর ও আপনার জ্যেঠার কাছেই চলে আসবে, এখুনি সব জানাবার দরকার কি?"

নিশীথ ধমক দিয়া কহিল—"আরে, বিয়ের পর কি আর চুপচাপ কিছু রাখা যায়? আপনিই যে ঢাক বেজে যাবে। নে এখন—তাড়াতাড়ি চল্—কাকীমা বকাবকি করচেন। আগে দ্যাখ তোর sweetheart রাজী কি না।"

"হুস্ রাজী আবার না? এমন রসের সাগর, গুণের নাগর পাবে কোথায়?" গর্ব্বভরে এই কথা বলিয়া বাসবও তখন দ্রুত পদে নিশীথের সহিত পথ চলিতে লাগিল।

৪

দিন চার পরে। নিশীথের কাকীমার নবীনা আত্মীয়াটির নাম কাত্যায়নী—বয়সে সে উর্ম্মিলার অপেক্ষা চার পাঁচ বছরের বড় হইলেও উর্ম্মিলার সহিত বেশ ভাব জমাইয়া লইয়াছে। মন্দির দর্শনে বা সমুদ্রের বায়ু সেবনে সে উর্ম্মিলাকে সঙ্গে না লইয়া যায় না। আজ মধ্যাহ্ন ভোজনে সে উর্ম্মিলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে; এবং ঠাকুরের রন্ধন বিষয়ে অপটুতা স্মরণ করিয়া মাছ তরকারী প্রভৃতি নিজেই রাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার কোলে আবার এক বৎসরের একটি কচি মেয়ে। এদিকে সমুদ্রের ঢেউ খাইয়া স্নান করিবার লোভটুকুও কম নাই। নিশীথ পরামর্শ দিল, বাড়ীতে ঝির কাছে খুকীকে রাখিয়া, সকাল সকাল স্নান সারিয়া আসিয়া রান্নার কাযে নিযুক্ত হইলেই চলিবে, বেলা দশটার মধ্যে আহার সারিয়া অফিস স্কুল যাইবার ত কোন বালাই নাই। কাত্যায়নী তাহা মানিয়া লইল।

কাকীমা, কাত্যায়নী ও উর্ম্মিলাকে লইয়া নিশীথ যখন সমুদ্রের পথে অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় খোকাকে কাঁধে লইয়া ঠাকুরকেও পিছু লইতে দেখিয়া কাত্যায়নী বলিয়া উঠিল—"ওমা—ঠাকুর আবার আসে কেন? ও-ঠাকুর—তুমি ডাল চাপিয়েছিলে না, ডাল পুড়ে ছাই হয়ে থাকবে যে—"

বৃদ্ধা কহিলেন—"এমন অবাধ্য ঠাকুর যদি আর দুটি আছে। সমুদ্দুর দেখলে আমার বুক গুর্ গুর্ করে' কাঁপে—রাক্ষসে হাঁ মেলে যেন রাদ্দিন গাঁ গাঁ করে চেঁচাচ্ছে—ঐ দুরন্ত ছেলে বলুকে সেখানে নিয়ে যাবার কি দরকার?"

ঠাকুর কহিল—"ও আমায় জিজ্ঞেস করলে—ঠাক্মা কোথা গেল? আমি বললাম—সমুদ্রে স্নান করতে। অমনি কাঁদতে লাগল যে আমায় নিয়ে চল—ঝিনুক কুড়িয়ে আনব।"

বৃদ্ধা কহিলেন—"তা তুমি ওকে বললে কেন যে সমুদ্দুরে গেচে? বললেই হত ওবাড়ী দেখা করতে গ্যাচে।"

ঠাকুর জিভ কাটিয়া কহিল—"জগবন্ধু, জগবন্ধু! দেবতার স্থানে কি মিছে কথা বলতে আছে মা ঠাকরুণ?"

কাত্যায়নী কহিল—"আর ডালের গতি কি হবে? সে যে চুঁয়ে পুড়ে থাকবে।"

ঠাকুর কহিল—"ডাল নামিয়ে রেখেছি—এসে চাপালেই হবে।"

কাত্যায়নী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল—"ওমা কোথা যাব! ও ডাল যে দ' পড়ে যাবে, ও কি আর সেদ্ধ হবে?"

নিশীথ কহিল—"খুব হবে—চলে চল সব—মেসের ঠাকুররা আধসেদ্ধ ডাল নামিয়ে কত সময় বাজারে যায়, দোকানে যায়, তাতে আর কি হয়েচে?"

কাত্যায়নী কহিল—"মেসের কথা ছেড়ে দাও। ঠাকুর তুমি ফিরে যাও।"

ঠাকুর আদেশ পালনে তৎপর হইবামাত্র, স্কন্ধারূঢ় বলুবাবু এমন প্রতিবাদের রাগিণী আলাপ করিতে সুরু করিল যে, সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে ঠাকুরেরও সহযাত্রী হইতেই হইল।

পুরী আসিয়া সব চাইতে সুন্দর বা ভয়ঙ্কর দৃশ্য এই সমুদ্র—বিশেষ করিয়া কলিকাতা বা ঐ অঞ্চলবাসীদিগের চক্ষে। সুতরাং সমুদ্র দর্শনে সবারই চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে—এবং প্রতিবারেই নূতন নূতন ভাবে।

প্রথম প্রথম সমুদ্রস্নানে নাকানী চুবানী খাইয়া এ কয়দিন কাত্যায়নী স্নানে বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধার স্নানে অনুরাগ মোটেই ছিল না, কিন্তু ঢেউ খাইয়া পুণ্য সঞ্চয়ের প্রলোভন ছিল তিন গুণ।

উর্ম্মিলার স্নানের লোভ বেশী থাকিলেও নিশীথ ও ঠাকুরের সম্মুখে স্নান করিতে সে সম্মত হইল না। শরীর ভাল নাই বলিয়া আপত্তি জানাইল। অগত্যা নিশীথ ও কাত্যায়নী স্নানে নামিল, এবং বৃদ্ধা যথাসম্ভব ডাঙ্গার উপরে বসিয়া ঢেউয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বলু, ঠাকুরের স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চঞ্চল ঢেউয়ের ফেনাগুলিকে অন্ততঃ স্পর্শ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেই ঠাকুর তাহাকে সাধ্যমত আগুলিয়া রাখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য নিকটেই উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়া। ছদ্মবেশী বাসবকে সে আজ ভাল করিয়াই চিনিয়া ফেলিয়াছে এবং তার এই ছদ্মবেশের অন্য কারণ আছে কি না, না জানিলেও, তার মনে যে কারণটি বেশ স্পষ্ট করিয়া সাড়া দিয়াছে তাহার আভাসে প্রতি পলে পলে মন তার সুখের বেদনায় রাঙা হইয়া উঠিতেছে।

সম্মুখে স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত—এ মাহেন্দ্রক্ষণ হেলায় বহাইয়া দিতে বাসব প্রস্তুত ছিল না। সমুদ্রের অশ্রান্ত তরঙ্গদল কলরোলে দিগ্‌ দিগন্ত ভরিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং মৃদুকণ্ঠের কথা অপরের শুনিবার আশঙ্কা নাই। সে নির্ভয়ে স্পন্দিত চিত্তে উর্ম্মিলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"বুঝতেই পারচ উর্ম্মিলা—তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা। কিন্তু এ ভাবে দিন ত আর কাটে না! চিঠিতে তোমায় সব কথাতে খুলে লিখেচি—আর বলবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এখন উত্তর কি দেবে তাই শুনতে চাই।"

উর্ম্মিলার দেহ মন কাঁপিতে লাগিল। উত্তর? হায়—কি উত্তর দিবে সে?

এতক্ষণে ঐ একটা বড় রকম ঢেউ আসিয়া বৃদ্ধার মস্তকে তরঙ্গাঞ্জলি অর্পণ করিয়া গেল। বড় ঢেউ অবশ্য বেশ একটু দেরী করিয়াই আসিতেছে। কিন্তু আর দুইটা ঢেউ আসিলেই সব সুযোগ শেষ হইয়া যাইবে। অশান্ত কণ্ঠে আবার বাসব বলিয়া উঠিল—"তোমার কথার উপরেই আমার বাঁচা মরা নির্ভর করচে। যদি তুমি আমার না হও তা হলে আজই আমায় বিদায় দাও—আমি এখনি ঐ সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যাই—"

সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গরাশির পানে চাহিয়া উর্ম্মিলা শিহরিয়া উঠিল—ঢেউয়ের সঙ্গে কারা অর্থাৎ মৃত্যু বরণ। না, না—এতখানি প্রণয় সুধা-পরিপূর্ণ হৃদয়কে প্রত্যাখ্যান করিবে সে কোন গর্ব্বে? কোন্ বাঙ্গালা বা ইংরাজী উপন্যাসে এমন দর্পিতা নায়িকার চিত্র আছে? এ যে অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার।

নতমুখে উর্ম্মিলার মুখের দিকে চাহিয়া বাসব অধীর আগ্রহে আবার বলিল—"উত্তর দাও উর্ম্মিলা—আর সময় নেই।"

উর্ম্মিলা মৃদুকণ্ঠে কহিল—"কি উত্তর দেব?"

বাসব উন্মত্ত আগ্রহে কহিল—"বল আমার হবে কি, না।"

একটি ছোট্ট হাঁ—বলিয়াই উর্ম্মিলা প্রণয়ীর সবখানি আশা ও কামনাকে এক লহমার মধ্যে সার্থকতার গৌরবে ভরিয়া দিল।

ঠিক এই সময় যে ব্যাপার ঘটিল, তাহার জন্য নায়ক নায়িকা কেহই প্রস্তুত ছিল না, এবং উপন্যাস বা রোমান্স জগতে এই প্রকার প্রতিবন্ধকতাই প্রেমিক প্রেমিকার মিলন মুহূর্ত্তকে নিতান্ত বিপন্ন করিয়া তোলে—অর্থাৎ সহসা সমুদ্রের গর্জ্জনকেও ছাপাইয়া উর্ম্মিলা তার নাম উচ্চারিত

হইতে শুনিয়া, চকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—সোমেশ দাদা তাহার সম্মুখে।

সোমেশ থাকে সিমলার পাহাড়ে—সেইখানেই তার চাকুরী—তবে পীড়িত পিতাকে দেখিতে আসিবার জন্ম সে মাসাধিক কাল হইতে ছুটি লইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হঠাৎ সে যে এ ভাবে পুরী আসিয়া পৌছিবে এ সম্ভাবনা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। যাহা হউক, প্রথমটা চমকিয়া উঠিলেও পরক্ষণে আনন্দের আভায় উজ্জল হইয়া উঠিয়া ঊর্ম্মিলা অগ্রসর হইয়া সোমেশের পায়ের ধূলা লইয়া কহিল—"তুমি কখন এলে দাদা?" সোমেশ সে কথার উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে বাসবের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল—"বাসব, ব্যাপার কি? সতীন্দ্রের তার পেয়েই আমি চলে এসেচি। কারও কাছে কোন কথা ভাঙি নি বটে, তবে তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে এসেচি। তিনিও আজ রাত্রে এসে পৌছুচ্ছেন। কিন্তু তুমি ভদ্র সন্তান—সুশিক্ষিত, একটি বালিকার পিছনে এমন করে ধাওয়া করে বেড়ানো—"

সোমেশ কথা শেষ করিল না। বাসব ভয়ে ও লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। প্রেমের স্বপ্ন তার চক্ষু হইতে একেবারেই মুছিয়া গিয়াছিল। বাবা আসিতেছেন—শুধু এই শব্দটি তার কাণে প্রাণে সমুদ্র কল্লোলকে ছাপাইয়া বাজিতেছিল। সুতরাং সে বলিয়া উঠিল—"আমায় বৃথা দোষ দেবেন না। মেয়েমানুষের কাছ থেকে প্রশ্রয় না পেলে—"

বজ্র গর্জ্জনে সোমেশ বলিয়া উঠিল—"চুপ! আর কথা নয়। কোথায় তোমার বন্ধু নিশীথ? বেশী গোলমাল করে দরকার নেই, বিয়ে কর্ত্তে যদি রাজী থাক, এখনি প্রস্তুত হও। তোমায় বাবা এসে পৌছিবার আগেই আমি সম্প্রদান শেষ কর্ত্তে চাই—আমার বাবাকেও জানিয়ে আমি গোলমাল করতে চাই নে।"

সোমেশকে দূর হইতেই নিশীথ চিনিতে পারিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল ব্যাপার সঙ্গীন। কিন্তু সে বুদ্ধিমানের ন্যায় চুপ চাপ কাত্যায়নী ও কাকীমাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া দ্রুতপদে সোমেশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সোমেশ তাহার দাদারই বন্ধু, সে সোমেশকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সম্মান করে, সুতরাং তাঁহাকে সাহসা এ ভাবে সম্মুখে দেখিয়া তার মন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। যাহা হউক সে সাহসে ভর করিয়া কহিল, "এদের যখন বিবাহের এত ইচ্ছে, তখন বাধা দেওয়া তো আর ঠিক্ না সোমেশ দা!"

সোমেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বাসবকে কহিল, "ঊর্ম্মিলা নিজের মুখে তোমার বিয়ে করতে রাজী হয়েচে বাসব?"

বাসব ব্যস্তভাবে কহিল, "নিশ্চয়। নইলে কি আমার কাছে ঘেঁসতে সাহস হয়? পুরুষ মানুষ হাজার হোক্ তবু...."

"চুপ, আর কথা নয়। বলি, ছদ্মবেশ ধরবার আগে আমায় তো একবার চিঠি লিখে সব জানাতে পার্ত্তে! তারপর সতীন্দ্র যা বললে—তোমার love matter সে বড় সরল ব্যাপার নয়।"

উগ্রকণ্ঠে এই কথা বলিয়া এইখানেই সোমেশ থামিয়া গিয়া ঊর্ম্মিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে অদূরে দাঁড়াইয়া বেতসলতার মত কাঁপিতেছে। সে তখন হাত তুলিয়া বাসবকে কহিল, "আচ্ছা, বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, এখন চল্লাম।"

সোমেশ ঊর্ম্মিলাকে লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, "এসে পৌছেই শুনলাম, তুই সমুদ্রস্নানে এসেচিস্। অমনি ছুটে এসেচি। ঐ যে লাল বাড়ীটা দেখ্‌চিস্ গতবৎসরে আমরা এসে ঐ বাড়ীটাতেই ছিলাম।"

ঊর্ম্মিলাকে সোমেশ অত্যন্ত স্নেহ করে। সে বুঝিতে পারিল ঊর্ম্মিলা বিমনা হইয়া পড়িয়াছে। বাসবকে সেও বড় পছন্দ করিত না, সুতরাং সেও বেশ একটু অন্যমনস্ক ভাবেই তখন নীরবে পথে চলিতে লাগিল।

* * * * *

বেলা দুইটার সময় নিশীথদের বাসায় নিজেই যখন সোমেশ বাসবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, তখন দেখিল, নিশীথের কাকীমা বামুন ঠাকুরের পলায়ন সংবাদ উড়েনী ঝির মুখে সবে মাত্র অবগত হইয়া, কাপড়

চোপড় ও বাসন কোসনের বিশেষ করিয়া খোঁজ লইতেছেন যে, ঠাকুরটা কিছু লইয়া পলাইল কি না এবং এহেন জুয়োচোর আনাড়ী ঠাকুরকে সঙ্গে আনার জন্য নিশীথকে ধমক ধমকও করিতেছেন। যাহা হউক, সোমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, যেহেতু এখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সতীন্দ্র মিথ্যা বলে নাই যে বাসবের এ একটা খেয়াল মাত্র। নিশীথ কিন্তু ভারি দমিয়া গেল। সে তার নূতন বন্ধুর প্রণয় ব্যাপারটিকে এতখানি হাল্কা ভাবে গ্রহণ করে নাই। সেই জন্য বাসবের প্রণয় কাহিনী শুনিয়া সতীন্দ্র যখন ছ্যাবলামী বলিয়া টিট্‌কারী দিয়াছিল, তখন তার ভারী রাগ হইয়া, নূতন প্রেমিক বন্ধুর প্রতি অনুকম্পার মাত্রা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক এদিকে নায়কের পলায়ন ও নায়িকার চক্ষু মুছিয়া পাঠে নূতন করিয়া মনঃসংযোগ এবং দাদার নিকট হইতে পুনঃপুনঃ সাবধান হইয়া পড়া শুনা করিবার জন্য উপদেশ লাভ, ওদিকে হারানিধি পুত্র-ধনকে কোলে পাইয়া বাসবের মাতা সওয়া পাঁচ টাকার সত্যনারায়ণের সিন্নী চড়াইয়া, ঘটক ঘটকীকে অবিলম্বে তিন হাজার টাকার তোড়া শুদ্ধ সুন্দরী বধূ খুঁজিয়া দিবার জন্য বড় রকম পুরস্কার অঙ্গীকার করিলেন। আর, নায়ক বাসব ছুটির বন্ধের পর প্রত্যহ সতীন্দ্রের রহস্য চটুল দৃষ্টি এড়াইবার জন্য ক্লাসে চোখে নোটবুক আড়াল দিয়া যাতায়াত সুরু করিল।

পাড়া প্রতিবেশীদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই সোমেশ ও নিশীথের জন্য এ হেন রসাল ব্যাপারটিকে শাখা প্রশাখায় পল্লবিত করিয়া অন্ততঃ দু-তিন-মাসও উপভোগ করিয়া অবসর সময়ে নিজের ও দশের চিত্ত বিনোদন করিতে পারিল না। ব্যাপারের প্রকৃত সূত্রের এতটুকুও যদি কাণে পশিত গো।

শ্রীসরসীবালা বসু।

ধারা-লিপি

আমার নয়ন-ধারা
শ্রাবণ-ধারায়, বঁধু,
  নিকাশে;
আমার হিয়ার জ্বালা
জ্বালাময়ী বিদ্যুৎ—
  শিখা সে।
মলিন মনের ছায়া
গগনে লভেছে কায়া;
সজল জলদ-জালে
  লিখা সে।
দেয়া-রবে ঘন-ঘন
প্রিয়-স্মৃতি-শিহরণ
কম্পিত নীপবন
  বিকাশে।

তোমার বিরহে ওগো
কি যাতনা, কাব কি তা
  বিচারি;
এ বাদল ঝর-ঝরে
আনমনে থাকিবারে
  কি পারি!
একেলা আঁধার ঘরে,
শূন্য শেযের পরে
হিয়া শুধু কেঁদে মরে
  আছাড়ি—
আজি তুমি কোথা বঁধু,
তুমি যে আমারি শুধু—
জীবনে মরণে আমি
  তোমারি।

শ্রীনলিনীভূষণ দাসগুপ্ত।

পুলিন বাবুর পুত্রলাভ

(গল্প)

পুলিন বাবুর বয়স যখন ১৫ বৎসর মাত্র, সেই সময়েই একটি দশ বৎসর বয়স্কা বালিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। এখন তাঁহার বয়স ৩০ এবং পত্নী সুশীলা সুন্দরীর বয়স ২৫ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি এই দম্পতী একটি সন্তানের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে দুইজনেই বড় মনঃক্ষুন্ন—বোধ হয় সুশীলাই বেশী।

পুলিনবাবু পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদ্র জমিদার। তবে, পাড়াগাঁয়ে বাস বলিয়া তিনি নিজে পাড়াগেঁয়ে নহেন—কারণ, প্রথমতঃ গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূর নহে—রেলে ৫৬ ঘণ্টার পথ মাত্র; দ্বিতীয়তঃ বিবাহের পর কলিকাতায় গিয়া তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করিয়া, সভ্যভব্য হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সুশীলা নির্জ্জলা পাড়াগেঁয়ে।

আত্মীয় পরিবার পাড়া-প্রতিবেশী—যখন দেখিল যে সুশীলার ২০ বৎসর বয়স হইয়া গেল, তথাপি সন্তান হইল না, তখন সকলেই তাহাকে "বাঁজা" বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। অনেকেই বলিতে লাগিল, পুলিনের আবার বিবাহ করা উচিত, নচেৎ বংশলোপ অনিবার্য্য। পুরুষেরা বলিল, পুলিন যদি স্ত্রীর ভয়ে বিবাহে বিরত থাকিয়া, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা নষ্ট করে, তবে তার তুল্য নরাধম আর জগতে নাই। স্ত্রীলোকেরা—যাঁহারা প্রবীণা হইয়াছেন—তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, স্বার্থের জন্য স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে না দেওয়া, সুশীলার অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে এবং এরূপ কার্য্য শুধু বর্ত্তমান যুগেই সম্ভব—তঁাহাদের আমলে এরূপ ঘটিতে কখনও শোনা যায় নাই। তাঁহারা মাঝে মাঝে এই লইয়া সুশীলাকে মৃদু গঞ্জনা দিতেও ক্রুটি করেন না।

এইরূপে উত্যক্ত হইয়া, সুশীলা কিছু দিন হইতে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে; কিন্তু পুলিন সে কথা কাণেই তুলে না।

সংসারে এখন সুশীলাই গৃহিণী। একটি বিধবা ননদ ও একটি বিধবা যা' আছে—তাহারা সুশীলার বয়ঃকনিষ্ঠ।

আজ গ্রামে একটা নিমন্ত্রণে গিয়া, সুশীলা কয়েক জন গিন্নিবান্নী রমণীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য শুনিয়া আসিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে রাজি করিবে, নচেৎ—

নচেৎ, গঙ্গায় ডুবিবে, অথবা বিষ খাইবে, অথবা পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে, তাহা সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই। রাত্রে আহারাদির পর শয্যায় প্রবেশ করিয়া, স্বামীর নিকট সুশীলা এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল।

পুলিন বলিল, "দূর পাগলী!"

সুশীলা বলিল, "এটা আমার পাগলামি হল কিসে? বিয়ে করলে যদি একটি ছেলের মুখ দেখতে পাও, বাপ-পিতামো যদি জলপিণ্ডি পান, সেটা কি তোমার করা উচিত নয়?"

পুলিন বলিল, "দেখ সুশী, বিয়ে আমি একটা কেন দশটা করতে পারি। কিন্তু জান ত, যেমন স্ত্রীলোক বাঁঝা আছে, তেমনি পুরুষ বাঁঝাও আছে। আমি যদি সেই রকম পুরুষ হই—তাহলে সে স্ত্রীরও ত সন্তান হবে না। চিরদিনের জন্যে মিছে কেবল তোমায় সতীনের যন্ত্রণা দিয়ে যাব সেটা কি ভাল?"

সুশীলা গম্ভীর ভাবে বলিল, "কে বল্লে তোমার ছেলে হবে না? তা ছাড়া, আমায় সতীনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তারই বা মানে কি? তুমি কি

নতুন বউ এনে আমাকে আর খেতে দেবে না, না পরতে দেবে না, না আমায় বিষ নয়নে দেখবে? সে রকম লোক তুমি নও তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

পুলিন পাশ ফিরিয়া, পাশের বালিস আঁকড়িয়া ধরিয়া বলিল, "রাত ১২টা বাজে, এখন একটু ঘুমতে দেবে? না, খালি গজর গজর করবে?"

সুশীলা, চুপ করিয়া গেল।

২

দুই দিন পরে বেলা ৯টার সময়, পুলিন তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া দুই একজন প্রতিবেশীর সহিত আরামে ধূমপান ও গল্পগুজবে মগ্ন আছে—এমন সময় অন্তঃপুর হইতে তাহার তলব আসিল। হুঁকাটি একজনের হাতে দিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, নিম্নতলের ঢাকা বারান্দার উপর একখানি কুশাসন বিছাইয়া, গ্রামের দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি লইয়া বসিয়া আছেন—সুশীলা, কক্ষমধ্যে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া।

পুলিন বারান্দায় উঠিয়া বলিল, "ঠাকুর মশাই যে! প্রণাম হই। কতক্ষণ আসা হয়েছে?"—বলিয়া, তাঁহার পানে চাহিয়া, অন্যের অলক্ষিতে একটু হাসিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর হস্তসঙ্কেতে আশীর্ব্বাদ করিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "বেশীক্ষণ নয়—এই ঘণ্টা খানেক হল এসেছি বাবা। লক্ষ্মী মা কালই আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা কাল আর সময় পাইনি, আজ এসেছি।"

পুলিন ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তলব কেন গিন্নী? দৈবজ্ঞ ঠাকুরকেই বা আনিয়েছ কেন? নিজের একটা সতীন টতীন ঠিক করেছ নাকি? ঠিকুজী কুষ্ঠী মেলাবে?"

সুশীলা বলিল, "হাঁ, মেলাব। তুমি এখন হাত পা ধুয়ে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে ঐ তসরের কাপড় খানা পর দেখি!"

পুলিন বলিল, "সুবোধ ও সুশীল স্বামী সর্ব্বদা স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বেড়ায় এবং কখনও তাহার অবাধ্য হয় না। সে যা পায় তাই খায়—গালিগালাজ, সম্মার্জ্জনী কিছুতেই আপত্তি করে না।—তা, আমি তসরের কাপড় পরে' কি করবো?"

সুশীলা বলিল, "দৈবজ্ঞ ঠাকুর তোমার হাত দেখবেন।"

পুলিন বলিল, "হাত দেখ্‌বেন? কি সর্ব্বনাশ! কৈ, আমি ত নিজের কোনও অসুখ বিসুখ বুঝতে পারছি নে! ক্ষিদের পেট জ্বলে যাচ্চে! দোহাই তোমার—আমার ভাতটি যেন বন্ধ কোর না!"

সুশীলা বলিল, "যাও—যাও, বুড়ো বয়সে আর ঢং দেখে বাঁচিনে! সে হাত দেখা নয়। হাত দেখে, উনি অদৃষ্টের ফলাফল বলে' দেবেন।"

পুলিন শুনিয়া হাসিল। বলিল, "তুমি ত জান সুশী ও সবে আমার বিশ্বাস ফিশ্বাস নেই। মিছে কেন আমায় কর্ম্মভোগ করাবে?"

সুশীলা বলিল, "তোমার বিশ্বাস নেই, আমার ত আছে। আমি যা বলি তা কর।"

স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে অবশেষে পুলিনকে বাধ্য হইয়া তসর পরিয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া বসিতে হইল।

ঠাকুরমহাশয় বলিলেন, "দাও দেখি বাবা! ডান হাতখানি দাও।"

পুলিন হাত বাড়াইয়া দিল। সেখানি লইয়া ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, "যদিও বউমা, তোমার পুত্রভাগ্যটি জানবার জন্যেই বিশেষ ব্যস্ত হয়েছেন, তথাপি পরমায়ুটাই আগে পরীক্ষা করতে হয়। কেননা শাস্ত্র বলেছেন—পূর্ব্বমায়ুঃ পরীক্ষেত পশ্চাল্লক্ষণমেব চ। বাঃ—এই যে বুড়ো আঙুলে ধনুরেখা রয়েছে। শাস্ত্র বলেছেন,

ধনুর্ব্বস্তু ভবেৎ পাণৌ, পঙ্কজং বাথ তোরণম্।
তদৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ধ্রুবম্॥

বাবা, এতে ক'রে তোমার রাজোচিত ঐশ্বর্য্য, আর আশীবছর পরমায়ু সূচিত হচ্চে। আচ্ছা, এইবার তবে পুত্রভাগ্যটা দেখি।"—বলিয়া তিনি পুলিনের

পাণিপার্শ্ব অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। —তার পর, হাত খানি ছাড়িয়া দিয়া, সুশীলার পানে চাহিয়া বলিলেন, "একটি পুত্রসন্তান তোমার স্বামীর অদৃষ্টে ত রয়েছে দেখ্‌ছি মা।"

সুশীলা ঘোমটার ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ ক'টি?"

দৈবজ্ঞ ঠাকুর আরও কিছুক্ষণ হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বিবাহ ত একটিই দেখ্‌ছি। আচ্ছা, এস ত, তোমার হাতখানি আর একবার দেখি।"

সুশীলা আসিয়া, নিজ বাম হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিল।

দৈবজ্ঞ ঠাকুর সেখানি লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "নাঃ—আমার ভুল হয়নি। তুমিই তোমার স্বামীর সন্তানের জননী হবে, মা! এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।"

অতঃপর দৈবজ্ঞ ঠাকুর দক্ষিণান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পুলিন, তসর ছাড়িয়া নিজ সাবেক বস্ত্র পরিধান করিতেছিল, সুশীলা তাহার কাছে গিয়া বলিল, "বলি হ্যাগা - দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে কত টাকা ঘুষ খাইয়েছ?"

পুলিন বলিল, "ঘুষ! ঘুষ আমি কি জন্যে খাওয়াব?"

"নইলে, আমার ২৫ বছর বয়স হল, এখনও আমি সন্তানের জননী হব বলে গেল কেন?"

পুলিন বলিল, "বাঃ—সে আমি কি জানি? আমি ত তোমায় সাফ বলেছি আমি ও সব বুজরুকি বিশ্বাস করিনে। তুমি নিজেই বল যে তোমার বিশ্বাস হয়;—এখন তুমি জান আর তোমার দৈবজ্ঞ ঠাকুরই জানে—আমি কি জানি?"—বলিয়া পুলিন বাহির হইয়া গেল।

সুশীলা বসিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। তার পর ডাকিল, "গেনির মা!"

ঝি, গেনির মা আসিয়া বলিল, "কেন গিন্নীমা?"

"তুই কাল দৈবজ্ঞ ঠাকুরকে ডাকতে গিয়েছিলি, কর্ত্তা কি তা জানতে পেরেছেন?"

গেনির মা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কর্ত্তা জানতে পেরেছেন?—তা, কেমন করে বলবো মা? ওঃ—হ্যাঁ—মনে হয়েছে। ঠিক ত। কাল যখন আমি দৈবজ্ঞি ঠাকুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠেছি, সামনেই দেখি কর্ত্তা মেশাই—লাঠি হাতে করে' কোথা থেকে বেড়িয়ে আসছেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গেনির মা, এখানে কি করতে এসেছিলি? আমি মাথাটি নীচু করে বল্লাম, আজ্ঞে, মাঠাকরুণ ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই বলতে এসেছিলাম।"

সুশীলা রুষ্টস্বরে বলিল, "কৈ আমাকে ত এসে সে কথা তুই বলিসনি!"

গেনির মা বলিল, "ভুলে গেছনু মা—ভুলে গেছনু! আর মা, এখন কি আর সব কথা মনে থাকে ছাই! দশ-গণ্ডাই হবে কি বিশ গণ্ডাই হবে বয়স হল, এখন তোমাদের রেখে যেতে পারলেই বাঁচি মা!"

অতঃপর সুশীলা, দৈবজ্ঞ ঠাকুরের দশম বর্ষীয় পৌত্র উমাপদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, সমস্ত কথাই সে প্রকাশ করিল। গতকল্য বিকালে জমিদার বাবু তাহাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং বৈঠকখানায় বসিয়া তাহার পিতামহের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, উপরন্তু উঠিবার সময় দশটি টাকা প্রণামী দিয়া আসিয়াছেন।

শুনিয়া সুশীলা মনে মনে বলিল, "হুঁঃ—সুশীলা বামনী আবার জানে না কি! কেবল, মরে বলে তাই জানে না। আমার সঙ্গে এই রকম চালবাজি! আচ্ছা আসুক মিন্সে বাড়ীর ভিতর!"

স্ত্রীর পীড়াপীড়ি ও জেরায় পড়িয়া, অবশেষে "মিন্সে"কে স্বীকার করিতেই হইল যে ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষী সৃষ্টিকরণরূপ দুষ্কার্য্য সে করিয়াছে এবং নাক কাণ মলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে এরূপ কার্য্য আর কখনও তাহার দ্বারা হইবে না।

আষাঢ় মাস। আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। সুশীলা তাহার শয়ন কক্ষের জানালার কাছে বসিয়া আকাশের গায়ে নীরদ ও সৌদামিনীর খেলা দেখিতেছিল। তার মনটা বড় ভাল নাই—কারণ তার স্বামী ৩।৪ দিনে

ফিরিব” বলিয়া একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, আজ সপ্তাহ অতীত হইল, আজিও তিনি ফিরিলেন না, বা কোন সংবাদও পাঠাইলেন না।

এই সময় গেনির মা আসিয়া প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে প্রভুপত্নীর নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, “মা, একটা যে বিষম খপর শুনে এলাম এখনি!”

সুশীলা তাহার পানে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, “কি খবর গেনির মা?”

“কত্তা না কি শুনলাম, কলকাতায় গিয়ে এক বিয়ে করেছেন?”

“বিয়ে করেছেন! ধুৎ—কে বল্লে তোকে? স্বপ্ন দেখেছিস না কি?”

“না সপ্নি কেন দেখব মা? ঘোষেদের ঝি পেসন্ন বল্লে।”

“কি বল্লে?”

“ঘোষজা মশাই ত মাস খানেক বাড়ী ছিল না কিনা;—হাইকোর্টে তেনার শালার বুঝি কি মকদ্দমা চলছিল, তাই সে সেখানে গিয়েছিল। কাল বিকেলে ফিরে এসেছে। এসে ঘোষ গিন্নীর সঙ্গে বলাবলি করছিল, তাই পেসন্ন বাইরে থেকে শুনেছে।”

সুশীলা, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, “আর কি কি পেসন্ন বল্লে, গেনির মা?”

গেনির মা বলিল, “আর কি কি বল্লে?—মনে করে দেখি দাঁড়াও! দশ গণ্ডা বছর বয়স হল! কোনও কথা কি মনে রাখতে পারি ছাই! হ্যাঁ হ্যাঁ—আর বল্লে যে, সে বউ নাকি বেশ ডাগর সাগর, যেমনি রূপ তেমনি নেকাপড়া জানে।”

শুনিয়া সুশীলার মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তার চোখ দিয়া প্রায় জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এত দিন যে জন্য আমি অনুনয় বিনয় করিতেছি—সেই কার্য্য করিলই শেষে—তবে ওরূপ ভাবে, আমাকে লুকাইয়া করিবার কি দরকার ছিল? কলিকাতা যাইবার সময় সকল কথা খুলিয়া বলিলেই ত হইত! এরকম ভাবে আমাকে অপমান করিল কেন?

আহারাদি শেষ হইলে, সুশীলা ঘোষ গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এই গ্রামের আর একজন ক্ষুদ্র জমিদার। পুলিন ইঁহাকে দাদা সম্বোধন করিয়া থাকে।

খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া, বাগানে বাগানে সেই বাড়ীতে যাওয়া যায়। সুশীলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘোষ গৃহিণী আহারান্তে পাণ খাইতে খাইতে তাঁহার চন্দনা পাখীকে পড়াইতেছেন। সুশীলাকে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং পরম সমাদরে ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ সাধারণ ভাবের কথা বার্ত্তার পর, সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, “শুনলাম বটঠাকুর কাল কলকাতা থেকে ফিরেছেন। আমাদের ওরা আজ এক হপ্তা হল কলকাতায় গেছে; ৩.৪ দিনে ফেরবার কথা, তা আজও ফিরলো না, আমি ত তাই ভেবে মরছি দিদি।”

ঘোষ গৃহিণী বলিলেন, “না, কিছু ভাবনা নেই, ঠাকুরপো ভালই আছেন, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে!”

“দেখা হয়েছিল?—যা হোক ভাল আছে শুনে তবু নিশ্চিন্ত হলাম। ওর সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল দিদি, তা কিছু বল্লেন বটঠাকুর?”

“হ্যাঁ—বল্লে পশু বুঝি। কোথায় নেমন্তন্ন ছিল সেইখানে দুজনে দেখা হয়।”

“নেমন্তন্ন ছিল? কিসের নেমন্তন্ন ভাই?”

ঘোষ গৃহিণী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “কে জানে বিয়ের না কিসের!”

“কবে আসবে তা কিছু শুনলে?”

“হ্যাঁ—বল্লেন তাঁর আসতে এখনও হপ্তাখানেক দেরী আছে।”

সুশীলা মনে মনে হিসাব করিল—“পশু বিয়ে হয়ে গেছে—কাল গেছে কালরাত্তির—আজ ফুলশয্যে—শ্বশুর

বাড়ীতে অষ্টমঙ্গলা সেরে বাড়ী ফিরতে এখনও হপ্তা খানেক দেরী ত আছেই বটে!"

ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "কেন, তোমরা কি তাঁর কোনও চিঠি পত্র পাও নি?"

"না দিদি, গিয়ে অবধি একখানি চিঠিও লেখে নি!"—বলিয়াই, সুশীলা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ঘোষগৃহিণী বলিলেন, "ওকি—ওকি ভাই—কাঁদছ কেন? এই ঠিক দুপুর বেলায়, স্বামীর কথা কইতে কি কাঁদতে আছে?—তাতে তাঁর অমঙ্গল হবে যে!"—বলিয়া তিনি স্নেহের হস্তে সুশীলার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

সুশীলা, নিজ অঞ্চলেও মুখ চক্ষু মুছিয়া, গ্রীবা উন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দিদি, একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি সত্যি বলবে? যদি মিথ্যে বলবে ত আমার মাথা খাবে। তোমায় মা কালীর দিব্বি, মা মনসার দিব্বি, বাবা তারকনাথের দিব্বি, বাবা বিশ্বনাথের দিব্বি—সে নাকি আবার বিয়ে করেছে?"

এই সকল ভীষণ দিব্যগুলি শুনিয়া, ঘোষ-গৃহিণীর মুখখানি অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি মুখ খানি নত করিয়া বলিলেন, "তোমায় কে বল্লে এরই মধ্যে?"

"সে যেই বলুক। কথাটা সত্যি ত?"

"উনি ত বল্লেন ভাই। কারু কাছে প্রকাশ করতে আমায় মানা করেছিলেন, আমি ত কাউকে বলিনি—তবে তুমি শুনলে কি করে তুমিই জান আর ভগবান জানেন। আর কেউ দেখে এসে বলেছে বোধ হয়। এ সব কথা কি আর ছাপা থাকে? বলে, ধর্ম্মের ঢাক আপনি বেজে ওঠে।"

"তাই বেজেছে দিদি। আমি যখন জানতেই পেরেছি, তখন আর আমার কাছে লুকিয়ে কি হবে? যা যা তুমি শুনেছ, সব আমায় বল।"

ঘোষ-গৃহিণী যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই—বিবাহ করিবার কোনও ইচ্ছাই পুলিন বাবুর ছিল না—কেবল ঘটনাচক্রে ইহা হইয়া গিয়াছে। গিয়াছিলেন একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে—পুলিন বাবুও ঘোষ মহাশয়ও। কন্যার পিতা তাদৃশ ধনবান নহেন—কিন্তু কন্যাটি খুব সুন্দরী—আর, লেখা-পড়াও বেশ শিখিয়াছে, বয়সও একটু হইয়াছে—১৫।১৬ বছরের কম হইবে না। ঘড়ি আংটি প্রভৃতি দান সামগ্রী একটু খেলো হইয়াছিল বলিয়া, বরের বাপ আরও ২০০৲ অতিরিক্ত দাবী করিয়া বসেন। এই লইয়া, বরপক্ষ কন্যাপক্ষে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, বরপক্ষ বর উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করেন। মেয়ের জাতি যায় দেখিয়া, সভাস্থ সকলের অনুরোধে পুলিন বাবু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই সেই মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন।

এই বিবরণ শেষ করিয়া ঘোষ গৃহিণী বলিলেন, "তা ভাই, তুমি মনে কিছু দুঃখ কোর না; জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এ গুলো ভবিতব্যতা কিনা, এতে মানুষের হাত নেই। তোমায় ত ভগবান ছেলে-পিলে দিলেন না। দেখ, এইবার যদি তোমার শ্বশুরের বংশটা রক্ষা হয়,—এতে দুঃখ করা তোমার উচিত নয়।"

সুশীলা বলিল, "না না—তার জন্যে আমি দুঃখ করবো কেন? আমি নিজেই ত তাকে কতদিন থেকে বলছি—ওগো বিয়ে কর, বিয়ে কর—তবু সে করলে না। ঘটনাচক্রে এবার হয়ে গেল।"

বাড়ী ফিরিয়া সুশীলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, তাই কি ঠিক? অত বড় কলকাতা সহরে, সে ছাড়া কি আর কোনও পাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না?"

৪

বাড়ী ছাড়িবার ঠিক তেরো দিন পরে, পুলিন ফিরিয়া আসিল। তাহার অঙ্গে একটি নূতন সিল্কের পাঞ্জাবী, পরিধানে জড়িপাড় ধুতি, স্কন্ধে জড়িপাড় উড়ানি, পায়ে নূতন একযোড়া পাম্প শু এবং হাতের কব্জীতে নূতন সোণার ঘড়ি। এতদ্ভিন্ন, তাহার হাতে একটি নূতন চামড়ার ব্যাগও ছিল। সুশীলা তার স্বামীর এরূপ সৌখীন বেশ

ভূষা পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। অনুমান করিল, এ গুলি হয়ত নূতন শ্বশুরবাড়ী হইতে প্রাপ্ত—অথবা, উক্ত মধুপুরীতে গমন উপলক্ষ্যে ক্রীত। হাতের ব্যাগ মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া পুলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?"

সুশীলা শুষ্কভাবে বলিল, "ভাল আছি। এত দেরী তোমার?"

"কাযের ঝঞ্ঝাটে"—বলিয়া পুলিন বস্ত্রপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল।

সুশীলা ভারি গলায় বলিল, "তা, দেরী করলে বেশ করলে, একখানা চিঠি লিখেও ত খবরটা দিতে হয়। আমি যে এদিকে ভেবে মরি!"

চটজুতা পায়ে দিয়া, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, পাখা নাড়িতে নাড়িতে পুলিন বলিল, "ওঃ—তুমি বুঝি ভাবছিলে? তা, অতটা আমার খেয়াল হয় নি।"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "নূতন রসে মজে' ছিলে—পুরানোর কথা আর খেয়াল হবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "গিয়েছিলে ত বন্ধুর ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। তায়, এত কি ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেলে, শুনি?"

পুলিন আমতা আমতা করিয়া বলিল, "ঝঞ্ঝাট—অর্থাৎ—খবর পেলাম কি জান? শুন্‌লাম, হিমালয়ের জঙ্গলে এক মস্ত বড় সাধু আছেন—৩০০ বছর বয়স—তিনি, ছেলে হবার জন্তে যে কবচ দেন তা একেবারে নাকি অব্যর্থ। তাই, সেই কবচ আনবার জন্তে সেই জঙ্গলে গিয়েছিলাম। উঃ—সে বিরোধ জঙ্গলে যেতে তিন দিন, আসতে তিন দিন। তাই তো তোমায় চিঠি লিখতে পারি নি—সেখানে ত খাম পোষ্টকার্ড পাওয়া যায় না!"

সুশীলার মন, ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। একে ত এই প্রবঞ্চনা—তার উপর এত মিথ্যা কথার সৃষ্টি! ছি ছি! সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "সেই জঙ্গলে বোধ হয় ভাল ভাল কাপড় চাদর, পম্প শু, হাতঘড়ি টড়ি খুব সস্তা? সেখানেই এ সব কেনা হল নাকি?"

পুলিন বলিল, "নাঃ—এ সব কলকাতাতেই কিনেছিলাম। তা, তোমার জন্তেও কিছু কিনে আনবো ভেবেছিলাম, কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেল!"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "এখন ত ফুরবেই!" প্রকাশ্যে বলিল, "সে, ভালই হয়েছে! বেলা হল, এখন স্নান করে ফেল।"

"হ্যাঁ—স্নান করে' দুট খেয়ে শুয়ে পড়ি। গাড়ীতে রাত্রে ত ঘুম হয় নি।"

সুশীলা মনে মনে বলিল, "শুধু কাল রাত্রে কেন? ষোল-বছুরী অপ্সরী পেয়েছ—তার আগেরও ক' রাত সে কি আর তোমায় ঘুমতে দিয়েছে?"

পুলিন উঠিয়া স্নানাহার করিল, তার পর শয্যায় লম্ববান হইয়া, অবিলম্বেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল।

সুশীলা সেদিন আহারে বসিল বটে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র—কিছুই খাইল না। বাটীর অন্তান্ত স্ত্রীলোকেরা এ সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "শরীরটে ভাল নেই। বোধ হয় জ্বর হবে।"

আহারান্তে, সুশীলা নিজ শয়ন কক্ষে গেল না, পাশের ঘরে গিয়া একখানা মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিল। কিন্তু ঘুমাইতেও পারিল না। তাহার বুকের ভিতরটায় কেমন যেন হুহু করিতেছিল—সর্ব্বশরীরে যেন আগুন ধরিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক এইরূপ শয্যা কণ্টকের যন্ত্রণায় ছটফট করিবার পর, সে উঠিল। বাড়ীর অন্তান্ত সকলে নিদ্রিত। সুশীলা নিজ শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। পালঙ্কোপরি স্বামী নিদ্রিত—তাহার মুখে মাঝে মাঝে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে—বোধ হয়, সে কোনও স্বপ্ন দেখিতেছে। সুশীলা স্থির করিল, নিশ্চয়ই সেই ষোলবছুরী পরীকেই স্বপ্ন দেখিতেছে। ইচ্ছা হইল, স্বামীর সেই হাসিমুখে এক কিল মারিয়া তার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দেয়!

শয্যার নিকটেই টেবিলের উপর, নূতন চামড়ার ব্যাগটি ছিল; সুশীলা তাহা লইয়া, পার্শ্বের কক্ষে গিয়া, খুলিয়া ফেলিল। অন্তান্ত জিনিষের সহিত তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল, কয়েকখানি ছাপা রঙীন কাগজ ও একখানি ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফখানি একটি

সুন্দরী যুবতীর প্রতিমূর্ত্তি, বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইবে। সুন্দর একখানি বারাণসী শাড়ী পরা, সর্ব্বাঙ্গ ভাল ভাল অলঙ্কার। সুশীলা নিশ্চয় করিল, ইহাই বিবাহ সজ্জায় সজ্জিতা তাহার সপত্নীর ছবি। সে প্রায় একমিনিট ধরিয়া, ছবিখানির প্রতি এক-দৃষ্টে চাহিয়া, তাহার রূপের খুঁৎ অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার মুখের হাসি ও দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়া রাগে সুশীলার গা জ্বলিয়া উঠিল—গৃহস্থ ঘরের মেয়ের অত ঢং কেন? সে শুনিয়াছিল, আজকাল কলিকাতা সহরের মেয়েরা যখন থিয়েটার বায়স্কোপ বা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে যাইবার জন্য সাজগোজ করিয়া বাহির হয়, তখন তাহারা কুলবধূ অথবা বাইজী তাহা চেনা দুষ্কর। সুশীলা অস্ফুট স্বরে বলিল—মুখে আগুন! মুখে আগুন।

লাল সবুজ হলদে কাগজগুলির বাণ্ডিল খুলিয়া দেখিল, সেগুলি বিবাহের 'প্রীতি উপহার,' 'আশীষ,' প্রভৃতি। উপরে ছাপা আছে "শ্রীমন্ ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর শুভ পরিণয়ে" —কিন্তু ইন্দুভূষণ লাল কালী দিয়া কাটিয়া তাহার উপর হাতের লেখায় "পুলিনবিহারী।"

জিনিষগুলি সমস্ত ব্যাগের মধ্যে পুনঃ-স্থাপন করিয়া, সুশীলা চোরের মত সন্তর্পণে গিয়া উহা পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আসিল। তার পর ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া, তিনি মেঝের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

৫

রাত্রে আহারের পর, পুলিন শয্যাপ্রান্তে বসিয়া গুড়-গুড়িতে তামাকু সেবন করিতেছিল, সুশীলা আসিয়া সেই শয্যার অপর প্রান্তে বসিয়া বলিল, "তুমি এমন জোচ্চোর হলে কবে থেকে?"

পুলিন বলিল, "কেন, কি জুচ্চুরি করলাম?"

"কলকাতায় গিয়ে তুমি বিয়ে ক'রে আসনি?"

পুলিন বলিল, "বিয়ে? বিয়ে কি? কখন আবার বিয়ে করলাম? স্বপ্ন দেখছ না কি?"

সুশীলা বলিল, "তাই বোধ হয়। তা, বিভাবতীকে বেশ পছন্দ হয়েছে ত?"

পুলিন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "বিভাবতী কে?"

"ন্যাকামি রাখ না! তুমি ভেবেছ ডুবে ডুবে জল খাবে শিবের বাবাও টের পাবে না!—কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক যে আপনি বেজে ওঠে! আমি সব জানি—সব শুনেছি।"—বলিয়া সুশীলা, গেনির মা ও ঘোষ গৃহিণীর নিকট যাহা শুনিয়াছিল সমস্তই বলিল।

শুনিয়া পুলিন মাথাটি নীচু করিয়া অপরাধীর মত বসিয়া রহিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমার অনুরোধেই এ কায করা—আর তুমিই আমায় দুষছো!"

সুশীলা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "আমার অনুরোধেই যদি করা, ত আমার কাছে এত লুকোচুরি কি জন্যে?"

"সেটাও তোমার ভাল ভেবেই করছিলাম, সুশীলা! ভেবেছিলাম এখন তোমায় কিছু বলবো না—সে বউ সেইখানেই থাকবে; তার পর, একটি ছেলে হলে, তখন সব তোমায় ভেঙ্গে বলবো। হাজার হোক তুমি স্ত্রীলোক বৈ ত নও—সতীন হয়েছে শুনলে পাছে এখন মনে তুমি দুঃখ পাও—সেই ভেবেই গোপন করেছিলাম আর কি!"—বলিয়া পুলিন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আবার তামাক টানিতে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে, পত্নীর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে তখনও কাঠের পুঁতুলের মত সেই এক ভাবেই বসিয়া আছে। বলিল, "রাত হল, শোও, এখনও বসে কেন?"

সুশীলা কহিল, "তুমি শোও। আমার জন্তে তোমায় ভাবতে হবে না।"

পুলিন বলিল, "দিনের বেলা খুব ঘুমিয়েছি—এখনও আমার ঘুম পায় নি। তামাকটা খেয়ে নিয়ে, তার পর একখানা চিঠি লিখবো। চিঠি শেষ করে শোব এখন তুমি ততক্ষণ শোও না!"

সুশীলা বলিল, "ওঃ—চিঠি লিখতে হবে? তা, আমি এ ঘরে উপস্থিত থাকলে, লেখার অসুবিধে হবে না? বেশ প্রাণ খুলে প্রাণের কথা লিখিতে পারবে কি? সে দরকার নেই, আমি ও ঘরে গিয়ে শুচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে তোমার প্রেমপত্র লেখ।"—বলিয়া সুশীলা নামিয়া, সজোর পদক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

৬

স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা আর বড় নাই। মুখ দেখাদেখিও এক রকম বন্ধ বলিলেই হয়। এই ভাবে, এক সপ্তাহ কাটিল। সুশীলাদের শয়নকক্ষ ছিল ত্রিতলে, অন্যান্য সকলে দ্বিতলে বা নীচের ঘরে শয়ন করিত, সুতরাং এই দম্পতীর এরূপ মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদের সংবাদ কেহ জানিতে পারিল না।

প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর, পুলিন ঘণ্টা দুই আড়াই দিবানিদ্রা উপভোগ করিত। সুশীলা মাঝে মাঝে এটা ওটা লইবার বা রাখিবার জন্য, সে ঘরে প্রবেশ করিত, এবং কাষ সারিয়াই চলিয়া যাইত।

আজ দ্বিপ্রহরে এইরূপে স্বামীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বার হইতে সে দেখিল, স্বামী নিদ্রিত—কিন্তু তাহার বুকের উপর কি একটা জিনিষ রহিয়াছে। আস্তে আস্তে শয্যার নিকট গিয়া দেখিল, উহা একখানা কালো মোটা পেষ্টবোর্ড—তাহাতে ইংরাজিতে কি সব ছাপা রহিয়াছে।

সুশীলা অতি সন্তর্পণে সেখানি স্বামীর বুক হইতে উঠাইয়া লইয়া দেখিল, তাহার অপর দিকটায়—সেই সুন্দরী "যোগবছুরী"র ফটোগ্রাফ!

আবার সন্তর্পণে ফটোগ্রাফখানি স্বামীর বুকে রাখিয়া দিয়া সুশীলা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অপরাহ্নে, পুলিন নিদ্রাভঙ্গের পর হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বিছানায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। সুশীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, স্বামীর শয্যার নিকট দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "আমি বাপের বাড়ী যাব।"

পুলিন দেখিল, সুশীলার মুখ চোখ স্ফীত—সে বোধ হয় অনেক কাঁদিয়াছে। বলিল, "হঠাৎ এ মৎলব?"

"আমি আর এখানে থাকবো না।"

"কেন? কি হল আবার?"

"আমি কারু সুখের কণ্টক হয়ে থাকতে চাইনে!"

"কেন, কার আবার সুখের কণ্টক হলে তুমি?"

"তোমার! আর কার? আমি রয়েছি বলেই ত তোমার বিভাবতীকে এখানে আনতে পারছ না!"

"আমার বিভাবতী আবার কে?—ওঃ বুঝেছি।—তা, আমি তাকে এখানে আনবার জন্যে ছটফট করছি তুমি কিসে বুঝলে?"

"দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে? ফটোগেরাপ বুকে করে শুয়ে থাকার চেয়ে, তাকে এখানে নিয়েই এস,—এসে সুখে রাজ্যি ভোগ কর। আমি তোমার আপদ বালাই, আমি দূর হয়ে যাই।"—বলিয়া সুশীলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"ওকি সুশী—ছি ছি—কাঁদ কেন?"—বলিয়া পুলিন খপ করিয়া তাহার হাত খানি ধরিল। সুশীলা সজোরে আপন হাত ছাড়াইয়া লইয়া, পশ্চাতে হটিয়া, গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আমায় ছুঁওনা বলছি খবর্দ্দার।"

"কেন? তাতে দোষ কি?"

"স্পর্শদোষ। যে স্বামী অন্য স্ত্রীলোককে ছুঁয়েছে, তাকে আমি ছুঁতে চাইনে! তাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।"

পুলিন বলিল, "ওঃ—এই ব্যাপার! তবে যে আগে তুমি বিয়ে করবার জন্যে আমায় অত পীড়াপীড়ি করতে? এখন বিয়ে যদি করলাম, তায় আমার এত অপরাধ হল?"

সুশীলা বলিল, "বিয়ে করতেই বলেছিলাম; তার ফটোগ্রাফ বুকে করে ঘুমুতে তোমায় বলিনি ত! সে সব কথা ছেড়ে দাও—যার যা অদৃষ্ট ছিল তাই হয়েছে। এখন আমার আর এখানে একদণ্ড থাকতে

ইচ্ছে নেই—আমি বাপের বাড়ী যাব। তুমি যদি আমায় রেখে আসতে না পার, বল, আমি অন্ত উপায় দেখবো।"

পুলিন কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া কি চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "তা বেশ, আমিই রেখে আসবো এখন। বল কবে যেতে চাও।"

"কালই।"

"বেশ, উত্তম কথা। কালই তোমায় নিয়ে যাব। তোমার কিছু ভয় নেই—গাড়ীতে দু'জনে একটু তফাতে তফাতে বসলেই স্পর্শদোষটা আর ঘট্‌বে না।"

৭

পরদিন পুলিন, সুশীলাকে লইয়া যাত্রা করিল। সুশীলার পিত্রালয়ে যাইতে হইলে হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া শিয়ালদহ গিয়া আবার অন্ত গাড়ীতে চড়িতে হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন পুলিন সুশীলাকে লইয়া গিয়াছে, অথবা পিত্রালয় হইতে আনিয়াছে, তখন এই সুযোগে পথে কলিকাতায় ২।১দিন যাপন করিয়া, তাহাকে থিয়েটর সার্কাস প্রভৃতি দেখাইত।

বেলা দশটার সময় হাওড়ায় নামিয়া, পূর্ব্ব প্রথামত, পুলিন সুশীলাকে লইয়া, "আর্য্য আশ্রম" নামক বাঙ্গালী হোটেলে গিয়া উঠিল। পর্দ্দানশিনা স্ত্রীলোকগণের জন্তও সেখানে উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

আহারাদির পর উভয়ে বিশ্রামার্থ পৃথক পৃথক শয্যায় শয়ন করিল। পুলিন বলিল, "সুশী, শেষকালে তোমার মনে কি এই ছিল?"

সুশীলা বিরক্তিভরে বলিল, "কি আবার?"

"তুমি আমায় এমন ভাবে ত্যাগ করবে জানলে কি আমি আবার বিয়ে করি? এমন বিয়ে করে লাভ?"

"বিয়ে করে ত সুখী হয়েছ তুমি!—সেই লাভ।"

পুলিন আর কিছু না বলিয়া, পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

নিদ্রাভঙ্গে উভয়ে নিজ নিজ শয্যায় উঠিয়া বসিলে, সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের গাড়ী কটায়?"

"রাত ন'টায়।"

"তুমি একবার সেখানে যাবে না?"

"কোথায়?"

"তোমার বিভাবতীর কাছে!"

পুলিন খুসী হইয়া বলিল, "তুমি শুদ্ধ যাও যদি, ত যাই। চলনা, দেখে আসবে তাকে। তোমার সে দিদি বলতে অজ্ঞান। কলকাতা থেকে যেদিন আমি ফিরে যাই, সেদিন সে কত যে কাঁদলে! বল্লে, 'আমায় এখানেই ফেলে রাখলে, দিদিকে ত আমি দেখতে পাব না, তাঁর একদিন সেবাও করতে পাব না!'—তার কথাবার্ত্তায় বুঝতে পেরেছিলাম, তোমায় সে খুব ভক্তি করে। চল না, সে তোমায় দেখলে কত খুসী হবে।"

সুশীলা বলিল, "আমার গলায় এক গাছা দড়ি আর আর একটা কলসী কি জোটে না ভেবেছ তুমি—যে তার সঙ্গে যাব আমি দেখা করতে?"

পুলিন ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তবে থাক্।"

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। শেষ সুশীলা বলিল, "তুমি যাওনা, গিয়ে দেখা করে এস। এখন ত মোটে ৪টে—আমাদের গাড়ীর এখনও ৫ ঘণ্টা দেরী।"

পুলিন বলিল, "এখন থাক্—সে তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফেরবার পথেই হবে এখন।"—বলিয়া তামাক সাজিতে বসিল। পূর্ব্বে, ভৃত্যাদি না থাকিলে সুশীলা নিজে তাহাকে তামাক সাজিয়া দিত, এখন আর দেয় না।

তামাক সাজিয়া, কিয়ৎক্ষণ ধূমপানের পর পুলিন বলিল, "সুশীলা, তোমায় আমায় এখন থেকে বোধ হয় চিরবিচ্ছেদ?"

সুশীলা কঠোর স্বরে বলিল, "একরকম তাই বৈকি!"

"আমার শেষ অনুরোধ একটি রাখবে?"

"কি?"

"চল, তোমাতে আমাতে এক সঙ্গে ফটোগ্রাফ তোলাই। আগে যখনই কলকাতায় এসেছি, তখনই ওকথা তুমি আমায় বলেছ—কিন্তু একবারও হয়ে ওঠেনি।—

একখানা ফটোগ্রাফ থাকলে তবু, চিহ্ন ত একটা থাকবে!"

সুশীলা নীরব রহিল। তাহার মৌন সম্মতি জানিয়া, পুলিন বলিল, "তবে, তোমার বেণারসী খানা বের করে পর—আর খানকতক গহনা টহনাও পরে নাও।"

প্রবেল বেগে মাথা নাড়িয়া সুশী বলিল, "সে সব কিছু আমি পরবো না।"

পুলিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমার উপর ত এখন আর আমার কোনও জোর নেই। আচ্ছা, তবে গাড়ী ডাকতে পাঠাই?"

গাড়ী আনাইয়া, সুশীলাকে লইয়া পুলিন হাতী-বাগানে এক ফটোগ্রাফের দোকানে গিয়া উঠিল।

ফটোগ্রাফওয়ালা, খাতির করিয়া উভয়কে একটী কামরায় লইয়া গিয়া বসাইল। তাহার সহকারী পার্শ্বের ষ্টুডিও মধ্যে ক্যামেরা ঠিক করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই উভয়ের ফটোগ্রাফ তোলা হইয়া গেল।

বিশ্রাম কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে আবার উপবেশন করিল। ফটোগ্রাফওয়ালা বলিল, "লেমনেড, বরফ, কি চা—কিছু আনিয়ে দেবো?"

পুলিন বলিল, "না।—দেখুন,এই যে সেবার আপনার দোকান থেকে আমি এই ফটোখানা কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম—এ নিয়ে ত মহাতর্ক উপস্থিত হয়েছে মশাই।"—বলিয়া পুলিন, পকেট হইতে একখানি ফটো বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। সুশীলা ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে দেখিল—ইহা সেই বিভাবতীর ফটোগ্রাফ।

ফটোগ্রাফওয়ালা বলিল, "কেন, তর্ক কিসের?"

"আপনি ত বলেছিলেন যে এখানি ষ্টার থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস হেনা বালার?"

"হেনারই ত। কেন কি হয়েছে?"

"আমার এক বন্ধু বলেন, এখানি মিনার্ভার সুধা-মুখীর ছবি।"

ফটোওয়ালা বলিল, "না না—সুধার এ চেহারা? এ হেনার ফটোগ্রাফ্‌—যে হেনা এখন ষ্টারে বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী সাজছে। নগেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের পর কুন্দনন্দিনীর সাজেই এখানি তোলা।"

পুলিন বলিল, "ষ্টারে বিষবৃক্ষ হচ্ছে নাকি? দেখতে গেলে হয়। কখন আরম্ভ?"

"আজ রবিবার—বেলা পাঁচটায় আরম্ভ।"

গাড়ী নিচে অপেক্ষা করিতেছিল। আরোহীদ্বয়কে লইয়া দুই মিনিটের মধ্যেই উহা ষ্টার থিয়েটরে গিয়া উপস্থিত হইল।

পুলিন নামিয়া সুশীলাকে টিকিট কিনিয়া দিয়া, তার হাতে ফটোখানি দিয়া বলিল, "চেহারা মিলিয়ে দেখো—যে কুন্দনন্দিনী সাজবে, তার সঙ্গে মেলে কিনা।" বলিয়া, সুশীলাকে ঝির জিম্মা করিয়া দিয়া সে অন্তর্হিত হইল।

রাত্রি সাড়ে দশটায় থিয়েটর ভাঙ্গিল। গাড়ীতে স্বামী স্ত্রীতে বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হইল না।

বাসায় ফিরিয়া, উভয়ে নীরবে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিল। তারপর, পুলিন তামাক সাজিতে বসিল। সুশীলা বলিল, "বলি হ্যাঁগা—এ ফটোখানা ত সেই যে কুন্দনন্দিনী সেজেছিল তারই বটে। তুমি ওখানা কিনেছিলে কেন?"

"পুলিন গম্ভীর ভাবে বলিল,তোমায় ঠকাবার জন্যে।"

"কি ঠকাবার জন্যে?"

"যাতে তুমি মনে কর আমি ফের বিয়ে করেছি—আর ঐ আমার নতুন স্ত্রী।"

"কেন, তুমি কি বিয়ে করনি?"

"আজ্ঞে না।—আমি কেন বিয়ে করবো? আমার শত্রু যে সে দুই বিয়ে করুক।"

"তবে কেন নিজে মুখে তুমি স্বীকার করেছিলে যে বিয়ে করেছ?"

"তোমায় জ্বালাবার জন্যে।"

সুশীলা বলিল, "উঃ—কি ধাপ্পাবাজ তুমি!—আচ্ছা, সে যেন হল। তুমি ঐ হেনা না কেনার ছবি বুকে করে বাড়ীতে কাল দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছিলে কেন?"

"ঘুমুইনি—জেগেই ছিলাম। তুমি আসছ, পায়ের শব্দ পেয়েই, ওখানা বুকে করে চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করে' পড়েছিলাম।"

"ভণ্ড মিন্সে! আচ্ছা, সে যেন বুঝলাম। তোমার ব্যাগের মধ্যে সেই সব প্রীতি উপহারে যে বিভাবতীর নাম ছাপা ছিল, সে তবে কে?"

"ঐ যে, যে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে কলকাতায় এসেছিলাম, সেই।"

"কার সঙ্গে তার বিয়ে হল?"

"নাম মনে নেই।"

"যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, তারই সঙ্গে হল কি?"

"তারই সঙ্গে।"

"তবে কেন ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুর বলেছিলেন যে সে বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তারা, বর তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল?"

"তাকে ঐ কথাই বল্‌তে আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম যে এমন ভাবে বউদির কাছে গল্পটা করবে যাতে আরও ২।১ জন মানুষ শুনতে পায়।"

সুশীলা বলিল—"এত দুষ্টামিও তোমার পেটে?—জোচ্চোর মিন্সে! আচ্ছা—বিয়ের পদ্যে তবে সে বরের ছাপা নাম কেটে তোমার নাম হাতের লেখায় বসানো ছিল কেন?"

পুলিন বলিল, "ওটা, ঐ মজাটুকু করবার জন্যে।"

"তবে সেটা জাল, বল!"

"একরকম তাই বৈ কি!"

সুশীলা বলিল, "জালিয়াৎ মিন্সে!"

পুলিন তামাক সাজিয়া আনিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। বলিল—"আমি তা হলে ১ নম্বর ধাপ্পাবাজ, ২ নম্বর ভণ্ড, ৩ নম্বর জোচ্চোর, ৪ নম্বর জালিয়াৎ। আর কিছু আছে?"

সুশীলা বলিল, "তোমার মত নিষ্ঠুর কি আর ভূভারতে আছে? এই ৮।১০ দিন, কি কষ্টটাই তুমি আমায় ভোগ করালে বল দেখি! পুরুষ মানুষ, তুমি কি জানবে স্বামীর ভালবাসা হারালে স্ত্রীলোকের কি বুকফাটা কষ্ট!"—বলিয়া সুশীলা চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুলিন হুঁকা ফেলিয়া, স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "ছি ছি সুশী—কেঁদনা কেঁদনা চুপ কর!"

এবার সুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইল না, স্পর্শদোষ স্বীকার করিয়া লইল।

একটু পরেই, হোটেলের ঠাকুর দুই থালায় লুচী তরকারী প্রভৃতি দিয়া গেল। সুশীলা সে সমস্ত গুছাইয়া স্বামীকে খাইতে বসাইল।

পুলিন খাইতে লাগিল। সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তবে তোমার সেবার কলকাতায় অত দিন দেরী হল কেন?"

"ঐযে বল্লাম, কবচ আনতে গিয়েছিলাম। তবে হিমালয়ের জঙ্গলে নয়, বাঙ্গালা দেশেরই একটা পল্লীগ্রামে।"

"এ কথাটা সত্যি?"

"কেন, কবচ ত তুমি নিজে চক্ষে দেখেছ—তুমি পরলে না ত আমি কি করব? কাল চল কালীঘাটে গিয়ে, গঙ্গাস্নান করে, মাকে দর্শন করে' দুজনে কবচ দুটি ধারণ করি।"

তাহাই হইল। এ যাত্রায় সুশীলার পিত্রালয় যাওয়া ঘটিল না। বিধাতার ইচ্ছায় কখন কি হয় বলা যায় না। অসম্ভবও সম্ভব হয়। বৎসর না ঘুরিতেই, কবচধারণের সুফল ফলিল;—এই দম্পতী পুত্রলাভ করিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু বৃন্দাবনে

নন্দদুলালে খুঁজিতে, সিন্ধু, তোমার বৃন্দাবনে
এসেছি বন্ধু, দেখাও আমার সুন্দর শ্যামধনে।
নীলমণি ধনে বক্ষে গোপনে লুকাবে কেমনে বল?
তার তনু আভা লেগে জলরাশি তব নীলে নীল হ'ল।
শ্যাম বিরহের অশ্রু ঝরিয়া মিলে তায় কোটি ধারা
নীল কালিন্দী, সিন্ধুর রূপ ধরিয়াছ সীমাহারা।

লোকে কয় "খোঁজো ব্রজবান্ধবে নগরের মন্দিরে।"
সেথা গিয়ে তারে না পেয়ে, সিন্ধু, এসেছি তোমার তীরে
সেথায় হেরিনু বিশাল সৌধ পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা,
রাজভোগ ভেট বহিতেছে তথা শত শত বাহকেরা।

বাজে দুন্দুভি ডঙ্কা সেথায়, শত শত উড়ে ধ্বজা,
সে রাজপ্রাসাদে জুটেছে রাজার হাজার হাজার প্রজা।
রাজ বৈভবে গুরু গৌরবে, সেথা হায় কোথা মোর
প্রাণের গোপাল ব্রজের রাখাল নীলমণি ননীচোর?

তোমার সদনে এসেছি বন্ধু, সন্ধান জান তুমি,
অশ্রুপাথার প্লাবিত গোকুল, তুমি শোক ব্রজভূমি।
জানি জানি আমি; ঊর্ম্মিপাণিতে 'না-না' বলো অকারণে
নিমাই গিয়াছে ঢুঁড়িতে সে ধন তোমার তমাল বনে।
মিছে লুকায়োনা, ভয় দেখায়োনা উত্তাল কল্লোলে,
শ্যামসুন্দর কোথা আছে মোর দাও হে সিন্ধু বলে'।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন গল্পগ্রন্থ "প্রেমের মূল্য" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১.০

—

ডাঃ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি প্রণীত "কালাজ্বর চিকিৎসা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৹

—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "বেনো জল" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৲

৺বিষ্ণুপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন পথে" উপন্যাস, ৩খণ্ডে ৮০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল, মূল্য ৪৲

—

শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত "ছন্নছাড়া" উপন্যাস যন্ত্রস্থ, পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

—

গ্রাহকগণের প্রতি

কার্ত্তিক সংখ্যা, আগামী ১৫ই আশ্বিন তারিখে প্রকাশিত হইবে। যে সকল গ্রাহকগণ ঐ সময় অন্য ঠিকানায় থাকিবেন, তাঁহারা পত্র দ্বারায় জানাইলে, কার্ত্তিক সংখ্যা সেই নূতন ঠিকানায় আমরা পাঠাইয়া দিব—নচেৎ পত্রিকা মারা যাইবার সম্ভাবনা।

কলিকাতা।
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্রাট্ শাজাহান ও মমতাজ বেগম।

(কমলিনী সাহিত্য-মন্দিরের সৌজন্যে)।

Bengal Art Press, 44 Shikdar Bagan St

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩১ { ২য় খণ্ড
২য় খণ্ড } { ৩য় সংখ্যা

খানাকুল-কৃষ্ণনগর

(পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর মূল সভাপতির সম্বোধন)

সমবেত মহোদয়গণ! আপনারা এবার খানাকুল কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন আহ্বান করিয়া বড়ই ভাল কাজ করিয়াছেন। এতদিন সম্মিলন বড় বড় নগরেই হইয়াছে। মাত্র আর বৎসর উহা নগর হইতে নামিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামই বাঙ্গলার প্রাণ। গ্রামে যেটা জাগ্‌বে, সেটাই টিক্‌বে। নগর ইংরাজের কীর্ত্তি। টিকিবে কি না আজিও বুঝা যাইতেছে না। তাই সাহিত্য সম্মিলন, নগর হইতে গ্রামে নামায় ভরসা হইতেছে যে, সম্মিলনটা টিকিবে ও একটা জাতীয় উৎসবের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর আর বৎসর বঙ্কিমের স্মৃতি লইয়া সম্মিলন হইয়াছিল; এবার মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি লইয়া হইতেছে। আর বারে যেখানে হইয়াছিল, সে একটা বড় ব্রাহ্মণের সমাজ, কিন্তু বড় বেশী পুরাণ নয়—২০০।২৫০ বৎসরের বেশী হইবে না। কিন্তু এবার যেখানে হইতেছে, সেটী রাঢ়দেশের একটা খুব পুরাণ জায়গা। এইরূপে পাড়াগাঁয়ে বড়লোকের নাম রক্ষার জন্য সম্মিলন যত অধিক হয়, ততই দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা বেশী।

আপনারা এ সম্মিলনে আমাকে কর্ত্তা করিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া আমার একটী প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইয়াছে এবং সে জন্য আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার হইতেছে। একই লোককে বার বার সভাপতি করাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। সাধ্যমত সাহিত্যচর্চ্চা এখন অনেকেই করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই এক একবার সভাপতি হইবার অধিকার আছে। তাঁহাদিগকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা একেবারেই উচিত নয়। দেশে যোগ্য ব্যক্তির অভাবও নাই।

বাঙ্‌লা সাহিত্য শিশু সাহিত্যও নয়, যে উহা এক মা বাপের কোলে বিশ বৎসর থাকিবে। এরূপ স্থানে প্রতিবৎসর নূতন নূতন সভাপতি করাই উচিত। কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একথা আমি বার বার বলিয়া আসিয়াছি, এবং নিজেও দ্বিতীয়বার স্বীকার করি নাই—এবং করিবার ইচ্ছাও ছিল না।

কিন্তু এবার আমি খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। কারণ খানাকুল কৃষ্ণনগরটী অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজ, অতি প্রাচীন কায়স্থ সমাজ, ও অতি প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজ। ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন খানাকুল কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের ছোট ভাই। এ বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে। কিন্তু সে কথা এখন বলিতেছি না। নানা কারণে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ আমার পূর্ব্বপুরুষ নৈহাটীর ভট্টাচার্য্যদের সঙ্গে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সম্পর্ক অতি মিষ্ট ও অতি ঘনিষ্ঠ। বর্গীর হাঙ্গামায় যখন গঙ্গার পশ্চিম পারের সমস্ত দেশ লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়, তখন হইতেই কৃষ্ণনগরের পণ্ডিতসমাজ অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই সময়েই আমার পূর্ব্বপুরুষেরা নৈহাটীতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলেন। একশত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ী পাঠ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই নৈহাটীতে পাঠসমাপ্ত করিয়া তথা হইতে উপাধি লইয়া গিয়াছেন। বেশী দূর যাইতে হইবে না এখানকার প্রবীণ নৈয়ায়িক কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় আমার ন ঠাকুরদাদার পড়ুয়া ছিলেন। ন ঠাকুরদাদা মৃত্যুকালে তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তুমি আমার ভাইপো রামকমল ন্যায়রত্নের নিকট পাঠ স্বীকার করিও। কিন্তু কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাহা করেন নাই। অন্য কোথাও পাঠ স্বীকার করেন নাই। এখানে আসিয়া টোল করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা বারাণসী দাদা রামকমল ন্যায়রত্নের নিকট পাঠস্বীকার করেন এবং অনেকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। বাবার এক প্রধান ছাত্র সত্যব্রত। সত্যব্রতের বাড়ী খানাকুল। বাবা বলেছিলেন সত্যব্রতের মত ছাত্র পাওয়া কঠিন। আমার মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিতেন কমলের বড় ভাগ্য যে সত্যব্রতের মত ছাত্র পাইয়াছে। ক্ষীরপাই রাধানগরের শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় আমার বাবার পড়ো ছিলেন। তিনিও আপন দেশে খুব পসার প্রতিপত্তি করিয়াছিলেন। সে সব পড়োয়া আর কেহই নাই। তাঁহার পুত্রেরাও অনেকে গত হইয়াছেন। তাঁহার পৌত্রেরা আমাকে চিনিবেন কিনা জানি না। তবু তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবার লোভ আমি সামলাইতে পারি নাই। লোভ না সামলাইবার আর দুইটি কারণ আছে। বর্গীর হাঙ্গামার কিছুদিন পরেই দেশগুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পূর্ব্বদেশ হইতে আসিয়া চাতরায় বাস করেন। তাঁহারা শাক্ত, তান্ত্রিক ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের গুরু। চাতরার দেশগুরু বংশের আদিপুরুষদের সঙ্গে অনেক বিচারের পর আমার প্রপিতামহের এই সর্ত্তে রক্ষা হয় যে, তাঁহারা আমাদের বাড়ী পড়িবেন আর আমরা তাঁহাদের কাছে মন্ত্র লইব। ইহার পূর্ব্বে আমরা ঘরে ঘরেই মন্ত্র লইতাম। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই দেশগুরুদের আদিপুরুষ শ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র ছিলেন। উভয়েই সুরাই মেলের লোক। সুতরাং রামমোহন রায়ের সহিতও আমাদের বেশ জানাশুনা ছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যখন কলিকাতায় পণ্ডিত মণ্ডলীর অগ্রগণ্য, সেইসময় আমার ন ঠাকুরদাদার এক ছাত্র আসিয়া তাঁহার সহিত জোটে। ইঁহার নাম গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বা গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য্য। ন ঠাকুরদা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে পালন করেন। কিছুদিন রামমোহন রায়ের সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়েই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন ও ব্রহ্মসভার বিরোধী যে ধর্ম্মসভা ছিল তাহাতেই উপস্থিত হন ও তাহার কর্ত্তা নন্দলাল ঠাকুরের দক্ষিণহস্ত

হইয়া উঠেন। গৌরীশঙ্কর বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের নাম আপনাদের অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তিনি সম্বাদভাস্কর, রসরাজ প্রভৃতি বাঙ্‌লা কাগজের সম্পাদক হইয়া খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। গৌরীশঙ্করের গুরুভক্তির বিশেষ অভাব ছিল না। আমাদের বাড়ীর কেহ কখনও কলিকাতায় আসিলে তিনি মহা সমারোহে তাহাকে কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া যাইতেন ও বৎসর বৎসর ৺পূজার সময় আমার ন ঠাকুরমাকে ৺পূজার প্রণামীর টাকা ও কাপড় পাঠাইয়া দিতেন।

১৮৫৮ সালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্ত্রীর পরলোক হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ৺ রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় তখন হাইকোর্টের প্রধান উকীল। তাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল। তিনি শাস্ত্রানুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করেন, কিন্তু দেশের কেহই রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অধ্যক্ষতা করিতে রাজী হন্ নাই। এদেশের সকলেই আমাদের বাড়ীর ছাত্র, সুতরাং বাবার উপর খুব পীড়াপীড়ি হয় আপনি অধ্যক্ষতা করুন। বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রমাপ্রসাদ রায় তখন আমার বড় ভাই নন্দকুমার স্তায়চুঞ্চুকে ধরিয়া বসিলেন। দাদার বয়স তখন ২৩।২৪ মাত্র। তিনি অধ্যক্ষতা করিতে স্বীকার করিলেন। লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইল। নৈহাটীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অধ্যক্ষতা করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের ছাত্রেরা কেহই না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দাদার কথা মত রায় মহাশয় তাঁহাদের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিলেন। ২।৪ জন অভিজাত ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমাজের ব্রাহ্মণেরাও ভোজন করিয়া গেলেন। সুতরাং রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় পুত্র হিন্দু সমাজে অপনার স্থান পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন।

এই সকল কারণে আমি খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারি নাই। যদি বিশেষ দোষ হইয়া থাকে, আপনারা ক্ষমা করিবেন।

অনেকে মনে করেন, বক্তিয়ার খিলিজি যখন নবদ্বীপ ও গৌড় দখল করিয়া ফেলিলেন, তখন বুঝি সমস্ত বাঙ্গালাটাই তাঁহার দখল হইয়া গেল। কিন্তু সে কথা একেবারেই সত্য নয়। বাঙ্গালার বড় রাজা লক্ষ্মণসেন পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সামন্ত রাজারা কেহই বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিদান করেন নাই। সমস্ত রাঢ়দেশ এখন যেমন ইংরেজের হইয়াছে, মুসলমানদের এইরূপ কখনও হইয়াছিল কি না সন্দেহ। দেশময় অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন, তাঁহাদের কেল্লা ছিল, সৈন্য ছিল, রাজধানী ছিল, রাজসভা ছিল। তাহারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। মুসলমানেরা অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে কিছু কর দিয়া তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইতেন। রাঢ় দেশের খানিকটা এখনও ময়ূরভঞ্জের রাজার আছে। বিষ্ণুপুর বরাবরই স্বাধীন ভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। বীরভূমে যদিও ব্রাহ্মণ রাজাকে মারিয়া একজন মুসলমান রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও রাজাই হইয়াছিলেন; মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হন্ নাই। বর্গীর হাঙ্গামার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্র রায় ভুরসুটে রাজত্ব করিতেন।

রাঢ় দেশ মুসলমানের অধীন না হওয়ার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। উড়িষ্যার রাজারা খুব প্রবল ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে সমস্ত রাঢ় দেশ দখল করিয়া লইতেন। অনেক সময় গঙ্গা, রাঢ়াবরেন্দ্র যবনীনয়নাশ্রুতে কাল হইয়া যাইতেন। রাঢ় দেশে মুসলমানদের অপেক্ষা উড়িয়াদের প্রাধান্য বেশী ছিল। মেদিনীপুর নগরটী যিনি স্থাপন করেন তিনি একজন উড়িয়া রাজার গবর্ণর ছিলেন। তাহার নাম মেদিনীকর। তিনি আপনার নামে ঐ নগর স্থাপন করেন এবং তিনি মেদিনী কোষ নামে একখানি অভিধান রচনা করেন ঐ অভিধান খানি সংস্কৃতে প্রায় অমরকোষের সমান। উড়িষ্যার রাজা ও রাজপুরুষেরা রাঢ়দেশে অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। গিয়াস উদ্দীন বলবনের সময় কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা এমন কি কাশী পর্য্যন্ত বড় বড় তীর্থ লোপ হইয়াছিল।

প্রায় দুই শত বৎসর এই সমস্ত তীর্থ লুপ্ত ছিল। তাহার পর সেগুলিকে উদ্ধার করিতে আরও এক শত বৎসর লাগে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালীরা বিশেষ রাঢ় দেশের লোকে এক মাত্র জগন্নাথকেই আপনাদের তীর্থস্থান বলিয়া মনে করিত। জগন্নাথ উড়িষ্যা দেশে। সেখানে তখনও মুসলমান যাইতে পারে নাই। সুতরাং সেই তীর্থ একেবারেই লোপ পায় নাই। জগন্নাথ যাইতে হইলে, বাঙ্গালীকে কুলীনগাঁয়ের বোসেদের বাড়ী গিয়া ডুরি লইতে হইত। সেই ডুরি হাতে বাঁধিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে জগন্নাথের পথে যাতায়াত করিত। ডুরি যেন তাহাদের পাসপোর্ট ছিল। রাস্তায় নারায়ণগড়ের কেল্লা পড়িত। কেল্লার উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে হইত। ডুরি দেখিলে নারায়ণগড়ের রাজা কিছু বলিতেন না। সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার জন্য একটা ব্যবসায়ই ছিল। ব্যবসাদারদিগকে সেথো বলিত—যে হেতু তাহারা যাত্রীদিগকে সাথে করিয়া লইয়া যাইত। আমাদের বঙ্গদেশের স্মৃতিতে অন্য তীর্থের কথা বড় নাই, কেবল পুরুষোত্তম তীর্থ। রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বে পুরুষোত্তম তত্ত্ব একটা। তাহাতে কাশী তত্ত্বও নাই গয়া তত্ত্বও নাই। অনেক বড় বড় বাঙ্গালী পণ্ডিত পুরুষোত্তমে যাইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সর্ব্ব প্রধান। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমই সর্ব্ব প্রথম মিথিলায় গিয়া ন্যায় শাস্ত্র পড়িয়া আসেন। শুনিয়াছি কণাদ তর্কবাগীশ ও রঘুনাথ শিরোমণি এই দুই জনই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। কণাদ তর্কবাগীশ বয়সে বড়, শিরোমণি ঠাকুর বয়সে ছোট। কণাদ তর্কবাগীশই শিরোমণিকে মিথিলায় যাইতে পরামর্শ দেন। এবং সেই পরামর্শ মত শিরোমণি মিথিলায় যাইয়া খুব প্রতিপত্তি লাভ করেন ও ফিরিয়া আসিয়া নব্য ন্যায়ের এক সম্প্রদায়ই চালাইয়া যান্। কণাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ী খানাকুল; তিনি শিরোমণির পূর্ব্বে ন্যায় শাস্ত্রের মূল অর্থাৎ তত্ত্ব চিন্তামণির এক টীকা লেখেন। সেই টীকার কিছু আমি বারাসতের নিকট ব্রাহ্মণগ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। লেখা বেশ গাঢ় এবং মূলকে বিশদ করিবার বেশ চেষ্টা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম বিদ্যানিধি মহাশয় যে খানাকুলকে নবদ্বীপের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া গিয়াছেন, সেটা যেন ঠিক না হইতেও পারে। তবে শিরোমণির প্রতিভার কণাদ অনেকটা চাপা পড়িয়াছেন। শিরোমণির প্রতিভা যেমন ছিল, উদ্যমও তেমন ছিল। তিনি ত মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের কাছে পড়িয়াই ছিলেন এবং সেখানে পাঠ সমাপ্ত করিয়া উপাধিও পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত হন্ নাই। সেই সময় গোদাবরী নদীর তীরে পাইটানা নগরে রামেশ্বর নামে একজন বড় পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। তিনি মহালক্ষ্মী মন্দির দর্শন করিতে কোহ্লাপুর যান। তথা হইতে বিদ্যানগরে উপস্থিত হন্ এবং তথায় প্রভুত সম্মান লাভ করেন। বিদ্যানগরের রাজারা তখন হিন্দুদের মধ্যে রাজরাজেশ্বর। কিন্তু রাজা কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মহাদান দিবার চেষ্টা করায় তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিয়া দ্বারকায় যান্। এবং সেখানে ৮ বৎসর টোল করিয়া পড়ান। আমাদের শিরোমণি ঠাকুর ততদূর ধাওয়া করিয়া রামেশ্বরের কাছে অনেকদিন পাঠ করেন। একথা রামেশ্বরের পৌত্র শঙ্করভট্ট গাধিবংশানুচরিত নামে আপনাদের বংশ পরিচয়ে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। সুতরাং শিরোমণির মত প্রতিভাবান্ ও উদ্যমশীল পণ্ডিতের প্রতিভার কাছে কণাদ যে একটু ম্লান হইবেন, তাহার খুবই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কণাদও বড় ছোট-খাট লোক ছিলেন না। সব দেশের নৈয়ায়িকেরা নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করিতে আসেন; কিন্তু কণাদের বংশে বা সম্প্রদায়ে সেটা বড় একটা ছিল না। শেষাবস্থায় তাঁহারা আমাদের বাড়ী গিয়া পাঠ সমাধা করিতেন, তথাপি নবদ্বীপ যাইতেন না। কণাদ তর্কবাগীশের পুরা টীকাটা পাওয়া গেলে বড় ভাল হয়। কারণ সেটা শিরোমণির আগেকার পুথি। শিরোমণির পূর্ব্বে আমাদের দেশের ন্যায় শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা

ছিল, কণাদের টীকাই তাহা জানিবার একমাত্র উপায়।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় কণাদের বংশীয় অনেকের পরিচয় দিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলিবার দরকার নাই। কণাদ তর্কবাগীশ যে সময়ের লোক, তখন বাঙ্গালার অবস্থা অতি ভীষণ, দ্বিতীয় ইলিয়াস্ সাহী বংশ তখন মৃতপ্রায়। গৌড়ে কখন খোজা, কখনও হাবসী রাজারাই সুলতান হইয়া বসেন। সে সকল কথা ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে পড়িলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। শুনিয়াছি একজন খোজা রাজা নাকি আড়াই মণ করিয়া পোলাও খাইতেন এবং চওড়া পাড়ের শাড়ী পরিয়া অন্দর মহলে নাচিতেন। তাঁহাদের সময় উড়িষ্যার রাজা গজপতি পুরুষোত্তমদেব গঙ্গার পশ্চিম তীর প্রায় সব দখল করিয়া লইয়াছিলেন। রাঢ় দেশে মুসলমান রাজত্ব এক প্রকার লোপই হইয়া গিয়াছিল। এই পশ্চিম বাঙ্গালাটাকে কতক পরিমাণে দখল করেন হোসেন সা। আবার ঠিক এই সময়েই সাতগাঁয়ের মালীক মুসলমানদিগকে বিদায় দিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই সাতগাঁয়ের রাজত্ব দখল করেন। সাতগাঁয়ের রাজত্ব তখন যশোহরের ভৈরব নদী হইতে প্রায় রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহাদের রাজধানী ছিল সাত গাঁ। সুতরাং এই সময়টা হিন্দুদের পক্ষে একরকম মাহেন্দ্র যোগ ছিল। সর্ব্বত্রই হিন্দুদের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। হিরণ্য গোবর্দ্ধনের যিনি গুরু ছিলেন, চৈতন্যদেব দ্বিতীয় পক্ষে তাঁহারই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার ঠিক এই সময়েই দেবীবর রাঢ়ি শ্রেণীর সমস্ত কুলীন ব্রাহ্মণকে একত্র করিয়া কালনার নিকট আয়েদা গ্রামে তাঁহার গুরু শোভাকরের বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া কুলীনদের মেল্ বন্ধন করিয়া দেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরের সমাজের উৎপত্তি এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। অনেকের সংস্কার যে এখানকার সর্ব্বাধিকারীরা নবাব সরকারের সর্ব্বাধিকারী ছিলেন। কিন্তু সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বলিতেন তাঁহারা উড়িষ্যার রাজাদের সর্ব্বাধিকারী ছিলেন। উড়িষ্যার রাজার দেওয়া রঘুনাথপুর তালুক এখনও তাঁহারা ভোগ করেন, এবং তাঁহাদের জগন্নাথের মন্দিরে তাঞ্জাম চড়িয়া যাইবার অধিকার আছে। এ সকল কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে তাঁহারা কোন্ রাজার সময়ে সর্ব্বাধিকারী ছিলেন। ১৫৬৭ সালে কালাপাহাড় উড়িষ্যা দখল করেন। তাহার পর উড়িষ্যার মোগল পাঠানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে বাদশা আকবর উড়িষ্যার রাজাকে চারিটি মাত্র পরগণা ও জগন্নাথের মন্দিরের ভার দেন। সুতরাং সে সময়ে ইঁহারা যদি উড়িষ্যার রাজার সর্ব্বাধিকারী হইতেন, সেটা বড় বেশী কিছু মানের কথা ছিল না, তাহার পূর্ব্বে কোনও সময়েই তাঁহারা উড়িয়া রাজার সর্ব্বাধিকারী হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম পত্তন হইবার পূর্ব্বে নিকটেই ধামাল নামে এক গণ্ডগ্রাম ছিল। একথাটা কানে খুব বাজিল। ধামাল মানে ধর্ম্ম ঠাকুরের একটা স্থান। যেখানেই গ্রামের নাম ধাম-ওয়ালা সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে ধর্ম্ম ঠাকুরের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধদিগের এককালে একটা বাসস্থান ছিল। ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি অনেকে বলেন এগার শতকে হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন নেপাল হইতে আনা বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে সেই সময়কার বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম সে সময় খুব প্রবল ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুররূপে পরিণত হয় নাই। সেই পরিণামটা আরও দুই তিন শত বৎসর পরে হইয়াছিল। শূন্য পুরাণের ভূমিকায় নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে ঐ পুরাণের ভাষা ও ভাব দেখিয়া মনে হয়, যখন রাঢ়দেশে উড়িয়াদের

প্রভাব খুব বেশী সেই সময় এই সমস্ত বহির খুব প্রচার হয়। তাহা হইলে খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ আরও পুরাণো হইবে। কত পুরাণো বলিতে পারা যায় না।

ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। এখনও অনেকের ধারণা যে ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি এগার শতকে হইয়াছিল। সেটা যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মপূজা পদ্ধতি নামে এক প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দিক্‌ডাক নামে বাঙ্গালা ও নিকটবর্ত্তী দেশের ভূগোলের কিছু পরিচয় আছে। তাহাতে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের নাম আছে, যথা সোয়ালক্ষ উড়িষ্যা, বত্রিশলক্ষ গৌড় তেত্রিশ লক্ষ কল্লরী, নবলক্ষ বঙ্গ, চৌদ্দলক্ষ সুরঙ্গ, কত জাঙ্গিকারা, পাটলী রঙ্গপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি। ইহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কারণ এই যে, উহার সঙ্গে উহার রাজস্বের পরিমাণ দেওয়া আছে। যেমন সোয়ালক্ষ উড়িষ্যা, নবলক্ষ বঙ্গ ইত্যাদি। এখন দেখিতে হইবে কোন্ সময় এই দেশগুলি স্বাধীন ছিল। গৌড় ত মুসলমানের হইয়াছিল, উহার রাজস্ব ছিল বত্রিশলক্ষ, বঙ্গের নয়লক্ষ, কল্লরীর তেত্রিশ লক্ষ, সুবঙ্গের চৌদ্দলক্ষ ছিল। এখন দেখিতে হইবে কোন সময়ে এই দেশগুলির স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। উড়িষ্যা ১৫৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। বঙ্গ মোটামুটি ১৩২০ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুবঙ্গ বা শ্রীহট্ট ১৩৫০ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল, তাহার পরেও টুকি টুকি করিয়া অধীন হয়। গৌড় ১২০০ সালে মুসলমানের হস্তগত হয়। কল্লরী দুই ভাগ হইয়া যায়। একভাগ চৌদ্দশতকে রেওয়ার সামিল হইয়া যায়। আর এক ভাগ মহারাষ্ট্রীরা দখল করে, সে অনেক পরে। তাই দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয়, যে এই ভূগোলের ব্যাপার ১২০০ হইতে ১৩০০ সালের মধ্যে লেখা হয়। ধর্ম্মঠাকুরের উৎপত্তি সেইখান হইতে। ব্রাহ্মণদের প্রভাব রাঢ়ে যত বাড়িতে লাগিল, ধর্ম্মঠাকুর ক্রমেই সরিয়া যাইতে লাগিল। সেইরূপ এক ধর্ম্মঠাকুরের আস্তানা ভাঙ্গিয়া খানাকুল গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে। খানাকুলের লোকেও জানেন যে খামলা হইতেই খানাকুলের উৎপত্তি।

খানাকুলের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অভিরাম গোপালের নাম শুনিতে পাই। তিনি ত ১৩১৬ শকে আবির্ভূত হন, সুতরাং চৈতন্যদেবের অনেক পূর্ব্বে, নবদ্বীপের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠতার অনেক পূর্ব্বে। অভিরাম গোস্বামীর জীবনের সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডিদাসের জীবনের অনেক স্থানে মিল আছে। চণ্ডিদাসের যেমন রামি, অভিরাম গোস্বামীর তেমন মালিনী। রামি ধোবানী ছিল, মালিনী কাবাড়ির বাড়ীতে থাকিত। অভিরামেরও জাতি যায়, চণ্ডিদাসেরও জাতি যায়। মালিনীর সিদ্ধি প্রভাবে অভিরামের জাতি রক্ষা হয়, রামিরও সিদ্ধি প্রভাবে চণ্ডিদাসের জাতি রক্ষা হয়। আমার বোধ হয় চৈতন্যের পূর্ব্বে বৈষ্ণবদের মধ্যে সহজিয়া ভাবটা ঢুকিয়াছিল। জয়দেবও সহজিয়া ভাবের, বড়ু চণ্ডিদাসও সহজিয়া ভাবের। চৈতন্যের পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। পরে ঐ পন্থের বৈষ্ণবেরা চৈতন্যধর্ম্মে মিশিয়া যায়, এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই ধর্ম্মের দুই দল হয়, গোস্বামী মতের বৈষ্ণব ও সহজিয়া মতের বৈষ্ণব। অভিরাম ঠাকুর সহজিয়া মতেরই বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে একখানা বহি ছাপা হইয়াছে, নাম অভিরাম লীলামৃত। তিনি অনেক দিন বাঁচিয়া ছিলেন। এবং চৈতন্য ও নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেকবার মিলিয়াছিলেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের আর একজন প্রধান লোক নারায়ণ ঠাকুর। তাঁহার শুদ্ধিকারিকা অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এখনও মুখস্থ আছে। সেকালে ত ছাপা ছিল না, পুথি চুরির বেশ সুবিধা ছিল। হরিনারায়ণ শর্ম্মা নামে একজন প্রধান পণ্ডিত নারায়ণ বাড়ুয্যের নামের একখানা

পুথি নিজনামে চালাইয়া গিয়াছেন। রামভদ্র সার্ব্বভৌমও তাহাই করিয়াছেন। বাড়ুয্যে ঠাকুরের আর এক পুস্তকের নাম স্মৃতিসর্ব্বস্ব। অনেকের ধারণা স্মৃতিসর্ব্বস্ব রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের সংক্ষেপ। কিন্তু আমার বোধ হয় কথাটা ঠিক নয়। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন বাড়ুর্য্যে ঠাকুর কণাদের শিষ্য। তাহা হইলে তিনি ত রঘুনন্দনের তুল্যকাল হইলেন। রঘুনন্দন তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্ব ১৫৬৭ সালে লিখিয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহারই তুল্যকাল কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা প্রাচীন। রঘুনাথের এক ছাত্র ছিলেন মহেশ পণ্ডিত। উভয়েই ন্যায়শাস্ত্রের মূলের টীকা করেন। মহেশ পণ্ডিতের লেখা শিরোমণির শিরোনামে একখানি পত্র আমি এসিয়াটিক সোসাইটির বিবরণ সংহিতার মধ্যে পাইয়াছিলাম। পুথিখানি ১৫২৯ সম্বতের তৈয়ারী। কবেকার হাতের লেখা জানি না। এই শিরোমণিকে মিথিলায় পাঠাইবার কর্ত্তা হইলেন কণাদ। সুতরাং তিনি শিরোমণি অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহার ছাত্র রঘুনন্দনের সঙ্গে বাড়ুর্য্যে ঠাকুরের তুল্যকাল হওয়াই সম্ভব, পরে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং স্মৃতিসর্ব্বস্ব রঘুনন্দনের সংক্ষেপ নহে, তাঁহারই তুল্যকালের কোন লোকের লেখা। বাড়ুর্য্যে ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত, পড়াশুনা খানাকুলে আসা, খানাকুলে বাস, এ সমস্ত কথা বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন যে স্মৃতিসর্ব্বস্ব বহিখানির উল্লেখ এসিয়াটীক সোসাইটীর তালিকায় আছে। উহার ১৬০৩ শকের এক প্রতিলিপিও গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন। ৯৫৫ সালে উহা সঙ্কলিত হয়। বাস্তবিক সেখানি এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি নয়, উহা ইণ্ডিয়া আফিসের পুথি। তাহাতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত আছে তাহার অর্থ এই যে, কংনামক বৎসর ১৬০৩ শকে হইবে, ও ৯৫৫ শকে হইয়া গিয়াছে। উহা প্রতিলিপি বা সঙ্কলনের কাল নহে।

১৬০৩ শক হইলে উহা খৃষ্টের ১৬৮১ হইবে, ৯৫৫ শক হইলে উহা খৃষ্টের ১০৪৩ হইবে। নারাণ বাড়ুর্য্যে মহাশয় জানিতেন এই দুটী বৎসর ক্ষয় সংবৎসর। লোকের ধারণা বাঁড়ুয্যে ঠাকুর যখন রঘুনন্দনের সংক্ষেপ করিয়াছেন তখন উনি রঘুনন্দনের ১০০।১৫০ বৎসর পরের লোক। উনি যখন ১৬৮১ সালকে ভবিষ্যৎ কাল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তখন সে কথাটা বেশ খাটিল বলিয়া বোধ হয় না।

বাঁড়ুয্যে ঠাকুর যে রঘুনন্দনের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সে বিষয়ে আর একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অনেক পুথি নকল করা হয়। ১৮৩৬ সালে ঐ কলেজ উঠিয়া গেলে ঐ পুথিগুলি এসিয়াটিক সোসাইটিতে দেওয়া হয়। ঐ সকল পুথির মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনখানি পুথির নকল আছে—স্মৃতি সংগ্রহ, শান্তিকতত্ত্ব ও স্মৃতিসার। শেষ পুথিখানির প্রথমেই লেখা আছে উহা বংশীরায়ের সভায় লেখা হয়। বংশীরায় যাদবেন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারী। তাহা হইলে ১৫০০ হইতে ১৫৫০ পর্য্যন্ত অথবা উহারই কাছাকাছি কোনও সময়ে তিনি সমাজের কর্ত্তা ছিলেন এবং বাঁড়ুয্যে ঠাকুর তাঁহার সভায় বসিয়াই স্মার্ত্তদিগের জন্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

যখন অভিরাম গোস্বামী চৈতন্যের তুল্যকাল অথচ তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়; যখন কণাদ তর্কবাগীশ শিরোমণির তুল্যকাল অথচ তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় এবং বাড়ুয্যে ঠাকুরও রঘুনন্দনের তুল্যকাল অথচ তাঁহা অপেক্ষা বয়সে বড়; তখন আমরা খানাকুলকে আর নবদ্বীপের ছোট ভাই বলিব কেমন করিয়া? 'বড়' নিতান্ত বলিতে না দাও, পিঠাপিঠি বলিব। ধামাল ভাসিয়া খানাকুলের উৎপত্তি যখন, তখন বুঝিতে হইবে বৌদ্ধধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যে চৌধুরী মহাশয়েরা কণাদ তর্কবাগীশ ও বাড়ুয্যে ঠাকুরকে ১৫০ বিঘা করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয় আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেন, না হলে তাঁহাদের ভূমিদান সিদ্ধ হইবে কেন? সে সময়ে এরূপ ছোট ছোট রাজা রাঢ়দেশে বহুতর ছিলেন। ইঁহারা কখন

উড়িষ্যার রাজার হইয়া মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেন, কখন বা মুসলমানের হইয়া উড়িষ্যার রাজার সহিত যুদ্ধ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা আপনাদের ধন মান ও সম্পত্তি রক্ষা করিতেন। কিন্তু নিকটে আর কোন হিন্দু রাজা না থাকায় তাঁহারা উড়িয়াদেরই অনুকরণ করিতেন। তাঁহাদের প্রজারাও তাহাই করিত। উড়িয়াদের মত কাপড় পরিত, উড়িয়াদের মত মাথা কামাইত, উড়িয়া বুলি বলিবার চেষ্টা করিত। উড়িয়া মন্দিরের নকলে মন্দির বানাইত, উড়িয়াদের ঠাকুর জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করিত, এইরূপে সমস্ত রাঢ়দেশেই উড়িয়াদের প্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ১২০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত রাঢ়দেশের বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও উড়িষ্যার প্রভাব বেশ দেখা যাইত। শূন্য পুরাণের ভাষায় উড়িয়া ভাষার প্রভাবের কথা নগেন্দ্র বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, যে দেখিয়াছে সেই স্বীকার করিবে। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতেও উড়িয়ার প্রভাব যথেষ্ট আছে, এই কালের সংস্কৃত সাহিত্যেও উড়িয়ার প্রভাব আছে। কারণ এই তিনশ বৎসর রাঢ়ের হিন্দুরা পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্য তীর্থে যাইতে ভরসা করিত না। রাঢ়ের পরবগুলি সব উড়িয়ার দেখাদেখি হইয়াছে। যথা রথ, দোল, স্নানযাত্রা, গুণ্ডিবাড়ী পুনর্যাত্রা—সবই উড়িষ্যার অনুকরণ। এই তিনশ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে রাঢ়দেশে একখানি মাত্র ভাল পুথি হইয়াছে। সেখানি শূলপাণির "বিবেক"। শূলপাণি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্র, সাহড়ীয়া গাঁই। তিনি মাধবাচার্য্যের লেখা পরাশর সংহিতার টীকার দোহাই দিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে কিছুতেই ১৩৬০ এর পূর্ব্বে দেওয়া যাইতে পারে না। তাহার বিবেক ১২ খানি। একখানি দোলযাত্রা বিবেক। বোধ হয় উড়িষ্যার অনুকরণেই লেখা। ইহার পূর্ব্বে বাংলাদেশে আর দোলযাত্রার পুথি পাই নাই। একখানি "দুর্গোৎসব বিবেক" এখানির সঙ্গেও উড়িষ্যার সম্পর্ক আছে বোধ হয়। কারণ ইহার পূর্ব্বে আর দুর্গোৎসবের পুথি পাওয়া যায় নাই। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে লেখা আছে নগ্নদর্শন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; সে "নগ্ন" মানে "বৌদ্ধাদয়ঃ।" তখনও রাঢ়ে খুব বৌদ্ধ দেখা যাইত। শূলপাণির সঙ্গে রঘুনন্দনের তুলনা করিলে রাঢ়দেশে উড়িষ্যার প্রভাব কতদূর বাড়িয়াছিল তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। রঘুনন্দনের কাছে আর তীর্থ নাই, কেবল পুরুষোত্তম।

বাড়ুর্য্যে ঠাকুরের "স্মৃতিসর্ব্বস্ব" "শুদ্ধি কারিকা" পড়িয়া এক একবার মনে হয় যেন তিনি জীমূতবাহন ও শূলপাণির সারমর্ম্ম দিতেছেন। তিনি যে রঘুনন্দনের সারমর্ম্ম দিতেছেন এরূপ মনে হয় না। মনে হয় সংক্ষেপে প্রাচীন স্মৃতির মর্ম্মাদি দিতেছেন। কিন্তু লোকে বলে যে তিনি রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী ও রঘুনন্দনেরই অনুগমন করিয়াছেন, ঐ কথার কোনও বিশেষ ভার আছে তাহা মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহারা দুজনেই তুল্যকালের লোক। বরং কণাদের শিষ্য বাড়ুয্যে ঠাকুর একটু বয়সে বড় হইতে পারেন। তাহার পর রঘুনন্দন ত সমস্ত বাঙ্গালার জন্য বই লেখেন নাই। তাঁহার মতে ত্রিবেণী চাকদা দক্ষিণ দেশ, যেন তাঁহার অধিকারের বাহিরে—তাহা হইলে খানাকুল ত আরও দক্ষিণ দেশ। সুতরাং ও কথাটার উপর জোর দেওয়া চলে না। বলিতে পারি না বাড়ুর্য্যে ঠাকুর কোনও উড়িয়া স্মৃতির সংক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন কি না। উড়িয়া স্মৃতির সব কথা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। তবে একটা কথা এই যে বাড়ুয্যে ঠাকুরের শুদ্ধিকারিকা বইখানি রামভদ্র সার্ব্বভৌম "শুদ্ধিতত্ত্ব কারিকা" বলিয়া নিজ নামে চালাইয়াছেন। তাহাতেই লোকে ভাবিল, যদি শুদ্ধিতত্ত্ব কারিকা হইল তাহা হইলে রঘুনন্দনের তত্ত্বের উপরই কারিকা হইবে।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা যখন এখানে আসেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন আগম ব্রাহ্মণ, নাম রত্নেশ্বর। সাধারণ লোকে তাঁহাকে আগমবাগীশ বলিয়া আর একজন আগম বাগীশের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চান। তাঁহার নাম কৃষ্ণানন্দ আগম-

বাগীশ। তিনিও এই সময়ের লোক কিন্তু তিনি নবদ্বীপাঞ্চলের লোক। তাঁহার প্রধান পুথি তন্ত্রসার। তিনি বুদ্ধ ছাড়া বৌদ্ধদিগের অনেক বোধিসত্ত্ব ও ডাকিনী যোগিনীর পূজা ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া যান। এই সময়টা অর্থাৎ খৃঃ ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত অনেক বৌদ্ধ দেবতা হিন্দু দেবতার সামিল হইয়া যান। যে সকল মহাপুরুষ এইরূপে ভারতবর্ষের দুইটী প্রধান ধর্ম্ম মিলাইয়া দেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশে ত্রিপুরানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ প্রধান। আর রাঢ়ে আগম বাগীশ কৃষ্ণানন্দ, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র। এই সময় হইতেই বাঙ্গালাদেশে গুরু গিরির সূত্রপাত। বৈদিক পুরোহিতের উপর এই সময় হইতে তান্ত্রিক গুরু দেশে প্রভুত্ব করিতে থাকেন। এই সময়েই রঘুনন্দন দীক্ষাতত্ত্ব লিখিয়া তন্ত্রকে স্মৃতিভুক্ত করিয়া লন এবং স্মৃতির ভিতর নানা তন্ত্রের বচন প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধার করিতে থাকেন। খানাকুলের রত্নেশ্বর আগমবাগীশও এই সময়ের লোক।

খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ ১৪০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হয়। এখানে অভিরাম গোপাল পুরাণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। পরে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলে তাহার সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়া যান। তিনি খুব উৎসাহী পুরুষ ছিলেন; তিনি আপন শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা নানাস্থানে বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়া ও তাহার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম খুব প্রচার করিয়া যান। খানাকুল কৃষ্ণনগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম তাহার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির আজও আছে। তাঁহার পর কণাদ তর্কবাগীশ মিথিলায় পড়িয়া আসিয়া তত্ত্ব চিন্তামণি টীকা লিখেন। তাঁহার শিষ্য রাড়ুয্যে ঠাকুর এক নূতন স্মৃতির মত চালাইয়া যান। তাহার পর রত্নেশ্বর আগম ভূষণ তান্ত্রিক মত প্রচলন করেন। সুতরাং একশ বা দেড়শত বৎসরের মধ্যে এই সমাজে বৈষ্ণব শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র সবই প্রচলিত হয়। সমাজটী সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিয়া উঠিতে থাকে।

এতক্ষণ যাহা কিছু বলিয়াছি সবই ব্রাহ্মণ সমাজের কথা। এখন কায়স্থ সমাজের কথাও একটু বলিতে চাই। যাদবেন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার পুত্র বংশীধর চৌধুরীই এই সমাজ স্থাপন করেন, বড় বড় ব্রাহ্মণ বাস করান। তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূমি দান করেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা কি ছিল কেহ বলিতে পারেন না। প্রচলিত প্রবাদ মত তাঁহারা নবাব সরকারের ইজারাদার মাত্র। কিন্তু আমার উহা বোধ হয় না। আমার বোধ হয় হিন্দু ও মুসলমান দুই রাজ্যের সীমানায় অনেক লোক এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যকে রাজ্য বলিত না, সমাজ বলিত। এই সময়ে অনেকে স্বাধীন ভাবে ক্ষুদ্র রাজ্য বা সমাজ স্থাপন করিতেন। প্রবল রাজারা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে কর দিতেন, নইলে দিতেন না। যুদ্ধের সময় একপক্ষ বা আর একপক্ষের সহায়তা করিয়া আপনার ধন বৃদ্ধি করিতেন। যাদবেন্দ্র সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া আমার মনে হয়। এসময়ে গৌড়ের মুসলমান সুলতানগণের অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং আপন কোটে চৌধুরী মহাশয়েরা যা খুসী তাই করিতেন।

তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে সর্ব্বাধিকারী বংশকে আনিয়া খানাকুলে স্থাপন করেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ বসু বংশ। তাঁহারা মাই-নগরের বসু। মূল দশরথ বসু হইতে যিনি ১২ নম্বরে তিনি উড়িষ্যায় যান এবং সেখানকার স্বাধীন হিন্দু রাজার সর্ব্বাধিকারী হন। সেটা কোন্ শতাব্দী তাহা কোথাও লেখা নাই। তবে ১২ নম্বর হইলে ১২০০ হইতে ১৩০০ মধ্যে হওয়াই সম্ভব। ইহার পূর্ব্বেই জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটা বোধ হয় ১০৩৮ হইতে ১১১৮ পর্য্যন্ত। তাহার পর ভোগের ও পূজার বন্দোবস্ত। তাহাতে অনেক পুরুষ লাগে। মাইনগরের সর্ব্বেশ্বর বসু মহাশয়, বোধ হয় এই সময়েই উড়িষ্যার অথবা জগন্নাথ ক্ষেত্রের সর্ব্বাধিকারী

হন। কারণ জগন্নাথ মন্দিরে তাঁহার ও তাঁহার বংশধর গণের অনেক অধিকার এখনও অক্ষুন্ন আছে। তাঁহারা তাঞ্জামে চড়িয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন। ছাতা মাথায় দিয়াও প্রবেশ করিতে পারেন। এটা একটা বড় রাজসম্মান। মন্দিরের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে এ সকল অধিকার পাওয়া যায় না। এই সময়ে তাঁহারা উড়িষ্যার রঘুনাথপুরের তালুক পান। ঐ তালুকের স্বত্ব এখনও সর্ব্বাধিকারী বংশ ভোগ করিতেছেন। তবে অনেক ভাগ হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাধিকারীরা অনেক পুরুষ ধরিয়া রঘুনাথপুরে বাস করিতেছিলেন। উনিশ পর্য্যায় রত্নেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারীকে আনিয়া যাদবেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কন্তা সম্প্রদান করেন এবং কৃষ্ণনগরে বাস করান। তাঁহার আর দুই ভাইও এই সময়ে আসিয়া কৃষ্ণনগরে বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা আজিও উড়িয়া অধিকারী বা উড়িয়া সর্ব্বাধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ তাঁহারা উড়িয়া স্ত্রী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েরা যখন উড়িষ্যার রাজার কর্ম্মচারী ও জগন্নাথ মন্দিরের সেবক ছিলেন তখন যে তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরম আস্থাবান। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের অনেক কথাই লিখিয়াছেন তাহাতে আপনারা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে সর্ব্বাধিকারী বংশের রামনারায়ণ মুন্সী কলিকাতায় আসিয়া খুব পসার প্রতিপত্তি করেন। তিনি একবার ভূ-কৈলাসের ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিয়া প্রভূত যশোলাভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মথুরামোহন সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মিউটিনীর পূর্ব্ব বৎসর হাঁটিয়া তীর্থ দর্শন করিতে যান এবং মিউটিনি শেষ হয় হয় এমন সময় দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার এই তীর্থ ভ্রমনের এক বিবরণ আছে ঐ বিবরণ ১৮৫৮ সালে লেখা হয়। উহা গদ্যে লেখা এবং একখানি বড় বই। এত বড় এবং এমন সুন্দর গদ্যে লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় আর আছে কি না সন্দেহ। যদুনাথ পায়ে হাঁটিয়া বদরিকাশ্রম, জ্বালামুখী প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সমস্ত তীর্থস্থানের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। কোথায় কি কি পুণ্য কার্য্য করিতে হয়—কোথায় কিরূপ থাকিবার স্থান পাওয়া যায়—কোথায় কিরূপ খাবার জিনিস পাওয়া যায়, এ সব কথা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় বেশ পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর ছেলেরা সকলেই সুপরিচিত। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ছিলেন, আমরা তাঁহার কাছে পড়িয়াছি। তাঁহাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহের অনুকরণ করাই জীবনের সার বস্তু বলিয়া মনে করি। ২য় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী নিজে ত স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, তাহার পর "পুত্রে যশসি তোয়েচ" নরাণাং পুণ্যলক্ষণম।"—তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতী। দেববাবু ও সুরেশ ত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। দেববাবু উপস্থিত আছেন। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সুরেশ অল্পভোগী ছিল, অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। আমি তাহাকে অতি অল্প বয়স হইতেই জানিতাম। সে যে কাজেই লাগিত প্রাণপণে তাহা সুসিদ্ধ করিত। কি অস্ত্র চিকিৎসায়, কি অন্য চিকিৎসায় তাহার মত তাহার সময়ে আর কয়জন ছিল? তাহার পর এই যে বেঙ্গলী এম্বুলেন্স কোর এটা ত সেই করিয়া গিয়াছে। সে পরলোকগত হইয়াছে; আমরা পরলোকে তাহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর আর এক পুত্র রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পাইয়া রীতমত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া গিয়াছেন। তাহার উপর রাজ-নীতি ক্ষেত্রে তিনি ত একজন

পাইওনিয়ার। কত কাজই যে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমরা এতক্ষণ খানাকুলের অনেকেরই কথা বলিলাম, কিন্তু এখানকার প্রধান পুরুষের নাম এখনও করি নাই। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ইনি নিজেই লিখিয়াছেন যে ইঁহার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইতেই ইঁহারা ব্রাহ্মণ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাকরী ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং কখনও বড়লোক হইতেন, কখনও বা পড়াইয়া খাইতেন। রামমোহন রায়ের উভয় কুল পবিত্র। তাঁহার পিতৃকুলের কথা তিনিই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতামহ দেশগুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের আদি পুরুষ শ্যাম ভট্টাচার্য্য। ইনি চাতরায় বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন, এবং সেকালে বড় বড় ব্রাহ্মণের গুরু ছিলেন। রামমোহন রায় প্রথম আরবী ও পারসী পড়িয়া ছিলেন। পাটনা তাঁহার পাঠস্থান ছিল। তাঁহার পিতৃ-বংশ বৈষ্ণব ও মাতামহ বংশ শাক্ত ছিল। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই তাহাকে ধর্ম্মসঙ্কট পড়িতে হইয়াছিল। তাহার পর আরবী পারসী পড়িয়া তিনি একেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি ১৬ বৎসর বয়সে পুতুল পূজার বিরুদ্ধে এক বই লেখেন। ঐ বই লেখায় তাঁহার পিতা ও মাতামহ উভয়েই তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনিও চারি বৎসর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ২০ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পিতাপুত্রে আবার সদ্ভাব হয়। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সংস্কার জন্মে যে একেশ্বরবাদ প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এবং সেই সকল শাস্ত্রের পর নানা নূতন ও অসার মত প্রচলিত হইয়া আমাদের ধর্ম্মকে দূষিত করিয়াছে। সুতরাং তিনি পুরাণ ও তন্ত্র নিম্ন অধিকারীর পক্ষে রাখিয়া উচ্চ অধিকারীর জন্য ব্রহ্মজ্ঞানই প্রচার করিতে থাকেন।

ইংরাজি ১৮০০ হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায় সরকারী চাকরি করেন এবং চাকরি করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। এই চাকরীর সময়েই তিনি ইংরাজি শিখেন। ইংরাজের সঙ্গে মিশিতে থাকেন এবং ক্রমেই ইংরাজের ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। চাকরী হইতে অবসর লইয়া তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার মত প্রচার করিতে থাকেন। তাহার মত প্রচারের চারিটি উপায় ছিল। (১) কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক, (২) বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষাদান, (৩) পুস্তক প্রচার, (৪) সভাসংস্থাপন।

এই চারি উপায়ে তিনি আপন মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তাহার অভিপ্রায় ছিল না যে হিন্দু সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দু সমাজ, তিনি যাহাকে উপধর্ম্ম বলিতেন, তাহা ত্যাগ করিয়া উন্নত হয় এই তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। উপধর্ম্মের মধ্যে 'সতী" হওয়া একটা। এটা যে অতি নৃশংস ব্যাপার তাঁহার এই ধারণা হইলে ১৮১৮ হইতে ১৮২৯ পর্য্যন্ত তিনি উহাকে উঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ যখন স্থাপিত হয় তখনও তিনি উহার বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও, ইংরাজেরা যে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমস্ত দেশটাকে ইংরাজি ভাবে চালাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনিই তাহার সূত্রপাত করিয়া যান। তিনিই সব প্রথমে আপনার বাড়ীটী ইংরাজী ভাবে সাজাইয়াছিলেন। আর এই একশত বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষটাই ইংরাজি সাজে সজিয়াছে। যাঁহারা ইহাকে উন্নতি বলেন তাঁহারা রামমোহন রায় মহাশয়কে ইহার আদিকর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারা বলেন, রামমোহন রায় মহাশয় হইতেই ভারতবর্ষের সবদিকে উন্নতি। সুতরাং তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ, অসাধারণ মনীষী। পুরাণ আদি নিবাইয়া দিয়া নূতন আদর্শ আনায় তিনিই মূল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় সকল বিষয়েই ভাগ্যবান ছিলেন। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন। ওকালতীতে তিনিই বাঙ্গালাদেশে

প্রথম প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনিই কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ নিযুক্ত হন। কিন্তু শরীর ভগ্ন হওয়ায় তিনি এক দিনও বিচারাসনে বসিতে পারেন নাই। তিনি শুনিয়া গিয়াছিলেন তিনিই হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

এতক্ষণে আমরা খানাকুলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কথাও কতক বলিলাম। সময় নাই যে সবকথা বলি। আর অধিক বলিতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্যও থাকিবে না। ইহারই মধ্যে দেখিতেছি অনেকেই উস্‌খুস্ করিতেছেন। আমরা আজ এই পুণ্যভূমিতে মিলিত হইয়াছি। এখানে কিছু সাহিত্য চর্চ্চা হয়, এইটাই আমাদের সকলের ইচ্ছা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সাহিত্য-চর্চ্চা

(তুলাসার শচীনাথ পাঠমন্দিরে পঠিত)

সূচনা।

স্বর্গীয় মহাত্মা শচীনাথ বাবুর স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত এই পাঠমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার তৈলচিত্র উন্মোচন কার্য্যে যোগদান করিয়া আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। স্বর্গীয় মহাত্মার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের কথা যাহা শ্রবণ করিলাম তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি প্রায় দশসহস্র টাকা ব্যয়ে নিজবাড়ী হইতে পালং বাজার পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; তুলাসারে মধ্য ইংরেজী-বিদ্যালয়টি হাইস্কুলে পরিণত করিয়াছিলেন ও ছাত্রদের সুবিধার জন্য স্কুলের সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন।—এইগুলি তাঁহার বাহিক কীর্ত্তিস্তম্ভ সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবলে এতদ্দেশবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে যে প্রীতিশ্রদ্ধার বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ তাহা এই পাঠমন্দিররূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ পালং ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের অধিবাসিগণ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই তৈলচিত্র স্থাপন করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। যিনি জীবনে মরণে তাঁহার স্বদেশবাসীর এইরূপ প্রীতিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন, তাঁহার জীবনই ধন্য। এরূপ মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে অনুষ্ঠিত এই সভার সভাপতির পদে বৃত হইয়া আমিও ধন্য হইয়াছি।

আজ এই উপলক্ষে আপনাদের এই স্থানে আসিয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ পাইলাম। ইহাও আমার বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমি বাল্যকাল হইতে পালঙের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম একসময়ে পূর্ব্ববঙ্গের প্রকৃত অধীশ্বর সেই ইতিহাস-বিশ্রুত রাজা রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগরের ভগ্নাবশেষ এই পালঙে। এই পালঙ্ পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান। একসময়ে ইহা বঙ্গের গৌরব বহু অধ্যাপক পণ্ডিতের দ্বারা অধ্যুসিত ছিল। বর্ত্তমান সময়েও এখানে বহু পণ্ডিত এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ মুসলমানাদি ভদ্রলোকের বাসস্থান। এই পালঙ্ দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতে আমার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। আপনাদের সাদর আহ্বানে এখানে আসিয়া আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গাল দেশ

আমাদের এটা বাঙ্গাল্ দেশ। পালঙ্ একসময়ে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল, ইহা এখন ফরিদপুরের মধ্যে আসিয়াছে, এবং ইহা বরিশালের অতি সন্নিকট— এজন্য এখানে বাঙ্গাল দেশের "ত্রিবেণীসঙ্গম" হইয়াছে। কিন্তু এটা পালঙের অধিবাসিবর্গের নিন্দার বিষয় নহে, প্রশংসার বিষয়। একসময়ে বঙ্গদেশ বলিতে পূর্ব্ববঙ্গের এই কয়টি জেলা বুঝাইত। এখন বাঙ্গালী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, একসময়ে বাঙ্গালেরও সেই অর্থ ছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ যদিও কখন কখন আমাদিগকে গালি দেওয়ার ভাবে এই শব্দ এখন ব্যবহার করেন, আমি কিন্তু তাহাতে অসন্তুষ্ট হই না। বাঙ্গাল শব্দ দ্বারা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসীর একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। সেই বিশেষত্ব কি ?

বাঙ্গালের সদ্‌গুণ

যেমন কুলীনের নয়টি লক্ষণ ছিল-"নবধাকুললক্ষণম্" —আমি বলি বাঙ্গালের পাঁচটা লক্ষণ আছে—"পঞ্চধা-বঙ্গলক্ষণম্"। তাহা ইংরেজী ভাষায় এইরূপ প্রকাশ করা যায়, যথা Earnestness, tenacity, courage of conviction, adventurous spirit and self reliance. বাঙ্গাল মনে এক মুখে আর নহে, বাঙ্গাল মনে মুখে এক, যাহা মনে ভাবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলে, আবার মুখে যাহা বলে কাযেও তাহা করে। বাঙ্গালের কথায় ও কাযে একটা আন্তরিকতা আছে। বাঙ্গাল যে কাযটা ধরিবে, তাহার পেছনে লাগিয়া থাকিবে। কথায় বলে "বাঙ্গালের গোঁ।" বাঙ্গালের মধ্যে একটা দুঃসাহস দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গাল কোন কায কঠিন বলিয়া পশ্চাৎপদ হয় না। বাঙ্গাল অর্থোপার্জ্জনের জন্য দূরদেশে যাইতে ভীত হয় না, এই জন্য ভারতের এমন স্থান নাই যেখানে বিক্রমপুরের লোক দেখিতে না পাওয়া যায়। বাঙ্গাল আত্মনির্ভরশীল। বর্ত্তমানকালের স্বদেশী ভাবটা পূর্ব্ববঙ্গ যেরূপ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে আমার বোধ হয় আর কোথাও তাহা সেরূপভাবে গ্রহণ করা হয় নাই। সেই প্রথম যুগের স্বদেশী আন্দোলন পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিল, আর কোথাও সেরূপ করে নাই। সেই আন্দোলনের ফলে পূর্ব্ববঙ্গের শত শত যুবক অম্লানচিত্তে কারাগারে গমন করিয়া তাহাদের অসীম স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল। পরে এই নন্‌কোঅপারেশনের যুগেও পূর্ব্ববঙ্গ বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার ফলে তুলার চাষ, চরকা ও খদ্দর পূর্ব্ববঙ্গেই বেশী চলিয়াছে। আপনারা এখানে কুটীর শিল্পের যে প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, আমি আজ প্রাতঃকালে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

যে দেশে এখনও নানাবিধ কুটীর শিল্পের এরূপ নীরব চর্চ্চা হইতেছে, আমি এখনও সে দেশের Industrial regeneration (শিল্পবাণিজ্যের জাগরণ) সম্বন্ধে হতাশ হইতে পারি না।

আমি বাঙ্গালদের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলাম, জাতীয় উন্নতির পক্ষে ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। আমরা যদি আত্মনির্ভরশীল হই, আমরা যদি বিপদ তুচ্ছ করিয়া দেশে বিদেশে গিয়া ধন উপার্জ্জন করিয়া আনিতে পারি, আমাদের মধ্যে যদি কথায় ও কাযে আন্তরিকতা থাকে, আমরা যদি কোন কায সফল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারি, তবে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের বিলম্ব হইবে না।

বাঙ্গালের দোষ

তবে আমাদের একটা প্রধান দোষও আছে। সেটা আমাদের আত্যন্তিক স্বাধীনতাপ্রিয়তা (too much independent spirit), আমাদের এই দোষের জন্য আমরা আর দশ জনের সঙ্গে মিলিত হইয়া কায করিতে পারিনা, আমরা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের জেদ বজায় রাখিতে চেষ্টা করি। এটা কেবল আমাদের বাঙ্গালদের দোষ নহে, ইহা সমস্ত বাঙ্গালীর

জাতীয় দোষ। অন্য দেশে এবং অন্যজাতির মধ্যেও অনেক বিষয় লইয়া দুইটি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলের মধ্যে মতবৈষম্য ও বিবাদ হয়, কিন্তু পরে যখন এক পক্ষ জয়ী হয় তখন অন্যপক্ষ সেই বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে তাহা প্রায়ই হয়না। আমাদের মধ্যে পরাজিত পক্ষ চিরদিনের জন্য বিজেতার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও পদে পদে তাহার কার্য্যের সফলতা বিষয়ে বাধা বিঘ্ন জন্মায়। কি মিউনিসিপাল ইলেক্সানে, কি স্কুল বা ডাক্তারখানা স্থাপনে,—এইরূপ সাধারণের অনেক হিতকর কার্য্যে আমরা নিজ নিজ স্বাধীন মত রক্ষা করিতে যাইয়া সমস্ত কার্য্যটাকে পণ্ড করিয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের অনেক সময়ে সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, আমাদের মধ্যে একতা জন্মিতে পারেনা। যাহা হউক, জাতীয় উন্নতির জন্য আর একটা জিনিষের সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজন। সেটা হইতেছে সুশিক্ষা।

বিদ্যানুশীলন

আমরা সাধারণতঃ স্কুল, কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকি। সেখানে গুরু বা শিক্ষক আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেন। কিন্তু সেই গুরু বা শিক্ষক যত বড় বিদ্বানই হউন না কেন, তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। কতক দিন তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলে, তাঁহার যতটুকু দেওয়ার ছিল তাহা শেষ হইয়া যায়। কিন্তু সেই গুরু ও শিক্ষক উপযুক্ত হইলে, তিনি আমাদের মনে একটা জ্ঞানের পিপাসা জাগাইয়া দিতে পারেন। স্কুল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ আমাদের যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ হয় তাহারও উদ্দেশ্য সেই জ্ঞানপিপাসা জাগাইয়া দেওয়া। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া—অর্থাৎ গ্রাজুয়েট হইয়া—বাহির হইয়া আসেন, তিনি যদি মনে করেন যে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে, তবে তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিভিন্ন বিভাগের দুই একখানা পুস্তক পড়াইয়া দিয়া ছাত্রের হৃদয়ে জ্ঞানের পিপাসা উদ্রেক করিয়া দেন মাত্র। এই ভাবে দিগ্‌দর্শন করিয়া সেই ছাত্র, যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-পিপাসু হন, তবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট হইবেন। আর যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া মনে করেন, তাঁহার কার্য্য এই খানেই শেষ হইল। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিকাংশ ছাত্রই এইরূপ অর্থকরী বিদ্যালাভ করাকেই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। যে দুই চারিটি প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র পরবর্ত্তী জীবনে বিদ্যানুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, এইরূপ লাইব্রেরী স্থাপন দ্বারা তাঁহাদের মহোপকার সাধিত হয়। জ্ঞানপিপাসা একবার উত্তেজিত হইবামাত্র, তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁহাদিগকে যেটুকু শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার সীমা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। তখন একটি সুসমৃদ্ধ লাইব্রেরী বা বিদ্যামন্দিরই তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপুরণ করিতে পারে। সেই বিদ্যামন্দিরে তাঁহারা একসঙ্গে বহু স্বদেশীয় বিদেশীয়, আধুনিক প্রাচীন লোকশিক্ষক গ্রন্থকারের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

সেজন্য, যাঁহারা একটি বিদ্যা মন্দির স্থাপন করিয়া আমাদের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ প্রদান করেন, তাঁহাদের দান যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় শচীনাথ বাবুর কৃত এখানে একটি উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন ও তৎসঙ্গে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষার্থিগণের পক্ষে মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের অধিকাংশই অর্থকরী বিদ্যার সেবা করিয়া

থাকেন। সেই অর্থ উপার্জ্জনের জন্ত তাঁহারা যখন কোন চাকুরি বা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তখন তাঁহাদের অবসর কাল, তাঁহারা কিরূপে অতিবাহিত করেন? তাস পাশা খেলা, গল্প গুজব করা, পরচর্চ্চা পরনিন্দা প্রভৃতি কার্য্যে। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, যেখানে একটি ভাল লাইব্রেরী থাকে, সেখানকার যুবকগণ তাঁহাদের অবসর কাল সম্পূর্ণরূপে অপব্যবহার না করিয়া সহজ পাঠ্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাও প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। একটি কথা আছে, —ধীমান ব্যক্তিদিগের অবসর কাল কাব্য শাস্ত্রবিনোদে অতিবাহিত হয়, আর মূর্খদিগের অবসর কাল কলহ, পরনিন্দা, পরচর্চ্চাতে অতিবাহিত হয়। এইরূপ একটি লাইব্রেরী নিকটে থাকিলে সমাজে মূর্খের সংখ্যা কমিয়া ধীমানের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে পারে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পাঠক সাধারণ কি পড়েন?

সাধারণতঃ পাঠক পাঠিকাগণ কি বই পড়িয়া সময় কাটান? উপন্যাস ও গল্পের বই। সচরাচর সকল দেশে সকল সমাজেই এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অবসর কাল যাপনের জন্ত সকলেই লঘু সাহিত্য পছন্দ করে। সমস্ত দিন খাটুনির পর আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় মাথা ঘামাইয়া কেহ কোন বই পড়িতে চায়না। তবে কোন পাঠক বা বিদ্যার্থীর যদি কোন গুরুতর বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক থাকে, তবে তিনি সারাদিন খাটুনির পরেও সেই ঝোঁকের মাথায় সেই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে আনন্দ পান। কিন্তু সকল দেশে ও সকল সমাজেই এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল, আমাদের বাঙ্গালা দেশে খুব বেশী বিরল। বর্ত্তমান যুগে উপন্যাসই হইতেছে সর্ব্বজনপ্রিয় সাহিত্য। এই কারণে যদি কোন গ্রন্থকার সমাজ তত্ত্ব, প্রাকৃত তত্ত্ব, ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে কোন কথা বলিতে চান, তবে তাহা উপন্যাসের মধ্য দিয়াই প্রচার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমাজতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক কথা "দেবীচৌধুরাণী", "সীতারাম" ও "আনন্দ মঠের" মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন। তবে এই সকল উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস প্রথম শ্রেণীর কাব্য হইতে পারে না ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল কাব্যে শিক্ষয়িতব্য বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাই উৎকৃষ্ট। সেই সকল কাব্যেই আর্ট অর্থাৎ শিল্পকৌশল বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়।

আধুনিক উপন্যাসে দুর্নীতি

এক শ্রেণীর কবি মনে করেন, কাব্য রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য পাঠকের মনে সাহিত্যের রস সঞ্চার দ্বারা আনন্দ উৎপাদন করা; কবি লোকশিক্ষক বা স্কুল মাষ্টার নহেন। আমাদের আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে এই মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা বিদেশীয় মতের অনুকরণ বশতঃ। আমাদের প্রাচীন মতে কবি একজন লোকশিক্ষক, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে কাব্যের উদ্দেশ্য কান্তার ন্যায় সরস বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান করা। আবার কোনও শাস্ত্রে কাব্যকে "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর" পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং কাব্য উপন্যাসাদি পাঠকে, কেবল তাস পাশা খেলা অথবা মদগাঁজা খাওয়ার ন্যায় শুধু মনে একটা ক্ষণিক সুখ বা স্ফুর্ত্তি দানের উপায় বলিলে চলিবে কেন? আমাদের ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি কি কেবল এইরূপ স্ফুর্ত্তি দানের জন্ত তাঁহাদের বিশ্ববিশ্রুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছিলেন? তাহা কখনই নহে। যাহা হউক, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে আজকাল অনেক গ্রন্থকার ক্ষণিক আমোদ প্রদানের উদ্দেশ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প উপন্যাস রচনা করিতেছেন। তাঁহারা তাহাদের লেখনীকে সুনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন না, সেই জন্ত তাঁহাদের অনেক গ্রন্থে পাপের চিত্র নিতান্ত উলঙ্গ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পাঠক পাঠিকার মন কলুষিত করিতেছে। অপরিণতবয়স্ক পাঠক পাঠিকার উপর ও সমস্ত সমাজের উপর এই সকল কাব্য পাঠের

পরিণাম যে কতদূর বিষময়, ইহা তাঁহারা ভাবিবার অবসর পান না।

"সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আমি এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অনেকের বিরাগ-ভাজন হইয়াছি। এই সকল গ্রন্থকার একটা প্রধান কথা ভুলিয়া যান—অর্থাৎ সমাজের জন্য সাহিত্য, সাহিত্যের জন্য সমাজ নহে। যে সাহিত্যের দ্বারা মানব সমাজের কোন প্রকার উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, তাহার সার্থকতা কি? এ বিষয়ে আমি সম্প্রতি আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহা বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের "মানসী"তে বাহির হইয়াছে।

যাহা হউক, লাইব্রেরী হইতে এই সকল দুর্নীতি-বহুল কাব্য উপন্যাসাদি একেবারে বর্জ্জন করা অসম্ভব। কারণ পাঠক পাঠিকাগণকে নিত্য নূতন খোরাক না জোগাইলে লাইব্রেরী চলে না। আমি এ পর্য্যন্ত নানাস্থানে কয়েকটি লাইব্রেরীর সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। তবে যতদূর সম্ভব, তরলমতি পাঠক পাঠিকাদিগের রুচি যাহাতে বিকৃত না হয় এবং চরিত্র যাহাতে দূষিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। স্বাস্থ্যকর সাহিত্যে রুচি জন্মাইতে পারিলে দুর্নীতি-কলুষিত উপন্যাসাদির প্রতি ঘৃণা আপনিই জন্মিবে। কারণ মানবচিত্ত স্বভাবতঃ ভাল দিকেই আকৃষ্ট হয়। সেই জন্য আমরা স্বভাবতঃ অসৎ লোকের সংসর্গ বর্জ্জন করিয়া সাধুসঙ্গ কামনা করি।

নব জাগরণ

এখন আমরা কি সাহিত্যে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নব জাগরণের মধ্যে পড়িয়াছি। জাতীয় জীবনের এই জাগরণের দিনে আমরা সর্ব্বাগ্রে কি চাই তাহা একবার ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের জন্য আমরা চাই শরীরের বল, মনের বল এবং বিশেষরূপে চরিত্রবল। স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন "আবার তোরা মানুষ হ।" মনুষ্যত্ব লাভ ভিন্ন জাতীয় উন্নতি কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যে সকল গ্রন্থ আমাদিগকে সেই মনুষ্যত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করে, আমাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক তাহাই পাঠ করিতে হইবে। গল্প ও উপ-ন্যাসের মধ্যে পরকীয় প্রেমের লীলা খেলার রসা-স্বাদন করিয়া কৌতুক অনুভব করিবার সময় আর নাই। বিশেষতঃ ক্রমাগতঃ সেই সকল নর নারীর ব্যভিচারের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে অনেক তরলমতি যুবক যুবতীর চিত্ত কলুষিত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এখন বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্ববিষয়ে কঠোর সংযম অবলম্বন করিয়া শরীর, মন ও চরিত্রকে দৃঢ় করিতে হইবে। আমি আশা করি আমার যুবক বন্ধুগণ বৃদ্ধের এই কথাটি স্মরণ রাখিবেন।

যাহা হউক, এইরূপ একটি মহদনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। পরিশেষে, সে সকল মহাত্মদিগের অর্থব্যয়ে আজ তাঁহাদের সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতেছি। একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা যেমন একটা spiritual atmosphere সৃষ্টি করিয়া অনেক নরনারীকে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার চতুষ্পার্শ্বে একটা intellectual এবং moral atmosphere সৃষ্টি করা হয় যাহা দ্বারা অনেক লোকের জ্ঞানচর্চ্চা ও চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি ও পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে। আমি প্রার্থনা করি এই পুস্তকাগার স্থাপনের দ্বারা উদ্যোক্তৃগণের এই মহদুদ্দেশ্য সফল হউক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ত্রিবেণী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ত্রিবেণীতে পূর্ব্বে বহু পণ্ডিতের বাসবাস ছিল। গত শতাব্দীর উজ্জ্বলরত্ন পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বংশবাটীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইঁহার অপূর্ব্ব স্মরণ শক্তি ছিল। একদা ত্রিবেণীর ঘাটে জগন্নাথ আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। সেই সময় ভিন্নভাষী দুইজন য়ুরোপীয় গোরার দ্বন্দ্ব হয়। তাহারা পরস্পরকে গালি দেয়। আদালতে নালিশ হইলে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে সাক্ষ্য দিতে হয়। তিনি উভয়ের পর পর কথাগুলি, ভাষা না জানিয়াও কেবল স্মরণশক্তি বলে যথাযথ বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন। জজের ও লোকের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা বহুভাষাবিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়াম জোনস্ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

প্রতিবৎসর মাঘমাসে উত্তরায়ণের দিন ত্রিবেণীতে একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলায় নানাস্থান হইতে বহুলোকের সমাগম হয়।

উত্তরায়ণ মেলা

আমাদের দেশে একটী প্রচলিত কথা আছে "যার ধন তার ধন নয় নেতা মারে দই।" সেই কথার উৎপত্তিস্থল ত্রিবেণী সরস্বতী-তীরে। নৃত্যকালী বা নেতা ছিল রজকিনী—প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া সরস্বতীতীরে একখানি সুপ্রশস্ত প্রস্তর ফলকের উপর কাপড় আছড়াইত। তখন গঙ্গার প্রধান স্রোত সরস্বতী নদী দিয়া প্রবাহিত হইত। নানা-দেশের বাণিজ্যপূর্ণ জাহাজে তখন বিপুলকায়া সরস্বতী নদী পরিপূর্ণ থাকিত। একদিন রাত্রিতে এক জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া নেতার পাথরখানি স্থানচ্যুত হয়। নেতা প্রাতে কাপড় কাচিতে আসিয়া দেখিল, যে প্রস্তর খানিতে সে কাপড় কাচিত সেটী একটী পাথরের সিন্দুকের ডালা। ডালাটি সরিয়া যাওয়ায় সে দেখিতে পাইল সিন্দুকের ভিতর স্তরে স্তরে মোহর সজ্জিত রহিয়াছে। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর সে একবেলা ধরিয়া কাপড়ের মধ্যে করিয়া মোহরগুলি নিজ আলয়ে লইয়া গিয়া গোপনীয় স্থানে রাখিয়া দিল। অপরাহ্ণে সে ঘাটে আসিয়া দেখিল একজন ব্রাহ্মণ পাগলের মত সেই ঘাটের নিকট দাঁড়াইয়া সিন্দুকের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আপন মনে বিড় বিড় করিতেছে ও আবোল তাবোল বকিতেছে। প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে এরূপ আসিতে দেখিয়া নেতার মনে স্থির বিশ্বাস হইল যে, মোহরের সহিত ব্রাহ্মণের সংশ্রব আছে—সেই শোকে সে পাগল হইয়াছে। নেতা সামান্য রজকতনয়া হইলেও ধর্ম্মে তাহার আস্থা ছিল, পরকালে বিশ্বাস ছিল—ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে সে নারাজ হইল। ব্রাহ্মণ তখন উন্মাদ হইয়াছে তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। নেতা একদিন একটী হাঁড়িতে কতকগুলি মোহর রাখিয়া, তাহার উপর দধি ঢালিয়া, ব্রাহ্মণের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ সেই দধি একজন নাবিককে দান করিল। নাবিক তখন নেতার বাড়ীতে কাচা কাপড় আনিতে যাইতেছিল—পয়সার বদলে নেতাকে

"যার ধন তার ধন নয় নেতা মারে দই-"

সে দধির হাঁড়িটা দিল। নেতা আর কি করিবে? বুঝিল বিধাতা ব্রাহ্মণের উপর বিরূপ, তাঁহার কৃপায় সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছে। সে পুণ্য কার্য্যের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং দধি ভোজন করিতে করিতে আপন মনে বলিতে লাগিল "যার ধন তার ধন নয় নেতা মারে দই।"

ত্রিবেণী সরস্বতী তীরে এখনও নেতা ধোপানীর ঘাট রহিয়াছে। ত্রিবেণীর নিকট মগরার পথে এক

ডাকাতে কালী

ডাকাতে কালী ছিলেন। ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে সেই কালী স্থাপিত। ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে ডাকাতেরা এই কালীর ষোড়শোপচারে পূজা দিত। কালীর পদতলে রুধিরাক্ত কত নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। সেই সকল ডাকাতদের লোমহর্ষণকর কাহিনী শুনিতে শুনিতে বাল্যকালে আমাদের হৃদয় যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যাইত।

এই ভীষণ স্থানের অনতিদূরে আর একটি দুর্গম

জামাই জাঙ্গাল

স্থান ছিল সেটিকে "জামাই জাঙ্গাল" বলে। ত্রিবেণী হইতে মগরা যাইবার পথে এক জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি ছিল। প্রবাদ আছে, স্থানীয় কোনও ভূস্বামী তদীয় জামাতার উপর কোনও কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া শাস্তিবিধানে অগ্রসর হইলে জামাতা অশ্বারোহণে পলায়ন করে। শ্বশুরও উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অশ্বারোহণে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। জামাতা প্রাণভয়ে অনন্যোপায় হইয়া এই জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। জামাতাকে কেহ সেই জঙ্গল হইতে আর বাহির হইতে দেখে নাই। তদবধি ইহা "জামাই জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। এই ঘটনা চিত্রাঙ্কিত করিয়া জনৈক শিল্পী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চুঁচুড়া কৃষি ও শিল্পী প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অনুরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে তাহা এই—ত্রিবেণীর ভূস্বামীর জামাতা ছিলেন মহানাদের রাজপুত্র। মহানাদ হইতে ত্রিবেণী আসিতে হইলে এই জলাভূমি দিয়া আসিতে হইত। রাজপুত্র একবার বন্যজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই কর্দ্দমাক্ত জলাভূমিতে বিশেষ নাস্তানাবুদ হন। তিনি তদবস্থায় শ্বশুরালয়ে আগমন না করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। শ্বশুর উক্ত ঘটনা অবগত হইয়া সেই জলাভূমি মৃত্তিকা দিয়া ভরাট করাইয়া উচ্চ রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করান।

ত্রিবেণীর পশ্চিমে দীঘসুই যাইবার পথে "চিন্তমার দীঘি" নামে একটি সুবৃহৎ সরোবর আছে। প্রবাদ

৺চিন্তেশ্বরী দেবী

আছে এই দীর্ঘিকার সন্নিকটে ৺চিন্তেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন—এই দেবীর নিকট মধ্যে মধ্যে নরবলি দেওয়া হইত। দেবী নরবলি গ্রহণে বীতরাগ হইয়া সেওড়াফুলি রাজবংশের জনৈক বংশধরকে স্বপ্নাদেশ দেন যেন তিনি তাঁহাকে সেই পৈশাচিক নররক্তাপ্লুত স্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া ত্রিবেণী সংলগ্ন বাসুদেবপুর পল্লীতে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যথারীতি সেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি তদনুযায়ী বাসুদেবপুরে দেবী মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব হইতে এখনও দেবীর সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

উপরিউক্ত তিনটি জনশূন্য স্থানই পথিকের পক্ষে বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল। দস্যুগণ দিনে দুপুরে মাথা

রাহাজানি

কাটাইয়া পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। সেই নরপিশাচগণের হৃদয়ে দয়ামায়ার লেশমাত্র ছিল না। সেই জন্য পথিকগণ প্রায় দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করিত। একবার জনৈক দস্যু ভ্রমান্ধ হইয়া স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়াছিল। জামাতা কাতর স্বরে দস্যুর সহিত তাহার সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার ঘাড়ে তখন খুন চাপিয়াছে, সে জ্ঞানশূন্য হইয়া বলে—"প্রাণের দায়ে অনেকে অমন সম্বন্ধ পাতাইতে আসে।" তাহার পর মৃতদেহ দেখিয়া লোকটা পাগল হইয়া যায়।

ত্রিবেণীর উত্তরে চন্দ্রহাটী ও ডুমুরদহ গ্রাম এ অঞ্চলে জলদস্যু বা বোম্বেটের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহাদের

অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী শুনিলে এখনও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। নৌপথে ত্রিবেণী তীর্থযাত্রিগণ তাহাদের হস্তে কতবার যে লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

বোম্বেটে বা জলদস্যু

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার জগদীশ-চন্দ্র বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র হুগলীতে হাকিমী করিতেন। একবার তিনি এই জলদস্যুগণের হস্তে সপরিবারে বিপন্ন হইয়াছিলেন। দৈবানুগ্রহে বহু কষ্টে সে বার নিষ্কৃতি পান।

ত্রিবেণীর আশে পাশে অনেক ডাকাতের আড্ডা ছিল। শ্যাম মল্লিক, রাধা ডাকাত, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ এবং পীতাম্বর প্রভৃতি খ্যাতনামা দস্যু সর্দ্দারগণের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তৎকালে গঙ্গার উভয় তীরস্থ জনপদ সমূহের অধিবাসিগণ সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিত।

ডাকাতি

শ্যাম মল্লিক ডাকাইত ছিল বটে, কিন্তু তাহার উদারতার কথাও শুনা যায়। ত্রিবেণীর পণ্ডিত ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাব বশতঃ সদ্ব্যয় করিতেন না। শ্যাম মল্লিক এক রাত্রিতে পণ্ডিতকে ভয়প্রদর্শন করিয়া সুশিক্ষা দিবার জন্য সদলবলে পণ্ডিতের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয় এবং পণ্ডিতকে ধরিয়া আনিবার জন্য অন্দরে লোক প্রেরণ করে। বাটী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা হইল কিন্তু কোথাও পণ্ডিতকে পাওয়া গেল না। তিনি দস্যুগণ বাটী প্রবেশ করিবমাত্রই পলায়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে না পাইয়া, হতাশ হইয়া শ্যাম মল্লিক সদলে চলিয়া গেল, লুণ্ঠন করিল না। বিশ্বনাথ ডাকাইতকে লোকে "বিশ্বনাথ বাবু" বলিত। বিশ্বনাথ গরীবের মা বাপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে ধনবানের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া গরীবদিগকে বিতরণ করিত। রাধা ডাকাইতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহাকে ধরিবার জন্য সুদক্ষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়। বহুকাল গোয়েন্দাগণকে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইয়াছিল। অবশেষে এক বারবনিতার গৃহে রাধা ধৃত হয় এবং হুগলী জজ সাহেবের বিচারে তাহার ফাঁসীর আদেশ হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে অনেক ডাকাইত ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

বিশ বৎসর পূর্ব্বেও ত্রিবেণীর সন্নিকট বাগহাটীর ডাকাইত বিধু ঘোষের প্রবল প্রতাপে এতদঞ্চল প্রকম্পিত হইত। লোকে তাহাকে বিধুবাবু বলিত। সে ফিট-ফাট ছোকরা বাবু সাজিয়া থাকিত—দেখিলে ডাকাইতের সরদার বলিয়া মনে হইত না। সে অনেকবার ধৃত হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, লোকে ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিত না, কাযেই সে নিষ্কৃতি পাইত।

ত্রিবেণীর সম্মুখে যে চড়া আছে, তাহা বহুকালের—১৫৪০ খৃষ্টাব্দেও বিদ্যমান ছিল। ডি ব্যারো সাহেবের ঐ সময়ের মানচিত্রে চড়াটি স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। সেই চড়ায় প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন বিজয়োৎসব হইত।

বিজয়োৎসব ও লাঠিয়াল

দেশবিদেশ হইতে শত শত লাঠিয়াল এইস্থানে সমবেত হইয়া লাঠি খেলার কসরৎ দেখাইত। লাঠি খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক ভদ্র সন্তান যোগ দিতেন—ইহাতে তাঁহাদের মানের লাঘব হইত না। তখন লাঠি ছিল বাঙ্গালীর প্রধান অস্ত্র। লাঠিয়ালগণ লাঠি ও তরবারির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, লাঠির উপর ভর দিয়া অক্লেশে ত্বরিতগতিতে চলিতে পারিত, লাঠির সাহায্যে দ্বিতলের ছাদে লাফ দিয়া উঠিতে পারিত। আদিকাল হইতে ইংরাজ আমলের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে লাঠির প্রবল প্রতাপ ছিল কিন্তু ক্রমে তাহার প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়া আসে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ডাকাতি কমিশন সৃষ্টি হয়। প্রথম ডাকাইতি কমিশনর হন ওয়াকুপ সাহেব। কেওটার "সার্কিট হাউস" ছিল তাঁহার কর্ম্মস্থল।

ডাকাতি কমিশন

ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস যদি কেহ লিখিতে পারেন, লোকে নাটক, নভেল, উপন্যাস ফেলিয়া তাহা পাঠ করিবে। ইহার এক একদিনের ঘটনায় কত উপন্যাস, নবন্যাস সৃষ্টি

হইতে পারে। হুগলী জেলা চিরদিনই ডাকাতির জন্ত প্রসিদ্ধ। যতদিন ডাকাতেরা কেবল প্রজা লইয়া ছিল—বাঙ্গালী লইয়া ছিল—ততদিন এতটা কড়াকড়ি হয় নাই। কিন্তু যখন যুরোপীয় দিগের উপরও অত্যাচার আরম্ভ করিল, যখন পথিমধ্যে সরকারী খাজনার টাকা প্রহরী পাহারা সত্বেও লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন সরকারের চমক হইল, বৃটিশসিংহ তখন গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ভীষণ "থাবা" উত্তোলন করিলেন। এই থাবাটি হইতেছে ডাকাতি কমিশন। থাবার আঘাতে ডাকাতের দল চূর্ণ বিচূর্ণ দলিত পিষ্ট লাঞ্ছিত হইয়া কোথায় দূরে গিয়া পড়িল। এই ডাকাত ধরার উপলক্ষ করিয়া লাঠিয়ালগণ নির্য্যাতিত হইতে লাগিল। ওয়াকুর সাহেব দেখিলেন লাঠির প্রভাব ক্ষুণ্ণ না করিতে পারিলে বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল, অসহায় ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিতে না পারিলে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করা সম্ভবপর হইবে না। তিনি স্বয়ং বিজয়োৎসবের দিন ত্রিবেণীর চড়ায় লাঠি খেলা দেখিয়া লাঠির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন—লাঠিয়ালদের কপাল ভাঙ্গিল। ক্রমে তাহাদিগকে লাঠিহীন বা নিরস্ত্র করা হইল। বিষহারা ফণীর ন্তায় তাহারা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও ঢোঁড়া হইয়া পড়িল।

ত্রিবেণীর সন্নিকটে বাগাটী পল্লী সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের জন্মস্থান। তিনি সেকালের ইয়ং

বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ

বেঙ্গল দলভুক্ত ছিলেন—হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের তোয়াক্কা রাখিতেন না। তিনি আচারভ্রষ্ট ছিলেন—কিন্তু তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তি ছিল। একবার তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দুর্গোৎসব করেন। নৈবেন্ত বিলি করিতে গেলে ত্রিবেণীর ব্রাহ্মণেরা তাহা রামগোপাল ঘোষের বাটী হইতে আসিতেছে বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। নৈবেন্ত ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রামগোপালের মাতা ক্ষুণ্ণ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামগোপালের হৃদয় তাহাতে ব্যথিত হইল। তিনি আর যাই করুন, মাতার চক্ষের জল সহ্য করিতে পারিতেন না। তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের সামাজিক অবনতির কথা তিনি অনবগত ছিলেন না তিনি প্রত্যেক নৈবেন্তের সহিত পাঁচটী করিয়া টাকা দক্ষিণা দিয়া বলিলেন—"মা দেখিবেন, এবার আর কেহ নৈবেন্ত ফেরৎ দিবে না।" তাহাই ঘটিল। লোভী ব্রাহ্মণগণ টাকার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৈবেন্ত গ্রহণ তো করিলেনই; আর যাঁহারা বাদ পড়িয়াছিলেন তাঁহারা নৈবেন্তের জন্ত তাঁহার বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ত্রিবেণীর নিকট কোঁচাটীতে একজন প্রসিদ্ধ ভূতের ওঝা ছিল। সকল রকম ভূতই তাহার বশীভূত ছিল।

ভূতের ওঝা

সে ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ দিনে ভূত নামাইতে পারিত ও সকল রকম ভূত তাড়াইতে অদ্বিতীয় ছিল। ওঝা বাড়ীতে আসিতেছে শুনিলে ভূতাবিষ্ট লোক অস্থির হইয়া পড়িত। ওঝা ঝাড়াইতে না ঝাড়াইতেই অনেক সময়ে ধমকের চোটে ভূত পলাইত। এ অঞ্চলে তাহার প্রতিপত্তি কম ছিল না। বৈহাটীর সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গা ময়রা তাহার সমসাময়িক ছিল।

বৈঁচির জমিদার বেহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের বদান্ততায় ত্রিবেণীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও

শবদাহ ঘাট ও দাতব্য চিকিৎসালয়

ইটেচোনার দানশীল জমীদার রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুরের ব্যয়ে ত্রিবেণীতে শবদাহ ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিবেণীতে বহু দূরদেশাগত শব দাহ হইয়া থাকে; অনেকে অন্ততঃ মৃতের অস্থি আনিয়াও ত্রিবেণীর পবিত্র সলিলে সমর্পণ করে।

ত্রিবেণীর সংলগ্ন বাসুদেবপুরের ডাক্তার শ্রীনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি

ডাক্তার শ্রীনাথ সেন

এলোপ্যাথিক ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার ন্তায় সুচিকিৎসক তৎকালে এ প্রদেশে অল্পই ছিল।

ত্রিবেণীতে দুইটী রেল ষ্টেশন আছে—একটা বাঙ্গালীর

স্থাপিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে ষ্টেশন—এই লাইন তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপরটী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনের ষ্টেশন।

রেল ষ্টেশন

ত্রিবেণীতে শিল্পের বিশেষত্ব কিছু নাই। শিল্পমধ্যে স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এখানে চোরাই মাল কেনাবেচা হয় বলিয়া দুর্ণাম আছে। বহুযাত্রী সমাগম হয় বলিয়া অনেকগুলি দোকান পাট আছে। যাত্রী বাসের জন্ত কোনও ধর্ম্মশালা নাই, কতকগুলি পর্ণকুটীর যাত্রীদিগকে ভাড়া দেওয়া হয়। মগরার বাণী ত্রিবেণী হইতে কলিকাতা অঞ্চলে প্রেরিত হয়। সরস্বতী তীরে কয়েকটা টালিখোলা আছে। সম্প্রতি ত্রিবেণীর উত্তরে মধুসূদনপুরে বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানী কাগজের কল প্রতিষ্ঠার জন্ত জমী ইজারা লইয়াছেন। এখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য

স্বামী সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রহাটী পল্লীতে ভাগীরথী তীরে "কপিলাশ্রম" নামক একটী আশ্রম আছে। স্বামীজী তথায় শাস্ত্রালোচনা ও অতিথি সৎকারের ব্যাবস্থা করিয়াছেন।

কপিলাশ্রম

পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে কয়েকটী চতুষ্পাঠী ছিল—কালসহকারে সেগুলি লুপ্ত হইয়াছে। এক কালে বংশবাটীর রামরাম ও ত্রিবেণীর রঘুরাঘব এ প্রদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন—"বংশবাট্যাং রামরাম ত্রিবেণ্যাং রঘুরাঘব॥" বাগাটি পল্লীতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

বিদ্যা চর্চ্চা

মুক্তবেণী ত্রিবেণী হিন্দুর পরম তীর্থ স্থান। একদিন গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই ত্রিস্রোত প্রবাহিত ছিল। আজকালের কঠোর নিষ্পেষণে যমুনা প্রায় অদৃশ্য—সুন্দর বনে ছোট দুর্গা ও বুড় দুর্গা রূপে পরিণত হইয়া সাগরে মিশিয়াছেন। সরস্বতী ক্ষীণকায়া শুভ্র রেখার ন্তায় বহিয়া তাম্রলিপ্তির নিকট ভাগীরথীর অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছেন—আর জুবিলী সেতুর কৃপায় ভাগীরথী দিনে দিনে শুকাইতেছেন, ছোট বড় চড়া পড়িতেছে। কিন্তু ধন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব! শতাব্দীর পর শতাব্দী কত কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও আজিও তীর্থ মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রহিয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী আজিও ত্রিবেণী তীর্থে ভাগীরথীর সলিলে অবগাহন করিয়া ধন্ত হইতেছে।

তীর্থ মাহাত্ম

শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায়।

কাশ্মীর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৪ মাইল যাইতেই বরফ সুরু হইল। রাস্তায় বরফ নাই, কিন্তু দুই পাশের মাঠে এখনও একটু একটু আছে। আর খানিক যাইতেই বরফ ক্রমে পরিমাণে বেশী হইতে লাগিল এবং আমরা এক বরফের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। বরমূলা আর বেশী দূর নয়। ঘরের চালে, মঠে, রাস্তায়—সর্ব্বত্রই রাশীকৃত বরফ—শীতও যেন বাড়িয়া উঠিল। অগত্যা নাইট ক্যাপের পরিবর্ত্তে মাথায় 'বালাক্লাভা' চাপাইয়া কম্বল দিয়া পা ঢাকিয়া বসিয়া রহিলাম।

২-৩০ মিনিটে বরমূলা পার হইতেই মাঠ শেষ হইল এবং রাস্তা ঝেলমের পাশ দিয়া, সাধারণ পার্ব্বত্য রাস্তায় পরিণত হইল। বরমূলা হইতে 'রামপুর' পর্য্যন্ত সমস্ত পথই বরফে আচ্ছন্ন, তবে কুলীরা রাস্তার খানিকটা পরিষ্কার রাখিয়া মোটর চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

স্থানে স্থানে পাহাড় ধসিয়া গিয়া রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আজ পরিষ্কার হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম 'উরি' পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাই বরফে আচ্ছন্ন, তাই আজ 'উরি'তেই রাত্রি যাপন করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে রামপুর ছাড়াইয়াই বরফ চলিয়া গেল এবং হুহু করিয়া গাড়ী নামিতে লাগিল। যখন ৪টার সময় 'উরি' পৌছিলাম তখন আমি বলিলাম যে আজ 'গহি'তে পৌছিতেই হইবে। চালক বলিল যে অন্ধকার হইয়া যাইবে। আমি তাহাকে সাহস দিলাম।

ক্রমাগত নামিয়া আমরা 'চকোট' ও 'চিনারি' ছাড়াইয়া চলিলাম। চিনারি ছাড়াইতেই অন্ধকার হইয়া আসিল। সেই অন্ধকারে বে-আইনি করিয়া গাড়ী চলতে লাগিল। অতি কষ্টে গরুর গাড়ীর দলের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাঁচাইয়া আমরা প্রায় ১০০ মাইল আসিয়া সন্ধ্যা ৭ টায় 'গহি' পৌছিলাম।

যাইবার সময় এই 'গহি'তেই আমার ভোজন বিভ্রাট হইয়াছিল। এখানে শ্রীনগর অপেক্ষা অনেক কম শীত। হঠাৎ ঝড়ের মত বাতাস উঠিয়া শীত বাড়িয়া উঠিল। আমরা 'হিন্দু কিচেন'-এ একটি কামরা লইয়া জিনিষ পত্র নামাইয়া, ডাক বাংলোতে 'ঘ' বাবুর স্ত্রী ও নিজের জন্য চা ও রুটী মাখনের হুকুম দিয়া বুখারি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিলাম। ৫ মিনিটের মধ্যে চা হাজির। 'ঘ' বাবুর সহিত আনীত সন্দেশ, রুটী ও সেই বরফের মত জমাট মাখনের সদ্ব্যবহার করিয়া শরীরটা তাজা করিয়া লওয়া গেল। 'ঘ' বাবু চা পান করেন না, কিন্তু তিনি আহারে সেটুকু সারিয়া লইলেন।

'ঘ' বাবুর স্ত্রী বলিলেন তিনি রান্না করিবেন। তাঁহাদের সহিত চা'ল ডা'ল ছিল। পণ্ডিতের চুলায় রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি বসিয়া ডায়েরি লিখিতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে ভাত, ডাল সিদ্ধ ও আলু ভাজা হইয়া গেল। বেশ তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া শয়নের ব্যবস্থা দেখা গেল। একই ঘরে তিন খানা খাটিয়ায় বিছানা করিয়া শয়ন করিতে যাইব, এমন সময় সংবাদ আসিল "মারী খুলিয়া গিয়াছে।" শুনিয়া মোটর চালক ও আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া শয়নে গেলাম।

২৫ শে ডিসেম্বর—রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই, ভোর বেলা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ৭ টায় নিদ্রা ভঙ্গেই দেখি যে খানসামা চা, রুটী, মাখন, লইয়া দরজায় ডাকিতেছে। মুখ হাত ধুইয়া চা পানান্তে বিছানা পত্র বাঁধিতে আরম্ভ করিলাম। 'ঘ' বাবুর বড় দেরী হইতে লাগিল, ফলে ন'টার পূর্ব্বে রওনা হওয়া গেল না। মোটর চালককে আসিতে বলিয়া আমরা পদব্রজে ঝেলমের তীরপথে দিয়া চলিলাম। তখন সূর্য্যোদয় হইয়াও হয় নাই। নদীর অপর পারে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা তীরে কাপড় ছাড়িয়া রাখিয়া স্নান করিতেছে এবং জল হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি পুনরায় সেই কাপড়ই পরিতেছে। বিষয়টি যদিও সুরুচি সঙ্গত নহে তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে এই শীতের সময় যখন এই সুন্দরী-বৃন্দ বরফ শীতল জল হইতে উঠিয়া আইসে তখন তাহাদের তুষার ধবল দেহগুলি একে বারে রক্তবর্ণ হইয়া 'বহুরূপীর' বর্ণ পরিবর্ত্তনের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

ঝেলমের তীরে তীরে প্রায় আধ মাইল যাইতেই মোটর আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে শীত অল্প নয় কিন্তু নদীর বাম তীরে একটু দূরের গিরিশৃঙ্গগুলি এখনও তুষারমণ্ডিত। বেলা ৯-৩৫ মিনিটে আমরা দোমেলে (Domel) পৌছিলাম। সেখানে ৫৲ দর্শনী দিতে হইল। মারির সঠিক সংবাদ শুনিয়া চালক বলিল যে তাহার ইচ্ছা যে সে এবটাবাদের রাস্তায় যায়। আমিও আনন্দের সহিত তাহার মতে মত দিলাম।

দোমেলের নিকটেই কিষণগঙ্গা নদী ঝেলমে মিশিয়াছে। আমরা পুল পার হইয়া এবটাবাদের রাস্তা ধরিলা। আধ মাইল যাইতে পুরাতন সহর মজঃফরাবাদ। এই খানে মোটর থামাইয়া আমরা নামিয়া পড়িলাম। নদীর তীরেই একটি বাঙ্গালী মহিলা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একটী আশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রম দেখিতে গেলাম। কি পবিত্র, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ

স্থান। নদীর কলতানের মধ্যে নির্জ্জন উপলবেষ্টিত উপত্যকায় এই আশ্রম। আশ্রমে 'গোপালজী' বিগ্রহ আছেন। বিগ্রহ দর্শন করিয়া উভয়ে আহারের চেষ্টায় সহরে চলিলাম। সহর অনেকটা উপরে, উঠিতে গা ঘামিয়া গেল। ক্ষুদ্র অপরিষ্কার রাস্তা দিয়া আমরা বাজারে উপস্থিত হইলাম। এ একটী পাঠান সহর। অধিবাসীরা অধিকাংশই পাঠান জাতীয়—অতিশয় সুশ্রী। পরিধেয় পাঞ্জাবীদের মত। সহরটী পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। পাঠানদের মাথায় বাঁধিবার রঙীন পাগড়ী অনেক ঘরে বুনান হইতেছে। একটী দোকানে ১৲ সের পুরী গরম ভাজাইয়া এক সের এবং ১৲ সের গরম জিলিপি আধসের, সঙ্গে সালগমের আচার ও তরকারী লইয়া মোটরে ফিরিলাম। বড় দেরী হইয়াছিল সুতরাং চলন্ত গাড়ীতেই আহার সমাধা করা গেল এবং ফ্লাস্কের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করা হইল।

সহর ছাড়াইয়া পুনরায় নদী পার হইতে হয়। পুলের মুখে গাড়ী থামাইয়া ১।৵০ টোল আদায় হইল। টোলের দৌরাত্ম্য এ মুলুকে বড় বেশী। পুল পার হইয়া আমরা পাঠান মুলুকের ভিতর দিয়া চলিলাম। মাঝে পাহাড় ধসিয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাথায় বাবরী চুল দলে দলে পাঠান কুলী রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে। দুই তিন স্থানে রাস্তা পরিষ্কার উপলক্ষে দেরী হইয়া গেল। ক্রমাগত চড়াই উঠিয়া প্রায় ৫ মাইল যাইয়া আবার উতরাই। দুই দিকেই সুউচ্চ পর্ব্বতমালা তাহার মধ্যে নিম্নে ক্ষীণকায়া তটিনী। ১৩ মাইল গিয়া 'রামকোট'। এটী কাশ্মীর রাজ্যের এদিকের সীমা। এতক্ষণে কাশ্মীরের নিকট হইতে প্রকৃত বিদায় লইতে হইল।

একটী শুষ্ক নদী পার হইয়া দেখিলাম লেখা আছে পিণ্ডি আর ১০৯ মাইল। আজ পৌছিতে পারিব কিনা সন্দেহ। একটু যাইয়াই আমরা প্রথম ক্ষুদ্র পাঠান সহর "গার্হি হাবিবুল্লা" পৌছিলাম। ইহা একটী গ্রাম মাত্র। অনেকগুলি সুন্দর পাঠান বালক-বালিকা মোটরের পাশে আসিয়া গম্ভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। একটী ঝোরার উপর দিয়া মোটর চালাইয়াই তাহা পার হইলাম। সামান্য জল ছিল। সমতল পথে আর খানিকটা যাইয়া একটী স্বল্পতোয়া নদী মোটরেই পার হইয়া পুনরায় পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়ের গায়ে অগণিত ঝাউ গাছ। একদল লোমশ ছাগল মোটরের শব্দে পাহাড়ের গা হইতে নামিয়া রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল। ৪.৫ মাইল উঠিয়া আসিয়া পাহাড় ঘুরিয়া আবার উৎরাই। এঞ্জিন বন্ধ করিয়া গাড়ী বেগে নামিতে লাগিল। ৫.৬ মিনিট নামিয়া ঝোরা পার হইয়া আমরা এক বিস্তৃত উপত্যকায় প্রবেশ করিলাম। 'মানসেরা' সহর আর ১০ মাইল মাত্র। মাঠে বেশ চাষ-বাস হইয়াছে। মাঝে মাঝে কুটীর, তাহার চাল কিন্তু সমতল। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট টিলা, আর চারিদিকে দূরে উচ্চ পাহাড়। "মানসেরা" সহরে পৌছিলাম। বাজার নিতান্ত ছোট নয়। চা'য়ের দোকান, Singer কল যুক্ত দরজীর দোকান, খাবারের দোকান কিছুরই অভাব নাই।

সমতল রাস্তায় মোটর বেগে ছুটিতে লাগিল। মেহেদি রঞ্জিত দাড়ী পাঠান সর্দ্দার মখমলের পোষাক পরিয়া ঘোড়ায় চলিতেছে—"সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় হেন শক্তি আছে কার" অনেকটা এইরূপ ভাব। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। ২।১খ নি টঙ্গা যাইতেছে। শ্লেট পাহাড় কাটিয়া রাস্তায় খানিকটা চড়াই উঠিয়া পাহাড়ের মাথায় পৌছিলাম। বহুদূরে কাবুলের পাহাড় মেঘের মত দেখা যাইতেছে—একেবারে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়াছি! ঘোড়ার পিঠে পাঠান স্ত্রীলোক যাইতেছে। রাস্তার পার্শ্বে ২।১টী কাঁথার তাঁবু দেখিলাম! এবটাবাদ আর ৮ মাইল মাত্র!

৩টায় আমরা এবটাবাদ ক্যান্টুন্‌মেন্টে পৌছিলাম। নোটিস্ লেখা রহিয়াছে যে ১০ মাইলের বেশী ঘণ্টায় মোটর চলিতে পারিবে না। চারিদিকে সৈনিকদের তাঁবু পড়িয়াছে।

এবটাবাদ, সীমান্ত প্রদেশের একটী প্রধান সহর ও সৈন্যের আড্ডা। সহরটী অতি সুন্দর, সরল

রাস্তাগুলি দেখিলেই আনন্দ হয়। সেই রাস্তা দিয়া আমরা ছাউনি অতিক্রম করিয়া সহরে পেট্রলের চেষ্টায় চলিলাম। চালকের একটা দোস্ত মিলিল এবং পেট্রলও মিলিল। দোস্তজী বলিলেন আজ এইস্থানে থাকাই কর্ত্তব্য, কারণ অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে "হাসান আবদাল্" অতিক্রম করিয়া পিণ্ডির বড় রাস্তা না ধরিতে পারিলে বিপদের সম্ভাবনা। বিশেষত কিছু দূরে "হারো" নদীতে জলবৃদ্ধি হইয়া তাহা পার হইবার উপায় নাই। বলা বাহুল্য এ অঞ্চলের অধিকাংশ নদীতেই পুল নাই, তবে জলও বিশেষ থাকে না। কদাচিৎ যখন পাহাড়ের বরফ গলিয়া জল বাড়িয়া উঠে তখন তাহা পার হইবার উপায় থাকে না। চালক আমায় মত জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম "চল যতদূর যাওয়া যায়। না হয় রাস্তাতেই এক রাত্রি কাটাইয়া দেওয়া যাইবে।" চালক পাঞ্জাবী যুবক, সে বাঙ্গালীর সাহসের নিকট নতমস্তক হইতে প্রস্তুত হইল না। তৎক্ষণাৎ মোটর চালাইয়া দিল।

সুন্দর সরল রাস্তা দিয়া আমরা চলিতেছি। পাহাড় দূরে সরিয়া গিয়াছে। পথের ধারে অনেকগুলি বালক বালিকা দেখিলাম—সকলেই অতিশয় সুশ্রী। একটা শুষ্কগর্ভ নদী পার হইয়া আর খানিকটা গিয়াই আবার সেইরূপ নদী পার হইলাম। একখানি সাইন বোর্ডে লেখা রহিয়াছে "To Hasan Abdal" সেই রাস্তা ধরিলাম। বাম দিকে একটি রেল ষ্টেশন। একটু যাইতেই দেখি আমাদের বামদিকে অনতিদূরে রেল রাস্তা আমাদের রাস্তার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। আর একটু যাইতেই দেখি একখানা ট্রেণ পিছনদিক হইতে আসিয়া আমাদের গাড়ী ধরিয়া ফেলিল। আমার মাথায় একটা মতলব উপস্থিত হইল—এই ট্রেণের সহিত 'রেস' দিতে হইবে! চালককে বলিতেই সে সম্মত হইল। ট্রেণ ততক্ষণ আমাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। চালক 'অ্যাক্সিলারেটর' চাপিয়া ধরিতেই সেই ডজ-কার লাফাইয়া উঠিল। ৩০ হইতে ৩৫ মাইল বেগে চলিয়াও আমরা ট্রেণকে ধরিতে পারিলাম না। আরও একটু বেগ বাড়াইয়া, আমরা ট্রেণ ছাড়াইয়া চলিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মুখে একটী শুষ্কগর্ভ নদীর জন্য আমাদের দেরী হইয়া গেল, ট্রেণও Hirpur ষ্টেশনে থামিয়া গেল। সুতরাং হার জিত স্থির হইল না। 'হিরপুর' ক্ষুদ্র সহর স্বভাবসুন্দর। আমরা হিরপুর ছাড়াইতে ট্রেণও ছাড়িয়া দিল এবং উভয়ে আবার পাশাপাশি চলিতে লাগিলাম। বোধ হয় ট্রেণের চালকও ক্ষেপিয়া উঠিল। আমাদের সম্মুখে সুন্দর সরল রাস্তা ছিল। আমি চালককে বলিলাম "জিতিতেই হইবে।" এই বার ট্রেণের প্যাসেঞ্জারগণও এই আমোদে যোগ দিল। আমাদের গাড়ী ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে চলিয়াও এঞ্জিন ছাড়াইতে পারিতেছে না। আমরা বেগ বাড়াইয়া ৪১, ৪২, ৪৩ করিয়াও সুবিধা করিতে পারিলামনা। অবশেষে ৪৫ মাইল বেগে চলিয়া ট্রেণকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় আমরা রুমাল উড়াইয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহা আনন্দ অনুভব করিলাম। একটু পরেই ট্রেণের রাস্তা বামদিকে বেঁকিয়া যাওয়ায় আমাদের বিজয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আর সম্ভাবনা রহিল না। আমরাও আবার ৩০ মাইলের বেগে চলিতে লাগিলাম। মনে মনে কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে "হারো" অতিক্রম করিতে না পারিলে কি হইবে। হয়তো ২।৩ দিন তাহার তীরে বসিয়া থাকিতে হইবে।

আর একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। বাম দিকে দূরে প্রাচীন "তক্ষশিলা" নগরের ভগ্নাবশেষ দেখা যাইতেছে। ৪-৩০টায় একটী নদীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। নদীতে বেশ স্রোত ছিল। পার হইয়া, "হারো" পার হইলাম ভাবিয়া আনন্দে জলযোগ করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম এ 'হারো' নয়। মনটা দমিয়া গেল। আর কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম।

প্রায় ৫টায় আমরা বাস্তবিকই "হারোর" সম্মুখীন

হইলাম। প্রবল স্রোত! তাহা পার হইবার কোন উপায়ই দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। একটু দূরে একদল বালক দাঁড়াইয়া আমাদের দুর্গতি দেখিয়া হাসিতেছিল। চালক তাহাদের নিকট গিয়া কথা বলিতেই তাহাদের দলপতি বলিল যে পয়সা পাইলে তাহারা নদী পার হইবার রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারে। তৎক্ষণাৎ আমরা স্বীকৃত হইলাম। 'ঘ' বাবুর স্ত্রী ব্যতীত আর আমরা সকলেই নামিয়া চলিলাম। বালকেরা কেহ আগে কেহ পেছনে কেহ পার্শ্বে চলিতে লাগিল এবং চালক তাহাদের নির্দ্দেশ মত গাড়ী চালাইতে লাগিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অল্প জল দেখিয়া প্রায় আধ ঘণ্টার অতি কষ্টে আমরা 'হারো' উত্তীর্ণ হইলাম। বকসিস পাইয়া বালকেরা আনন্দ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। আমরাও পুনরায় গাড়ী চালাইয়া দিলাম।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বাম দিকে দূরে উন্নত খিসেণ্ট পাহাড় দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যা হইতে হইতে আমরা "হাসান আবদালে" পৌছিলাম। এখানে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় গম্ভীর।

আমরা পিণ্ডির রাস্তা ধরিয়া প্রবল বেগে মোটর ছুটাইয়া দিলাম। আমি চালকের পাশে বসিয়াছিলাম, পরে যেন গরম বোধ হইতে লাগিল। পায়ের দিকে তাকাইয়া দেখি যে ক্রমাগত বেগে চালাইয়া মোটরের এঞ্জিন আগুনের মত হইয়া উঠিয়াছে। চালককে দেখাইতেই সে আস্তে চালাইয়া অবশেষে গাড়ী থামাইয়া দিল। প্রায় আধঘণ্টা সেই খানে অপেক্ষা করিয়া এঞ্জিন অপেক্ষাকৃত শীতল করিয়া লওয়া হইল। তাহার পর আর এক বিপদ— এঞ্জিন আর কিছুতেই ষ্টার্ট করে না। প্রায় ১০মিনিট চেষ্টায় গাড়ী চলিল, কিন্তু তাহাও অতিশয় ধীরে। এইরূপ ভাবে প্রায় এক মাইল চলিতে এঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। আর দুই মাইল গিয়া আমরা ৬টায় সময় রাওলপিণ্ডি কালীবাড়ী পৌছিয়া, সে দিন সেই স্থানে রাত্রি যাপন করা স্থির করিলাম।

(সমাপ্ত)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

ঝড়ের দোলা

তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে ঝড়ো হাওয়া দোদুল দোল্
মেঘের জটা ছাইচে আকাশ—ডুডুম্ ডুডুম্ ডমরু বোল্।
বিজলী খেলে চোখের কোণে ইন্দ্ররাজের বজ্রবাণ—
পাগ্‌লা কবির শনন্ শনন্ উদাস করা ভয়াল গান।
উল্কা ছোটে দিগ্ বিদিকে—ওড়না খসা চুম্‌কী ওই
বিশ্ব ঘরের প্রদীপ নেবা—আঁধারে কি মিল্‌বে থই?
লক্ষ ফণা গর্জ্জে ওঠে সাগর পারের অগ্রদূত
গরল ঢালা অনল শিখা—কোন্‌বা মুনির মন্ত্রপূত্?
বক্রপথের পথিক নিঝর হিমাচলের স্নেহের দান
রুদ্র তেজে প্রলয় গড়ি' ঝড়ের দোলায় গাইচে গান।
শ্মশানেতে আপন ভুলি ভুগ্‌ছে মহেশ বিষাণ রোল্—
তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে ঝড়ো হাওয়া দোদুল দোল্।

ধ্বংস করো ধ্বংস করো ভেঙে' আজি আকাশ খান্
সৃষ্টি আজি লুপ্ত হবে—ছুটবে জোরে রুধির বান্।
অঝোর কাঁদে বাদ্‌লা নিশা মান ভরা তার পাগলা বুক
গভীর হয়ে বেদন বাজে প্রলয় রাতের আলগ দুখ্।
ঝল্‌সে মরে আগুন ছোঁয়ায় বিশ্বরাজের সৃষ্টিথান
ওই যে শিঙা ফুকরে ওঠে—শিউরে কাঁপে গোরস্থান।
প্রলয় মাতন মাত্‌ল আজি মহাপায়ের বজ্র বাত,
দৈত্য দানার ভয়াল হাতে টুট্‌লো মায়ের বুকের পাত।
কাল বশেখীর আঁচল আড়ে অস্তাচলের বেদন শ্বাস্
বজ্র চোখের ঝিলিক মারা দিঠির দাহে সৃষ্টি নাশ।
আকাশ ছাওয়া গরল ধোঁয়ায় মড়ক্ লাগা কাঁদন রোল্
তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে ঝড়ো হাওয়া দোদুল্ দোল্।

বন্দে আলী মিয়া।

নগবালা

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতে বাধা

জ্যোতিঃপ্রকাশ কক্ষপ্রবিষ্টা লজ্জাবনতা জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে পাপনয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার মুগ্ধ নেত্র যুবতীর লজ্জারক্ত কপোলের মধুরতা যেন পান করিয়া আরক্ত হইয়া উঠিল।

তদ্দর্শনে জ্যোতির্ম্ময়ী যেন আরও ব্রীড়াবনতা হইয়া আনত মুখে কক্ষকুট্টিমে বিস্তৃত কার্পেটের উপর তাহার সূক্ষ্মাগ্র পাদুকার অগ্রভাগ ঘর্ষিত করিতে লাগিল। তাহার পরিধানের রৌপ্রাভ বসনেও যেন তাহার হৃদয়-নিহিত ব্রীড়া তরঙ্গিত হইয়া উঠিল; তাহার তাম্বুল রাগরক্ত অধরে লজ্জা যেন ক্রীড়া করিতে লাগিল; তাহার ললাটের উপর পতিত চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছে লজ্জা যেন ঝুলিতে লাগিল।

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, যে অবিবাহিতা যুবতী সে দিন প্রকাশ্য উদ্যানে বহুলোক সমারোহমধ্যে কৃষ্ণকমলকে প্রেম প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, মধুর প্রেম কথায় তুষ্ট করিয়াছিল; সে আজ জ্যোতিঃপ্রকাশের নিকট এই বাক্যহীন লজ্জা কোথা হইতে আমদানি করিল? ইহা কি সত্যই যুবকের মুগ্ধ দৃষ্টিতলে যুবতীর যৌবনসুলভ সহজ সঙ্কোচ? আমাদের সন্দিগ্ধ মন; আমরা সন্দেহ করি, এই লজ্জা, লজ্জা নহে, লজ্জার অভিনয় মাত্র। এই অভিনয়ে জ্যোতিঃপ্রকাশের ন্যায়, মাতাঠাকুরাণীও প্রবঞ্চিতা হইয়াছিলেন।

তিনি কন্যাকে ব্রীড়াম্রিয়মাণা, বিনম্রা ও স্তম্ভিতা দেখিয়া মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন; এবং প্রীত নেত্রে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "লজ্জা কি? যা' বলতে যাচ্ছিলে তা এঁর সমুখেই বল না। জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবুকে পর মনে কোর না। এঁর সঙ্গে ত কালকেই আমাদের আলাপ হয়েছে? বড় সজ্জন লোক, এঁর কাছে কোনও লজ্জা কোর না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ত্রাসিতা কুরঙ্গীর ন্যায়, ভূতভয়ভীত শিশুর ন্যায়, বিস্ফারিত নয়নে, সভয় কটাক্ষে আগন্তুককে ক্ষণেকের জন্য নিরীক্ষণ করিল, মৃদু হাসিতে তাহার তাম্বুল-রঞ্জিত অধর রঞ্জিত করিল; তাহার পর, ধীরে ধীরে একটি কুঞ্চিকাগুচ্ছ মাতার পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর রক্ষা করিয়া, স্মেরমুখে আবার একটু হাসি আনিয়া, সঙ্গীতধ্বনি নিন্দিত স্বরে কহিল, "তোমার চাবির থোলটা, মা, তুমি গোসল কামরায় মুখধোয়ার টেবিলের উপর ফেলে এসেছিলে। আমি দেখতে পেয়ে তোমাকে দিতে এসেছি; এই নাও। এবার থেকে তুমি একটু সাবধান হয়ো, বাপু। ঐ চাবিগুলো যে যে বাক্সের তাতেই তোমার সব আছে। আর কখনও যেখানে সেখানে ওগুলো ফেলে রেখ না।"

সঙ্গীতধ্বনি নিন্দিত কন্যার এই উপদেশ বাণী শুনিয়া মাতা বলিলেন, "আমার, বাছা, ঐ একটা দোষ আছে;—আমি আপনার জিনিষ কখনও সাবধান করে' রাখতে পারিনে। কাল রুমাল খানা যদি জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু কুড়িয়ে না পেতেন, তাহলে ওখানা হারিয়ে যেত। আর আজ চাবিগুলো যদি তুমি না পেয়ে, অন্য কেউ পেত তাহলে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। এই জীবনে ঐ অসাবধানতার জন্যে, কতবার যে কত জিনিষ হারিয়েছি, তা বলতে পারিনে। তোমার বাবা যখন জীবিত ছিলেন, তখন এর জন্যে কত রাগ করতেন, তবুও আমি এ দোষটা কখনও সংশোধন করতে পারিনি।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ মাতাঠাকুরাণীর এই বাক্যের মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক উদার স্বভাবের এবং পতিপরায়ণতার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইল।—আহা, কি উদার স্বভাব! স্বার্থপরের ন্যায় নিজের দ্রব্যে সাতটা গেরো দিতে জানেন

না ; মূল্যবান জিনিষের জন্তও কখন সাবধান হ'ন নাই :—মাতা যদি পুরুষ হইতেন জ্যোতিঃপ্রকাশ, তাঁহার সহিত সদা নির্ম্মুক্ত কচ্ছ, বোতাম-হীন জামায় উলঙ্গ কণ্ঠ, মানুষের তুলনা করিত ! কিন্তু সেই তুলনা করিতে না পারিয়া, সে তাহাকে স্বামীক্রোধলাঞ্ছিতা, তথাপি স্বামী-সোহাগিনী সাধ্বী মনে করিল।

কিন্তু যে বাক্যে জ্যোতিঃপ্রকাশ মোহিত হইয়াছিল, জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার অনুরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেই বাক্যের মধ্যে আপন গর্ভধারিণীর চতুরতার সন্ধান পাইয়া মনে মনে হাসিয়াছিল।

মাতা কিয়ৎকাল তুষ্ণীভাবাপন্না থাকিয়া, দণ্ডায়মানা কন্তার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "তুমি এখানে একটু বসবে না ? বসো না একটু।"

জ্যোতির্ম্ময়ী, সুবাধ্য কন্তার মত, মাতার আদেশ মু-যায়ী, মাতার নিকটবর্ত্তী একখানি আসনে উপ-বেশন করিল ;—যেন গোলাপদল গঠিতা, অজানিতদেশ-সম্ভবা, কোনও দেবী সূর্য্যের আলোক পরিধান করিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশের মনোমোহন করিবার জন্ত, আপনার উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হইল। শ্বেতবসনা জননীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হওয়ায়, তাহা অত্যন্ত সুসঙ্গত দেখাইতেছিল ; মনে হইতেছিল, যেন শারদগগনে শ্বেত নীরদের পার্শ্বে পূর্ণিমার শশধরের কনককিরণমালা খেলা করিতেছে। তাহার তাম্বুলরাগরক্ত, সরস ও পরিপুষ্ট অধরোষ্ঠে যেন চুম্বনলালসা ক্রীড়া করিতেছিল ; তাহার ফরাসী দেশীয় রুজ (rouge) রঞ্জিত নিটোল কপোলে, প্রেমপিপাসা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার শ্বেত কমলদল গঠিত শ্বেত কণ্ঠ পুষ্পপরাগতুল্য পাউডারে চর্চ্চিত হইয়া যেন প্রেমালিঙ্গনকে আহ্বান করিতেছিল ; তাহার যৌবনান্দোলিত বরদেহ রৌদ্রাভ বসনে আবৃত থাকায় যেন রৌদ্রপ্রতিফলিত তরঙ্গের ন্তায় অনুমিত হইতেছিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রেম ও পাপমুগ্ধ নয়নে যুবতীর এই রূপতরঙ্গে সাঁতার দিল, তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

চিত্তবিভ্রমপ্রাপ্ত জ্যোতিঃপ্রকাশকে মুগ্ধনেত্রে কন্তার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে দেখিয়া শুভ্রবেশধারিণী মাতাঠাকু-রাণী প্রীতা হইলেন ; এবং তাহাকে সুমিষ্টস্বরে কহিলেন, "আমি মেয়ের এখনও বিয়ে দিইনি, জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু।—এই সবে মাত্র সতের বছর বয়স। ম্যাট্রিকুলেশান ফার্ষ্ট ডিবিজানে পাশ হয়ে, স্কলারসিপ্ নিয়ে কলেজে ঢুকেছে। তবে এই বছরেই বিয়ে দেব মনে করেছি ;—আমরা সেকালের লোক, আমরা মেয়েদের বেশী লেখাপড়ার পক্ষপাতী নই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলিল,—"আর মেয়েদের বেশী পড়বারই দরকার কি ? সুশিক্ষিতা হ'বার জন্তে যতটুকু আবশুক, আপনার মেয়ে ত তা শিখেছেন।"

মাতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আর বেশী শেখাতে হ'লে, বিয়ে থাওয়া করে ঘর সংসার করা চলে না। আর, আমি শুধু লেখাপড়া শিখিয়েই ক্ষান্ত হইনি। সঙ্গীত বিগ্যাতেও আমাদের জ্যোতি বিলক্ষণ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে।"

মাতার কথা শুনিতে শুনিতে জ্যোতিঃপ্রকাশ স্বাভাবিক বাক্যশক্তি লাভ করিল ; বুঝি মাতার বাক্যের মধুরতায় তাহার কণ্ঠ সরস ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সে উৎসাহের সহিত কহিল, "বোধ হয়, আমিও সুখ্যাতি করবার অবসর পাব।"

ঈষৎ হাস্তে জ্যোতির্ম্ময়ীর অধরোষ্ঠ ঈষৎ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল।

মাতা কহিলেন, "তুমি ওর গান শুন্‌লে অবশুই সুখ্যাতি করবে। আর তুমি অনুরোধ করলে, বোধ হয়, জ্যোতি তোমাকে তার স্বরচিত একটা গান শোনাবে।"

'তোমাকে' কথাটা মাতা যে একটু জোর দিয়া বলিয়া-ছিলেন, তাহা জ্যোতিঃপ্রকাশ ও জ্যোতির্ম্ময়ী উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিল। লক্ষ্য করিয়া, একটা বিশেষ আনন্দে জ্যোতিঃপ্রকাশের হৃদয় নাচিয়া উঠিল ; এবং জ্যোতির্ম্ময়ী এবার সত্যই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ সেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া লজ্জারক্তা জ্যোতির্ম্ময়ীকে অনুরোধ করিল, "আপনি কি সেই সৌভাগ্য হ'তে আমাদিগকে বঞ্চিত করবেন ?"

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর লজ্জারঞ্জিত মুখ হইতে সহসা সঙ্গীত বাহির হইল না। সে অবনতমুখে জ্যোতিঃপ্রকাশকে কেবল কহিল, "মা যেমন! আমি কিছু গান গাইতে পারিনে। আমাকে কেবল ভদ্রলোকের কাছে অপ্রস্তুত করা! আর আমার নিজের রচিত গান মোটেই ভাল হয়না; তা শুনলে, আপনি মনে মনে কত হাস্‌বেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ, প্রকৃত প্রেমমন্ত্রের সাধকের ন্যায় কহিল, "আপনার কথাই কত মিষ্টি; না জানি, ঐ কণ্ঠের গান আরও কত মিষ্টি হ'বে। আপনার সে গান যদি নিজের রচিত গান হয়, নিজের অন্তরের ভাব যদি গানের ভাষায় প্রকাশ হয়, তাহলে সে মিষ্টতার এ পৃথিবীতে তুলনা থাকবে না।"

প্রেমিকের এই সুখ্যাতিতে প্রেমিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় প্রফুল্ল হইয়াছিল। তাহার প্রফুল্ল নয়ন দেখিয়া মাতা তাহার প্রফুল্ল হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি কন্যার এই প্রফুল্ল ভাবে বিশেষ প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, "তুমি যে কথা বলছ, জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু, তা' খুব ঠিক। পরের রচিত গান খুব ভাল হ'লেও, তা' গাইবার সময়, আমরা সকল সময় তা'র ভাব গ্রহণ করতে পারিনে বলে, তা' আমরা প্রাণের সঙ্গে গাইতে পারিনে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কহিল, "তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনার নিজের রচিত একটি গান আজ আমাদের শুনিয়ে দিন।"

মাতা কহিলেন, "জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু আজ আমাদের অতিথি। অতিথির অনুরোধ অবহেলা করতে নেই। লজ্জা কি? গাও। বুঝেছেন, জ্যোতি বাবু, আমাদের জ্যোতির লজ্জাটা কিছু বেশী।"

বলা বাহুল্য, অবশেষে এ লজ্জা দূর হইল, মাতা ও জ্যোতিঃপ্রকাশের সমবেত সাধনা সফল হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী আপন লজ্জানত আনন ঈষৎ হাস্যরসে সিঞ্চিত করিয়া, কক্ষস্থিত ক্ষুদ্র পিয়ানোর নিকট যাইয়া, চর্ম্মমণ্ডিত চক্রাকার আসনে উপবেশন করিল। তাহার সুশিক্ষিত হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালনে সুর সরল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কিন্তু, পর মুহূর্ত্তেই তাহা সহসা থামিয়া গেল।

দুষ্ট বিধাতার ইচ্ছায় কিংবা জ্যোতিঃপ্রকাশের মন্দ অদৃষ্টের ফলে, ঠিক সেই সময়, কক্ষদ্বার অন্ধকার করিয়া এক পুরুষ মূর্ত্তি দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীর ফুটোন্মুখ মুখে গান আর বাহির হইল না;' মাতা তাঁহার প্রসন্ন ললাটতল কুঞ্চিত করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মুখরোচক পিতৃনিন্দা।

জ্যোতিঃপ্রকাশ দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর সঙ্গীতোচ্ছ্বাস সহসা বন্ধ হওয়ায়, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর মুখমণ্ডলের প্রসন্নশ্রী অপগত হওয়ায়, অধিকন্তু দ্বার পথ অবরোধ হেতু কক্ষাভ্যন্তর কিছু অন্ধকার হওয়ায়, সে কোনও অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের আগমন অনুমান করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল। দেখিয়াই সে আগন্তুক ব্যক্তিকে চিনিল; সে অন্য কেহ নয়, তাহারই নবার্জ্জিত বন্ধু কৃষ্ণকমল রায়।

জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে কৃষ্ণকমলের অবারিত দ্বার। জ্যোতির্ম্ময়ীর মাতা কৃষ্ণকমলের আগমন কখনই পছন্দ করিতেন না। তথাপি সে আসিত; যখন ইচ্ছা, তখনই আসিত; হাসিত; ইংরাজি মিশ্রিত ভাষায় গল্প করিত; বসিয়া থাকিত; ক্ষুধা পাইলে, চাহিয়া জলযোগ করিত; এবং প্রয়োজন হইলে, অর্থ চাহিয়া লইত। মাতা তাহাকে কোনও প্রকার বাধা প্রদান করিতেন না; বাধা প্রদান করিতে পারিতেন না; বুঝি, বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কেন তাঁহার এই ক্ষমতার অভাব হইয়াছিল, আমরা তাহা পরে বুঝিব।

কৃষ্ণকমল জ্যোতিঃপ্রকাশকে কক্ষমধ্যে অবস্থিত দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। ভাবিল, অজ্ঞাতসারে ইহার সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীদের আলাপ হইল কিরূপে? এ আলাপ কত দিনের? এ আলাপ কতটা প্রগাঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? ইহার সহিত পরিচয় হইয়া এবং ইহার গুণগ্রাম লক্ষ্য করিয়াই কি, জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত তাহার বিবাহ দিতে মাতা স্বীকৃতা হন নাই? কিন্তু তাহার হাতে যে অমোঘ মৃত্যুবাণ সংগৃহীত আছে, তাহা প্রয়োগ করিলে, কোনও

অরণ্যে ভ্রাতৃযুগল

(ভাস্কর John Bell কর্ত্তৃক খোদিত The Children in the Wood)

কুলশীলসম্পন্ন ভদ্রব্যক্তিই আর জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিতে রাজি হইবে না। তাহার উপর, জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে যথার্থ ভালবাসে; সে নিশ্চয়ই তাহাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না; ভগবানের কৃপায়, কিংবা তাহাদের চেষ্টায় মাতা ভবপারাবার পার হইলেই জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকেই বিবাহ করিবে। আর জ্যোতির্ম্ময়ী যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে বাধ্যই হয়, তবে তাহাকে অন্যের অঙ্কগতা দেখিলে তাহার ঈর্ষান্বিত হইবার কোনও কারণ ছিল না। সে ত জ্যোতির্ম্ময়ীকে একটুও ভালবাসিত না; জ্যোতির্ম্ময়ীর অর্থ হস্তগত করিবার জন্য, ভালবাসার অভিনয় দেখাইত মাত্র। জ্যোতির্ম্ময়ী যাহারই হউক, তাহাতে তাহার কিছু আসিয়া যায় না; জ্যোতির্ম্ময়ীর অর্থ তাহার হস্তগত হইলেই হইল। সত্য বটে তাহার অন্যের সহিত বিবাহ হইলে অর্থটা হস্তগত করিবার নূতন একটা বাধা উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে বীরপুরুষ, তাহার বুদ্ধি আছে, সে অনায়াসেই সকল বাধা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে। জ্যোতির্ম্ময়ীর অর্থ তাহার হস্তগত হইবেই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং জ্যোতিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইয়া কৃষ্ণকমল ক্ষণকাল মধ্যে মুখে আনন্দের হাসি মাখিয়া কহিল, "এই যে, my dear friend জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু! এখানে কোথা থেকে?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ জানিত, জ্যোতির্ম্ময়ী কৃষ্ণকমলের সম্বন্ধে ভগিনী হয়, এ জন্য তাহার হঠাৎ আবির্ভাবে সে কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না; তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "এঁদের সঙ্গে কাল বাগানে আলাপ হয়েছিল। এঁরা কৃপা করে আমাকে আসতে বলেছিলেন; তাই এসেছি।"

ইত্যবসরে কৃষ্ণকমল একটা আসন, আসনাধিকারীর মত, গ্রহণ করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল; এবং আবার আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, "বেশ বেশ! আসবেন বই কি। এটা আপনারই বাড়ী মনে করবেন।—Very glad to meet you ভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী বোধ হয় আপনাকে গান শোনাচ্ছিল। বেশ বেশ! চলুক গান। লজ্জা কি? জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু আমার bosom friend ওঁকে লজ্জা করবার কিছু আবশ্যক নেই। জানবেন জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু, আমার sister বলে বলছিনে কিন্তু বেশ গায়!—sweet like honey মধুর মত মিষ্টি।"

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী আর গাইল না। মলিন মুখ অবনত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত কৃষ্ণকমলের আলাপ আছে বুঝিয়া, মাতাঠাকুরাণী মনে করিলেন যে, কৃষ্ণকমলের নিকট হইতে জ্যোতিঃপ্রকাশের আরও তথ্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা হইবে। অতএব কৃষ্ণকমলের অতর্কিত আগমনে তাঁহার মুখমণ্ডলে যে অপ্রসন্ন ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া, প্রসন্নমুখে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?"

জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত তাহার বন্ধুত্ব কতটা প্রগাঢ়, তাহা জানাইবার জন্য কৃষ্ণকমল তাহার চিরাভ্যস্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। বন্ধুত্বের গভীরতা দেখাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না; এবং তাহার জন্য মিথ্যা কহিবারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকমল অনাবশ্যক মিথ্যাকথা কহিত, কহিতে ভালবাসিত। তাহার উপর, সে মনে করিয়াছিল যে, জ্যোতির্ম্ময়ীদের চেয়ে তাহার সহিত জ্যোতিঃপ্রকাশের অনেক বেশী আলাপ আছে, একথা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, জ্যোতির্ম্ময়ীদের গর্ব্বে বেশ একটু আঘাত দেওয়া হইবে; তাহাতে তাহার হৃদয়ে বেশ একটু আনন্দ সঞ্চারিত হইবে। অতএব সে বলিল, "ওঁকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। Very good boy! ম্যাট্রিকুলেশন ফার্ষ্ট ডিভিজনে পাশ করে কুড়িটাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। তার পর, দেখতে দেখতে আই-এস্‌সি, বি-এস্‌সি, পাশ করে স্কলারশিপ মেডেল ইত্যাদি পেয়েছিলেন। এখন এম, এ,-বি, এল পাশ করে, ইউনিভার্সিটিকে 'প্ল্যাণ্টেন শো' করে ঘরে বসে আছেন—আর গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসের চেষ্টায় আছেন।"

কৃষ্ণকমলের এ সকল সংবাদ মিথ্যা নয়। বাস্তবিক সে জ্যোতিঃপ্রকাশের বিদ্যার সংবাদ এইরূপই রমেশের নিকট শুনিয়াছিল।

মাতাঠাকুরাণী হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, জ্যোতিঃপ্রকাশ তাঁহার নিকট যেরূপ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা সকলই সত্য—কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তিনি আরও তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য, কৃষ্ণকমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখনও জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবুদের বাড়ীতে গিয়েছিলে ?"

তাহার বন্ধু কত বড় মস্ত লোক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, কৃষ্ণকমল কহিল, "তা আর যাইনি ? মস্ত বাড়ী! ওঁরা এই কলকাতার বনেদী লোক—aristocrat ওঁর—পিতা ষ্টীফেন কোম্পানীর বড়বাবু,—অনেক টাকা মাহিনা পান। কিন্তু বড় বজ্জাৎ,—one pice father mother,—fingerএর ফাঁক দিয়া water slip করে না।"

সুশিক্ষিত জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহার নূতন বন্ধুর—তাহার জ্যোতির্ম্ময়ীর—ভ্রাতার মিথ্যাগুলি এবং আপন জনকের নিন্দাগুলি অবাধে এবং অম্লান বদনে শ্রবণ এবং সহ্য করিল। তাহা শুনিয়া যেন একটা পরিতৃপ্তি লাভ করিল; মৃদু হাস্যে তাহার দন্তশ্রেণী বিকশিত হইয়া পড়িল; নয়নদ্বয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশের পিতা যে অর্থবান তাহা মাতাঠাকুরাণী জ্যোতিঃপ্রকাশের মূল্যবান সজ্জা দেখিয়াই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণকমলের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে সেই অনুমান সুদৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল। সে সজ্জা যে সবই সেই পাথরকোণার শ্বশুরালয় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার মাতাঠাকুরাণীর কোন উপায়ই ছিল না;—সে সংবাদ মিথ্যার ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন ছিল।

অতঃপর মাতা কৃষ্ণকমলকে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।—জ্যোতিঃপ্রকাশের সম্মুখে তাহার সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শোভনীয় বা ভদ্রজনোচিত হইত না। জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ সম্বন্ধেও তিনি কোন কথা উত্থাপন করিলেন না;—তাহা কৃষ্ণকমলের সাক্ষাতে সুবিধাজনক হইত না। অন্য কথা কহিয়া, তিনি সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সঙ্গীত বিদ্যায় আপন পারদর্শিতা দেখাইবার অবসর না হওয়ায় এবং কৃষ্ণকমলের অতর্কিত আগমনে জ্যোতির্ম্ময়ীর কণ্ঠরোধ হওয়ায়, সে কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। যাইবার সময় মাতা তাহার কর্ণের নিকট মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিয়া দিলেন যে, অতিথিদের জন্য কিছু জলযোগের উদ্যোগ করিতে হইবে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর তিরোভাবে, জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রেমপূর্ণ হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকমল কিয়ৎকাল নীরস কথোপকথনের পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াল। জ্যোতিঃপ্রকাশও তাহার সহিত উঠিল।

দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "তোমরা যাচ্ছ যে! একটু জলখাবার না খেয়ে যাওয়া হ'বে না। কৃষ্ণকমল, তোমার বন্ধুকে বসাও; আমি এইখানেই জলখাবার নিয়ে আসতে বলি।"

কৃষ্ণকমল কি ভাবিয়া বলিল, "আজ আর জলখাবার খাব না। আজ এক বন্ধুর বাড়ী আমাদের দু'জনেরই জলখাবার নেমন্তন্ন আছে; আজ সেখানে না খেলে বড়ই rudeness হ'বে। আর একদিন জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবুকে নিয়ে এসে, তোমার নিজের তৈরী জলখাবার—সব home-made মিষ্টান্ন—কত delicious, তা taste করিয়ে নিয়ে যাব। আজ আমরা বিদায় হ'লাম ;—good bye!"

কৃষ্ণকমল, এই বলিয়া বন্ধুর বাহুধারণ করিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ অগত্যা মাতাঠাকুরাণীকে সসম্মান নমস্কার করিয়া, বন্ধুর আকর্ষণে বন্ধুর সহিত চলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রমেশের ঋণদান।

রাজপথে বাহির হইয়া, কৃষ্ণকমল পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বলিল, "Heavenly father! hallowed be thy name!—বাবা! এতক্ষণ কি সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারা যায় ? আমার suffocation হ'বার মত হ'য়েছিল।" এই বলিয়া, হস্তস্থিত কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্তে দিল; এবং অপর একটি বাহির করিয়

আপন কৃষ্ণবর্ণ অধরপুটে ধারণ করিল। পরে সিগারেটের কৌটাটি পকেটে রাখিয়া একটি সুদৃশ্য দেশেলায়ের বাক্স বাহির করিল; এবং একটিমাত্র শলাকা ঐ বাক্স হইতে বাহির করিয়া তাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া, দুই বন্ধুতে মিলিয়া, দুইটি বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

উভয়েরই চিন্তাস্রোত দুই বিভিন্ন পথে ছুটিল; একজন সিগারেটের ধূমের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রেমললিত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে লাগিল; আর একজন জ্যোতির্ম্ময়ীর অর্থের জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহা প্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। এইরূপে মৌন থাকিয়া দুই বন্ধু কতকটা পথ অতিবাহিত করিল।

পরে সিগারেট ফুরাইয়া আসিলে, জ্যোতিঃপ্রকাশের ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন দগ্ধ সিগারেটের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করিয়া সে কৃষ্ণকমলকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় নেমতন্নর কথা বলছিলেন? কৈ আমি ত কোন নেমতন্নর কথা জানিনে।"

কৃষ্ণকমল বলিল, "Old ladyর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্যে ওটা একটা fashionable falsehood —কিন্তু পয়সা খরচ করতে পারলে নেমন্তন্নর অভাব হবে না। চলুন না, সেদিনকার সেই হোটেলে যাওয়া যাক্।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ, হোটেলে যাওয়ার প্রস্তাবে কিছু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। ভাবিল, আজ হোটেলের ব্যয়টা তাহারই নির্ব্বাহ করা উচিত। সে কেমন অর্থবান লোকের পুত্র, তাহা আজ জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে কথাবার্ত্তার পর জ্যোতির্ম্ময়ীর ভ্রাতার নিকট, প্রমাণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল; তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে ভদ্রস্থতা থাকিবে না। কিন্তু অর্থ কোথায়? তাহার পকেটে ট্রামভাড়ার বা সিগারেট কিনিবার জন্য কয়েক আনা পয়সা মাত্র ছিল; তাহাতে ত হোটেলের ব্যয় কোনও মতে সংকুলান হইবে না। বাটী যাইতে পারিলে, তাহার কোন মিথ্যা বিপদের কথা তুলিয়া, সে তাহার বুদ্ধিহীনা মাতার নিকট হইতে, কোনও ক্রমে পাঁচ টাকা আনিতে পারিত। কিন্তু এখন বন্ধুবর সঙ্গে থাকিতে তাহার কোনও উপায় ছিল না; তাহার মত ধনীলোকের পুত্রের পকেট সর্ব্বদা অর্থপূর্ণ থাকিবে; সেই পকেটে কৃষ্ণকমল একবার অর্থের অসদ্ভাব দেখিয়াছে; আবার যদি অর্থহীনতার সন্ধান পায়, তবে সেটা বড়ই লজ্জাকর হইবে—হয়ত অতি লজ্জায় তাহাকে চিরকাল হেটমুণ্ড হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু এখন সেই লজ্জা হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও উপায় ছিলই না;—প্রতি পদক্ষেপে তাহারা সেই হোটেলের দিকেই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল। হায়! বিধাতা, তুমি কি তাহাকে এই নিদারুণ লজ্জার হাত হইতে রক্ষা করিবেন না?

বিধাতা লজ্জানিবারণ হইয়া, তাহাকে এই মহালজ্জা হইতে রক্ষা করিলেন।

ইহা কিরূপে সংঘটিত হইল, তাহা বলি শুন। যে রাস্তা দিয়া দুই বন্ধু মন্থর গমনে হোটেল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই রাস্তার ধারে একটা দোকানে বসিয়া রমেশ জামা কিনিতেছিল; সে যে সেই দিন সন্ধ্যাকালে পত্নীর পরামর্শ অনুযায়ী নিজের জামা কিনিতে বাহির হইয়াছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বে এক পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি।

এই সময়, লজ্জাভারে জ্যোতিঃপ্রকাশ কিছু মন্দগতি হইয়াছিল; এবং কৃষ্ণকমল জ্যোতির্ম্ময়ীর অর্থ প্রাপ্ত হইবার আশায় মুগ্ধ হইয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশের মন্দগতি লক্ষ্য না করিয়া কিছু দ্রুত চলিয়াছিল। কাযেই উভয় বন্ধুর মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল রমেশকে দোকান মধ্যে লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইল; কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহাকে লক্ষ্য করিল; এবং ভাবিল যখন সে দ্রব্য ক্রয়ের জন্য দোকানে আসিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার পকেটে কিছু অর্থ আছে; এবং চেষ্টা করিলে, রমেশের মত বোকা ও অশিক্ষিত লোকের নিকট হইতে তাহা, ঋণ স্বরূপ অনায়াসেই হস্তগত করিতে পারা যাইবে;—সুকৌশলে ব্যক্ত একটি চতুরা মিথ্যার দ্বারা তাহা সহজেই সুসিদ্ধ হইবে। এই ভাবিয়া সে একবার গমনশীল কৃষ্ণকমলের দিকে চাহিল; দেখিল যে, সে তাহাকে ছাড়িয়া অন্যমনস্কভাবে শ্রবণসীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তখন সে রমেশকে ডাকিল।

রমেশ বন্ধুর সে ডাক শুনিয়া হাসিমুখে দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, "আমি তোমাকেই একটু বিশেষ দরকারের জন্তে খুঁজছিলাম; কিন্তু বড়ীতে তোমার দেখা পেলাম না। তার পর তুমি এই পথে এসেছ জান্‌তে পেরে, তোমাকে খুঁজতে বার হয়েছি।"

রমেশ পূর্ব্ববৎ হাসিমুখে বলিল, "কি এমন দরকার যে এতটা আমার পেছু পেছু ছুটে এসেছ! তুমি ত জান যে, সন্ধ্যার পর আমি বাড়ীতেই থাকি। একটু অপেক্ষা করলে আমাকে বাড়ীতেই পেতে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, "তা ত জানি। কিন্তু দরকারটা বড়ই বেশী; তাই, তোমার পেছু নিতে হয়েছে।"

রমেশ সস্মিত মুখে প্রশ্নপূর্ণ নয়নে জ্যোতিঃপ্রকাশের দিকে চাহিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ জানিত যে মাতৃভক্ত রমেশ মাতৃভক্তিটা সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে। অতএব সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "দরকারটা ঠিক আমার নয়; দরকারটা আমার মার। মাসকাবার হ'য়েছে, তাঁর হাতে একটিও টাকা নেই। অথচ এখনই একজনকে দশ টাকা না দিলেই নয়। তাই তিনি তোমাকে খুঁজছিলেন। তুমি যদি দুদিনের জন্তে তাঁকে দশ টাকা ধার দিতে পার, তাহলে বড়ই ভাল হয়। পরশু বাবা মাহিনা পাবেন; আমি পরশু সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে টাকাটা তোমায় দিয়ে আসব এখন।"

রমেশের পিরাণ ক্রয় শেষ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পকেটে এখনও টাকা ছিল। মাতার কাপড় ও ঘি ময়দা ক্রয় জন্ম মালতী যে তাহাকে দশটা টাকা দিয়াছিল, তাহার কিছুই খরচ হয় নাই। রমেশ জ্যোতিঃপ্রকাশের মাতাকে চিনিত এবং বিশেষ ভক্তি করিত। সে মনে করিল, জ্যোতিঃপ্রকাশের মাতার যত আবশ্যক, আশ্চর্য্যের বিষয় ভগবান তাহার পকেটে ঠিক তত টাকাই মজুদ রাখিয়াছেন, সে যে দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্ম টাকাটা আনিয়াছিল, তাহা দুইদিন পরে ক্রয় করিলেও ক্ষতি হইবে না। কিন্তু ইহার দ্বারা যদি দুই দিনের জন্যও একজন মান্যা ভদ্রমহিলার কোন উপকার হয়, তাহা হইলে,তাহার জীবন সার্থক হইবে। ভগবান সেই উদ্দেশ্যেই ত তাহার পকেটে ঠিক সেই সময়, সেই দশ টাকাই মজুদ রাখিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পকেট হইতে দশ টাকা বাহির করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশকে বলিল, "এই নাও, তোমার মাকে দিও। আর, তাঁকে আমার প্রণাম জানিও।"

এত সহজে নগদ টাকা হস্তগত হইবে, তাহা জ্যোতিঃপ্রকাশ কল্পনা করিতে পারে নাই। সে ক্ষিপ্রহস্তে টাকা কয়টা গণিয়া পকেটে ফেলিল; এবং কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া, রমেশের সহিত আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, গর্ব্বিত বক্ষে, মহা আনন্দ-বেগে কৃষ্ণকমলের পশ্চাতে ছুটিল।

রমেশ তাহাকে ত্বরিত পদে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, মাতার কার্য্যোদ্ধারে তাহার অতিশয় আগ্রহ অনুমান করিয়া, আহ্লাদিত হইল; এবং প্রশংসমান নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সে, ঈষৎ দূরবর্ত্তী রাজপথের লোক সমারোহ মধ্যে অন্তর্হিত কৃষ্ণকমলকে দেখিল না।

আবশ্যকের সময়, রমেশ যে জ্যোতিঃপ্রকাশের মাতাকে ঋণস্বরূপ অর্থ সরবরাহ করিতে পারিয়াছে, এজন্য তাহার হৃদয়মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। এই আনন্দ লইয়া সে বাটী ফিরিল। এই আনন্দের সংবাদ সে গোপনে প্রেমময়ী অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীকে প্রদান করিয়া, তাহাকে আপন হৃদয়স্থিত প্রীতির অংশ দিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বদিবসের শ্রম এবং অনিদ্রার ক্লান্তিতে শরীর বড়ই খারাপ বোধ করিলাম। তদুপরি বেদনা জন্য পদদ্বয় আমার দেহভার বহন করিতে চাহিল না, সুতরাং সেদিন আর কোথাও গেলাম না, সমস্ত দ্বিপ্রহরটা কতক ঘুমাইয়া কতক গল্প করিয়া কখন বা তাস খেলিয়া কাটাইয়া দেওয়া গেল। অপরাহ্নে গাড়ী চড়িয়া বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলাম, এবং হোসেন সাগরের তীর সংলগ্ন দীর্ঘ রাজপথ দিয়া সেকেন্দ্রাবাদ পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। সে সময়ে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, হ্রদতটের দীপমালা প্রজ্বলিত হইয়াছে, সে যে কি অপূর্ব্ব শোভা তাহা না দেখিলে সম্যক্ ধারণা করা কঠিন।

সে দিবস নিশিবাবু ভ্রমণকালে আমাদের সঙ্গী হন নাই, আসিয়া দেখিলাম হোটেলের বৈঠকখানা ঘরে (Drawing room) বসিয়া আছেন। যথাকালে আহারের ঘণ্টা পড়িল, সকলে ভোজনান্তে কিছুক্ষণ তাস খেলিয়া যে যাহার কক্ষে নিদ্রার আয়োজনে মনোযোগী হওয়া গেল। আজিকার দিনের মত সে কালে 'ব্রিজ' খেলার ধুম ছিল না। দেশী খেলার মধ্যে 'গ্রাবু' এবং

হাতিয়ার বাজার—হায়দ্রাবাদ

হাতিয়ার বিক্রেতৃগণ—হায়দ্রাবাদ

চাপিয়া ধরিলে শুনিয়াছি লোকে বহু টাকা হারে এবং জিতে; আমরা কোন দিনই অধিক টাকা বাজি ধরি নাই; ঊর্দ্ধ সংখ্যা যুগ্ম মুদ্রা পর্য্যন্ত আমাদের দৌড় ছিল।

পরদিবস নিজাম বাহাদুরের ঘোড়ার আস্তাবল দেখিতে গেলাম। ইহা হায়দ্রাবাদ লান্সা-র্সের ঘোড়ার আস্তাবল নহে, নিজাম বাহাদুরের খাস ঘোড়ার আস্তাবল। জিন সওয়ারী এবং গাড়ীর জন্য বহুতর ঘোড়া দেখিলাম। পোলো খেলিবার পোনিও দেখিলাম অনেক রহিয়াছে। বিলাতী, অষ্ট্রেলিয়ান, আরবী, "দো আসলা" (অর্থাৎ Cross breed) পারসীক নানা প্রকারের ছোট বড় কত ঘোড়া যে দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। আস্তাবল ঘর এবং ঘোড়ার থাকিবার "থান" (stalls) এমন পরি পাটি করিয়া নির্ম্মিত এবং পরি-ষ্কার ভাবে রক্ষিত যে তাহা না দেখিলে লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করা কঠিন; আমি তৎ-পূর্ব্বে তাদৃশ ঘোড়ার আস্তাবল আর দেখি নাই; সেই প্রথম দেখিলাম এবং দেখিয়াই মনে হইল নিজাম সরকারে আসিয়া ইহাদের পশুজন্ম সার্থক হই-য়াছে। নিজাম বাহাদুরের খাস ব্যবহারী সোয়ারের ঘোড়া, ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া, পোলো খেলিবার ঘোড়া এবং নর্ত্তন-শীল শোভাযাত্রার ঘোড়াগুলির যত্ন আরও অধিক। আমি বরোদায়, উদয়পুরে, আলোয়ারে, পাতিয়ালায় এবং অপর

বিলাতী খেলার মধ্যে 'পোকর', 'লু' প্রভৃতি খেলা প্রচলিত ছিল। লু আমি ভাল খেলিতে জানিতাম না তবে পোকারে আমার বিদ্যা মন্দ ছিল না। পোকর আমাদের প্রেমারা'র মত খেলা। পোকর ও প্রেমারায় বাজি রাখিয়া খেলিলে খেলার আনন্দ সমধিক বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু খেলিতে নেশা
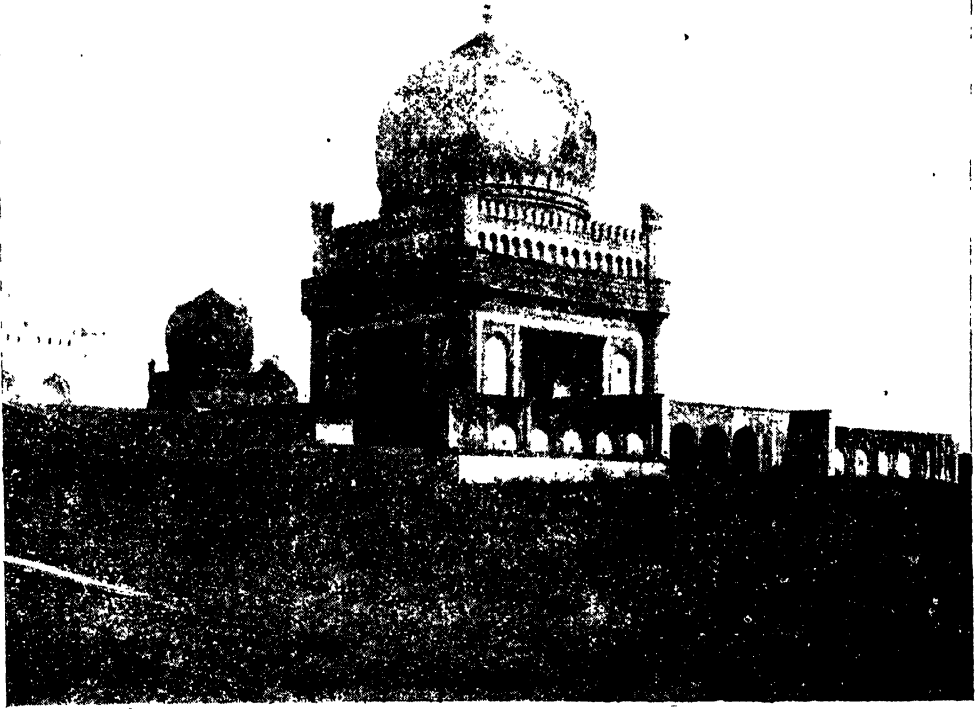
কুতুব শাহের সমাধি—হায়দ্রাবাদ

রাজধানীতেও এই নর্ত্তনশীল ঘোড়াকে শোভাযাত্রার সহিত নাচিতে নাচিতে যাইতে দেখিয়াছি। অভিরাম গ্রীবাভঙ্গীর সহিত চরণ চতুষ্টয়ে বদ্ধ নূপুরের শব্দ করিতে করিতে, কণ্ঠে শীর্ষে, নিতম্বে মণিময় আভরণ ধারণের গর্ব্বে যেন মত্ত হইয়া চলিয়াছে। অশ্বগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর ইহাদের শিক্ষাও তেমনি আশ্চর্য্য; কেবল উত্তর পশ্চিম, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, রাজপুতনা কিংবা পাঞ্জাবে নহে, আমার বাল্যকালে আমি বাঙ্গালা দেশের অভিজাত বংশোদ্ভব ধনী গৃহেও এইরূপ নৃত্যপর আরব অশ্ব শোভাযাত্রার সহিত নাচিতে নাচিতে যাইতে দেখিয়াছি। এই সকল অশ্বকে শিক্ষা দিবার জন্য "চাবুক সওয়ার" প্রায় প্রতি রাজধানীতেই বেতনভোগী হইয়া থাকিত এবং রাজকুমারগণকে অশ্বারোহণ করিবার সর্ব্বপ্রকার কৌশল শিক্ষা দিত। আজ সে হিন্দুস্থানী কায়দায় অশ্বারোহণ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, রাজকুমারগণও আজ অশ্বারোহণ ব্যায়ামে পরাঙ্মুখ। অশ্বের স্থান এখন মোটর গাড়ীতে অধিকার করিয়াছে। তবে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের মিত্ররাজ্যের নরপতিগণ বোধ করি অশ্বারোহণ বিদ্যা এখনও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া থাকেন। দেখিয়াছি কুচবিহারের লোকান্তরগত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ পোলো খেলায় বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন এবং পাতিয়ালা, আলোয়ার, যোধপুর, বিকানীর প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিগণ অদ্যাবধি পোলো খেলায় বিশেষ কৃতি। রাজপুতনা ও পাঞ্জাবের পোলো সম্প্রদায় (team) এসিয়া ও ইউরোপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইউরোপে প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়গণও ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে পারে না।

সে দিবস নিজাম বাহাদুরের অশ্বশালা এবং পুরাতন

প্রাসাদ দেখিয়া হোটেলে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। পরদিবস সহর দেখিতে বাহির হইলাম; সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে চার মিনার নামক বৃহৎ তোরণ পার হইয়া যাইতে হয়। এই তোরণ একটি দেখিবার সামগ্রী—দ্বারপথ সুবৃহৎ, ইহার চারি কোণে চারিটি বৃহৎ মিনার রহিয়াছে, সেই জন্যই ইহার নাম চারমিনার; শুনিয়াছি জন্য সমগ্র নগরী প্রাচীর বেষ্টিত করা হইত, নগর এবং দুর্গের চতুষ্পার্শে পরিখা খনন করিয়া তাহা সর্ব্বদা জলপূর্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত, সেই দিনেই সুবৃহৎ তোরণ নির্ম্মাণের প্রয়োজন ছিল, এবং সেই নগর-প্রবেশ-পথের দ্বার রজনীর প্রথম যামেই রুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল। সহর যাহা দেখিলাম তাহাতে অন্যান্য সহর অপেক্ষা ইহার
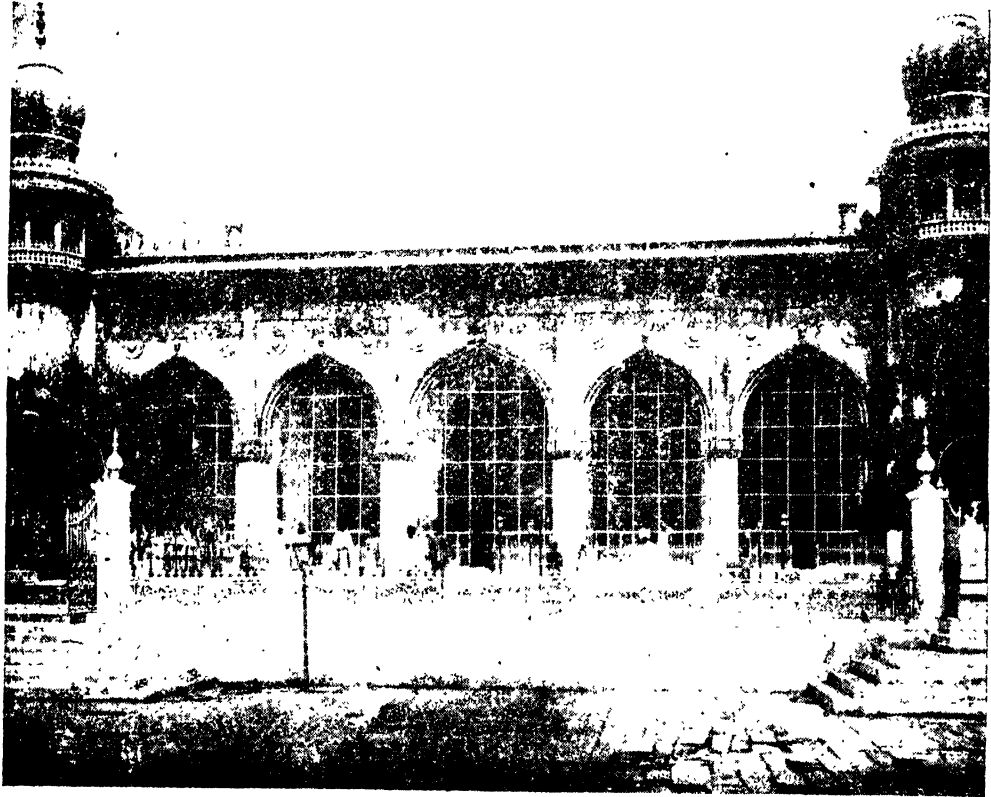
মক্কা মসজিদ—হায়দ্রাবাদ

এই তোরণ হায়দ্রাবাদ সহর পত্তনের সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। জানি না ইহা সত্য কিনা, তবে দেখিলে মনে হয় যে ইহা নিতান্ত আধুনিক নহে, কারণ অধুনাতন সময়ে তাদৃশ বৃহৎ তোরণ দ্বার নির্ম্মাণ করিবার অর্থব্যয়কে লোকে অপব্যয় মনে করিয়া থাকে। যে দিনে সর্ব্বদা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় লোকে সতত সশস্ত্র থাকিত, যে দিনে পুরবাসিগণকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কোন বৈশিষ্ট দেখিতে পাইলাম না; দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি মুসলমান সময়ের মহানগরীগুলি দেখিলে আজও মনে হয় যে ইহাদের গৌরবের দিনে ইহারা সৌন্দর্য্যে এবং সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় ছিল; ইহাদের শ্বেত মর্ম্মর ও লোহিত প্রস্তরের সৌধাবলী আজও জগতের অন্যত্র দুর্লভ। ফতেপুর সিক্রীর পরিত্যক্ত পুরী আজ একান্ত জনহীন, নহবতের বংশীরব আজ নীরব, নকীবের বোলবাণী আজ নিস্তব্ধ,

রেসিডেন্সী—হায়দ্রাবাদ

মক্ক মস্‌জিদের মিনার হইতে আজ আজানধ্বনি ঈশ্বর-পরায়ণ মস্‌লেমগণকে আর নামাজে আহ্বান করে না, দিল্লীশ্বর আকবরের সহস্র দীপোদ্ভাসিত সভাগৃহে ঐতিহাসিক আবুল ফজলের, কবি ফৈজীর, সুরসিক বীরবলের কণ্ঠস্বর আজ কেহ আর শুনিতে পায় না; বীরশ্রেষ্ঠ মানসিংহের কটিনিবদ্ধ অসির ঝনঝনা আজ শত্রুহৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করে না। তথাপি এই মহানিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী দণ্ডায়মান লোহিত পাষাণের প্রাচীন পুরী আজও তাহার চতুর্দ্দিকে কি মহিমাই বিস্তার করিতেছে!

হায়দ্রাবাদ সহরে প্রাচীন মহিমার তাদৃশ কোন নিদর্শন দেখিলাম না, অন্ততঃ আমার মনে সেরূপ ভাবের উদ্রেক হইল না। ফলুকনুমা প্রাসাদ সুন্দর বটে, বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে সত্য, মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত সন্দেহ নাই, ধরণীর যে কোন সম্রাট্ বা রাজা ঐ প্রাসাদে সুখে বাস করিতে পারেন তাহাও সত্য। কিন্তু মোগলের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট দেখিলে মানুষ যেমন হর্ষে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে অভিভূত, স্পন্দহীন ও নির্ব্বাক হইয়া যায়, হায়দ্রাবাদে তেমন কিছু দেখিতে পাইলাম না। সহরে ভ্রমণকালীন রাজপথে স্ত্রীলোক অত্যন্ত কম দেখিয়াছি, বোধ করি জীবন্ত মুসলমান রাজ্যের রাজধানী বলিয়া স্ত্রীলোকের আবরু পর্দ্দা সেখানে অধিক, সেই জন্য রাজপথের জনতার মধ্যে কৌতূহলী সহস্র চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই নারীবর্গ পথে বাহির হয় না; হইলেও ডোলাডুলি পাল্‌কী নাল্‌কীর অভ্যন্তরে শত আবরণে আবৃত হইয়া পথচারী পুরুষের অন্তরে ব্যর্থ কৌতূহল জাগাইয়া তোলে।

শুনিয়াছিলাম হায়দ্রাবাদ দরবারে বেতন ভোগী বহু সঙ্গীতভক্ত ওস্তাদ আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশে কাহারোই

সঙ্গীতাদি শুনিবার সুবিধা আমার হয় নাই, কারণ জানিলাম যে দরবারে বেতনভুক্ ওস্তাদগণ বিনা অনুমতিতে কাহাকেও সঙ্গীত শুনাইতে পারেন না। নিষেধাজ্ঞা সঙ্গত বলিয়াই মনে হইল, কারণ দরবারের গায়ক বাদকগণ যদি সকলকেই সর্ব্ব সময়ে কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে সঙ্গীত শুনায়, তাহা হইলে তক্তের গায়ক বলিয়া যে সম্মান উহারা চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, সে সম্মান আর লোকের নিকট পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। কাহার নিকট আবেদন সুলভ। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে কর্ণাটী রীতির সঙ্গীত বিস্তারই বিশেষ অনুশীলন হইয়া থাকে বলিয়া আমার ধারণা। দক্ষিণী রীতির কণ্ঠ সঙ্গীত বা যন্ত্র সঙ্গীত তৎপূর্ব্বে আমি শুনি নাই ; সেই জন্য বড় ইচ্ছা ছিল যে নিজাম দরবারের ওস্তাদগণের নিকট কর্ণাটী সঙ্গীত শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করিব, কিন্তু মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। সেবারে শুনিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু পরে মাদ্রাজে, মহীশূরে, বাঙ্গালোরে দক্ষিণী রীতির কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত অনেক শুনিয়াছি।
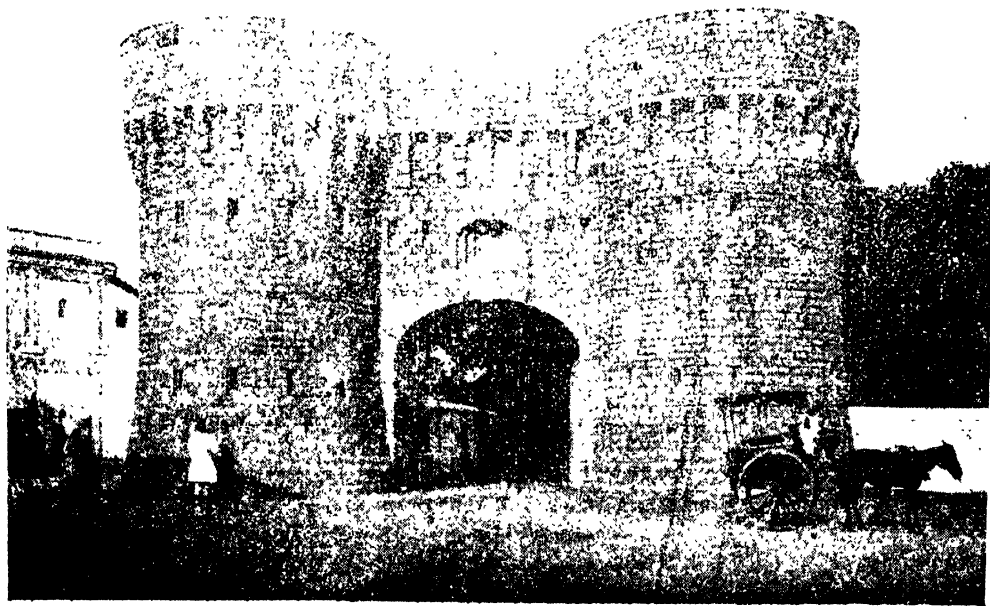
রেসিডেন্সির ফটক—হায়দ্রাবাদ

জানাইয়া, কবে কখন অনুমতি বাহির করিতে হইবে, সে সকল সন্ধান করাও কঠিন এবং হয়ত দরবারে একবার অনুমতি প্রার্থনা জানাইলে, সে অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিতে পারা যাইবে না, এই সকল নানা কথা ভাবিয়া আর সে চেষ্টা করি নাই। বাজারে পেশাদার ওস্তাদ যাহারা ছিল, তাহাদের গান শুনিতে ইচ্ছা হইল না, কারণ সেরূপ সাধারণ গায়ক বাদক সর্ব্বত্রই একবার আমাদের এই কলিকাতা সহরে মাদ্রাজ প্রদেশের একজন বীণকার আসিয়াছিল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে তাহার বীণা বাদন আমি প্রথমে শুনি, পরে আমাদের বাড়ীতেও দুই একবার তাহার বীণা শুনিয়াছিলাম। কি মিষ্ট তাহার হাত, কি তন্ময় হইয়াই সে বাজাইত, মনে হইত যে রাগিণীর আলাপ করিতেছে। তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপের মধ্যে যেন সে নিজকে

ডুবাইয়া দিয়াছে। প্রত্যেকটি মীড়ের টানে টানে যেন রাগিণীটি মূর্ত্তিমতী হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, বাদক মুদিত নেত্রে ধ্যানাবস্থিত তদ্গতচিত্ত হইয়া যেন সাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছে, শ্রোতৃবর্গের অস্তিত্ব তাহার মন হইতে যেন মুছিয়া গিয়াছে; আর তাহার হস্তস্থিত প্রাণহীন বীণাযন্ত্র খানি যেন সজীব হইয়া তাহার সহিত একত্রে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আহ্বান করিতেছে।

বীণার সহিত কণ্ঠ সঙ্গীতও শুনিয়াছি; তবে আমাদের কণ্ঠ সঙ্গীতের সহিত যন্ত্র শুনা অভ্যাস নাই, সেই জন্য ইহা তেমন ভাল বোধ হইল না। মনে হইল পরস্পরের সাহায্যে ভাল না হইয়া যেন উভয়েরই মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। স্ত্রীকণ্ঠের সহিত সারেঙ্গের রব শুনাই আমাদের অভ্যাস, অপর কিছু হইলেই যেন উহা অসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু দক্ষিণে বীণার সহিত গান গাহিবার পদ্ধতি প্রচলিত এবং সে দেশবাসিগণের নিকট উহা সমধিক

গোলকুণ্ডা—রাজগণের সমাধি

আদরের সামগ্রী। সেদেশে বীণার সহিত কখন কখনও নৃত্যও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা আমি দেখি নাই; সম্ভবতঃ উহা স্ত্রীজন-সাধ্য লাস্য হইবে, জানিনা উহার স্বরূপ কি—তবে তাণ্ডব না হওয়াই সম্ভব।
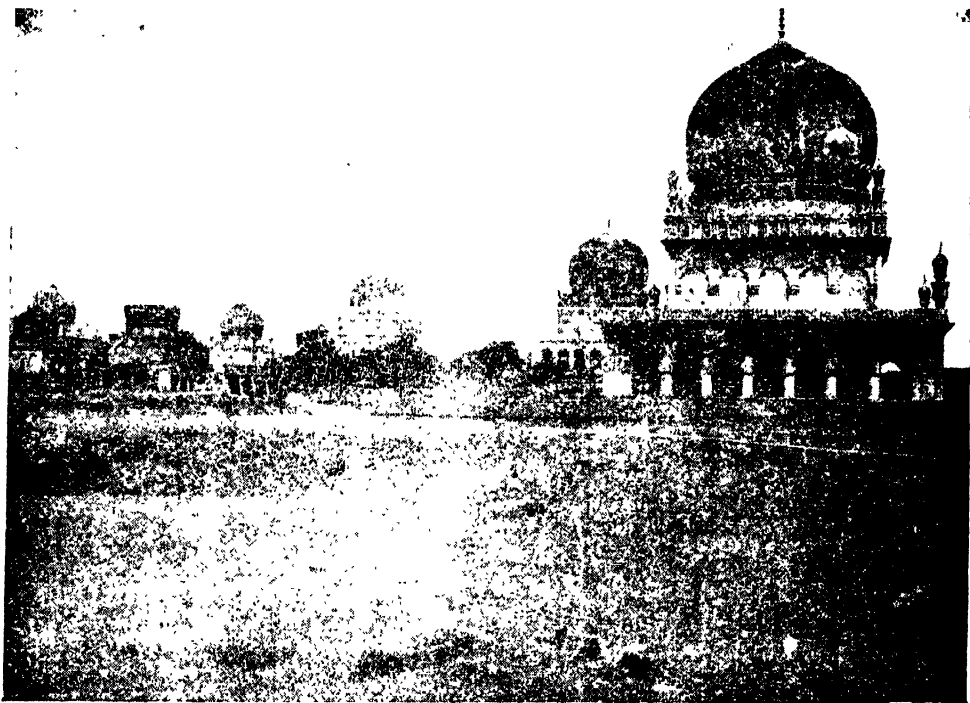
কর্ণাটী রীতির সকলগুলি রাগ রাগিণীর সহিত উত্তর ভারতের রাগ রাগিণীর মিল নাই। দক্ষিণী রীতিতে রাগ রাগিণীর রূপ বিভিন্ন, নামও বিভিন্ন, তবে কতকগুলি রাগিণীর মিল আছে যথ—ভৈরবী, বেহাগ প্রভৃতি। দক্ষিণী রীতিতে মিষ্ট রাগিণীর সংখ্যা প্রচুর; সেই সকল রাগ রাগিণী গাহিতে বা যন্ত্রে বাজাইতে আরম্ভ করিলে যেন শ্রোতার কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে থাকে, সত্য সত্যই সর্ব্ব শরীর যেন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। আমি মান্দ্রাজে

হায়দ্রাবাদে প্রায় পক্ষাধিক সময় থাকিতে হইল। সকলগুলি দ্রষ্টব্য পদার্থ দেখিবার পাস বাহির করিতে সময় লাগিল, সেই জন্যই বিলম্ব হইল, নতুবা সহর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলির দর্শনীয় বস্তু দেখিতে দীর্ঘ সময়

লাগিবার কথা নহে। বোম্বাই পুণা হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি সকল গুলি স্থানে অবস্থানের সময় সর্ব্ব সমেত প্রায় দুই মাস, এই সময়ের মধ্যেই সেক্রেটারি বাবু এবং ডাক্তার বাবু গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ম বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ফিরিবার পথে বরোদা আজমীর ও জয়পুর দেখিয়া দিল্লী হইয়া আসিবার কথা ছিল, তাহাতেও সময় লাগিবে। সেই জন্য সেক্রেটারী বাবু এবং ডাক্তার বাবু হায়দ্রাবাদ কাটিয়া গিয়াছিল, যাহাদের সৌজন্য ও বন্ধুবৎসলতা আমাদের হৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, যাহারা স্বদেশবাসী অপেক্ষা এই কৃষ্ণকায় প্রাণী কয়টিকে সমধিক আদর যত্ন ও আপ্যায়নে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। যাত্রাকালে হস্ত প্রসারণ করিয়া করমর্দ্দন সময়ে দেখিলাম বন্ধুবৎসলা বুদ্ধি গৃহিণীর নীল
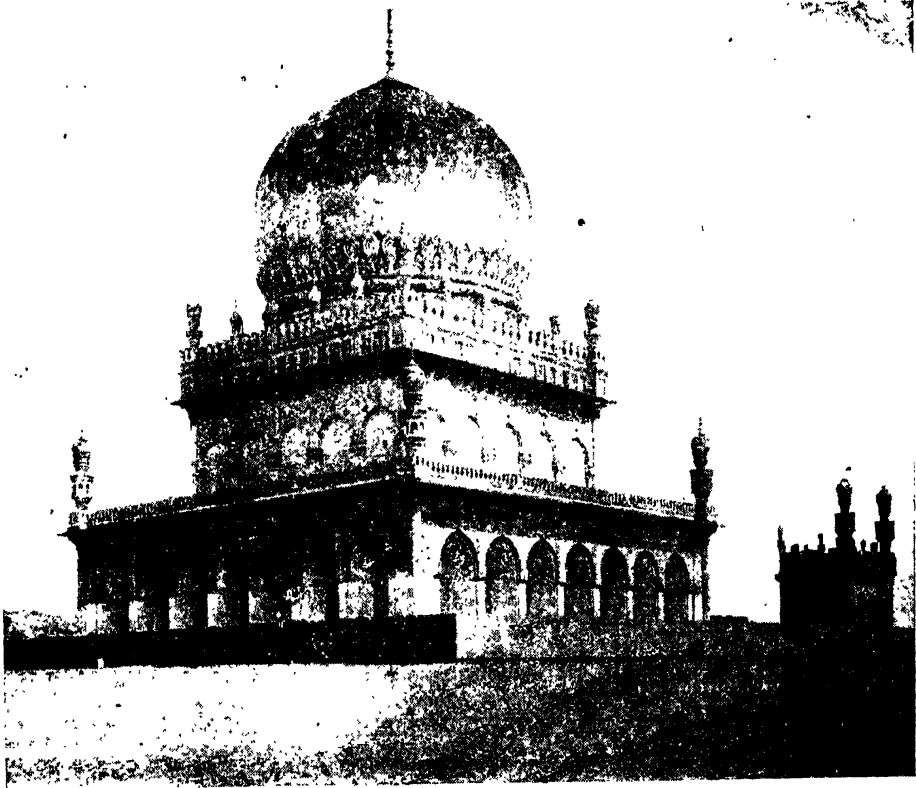
সুলতান আবদুল্লার সমাধি—হায়দ্রাবাদ

পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে ফিরিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। দেখিবারও আর বিশেষ কিছু বাকি ছিলনা, সেই জন্য আমি ও শশিশেখর কোন রূপ বাধা উপস্থিত করিলাম না, বিশেষতঃ নূতন স্থান দেখিবার উৎসাহে হায়দ্রাবাদে আর অধিক সময় নষ্ট করা সঙ্গত মনে হইল না। যে বুদ্ধি দম্পতীর আশ্রয়ে আনন্দে দিন নলিনাভ নেত্র-যুগল জলভারাক্রান্ত। "Au revoir" বলিবার সময়ে তাঁহার কণ্ঠস্বর অশ্রুবেগরুদ্ধ হইয়া অবশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িল! নারী হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় প্রাচী প্রতীচী নির্ব্বিশেষে পাওয়া যায়। যাহা ভাল তাহা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সকল অবস্থাতেই ভাল। যাহার সহিত কোন-রূপ সম্বন্ধই নাই, দুই দিনের পথের পরিচয় মাত্র, জীবনে

হার কখনও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, তাহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে বিয়োগ বেদনার অশ্রুজল উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়ে ইহা যেমন বিচিত্র—আবার যে নিতান্ত আপনার জন, যাহার সহিত বহুদিনের হৃদয় সম্বন্ধ, সকল মন প্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ করতঃ যে নিত্য আশ্রয়-ভিখারী হইয়া মুখের পানে চাহিয়া আছে, তাহাকে শুষ্কনেত্রে হাস্য মুখে বিদায় দেয় ইহাও তেমনি বিচিত্র। ভগবানের এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সকলই বিচিত্র, তাহার মধ্যে মানব মানবীয় হৃদয়ের বিচিত্র রহস্য বুঝিবার ক্ষমতা সেই রহস্যের স্রষ্টারও আছে কিনা তাহা তিনিই জানেন। রমণী হৃদয়ের সেই অহৈতুকী—বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন আমাদের অন্তরকেও স্পর্শ করিল, আমাদেরও চক্ষু অশ্রু-ছলছল হইয়া আসিল; অধিক বাক্যব্যয়ে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে আমরা কোন মতে দম্পতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গাড়ীতে বসিলাম। গাড়ী রেল ষ্টেশনে অল্পক্ষণেই পঁহুছিল; হায়দ্রাবাদ হইতে ডাক গাড়ী প্রাতে আটটার সময় ছাড়িয়া পরদিন প্রভাতে আমাদিগকে বোম্বাই সহরে নামাইয়া দিল। বোম্বাইয়ে আমরা দুইদিন মাত্র থাকিয়া, বি, বি, সি, আই লাইনের মেল ট্রেণে বরোদা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বরোদা যাত্রা করিবার সময়ে আমরা গ্রাণ্টরোড ষ্টেশন হইতে রওনা হই। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই সুবৃত্ত মুসলমান কোচোয়ানটি এক কাণ্ড করিয়া বসিল। যতদিন আমরা বোম্বাইয়ে ছিলাম উহারই গাড়ী আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়াছি; যে পার্শী ভদ্রলোকের বাড়ীর উপর তালা আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম, সেই বাড়ীর আস্তাবলে ঐ ব্যক্তি তাহার গাড়ী ঘোড়া রাখিয়াছিল। দিনে রাত্রে যখনই গাড়ীর প্রয়োজন তখনই পাইতে পারি এই জন্য নিজের আস্তাবল ছাড়িয়া এই খানেই সে আড্ডা লইয়াছিল, এবং আস্তাবলের এক ধারে নিজেও শয়ন করিত, এইরূপে তাহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা একটু অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিলাম। দেখিলাম তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং যখন তাহার প্রাপ্য পাওনা গণ্ডার উপরে বখসিস স্বরূপ কিছু টাকা তাহার হাতে দেওয়া হইল, তখন সে একেবারে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে শান্ত করিতে গিয়া আমরাও অশান্ত হইয়া উঠিলাম, আমাদের চক্ষুও ছল ছল করিতে লাগিল। এক জনকে হৃদয়াবেগে রোদন করিতে দেখিলে স্বভাবতই অপরের চক্ষুও শুষ্ক থাকে না, করুণ রস এমনই সংক্রামক পদার্থ! মুসলমান কোচ্‌ম্যান আমাদের নিকট হইতে যে সদ্ব্যবহার পাইয়াছিল তাহারই কথা বারম্বার বলিতে লাগিল এবং "আর কখনও দেখা হইবে কিনা ঈশ্বর জানেন" এই কথা বলিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিল। গাড়ী ধীরে ধীরে যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিলাম সে গাড়ীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্লাটফর্ম্ ছাড়িয়া গেলে আর তাহাকে দেখা গেল না। তদবধি আজ পর্য্যন্ত আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই—যতবারই বোম্বাই গিয়াছি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি—কিন্তু কেহই কোন সংবাদ দিতে পারে নাই। বোধ করি বোম্বাইয়ের ভীষণ প্লেগের সময় বেচারা মারা গিয়া থাকিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

পুষি

(গল্প)

সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। পুকুরে গা ধুয়ে ঘড়া করে জল নিয়ে ঘরে আসছি, তখন একটা ঝোপের কাছে শুনতে পেলাম 'মিআও, মিআও'। কাছে গিয়ে দেখি না একটা ছোট বেড়ালের বাচ্ছা জলে ভিজে কাঁপচে, আর সরু গলায় ক্ষীণস্বরে ডাকচে 'মিআও, মিআও'। শুনে মনটার বড় দুঃখ হল। এর মা মাগীটা কেমন ধারা! এই বৃষ্টিতে এরকম ভাবে একলা ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছে? বাচ্ছাটাকে তুলে এক হাতে জলের ঘড়া ধরে অন্য হাতে তাকে নিয়ে বাড়ীতে গেলাম্।

বাড়ী ঢুকতেই শাশুড়ী বলে উঠলেন, "ও বউমা, এ-কি করলে?" আমি অবাক হয়ে জবাব দিলাম, "কেন মা কি হয়েছে?" তিনি বল্লেন, "ওমা কোথা থেকে এটাকে কুড়িয়ে আনলে? আর সেই কাপড়ে জল ভরে নিয়ে এলে, জল যে নষ্ট হয়ে গেল।"

বেড়াল তুলে আনার সঙ্গে জল নষ্ট'র যে কি সম্বন্ধ তা আমি কিছুতেই ঠিক্ করে উঠতে না পেরে তাঁর দিকে চেয়ে বল্লাম, "না মা জল নষ্ট হয় নি, আমি একে কোনো আস্তাকুড় থেকে আনি নি।"

শাশুড়ী একটু হেসে বল্লেন, "তা না হলেই বা, ও যে বেড়াল ছোঁয়া জল।" এ কথার কি জবাব দেবো? শুধু বল্লাম, "আচ্ছা মা আবার জল নিয়ে আসচি।" এই বলে ঘরে গিয়ে বাচ্ছাটাকে রাখবার জন্যে নামাতে গিয়ে দেখি, সে তার ছোট পায়ের অঙ্গুলের নখগুলো দিয়ে আমার কাপড়টা আটকে ধরেছে। বোধ হয় কোলের গরম পেয়ে তার আর নামতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। একটু হেসে তার নখ গুলো থেকে কাপড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে ঘরের মেঝেয় রেখে জল আনতে গেলাম। এসে দেখি, বাচ্ছাটা তখনও কাঁপচে আর মাঝে মাঝে ডাকচে 'মিউ মিউ।' তার গাটা বেশ করে মুছিয়ে দিয়ে, একটা কাছে আসন ছিল সেইটে ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। কি একটা কাযে শাশুড়ী আমার ঘরে ঢুকে সেই বাচ্ছাটাকে দেখে বলে উঠলেন, "ওমা, এ আবার কি! এটাকে ঘরের ভিতর পুরেছো কেন? এখুনি যে * * * এক করবে।"

আমি বল্লাম, "না মা ও কিচ্ছু করবে না, যদি করে আমি সব গোবর জল দিয়ে ধুয়ে দেবো। মা, আমি এটা পুষবো।"

তিনি একটু মুখ বেঁকিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, "এসব আবার কি অনাছিষ্টি' হ'চ্ছে?" তারপর একটু পরে আমার মলিন কাতর মুখ দেখেই হোক্ কি অন্য কোন কারণেই হোক, তিনি গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "তা, ইচ্ছে হয়ে থাকে পোষ, কিন্তু এই শোবার ঘরের ভিতর রেখো না, ঐ বারণ্ডার এক কোণে ফেলে রাখ।"—এই বলে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন।

আমার কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে ওকে অন্য কোথাও বার করে দিতে কিছুতেই মন সরল না। বাচ্ছাটার দিকে চেয়ে দেখি, সে গরম পেয়ে চোখ দুটো অল্প বুজিয়ে বেশ আরামে ঝিমোচ্ছে। ওর গায়ে যেটুকু ফাঁক ছিল সেটাকে ঢেকে দেবার জন্যে আমি আসনটা একবার খুলে নিয়ে ভাল করে তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিলাম। আসনটা খুলতেই সে একবার চোখটা চেয়ে ডেকে উঠল 'মিআও, মিআও,' বোধ হয় আমায় জানিয়ে দিলে, "ওগো খুলো না গো খুলো না।" আমি নিজের মনে হেসে বল্লাম, "না রে খুলিনিরে খুলিনি, তোরই গায়ে ভাল করে চাপা দিয়ে দিচ্ছি।"

"কার সঙ্গে বিড়বিড় করছো ?"

চেয়ে দেখি না মূর্ত্তিমন্ত স্বামী মহাপ্রভু !

একটু গম্ভীর হয়ে বল্লাম, "পাগল হয়ে গেছি কিনা, তাই নিজের মনেই বক্‌ছি।" হেসে উঠেসব বৃত্তান্তটা বলে ফেল্লাম।

তিনি বল্লেন, "হাঁ, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছ ?"

আমি চোখ দুটো একটু কুঁচকে বল্লাম, "তার মানে ?" তিনি ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে উত্তর দিলেন, "এই ছেলে হয় নি কিনা, তাই বল্‌চি।"

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বল্লাম, "যাও, সবতাতেই দুষ্টুমি।"

২

বাচ্চাটার নামকরণ করে দিলাম 'পুষি'। কেন যে ঐ নাম দিতে ইচ্ছে হল তা বল্‌তে পারি না, তবে এটা হতে পারে যে ওকে পুষচি এই ভেবেই হয়ত ওর নাম দিলাম 'পুষি'। পুষি আমার বেশ দেখতে; কেমন ধবধবে সাদা রঙ, আর তার মাঝে মাঝে কালোর ছোপ ধরান। পুষি যখন এদিক ওদিক করে বেড়াত তখন আমি প্রায়ই তার দিকে চেয়ে থাকতাম। প্রথম প্রথম পুষি একটু সঙ্কোচের ভাবে বেড়াত, শেষে দিন কতক পরে টুক্ টুক্ করে এদিক ওদিক করে লাফিয়ে বেড়াত। আর যদি কেউ তাকে তাড়া দিত সে অমনি দৌড়ে আমার শোবার ঘরে খাটের নীচে একটা কোণে আশ্রয় নিত। ঐ কোণটা যে তার নিরাপদের স্থান এবং ঐটে যে তার বসত বাড়ী এ ধারণাটা যে কোথা থেকে তার বদ্ধমূল হল তা আমি কিছুতেই ঠিক্ কর্‌তে পারলাম না। স্বামী-দেব প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন কিন্তু আমার কাকুতি মিনতির কাছে পরাস্ত হয়ে শেষে চুপ করে গেলেন।

আমার খাওয়ার সঙ্গে দুবেলাই পুষিকে সঙ্গে করে নিয়ে খাওয়াতাম। খাশুরী দু'এক দিন নিজের মনেই আপত্তি করে নিজেই থেমে গেলেন। ও পাড়ার শৈল ঠাকুরঝি সে'দিন বেড়াতে এসেছিল। বেড়ালকে সঙ্গে নিয়ে খেতে দেখে ঠাট্টা করে বলে উঠল, "কি বউদি, ছেলে হয় না দেখে কি মা ষষ্ঠীর বাহনকে ঘুষ দিচ্ছ ?" আমিও হেসে জবাব দিলাম, "কি করি বল শেষে হয়ত কোন্ দিন এর দরুণ সতীন এসে হাজির হবে, তাই তাই চেষ্টা করে দেখচি যদি ঘুষ দিয়ে সে পথটা বন্ধ কর্‌তে পারি।"

শৈল ঠাকুরঝি হেসে জবাব দিল, "সে গুড়ে বালি। বেড়াল কি বলে জান ? সে বলে, 'তুই আটকুঁড়ো হ আমি তোর কোল জোড়া হয়ে থাকি।' বুঝলে ?"

আমি একটু গম্ভীর হয়ে জবাব দিলাম, "না ভাই আমি কখনও বেড়ালকে ওরকম বল্‌তে শুনি নি।" কথায় ব্যস্ত ছিলাম। পরে দেখি যে পুষিটা কোথায় পালিয়ে গেছে। শৈল ঠাকুরঝি চলে যাবার একটু পরে দেখি যে পুষি আবার আমার কাছে এসে হাজির হয়েছে।

পুষিকে অনেক সময় ডাকতেই হয় না। আমি খেতে বস্‌লেই সে কেমন নিজেই টুক্ করে এসে হাজির হয়। অনেক সময় আবার অন্য কোথাও থাকলে 'পুষি আয়, পুষি আয়' বলে ডাকলেই একটু পরে দেখি না পুষি এসে হাজির হয়েছে। অন্য লোকে খেয়ে গেলে যদিও তার পাতের কাঁটাটা আসটা পুষি চিবুতো, কিন্তু আমার কাছে বসে সে যেমন নিশ্চিন্তমনে তৃপ্তি করে খেতো— পুষিকে আর কোথাও সে রকম দেখা যেত না। ঐ দেখে আমার মনে যে একটু গর্ব্ব হত না এমন কথা আমি বল্‌তে পারি নে। এই খাওয়া সম্বন্ধে আমি পুষিকে অনেক উপদেশও দিতাম। তাকে প্রায়ই বল্‌তাম সে সাপটে সুপটে খাওয়া ভাল, চারিদিকে ছড়িয়ে খেলে লোকে নিন্দে করবে; যেখানে সেখানে মাছের কাঁটা কি মাংসের হাড়

ছড়ান ভাল নয়। পুষির যাতে নিন্দে না হয় এজন্য অনেক বিষয় আমার লক্ষ্য রাখতে হত।

সে দিনকার একটা ঘটনায় পুষির উপর কিন্তু আমার বড় রাগ হল। স্বামীর আফিসের ভাত বেড়ে দিয়ে তাঁর জন্যে একটা নেবু কাটতে ভাঁড়ার ঘরের ভিতর গেছি। তখনও তিনি খেতে আসেন নি, স্নান করে কাপড় ছেড়ে চুল ফেরাচ্ছেন। নেবু কেটে যাই ভাতের কাছে এসছি, অমনি দেখি না পুষি কোথা থেকে এসে পাত থেকে ভাজা মাছখানা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। দেখে মনে বড় ঘৃণা হল। তাহলে ত পুষি চুরি বিদ্যে শিখেছে, বেশ ত একটি আস্ত চোর হয়ে উঠেছে! আর ও কেমন বুঝতে পেরেছে যে এটা চুরি করা হচ্ছে এবং অন্যায় কায, তা না হলে অমন দৌড়ে পালিয়ে যাবে কেন? কিন্তু থাক্—পাছে সে সময় চেঁচিয়ে উঠ্‌লে একটা গোলমাল হয়ে পড়ে এই জন্যে সে সময় কিছু আর না বলে তাড়াতাড়ি আমার ভাগের যে ভাজা মাছটা ছিল, সেইটে ওঁর পাতে দিয়ে দিলাম। খাশুড়ী ওঁর খাবার সময় কাছে এসে বস্‌তেন। দেখলেন, তাঁর নির্দ্দেশ মত সবই দেওয়া হয়েছে; কাযেই আর কিছু গোলমাল হল না। কিন্তু আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। পুষি আমার চোর! এ কথা কাউকে বল্‌তেও পারলাম না, লোকে পুষির নিন্দে করবে সে আমার অসহ্য। রাগ করে পুষিকে আর সে দিন আমার খাওয়ার কাছে ডাক্‌লাম না। কিন্তু একটু পরেই দেখি সে আমার খাওয়ার সময় ঠিক্ এসে হাজির। একবার মনে করলাম যে খাওয়ার সময়টা আর কিছু বলব না; কিন্তু তখনি আবার মনে পড়ে গেল যে অল্প শাসন না করলে তার আস্‌কারা আরও বেড়ে যাবে। তাই কাছে আস্‌তেই তার বাঁ কাণটা আস্তে মলে দিয়ে বল্লাম, "কেন? এত খেয়েও আশ মেটে না, শেষে চুরি করে খেতে শিখেছো?" পুষি ম্যাও ম্যাও করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। আমি তার কাণটা ছেড়ে দিতেই সে আমার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে সভয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বল্লাম, "আচ্ছা আর করিস্ নি, খাবি আয়।" দেখি সে আস্‌তে ইতস্ততঃ কর্‌চে। দু'একবার হাত ছিনি দিয়ে ডাক্‌তেই সে এসে খেতে বসল।

এর তিনচার দিন পরে একদিন সন্ধ্যা বেলা আমি ঘরে বসে চুল বাঁধ্‌ছি এমন সময় খাশুড়ীর গলার স্বর কাণে গেল। তিনি কাকে যেন চেঁচিয়ে ব[illegible]ন, "এমন অনাচ্ছিষ্টি বেড়াল কোথাও দেখি নি বাবু ঢাকা ফেলে এক বাটী দুধ খেয়ে গেল! আফিস্ থেকে এলে এখন অনিলকে কি খেতে দিই বল দিকিনি? তখনি বউমাকে বলেছিলাম যে ও সব আপদ বাড়ীতে ঢুকিয়ো না।" অভিমানে রাগে মনটা দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল—হতচ্ছ'ড়া বেড়ালের জন্যেই ত এত কথা! আসুক্ আজ পুষি।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, একটু পরে দেখি যে মুখে দুধের সর মেখে পুষি এসে হাজির। তখনও চুরির দাগ মুছে যায় নি। রাগ সামলাতে পারলাম না। সামনে ছিল তাঁর মোটা ছড়িটা, তাই দিয়ে পিঠে খুব ঘা কতক জোরে মারলাম। পুষি 'ম্যাআও ম্যাআও' করতে করতে দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

৩

প্রায় তিন চার মাস হবে পুষির আর কোন খোঁজ পেলাম না। এ বাড়ী সে বাড়ী অনেক খোঁজ করলাম, কিন্তু কোনো ঠিকানাই পেলাম না। একদিন দুপুর বেলা খাটে বসে একটা লেশ বুনচি, এমন সময় মনে হল যেন একটা বেড়াল আমার খাটের নীচে এসে ঢুক্‌লো। কুঁড়েমীর দরুণই হোক কিংবা অন্য একটা ঘরে সুতো দেবো বলে ক্রুশটা পরিয়েছি বলেই হোক, নেমে গিয়ে বেড়ালটাকে তাড়াতে আর মন গেল না। কিন্তু যখন ৫।৭ মিনিট কেটে গেল অথচ বেড়ালটা বেরলো না, তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওঁর জন্যে ঘরে যে দুখানা আলুর চপ ও ফুলকপির সিঙ্গাড়া ভেজেছি, বেড়ালটা

ঢাপা ফেলে সেগুলো খেয়ে যাচ্ছে না ত! তাড়াতাড়ি লেপটা বিছানার উপর ফেলে দিয়ে খাট থেকে নীচে নেমে দেখি যে বেড়ালটা কিছু না খেয়ে শুধু খাটের নীচে একটা কোণের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর কিছু পরে পিছনের দুটো পা গুটিয়ে সামনের দুটো পা ছড়িয়ে দিয়ে ঘাড়টা উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে সেইখানে শুয়ে পড়ল। তার চাহনি ও শোবার রকম দেখে আমার পুষির কথা মনে পড়ে গেল। আমার তখনি মনে হল ও আমার পুষি। আবার তখনি মনে হল সে কি রকম করে হবে? সে ছিল রোগা আর এ হচ্ছে একটু গোলগাল একটু নধর। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখলাম পুষি যে জায়গাটাতে শুতো, এ-ও-ঠিক সেই জায়গাটা দখল করে শুয়েছে। তাড়া দেবার জন্তে হুস্ করতেই বেড়ালটা ডেকে উঠল 'ম্যাও ম্যাও' আর ঘাড় বাঁকিয়ে এক দৃষ্টে আমার দিকে দেখতে লাগল। তার গলার স্বর ও চাহনির ধরণ দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এ আমার পুষি না হয়ে আর যায় না। একটু লক্ষ্য করে তারপর দেখি যে সেই সাদা ধপধপে রঙ, মাঝে মাঝে কালোর ছোপ, ডান দিকের কাণটা একটু বেঁকান—এ নিশ্চয়েই পুষি, পুষি না হয়ে আর যায় না। আহ্লাদে 'পুষি পুষি' বলে ডেকে উঠলাম। পুষি আমার ডাক শুনে একটু উঠবার চেষ্টা করে' আবার শুয়ে পড়ল।

"বউমা বেলা যে পড়ে গেল, এইবার অনিলের লুচি দু'খানা·········ওমা খাটের নীচে বউমা যে বেড়াল ঢুকেছে, তাড়িয়ে দাও তাড়িয়ে দাও, ঢাকা ফেলে সব খেয়ে যাবে। আর, এটা যে পোয়াতী—এক্ষুণি বাচ্চা পাড়বে; বিদেয় কর, এক্ষুণি বিদেয় কর।"

শাশুড়ীর দিকে চেয়ে আহ্লাদে বলে উঠলাম, "মা, ও যে আমাদের পুষি, চিনতে পারছো না?"

কিন্তু এ কথায় যে কি আহ্লাদের কারণ থাকতে পারে এবং তা বলে তাকে যে রাখতে হবে এর কারণ বোধ হয় তিনি কোন কিছু দেখতে পেলেন না। তাই একটু বিরক্ত ভাবে বলে উঠলেন, "তবে আর কি, কপাল ফিরে গেছে! শীগ্‌গির করে বিদেয় কর বউমা, এক্ষুণি ঘরে এক পাল বাচ্চা বিওবে।"

আমি কাতর দৃষ্টিতে শাশুড়ীর দিকে চেয়ে বলে উঠ্‌লাম, "মা, যদি ঘর কিছু নোংরা করে, আমি সমস্ত গোবর জল দিয়ে সাফ্ করে দেবো। এবারটা পুষিকে থাকতে দাও মা, যদি কিছু ফের জ্বালাতন করে, আমি নিজেই ঘাড় ধরে বার করে দেবো।"

শাশুড়ী খানিকক্ষণ চুপ্ করে থেকে চলে গেলেন। যাবার সময় শুধু বল্লেন, "আচ্ছা তখন দেখো, কি নাকালেই পড়্‌তে হয়।" শাশুড়ীর কথা যেন হাড়ে হাড়ে ফলে গেল। ঠিক্ দু'দিন পরে দেখি যে পুষির চারটী বাচ্চা হয়েছে। আর দিন কতক পরে এমনি তারা ঘর দোর নোংরা করতে আরম্ভ করলে তা আর বলা যায় না। পাছে শাশুড়ী বিরক্ত হন্ আমি সেই ভয়ে যথাসাধ্য সব সাফ্ করে রাখতাম্।

৪

পুষিকে মা হতে দেখে মনটায় বড় আহ্লাদ হল। পুষি এখন মা, কেমন ছেলে মেয়ে গুলো তার কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়! আমার যেমন কপাল—থাকগে সে সব কথা। পুষির বাচ্চাগুলো কখনো এটা শোঁকে, কখনো ওটায় মুখ দেয়, কখনো বা ছুটে এ ওর ঘাড়ে পড়ে। বাচ্চাগুলো বেশ দেখতে হয়েছে। কোনটা সাদায় কালোয় মেশা, কোনটার বা গাটা সাদা শুধু লেজটা ও গায়ের দিকটা কালো, কোনটার বা গায়ের মাঝে মাঝে হলদের ছোপ ধরান। বাচ্চাগুলির মধ্যে একটার প্রতি আমার দুটী ভাসুরঝির বড় লোভ হল। টুনি এসে বল্লে, "কাকীমা, ও বাচ্চাটা আমায় দাও না।"

চুনী তাই দেখে তড়াক করে বলে উঠলো, "বাঃ, আমি ওটা ক'দিন ধরে নেবো নেবো মনে করছি! না কাকীমা ওটা টুনিকে দিও না, ও ছেলে মানুষ ভাল করে পুষতে পারবে না।"

শেষের দিকটা চুনী এইরকম গম্ভীর ভাবে বল্লে যে তার বল্‌বার রকম দেখে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। বলে রাখা ভাল যে টুনির চেয়ে চুনী একবছরের বড়। টুনিও ছাড়বার পাত্রী নয়, সে জবাব দিলে, "হাঁ থাম, তোমার যে যত্নের ছিরি, তাই তোমার হাত থেকে পড়ে সে দিন ভাল পুতুলটা ভেঙে গেল।" চুনী চোখটা রাঙিয়ে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু বলাবলি থেকে পাছে শেষে হাতাহাতিতে নামে তাই আমি মধ্যস্থ হয়ে বল্লাম, "ছিঃ দু বোনে কি ঝগড়া কর্‌তে আছে? আমি দু'জনকে দুটো ছানা দেবো। টুনি ছোট সে ঐটে নিক, আর তুমি আর একটা বেছে নাও।"

চুনী তাতে রাজী হয়ে অন্য একটা বাচ্ছা দেখিয়ে দিলে। আমি বাচ্ছা দুটোকে ধর্‌বার জন্যে খাটের নীচের দিকে যাই হাত বাড়িয়েচি, ওমা! কোথা থেকে দেখিনা পুষি এসে হাজির। সে এসেই বাচ্ছাগুলোর কাছে বসল। যেমন টুনির বাচ্ছাটা ধরেছি অমনি পুষি দাঁড়িয়ে ওঠে 'ম্যাও! ম্যাও' মূর্ত্তি দেখে আমার নিজের একটু ভয় হল। হাতটা সরিয়ে নিলাম্—বুঝলাম্ তার বাচ্ছাটা নিচ্চি বলে তার খুব রাগ হয়েছে। তখনও সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আমার দিকে রেখেছিল। ওখান থেকে উঠে এসে টুনি ও চুনীকে বল্লাম্, "তোমরা মা এখন যাও, পুষি কোথাও বেরিয়ে গেলে তোদের ধরে দেবো এখন।" মনটায় বড় দুঃখ হল—পুষির বাচ্ছাদের উপর কি আমার এতটুকু অধিকার নেই? উনি একলাই মা হয়েছেন! আমি আজই ওদের বিদেয় করে দেবো।

একটু পরে পুষি এদিক ওদিক করে বেরিয়ে গেল। আমি বাচ্ছাগুলোর এক একটার ঘাড় ধরে ছুড়ে উঠনে ফেলে দিলাম। পড়েই ছুটো ক্ষীণস্বরে 'মেআও মিআও' করে কেঁদে উঠলো; বাকী ক'টা কোন শব্দ কর্‌লে না, শুধু ঠোঁটটা একটু নাড়লে। মনে খুব কষ্ট হলেও, শক্ত হয়ে রইলাম—পুষি দেখুক এসে আমার রাগ আছে কি না! রাগ হলেও একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাছে বাচ্ছাগুলোকে কেউ নিয়ে যায়। একটু পরে দেখি যে পুষি আমার ঘরে ঢুকলো। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরতে লাগলো—বুঝলাম বাচ্ছাগুলোকে খুঁজচে। একটু পরেই উঠানের দিকে চোখ পড়তে তড়াক্ করে লাফিয়ে বাচ্ছাগুলোর কাছে এসে হাজির। তারপর এ-দিক ওদিক চেয়ে, এক একটা বাচ্ছার ঘাড় কামড়ে ধরে আমার শোবার ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। আমি ঘরে ঢুকে দেখি যে খাটের নীচে যে কোণটাতে ঘরকন্না পেতেছিল, আবার সেইখানটীতে সব কটা এসে হাজির। খুব রাগ হলেও আমি না হেসে থাকতে পারলাম না—কি নির্লজ্জ বেহায়া! তাড়িয়ে দিলে আবার আসে!

কিন্তু তা বলে একেবারে মন থেকে রাগটা চলে গেল না। এনেছে থাক্, কিন্তু আমি আর ওদের কোন কথায় থাক্‌বো না; যেখান থেকে পারুক্ বাচ্ছাদের এনে খাওয়াক, আমি আর অত লোককে খেতে দিতে পারবো না। তার পর দিন থেকে আমিও খাওয়া দাওয়ার সম্বন্ধে একটু কড়াকড়ি বন্দোবস্ত করলাম। কিন্তু এতে একটা উল্টো ফল হল। পুষি দেখি যে এখন খুব পাড়া বেড়ানী হয়ে উঠেছে। এর আগে যে কোন বাড়ীতে যেত না এমন কথা আমি হলফ করে বল্‌তে পারি নে, তবে বড় একটা দেখি নি। এখন দস্তুর মত ম্যাও ম্যাও করে' এর তার বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। দেখি না কারোর বাড়ী থেকে মাছ চুরি করে দৌড়ে পালিয়ে গেল, কারোর বাড়ী থেকে দু'খানা বাসী রুটি, কারোর বাড়ী থেকে বা শুধু মাছের কাঁটাটাই নিয়ে এল। এ চুরি করা যে নির্ব্বিঘ্নে

চল্‌তো তা নিশ্চয়ই না। কেন না দু'একটা বাড়ী থেকে এমনি ম্যাও ম্যাও শব্দ করে দৌড়িয়ে পালিয়ে আস্‌ত যে আমার বুঝতে বাকী থাক্‌তো না, সেখানে ধরা পড়ে বেশ দু'এক ঘা উত্তম মধ্যম খেয়েছে। কেউ বা হয়ত আদর করে ভুক্তাবিশিষ্ট খাবারটুকু খেতে দিত—কিন্তু সেটা যে একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে তা আমি বল্‌তে পারি নে, নিশ্চয়ই বাবুদের বাড়ী খুব ইঁদুরের উপদ্রব আছে।

আমি বড় একটা কিছু বল্‌তাম না। মরুকগে বড় হয়েছে, আমি আর কি বলবো—যে যেমন কায করবে সে তার ফল ভুগবে।

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করচি—পুষি যেন আজ কাল বড় সন্দেহযুক্ত হয়েছে। ঘোরে ,ফেরে, আর কিছুক্ষণ বাদে তার বাচ্ছাগুলোকে এসে দেখে যায়। সেদিন খামকা একটা অন্য বেড়ালের সঙ্গে ঝগড়া করলে। তার অপরাধের মধ্যে সে আমার ঘরে ঢুকছিল, নিশ্চয়ই কোন খাবার সন্ধানে। পুষি তখন একটা বাচ্ছার কাছে চুপ করে বসে ছিল। বেড়ালটাকে আস্‌তে দেখে ম্যাও ম্যাও করে ডেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সে প্রথমে কোন জবাব দিলে না। নিজের মনেই সে ঘরের ভিতর ঢুকে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। পুষি তাই দেখে, বাচ্ছাদের কাছ থেকে চলে এসে, খুব জোরে ম্যাও ম্যাও করে ডেকে একেবারে বেড়ালটার সামনে এসে হাজির। তা এরকম গায়ে পড়া ঝগড়া সে কতক্ষণ সহ্য করবে? সেও এবার পুষির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডেকে উঠল 'ম্যাও, ম্যাও'। কিন্তু মাগো, পুষিটা কি মেয়ে মন্দনী! সে এতে একটুও ভয় পেলে না। সে ঘাড়টা লেজটা মোটা করে করে ফুলিয়ে মুখটা খিচিয়ে তার দিকে মুখ ঝামটা দিয়ে ডেকে উঠল। বেড়ালটা ঠিক তার পাল্টা জবাব দিলে। তার একটু পরে রাম রাবণের যুদ্ধ বেঁধে গেল। এমনি কামড়া কামড়ি আঁচড়া আচড়ি লেগে গেল যে দুজনের গা দিয়ে যে কতক-গুলো রোঁয়া ছিঁড়ে গেল, চোখের কোণ দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগলো সে দিকে কারোর হুঁসও নেই। কাছে গিয়ে ছাড়িয়ে দিতে আমার আর সাহস হল না। দূর থেকে দু'চারবার হুস্ হুস্ শব্দ করলাম, কিন্তু দেখলাম সে দিকে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপই হল না। কিছুক্ষণ এরকম যুদ্ধ করবার পর দেখি, হুলোটা পালিয়ে গেল। পুষি কিছুদূর তাড়া দিয়ে, বাচ্ছাদের কাছে ফিরে এল। বেড়াল যে বাঘের মাসী তা পুষির সে দিনকার রণমূর্ত্তি দেখে আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়ে গেল। আমার মনের মধ্যে থেকে থেকে খালি এই কথাটা আনাগোনা করতে লাগলো যে, সে দিনকার সেই নিরাশ্রয় পুষিটা আজ কেমন করে, এতটা হিংস্র ও দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠলো। সে দিন যদি না কুড়িয়ে আনতাম,—

"বউমা, বউমা!"

ফিরে দেখি শাশুড়ী ডাকচেন।

"কি বলচেন, মা?"

"আজ একটু সকাল সকাল রান্না টান্না গুলো সেরে নিও, ভূতোর অবস্থা বড় খারাপ।"

শুনে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে বল্লে মা?"

"এই একটু আগে ডাক্তার এসেছিল, সে নাকি বলে গেছে যে আজকের রাত্তিরটা টেঁকে কি না। আমি চল্লাম, হাঁড়ীতে যা মাছগুলো আছে সব আজ রেঁধে ফেলো।"

শাশুরী সোজাভাবে এই কথাগুলি বলে গেলেন, কিন্তু আমার যেন আর হাত পা উঠ্‌তে চাইল না। আহা! পাশের বাড়ীর ভূতো ঠাকুরপো বেশ আমুদে লোক ছিলেন। ওঁতে আর ভূতো ঠাকুরপোতে মোটে দু' বছরের তফাৎ। আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমায় নিয়ে কত রঙ্গ ব্যঙ্গই না করেছিলেন। আহা, বাপ্ মার এক ছেলে, না জানি তাদের প্রাণের ভিতর কি হচ্ছে।

কোন রকম করে ঘরের কায সেরে নিয়ে

রাঁধতে গেলাম। কিন্তু রান্না যেন আর এগোতে চায় না, কি যে ছাই রাঁধ্‌চি তাও ভাল হুঁস্ নেই।

রান্না শেষ করে ঘরে আলো দিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় বসে রইলাম। কিন্তু চুপ করে একলা বসে থাকতে ভাল লাগলো না। কত রকম দুশ্চিন্তা মনে আস্‌তে লাগ্‌লো। র‍্যাক্ থেকে একখানা বাঙলা বই টেনে নিয়ে পড়তে বস্‌লাম। কিন্তু বইএর পাতার দিকে খুব নিবিড় দৃষ্টি রাখ্‌লেও মানে কিছু বুঝতে পার্‌লাম না। মন পড়ে আছে ন'কাকীমাদের বাড়ীর দিকে, খালি মনে হতে লাগলো এই বুঝি ভূতো ঠাকুরপোর কখন কি হয়!

একটু পরে দূরে পুষির গলার স্বর শুন্‌তে পেলাম। সেই সঙ্গে কে যেন একজন মেয়েগলায় চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, "মার্ মার্ হতভাগা বেড়ালটাকে! আবার মর্‌তে এসেছে, দেখ্‌ছি—ভূতোকে না নিয়ে যাবে না।"

বুঝলাম পুষি ভূতো ঠাকুরপোদের বাড়ী গিয়ে ডাক্‌ছে। এমন সময় সে কি কর্‌তে ওখানে গেছে তা ত বুঝতেই পারলাম্ না। কিন্তু সে ত খাবার সন্ধানে প্রায়ই ওদের বাড়ী গিয়ে ডাকে, তবে আজকের এ ডাকে লোকে এত বিরক্ত হচ্ছে কেন তা কিছুতেই ঠিক্ কর্‌তে পারলাম না। ইচ্ছে হ'ল পুষির কাণটা ধরে টেনে নিয়ে আসি, কিন্তু বউ মানুষ, কি কর্‌বো কোন উপায় নেই—তাই চুপ্ করে বসে রইলাম।

তখনও পুষির গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কে একজন একটু রেগে বলে উঠ্‌লো, "কৈরে, কেউ ওটাকে মেরে তাড়িয়ে দিলি না?"

অন্য একজন চেচিঁয়ে বলে উঠ্‌ল, "দাঁড়াও ওটাকে ঠিক্ করচি।"

শুনে আমার বুকটার ভেতর ধড়াস ধড়াস কর্‌তে লাগলো। একটু পরে দড়াম্ করে একটা শব্দ হল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পুষি আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল। আমার প্রাণটার ভিতর যেন সজোরে কে ঘা দিলে। খাট থেকে নেমে পুষির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে দেখি, ঘাড়টি কাত করে পুষি আস্‌ছে। ওমা, একি কাণ্ড! পুষির কপালটা দিয়ে যে দরদর করে রক্ত পড়্‌চে, আর চোখ মুখ কাণ সব রক্তে ভেসে যাচ্চে! আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম।

শ্বাশুড়ী ঘরে ঢুকে বল্লেন, "কি হয়েছে বউমা?"

আমি কোন কথা বল্‌তে না পেরে শুধু পুষির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

শ্বাশুড়ী কাতরকণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন, "আহা! পুষিকে এমন করে মার্‌লে গা। তুমি কপালে একটু জলপটি বসিয়ে দাও, এখুনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি তাঁর কথামত খানিকটা নেকড়া ছিঁড়ে, জলে ভিজিয়ে তার ফাটা কপালটার উপর বসিয়ে দিলাম। কিন্তু রক্ত কিছুতেই বন্ধ হল না, ভিজে পটিটার ভিতর দিয়ে সমানে রক্ত বেরোতে লাগিল।

তার ঘাড়টা যেন ক্রমে ক্রমে আরও কাত হয়ে এল। সে ঘাড়টা লতিয়ে আমার কোলের কাছে মেঝের উপর শুয়ে পড়্‌ল। আমার দিকে চেয়ে বার দুই ক্ষীণস্বরে ডেকে উঠ্‌ল, "মাও মাও।"

আমার বুকের ভিতর একটা হাহাকারের ধ্বনি গুমরে উঠল। বল্‌তে পারি না কাকে উদ্দেশ করে মনের ভিতর থেকে একটা তীব্র অভিশাপ ছুটে বেরিয়ে গেল। একটু পরে দেখি আস্তে আস্তে পুষির চোখের তারা দুটি আপনা হতে স্থির হয়ে আস্‌ছে।

ভূতো ঠাকুরপো সে যাত্রা বেঁচে উঠলেন।

শ্রীরাজকুমুদকৃষ্ণ মিত্র।

শাঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি শঙ্কা

মহামতি শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্তদর্শন উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার নিম্ন প্রকার শঙ্কা আছে। যদি বেদান্ত-বিদ্যা-মহার্ণব কোনও পণ্ডিত উহার সমাধান করিয়া দেন তবে বিশেষ উপকৃত হইব।

প্রথমেই বলি শ্রুতির অর্থ সম্বন্ধে আমার শঙ্কা নাই। মতান্তরে উহার সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আমি শুনিয়াছি, সুতরাং শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমি নিঃসংশয় ও অতীব শ্রদ্ধালু। বৈদান্তিকগণ "অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ" অনুসারে যে ব্যাখ্যা করেন তাহাতেই আমার শঙ্কা, যথা—

'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'—(তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মানন্দবল্লী ১)—এই শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য্য বলেন, 'সত্য' শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণ। 'সত্য' অর্থে তিনি বলেন "যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্।" (১।৭) এরূপ যদি সত্যের লক্ষণ হয় তবে মায়াও ত সত্য। বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ মায়াকে সমষ্টি অজ্ঞান বলেন, আর মায়া যে অনন্তা তদ্বিষয়ে কথাই নাই। কিন্তু "মায়া অনন্তা অজ্ঞানরূপা" এই নিশ্চয়ের কখনও ব্যভিচার হইবে না। অতএব বলিতে হইবে—"সত্যা অনন্তা অজ্ঞানরূপা মায়া।" কিন্তু তথাপি মায়াকে মিথ্যা বলা হয় কেন? আর যদি ভাষ্যকারের লক্ষণায় 'সত্য' শব্দের অর্থ নির্ব্বিকার হয়, তবে তাহা বলিলেই গোল চুকিয়া যাইত।

সাধারণতঃ 'সত্য' অর্থ বাক্যের যাথার্থ্য বুঝায়। নির্ব্বিকারকে নির্ব্বিকার বলিলে, বিকারীকে বিকারী বলিলে, যাহা আছে বা সৎ তাহাকে সৎ বলিলে, তবেই সেই বাক্যকে সত্য বলা যায়। সৎ অসৎ সর্ব্বপদার্থই সত্যের বিষয় হইতে পারে। পুনশ্চ আচার্য্যস্বামী বলিয়াছেন যে 'সত্য' ও 'জ্ঞান' শব্দ—"স্বার্থসমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবত," আর 'অনন্ত' শব্দ—"অন্তবত্ত্ব প্রতিষেধেনৈব বিশেষণং," কিন্তু সত্যের লক্ষণে "ন ব্যভিচরতি" বলিয়া ব্যভিচারের প্রতিষেধ করিয়াছেন। আর 'সত্য' বস্তুত তাঁহার মতে নির্ব্বিকারার্থক তাহাতেও ত বিকারের প্রতিষেধ, "স্বার্থসমর্পণ" কোথায়?

'জ্ঞান' শব্দের অর্থ তিনি "চিদ্রূপ" বলিয়াছেন। বলিয়াছেন যে জ্ঞান' ভাবরূপ, ক্রিয়ারূপ জ্ঞান নহে। এ বিষয় বেশ বুঝা গেল। কিন্তু পরে তিনি বলিয়াছেন যে "যত্ তদ্ব্রহ্মণো বিজ্ঞানং তৎ সবিতৃ প্রকাশবৎ অগ্ন্যুষ্ণ্যবচ্চ।" সূর্য্যের প্রকাশ এবং অগ্নির উষ্ণতা, গুণ বা ধর্ম্ম। ইহাদের গুণী, সূর্য্য ও অগ্নি। ইহারা (গুণ সকল) গুণীর সমস্ত নহে কিন্তু একতর ভাগ। জ্ঞানও যদি ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয়, তবে জ্ঞান ছাড়াও আরও কিছু তাহাতে আছে কি?

পরেই তিনি উপসংহার করিয়া বলিয়াছেন যে এই 'জ্ঞান' মানে সর্ব্বজ্ঞতা "তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং তদ্ব্রহ্ম।" এখানে জিজ্ঞাস্য, অল্পজ্ঞতারূপ জ্ঞান 'কর্ত্তৃকারকযুক্ত," আর সর্ব্বজ্ঞতা কি কর্ত্তৃকারকযুক্ত নহে? দেখা যায় সর্ব্বজ্ঞতা, চিদ্রূপতা, বিজ্ঞাতৃত্ব, এই সমস্তই এই জ্ঞানশব্দের অর্থ, তিনি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চিদ্রূপতা ও বিজ্ঞাতৃত্ব একার্থক হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা কিরূপে কর্ত্তৃকারকশূন্য জ্ঞান হইতে পারে? "সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদ্" সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানই তাঁহার মতে সার্ব্বজ্ঞ্য। সূক্ষ্মাদি জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞানই যদি ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় শূন্য চিৎ তাহা কিরূপে হয়?

'অনন্ত' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে—আনন্ত্য ত্রিবিধ—দেশত, কালত ও বস্তুত। দেশত অনন্ত—আকাশ। আকাশ কিন্তু কালত অনন্ত নহে, যেহেতু তাহা কার্য্য।

এখানে জিজ্ঞাস্য আকাশ কি? দেশ কি? আর

কালত অনন্ত পদার্থ ত আকাশ নহে। কালত অনন্ত পদার্থ কি খালি "ব্রহ্ম"? না আর কোনও তাদৃশ দ্রব্য আছে? আবার পরেই শঙ্কর বলিয়াছেন যে 'দেশ কালাদি কার্য্যও ব্রহ্ম কারণ'। দেশত কাল যদি কার্য্য হইল, অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিলনা পরে উৎপন্ন হইয়া ছ, তবে ব্রহ্ম দেশত ও কালত অনন্ত হন কিরূপে? সুতরাং 'দেশত অনন্ত, কালত অনন্ত ব্রহ্ম', এই নিশ্চয় ব্যভিচারী। অতএব ভাষ্যকারের 'সত্য' লক্ষণায় উহা সত্য হইবে কিরূপে?

বস্তুত আনন্ত্যের লক্ষণে ভাষ্যকার বলেন—"কথং পুনর্বস্তুত আনন্ত্যং সর্ব্বানন্যত্বাৎ"। অর্থাৎ যাহা সর্ব্ব-বস্তু হইতে অভিন্ন তাহাই বস্তুত অনন্ত। তিনি বুঝাইয়াছেন—"যাহা হইতে যাহার বুদ্ধিনিবৃত্ত হয়, তাহাই তাহার অন্ত। ব্রহ্মের সেরূপ অন্ত নাই তাই ব্রহ্ম বস্তুত অনন্ত। ব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুর কারণ বলিয়া সর্ব্ববস্তুই ব্রহ্ম, যেহেতু কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। আর কার্য্যবস্তু অনৃত সুতরাং কারণ ব্রহ্ম বস্তুই অনন্ত।" প্রমাণ দিয়াছেন "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকে-ত্যেব সত্যং" এই শ্রুতি। দেখা যায় যে এই শ্রুতি ভাষ্যকার শত শত স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার অর্থ যথা—ঘটাদি বিকার বাক্যমাত্র বা নামমাত্র উহাদের কারণ (উপাদান) মৃত্তিকাই সত্য। এই তথ্যই শাঙ্কর মতের এক প্রধান স্তম্ভ দেখা যায়।

কিন্তু উহাতে ত শঙ্কার নিবৃত্তি হয় না। যেহেতু কারণ দ্বিবিধ—উপাদান ও নিমিত্ত। ঘটাদি মৃত্তিকা মাত্র ইহা খুব সত্য। উহার অর্থ ঘটাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা। তাই বলিয়া শুদ্ধ মৃত্তিকা থাকিলেই যে ঘট হইয়া যায়, তাহা ত নহে। তাহা হইলে কুম্ভকারের অন্ন জুটিত না। শুদ্ধ 'ঘট' এই বাক্য বা নাম উচ্চারণ করিলেই কি ঘট হয়? তাহা কখনই নহে। মৃত্তিকার অবয়বের অবস্থান্তরতা হইলেই তবে ঘট হয়।

ব্রহ্ম পক্ষে বেদান্তমতে উহা কিরূপে খাটে তাহা দ্রষ্টব্য। শঙ্কর চারিপ্রকার ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

১ম—"অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতির ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন (২.২১২) যে "নিরুপাধিকস্য পুরুষঃ-ব্রহ্ম।"

২য়—ঈশ্বর—ঈশ্বরো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বোপাধিরীশ্বরঃ। (মুণ্ডকভাষ্য ৩।১।১)

৩য়—অক্ষর বা হিরণ্য গর্ভ—সর্ব্ব কার্য্য-কারণ-বীজ-রূপ উপাধিযুক্ত অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর। (মুণ্ডক ভাষ্য ১২২)

৪র্থ—বিরাট—ব্রহ্মাণ্ড শরীর।

ভাষ্যকার মহোদয়ের মতে এই চারি রকম ব্রহ্মই এক, সুতরাং জগৎ-কারণ অদ্বৈত। উহার মধ্যে হিরণ্য-গর্ভকে আধুনিক বেদান্তীরা সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্ত বলেন। ইনি শ্রুতিতে ব্রহ্মা নামেও কথিত হন, (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব ইত্যাদি মুণ্ডক। ১১১) আর ইনি অমুক্ত পুরুষ কল্লান্তে মুক্ত হইবেন বলিয়াও কথিত হয়।

নিত্যমুক্ত সর্ব্বোপাধিক ঈশ্বর সুতরাং হিরণ্যগর্ভ হইতে পৃথক্। আর নিরুপাধিক পুরুষ ও সর্ব্বোপাধিক ঈশ্বর অবশ্য পৃথক্ বলিতে হইবে।

ইহার মধ্যে নিরুপাধিক পুরুষ ছাড়া আর সব ব্রহ্মই ত দ্বৈত, কারণ সকলেই উপাধিক। সর্ব্ব না থাকিলে সর্ব্বজ্ঞ হইবে কিরূপে? সর্ব্বজ্ঞ মুক্ত ঈশ্বরও দ্বৈতাশ্রিত। ইহাতে জিজ্ঞাস্য :—

নিত্যমুক্ত ঈশ্বর যদি নিত্যসর্ব্বোপাধিযুক্ত, তবে নিত্যই দ্বৈতবুদ্ধি আছে। আর দ্বৈতবুদ্ধি কাহারও না কাহারও নিত্যই থাকিবে সুতরাং অদ্বৈত কবে ছিল বা থাকিবে?

যদি বল দ্বৈত সব বাচারম্ভণমাত্র নাম মাত্র, তবে জিজ্ঞাস্য সেই বাচারম্ভণ কে কবে করিয়াছিলেন? নিরুপাধিক পুরুষ কি করিয়াছিলেন? উপাধি না থাকিলে বাক্য ও তাহার আরম্ভণ কল্পনা কর কিরূপে? বিশেষত উপাধি বা দ্বৈতভাব নিত্য। কোনও কালে

তাহা সৃষ্ট হয় নাই তাহা ত নিজেরাই বলিতেছ, সুতরাং সঙ্গতি কি?

অবশ্য বাচারম্ভেই ঘট হয় না, আরও কিছু চাই। বিকারী নিমিত্ত চাই ও উপাদানের বিকারশীলতা চাই। আর বাচারম্ভই একপ্রকার বিকার। সেই বিকার ব্রহ্ম কিরূপে আসিল?

সত্ত্বোপাধিক ঈশ্বর যদি নিত্য সর্ব্বজ্ঞ হন তবে উপাধি-বুদ্ধি ও নিরুপাধিক বুদ্ধি দুইই নিত্য। অতএব "বস্তুত আনন্ত্যের" লক্ষণ অনুসারে ঐ সব ব্রহ্ম কিরূপে বস্তুত অনন্ত হন? এক বুদ্ধি থাকিলেই তবে তাহা ভাষ্যকারের মতে বস্তুত অনন্ত, কিন্তু সত্ত্বোপাধিক ঈশ্বরের নিত্য উপাধিবুদ্ধি রহিয়াছে, তখন ব্রহ্ম নিত্যই বস্তুত সান্ত হন না কি? "ইহা অনির্ব্বচনীয়" এতদ্ব্যতীত অন্য উত্তর আছে কি? আর যদি বল উহা সব বিশ্বাসের বিষয়, তবে যুক্তি তর্কের দ্বারা উহার উপপত্তি করার এত প্রয়াস করা হইয়াছে কেন? আর পর-মতই বা খণ্ডনের প্রয়াস কেন?

ভাষ্যকার তৈত্তিরীয় ভাষ্যে এই অনুবাকের উপসংহারে বলিয়াছেন, "আকাশো হ্যনন্ত ইতি প্রসিদ্ধং দেশত স্তস্যেদং কারণং তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মনঃ আনন্ত্যম্। ন হি অসর্ব্বগতাৎ সর্ব্বগতং কিঞ্চিদুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে, অতো নিরতিশয়-মাত্মনঃ আনন্ত্যং দেশতস্তথা সর্ব্বকার্য্যত্বাৎ কালতস্তথা বস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ বস্তুত অতএব নিরতিশয়সত্যত্বম্।" ইহাতে জিজ্ঞাস্য—আকাশ দেশত অনন্ত, আকাশের কারণ আত্মা, সুতরাং আত্মাও দেশত অনন্ত, ইহা যদি সত্য হয়—তবে দেশের কারণ কি? দেশ নিত্য না হইলে আত্মা দেশত অনন্ত এই অব্যভিচারী নিশ্চয় হয় কিরূপে? আর তাহা হইলে আত্মা দেশব্যাপী বা দেশাশ্রয় বা দেশাধার হন নচেৎ আত্মা দেশত অনন্ত হইবেন কিরূপে?

অসর্ব্বগত হইতে সর্ব্বগত দ্রব্য হয় না, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে যখন সর্ব্বগত আকাশ হইয়াছে তখন ব্রহ্ম সর্ব্বগত এই যুক্তিটী ব্যর্থ নহে কি?

আকাশকে কেহ নিত্য বলে (তার্কিকরা), কেহ স্বীকার করে না (বৌদ্ধেরা)। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন আত্মা হইতে আকাশ হয় তাই তাহা প্রামাণ্য, তেমনি শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা সর্ব্বগত তাই তাহা সত্য এরূপ বলিলেই ত হয়। যদি যুক্তি দিতে হয় তবে ভিত্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যুক্তি দেওয়ার প্রয়াস নিরর্থক নহে কি?

আকাশের বিবরণে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন "আকাশো নাম শব্দগুণোঽবকাশকরো মূর্ত্তদ্রব্যানাং"—এরূপ আকাশভূত যে অনন্ত—এ প্রসিদ্ধি পুরাকালেও ছিল না এখনও নাই। পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে প্রত্যেক ভূত দশগুণ উপরিস্থ ভূতের দ্বারা আবৃত। আকাশও সেইরূপ উপরিস্থ অন্তঃকরণ ও অব্যক্তের দ্বারা আবৃত। আর আধুনিক মতে শব্দগুণক আকাশ সর্ব্বগত নহে। পরন্তু অনন্ত বলিলে সর্ব্বভূতই অনন্ত, শুদ্ধ আকাশ নহে, আর আকাশ সর্ব্বগত এ কথায়ই বা মূল্য কি? সর্ব্ব না থাকিলে সর্ব্বগত হয় না। ক্ষীরে সর্পির ন্যায় সর্ব্বগত হইলে আকাশ সেরেক্তে এক ছটাক মাত্র হইবে। সুতরাং ঐরূপ উপায়ে 'ব্রহ্ম সর্ব্বগত' ইহা উপপন্ন করার চেষ্টা ব্যর্থ প্রয়াস নহে কি?

আত্মাই একমাত্র আছেন তাই অন্য কিছু নাই, এরূপ প্রতিজ্ঞা ও নিগমনা করা ব্যর্থ, কারণ সকলেই জানে যে যদি এক দ্রব্য থাকে তবে দ্বিতীয় থাকিবে না। এ স্থলে দেখাইতে হইবে যে যখন প্রপঞ্চ রহিয়াছে তখন একমাত্র আত্মা কিরূপে থাকিতে পারেন। আত্মা-ছাড়া আর অন্য দ্রব্য নাই—শুদ্ধ এরূপ ভিত্তিহীন কথা বলিলে চলিবে না। উহার উপপত্তি কি তাহা দেখাইতে হইবে।

সর্ব্বগত বলিলে সর্ব্ব থাকিবে এবং যাহা সর্ব্বগত তাহা থাকিবে। যখনই সর্ব্বই নাই কেবল ব্রহ্ম আছেন তখন তাঁহাকে সর্ব্বগত বলিলে মিথ্যা (ব্যভিচারী নিশ্চয়) বলা হয়।

শাঙ্কর মতাবলম্বীদের মধ্যে 'ব্রহ্ম' আনন্দময় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রুতিতে কিন্তু আনন্দময় কোষের উপর আত্মা এরূপ বলা হইয়াছে। অতএব আত্মা বা চৈতন্য কিরূপে আনন্দময়? তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যে ব্রহ্মানন্দের

কথা আছে, যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহা যে ব্রহ্মের সেই ব্রহ্ম নিরুপাধিক চিদ্রূপ পুরুষ নহেন। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলেন "নিরতিশয়ং যত্র স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তস্যৈষ আনন্দঃ।" হিরণ্যগর্ভ ভগবান সোপাধিক পুরুষ, সুতরাং নিরুপাধিক পুরুষের আনন্দ নাই, তথাপি বেদান্তীরা চৈতন্যকে আনন্দময় বলেন কেন ?

আত্মা বিজ্ঞাতা ইহা শ্রুতি বলেন, ভাষ্যকারও বলেন। অতএব তিনি আনন্দের বিজ্ঞাতা না হইয়া আনন্দ হইবেন কিরূপে ? বিজ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয় আনন্দ (কোষরূপ) পৃথক্ পদার্থ নহে কি ?

ভাষ্যকার মিথ্যা পদার্থের উদাহরণ এইরূপ দিয়াছেন, যথা—"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ॥" অর্থাৎ মরীচিকার জলে স্নান করিয়া, আকাশকুসুমের মাল্য মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক এই বন্ধ্যাসুত শশশৃঙ্গের ধনুর্ধারণ করিয়া যাইতেছে।

ইহার মধ্যে মিথ্যা কি ? মরু, জল, স্নান, আকাশ, পুষ্প, শশক, শৃঙ্গ, ধনু, বন্ধ্যানারী, ও পুত্র—এই সব 'সত্য', বা কোথাও না কোথাও বর্ত্তমান, বা পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ। কেবল একের উপর অন্যের আরোপ করাই মনের কল্পনা বিশেষ। কল্পনা শক্তিও ভাব পদার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উক্ত উদাহরণ 'সতী' কল্পনা শক্তির দ্বারা কতকগুলি 'সৎ' পদার্থকে ব্যবহার করা মাত্র। বেদান্ত মতে ব্রহ্মেই এই জগৎ আরোপিত। সুতরাং বলিতে হইবে ব্রহ্মে স্বকীয় কল্পনা শক্তির দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চ নিজেতেই কল্পনা করিলেন এবং নিজেই ভ্রান্ত হইয়া গেলেন। ইহাতে শঙ্কা—অপ্রাণ অমনা (সুতরাং কল্পনাশক্তি শূন্য) বা নিরুপাধিক অদ্বৈত অখণ্ড চৈতন্যরূপ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদহীন ব্রহ্ম কিরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট অথচ ত্রৈকালিক সত্তাহীন আকাশাদি প্রপঞ্চ সকল নিজে কল্পনা করিয়া স্বয়ং নিত্যবুদ্ধ হইয়াও ভ্রান্ত হইয়া দেখিতে লাগিলেন ?

বৈদান্তিক মত একটি দার্শনিক মত ; তাহার মূল বিষয়ের উপপত্তি চাই। কিন্তু এই মূল বিষয়ের কুত্রাপি উপপত্তি দেখি নাই। ইহার তিন উত্তর পাইয়াছি (১) অজ্ঞেয়, (২) অনির্ব্বচনীয়, (৩) অবচনীয়।

যেমন বন্ধ্যাপুত্রের ঐ কল্পনা স্বোক্তি বিরোধ, সেইরূপ বৈদান্তিক মতও স্বোক্তি বিরোধ হইতেছে না কি ? অমনা (কল্পনাশক্তিহীন) নিত্যবুদ্ধ ত্রিভেদশূন্য চিদ্রূপ ব্রহ্ম ত্রৈকালিক সত্তাহীন, সুতরাং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থের ন্যায় অকল্পনীয় আকাশাদি প্রপঞ্চক কল্পনা করিয়া, নিজে নিত্যবুদ্ধ হইয়াও ভ্রান্ত বা অবিদ্যাবস্থ হইলেন !

কেহ কেহ বলেন মায়া বা প্রপঞ্চ কল্পনা বা ইচ্ছা-শক্তি ব্রহ্মেতেই আছে। আচার্য্য স্বামীও বলিয়াছেন "সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতম্ অব্যাকৃতনামরূপং সতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্য কারণ শক্তি সমাহার-রূপম্ অব্যক্তম্ অব্যাকৃতা-কাশাদিনামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ।" (কঠভাষ্য ১।৩।১১)। অর্থাৎ বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষ জননশক্তি থাকে, সেইরূপ সর্ব্বজগতের বীজভূত নামরূপহীন সর্ব্বকার্য্যকারণশক্তির সমাহাররূপ, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, আকাশ আদি নাম বাচ্য, পরমাত্মাতে ওতপ্রোত ভাবে সমাশ্রিত শক্তিই অব্যক্ত। ইহাকে বৈদান্তিকেরা মায়াও বলেন প্রকৃতিও বলেন। শুদ্ধ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মে—যাহাতে স্বগতভেদ কল্পনীয় নহে—তাহাতে এতবড় একটা শক্তি ওতপ্রোত ভাবে থাকে কোথায় ? "ক্ষীরে সর্পিমিবার্পিতম্' বলিলে ক্ষীরও চাই সর্পিও চাই, অর্থাৎ চেতন ব্রহ্মও চাই আর তদ্ভিন্ন দ্বৈত জড়া প্রকৃতিও চাই। ক্ষীরের অতি অল্পাংশই সর্পি, সুতরাং খানিক প্রকৃতি ও খানিক ব্রহ্ম ইহা সিদ্ধ হয়। অদ্বৈত চৈতন্য ব্রহ্ম কিরূপে সিদ্ধ হয় ? ইহার উত্তর পাইয়াছি "অনির্ব্বচনীয়," তা ছাড়া আর অন্য উত্তর আছে কি ?

বৈদান্তিকদের সাধন সম্বন্ধেও শঙ্কা আছে। তাঁহারা ভাবেন "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং।" অহং মানে 'আমি' এবং বুদ্ধি বা অহংকার মানেও 'আমি'। সুতরাং ঐ বাক্যের অর্থ হইতেছে "আমি আমি নহি" ইহা কিরূপে ভাবনা করা যায় ?

অহং ব্রহ্মাস্মি প্রভৃতি ঠিক এবং উত্তম সাধন। উহার দ্বারা ক্ষুদ্রাভিমান কাটিয়া মহত্তর সুশুদ্ধতর অভিমান হয়, এবং উহা ভাবনীয় সাধন। কিন্তু "আমি" অহঙ্কার বা "আমি" নহি—এরূপ ভাবনা কিরূপে যুক্ত হয়?

মাণ্ডুক্য কারিকায় আছে—"ন নিরোধো ন চোৎপত্তি-র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" ২।৩২। এই পরমার্থতা কি? ভাষ্যকার তৈত্তিরীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন—"ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থৌ" —সুতরাং দুইটি পুরুষার্থের মধ্যে পরমার্থ কাযে কাযেই অপবর্গরূপ অর্থ হইতেছে। অপবর্গ মানে মুক্তি। মুক্ত হইলে নিরোধ-মুমুক্ষুতা না থাকিতে পারে। সর্ব্ব-বাদীরাই উহা বলেন। কিন্তু "ন মুক্তঃ" ইতি পরমার্থতা বা মুক্তি, এ কথার মূল্য কি? মুক্ত হইয়া গেলে "মুক্ত হইলাম" এরূপ ভাব থাকে না, এই সামান্য কথাই কি অত বড় শ্লোকে বলা হইয়াছে?

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার অদ্বৈতবাদের যুক্তি গুলি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন, যথা—উৎপত্তি প্রলয়াদি কেন নাই—না, দ্বৈতসত্তা নাই বলিয়া (দ্বৈত-স্যাসত্ত্বাৎ) দ্বৈত নাই কেন?—শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" সেই জন্য দ্বৈত যদি নাই তবে দ্বৈতের কথা বল কেন? উহা সংব্যবহার মাত্র, যেমন রজ্জুতে সর্প কল্পনা করা হয় সেইরূপ। সেই কল্পনায় যেমন প্রকৃত সর্প মনেও উৎপন্ন বা প্রলীন হয় না, রজ্জুতেও উৎপন্ন বা প্রলীন হয় না, সেইরূপ।

"অতো মনো বিকল্পনামাত্রং দ্বৈতমিতি সিদ্ধম্।"

অতএব বলিতে হইবে ব্রহ্ম অমনা নহেন, তাঁহার মন আছে, কল্পনাশক্তি আছে, পূর্ব্বস্মৃতি আছে, পূর্ব্ব-স্মৃতির বিষয় আকাশাদি আছে ইত্যাদি। অর্থাৎ বিজ্ঞাতা-বিজ্ঞান-বিজ্ঞেয়-যুক্ত পদার্থ ব্রহ্ম। এরূপ ত্রিভেদযুক্ত একজন "অদ্বৈত" ব্রহ্ম যে আছেন তদ্বিষয়ে কাহারও শঙ্কা নাই। শঙ্কা এই যে ঐরূপ স্বগতাদি-ভেদশূন্য চিদ্রূপ ব্রহ্মমাত্র আছেন, আর কিছু নাই—এই অদ্বৈতবাদ কিরূপে সঙ্গত হয়? এক অখণ্ডৈক-রস চৈতন্যমাত্র থাকিলে দ্বৈতসংব্যবহারের অবকাশ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর পাইলে সুখী হইব।

মুক্তি ও পরমার্থ একই কথা। যেমন বদ্ধ ও মুক্ত তেমনি অর্থ ও পরমার্থ। ব্রহ্মে বদ্ধমুক্ততা নাই বলিলে অর্থপরমার্থতাও নাই বলিতে হইবে। নচেৎ পরমার্থ-তাতে 'মুক্ত' নাই, ইহা বলিলে মুক্ততাতে 'মুক্ত' নাই এরূপ অলীক কথা বলা হয় না কি?

আর এক কথা, বৈদান্তিকেরা বলেন পরমার্থ দৃষ্টিতে প্রপঞ্চ থাকে না। ইহা সর্ব্ববাদীরই মত। ভাষ্যকার শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে এই দুই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরং।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥"
অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি।
ব্রহ্মভূতঃ স এবেহ বেদশাস্ত্রউদাহৃতঃ॥"

এ বিষয়ে সর্ব্ববাদীই একমত। পরমার্থদৃষ্টিতে উপনীত হইলে ব্যবহারিক বিষয় থাকে না, ইহা সকলেই বলেন। তেমনি ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও ব্রহ্ম থাকে না, ইহাও বলিতে হইবে। অনুমান অথবা বিশ্বাসের দ্বারা তখন ব্রহ্মসত্তার জ্ঞান হয়। কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে অদ্বৈতবাদীরা বলেন 'প্রপঞ্চ নাই' তাহা কিরূপে যুক্ত হয়? যাহা সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা নাই এরূপ চিন্তা করা মনের অসাধ্য। তাহা অবস্থান্তরে আছে এরূপই চিন্তা করিতে পারা যায়। সুতরাং বৈদান্তিকেরা যে প্রপঞ্চের ত্রৈকাল সত্তা অস্বীকার করেন তাহা কিরূপে কল্প্য হইতে পারে? পরমার্থদৃষ্টিতে প্রপঞ্চ থাকেনা, ইহা সত্য, কিন্তু যখন যাহার ব্যবহারদৃষ্টি রহিয়াছে, তখন তাহার নিকট প্রপঞ্চ আছে। সেইরূপ যাহার ব্যবহারদৃষ্টি রহিয়াছে তাহার নিকট শুদ্ধ চৈতন্য নাই। দৃষ্টিভেদে কোনও দ্রব্য না জানিলে তাহা যে নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্ত হয় কিরূপে? আমি মাত্র

'রাম'কে দেখিতেছি বলিয়া কি 'শ্যাম' আদি নাই? যাঁহারা চিত্তরোধ করিয়া কেবল আত্মাতে সংস্থিত, তাঁহাদের কাছে জগৎ নাই, অন্যের নিকট অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত জগৎ আছে, সুতরাং জগতের ত্রিকালসত্তা নাই—এরূপ বলা কিরূপে সঙ্গত হয়?

শ্রীধর্ম্মমেঘ ব্রহ্মচারী।

মণিভদ্র

স্কন্দপুরাণে মণিভদ্রের উপাখ্যান আছে। প্রাচীন ভারতের উপন্যাসের নমুনা স্বরূপ এই কাহিনী বিবৃত করিতেছি।

বিদিশা নাম্নী এক নগরী ছিল। রাজার নাম চিত্রবর্ম্মা। এই দেশ বেশ সমৃদ্ধ ছিল, প্রজারা শান্তিতে বাস করিত।

এই দেশে মণিভদ্র নামে পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ ধনে ধনী একজন ক্ষত্রিয় বাস করিত। ধন থাকিলে কি হয়, মণিভদ্রের অন্য অভাব বিস্তর ছিল। রূপ ত ছিলই না, পরন্তু পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ কুঁজ ছিল; সমস্ত শরীরটি জরা ব্যাধিগ্রস্ত ছিল, দেখিতে সে কদাকার ও বিরূপ ছিল। এইরূপ শারীরিক গঠনের সহিত যেরূপ প্রকৃতি হওয়া উচিত, তদনুযায়ী তাহার প্রকৃতিও অতিশয় নীচ ছিল। এত ধন থাকিয়াও সে ভয়ানক কৃপণ ছিল, কাহাকেও কোন দিন কিছু দান সে করিত না। নিজের ক্ষুধা হইলেও সে ভাল করিয়া খাইত না, কারণ বেশী খাইলে তাহার ধনক্ষয় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

হঠাৎ মণিভদ্রের বিবাহ করিবার সাধ হইল। ঐ নগরের দারিদ্র্য-পীড়িত অপর একজন ক্ষত্রিয়ের সুন্দরী এক কন্যা ছিল। মণিভদ্র কোন সুযোগে এই কন্যার রূপ লাবণ্য দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইল। অর্থে সব হয়, কন্যার পিতা অর্থের আশায় এই কুৎসিৎ পাত্রেও কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কন্যার মাতাকে সম্মত করাইতে তাঁহার কিছু বেগ পাইতে হইল। কিন্তু অর্থের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষত্রিয় অবশেষে গৃহিণীকে সম্মত করাইলেন।

কিন্তু চতুর মণিভদ্র এ পর্য্যন্ত বহু অর্থ দিবার অঙ্গীকার মাত্র করিয়াছে! এক পয়সাও এখনও পর্য্যন্ত দেয় নাই। অর্থের আশাতেই মানুষে এরূপ মত্ত যে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না! মণিভদ্র বলিল, আজই বিবাহ দিতে হইবে। শুভলগ্নের অপেক্ষায় থাকিলে তখনও কয়েক মাস বিলম্ব করিতে হয়। মণিভদ্র তত অপেক্ষা করিতে রাজী নন। ক্ষত্রিয় অর্থ লাভাশায় অলগ্নেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মণিভদ্র বধূ লইয়া গৃহে ফিরিলেন। বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন আর কি? প্রতিশ্রুত অর্থ শ্বশুরকে দেওয়া সে আর প্রয়োজন বোধ করিল না। ক্ষত্রিয়ের মনের ভাব কি হইল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। রাজার কাছে গিয়া অভিযোগ করিয়া কোন ফল নাই, যে হেতু ধনী মণিভদ্র রাজার প্রিয়পাত্র, রাজা তাহার বিরুদ্ধে কোন কথাই শুনিবেন না! ঐ কারণেই, প্রতিবেশীরাও যে কেহ কিছু করিবেন তাহার আশাও ছিল না। সুতরাং এই কন্যা বিক্রয়ের ব্যাপারে বিক্রেতা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইয়া মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিল।

আর এই ক্রয় বিক্রয়ের পাত্রী সেই কন্যা—যাহার সম্মতি অসম্মতির কথা কেহই ঘুর্ণাক্ষরে একবারও ভাবে নাই—তাহার কি হইল? অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দুঃখার্ত্তা সেই কন্যা মোহিকা স্বামিগৃহে গিয়া এই পাষণ্ড স্বামীর সাহচর্য্য যথাসম্ভব অস্বীকার করিল। মণিভদ্র অতিশয়

ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু মোহিকা এখন দৃঢ়ব্রতা, তাহার স্বাধীন প্রবৃত্তির মালিক সে, মণিভদ্র এখানে অর্থের প্রলোভনে কিছু করিতে পারিল না। তখন মণিভদ্র মোহিকার যত প্রকার দুর্গতি সম্ভব তাহার আয়োজন করিল। দাস দাসী সব তাড়াইয়া দিল। দ্বারে একজন নপুংসক দ্বারপাল নিযুক্ত করিল। তাহাকে বলিয়া দিল, ভিক্ষুক, বৃদ্ধ, ব্রতী প্রভৃতি কোন লোককেই তুমি গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না। মোহিকাকে বিধবার ন্যায় শাদা কাপড় পরাইল, অলঙ্কার ত কিছুইএ পর্য্যন্ত দেয়ই নাই।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে দ্বারপালকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিয়া সে নিজের কার্য্যে চলিয়া যাইত। খোজা দারোয়ান বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল, সে প্রভুর কথামত কার্য্য করিত। মণিভদ্র নিজের কায সারিয়া বেলা দুপুরে আসিয়া ভাঁড়ার হইতে কয়েক মুষ্টি চাউল বাহির করিয়া দিত, তাহাই মোহিকা রন্ধন করিত। মণিভদ্র খাইলে পর অতি অল্পমাত্র যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই খাইয়া মোহিকা প্রায় অনাহারে জীবন ধারণ করিত। সন্ধ্যার পরও এই ব্যবস্থা। এই প্রকারে মোহিকা সঙ্গিনী বিহীনা ক্ষুধার্ত্তা বসন ভূষণ বিহীনা একাকিনী পাষণ্ড মণিভদ্রের বাটীতে বাস করিতে লাগিল।

কৃপণ মণিভদ্রের একটা প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান এই ছিল যে,সে মধ্যাহ্ন ভোজনকালে একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া ভোজনে বসিত। অধর্ম্মশীল মণিভদ্রের ধর্ম্মকে ফাঁকি দিবার এই কৌশলে এতদিন কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু বধূ ঘরে আসিলে পর, বিশেষতঃ বধূ বিদ্রোহী হইলে পর, মণিভদ্রের এই ব্রাহ্মণ ভোজন করান ব্যাপার কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। অবাধ্য স্ত্রীর সম্মুখে পরপুরুষকে কি করিয়া উপস্থিত করা যায়? ওদিকে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাপক্ষালন তাহার প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাও কোনমতে উঠাইয়া দেওয়া যায় না, অথচ কি জানি যদি অন্য পুরুষ অন্দরে আসিলে তাহার পত্নীকে ভুলাইয়া লইয়া যায়! বেচারা মহা মুস্কিলে পড়িল। যাহা হউক এখন হইতে সে নিয়ম করিল যে যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, তাহাকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া দিবে, "হে বিপ্র, আমার গৃহে অবনত বদনে ভোজন করিবে। যদি আমার পত্নীকে দর্শন কর, তাহা হইলে তোমার বিড়ম্বনা করিব।" তা, সকল ব্রাহ্মণ কি আর অবনত বদনে ভোজন করে? এইরূপ অদ্ভুত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে বরং তাহার বিপরীত করিবারই একটা স্পৃহা জন্মে। সুতরাং ঊর্দ্ধ বদনে ভোজনকারী বিপ্রও বহু জুটিল এবং মণিভদ্রও তাহার দারোয়ানের সাহায্যে তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রহারাদি দ্বারা বিড়ম্বিত করিয়াছিল; যাহারা একবার প্রহারিত হইয়াছিল, তাহারা আর মণিভদ্রের বাড়ীর চতুঃসীমানা মাড়াইত না। এই পাষণ্ডের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিকারও নাই, কারণ রাজা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে।

একদা পুষ্প নামক দর্শনীয় কৃতি ব্রাহ্মণ যুবক তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে ঐ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে গৃহে যাইতে লাগিলেন। এমন সময় একজন নাগরিক তাঁহাকে বলিয়া দিল, আপনি ঘুরিতেছেন কেন? মণিভদ্র ক্ষত্রিয়ের বাড়ী ঐ, ওখানে যান, গেলেই তাহার বাড়ীতে ভোজন পাইবেন। নাগরিক দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া মণিভদ্রের বাড়ী দেখাইয়া দিল কি না তাহা পুঁথিতে লেখে না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ পুষ্প, মণিভদ্রের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মণিভদ্রের ত ব্রাহ্মণ প্রয়োজনই ছিল, ভোজনের সময়ও হইয়াছে। সুতরাং মণিভদ্র পুষ্পকে ভোজন দান করিতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল, কিন্তু তাহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে তুমি অধোবদনে ভোজন করিবে, আমার প্রিয়াকে দেখিতে পাইবে না, রাজী আছ? পুষ্প বলিল, "আপনার প্রিয়াকে দেখিবার আমার আবশ্যক কি? আমি ক্ষুধিত, আমি ভোজন করিব মাত্র। আর আমার চরিত্র বিষয়ে আপনার সন্দেহের কারণ নাই। আমি বেদাধ্যয়ননিরত, অধিকন্তু তীর্থযাত্রা করিয়াছি। পরদার অবলোকন করিবার অবসর আমার নাই।" মণিভদ্র অতিশয় প্রীত হইল। বলিল, "চল, তোমাকে উত্তমরূপে ভোজন

করাইব ও ভোজন দক্ষিণাও দিব।" এই বলিয়া মণিভদ্র অন্দরে প্রবেশ করিয়া ভোজন ভাণ্ডার হইতে চাউল ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল ও স্ত্রীকে রন্ধন করিতে বলিল। ব্রাহ্মণ পুষ্প বহির্ব্বাটীতে সেই নপুংসক দ্বারবানের নিকট বসিয়া রহিলেন।

অতঃপর আহারের আয়োজন সমাপ্ত হইলে মণিভদ্র যথারীতি ব্রাহ্মণ পুষ্পের পদ প্রক্ষালন করাইয়া, তাঁহাকে ভোজনস্থানে লইয়া গিয়া আসনে উপবেশন করাইল। মোহিকা অন্ন পরিবেষণ করিতেছিলেন। পুষ্প প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী অবনত বদনে ছিলেন, কিন্তু অবনত বদনেও পরিবেষণকারিণীর পদপঙ্কজ দেখা যায়। পুষ্প এই যুবতীর সুন্দর পা দুখানি একবার দেখিলেন। দেখিয়া মোহিত হইলেন। মোহিকা অসামান্য লাবণ্যবতী ছিলেন। যাহার এমন সুন্দর পা, তাহার মুখপদ্ম কি অপূর্ব্বই হইবে! যুবক পুষ্প সুতরাং কৌতূহল দমন করিতে পারিল না—পা দুখানি দেখিয়াই নিরস্ত হইল না, এই যুবতীর মুখখানিও দেখিয়া ফেলিল। ভগবান পুষ্পধন্বা অমনই অন্তরীক্ষ হইতে সুযোগ বুঝিয়া একটী নহে, দুইটী বাণই এই যুবক যুবতীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

নিমেষে এই অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ মণিভদ্র ক্রোধে অধীর হইয়া দ্বারবানকে হাঁকিল। প্রভুভক্ত দ্বারবান উপস্থিত হইল। মণিভদ্র হুকুম করিল—লাগাও। বুদ্ধিমান দ্বারবান এরূপ ঘটনায় অভ্যস্ত ছিল, সে দ্বিধামাত্র না করিয়া পুষ্পের মস্তকে বিষম প্রহার করিল। প্রহারের চোটে ব্রাহ্মণ রুধিরাপ্লুত দেহে ভূমিতলে পতিত হইল। নৃশংস দ্বারবান্ তখন পদাঘাত করিতে করিতে তাহাকে রাস্তায় নিয়া ফেলিল। পথে লোক জমিয়া গেল, সকলে হাহাকার করিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও এমন সাহস হইল না যে এই নৃশংস ব্যাপারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়—মণিভদ্রের ভয়ে সকলেই ভীত। যাহা হউক, দ্বারবান্ প্রহার শেষ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলে পর পথের লোকজন পুষ্পের সেবা শুশ্রূষা করিল।

ব্রাহ্মণ পুষ্প এই সেবায় একটু সুস্থ হইয়া, ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেন। তিনি সকলকে বলিলেন, "এই দেশ কি অরাজক? আমি ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার নির্দ্দোষ আমাকে এইরূপ অন্যায় ভাবে প্রহার করিল?" লোকেরা বলিল, "কি করিবেন মহাশয়! এই প্রহার হজম করিতে হইবে। এই মণিভদ্র রাজ প্রসাদে বলীয়ান। রাজার ভয়ে কেহই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, চলুন আপনাকে আমরাই ভোজন করাইব।" বলা বাহুল্য পুষ্পের ভোজন আরম্ভই হয় নাই। অভুক্ত ব্রাহ্মণ এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়াছিল।

পুষ্পের তখন বেদ ধ্যয়ন চুলায় গিয়াছে। সে তখন ক্রোধে উন্মত্ত। ভোজনের কথ শুনিয়া বলিল, "কি! আমি ভোজন করিব? না, কখনই না। যতদিন আমি এই পাষণ্ডের দুষ্কর্ম্মের প্রতিকার না করিতে পারি, ততদিন আমি আহার ত্যাগ করিলাম। ব্রাহ্মণের এই প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করিবই।"

পুষ্প ঐ নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোথায় কোন্ দেবতার উপাসনা করিয়া তিনি অভিচার মন্ত্র লাভ করিতে পারেন। এ বিষয় সম্যক্ তথ্য অবগত হইয়া তিনি দিবাকরের উদ্দেশে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ শরীরের মাংস দ্বারা হোম ইত্যাদি কঠোর কর্ম্ম করার পর ভগবান্ সূর্য্যের দর্শন লাভ করিয়া বর চাহিলেন, "আমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চাই। হীন কুব্জ মণিভদ্র আমাকে প্রহার করিয়াছে। আমাকে দুইটী গুটিকা দেন। শ্বেত গুটিকা মুখে ধারণ করিয়া যেন আমি যথেচ্ছ রূপ-ধারণ করিতে পারি। দ্বিতীয় গুটিকা মুখে ধারণ করিলে যেন আমার সহজরূপ ফিরিয়া পাই। দ্বিতীয়তঃ এই বর দিবেন যে ঐ মণিভদ্রের

ধনধান্য, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব স্বভাব চরিত্র যাহা কিছু ব্যাপার সব যেন আমি অবিলম্বে জ্ঞাত হইতে পারি। তৃতীয়তঃ আমার কর্ত্তিত শরীর যেন আপনার কৃপায় পূর্ব্বের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ভগবান্ প্রীত হইয়া তিনটী বরই দিয়া পুষ্পকে আপ্যায়িত করিলেন।

প্রতিশোধ লইবার উপায় স্থির হইল, সুতরাং বহু দিন পরে পুষ্প উত্তমরূপে ভোজন করিলেন; এত দিন তিনি অনাহারে ছিলেন। তারপর তিনি বিদিশা নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ও নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া মুখে শুক্র বটিকা ধারণ করিলেন। অমনই তিনি মণিভদ্রের রূপ ধারণ করিলেন; সেই কুব্জাকৃতি, সেই বিরূপ শরীর, সেইরূপ পরিধেয়। মণিভদ্রবেশী পুষ্প মণিভদ্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন, দ্বারপালকে মণিভদ্রের স্বরেই আহ্বান করিলেন। দ্বারপাল আসিলে তাহাকে বস্ত্র পারিতোষিক দান করিলেন। দ্বারপাল কোন সন্দেহ অবশ্যই করিল না, ভাবিল, আমার কৃপণ প্রভু না জানি কি কারণে আজ আমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন! তখন পুষ্প খোজাকে বলিলেন, দেখ তুমি বিশেষ সাবধানে দ্বার রক্ষা করিবে। একজন দুষ্টলোক আমারই বেশ ধারণ করিয়া নগরে ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া আসিলাম। সে তোমার কাছে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিবে, তোমাকে প্রলোভনও দেখাইবে, তাহাকে কিছুতেই গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না। পুষ্প সময় বুঝিয়া মণিভদ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তখন মণিভদ্র বাড়ীতে ছিল না, কার্য্যবশে নগরে গিয়াছিল।

মণিভদ্রবেশী পুষ্প অন্তঃপুরে সোজা প্রবেশ করিয়া সহজ ভাবে মোহিকাকে বলিল, "দেখ আজ নগরে আমি বড় একটা কুলক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছি। পথে দেখিলাম আমার স্বর্গগত পিতার প্রেতাত্মা মলিন বসনে একস্থানে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, রে পাপিষ্ঠ তোকে ধিক্। তুই চোর, শ্বশুরকে বঞ্চিত করিয়া তাহার সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিস্। তুই চোর, ধর্ম্মপত্নীকে বিধবার মত বস্ত্রালঙ্কারে হীন ভাবে রাখিয়াছিস্, তাহাকে ইচ্ছামত ভোজনও করিতে দিস্ না। শীঘ্র গিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ নতুবা আমরা তোর পিতৃপুরুষেরা স্বর্গ হইতে পতিত হইব। যা চোর, শ্বশুরকে অযুত মুদ্রা প্রদান কর্; আর বধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দে, উত্তম আহারে পরিতুষ্ট কর্। এই শুনিয়া আমার মনে বড় ভয় হইয়াছে। আজ হইতে তোমাকে ভাল ভাবে রাখিব।" এই বলিয়া পুষ্প মণিভদ্রের বাক্স পেটরা খুলিয়া বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিয়া মোহিকাকে দিল। ভোজনের ভাল বন্দোবস্ত করিল। দেবতার বরে কোথায় কি আছে পুষ্প সমস্তই জানিতে পারিয়াছিল। মোহিকা "স্বামীর" এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইল—অথচ বস্ত্রালঙ্কার পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিতও হইল।

এদিকে আসল মণিভদ্র গৃহে আসিতেছে। দ্বারে আসিয়া যেমনই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনই দ্বারপাল পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। মণিভদ্র তো অবাক! সে বলে প্রবেশ করিতে যাইলে দ্বারপাল তাহাকে গালাগালি দিল, ধাক্কা মারিল। ক্রমে মণিভদ্রে ও দ্বারপালে যুদ্ধ উপস্থিত। কিন্তু কুব্জ ও দুর্ব্বল মণিভদ্র দ্বারপালের দণ্ডাঘাতে ভূপতিত হইল। দ্বারে এই সোরগোলে লোক জমিয়া গেল। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "দ্বারপালের আজ সর্ব্বনাশ হইবে, রাজা এখনই ইহার মস্তক লইবে।" দ্বারপাল বলিল, "আমার দোষ কি? আমার প্রভু মণিভদ্র তো গৃহেই আছেন। এ ব্যাটা কোন বহুরূপী অসৎ উদ্দেশ্যে মণিভদ্রের বেশে এখানে আসিয়াছে। আমার প্রভু এই দুষ্টের কথা আগেই আমাকে বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি মাত্র আমার প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি।" এমন সময়ে পুষ্পও দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আহা এ বেচারাকে এত মারিয়াছ? এ কুঁজো, ইহাকে এত মারা উচিত হয় নাই। আমি

ইহাকে জানি, এ একজন বেশধর পুরুষ। পয়সার জন্য বেশ ধারণ করে।" লোকে দুই মণিভদ্র দেখিয়া অবাক্। আসল মণিভদ্র, নকল মণিভদ্রকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল, বুঝিল, এ মণিভদ্র সাজিয়াছে। রাগিয়া বলিল, "ব্যাটা চোর, আমার বেশে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিস? আচ্ছা দাঁড়া, এই আমি চলিলাম রাজার কাছে, তোর কি দুর্দ্দশা করি দেখ। ভাল চাস্ তো এখনই পালা।" এই বলিয়া মণিভদ্র পুষ্পকে এক চপেটাঘাত করিল। পুষ্পও তাহা সুদ সমেত ফিরাইয়া দিল। দুই কুঞ্জে তখন রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মণিভদ্রের আত্মীয় কুটুম্বেরাও ইতোমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুই মণিভদ্রকে দেখিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহারা এখন যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন ও দুই মণিভদ্রকে ধরিয়া নিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত করিলেন।

রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া দুই মণিভদ্রকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জেরা করিলেন। দুজনেই সঠিক উত্তর দেয়। রাজা গোলে পড়িলেন, এই দুইজনের মধ্যে কে জাল, কে আসল, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। সাক্ষীরাও কেহ বলিতে পারে না। দ্বারপালকে আনাইয়াও কোন লাভ হইল না, সে পুষ্পকে সনাক্ত করিল। তা, সে উৎকোচের বশীভূত হইতে পারে। তখন রাজার আদেশে মণিভদ্রের পত্নী মোহিকাকে বিচারালয়ে আনা হইল। রাজা বিজ্ঞাপিত করিলেন যে এই স্ত্রী যাহাকে সনাক্ত করিবে, সেই আসল। কারণ স্ত্রী নিজ স্বামীকে যেমন চিনিতে পারে, এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও পারিবে না। সকলে এই যুক্তিতে সায় দিলেন।

অবগুণ্ঠনবতী মোহিকা সভায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলেন প্রমথ মণিভদ্র নকল। মনে মনে বলিলেন, "কিন্তু এখন আমি বলি কি? সন্দেহবায়ুগ্রস্ত এই মণিভদ্র আমার জীবন বিষময় করিয়াছে, আমার পিতাকে বঞ্চিত করিয়াছে, আমায় অশেষ লাঞ্ছনা এই মণিভদ্রের সাহচর্য্যে অবশ্যম্ভাবী। আজ সুযোগ উপস্থিত, এই দুষ্ট ব্যক্তির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব। অপর পক্ষে এই জাল মণিভদ্র এইটুকু সময় মধ্যেই আমাকে অভূতপূর্ব্ব সুখ দিয়াছে, আমাকে বস্ত্রালঙ্কার ও উত্তম ভোজন দিয়াছে, অধিকন্তু আমার পিতাকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিবে বলিয়াছে। ইহার কথায় বিশ্বাস করা যায়। সুতরাং ইহাকেই আমার স্বামী বলা উচিত।" এই ভাবিয়া মোহিকা দুই মণিভদ্রের দিকেই দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন আসল মণিভদ্র রক্তাক্ত দেহে ভ্রুকুটি কুটিল নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। মোহিকার মনে আর দ্বিধা রহিল না। পুষ্পের দিকে তাকাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত বলিলেন, "মহারাজ, ইনিই আমার স্বামী। আমার পিতা ইঁহাকেই আমার দান করিয়াছেন। আর ঐ দুরাচার আমার স্বামীর রূপ ধারণ করিয়া গুপ্তভাবে আমাকে প্রার্থনা করিয়াছে।"

এই উক্তির উপর আর কথা নাই। রাজা হুকুম দিলেন, মণিভদ্রকে ফাঁসি দেওয়া হউক। ঘাতক আসিয়া তখনই মণিভদ্রকে ধরিয়া লইয়া গেল। বেচারা নিজের স্ত্রীর এই আচরণ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। যখন তাহাকে ফাঁসিতে লট্‌কাইবার ব্যবস্থা করিল, তখন তাহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন রোষে ক্ষোভে দুঃখে সে সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রতি গালি দিতে দিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

পুষ্প মোহিকা সুন্দরীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মণিভদ্রের আত্মীয় স্বজন সকলেই ভাবিল আসল মণিভদ্রকেই তাহারা পাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। তাহারা জয়ধ্বনি করিতে করিতে মণিভদ্রের গৃহে সমবেত হইল। সমবেত লোকদিগকে পুষ্প বলিলেন, "দেখুন, আপনারা সকলে আমার একটা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আজ এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া তাহা আপনাদের সমীপে স্বীকার না করিয়া আর উপায় নাই। আজ আমার এই পত্নীর কৃপাতেই আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। অদ্য হইতে আমি অনুরূপ জীবন

যাপন করিব। এতকাল আমি কোন কারণ বশতঃ এতবড় ধনী হইয়াও কার্পণ্য অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে আমি সব হারাইতে বসিয়াছিলাম! আর আমি কার্পণ্য করিব না। আমি অদ্য হইতে আপনাদের সকলকে অংশী করিয়া আমার এই বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিব। আমার স্ত্রীও আমার কার্পণ্য আর অনুভব করিবে না।" এই বলিয়া পুষ্প প্রত্যেক আত্মীয়কে নাম ধরিয়া আহ্বান করিয়া যথাযোগ্য বস্ত্রাদি উপহার দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন, ও প্রতিবেশী অন্ধ আতুর সকলকে ডাকিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন ও বস্ত্রাদি দিয়া বিদায় করিলেন। মণিভদ্রের জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

রাত্রিকালে মোহিকা পুষ্পকে বলিলেন, "আমি আপনার পদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে আপনিই আমার জীবিত কালের ভর্ত্তা হইলেন, কিন্তু আমাকে একটা কথা বলিবেন কি? আপনি যে কে তা তো আমি জানি। আপনি যখন আমাকে বস্ত্রভূষণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন, তখনই আপনি কে তাহা আমার অন্তর বলিয়া দিয়াছিল। এখন আমার জানিতে কৌতূহল হইয়াছে যে আপনি এরূপ বেশ কেমন করিয়া ধারণ করিলেন? এ ইন্দ্রজাল, না কোনও মন্ত্রের সাধন? আমি তো আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমাকে বলিতে দোষ নাই, আমি কখনও আপনার কাপট্যের কথা প্রকাশ করিব না। আমি আপনার পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি!" পুষ্প এই কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন ও সহাস্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেই ব্রাহ্মণ যুবক, যাহাকে তোমার স্বামী বিড়ম্বিত করিয়াছিল।" তার পর পুষ্প রবিদেবের আরাধনা ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। তখন মোহিকা মোহিত হইয়া বলিলেন, "আপনার পূর্ব্বের তরুণরূপ গ্রহণ করুন।" পুষ্প তাহাই করিয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিলেন।

অতঃপর পুষ্প গৃহে ও গৃহিণীতে অধিষ্ঠিত হইয়া মণিভদ্ররূপে বসতি করিতে লাগিলেন। দিবসে তিনি লোক সমাজ মণিভদ্ররূপ ধারণ করেন; রাত্রিতে স্ত্রীর সম্মুখে পুষ্প ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করেন। মণিভদ্রের ব্যবসায় কার্য্যও তিনি চালাইতে লাগিলেন। প্রভূত অর্থ ছিল, প্রভূত অর্থের আগমও হইতে লাগিল। কালক্রমে পুষ্প পুত্রকন্যা পৌত্র পৌত্রী লাভ করিলেন। সুখে দিন কাটিতে লাগিল।

কিন্তু "চির দিন কভু সমান না যায়।" যখন পুষ্প বার্দ্ধক্য দশায় উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। বৃদ্ধ পুষ্প ভাবিলেন, আমি কি মহৎ পাপই করিয়াছি! মণিভদ্রের প্রাণনাশের কারণ হইয়াছি, তাহার ভার্য্যা হরণ করিয়াছি, তাহার ধন অধিকার করিয়া ভোগ করিতেছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আর না, আমি অবিলম্বে এই সব বিষয়-আশয় পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিব ও তথায় পুরশ্চরণাদি করিয়া আমার ও পত্নীর পাপ ক্ষয় করিব। এই ভাবিয়া পুষ্প সকল ব্যবস্থা করিয়া তীর্থ-ভ্রমণে প্রস্থান করিলেন।

হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে গিয়া পুষ্প ব্রাহ্মণদিগকে সম্মত করিয়া নিজের পাপ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন ও প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাহার এই গুরু পাপের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া হইয়া বলিল, "এ পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ হইবে না।" পুষ্প এখন অনুতপ্ত, কৃতকর্ম্মের দংশনে ক্ষিপ্ত। সে কাঁদিয়া ফেলিল। তখন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চণ্ডশর্ম্মা নামে একজন কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "এ ব্যক্তি পাপ করিয়াছে সত্য, কিন্তু রাজাই তো মণিভদ্রকে মারিয়াছেন। তিনিই বিচারের জন্য দায়ী, মণিভদ্রের মৃত্যুর পাপ তাঁহাতেই সম্যক্ অর্শিবে। আর পরদার গ্রহণ জনিত যে পাপ ইহার হইয়াছে, তাহার জন্য ইহার স্ত্রীই দায়ী—সেই জানিয়া শুনিয়া ইহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। অধিকন্তু এ এখন স্বীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত ও নিজের পাপ স্বেচ্ছায় নিজেই কীর্ত্তন করিতেছে। তজ্জন্য শাস্ত্রানুসারে ইহার পাপ ক্ষয় হইবে।" এইরূপ বাদানুবাদের পর, ব্রাহ্মণ চণ্ডশর্ম্মা পুষ্পকে

পুরশ্চরণ প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। পুষ্প কৃতমনোরথ হইয়া সস্ত্রীক বহু দান করিলেন, চণ্ডশর্ম্মাকে স্বরস্বতী তীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, "অনেক মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিলেন, বিশেষতঃ পুষ্পের আরাধ্য দেবতা সূর্য্যদেবের মন্দির। কালসহকারে পুষ্প নিষ্পাপ হইয়া মৃত্যুর পর জ্যোতির্ম্ময় রথে স্বর্গে গমন করিলেন। মোহিকা কোথায় গেলেন, স্বর্গে না নরকে, তাহার উল্লেখ পুরাণে নাই। তবে আমরা অনুমান করিতে পারি যে তিনিও স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে গমন করিলেন।

পৌরাণিক কাহিনী মাত্রই ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক। মণিভদ্রের এই কাহিনী হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, যত রকম পাপই হউক না কেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। অধিকন্তু মানসিক প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইলেই তবে বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গত হয়। সাধারণতঃ লোকে পাপীকে এত ঘৃণা করে যে সে বেচারা অনুতপ্ত হইলেও সমাজের পীড়নে 'মরিয়া' হইয়া আরও গুরুতর পাপের পথে অগ্রসর হইয়া প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করে। সুতরাং কঠোর সমাজপতিদের মধ্যে চণ্ডশর্ম্মার মত উদারচিত্ত করুণাপরায়ণ ব্যবস্থাবিদ্‌গণ অতীব প্রয়োজনীয়। এরূপ উদারমতাবলম্বীরা কিন্তু সমাজ কর্ত্তৃক ত্যক্ত হয়। এই কাহিনীর উপসংহারে পুরাণে লিখিত আছে যে বিপ্র চণ্ডশর্ম্মা অন্য ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারা পাতিত হইয়াছিলেন। কাহিনীর সারাংশ এই যে পাপীকে ঘৃণা করিতে নাই, পাপকে মাত্র ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের আছে।

এই কাহিনী স্কন্দ পুরাণ হইতে লওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতের নৈতিক জীবনের ইতিহাসও এই গল্প হইতে অনুমান করা যায়। প্রাচীন ভারতেও এখনকার মত লোকে ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, বর্ত্তমান কালের মতই অন্যায় কায করিয়া ফেলিত। জাল প্রতাপচাঁদ বা জাল রাজকুমার প্রাচীন ভারতেও ছিল। মনুষ্যের চরিত্র সব কালেই প্রায় একরূপ। মানুষ সর্ব্ব সময়েই দুর্ব্বলচিত্ত ও পাপের প্রতি হেলিয়া পড়ে। সুতরাং এইরূপ পাপীকে করুণার চক্ষে দেখাই মানুষের কর্ত্তব্য।

মণিভদ্রের এই কাহিনীতে পুরাণকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল বেশীর ভাগ এই উপাখ্যানের উপসংহারের দিকে। সুতরাং আধুনিক উপন্যাসে নায়ক নায়িকার মনের ভিতর ঘটনা বৈচিত্র্যে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহার নিদর্শন এই প্রাচীন গল্পে প্রায় নাই। আধুনিক ঔপন্যাসিক এই মণিভদ্রের কাহিনীকে মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারা কিরূপে সাজাইবেন, তাহার উদাহরণ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তদীয় "রত্ন-দীপ" নামক উপন্যাসে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই উপ-ন্যাসের উপাখ্যান ভাগ এইরূপ :—

খুস্রুপুর নামক ছোট একটী রেল ষ্টেসনের ছোট বাবু হইয়াছেন রাখাল ভট্টাচার্য্য। তিনি বিবাহিত, কিন্তু থাকেন একাকী, যেহেতু স্ত্রী কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে আসিতে চাহে না। রাখালবাবু একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য সিক্-রিপোর্ট করিয়া বাড়ী গেলেন। স্ত্রীকে পিত্রালয় হইতে আনাইয়া রাখিতে বাড়ীতে অগ্রজকে পূর্ব্বেই পত্র লেখা হইয়াছিল। তাহাকে আনাও হইয়াছিল, কিন্তু রাখাল বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী সেই রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রাখাল খুঁজিতে বাহির হইল। শ্বশুর বাড়ী নিকটস্থ গ্রামে; তথায়ও স্ত্রীকে পাইল না। ফলে রাখাল পীড়িত হইয়া পড়িল। সারিয়া উঠিয়া ভগ্নমনে যখন খস্রুপুরে আসিয়া কাযে যোগ দিল, তখন দেখিল তাহাকে ডিস্‌-মিস্ করার হুকুম হইয়াছে। রাখালের মানসিক অবস্থা কল্পনা করুন। বেচারা গৃহসুখ হইতে বঞ্চিত, এখন আহারের ব্যবস্থাও বুঝি থাকে না। এ অবস্থায় রাখাল ঠিক করিল, দূর ছাই, সন্ন্যাসী হইয়া যাইব।

সেই দিন রাত্রের প্যাসেঞ্জার গাড়ী যখন খস্রুপুরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখা গেল একজন সন্ন্যাসী হঠাৎ হার্টফেল্ করিয়া গাড়ীতেই মরিয়াছে। গার্ড ঐ সন্ন্যাসীর লাস তথায় নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

রাখাল সন্ন্যাসীর লাস তল্পীতল্পা সহ মালঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল। রাত্রে আর গাড়ী নাই, রাখালকে ষ্টেসন ঘরে শুইতে হইত। ছোট ষ্টেসন, আর কেহ রাত্রে তথায় থাকিত না, একটা খালাসী ছিল, সেও ছুটি নিয়া কোথায় গেল। রাত্রে একা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাখালের খেয়াল হইল, দেখি না কেন, মৃত সন্ন্যাসীর তল্পীতল্পার মধ্যে প্রভূত অর্থও পাওয়া যাইতে পারে। মালঘর খুলিয়া রাখাল অনুসন্ধান করিল। সন্ন্যাসীর অঙ্গে চাবি পাইল, তাহার পেটরা খুলিল, এক থলিয়ার মধ্যে অনেকগুলি টাকা পাইল, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। আর পাইল সন্ন্যাসীর কতকগুলি খাতা পুথি-পত্র। রাখাল এই সব লইয়া বাহিরে আসিল। সকাল বেলা পুলিস তদারকের সময় দারোগা ও অন্যান্য সকলে একটা বিষয় লক্ষ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—সন্ন্যাসী ও রাখালের আকারগত সাদৃশ্য। রাখালকে দুএকজন রসিকতাও করিল—বাবু, সন্ন্যাসী কি তোমার ভাই ছিল?

রাখাল বাসায় গিয়া সন্ন্যাসীর পুথি-পত্র ঘাটিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর এক বিস্তৃত ডায়েরী রহিয়াছে। উহাতে সন্ন্যাসীর জীবনের বাল্যকালাবধি ইতিহাস রহিয়াছে। রাখাল সমস্ত পড়িল। সন্ন্যাসীর নাম ভবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাগুলিপাড়া গ্রামের জমিদারের পুত্র, ছোট বেলায়—বিবাহের পর, স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। চকিতে রাখালের মাথায় ফন্দি খেলিল, সে তো মৃত সন্ন্যাসীরই মত দেখিতে, বয়সও সেই রকম, ভবেন্দ্র সাজিয়া এই জমিদারি লাভ করা যায় না কি? সব কাগজ পত্র ভাল করিয়া পড়িয়া, এই কার্য্যই রাখালের কর্ত্তব্য স্থির হইল। পরদিন রাখাল কাশী গেল, সন্ন্যাসীর চাল-চলন শিখিল, ডায়েরীখানা মুখস্ত করিল, যাহাতে ধরা না পড়িয়া যায় তজ্জন্য গোপনে অন্য বেশে বাগুলিপাড়ায় গিয়া লোক-জন চিনিয়া আসিল। ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, একদিনমাত্র পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া বাগুলিপাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই তাহাকে ভবেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিল, বিশেষতঃ যখন বৃদ্ধ দেওয়ান রঘুনাথ মজুমদার তাহাকে ভবেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন আর কথা কি? রাণীমা—ভবেন্দ্রের জননী—লাল ভবেন্দ্রকে বুকে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন—গ্রামে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

কিন্তু বৌরাণী—ভবেন্দ্রের স্ত্রী—তাহাকে রাখাল ঠকাইতে পারিবে কি? এইখানে রাখালের খটকা ছিল। তাই রাখাল প্রচার করিল, কোন ব্রত উপলক্ষে সে ছয় মাস সন্ন্যাসী বেশেই থাকিবে ও স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে না। কিন্তু তা হইলেও তো বৌরাণীর সম্মুখীন হইতে হইবে? রাখাল কপাল ঠুকিয়া বৌরাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বৌরাণীও সরল প্রাণে অকপট বিশ্বাসে, আনন্দে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৌরাণীর দোষ কি? তাহার বয়স যখন আট, ভবেন্দ্র যখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক, তখন তাহাদের বিবাহ হয়—বিবাহের অল্প দিন পরেই ভবেন্দ্র চলিয়া যায়,—তারপর ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং বৌরাণীর স্বামী সাহচর্য্য ঘটে নাই, স্বামীকে চিনিবার কোন উপায় তাহার ছিল না। শাশুড়ী চিনিয়াছেন, বাস, আর কোন সন্দেহ হইতে পারে কি?

রাখাল এই প্রকারে ভবেন্দ্র সাজিয়া বাস করিতে লাগিল, কিন্তু পৌরাণিক মণিভদ্রের মত পরদার গ্রহণটা অবিলম্বেই করিল না। অথচ পল্লী-বিড়ম্বিত রাখাল এই বৌরাণীর অকৃত্রিম প্রেম পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে রাখাল বৌরাণীগত প্রাণ হইয়া উঠিল। বিষয় কর্ম্ম কিছুই দেখে না, কেবল বৌরাণীর কাছে বসিয়া থাকে। স্পর্শ অবশ্য করে না, কিন্তু চক্ষের পরশ তো বাকি থাকে না! এই যে রাখাল বৌরাণীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবে না, ইহা লইয়া বৌরাণী একদিন পরিহাসছলে অভিমান করিয়াছিলেন। বৌরাণীর জ্বর হইয়াছিল, রাখাল দেখিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গায়ে জ্বর আছে? বৌরাণী বলিলেন, আমি কি জানি, গা জানে। এইরূপ প্রণয় কোপের আরও

অভিনয় হইয়াছিল। রাখাল ক্রমেই এই যুবতীর প্রেমে অধিকতর জড়িত হইতে লাগিল। যুবক যুবতী—অধিকন্তু স্বামী স্ত্রী—বাস্তব জীবনে কতকাল এইরূপ অসিধার ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? মুগ্ধ রাখাল তাই একদিন বৌরাণীকে বলিল, "ভাব্‌ছি ব্রতট্রত ঢের হয়েছে, আর কায নেই, এইখানেই একে সাঙ্গ করে দিই।" পুরাণকার জাল মণিভদ্রের এই প্রকার কোন মনের সঙ্কোচ লিপিবদ্ধ করেন নাই। ব্রাহ্মণ পুষ্প অম্লান বদনে দ্বিধা মাত্র না করিয়া প্রতিহিংসাবশে পরদার গ্রহণ করিয়াছিল। স্ত্রীর ভালবাসায় বঞ্চিত রাখাল প্রেমপরায়ণা নারী পাইয়াও অনেক দ্বিধা করিয়াছে। এ দ্বিধা সে না করিলেও পারিত, তাহাকে তো কেহই জাল বলিয়া ধরিতে পারে নাই। আধুনিক গ্রন্থকার ব্যক্তিগত চরিত্রের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্তই রাখালের মনের ভাবে এই দ্বন্দ্বের অবতারণা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, বৌরাণীর উত্তর অতি সুন্দর। দীর্ঘকাল পরে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে পাইয়াও বৌরাণীর ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত হয় নাই। রাখালের এই কথায় তাঁহারও হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি পতির সহধর্ম্মচারিণীর মতনই উত্তর করিলেন, "তা কি হ'তে পারে? আমি কি তা হ'তে দিতে পারি? কখনই নয়। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায় না হ'য়ে কি অধর্ম্মের কারণ হব?" ধর্ম্মপত্নীর মতই কথা বটে। মণিভদ্রের উপাখ্যানে মোহিকার সতীত্বের এই তেজ দেখি না। পুরাণকার বরং মোহিকাকে কদর্য্য কামপরায়ণা রমণীভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। মোহিকা জাল মণিভদ্রকে প্রথমেই চিনিতে পারিয়াছিল, তবু তাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। মোহিকাকে আমরা সহধর্ম্মচারিণী না বলিয়া দ্বিচারিণী বলিতে বাধ্য। তবে এও মনে রাখিতে হইবে যে, মোহিকার দ্বিচারিণী হইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান ছিল। অমন কদর্য্য স্বভাবের স্বামী পাইয়া কোমলস্বভাবা স্ত্রীলোক বিদ্রোহী না হইয়া পারে না, যদিও শাস্ত্রের আদর্শ তাহা নহে। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর কত সহ্য করিতে পারে? সুতরাং পৌরাণিক মোহিকাকে আমরা করুণার চক্ষেই দেখিব।

প্রেমময়ী সাধ্বী রমণীর প্রেমের কি পবিত্র শক্তি! রাখাল সরলা বৌরাণীর অকৃত্রিম প্রেমের সিঞ্চনে পবিত্র হইতে লাগিল। এই রমণীর সর্ব্বনাশ করিতে সে আসিয়াছে। ততস্তু কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ—এমন যে অপার্থিব প্রেমের বস্তু বৌরাণী তাহাকে রাখাল চূর্ণিত করিবে? যতই রাখাল বৌরাণীর প্রেমে ডুবিতে লাগিল, ততই তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি স্ফুরিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সুখস্বপ্ন সে স্বহস্তে ভাঙ্গে কি করিয়া? অথচ যাহাকে ভালবাসি তাহাকে রক্ষা করাই,—ভালবাসার পাত্রের জন্ত নিজেকে বলিদান দেওয়াই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। অন্তরে রাখাল তাহা ক্রমেই বুঝিতেছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু করিয়া ফেলার মত বল সে সঞ্চয় করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় একদিন রাখাল সামান্য একটা ঘটনায় অন্তরে এমন ঘা খাইল যে, সে নিজেকে বলিদান দেওয়াই ঠিক করিল। এক কাছারীতে যাইবার পথে সে দেখিল একজন ইতর মুসলমান তাহার আবাল্য পোষিত মেষশাবককে জমিদারের করাল কর্ম্মচারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত। এই ব্যাপার দেখিয়া রাখালের আর নিজের কার্য্যসম্বন্ধে ইতস্ততঃ রহিল না। রাখাল কাতর ভাবে ভাবিতে লাগিল—"এই নিরক্ষর নীচ মুসলমানের যেটুকু ধর্ম্মজ্ঞান আছে, আমার কি তাও নেই? সে যাকে পেয়ার করে, অন্ত কেউ পাছে তার গলায় ছুরি দেয়, এ জন্য সে আপনার জান কবুল করেছে। আমি যাকে ভালবাসি, আমি যে স্বহস্তে তার গলায় ছুরি দিতে উদ্যত হয়েছি। আমায় ধিক্—আমার অদৃষ্টকে ধিক।"

রাখালের আর দ্বিধা থাকিল না। সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়াই বাড়ী ফিরিল ও অকপটে বৌরাণীর নামে একখানি পত্রে নিজের পাপ কাহিনী বিবৃত করিল।

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ পুষ্পের অনুশোচনা সারা জীবনে না হইয়া বৃদ্ধ বয়সে হইয়াছিল এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। বেদধ্যয়নরত, তীর্থযাত্রী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পুষ্পের অন্তঃকরণটা কি অল্পশিক্ষিত, দরিদ্র, সুতরাং লোভী রাখালের দুর্ব্বল চিত্ত হইতে এতই হীন ছিল? পুরাণকার এ কি অস্বাভাবিক বর্ণনা করিয়াছেন? অথবা পুরাণকার কি একেবারে উপদেশমূলক (didactic) গল্প লিখিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তির সর্ব্বগুণনাশিত্বের উদাহরণ উপস্থিত করিয়াছেন? তাই হইবে। গীতাতে যে উল্লেখ আছে ধর্ম্মজীবনের পরিপন্থী কাম ও ক্রোধ—

কাম এষ ক্রোধঃ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।

—তাহারই ব্যাখ্যা এই মণিভদ্রের উপাখ্যান।

কিন্তু কাম প্রেম নহে। রাখালের চিত্তবৃত্তির নাম প্রেম—যদিও তাহার মন কলুষিত ছিল, তথাপি তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় ভালবাসার প্রভাব স্ফুরিত হইয়াছিল। আধুনিক গ্রন্থকার তাই প্রকৃষ্ট মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায় রাখালের মত অধার্ম্মিকের মধ্যেও এতটা মহিমার আবির্ভাব করাইয়াছেন।

বৌরাণী রাখালের পত্রের কয়েক ছত্র পড়িয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তার সাহেব আসিলেন, চিকিৎসা চলিল। বৌরাণীর পুনরায় সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সংজ্ঞা যেন ফিরিয়া না আসিলেই ভাল হইত। বৌরাণী এখন স্থির গম্ভীর ও প্রকৃতিস্থা হইলেন। সুরবালার সহিত কথোপকথন হইতেছে। বৌরাণী সুরবালাকে বলিতেছেন, "সব শুনেছ তো?" সুরবালা বলিলেন, "শুনেছি।" বৌরাণী বলিলেন, "তবে—তবে—আর আমার বেঁচে কি হবে? আমার জীবন যে কলঙ্কিত হয়ে গেছে। এ জীবন যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল নয় কি?" পাঠক এই কথার নিশ্চয়ই সমর্থন করিবেন, যেহেতু "সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তিঃ মরণাদতিরিচ্যতে।" সুরবালা সস্নেহে বলিলেন, "ও কথা তুমি কেন বল? তোমার তো কোনও দোষ নেই। তুমি তো নিজের স্বামী জেনেই—" এ কথায় বৌরাণী একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুযুগল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "সে কথা এক শো বার—হাজার বার।" সুরবালা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তাহ'লে তোমার দেহ মন দুইই তো খাঁটি আছে। কলঙ্কিত হয়েছ কেন বলছ? পাথরের মূর্ত্তিকে মানুষ যে ঈশ্বর মনে ক'রে পূজা করে—সে পূজা পাথর পায়, না ঈশ্বর পান? তুমিও তেমনি তোমার স্বামীকেই পূজা করেছ।" কথাটা বৌরাণীর মস্তিষ্ক আঘাত করিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।" খানিক পরে বৌরাণী ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি ঠিক বলেছ। ঐ দেরাজ থেকে আমার হাতির দাঁতের বাক্সটা দাও তো।" বাক্স আনীত হইল। ঐ বাক্সের ভিতর হইতে বাহির হইল, সযত্নে রক্ষিত বাসি বিবাহের খেলার সেই কড়ি। সেইগুলি বাহির করিয়া বৌরাণী সস্নেহে নাড়িয়া চাড়িয়া বুকের উপর খানিক রাখিয়া সুরবালাকে বলিল, "ভাই আমার ঘুম পাচ্ছে, এ গুলি যথাস্থানে রেখে দাও।" বৌরাণীর চিত্তে শান্তি আসিল, তিনি নিদ্রিত হইলেন। সুরবালা দেখিল, তাহার সেই সুপ্তিমগ্নমুখে, কয়েক দিবস পরে আজ শান্তির ছায়া বিরাজ করিতেছে।

পৌরাণিক মোহিকার হৃদয়ে পরপুরুষ গ্রহণে কোনও প্রকার অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল কিনা তাহার উল্লেখ নাই। বৃদ্ধবয়সে পুষ্পেরই মাত্র অনুশোচনার উল্লেখ আছে। প্রায়শ্চিত্তার্থে পুষ্প যখন তীর্থযাত্রা করেন, মোহিকা তাহার সঙ্গে ছিলেন এবং মোহিকাও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এই মাত্র উল্লেখ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পুরাণকার আর্টের দিক দিয়া মোটেই এই মণিভদ্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। আধুনিক কালে আমাদের মন আখ্যায়িকার মধ্যে হৃদয়ের যে ভাবাবলীর বিশ্লেষণ প্রত্যাশা করিতে শিখিয়াছে, প্রাচীন যুগে মানুষ সে দিকে বেশী নজর করিত না এইটাই বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু পুরাণকার যদিও এই মণিভদ্র কাহিনীতে একটা উপন্যাসই

রচনা করিয়াছেন, তথাপি উপন্যাসের বিবৃতি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং এই সব সূক্ষ্ম সুকোমল মনোভাবের উল্লেখের অবসর ছিল না। মনের ভিতরের ঘাত প্রতিঘাত বর্ণনা আধুনিক রীতি।

রাখালের কাহিনীর উপসংহার করিতে হয়, নতুবা পাঠক ক্ষমা করিবেন না। রাখালের জাল ধরা পড়িল; সকলে জানিল। রাণীমা যখন জানিলেন এ আমার ভবেন নয়, তখন তিনি কি ব্যথা পাইলেন, তাহা অনুমেয়। কিন্তু তিনি জমিদার গৃহের কর্ত্রী, বুদ্ধি হারাইলেন না। রাখালের ত্যাগের মর্য্যাদা বুঝিলেন, রাখালের প্রতি কোন অত্যাচার হইতে দিলেন না। রাখালকে কেহ যেন কোনও প্রকারে বিরক্ত না করে, যখন তাহার ইচ্ছা সে যাইবে, এই হুকুম করিলেন। রাখাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে, তিনি বড়ই অভিভূত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নীরবে রহিলেন। রাখাল যখন বলিল, "আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনাকে মা ব'লে সম্বোধন করবার যোগ্য আমি নই, আমি মহা পাপী। যদি অনুমতি করেন, আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে আমি জন্মের মত বিদায় হই। তখন সেই স্নেহময়ী রমণী "বাবা" মাত্র বলিয়া খানিকক্ষণ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সহৃদয় রমণীর পবিত্র অশ্রুতে রাখালের মলিন চিত্ত আরও মার্জ্জিত হইল। রাণীমা অবশেষে কোনও প্রকারে বলিলেন, "বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, যেন ধর্ম্মে মতি অচলা থাকে, যেন আবার তুমি সুখী হও।" কে এমন মাতৃ-আশীর্ব্বাদ পাইয়া আর মন্দ থাকিতে পারে? রাখালের জীবন এখন হইতে অন্য পথে চলিল। সে তাহার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়া পাইল, তাহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট চিত্তে আর এক ষ্টেশনের ছোট বাবু হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল।

রাণীমা বৌরাণীকে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। কাশীতে গিয়া বৌরাণী রাসপূর্ণিমার দিনে প্রশান্ত চিত্তে, সেই বাসি বিবাহের কড়িগুলি বক্ষে করিয়া, সংসারের সকল জ্বালা এড়াইয়া অমর লোকে স্বামীর সঙ্গে বুঝি মিলিত হইলেন।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

ম্যালেরিয়া

(সুর—'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে···')

তুমি, নির্ম্মূল কর বেঙ্গল-নরে
শরীর-চর্ম্ম শুকায়ে,
তব, কম্প ভীষণ দিয়ে যায় ঘোর
দোষ লিভারে ঢুকায়ে।
পক্ষ-যুক্ত লক্ষ মশারা
ছুটিছে নদী দুধারে
জানি না কি ভাবে ঢুকে যায় কার
অটুট মশারি মাঝারে;
ওগো, নিঃস্ব বাঙ্গালী হন্তা
তুমি পাড়াও নিদাঘে বন্যা
তব বিচরণভূমে ঢেলে দাও ঘোর
তপ্ত যাতনা লুকায়ে।
আছ, আগানে বাগানে, ফাঁকা ময়দানে,
অজ পাড়াগাঁয়ে, সহরে,
আছ, নদীয়া জেলায়, কাঁথি, খুলনায়,
মালদহে পূরো বহরে।
আমি, কুনিয়ান পেটে গাদিয়া
চোখে, দিবসে দেখি গো আঁধিয়া!
মোর, খেতে নাই কিছু আম কলা লিচু—
দাও হে জীবন চুকায়ে!

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

পদ্মা

(বড় গল্প)

কলিকাতার কলুটোলা নিবাসী মুকুন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে সে দিন বেশ একটু উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। মুকুন্দলালের পুরাতন জীর্ণ গৃহখানাকে ধুইয়া মাজিয়া নবীন সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। গৃহকর্ত্তা মুকুন্দলাল ও তাঁহার পুত্র মোহিতলাল মহাব্যস্ত হইয়া চারিদিকে পরিদর্শন করিয়া বড়াইতেছিলেন। পিতার ও ভ্রাতার অবিশ্রান্ত চারি পাঁচ বৎসর ব্যাপী পরিশ্রম ও চেষ্টার পর পদ্মাসনার বিবাহের ফুল এত কাল পরে ফুটোন্মুখ হইয়াছে। তাহার বিবাহের অন্যান্য কথাবার্ত্তা প্রায় সবই ঠিক হইয়া গিয়াছে। পাত্র পক্ষ, পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইলে, একেবারে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন বলিয়া মুকুন্দলালের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। পাত্রের পিতা উমানাথ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিকাশ অপর কয়েকটী ভদ্রলোকের সহিত, বৈঠকখানায় বসিয়া কন্যার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পাত্রী আনিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উমানাথ কহিলেন, "মুখুয্যে মশায় একটু তাড়া দিন। আমাদের আবার ৬টার ট্রেণ ধরতে হবে।" মুকুন্দলাল কুণ্ঠিত ভাবে কহিলেন, "আঃ—মেয়েদের দ্বারা কোন কায যদি একটু তৎপরতার সঙ্গে হবার যো আছে!" বলিয়া তিনি মোহিতকে আগন্তুকদিগের নিকট রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

মুকুন্দলাল বিপত্নীক। বিধবা ভগিনী গৌরী দেবীই সংসারের গৃহিণী। মুকুন্দলাল ডাকিলেন, "গৌরী।" "কেন দাদা" বলিয়া একটী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা বিধবা একটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মুকুন্দলাল কহিলেন, "গৌরী, কত দেরী আর? ওঁরা যে ব্যস্ত হচ্ছেন।" গৌরী কহিলেন, "এই হল বলে! আমি কি করব বল? তোমার বিদ্যেবতী মেয়ে কি কথা শোনে? কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে, কত বোঝাই কিছুতে শোনে না।" মুকুন্দলাল কহিলেন, "যাও দেখগে যা হল কি না? পছন্দ হলে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। বেশী দেরী করা ভাল নয়। সন্দেহ করতে পারে।" গৌরী কহিলেন, "দেরী কি আমি কচ্চি? এই নীতা আর বৌমার আর সাজান হয় না। একঘণ্টা কাটল ত মেয়ের কান্না থামতে। তারপর এঁদের বিবিয়ানার সাজের ঘটা। আমি ত দেখে অবাক্ হয়ে গেছি দাদা, খোঁপা বাঁধারই বা কি ঘটা! বাবা! ১০০টা কাঁটা লাগে খোপা বাঁধতে। কালে কালে কতই দেখব।"

মুকুন্দলাল মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "একটু শীগ্‌গির্ করতে বল। হলে ডেকে পাঠিও। আমি যাচ্ছি বাইরে। পাড়ার লোকদের কাছে একলা থাকতে দেওয়া ঠিক নয়। কে কোনখান থেকে ভাংচি দিয়ে বসবে।" বলিয়া তিনি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

গৌরী সম্মুখবর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মুকুন্দলালের তৃতীয়া কন্যা নীতা ও পুত্রবধূ অম্বা, পদ্মাসনাকে সাজাইতেছিল। গৌরী কহিলেন, "কত দেরী নীতু? দাদা যে তাড়া দিচ্ছেন।" নীতা কহিল, "এই ব্রোচটা আঁটা হলেই হয়। বৌদি, চটকর ফুলের মালাটা খোঁপায় জড়িয়ে দাও। কেমন সাজান হয়েচে বল দেখি পিসিমা।"

পিসমা মুখে বলিলেন, "বেশ!" আসলে কিন্তু পদ্মার সজ্জা তাঁহার মনোমত হয় নাই। তাহার কারণ, পদ্মাকে আধুনিক রুচি অনুসারে সাজান হইয়াছিল। তাহার হাতে কয়েকগাছি সরু সোণার চুড়ী। গলায় সরু হার। কাণে দুইটি চুনীর দুল, গহনার মধ্যে এই। আর চুল বাঁধা তাহাও হইয়াছিল হাল ফ্যাসানে। পদ্মার

চুল ছিল বড় সুন্দর। ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি, তাহার পদদেশ চুম্বন করিত। নীতা সেই চুলে সযত্নে এলো খোঁপা বাঁধিয়া তাহাতে যুঁই ফুলের মালা জড়াইয়া দিয়াছিল। কপালে একটী ছোট্ট সিন্দুরের টিপ দিয়াছিল, পরনে ছিল মিহি কালোবুটী তোলা ঢাকাই শাড়ী। পিসীমার এ সাজ পছন্দ হয় নাই। দু'একখানা ভারি ভারি গহনা না পরলে কি বিয়ের কনেকে মানায় গা! কী ফিরিঙ্গি মাগীদের মত খোঁপা বাঁধিয়ে ছে! অমন চুল, বিননী করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া কয়েকটা সোণার ফুল বসাইয়া দিলে কেমন মানাইত! কিন্তু কে বলিবে বল! এখনকার নাকি ঐ রকমই পছন্দ!

নীতা কহিল, "দেখ ত পিসীমা কোথাও কিছু বাকি রইল কি না।"

গৌরী দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পদ্মার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "না, বেশ হয়েচে। রঙটী কিন্তু বাছা খাসা করেচ। ভোল ধরবার যো নেই।" অম্বা কহিল, "রঙ বদলান কিন্তু আমার হাতের গুণ পিসীমা, সেজ ঠাকুরঝির ওতে কিছু বাহাদুরী নেই।" নীতা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল, "তুমি ত আচ্ছা ঝগড়াটে বৌদি। আমি বুঝি বলচি আমার বাহাদুরী? আমার ভাই অত জাল জুয়াচোরী আসে না।" অম্বা ননদিনীর কথায় মুখখানা ভারি করিয়া কহিল "বেশ গো বেশ। আমি জুয়াচোর।" গৌরী কহিলেন "তোমাদের ননদ ভাজের ঝগড়া এখন রাখ বাছা। হল কি না বল। দাদাকে ডেকে পাঠাই।" নীতা কহিল, "আমা দর হয়েছে। তুমি ভাল করে দেখে নাও কোথাও কিছু ভুল হয়েছে কি না।" গৌরী আর একবার পদ্মার আপাদ মস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া, হঠাৎ একটী বিষম ভ্রম আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, তিনি কহিলেন, "আলতা? আলতা কই? ওমা, এখনকার মেয়েরা সব হল কি? তারা আসল সাজটাকেই বাদ দিতে চায়!"

নীতা অপ্রতিভ ভাবে তাড়াতাড়ি আলতার শিশি আনিয়া পরাইতে উদ্যত হইলে, পদ্মা পা টানিয়া লইয়া কহিল, "না ছোড়দি তুমি আমার পায়ে হাত দিও না।" নীতা কহিল, "নে জ্যাঠামী রাখ্। ওতে দোষ হয় না। পা দে, দেরী হয়ে যাচ্ছে!" কিন্তু পদ্মা কিছুতেই দিদিকে পায়ে হাত দিতে দিল না দেখিয়া গৌরী কহিলেন, "তবে মাধবী এসে পরিয়ে দিক্।" মাধবী বাড়ীর দাসী। সে আসিয়া আলতা পরাইয়া দিলে, গৌরী মুকুন্দলালকে ডাকিতে পাঠাইলেন। পদ্মাকে লইয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "পদ্মা, নারায়ণকে প্রণাম করে আশীর্ব্বাদ চাও মা।" পদ্মা নত হইয়া শালগ্রামের সিংহাসনের নিকট প্রণাম করিল। তারপর গৌরীর চরণে মাথা রাখিল। গৌরী দুই হাতে তাহাকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পদ্মার মস্তকে পড়িল। আহা মাতৃহারা পদ্মাকে তিনিই মানুষ করিয়াছেন যে। চক্ষু মুছিয়া পদ্মার মুখ খানি তুলিয়া তিনি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় মুকুন্দলাল আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভগিনীর ভাব দেখিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে মুকুন্দলালের বিলম্ব হইল না। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "দেরী হয়ে যাচ্ছে গৌরী।"

"হাঁ দাদা নিয়ে যাও।" বলিয়া গৌরী পদ্মাকে ছাড়িয়া দিলেন।

মুকুন্দলাল পদ্মাকে লইয়া ভাবী কুটুম্বদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "উমানাথ বাবু, এই আমার ছোট মেয়ে। মা এঁকে প্রণাম কর।"

উমানাথ স্থির দৃষ্টিতে পদ্মাকে দেখিতেছিলেন। পদ্মার মুখে এমন একটা মধুর ভাব ছিল, যাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। উমানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটী কি মা লক্ষ্মী?" নতনেত্রে ধীরে ধীরে পদ্মা কহিল, "পদ্মাসনা দেবী।"

"পদ্মাসনা? বাঃ, বেশ সুন্দর নামটী ত! মুকুন্দবাবু আপনার পছন্দ আছে।"

মুকুন্দলাল কহিলেন "আজ্ঞে ওর নাম রাখেন আমার ভগিনী।"

উমানাথ কহিলেন, "মা পদ্মা, তোমার বাবা লিখে-

ছিলেন তুমি বেশ লেখাপড়া শিখেছ। কি কি বই পড়েচ মা লক্ষ্মী?"

পদ্মা উত্তর দিল না, পিতার দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল। মুকুন্দলাল কহিলেন, "গত বছরে পদ্মা বেথুন থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। বাঙ্গলা খুব ভাল জানে। মাসিকে লেখে।"

উমানাথ প্রশংসাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "লেখিকা? বড় সুখী হলাম মুকুন্দ বাবু আপনার মেয়ের পড়াশুনো দেখে! আমার প্রকাশ চায়, মেয়েটী সুন্দরী হবে, খুব শিক্ষিতা হবে। ছেলেটা আমার পুরো মাত্রায় নব্যতন্ত্রের কি না। আচ্ছা মা, তুমি কি লেখ গদ্য না পদ্য? পদ্মা উত্তর দিল "বেশীর ভাগ গদ্য—কবিতা খুব কমই লিখি।"

উমানাথ কহিলেন, "বেশ বেশ! আমার প্রকাশ ঠিক এমনটীই চায়। মুকুন্দ বাবু, এমন মেয়ের বিয়ের জন্যে আপনি আবার ভাবছিলেন?

মুকুন্দলাল কহিলেন, "রায় মশায়, গুণের কদর খুব কম লোকেই করতে জানে। আর রূপের মূল্য ত এখন রূপোয় দাঁড়িয়েছে। এখন টাকাই হচ্ছে সব, যার টাকা নেই তাকে ভাবতে হয় বৈ কি।" রূপ কথাটি উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

উমানাথ কহিলেন, "সে ত কতকটা কন্যার পিতার দোষেই দাঁড়িয়েছে। কন্যার পিতা কন্যাদের নিরক্ষর, কেউবা বড্ড জোর নভেল পড়বার মত শিক্ষা দিয়ে আপনার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ মনে করেন। এই নিরক্ষর কন্যাদের জন্যে তাঁরা উচ্চশিক্ষিত পাত্র চান। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি উচ্চশিক্ষিত যুবকদের এ রকম চারুপাঠ ফাষ্টবুক্ পড়া পত্নী কি উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী? আবার আজকাল সমাজ থেকে বাল্য বিবাহ উঠে গেছে বল্লেই হয়। সুতরাং দেশের শিক্ষিত লোকদের বয়স্থা মূর্খা কন্যা বিবাহ করতে হচ্ছে। জগৎ প্রলোভনময়! কিসের প্রলোভনে তারা এরকম কন্যা গ্রহণ করে বলুন ত? এ ক্ষেত্রে তারা যদি টাকার দাবী করে, তা কি এতই অন্যায়? সমাজ থেকে এ ব্যাধি দূর করতে হলে বাঙ্গালী পিতাকে পুত্রকন্যার প্রভেদ ভুলে' পুত্রের সঙ্গে সমান ভাবে কন্যাকে শিক্ষা দিতে হবে। যখন যুবকেরা দেখবে কন্যার পিতারা তাদের সম্বন্ধে জড়পিণ্ড "চেলীর ও অলঙ্কারের ভার" চাপাবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী দিচ্ছেন তখন ক্রমশঃ আপনিই এ ব্যাধি সমাজ থেকে দূর হবে।"

মুকুন্দবাবু নীরবে বৈবাহিকের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে-ছিলেন। তাঁহার মন ভাবী বৈবাহিকের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইল। তিনি কহিলেন "আশীর্ব্বাদ করবেন কি?"

উমানাথ কহিলেন "হ্যাঁ এই করি।" বলিয়া তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বিকাশ, তোমার মত কি?"

বিকাশ এতক্ষণ তাহার স্বর্ণ মণ্ডিত চশমার ভিতর দিয়া পদ্মাকে দেখিতেছিল। কোন কথা বলে নাই। পিতার প্রশ্নে কহিল, "সব ভাল কিন্তু বড় বিমর্ষ।"

পুত্রের কথায় উমানাথের চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন তাই ত, তাঁহার প্রাচীন চক্ষু যাহা ধরিতে পারে নাই, বিকাশের নবীন চক্ষু তাহা ধরিয়াছে। পদ্মার মুখ গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। তিনি চিন্তান্বিত ভাবে কহিলেন, "তাই ত, ছেলেমানুষ, এত বিমর্ষ কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর মুকুন্দলাল দিতে পারিলেন না। মোহিত কহিল, "ওর জন্যে ভাববেন না। আমার ভগ্নীর একটী ক্লাসের মেয়ে কয়েকদিন পূর্ব্বে মারা গেছে। সেই সংবাদে ওর মন ভাল নেই। পদ্মা বেশ গাইতে পারে। শুনবেন, ওর গান?"

উমানাথ কহিলেন, "গাও ত মা" দাদার অনুরোধে পদ্মা উঠিয়া টেবিল হারমোনিয়মের নিকট চেয়ারে বসিল, ও বাজাইয়া গাহিল।—

সকল মিলন সফল তখন
আসন যখন তুমি লও—
সকল জীবন মিষ্ট তখন
তুমি যখন কথা কও।

কর্ম্ম তখন, হয়হে ভালো
(তাতে) প্রীতি যখন তুমি ঢালো
জীবন পথে পাই হে আলো
যখন তুমি আগে রও।
বোঝা তখন হয় না ভারি
(তোমার) হাতে যখন রাখতে পারি
কি আনন্দ বলিহারী,
আমার বোঝা তুমি বও!
হারায় না যে কিছুই তখন
তোমায় সঁপি আমায় যখন;
আঁধার আলো জীবন মরণ
কিছুই ছাড়া তুমি নও।

পদ্মার কণ্ঠ অতি মধুর। তাহার গীত ওস্তাদের শিক্ষায় মাজা ঘসা সুর তাল নহে। ঈশ্বর তাহাকে গাহিবার অসাধারণ শক্তি দিয়াছিলেন। স্কুল গানের পরীক্ষায় সে বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছে।

উমানাথ ও বিকাশ উভয়েই তাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। পিতা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিকাশ কহিল, "বাবা আশীর্ব্বাদ করে ফেলুন, বেশী দেরী করলে ট্রেণ মিস্ করতে হবে।" উমানাথ কহিলেন, "হাঁ এই করি।" তিনি দুইটী মোহর দিয়া পদ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্তঃপুর হইতে শুভশঙ্খ সজোরে বাজিয়া উঠিল। পদ্মার পাকা দেখা হইয়া গেল। দাসী আসিয়া পদ্মাকে ভিতরে লইয়া গেল।

দেনা পাওনার কথা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। কন্যা মনোমত হইলে উমানাথ পণ লইবেন না। মুকুন্দলাল ইচ্ছামত কন্যা জামাতাকে যৌতুক দিবেন।

জলযোগ করিয়া উমানাথ সপুত্র বিদায় লইলেন। মুকুন্দলাল ও মোহিত তাঁহাদের সহিত ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাদের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

এ দিকে পদ্মা অন্তঃপুরে আসিলে নীতা অম্বা তাহাকে অজস্র প্রশ্ন বাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। সে কাহারও কথার উত্তর না দিয়া আপনার শয়ন কক্ষে যাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিল।

গৌরী কহিলেন, "কি হল রে নীতু?" অম্বা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "হবে কি আর পিসীমা। তোমাদের বিদ্যেবতী মেয়ে বিদ্যের গৌরব জানিয়ে গেলেন। ভাগ্যিস্ আমার বাবা আমাকে লেখাপড় শেখান নি। নইলে ঐরকম দেমাকে হলেই হয়েছিল আর কি!"

ছোটবোনের প্রতি ভ্রাতৃজায়ার এই প্রকার শ্লেষোক্তি নীতার ভাল লাগিল না। সে কহিল, "কি গর্ব্ব গর্ব্ব করচ বৌদি। পদ্মার মধ্যে গর্ব্ব কোথায়? তবে ও লেখাপড়া শিখেচে—নীচতা ও প্রতারণাকে ঘৃণা করে।"

অম্বা ননদের কথার উত্তর না দিয়া মুখভার করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। নীতার প্রতি তাহার মন তেমন প্রসন্ন না থাকিলেও সে মুখে তাহাকে ভয় করিত। গৌরী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এর পরিণাম কি হবে কে জানে।"

রাত্রি নয়টার পর মুকুন্দলাল ও মোহিত ভাবী কুটুম্বদের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ী আসিতেই নীতা কহিল, "আচ্ছা বাবা, আমরা ত সব কথা জানবার জন্যে ছটফট কচ্ছি। আর তোমরা দু'জনে স্বচ্ছন্দে চলে গেলে, বেশ যা হউক।"

মুকুন্দ বাবু কহিলেন, "কি করি মা, তাঁদের ট্রেণে না তুলে দিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। কি জানি কে চট্ করে ভাংচি দিয়ে বসবে। যতক্ষণ না দুই হাত এক হচ্ছে ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারচি না।"

গৌরী দেবী ভ্রাতার কথার সমর্থন করিয়া কহিলেন, "তা সত্যি। শত্রুর ত আর অভাব নেই। ভাল করবার বেলা কেউ নেই, কিন্তু মন্দ করবার বেলা সবাই আছে। কবে দিন ঠিক করলেন তাঁরা? ছেলে দেখিতে যাবে কবে?"

মুকুন্দলাল কহিলেন, "ছেলে ত আগেই দেখেছি, আমার মতও তোমাকে বলেচি। উমানাথ বাবুর ইচ্ছে শ্রাবণের প্রথমে বিয়ে হয়ে যায়। প্রকাশ ঢাকায় আছে শীগগিরই আসছে, এলেই গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে

আসবো। বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন দেরী করে কি হবে? কি বলিস্?"

গৌরী দেবী কহিলেন, "তা বই কি, শুভ কর্ম্মে শতেক বাধা, যত শীগ্‌গির হয় ততই ভাল।"

নীতা কহিল, "হ্যাঁ বাবা, তাঁরা পদ্মাকে দেখে কি বল্লেন?"

মুকুন্দলাল কহিলেন, "পছন্দ খুব হয়েছে। মায়ের আমার মুখ চোখে ত কোনই খুঁত নেই, এক যা অভাব কটা রঙের। তা, নীতু সেটা তোমরা সেরে নিয়েচ। কিন্তু আমি এতে মনে তৃপ্তি পাচ্ছি না মা, জানি না এর পরিণাম কি হবে।"

মোহিত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, "আপনি যদি অমন খুঁৎ খুঁৎ করেন বাবা তাহলে, পদ্মার বিয়ে হবে না এ কথা বলে রাখ্‌ছি। টাকা খরচ করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, অথচ পাত্র চাই রাজপুত্র। এখনকার দিনে কেউ যখন অমনি বিয়ে করে না, যখন নয় রূপ নয় রূপোর আকর্ষণে এখন বিয়ে হচ্ছে, এ স্থলে পদ্মাকে কেউ অমনি বিয়ে করবে এ ধারণা ভুল। পদ্মা অমন সুপাত্রে পড়চে হলই বা একটু প্রতারণা।"

মুকুন্দলাল এতক্ষণ উপযুক্ত পুত্রের বক্তৃতা নীরবে শুনিতেছিলেন। তিনি কহিলেন, "কিন্তু পরে যখন আমাদের এ প্রতারণা ধরা পড়বে, তখন আমাদের এ পাপের শাস্তি ভোগ করবে পদ্মা সে আমি কেমন করে সইব মোহিত!" মোহিত কহিল, "প্রথমটা একটু গোলমাল হবে বটে। কিন্তু তা ক'দিন থাকবে? পদ্মা যদি তাদের মন যুগিয়ে চলতে পারে তাহলে তারা সব ভুলে যাবে।"

কথাটা গৌরীর ভাল লাগিল না। তিনি কহিলেন, "কিন্তু তারা যদি আবার ছেলের বিয়ে দেয়?"

ভগিনীর প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিয়া মুকুন্দলাল কহিলেন, "তাই ত, তারা যদি আবার ছেলের বিয়ে দেয়।"

মোহিত কহিল, "হাঃ বিয়ে দেওয়া পড়ে আছে আর কি! এখনকার দিনে একটা পরিবার পুষতেই লোকের কান্না আসে,—আবার দুটো! ও সব মিথ্যে ভয়। সে শিক্ষিত লোক, সেই বা দুটো বিয়ে করবে কেন?"

মুকুন্দলাল কহিলেন, "যা হবার তা হবে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। রান্নার কত দেরী গৌরী?"

গৌরী কহিলেন, "হ্যাঁ হয়েচে দিচ্চি।"

আহারে বসিয়া মুকুন্দলাল পদ্মাকে না দেখিয়া কহিলেন, "নীতু, পদ্মা কই?" নীতা কহিল "তুমি খাও বাবা, আমি পদ্মাকে ডেকে আনছি।" পদ্মার রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া নীতা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল "পদ্মা খাবি আয়।" ভিতর হইতে পদ্মা কহিল, "দিদি আমি খাবনা। তোমরা খাওগে।" নীতা কহিল, "ওমা খাবিনে কেন? উঠে আয়, বাবা বসে আছেন।" পদ্মা কহিল, "আমার বড্ড মাথা ধরেছে। আমি খেতে পারব না। আমায় একটু ঘুমতে দাও তোমরা।" নীতা হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

অন্নের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া মুকুন্দলাল পদ্মার প্রতীক্ষায় ছিলেন। নীতা আসিয়া কহিল, "বাবা, পদ্মা খেতে আসচে না।" চমকাইয়া উঠিয়া পিতা কহিলেন, "কেন?" নীতা কহিল, "কি জানি কত ডাকলাম কিছুতে এল না।" "আচ্ছা আমি দেখচি" বলিয়া মুকুন্দলাল উঠিয়া গেলেন।

অম্বা আপনার পুত্রকে আহার করাইতেছিল। সে কহিল, "ঢং দেখে আর বাঁচি নে।" কথাটা নীতার কাণে গেল। কিন্তু সে পিতার ও ভ্রাতার আহারের সময় বলিয়া কিছু বলিল না। কেবল একটু ভ্রুকুটি করিল মাত্র। রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া মুকুন্দলাল ডাকিলেন "ছোট মা—পদ্মা!" পদ্মা কহিল, "বাবা, তুমি খাওগে। আমার শরীর ভাল নেই। আমি খাব না।" পিতা কহিলেন, "দোর খোল পদ্মা।"

পদ্মা পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মুকুন্দলাল ঘরে ঢুকিয়া দীপালোকে পদ্মার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন যে সে কাঁদিতেছিল। কন্যার অন্তরের ব্যথা বুঝিয়া তাঁহার পিতৃহৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি পদ্মার মাথায় হাত

দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "পদ্মা, তুমি ত আমার অবুঝ মেয়ে নও। তবে কেন আমার মনে কষ্ট দিচ্ছ?"

পদ্মা কহিল, "এ রকম মিথ্যা কি ভাল বাবা? তোমায় লোকে প্রতারক বলবে তা আমি সইতে পারব না।"

মুকুন্দলাল কহিলেন, "কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় নেই। আমি অনেক ভেবে এতে মত দিয়েছি। এতে কি আমার কষ্ট হচ্ছে না? কিন্তু কি করব? আমার মুখে চেয়ে এ তোমাকে সহ্য করতে হবে মা। আমার বড় সাধ তোমাকে সুপাত্রে দিই। এই আমার শেষ কর্ত্তব্য। আমার শেষ কর্ত্তব্য পূর্ণ করতে না পারলে আমার মৃত্যুর পরও আমি শান্তি পাব না।"

পদ্মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,"এক কায করলে হয় না বাবা?" মুকুন্দলাল কহিলেন "কি কায মা?" পদ্মা কহিল, "দরকার কি বাবা অত সব হাঙ্গামে? যেমন আছি তেমনই থাকি না কেন?" মুকুন্দলাল কহিলেন, "তা হয় না মা। আমি যতদিন আছি ততদিন তোমার কোন ভাবনা নাই। কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে মোহিত তোমার সঙ্গে কেমন ব্যভার করবে কে জানে? সে যদি তোমাকে তার বোঝা মনে করে? আর সমাজই বা তা শুনবে কেন?"

পদ্মা কহিল, "যে সমাজ প্রতিকার করতে জানে না কেবল দণ্ড দিতে জানে,—নাই বা মানলাম অমন সমাজ।"

মুকুন্দলাল কহিলেন, "আমার যদি অর্থবল থাকত, তা হলে সে কথা খাটত। কিন্তু আমি ত তোমার জন্যে কিছু রেখে যেত পারব না মা। আমার অবর্ত্তমানে তোমাকে যে সম্পূর্ণ রূপে মোহিতের উপর নির্ভর কর্ত্তে হবে মা। ওরও ত মেয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় গোল উঠতে পারে। তখন হয়ত মোহিত নিজের স্বার্থের জন্যে তোমাকে কোনও ভবঘুরের হাতে বলি দেবে। এতে প্রথমে একটু গোল উঠবে বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছি তারই জোরে তোমার বাবার এ ত্রুটীটুকু সেরে যাবে। প্রথমটা আমার মুখে চেয়ে সহ্য করো মা।"

পদ্মা চুপ করিয়া পিতার কথাগুলি শুনিতেছিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে সে কহিল, "তাই হোক। তোমার আদেশের চেয়ে আমার কাছে কিছুই বড় নয় বাবা। চল খেতে যাই।"

গাঢ়স্বরে পিতা কহিলেন, "চল মা।"

সে রাত্রিতে মুকুন্দলালের চক্ষে নিদ্রা আসিল না। পদ্মার অদৃষ্ট চিন্তা তাঁহার নিদ্রা হরণ করিল। মোহিত ও নীহার কথাতেই তিনি এরূপ নীচতাপূর্ণ কার্য্যে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছিল যে পদ্মা ইহাতে সুখী হইবে না। তাহা ছাড়া তিনি ভাবিতেছিলেন তাঁহার এই কার্য্যের জন্য পদ্মাকে তাহার স্বামীর নিকট চিরদিনের জন্য খর্ব্ব হইয়া থাকিতে হইবে। পদ্মা কি এ অপমান সহ্য করিতে পারিবে? সে যে বড় অভিমানিনী।

মুকুন্দলাল যখন এইরূপ চিন্তাতে মগ্ন ছিলেন তখন অপর কক্ষে অম্বা মোহিতকে কহিতেছিল, "ঢের ঢের বেহায়া মেয়ে দেখলাম, কিন্তু এই পদ্মার মত বেহায়া কোথাও দেখলাম না। মাগো রঙ মাখিয়ে দেখান হয়েছে বলে কি কাণ্ডটা কল্লে।" মোহিত কহিল, "ঐ জন্যে ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখান আমি পছন্দ করি না! বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষা—ইংরাজি শিখলে মেয়েদের লজ্জা বলে জিনসটা থাকে না। বাবাকে আমি প্রথম থেকেই বারণ করেছিলাম, বাবা শুনলেন না, মেয়েকে পাশ করালেন। বিবি করলেন, ও শিক্ষার যা ফল তাই হয়েছে।"

অম্বা ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল "ওমা তাই নাকি। লেখাপড়া শিখলে বুঝি এমনি বেহায়া হতে হয়? ভাগ্যিস্ বাবা আমাকে লেখাপড়া শেখাননি। অমনিই ত তুমি আমাকে বেহায়া বল।"

অম্বা অতিশয় সুন্দরী কিন্তু দরিদ্রের কন্যা। পিতার সামর্থ্যে তাহাকে অন্নদান করাই কুলাইত না, শিক্ষাদান ত দূরের কথা। মোহিত তাহা

উত্তমরূপেই জানিত। কিন্তু সে তাহার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া অম্বার সুগৌর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি আবার তোমায় বেহায়া কখন বললাম অমু? বরং তোমার দেড়হাত ঘোমটার জন্যেই আমি বিব্রত। তুমি একটু বেহায়া হলে আমার লাভ বই লোকসান হত না।" অম্বা কহিল, "তা যা বল। আমি যত মন্দই হইনা কেন, বিয়ের কথায় কখনও কথাটি কইনি। যার যেমন ইচ্ছে সাজিয়ে দেখিয়েছে।"

মোহিত কহিল, "তোমাকে ত আর নকলরঙে দেখাবার দরকার হয়নি। প্রকৃতি রাণী তোমাকে রাঙা রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন যে। কাযেই গলার অবস্থায় মনের অবস্থা যে কি হয় তাও তুমি বুঝতে পারবে না। আমারও বড় কষ্ট হচ্ছে। জানিনা আমাদের প্রতারণা ধরা পড়লে বেচারীর অদৃষ্টে কি আছে। কত লাঞ্ছনাই না ওকে সইতে হবে! কিন্তু উপায় নেই। বাবার ধনুর্ভঙ্গ পণ—রাজপুত্র না হলে বিয়ে দেবেন না।"

মোহিত যে ভগিনীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল ইহা অম্বার ভাল লাগিল না। সে মুখ ভার করিয়া কহিল, "যাই বল। আমাকে কেটে ফেল্লেও অমন বেহায়া হতে পারব না। তোমার পছন্দ না হয় তুমি বোনের মত বিবি বউ আনগে। কে বারণ কচ্চে?"

মোহিত হাসিয়া কহিল, "পাগল! আবার বউ! রক্ষে কর? তুমি একাই একহাজার। এমন রূপ হাজারে একটা বই পাওয়া যায় না গো। নাও এখন আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েচে।"

মোহিত জানিত যে অম্বা রূপের প্রশংসা শুনিতে অতিশয় ভালবাসে। তাই সে রাগিবার উপক্রম করিলেই মোহিত তাহার রূপের প্রসংসা করিয়া তাহার ক্রোধের উপশম করিত। আর কথাটাও মিথ্যা নহে। সত্যই অম্বার ন্যায় রূপসী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার এই অসামান্য রূপ দেখিয়াই মুকুন্দলাল তাহাকে পুত্রবধূ করিয়াছিলেন। সে লেখাপড়া কিছুই জানিত না। কি স্ত্রী কি পুরুষ শিক্ষার আলোকে যাহার হৃদয় আলোকিত হয় নাই, তাহার মানসিক উৎকর্ষতা হয় না। অম্বার মন অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তাহার হৃদয় হিংসা ও দ্বেষে পূর্ণ। সে নিজে লেখাপড়া জানিত না বলিয়া লেখাপড়া জানা মেয়ে দেখিলে ঈর্ষা না করিয়া থাকিতে পারিত না। সংসারে নারীর রূপই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে মুকুন্দলাল তাঁহার এই ভ্রম মোহিতের বিবাহের অল্পকাল পরেই বুঝিয়াছিলেন। গৌরী দেবী ভ্রাতাকে কহিয়াছিলেন, "দাদা এ কি করলে? এ যে সিমুল ফুল এনেচ।" কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। অম্বা শ্বশুরের ভয়ে বেশী কিছু করিতে সাহস না পাইলেও তাহার কথার বিষে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিত।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারনলিনী দত্ত।

"ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী"

(প্রতিবাদ)

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ যে দার্শনিকগণের অতিশয় আদর ও গৌরবের বস্তু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দিনে দিনে উহার প্রসার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে "কলৌ বেদান্তিনঃ সর্ব্বে ফাল্গুণে বালকা ইব" এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটী সত্য বলিয়াই মনে হয়। শারীরক মীমাংসা ভাষ্যের ভাষা

অতিশয় প্রাঞ্জল। সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ব্যতীতও উহাতে প্রবেশ লাভ অসম্ভব নহে। এজন্য অনেকেই উহার আলোচনায় সুবিধা পাইতেছেন। কিন্তু ঐ প্রাঞ্জল ভাষার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াও যে অনেক ক্ষেত্রে অতিশয় দুরূহ ব্যাপার, তাহা ভামতী টীকা দেখিলে এবং প্রবীণ অধ্যাপকের উপদেশ শুনিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে যেরূপ বিস্তৃত যুক্তি সহকারে প্রাচীন মত সমূহের উপন্যাস করা হইয়াছে, ও সেই সকলের খণ্ডনে যে নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। এমন কি দুই দিকের যুক্তি প্রবাহে পড়িয়া, অনেক সময় কোনটী পূর্ব্ব পক্ষ ও কোনটী সিদ্ধান্ত তাহা নির্ণয় করাও এত কঠিন হইয়া পড়ে যে অনেকেই আচার্য্যের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অন্য রূপে গ্রহণ করিয়া মতান্তরের সহিত তাহার সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন। শ্রাবণ মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় "ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী" শীর্ষক ধারা বাহিক প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক মহাশয়ও ঐ রূপ ভ্রমের হাত হইতে নিস্তার পান নাই।

ঐ প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় "তত্ত্বদর্শী" দিগের নিকটে "ঐ উভয়ের সম্বন্ধ কি প্রকার হইবে? এই অবস্থান্তর গুলির সঙ্গে সেই অনুস্যূত জিনিসটার সম্বন্ধ কি প্রকার" এই রূপ পুনরুক্ত প্রশ্ন করিয়া প্রথমেই অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা পরিত্যাগ করেন নাই। সে যাহা হউক, ঐ প্রশ্নের সমাধানের জন্য তিনি এই রূপে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন—"ইহারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মধুতে রসের ন্যায়, কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়, ঘৃতে মাধুর্য্যের ন্যায় তাহারই মধ্যে অবিভক্ত ভাবে ছিল বর্ত্তমানেও তাঁহাতেই অবিভক্ত রহিয়া…আবার ইহারা তাহার মধ্যে পুনরায় বিলীন হইয়া যাইবে।…প্রকৃত কারণের সহিত উহার কার্য্য বা অবস্থান্তর গুলির এই প্রকারই সম্বন্ধ। যাহা হইতে যাহার অভিব্যক্তি হয় তাহাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারেনা…।"

এই দৃষ্টান্ত ও কথা কয়টী প্রণিধান করিয়া দেখিলে মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয় প্রলয় কালেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের সূক্ষ্ম রূপে অবস্থান স্বীকার করেন।

"যাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপের বিকাশ বা অভিব্যক্তি" এই পরবর্ত্তী কথার সহিত উল্লিখিত পংক্তি কয়টী একত্র করিয়া ধরিলে "ব্রহ্মেরই স্বরূপের বিকাশ" ইহার অর্থ যে "ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন" এইরূপে পর্য্যবসিত হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। কষ্ট কল্পনায় অন্য কোনরূপ অর্থ করিলেও "এই প্রকারে ভাষ্যকার জগৎকে রাখিয়াই বিরোধ ভঞ্জন করিতে পারিয়াছেন। এ জগতের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হন নাই" বলিয়া তিনি প্রপঞ্চকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সার্থক হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে ব্রহ্মের সহিত জগতের সম্বন্ধ রাখিতে গিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি পরিণাম বাদেরই আশ্রয় লইয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কথা গুলি তত্ত্বদর্শীদিগের প্রশ্নোত্তর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং পারমার্থিক অভিপ্রায়েই তিনি তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রপঞ্চকে রাখিবার জন্য তিনি

পরমার্থাভিপ্রায়েণ তু অনন্যত্বং…।

এই ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া ফলত ঐ কথারই সমর্থন করিয়াছেন।

এখন নিপুণ ভাবে দেখিতে হইবে, শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাগুলির সামঞ্জস্য করিলে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তাহা হইলেই উহা শঙ্করাচার্য্যের অনুমোদিত কিনা সহজেই বুঝা যাইবে।

প্রথমত কার্য্য কারণকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়া তিনি কার্য্য ও কারণের যে ত্রৈকালিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, উহাকে অবিনাভাব সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। অবিনাভাব ব্যাপ্তিরই নামান্তর। সম্বন্ধ মাত্রই দুইটী বস্তুর অপেক্ষা করে। একই বস্তুতে নিজের সহিত নিজের কোনও সম্বন্ধ হইতে পারেনা ইহা বৈদান্তিকগণের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ

যে নিয়ত ভেদ সাপেক্ষ তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ও শেষভাগে স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ হইতে ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্তার কথাও তিনিই বলিয়াছেন। অতএব যে জগতের সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ পারমার্থিক ও ব্রহ্মের জগৎ হইতে স্বতন্ত্র সত্তা আছে, ইহাদের পরস্পরের যে ভেদ আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয় যে ভেদ বা অথবা দ্বৈতবাদই আচার্য্যের সিদ্ধান্ত রূপে বলিতেছেন তাহা মানিয়া লইতে হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা হইতে স্পষ্টরূপে ভেদবাদ পাইয়াও তাঁহারই "অন্য বস্তু নহে" এই নিষেধ বারংবার শুনিয়া আমরা উহা না হয় পরিত্যাগই করিলাম। তাহাতে ত কিন্তু বিপদ কাটিল না—পরিণাম বাদ আসিয়া পড়িল। ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। "ব্রহ্ম এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই আপনাকে জগদ্রূপে পরিণত করিতেছেন" ইহাতেও পরিণাম বাদেরই সমর্থন হয়। আচার্য্য শঙ্কর ব্যবহারে সিদ্ধির জন্য পরিণাম প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় "...পরিণাম প্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি" এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, অথচ উহার পূর্ব্ববর্ত্তী "ব্যবহারাভিপ্রায়েণ" ইত্যাদি অংশটী উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু আরও পূর্ব্ববর্ত্তী "পরমার্থাভিপ্রায়েণে তদনন্যত্বং" এই টুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি ব্যবহার সিদ্ধির জন্য আচার্য্যের স্বীকৃত পরিণাম বাদও মানিতেছেন না। তাঁহার এই পরিণামের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই পরিণাম কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

এক্ষণে "ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া পরিণাম করিতেছেন" ও "জগতের সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে" এই দুইটী কথার সামঞ্জস্য করিলে —"ব্রহ্ম একাংশে জগদ্রূপে পরিণত হইতেছেন ও অপর অংশে স্বতন্ত্র রহিয়াছেন" এইরূপে ব্রহ্মের অংশ স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তরই নাই। অথচ ব্রহ্মের অংশ স্বীকারও কোনমতেই সম্ভব নহে।

এখন অবশিষ্ট বিবর্ত্তবাদ। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রহ্মের সহিত জগতের পারমার্থিক সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, উহা কিন্তু বিবর্ত্তবাদিগণের সিদ্ধান্ত নহে। বিবর্ত্তবাদই অদ্বৈতবাদ এবং উহাই আচার্য্যের প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শাস্ত্রী মহাশয় প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের স্বরূপ ও উহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া বিবর্ত্তবাদের সিদ্ধান্তও পরিত্যাগ করিয়াছেন, পাঠকবর্গকে এখন আর তাহা বুঝাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। বিবর্ত্তবাদিগণ যে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের পারমার্থিক কোন রূপ সম্বন্ধই স্বীকার করেন না, তাহা—

"অত্যন্তং চেদ মুচ্যতে কার্য্য মপীতা বাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণে সংসৃজেদিতি স্থিতাবপি সমানোঽয়ং প্রসঙ্গঃ... অস্তি চায়মপরো দৃষ্টান্তঃ যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তুত্বাৎ"

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ২।১।৯) এই ভাষ্য হইতেই পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়।

বস্তুতঃ ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ। সুতরাং "জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন" এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াও শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাগুলির বিরোধ ভঞ্জন করা সম্ভব নহে। কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও উহা আচার্য্য শঙ্করের মত বলিয়া কোন রূপেই গণ্য হইতে পারে না।

আলোচ্য প্রবন্ধের সকল কথার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলেও "যাহা ব্রহ্মের স্বরূপের বিকাশ" "অন্য নহে" প্রভৃতি কথার দ্বারা প্রবন্ধকার যে ফলতঃ অভেদ বাদই আশ্রয় করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখিতে হইবে উহার মূল কোথায়। "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রের ও ইহার ভাষ্যের "অনন্যত্বং" পদটী হইতেই যে তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রবন্ধ দেখিলেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায়।

কিন্তু এস্থানের ঐ "অনন্যত্বং" কথাটীর দ্বারা "প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে" এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইলেও উহা যে "ব্রহ্মের স্বরূপ বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন" হইা কোন রূপেই সমর্থিত হয়না। কারণ

প্রথমতঃ নাম রূপময় প্রপঞ্চ ব্রহ্ম স্বরূপ হইলে উহার সত্তা পারমার্থিক সত্তাই হয়, ব্যাবহারিক সত্তা হয় না। তাহাতে "অভ্যুপগম্য চেমং ব্যবহারিকং ভোক্তৃভোগ্য লক্ষণং বিভাগং"

"উভয় সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহার গোচরোঽপি জন্তুরনৃতাভিসন্ধ ইত্যুচেত" (বেদান্তভাষ্য)

"যদ্বা ত্রিবিধং সত্বং, পারমার্থিক সত্বং ব্রহ্মণঃ, ব্যবহারিক সত্ব মাকাশাদেঃ" (বেদান্তপরিভাষা)

এই সকল গ্রন্থের বিরোধ অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ জগতের সত্তা পারমার্থিক হইলেও ব্রহ্মে তাহার ত্রৈকালিক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে তিনিও কোন প্রকারেই "জগৎ অসত্য" এই শঙ্কর মতের সমাধান করিতে পারেন না। কারণ পরমার্থতঃ "সৎ" বস্তুর ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধবিনাশ বা নিবৃত্তি হইতে পারে না। জগতের বিনাশ অসম্ভব হইলে তাহা "জ্ঞান নিবর্ত্ত্য" অথবা "ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিযোগি" বলিয়া প্রপঞ্চকে অসৎ বা মিথ্যা বলা চলে না (১) ইহাতে "জগদিদং তত্ত্বাধিকং দৃশ্যতাং" এই আচার্য্যোক্তির অসঙ্গতিও ভাবিবার বিষয়।

বস্তুতঃ জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে, উহা অবস্তু তুচ্ছ অনির্ব্বাচ্য ইহাই আচার্য্যের সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার যে এই তাৎপর্য্যেই "অনন্যত্ব" কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা—

"নত্বনন্যত্ব মিত্যভেদং ব্রূমঃ কিন্তু ভেদং ব্যাষেধামঃ ততশ্চ নাভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ"

—ভামতীর এই অংশটুকু দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। ইহার অর্থ এই যে "অনন্যত্ব" কথাটীর দ্বারা আমরা অভেদ বুঝাইতেছি না, কিন্তু ভেদের নিষেধ করিতেছি মাত্র, সুতরাং অভেদ বাদের দোষ সমূহের আশঙ্কা নাই। কথাটীর গূঢ় অভিসন্ধি এইরূপ—'একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সৎ, জগৎ সৎ নহে, সুতরাং আশ্রয়ের সত্তা না থাকায় ব্রহ্মের ভেদ জগতে থাকিতে পারে না এবং সেই জন্যই উহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা যায় না। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইতে পারে না তাহা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।"

ভেদ ও অভেদ অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব এবং ভাব ও অভাব এই সকলের একটা কোনও স্থানে না থাকিলেই বিরোধী অপরটীর সেইস্থানে থাকিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম হইতে পারে না। গগন কুসুমের সম্বন্ধে অস্তি বা নাস্তি কোন কথাই যে বলা যায় না তাহা দার্শনিকগণ সকলেই জানেন।

বেদান্তে অনেকস্থানে এবং "সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপকল্পিতং, আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং" ইত্যাদি বহু শ্লোকে দর্পন প্রতিবিম্ব, রজ্জুসর্প ও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সহিত প্রপঞ্চের তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং কল্পিত রজ্জুসর্প প্রভৃতির সত্তা যে কতটুকু তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহার পর "মায়য়া মায়াবীব ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে" এই কথায় আচার্য্য জগৎকে রাখিয়া গিয়াছেন অথবা উড়াইয়া দিয়াছেন তাহা সুধীগণই বিচার করিতে পারিবেন।

আচার্য্য ভারতের ব্রাহ্মণ সুতরাং ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি জগতের প্রাণনাশ ভয়ে উহাকে রাখিবার চেষ্টা করিয়া যে কোনরূপ তত্ত্বের অপলাপ করিয়াছেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত। ইহাতে যদি জগতের থাকা সম্ভব হয় তবে থাকুক, না হয় উড়িয়া যাউক, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

প্রবন্ধের আর একস্থানে মায়াকে ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের কোনরূপ অবস্থা স্বীকার করিলে তাঁহার কূটস্থতার হানি হয়। ইহাও ভাবিবার বিষয়।

কয়েক স্থানে অভিব্যক্তি বিকাশ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া তিনি বিষয়টী আরও জটিল করিয়াছেন। কারণ অভিব্যক্তি পদার্থটি উহার কর্ম্ম জগৎ হইতে পৃথক্ হইলে দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে যদি উহা

১। জ্ঞান নিবর্ত্ত্যত্বং বা মিথ্যাত্বং। নবা বিয়দাদের্ব্রহ্মজ্ঞান নাশ্যত্বেঽপি...। প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিক নিষেধ প্রতিযোগিত্বং বা মিথ্যাত্বং। অদ্বৈতসিদ্ধি।

কর্ত্তা ব্রহ্মের স্বরূপ হয় তবে আবার সেই অভেদবাদের সকল দোষই আসিয়া পড়ে। সুতরাং এ পদার্থটী কি তাহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত।

প্রবন্ধকার বেদান্তের আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য দর্শনের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তিনি লিখিয়াছেন—

"ব্যাপককে তাহার ব্যাপ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতেই হয়, ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এক বস্তু হইতে পারে না।"

এই সিদ্ধান্ত তিনি কোথায় পাইলেন? ব্যাপকত্বের প্রসিদ্ধ লক্ষণ "তৎ সমানাধিকরণাত্যন্তা ভাবা প্রতি-যোগিত্বং" এবং ব্যাপ্যত্বের লক্ষণ "তদভাববদবৃত্তিত্ব"। এই সমস্ত লক্ষণে এমন কিছুই বলা হয় নাই যাহাতে ব্যাপ্যত্ব ও ব্যাপকত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় উহাদের আশ্রয় বস্তুকও পরস্পর ভিন্ন হইতেই হইবে।

প্রবন্ধকার অন্যস্থানে লিখিয়াছেন "কর্ম্ম কখনই কর্ত্তাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারেনা…নাম রূপাদি বিকার বর্গ…ব্রহ্মেরই ক্রিয়া বা কর্ম্ম মাত্র।"

এইস্থানে "কর্ম্ম" শব্দটীর অর্থ যদি ব্যাকরণের কর্ম্ম কারক হয় তবে তাহা কর্ত্তাকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না এরূপ বলা সঙ্গত হয় না, কারণ "গৃহে স্থিত্বা হিমালয়ং স্মরতি" প্রভৃতি স্থলে কর্ম্ম হিমালয় কর্ত্তাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবেই থাকে, তাহার কর্ত্তার সহিত থাকা কিছুতেই সম্ভব নহে। শেষ ভাগে দৃষ্টি করিলে "কর্ম্ম" শব্দের অর্থ "ক্রিয়া" তাহা বুঝা যায়। "ক্রিয়া" কথাটী পরিস্পন্দনাদি অর্থেই প্রসিদ্ধ। ঐরূপ ক্রিয়া সকল কর্ত্তাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকিতে না পারিলেও উহা প্রপঞ্চ স্বরূপ হইতে পারে না। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" প্রভৃতি শ্রুতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা ব্রহ্মেও থাকিতে পারেনা ইহাও চিন্তনীয়।

প্রবন্ধের আর একস্থানে আছে, "এই পরমাণুপুঞ্জ তাঁহাদের (ন্যায়াচার্য্যদের) মতে স্বাধীন স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু।"

পরমাণুপুঞ্জের এই স্বাধীনতা ও স্বতঃ সিদ্ধতা কি তাহা বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। যাহা অন্য কোন কর্ত্তার অপেক্ষা না করিয়া নিজের শক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে পারে লৌকিকেরা তাহাকেই স্বাধীন বলেন। সাঙ্খ্যাচার্য্যের প্রকৃতিকে ঐরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন।

পরমাণু সকল ঈশ্বর সাপেক্ষ তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ও বলিয়াছেন, অতএব উহার ঐরূপ স্বাধীনতা নাই।

"স্বতঃ সিদ্ধ" শব্দে স্বপ্রকাশ অথবা প্রমাণ নিরপেক্ষ বুঝায়। পরমাণুগণ স্বপ্রকাশ অথবা নিজের সিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ নিরপেক্ষ নহে। এই শব্দটীর "উৎপত্তি রহিত" এইরূপ অর্থ করিলেও নিত্য কথাটীর সহিত থাকায় পুনরুক্ত হয়।

নূতন গবেষণা ও ছাত্রদিগের নিকট তাহার ফল প্রকাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের একটী বিশেষ কার্য্য বলিয়া প্রবন্ধান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এইরূপ নূতন গবেষণা অপেক্ষা পুরাতন সিদ্ধান্তগুলির যথাযথভাবে রক্ষার ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সমধিক উপযোগী।

শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিবার মত আরও অনেক কথা আছে। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কার জন্য সে সকলের উল্লেখে বিরত থাকিলাম।

বেদান্ত ঋগ্বেদ হইতে কিরূপে কতটুকু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা দেখিবার ঔৎসুক্যে আমরা এই স্থানেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

বাল্যসখী

(ফরাসী হইতে)

১

সে ছিল এক ছোট মেয়ে, নামটি বন-লতা,
ছোট একটি পল্লীমাঝে, কবেকার সে কথা!
জীবনের সেই প্রভাতে মোর নবীন উষালোকে
দেখেছিলেম তারে আমি স্বপ্নভরা চোখে!
হাতে সাজি, অঙ্গ ঘিরি চারু নীলাম্বরী
পুষ্পবন পথে—যেন ছোট একটি পরী।
দুটি ছোট ছেলে মেয়ের প্রথম পরিচয়
কখন হ'ল—সে কাহিনী তুচ্ছ অতিশয়।

২

সেদিন হতে মোরা দুটি মিলি সারাবেলা
খেলিয়াছি নিতি নিতি কতই নূতন খেলা।
ভোর না হতে ফুলের বনে আসিত সে ছুটি
মুখে চোখে কি আনন্দ উঠিত যে ফুটি।
বুলবুলিটি গান গাহিত মোদের পানে চাহি,
তারি সাথে সুধাকণ্ঠে উঠিত সে গাহি'।
প্রাণে গানে ভরা ধরা-বক্ষ হতে তারে
কেড়ে নিতে, কে জানিত মৃত্যু ছিল দ্বারে!

৩

মনে পড়ে বিদায় দিনে ভরা নদীর কূলে
তার সাথে মোর শেষ দেখা সেই প্রাচীন তরুমূলে।
কি বেদনা সেদিন প্রাণে উঠেছিল যে ভরি'
না জানি সে কি ছিল মোর বাল্যসহচরী!
বলেছিনু তারে ধীরে—মুছি অশ্রুরেখা—
"বরষ পরে বনলতা আবার হবে দেখা।"
আবার যবে শরৎ এল—কোথায় বনলতা?
কোন পথে সে গেছে চলে—চিহ্ন নাহি কোথা!

৪

এমন কত হয়ে থাকে—সংসারের এ রীতি,
না ফুটিতে পুষ্প কত ঝরে পড়ে নিতি।
আমার তরুণ হৃদয়খানি অন্ধকারে তবু
সেই যে গেল ছেয়ে—তাহা ঘুচিল না কভু।
বিশ্বমাঝে মনোলোভা যত শোভা আছে
চিরদিনের তরে সবই ব্যর্থ মোর কাছে।
একটি উজল স্মৃতি-রেখা—জীবনভরা ব্যথা
রেখে গেছে বাল্যসখী আমার বনলতা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

ঠাকুর নারায়ণ ভারতী

শাস্ত্রে আছে "আনন্দরূপমমৃতম্"! সত্যই আনন্দরূপ পরমানন্দ ঈশ্বর সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রকাশিত আছেন, আমাদের দৃষ্টিশক্তির অতীত রূপে সেই সারাৎসার জগৎ চিন্তামণি সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত। ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে সকলেই দেখিতে পায় একথাও ঋষিগণেরই আশ্বাসোক্তি। আমরা ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিনা, অভেদবুদ্ধি ব্যতীত তিনি আমাদিগের উপলব্ধির বিষয়ীভূত হন না। কিন্তু অভেদবুদ্ধি কাহাকে বলে? সমস্ত ভেদাভেদের অতীত ঈশ্বর সকল প্রকার খণ্ডক্ষুদ্র অস্তিত্বকে আবৃত করিয়া সত্তামাত্রেই অধিষ্ঠিত আছেন, এবম্প্রকার চিত্ত-প্রত্যয়কে অভেদবুদ্ধি বলা যায়। আমরা সেই বিশুদ্ধ ভেদবৈষম্যহীন চিত্ত চৈতন্য লাভ করিতে পারিলে ধন্য হইতে পারি। এই প্রকার চিত্ত চৈতন্যের উদ্বোধন ব্রহ্মচর্য্য সাপেক্ষ। সংযম শক্তির প্রভাবে মানব বুদ্ধি দ্বৈত প্রত্যয় হইতে অদ্বৈতের ধারণা লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

কালপ্রভাবে বর্ত্তমানে সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য জগৎ হইতে উৎসাদিত হইতে বসিয়াছে। প্রকৃত সত্যাচার্য্যের অভাবে ব্যসন বিলাস রঞ্জিত একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল যুগ সভ্যতা জাগিয়া উঠিয়া সংযমকে দূরান্বিত করিয়াছে। জগতের পক্ষে ইহা কল্যাণকর কিনা প্রতীচ্যের কতিপয় মনস্বী দার্শনিক এ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। সংযম রাহিত্য ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, রাষ্ট্রনীতিকতাই এ যুগের মনীষাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সমাপ্তিহীন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। আমরা রাষ্ট্রনীতিকতার আপেক্ষিকতা ও ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম প্রভৃতির চিরন্তনত্ব সহজ দৃষ্টিতেও বুঝিতে পারি। রাষ্ট্রীয় দৌর্ব্বল্য সংযম রাহিত্যেরই বিষক্রিয়া মাত্র।

আমরা যে মহাত্মার বিষয় কিছু বলিতে চাই ইনি সংযম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের প্রচারক। নদীয়া জিলার অন্তর্গত আমলা সদরপুর পোষ্টাফিসের অধীন আবুরী নামক এক পল্লীগ্রামে ইঁহার সাধনা ও বাসস্থান। পরম ধর্ম্মনিষ্ঠাবতী শ্রীমতী ত্রৈলোক্যতারিণী দেবীর গর্ভে, সাত্ত্বিক প্রকৃতি ভগবদ্‌ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি হরিনাথের কনিষ্ঠপুত্র।

শৈশবকালে নারায়ণ ভারতী হরিনামের পাগল ছিলেন। ৬,৭ বর্ষের বালক নামাবলী গায়ে দিয়া তারক ব্রহ্মনাম জপ করিবেন এইজন্য পিতামহ ৺কৈলাসচন্দ্রের একখানি ছিন্ন ও পরিত্যক্ত নামাবলী সংগ্রহার্থ চেষ্টা করিতেন। স্বজনের অসাক্ষাতে নামাবলী গায়ে দিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেন: ইনি অতি শৈশবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন হরিনাম করিলে জীবের আর জন্ম হয় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইনি অসংখ্য গ্রন্থপাঠ ও স্বাধীন চিন্তাদ্বারা উপলব্ধি করেন যে, দুর্গতির অগাধগহ্বরে আপতিত দুঃখদগ্ধ জীবের পক্ষে ভাবপ্রবণ ভক্তি ধর্ম্মাশ্রয় অপেক্ষা চরিত্র গঠন ও জ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। ভক্তিপথে চরিত্র ও জ্ঞানবল না থাকিলে ব্যভিচার অনিবার্য্য। নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি তীর্থে ভক্তির বিকৃতি চরমে পৌঁছিয়াছে।

নারায়ণ ভারতী একজন নীরব অথচ প্রবল কর্ম্মী। স্কুলে স্কুলে ইনি হেডমাষ্টারদিগকে প্রেরণা দিয়া যে ভাবে ব্রহ্মচর্য্য প্রচার কার্য্য নীরবে ও দ্রুত গতিতে অগ্রসর করিতেছেন তাহাতে আশ্বাসের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমাদের দেশের এখন চরম দুর্গতি উপস্থিত। রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইয়াছে, ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, ও দারিদ্র্য প্রভৃতির একাধিপত্যে দেশে জীবনী শক্তি নাই;—দুর্গতি আর কাহাকে বলে? কিন্তু এত অসুবিধা

সত্ত্বেও নিরুপায় হইয়া থাকা অনুচিত। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আমরা শক্তিমান ও পরমার্থবলে বলীয়ান হইলে অভাব অনটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করিবার ক্ষমতা লাভ করিব এবং দেশকে প্রকৃত সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিতে পারিব, ইহা স্থির সত্য। বাংলা দেশে যতগুলি স্কুল আছে (আমরা এখানে এণ্ট্রেন্সস্কুলের কথাই বলিতেছি) প্রত্যেক স্কুলে যদি বিশেষভাবে জাতি গঠন উদ্দেশ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা করিয়া পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ প্রদত্ত হয় তবে নিশ্চয়ই এ জাতির দুর্ভাগ্য তমসা ব্রহ্মচর্য্যালোকে অন্তর্হিত হইবে। নারায়ণ ভারতী মহাশয় প্রায় শত শত হেডমাষ্টারের সহায়তায় কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আরও লোক চাই। শুধু পুরুষদিগের বিদ্যালয়ে নহে নারী শিক্ষার জন্যও শিক্ষয়িত্রীগণের দ্বারা সংযম মন্ত্র প্রচারের ব্যবস্থা হইতেছে। ঈশ্বরের অভয় হস্ত শিক্ষকগণকে সহায়তা করিবে নিশ্চয়। শ্রীনারায়ণ ভারতী মহাশয়ের নীরব কর্ম্মপ্রয়াস ঈশ্বরের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠুক। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত দেশবাসীর মুক্তির অন্য উপায় নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-স্মৃতি

[চিন্তা *]

(১)

বালুকার উপর চিহ্ন ফেলা সহজ,—পাথরের উপর কঠিন। কিন্তু ঠিক চিহ্ন পাথরেই পড়ে, বালুকাতে নয়।

(২)

যে বিষয় মূর্খেও শিখতে পারে আর পছন্দ করে তা-তে বেশী কোন পদার্থ নেই; যা-আছে তা কিছুই নয়,—সে-টা না-শেখাই ভাল।

(৩)

মহৎ মানুষের এতবড় দোষ থাকতে পারে যার জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবনে যথেষ্ট স্থানই নাই। তবু যে মহৎ, সে মহৎ।

(৪)

হীন আনন্দ হ'তে বিরত থাকাই উচ্চতর আনন্দের অধিকারী হবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

(৫)

যাঁরা ক্ষুদ্রত্বে তৃপ্ত তাঁরা কিছুই করেন না; যাঁরা তা-নন তাঁরাই পৃথিবীর উপকারী।

(৬)

যাঁরা অধ্যায়নশীল তাঁদের দেখে মনে হয় যেন তাঁরা বুঝি খুব স্থির প্রকৃতি; কিন্তু বাস্তবিক তাঁদের চিত্ত যত অস্থির পৃথিবীতে তত কারুই নয়।—শান্ত পৃথিবীর গর্ভস্থ আগ্নেয় গিরির কথা মাঝে মাঝে মনে করা ভাল।

(৭)

মানব জাতির সম্বন্ধে 'বিরুদ্ধ'-মত পোষণ করতে নেই,—তা হ'লে দুষ্ট লোককে দেখানো হবে যে, তারা অপর চাইতে অধিকতর দুষ্ট নয়, আর সাধুর সাধুত্ব যেন একেবারেই বৃথা।

(৮)

যাঁরা পরিষ্কার ভাবে লেখায় মনোভাব জ্ঞাপন করেন তাঁরা স্বচ্ছ জলাশয়ের মতন,—দেখে তখনি বোঝা যায় যে বাস্তবিক গভীরতা কত।

—ঘোলা জল হঠাৎ দৃষ্টিতে কত গভীর দেখায়।

* বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ওয়ালটার স্যাভেজ লাণ্ডর লিখিত "কাল্পনিক বাক্যালাপ" দ্রষ্টব্য।

(৯)

যিনি খাঁটী জ্ঞানের কথা বলেন তাঁর কথা শুন্‌লে মানুষের প্রাণ উঁচু হয়।

কারু-কারু কথা শুন্‌লে খালি যেন চক্ষুর ভ্রু-মাত্রই উঁচু হ'য়ে ওঠে।

(১০)

কবিদের লেখায় একটা দুঃখের স্রোত প্রায় দেখা যায়; তবু সেই বিষাদময়ী কাহিনী যিনি লিখেছেন তাঁর তাতে কত আনন্দ,—কত 'পূর্ণ' আর কত 'স্থায়ী' সে আনন্দ!

পারস্য দেশ জয়েও ম্যাসিডোনিয়রা বুঝি তেমন আনন্দ পায়নি!

(১১)

খাঁটী বন্ধুত্ব একটা বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত পাত্র,—মূল্যবান্ পাথরে তৈরি। অথচ উত্তাপ লাগ্‌লে বা অসতর্ক-ব্যবহার তা হঠাৎ ফেটে যেতে পারে; আর একবার যদি ফেটে গেল তখন আর ভরসা নেই।

যতই বেশী সাজানো সে পাত্র ততই দেখা যাবে ভবিষ্যতে তার মেরামত কত দুরূহ।

মূল্যহীন অমার্জ্জিত জিনিষের 'ফাটা' জুড়ে নেওয়া যায়,—দামী জিনিষে তা মোটেই হয় না।

(১২)

ইঁটের দেওয়ালে ফুটো হ'লে তাকে বন্ধ করা চলে, মণি-মুক্তার তা' চলে না।

তেমনি মানুষের মন!

সাধারণ লোক অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু যার অন্তঃকরণ কোমল, চিন্তা উচ্চ-শ্রেণীর, সে ক্লেশ সহ্য করে,—আঘাত পেলে তা' তার 'ভাল' হয় না, যদি-হয় তবে সে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ভাবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

দীনের কাহিনী

পূর্ব্ব পাড়ায় গ্রামের প্রান্তে ছোট একখানি ঘরে
পিতা ও পুত্রী ছিল কোন মতে দুর্দ্দিনে দুখ-ঝড়ে,
মেয়ের বয়স বেড়ে যায় যত—রূপ উছলিয়া ওঠে
তার পানে চেয়ে বাপের বক্ষে কাঁটার বেদনা ফোটে।
দানেতে অর্থ উপে গেছে, আছে ভাঙ্গাবাড়ী একখানি,
কালের কবল হ'তে প্রাণপণে রাখা গেছে তারে টানি।
জমি যাহা ছিল, ময়নামতীর দারুণ ক্ষুধার গ্রাসে
চ'লে গেছে তাহা—স্মৃতি তার স্মরি চোখে জল ভরে'
আসে।

সাধ্বী ললনা উমার জননী অকালে গিয়াছে চ'লে
শিশু উমাটীরে ফেলে রেখে দিয়ে স্বামীর চরণ তলে।
যা' কিছুর মায়া উমার পিতাকে রেখেছিল পাশে বাঁধি
সবি গেল যেন অভাবিত ভাবে অকালে কাঁদায়ে, কাঁদি।
অসময়ে তাই জুড়াও আসিয়া দেহকে জীর্ণ করি'
অকুলের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় ত্বরিতে জীবন তরী।
মেয়ের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে স্নেহে আঁখি ছলছল
বুকের শোণিতে মানুষ ক'রেছে বহু যত্নের ফল,
ওরি হাসিটুকু নিখিলের আলো ফুটায় আঁধার ঘরে
সময় হ'য়েছে বিদায় দেবার কেড়ে নিয়ে যাবে পরে।
কিন্তু এযে গো মেয়ের বিবাহ, পিতৃদায়ের বড়
সময় হ'লেও এগোয় না বড় টাকা না করিলে জড়,
গরীবের মেয়ে দেখেই পিছায় পুত্র-পিতার দল,
দুর্ভাবনায় বৃদ্ধ পিতার চোখ হ'তে ঝরে জল।

এমনি করিয়া কেটে গেল আরো অচল বছর তিন,
ষোল বছরের মেয়েটাকে দেখে পিতার শরীর ক্ষীণ।
অন্ন রোচে না, নিদ্রা গিয়েছে, চক্ষু গিয়েছে ব'সে
জীর্ণ বৃন্ত শুষ্ক ফলটী কখন পড়িবে খসে!
অনেক যাতনা অনেক হতাশা বহু চেষ্টার পরে
উমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল হালদ রদের ঘরে,
মেয়েটী রূপসী তাই বেশী কিছু দাবি নাই ওঁ হাদের,
মেয়ের কেবল অলঙ্করণ চাই এক হাজারের।
মেয়ের বাপের আঁখি তারা দু'টি ললাটে উঠিয়া গিয়া
স্থির হয়ে গেল; হে বিধি এ বুকে স্নেহ দিলে কি
ভাবিয়া?
গরীব বাপের অন্তর কেন পাষাণ দিলে না গড়ি?
দয়াল নামেতে কলঙ্ক নিলে ওগো নিরদয় হরি!
শেষ সম্বল বাড়ীখানি গেল কন্যার মুখ চেয়ে,
সুখে থাক্ উমা, ও ছিল মায়ের বড় আদরের মেয়ে!

পথের ভিখারী আশ্রয়হীন তবু মনে মনে ভাবে
সুখে থাক্ উমা, শেষ ক'টা দিন কোন মতে কেটে
যাবে।

এত বড় ত্যাগ স্নেহের দায়েতে, সহিল না তাও বিধি—
বাক্হীন হয়ে বহু জ্বালা সয়ে পিতার পরাণ নিধি
মাতাস স্বামীর নিদয় আঘাতে মুদিল নয়ন দু'টি,
জীবন প্রভাতে অফুট কলির বৃন্ত গেল গো টুটি।
দশা আলোটুকু, তাও নিবে গেল—কি ঘোর
অন্ধকার।
অভাগ জনক কত স'য়েছিল, আজি সহিল না আর!
বুদ্ধি বৃত্তি লোপ হয়ে গেল জ্ঞান ভাণ্ডার হ'তে,
ধূলি ধূসরিত উন্মাদ ঐ ফিরিতেছে পথে পথে।

শ্রীঅমিয়া দেবী।

হিন্দুর দুর্দিনে

(পাবনা হিন্দু সভায় পঠিত)

এতদ্দেশীয় হিন্দু সভাগুলির উদ্দেশ্য যাহাই হউক, হিন্দুর ধর্ম্মের লোপ এ সকলের উদ্দেশ্য হইতেই পারে না; সুতরাং হিন্দু মানুষের লোপ হওয়াও এ সকল সভার উদ্দেশ্য হইতেই পারে না। হিন্দু মানুষ না থাকলে যখন হিন্দুধর্ম্ম থাকা সম্ভব নহে, তখন হিন্দুধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, হিন্দু মানুষকেও তিনি বাঁচাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবেনই। সুতরাং হিন্দুগণকে বাঁচাইয়া রাখিতে যে সকল অনুষ্ঠান ও আচরণ আবশ্যক হয়, যে সকল বিধি নিষেধ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া জানা যায় তাহা অবশ্য করণীয় ও পালনীয়। হিন্দুগণ নির্ম্মূল হইয়া গেলে শৃগাল, সর্প, চামচিকা ও পায়রা তাহাদিগের জঙ্গল কণ্টকিত উজাড় বাস্তু দখল করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাদিগের সেবিত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি না। সুতরাং হিন্দু মানুষ যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করা প্রত্যেক হিন্দু সভার গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

হিন্দু মানুষ কিসে রক্ষা হয়? মানুষ রক্ষা হইলেই সমাজ রক্ষা হইল, সমাজ রক্ষা হইলেই ধর্ম্ম রক্ষাও হইতে পারে।

কেবল রক্ষা মাত্রই হিন্দুসভা গুলির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে; উন্নতি সাধনও ইহাদিগের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জাতি যেরূপ দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে, তাহার রক্ষাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য।

হিন্দু জাতির কি হইয়াছে; ইহাদিগের দুর্দ্দিনের নিমিত্ত কি? কোন্ হেতু হিন্দু আজি মরিতে বসিয়াছে? এ সকল অবগত না হইলে রক্ষার উপায় চিন্তা করা যায় না; উন্নতি ত দূরের কথা। কিন্তু এত বড় প্রকাণ্ড একটি সমস্যা এ স্থলে সম্যক্ আলোচনা করা অসম্ভব এবং আমার ন্যায় ব্যক্তি দ্বারা তাহা হইতেও পারে না। যাহা হউক, যথাসম্ভব এই দুর্দ্দশার এবং ইহার প্রতিকারের উপায় সকল কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। হিন্দুর ধর্ম্ম তাহার সমস্ত জীবন-ব্যাপী। সুতরাং তাহার সমস্ত জীবনের আলোচনা করাই উচিত। তাহা এস্থলে অসম্ভব, সুতরাং কতিপয় অনুষ্ঠান মাত্র আলোচনা করিব। এ সকল বিষয় খণ্ডশঃ নানা দিক হইতে আমি বহুদিন আলোচনা করিয়া আসিতেছি। বক্তৃতাদ্বারা, গ্রন্থ প্রকাশ করতঃ এবং মাসিক পত্রিকা সমূহে আমার জীবনের প্রধান কর্ম্মই এই বিষয় আলোচনা। কিন্তু এ সকলে কি ফল হইয়াছে? আমি রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসে, কনফারেন্সে কখনও যোগদান করি নাই। ও সকল পন্থা পন্থাই নহে, এ ধারণা ভগবান্ আমার মনে প্রথম বয়সেই উদয় করিয়া দিয়াছিলেন। আমি ৩২,৩৩ বৎসর বয়সে ঋগ্বেদ অবলম্বনে "আদিম বৈদিক সময়ের আর্য্য সভ্যতা" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি। এই গ্রন্থ হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতিকেই আমি মানব জাতির উন্নতির এক মাত্র মূল কারণ বলিয়া প্রথম বয়স হইতেই মনে করিয়া আসিতেছি। তৎপর যথাশক্তি স্মৃতিশাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য মানব তত্ত্বমূলক সমাজ বিজ্ঞান পাঠে ও প্রত্যক্ষ দর্শনে বুঝিতে পারি যে, হিন্দু জাতির সমাজ গঠন যেমন উন্নত এবং যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তেমন কোথাও কোন কালে ছিল না ও নাই; বোধ হয় অন্যত্র তাহা সম্ভবও নহে। সে সকল কথা বহু বিস্তৃত। সুতরাং এস্থলে বিবৃত হইতে পারে না। কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম তাহা স্মরণ করুন। (১) হিন্দু জাতির কি হইয়াছে, কেন ইহারা মরিতে বসিয়াছে? (২) হিন্দু ধর্ম্মের এত অধোগতি কেন হইল? (৩) যে কারণেই ঐরূপ দুর্দ্দশা হইয়া থাকুক, এক্ষণে কি উপায়ে উহার প্রতিকার করতঃ হিন্দু জাতিকে সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করা যায়? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে। কোনও হিন্দু ইহার উত্তর অন্বেষণ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। আর যিনি যেরূপ উত্তর সঙ্গত বোধ করেন, তিনি তাহা অনুষ্ঠান এবং আচরণ দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে সেই পথাবলম্বী করিয়া হিন্দু জাতির ও হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি সাধনের যত্ন না করিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না।

ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে আমি কি বুঝিয়াছি? শাস্ত্রীয় প্রমাণে, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ মূলে আমি যেরূপ মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা এস্থলে উল্লেখ করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখি, যে স্মৃতি আমাদিগের সমাজ শাস্ত্র; উহা বেদমূলক। উহা মানিতেই হইবে। আমি স্বীকার করি যে, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। কিন্তু সে কোন্ যুক্তি? যাহার মনে যাহা উদয় হয়, সেরূপ যুক্তি নহে। সেরূপ যুক্তির অনুসরণ করা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। মীমাংসা কতিপয় বিধি নিষেধের দ্বারা স্বীয় অসংযত বিক্ষিপ্ত ও উন্মার্গগামী মনকে ন্যায়ের শাসনাধীন রাখিয়া বিচার করিতে বাধ্য; নচেৎ বিতণ্ডা মাত্রই সার হয়; মীমাংসা হয় না। ম্লেচ্ছাদি জাতিও একটা নিয়ম অবলম্বন করিয়া উহাদিগের ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে; কিন্তু তাহা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় উহাদিগকে অত্যল্প কাল মধ্যেই পতনের দিকে লইয়া যাইতেছে। হিন্দুর ন্যায়শাস্ত্রও মানবের ত্রিবিধ দুঃখ দূরীকরণ উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছে।

হিন্দু সমাজে প্রচলিত ন্যায় দর্শন বেদ মূলক, সুতরাং ধর্ম্মাশ্রিত। এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, প্রত্যেকে স্বস্ব বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বিচার বুদ্ধিকে সংযত রাখিয়া মীমাংসা করাই উচিত। আমি এ স্থলে এই পন্থাই অবলম্বন করতঃ আমার বক্তব্য আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিব।

প্রথম কথা হইতেছে, হিন্দু জাতির কি হইয়াছে?

কেন ইহারা মারতে বসিয়াছে? যদিও ব্যক্তির সমষ্টিতেই জাতি গঠিত হয়, তথাপি বহু বিষয়ে জাতি ঐ সমষ্টি অপেক্ষাও বৃহৎ এবং পৃথক্ পদার্থ।* আমরা এ প্রসঙ্গে কোথাও জাতিকে ব্যক্তির সমষ্টি গণ্য করিব, কোথাও তদপেক্ষা বৃহত্তর সংহতি বিবেচনা করিব।

হিন্দুজাতির কি হইয়াছে, ইহার উত্তরে অনেক দুর্লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু আমরা কেবল সাতটী মাত্রের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। (১) জন্ম, মৃত্যু; (২) আয়ু; (৩) অর্থাভাব ও দ্রব্যাভাব; (৪) পীড়া, (৫) বিলাসিতা (৬) নিরানন্দ (৭) একতা। দেখিবেন, এসকলকে সচরাচর হিন্দু সভার আলোচ্য বলিয়া গণ্য করা হয় না। কিন্তু আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, হিন্দুর ধর্ম্ম তাহার জীবন ব্যাপী। সুতরাং এ সকলের আলোচনা হওয়া উচিত। (ক) সকলেই জানেন হিন্দু সমাজে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানেই—হিন্দু জন্মে কম, এবং মরে বেশী। জন্মের হার প্রতি সহস্রে ২৯ অথবা ৩০ ত্রিশ; কিন্তু মৃত্যুর হার ৩১ হইতে ৩৩,৩৪ পর্য্যন্তও দেখা যাইতেছে। এরূপ হইলে সে জাতি কালে মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবেই ত। এস্থলে প্রজনন ক্ষমতার (fertility) হ্রাস বৃদ্ধিও দ্রষ্টব্য। প্রজনন ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু অপত্য জন্মাইবার নানা প্রকার বাধাও থাকিতে পারে; তদ্রূপস্থলে প্রজনন ক্ষমতা সন্তোষজনক মাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও জন্মের সংখ্যা হ্রাস হইয়া জাতি-বিলোপ হওয়া সম্ভব। ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের আদেশক্রমে আমি বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ মধ্যে নানাস্থলে গবেষণা করতঃ একটী মন্তব্য প্রস্তুত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভাগলপুর অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। উহা ঐ অধিবেশনের কার্য্যাবলীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে আমি দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতির প্রজনন শক্তি এখনও উত্তম আছে; উহা গত একশত বৎসরের মধ্যে হ্রাসও হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বৃদ্ধি যে পর্য্যন্ত আছে সে পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি নির্ম্মূল হইতে পারে না। কিন্তু ম্যালেরিয়া এক্ষণে দেশব্যাপী; কালাজ্বরও তদ্রূপ হইতে চলিল। ঐ সকল পীড়া জনন শক্তি হ্রাস করে এবং জনন শক্তি পরিচালনার ক্ষমতাও কমাইয়া দেয়। সুতরাং হিন্দুজাতি নির্ম্মূল হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

হিন্দু জন্মে কম। আমরা জন্মের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা ত করিতেছি না; বরং যাহাতে জন্মের সংখ্যা আরও কম হয় তাহাই সঙ্গত ব্যবস্থা মনে করি। যে পরিমাণ হিন্দু মরে, তাহাতে জন্মের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা না করিলে হিন্দুজাতি সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম নিশ্চয় অনতিবিলম্বে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। যিনি জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আপত্তি করিবেন, অথবা বাধা দিবেন, তিনি হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের শত্রু কি মিত্র তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন। জন্মের সংখ্যা বাড়াইব কেমন করিয়া? "সকলই বিধিলিপি" এই কথা বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না। জন্মের সংখ্যা বাড়াইবার এবং মৃত্যুর সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করা হিন্দুসভার এবং হিন্দুমাত্রেরই একটী গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "সকলই বিধিলিপি" এ কথা পরমার্থতঃ সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক বুদ্ধিতে এ কথা স্বীকার করতঃ কেহই সকল কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন না। সুতরাং চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। কি চেষ্টা? প্রথম চেষ্টা বহু-অপত্য বিশিষ্ট বংশের পুত্র কন্যার সহিত অল্প অপত্য-বিশিষ্ট বংশের পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া। ইহাতে ঐ অল্পাপত্য-বিশিষ্ট বংশেও বহু অপত্য জন্মিবার আশা করা যায়। এই বিধেরই এক অংশ হইতেছে, —অল্প অপত্য বিশিষ্ট দুইটী বংশের পুত্র কন্যাকে

* Human Society unit is a new synthesis, a unity with a disinctive mode of behaviour, with a whole that is more than the sum of its parts.......
—Thomson's Heredity, p. 150.

বিবাহ না দেওয়া। যদি বরকন্যা দুইজনই অল্পাপত্য বিশিষ্ট বংশের হয় তবে তাহাদিগের নির্ব্বংশ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। আপনারা স্মরণ করুন, কত বংশ নির্ম্মূল হওয়া আপনারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যদি মহামারী কিংবা অকস্মাৎ কোন দৈব দুর্বিপাক বশতঃ ঐরূপ না হইয়া থাকে, তবে দেখিবেন ঐ নির্ম্মূল হইবার প্রধান কারণ অল্পাপত্য বিশিষ্ট বংশের সহিত বিবাহ অনুষ্ঠান করা। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। গত পাঁচ পুরুষ হইতে আমাদিগের জননশক্তি হ্রাস হইতেছে; তাহার উপরেও আর একটী প্রায় জনন শক্তিহীন বংশের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইল। ইহার ফলে আমার যাহা হইল তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। জনন শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিবার একটী মোটামুটী সূত্র এই যে, যদি কেবল বংশে অপত্য জন্মে কম, অথবা জন্মের সংখ্যা অধিক থাকিলেও বাঁচে কম, অর্থাৎ অল্প বয়সেই মারা যায়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেই বংশে প্রজনন শক্তি হ্রাস হইয়াছে। ইহার বিপরীত অবস্থাতে প্রজনন শক্তির বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। তিন, চারি অথবা পাঁচপুরুষ হইতে যে বংশে অপত্য সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে অথবা অপত্যগণ ক্রমেই অতিশয় অল্পায়ু হইতেছে সে বংশ নির্ম্মূল হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে বহ্বপত্যবান্ বংশের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতেই হইবে। এই হইল জন্মসংখ্যা বাড়াইবার প্রথম কথা। সুপ্রণালী মত এই মূল সূত্র অনুসারে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত করিতে হইলে একশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ঘটক থাকা আবশ্যক। তাঁহারা সুপ্রজনন (Eugenics) শাস্ত্রের প্রধান প্রধান বিধি নিষেধগুলি যথাসম্ভব জ্ঞাত থাকিবেন। এবং এতদ্দেশীয় হিন্দুসমাজ পর্য্যবেক্ষণ করতঃ আমাদিগের উপযোগী নূতন নূতন বিধি নিষেধ আবিষ্কার করিবেন। সেই বৈজ্ঞানিক ঘটকের পুঁথি ও খাতা পত্র দেখিয়া হিন্দু সমাজ সদসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য বরকন্যা স্থির করিয়া বিবাহ দিবেন। এ কার্য্য কঠিন নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দুগণ কৌলিন্য প্রথার অনুরোধে তদনুরূপ ঘটকের পুঁথির আদর করিতেন। আজ বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সুপ্রজনন শাস্ত্রের নিয়মানুমানুসারে লিখিত ঘটকের পুঁথির আদর করিতে আমরা পারিব না কেন, তাহার কোন কারণ নাই। কাহার বংশে কতটি অপত্য জাত হইল, কাহার পুত্রের সংখ্যা অধিক, কাহার কন্যার সংখ্যা অধিক, কাহার বংশ অল্পায়ু, কাহার বংশ দীর্ঘায়ু, কাহার বংশে অন্ধ, খঞ্জ, উন্মাদ, বিকলাঙ্গ, অতিশয় নির্ব্বোধ, বংশানুক্রমিক পীড়াগ্রস্ত, অকৃতী অথবা কৃতী, বলিষ্ঠ, সুস্থ, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক অথবা অধার্ম্মিক ইত্যাদি কতজন জন্মিয়াছে এই সকল বিষয় এবং আরও কতিপয় বিষয় ঐ বৈজ্ঞানিক ঘটকের খাতায় লিপিবদ্ধ হইবে। তদ্দৃষ্টে আমরা বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব। এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও অর্থোপার্জ্জনের একটা পথ হয়, হিন্দুজাতিরও পরম মঙ্গল সাধন হয়। আপনারা এ কার্য্যে ব্রতী হইবেন কি?

বিবাহ বিষয়ে আপনাদিগের স্মৃতির এবং গৃহ্যসূত্রের বিধি নিষেধগুলি মানিয়া চলিলে সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। আমিও তাহার অধিক কিছু বলিতেছি না।

মনু বলেন—

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সুতে তথা বিধং।
মনুসংহিতা ৯।৯

এস্থলে আমি আর একটু যোগ করিতে চাই—

যাদৃশং ভজতে ভর্ত্তা সুতং সুতে তথাবিধং।

কারণ, অপত্য কেবল স্ত্রী হইতে জাত হয় না, স্বামী স্ত্রী উভয় হইতে জাত হয়। আমাদিগের গৃহ্য সূত্র গুলির বিবাহ বিষয়ক বিধি নিষেধ সকল বিবেচনা করিলে ইহা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, শতবর্ষজীবী বলিষ্ঠ সৎপুত্র লাভই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের প্রধান

লক্ষ্যাদি, আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রের ১৭৩ কারিকার ১।৫।৩ সূত্রের প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(১) প্রথমতঃ বর এবং কন্যার বংশ বিবেচনা করিতে হইবে, পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয়ই বিবেচনা করিতে হইবে।

২। বুদ্ধিমান যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিবে।

৩। যে কন্যা বুদ্ধিমতী, সুশ্রী, সচ্চরিত্রা এবং আরোগিণী অর্থাৎ ব্যাধিহীনা তাহাকে বিবাহ করিবে। আপস্তম্ব গৃহ্য সূত্রের ১ম পটলের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৮। ১৯ সূত্রেও বর কন্যার লক্ষণ সম্বন্ধে ঐরূপই বিধান দেখা যায়। এই নিয়মগুলির সহিত মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪—১১ শ্লোক, এবং ২০—৩৪ সংখ্যক শ্লোক স্মরণ করুন এবং তৎসহ স্মরণ করুন।—

> কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
> নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।
>
> অঃ ৯।৮৯ শ্লোক।

গুণহীন বরকে কখনও কন্যাদান করিবে না; বরং কন্যা ঋতুমতী হইয়াও অবিবাহিতা অবস্থায় সমস্ত জীবিতকাল পিতৃগৃহে বাস করিবে, তাহাও ভাল তথাপি নির্গুণকে কন্যাদান করিবে না; সুতরাং দোষী ব্যক্তিকে ত দিবেই না। মদ্যপ, পরদার রত, পরস্বাপহারী, বংশানুক্রমিক পীড়াগ্রস্ত, মূর্খ, ধর্ম্মহীন বরকে কখনও কন্যা সম্প্রদান করিবে না। কন্যা মাত্র প্রসবিনীর জননীর কন্যাকে, রোগিণীকে, অতি লোমাকে, বহুপরুষভাষিণীকে, চরিত্রহীনা, ধর্ম্মহীনাকে বিবাহ করিবে না। এ সকল কন্যার বিবাহই হইবে না এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। কেহ বা অর্থলোভে কেহ বা রূপের মোহে, কেহ বা অভিভাবকের গৌরব ইহাদিগকে বিবাহ করিবেই। কেবল যাঁহারা সমাজের উন্নতিকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁহারাই ইহাদিগকে বর্জ্জন করিবে। ইহাদিগকে বিবাহ করিলে সমাজের জনবল নষ্ট হইতে পারে, ধর্ম্মবলও নষ্ট হইতে পারে। ধর্ম্মই সমাজকে রক্ষা করে; ধর্ম্মহানি হইলে সমাজ কিছুতেই রক্ষিত হইতে পারে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুপ্রচলিত শাস্ত্রজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ঘটকগণ কর্ত্তৃক বংশাবলী লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত এবং তদ্দৃষ্টে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া সঙ্গত। ইহা করিতেই হইবে।

হিন্দু জন্মে কম, মরে বেশী। এই দুরবস্থার প্রতিরোধ করিতে জন্মের সংখ্যাও বাড়াইতে হইবে; মৃত্যুর সংখ্যাও কমাইতে হইবে। জন্মের সংখ্যা বাড়াইতে প্রথম কথা বহুঅপত্যবান্‌ বংশের সহিত বিবাহ বন্ধন; স্মৃতি ও গৃহ্যসূত্রের নিয়ম সকল যথা সম্ভব প্রতিপালন। এ সকল কঠিন কথা নহে। একাগ্র ভাব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। স্মরণ করুন ত মনু মহারাজের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সূচক ব্যবস্থা—

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।"

এই একটী ব্যবস্থা অমান্য করায় হিন্দু সমাজ অধঃপতিত হইতে হইতে নির্ম্মূল হইতে চলিল। অধঃপতনের ও ধ্বংসের অন্যান্য গুরুতর কারণও আছে, তাহা ক্রমে বলিতেছি। কিন্তু ঐ বিধানটী অমান্য করাও একটী গুরুতর কারণ। অধিক দিনের কথা নহে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে "কুললক্ষ্মী" নামক বৃদ্ধা কুমারীগণ পিতৃগৃহে আমরণ বাস করিয়াছে। "পাল্টী" ঘরের বর না পাওয়ায় তাহাদিগের বিবাহ হওয়া অসম্ভব ছিল। বিবাহ দিলে কুল নষ্ট হইত। সেই নিমিত্ত তাহাদিগের অভিভাবকগণ বিবাহ দিতেই পারিতেন না। যদি কুল রক্ষার নিমিত্ত এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়, তবে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ হওয়া যায় না কেন? এরূপ না হইলেও ত ভীষণ পণ-প্রথার অত্যাচার হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা যায় না। কন্যার বিবাহ দিতে আমরা এত তাড়াতাড়ি করি; কন্যা ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে থাকিলে স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণ সেই ঋতুরক্তঃ পান করায় পতিত হইবেন আশঙ্কায় আমরা এত ব্যস্ত হইয়া পড়ি, যে, অর্থশাস্ত্রের বিধান আসিয়া আমাদিগের কণ্ঠদেশে এরূপ বজ্র মুষ্টিতে আঘাত করে যে তাহাতে প্রাণান্ত

হইবার উপক্রম হয়। কন্যা কর্ত্তা যদ অতশীঘ্র কন্যাদান করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তবে বরকর্ত্তা দাঁও পাইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই চাহিবার মত সুবিধা ও সুযোগ প্রাপ্ত হন। শুধু কন্যা নহে, সমস্ত পদার্থেরই এই নিয়ম। যাহাই আমি হস্তান্তর করিতে অতি ব্যস্ত হই, তাহারই মূল্য থাকে না; বরং গৃহীতা সুবিধা পাইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া অবহেলা প্রকাশ করে। এ নিয়ম আপনারা কখনই উঠাইতে পারিবেন না। অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অলঙ্ঘ্য, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে। আপনারা নিশ্চিত বুঝিবেন যে, কন্যাকে বিবাহিত করিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আগ্রহ না দেখাইলে, মনু মহারাজের আদেশ শ্রদ্ধার সহিত মান্য করিলে বরপণ প্রথা কখনই আপনাদিগের সমাজকে এতদূর প্রপীড়িত করিতে পারিত না। উত্তম বরলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাকে বিবাহ দিবেন না। অথবা, কন্যাকে আপনার বিষয় সম্পত্তি যাহাই থাকুক তাহার উত্তরাধিকার স্বত্ব পুত্রের সহিত সমভাবে দিবার প্রথা প্রচলন করুন। এ দুই-এর এক পন্থা অবলম্বন না করিলে বরপণ প্রথা নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য হইবে—ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে অসাধ্যই হইবে। যদি কন্যা বিবাহ দিবার নিমিত্ত অতশয় ব্যাকুল হন, তবে পুত্রজনন শাস্ত্রের বিধি নিষেধও পালন করিবার অবসর হইতে পারে না; স্মৃত গৃহসূত্রকেও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা চলে না। আমরা যে সর্ব্বনাশকর পথে চলিয়াছি তাহাতে হিন্দুসমাজ কখনই টিকিতে পারে না। নির্ম্মূল হইবেই। আর যত দিন কোনরূপে আধমরা হইয়া পড়িয়া থাকে ততদিন শ্রীহীন অন্নহীন বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন হই। এখনকার মতই পড়িয়া থাকবে। অবশেষে নির্ম্মূল হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

স্মৃতি

(গল্প)

ভগবানের অস্তিত্বটা কোনদিনই স্বীকার করতাম না—কিন্তু করতে হল, ভগবানের লীলাক্ষেত্র পুরীতে এসে। সমুদ্রের বিকট গর্জ্জন আর তার বুকের উজ্জ্বল সূর্য্য রশ্মি আমার সে নাস্তিকতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যটা তখন আমার হৃদয়ে এমন ভাবে বাসা বেঁধেছিল যে, সেটাকে কিছুতেই তাড়াতে পারতাম না।

সেদিন সকাল বেলা সমুদ্রের ধারে পায়চারী কোরে জেলেদের ডিঙ্গি বেঁধে মাছ ধরতে যাওয়া একমনে দেখছিলাম, এমন সময়ে একটা বুড়ো গোছের লোক এসে আমার কাছে হাত পেতে দাঁড়াল! ভারী বিরক্ত হলাম্—রাস্তাঘাটে একটু আরামে বেড়াব—তাতেও নিস্তার নেই! খালি পয়সা—পয়সা।

বিরক্ত হয়ে তার আক্কেলের জন্যে তাকে খুব ভৎর্সনা করলাম। সে কেঁদে ফেল্লে!—বল্লুম "চাকরী করবে?" বল্লে "করবে!" সেই দিনই তাকে বাসায় ডেকে আনলাম! বৃদ্ধের দুই চোখ দিয়ে কৃতজ্ঞতার জল পড়তে লাগল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে উপরে এলাম—কিন্তু আজ একলা যেন কিছু ভাল লাগ্‌ল না—বৈচিত্র্যহীন জীবনের

সুখ কোথায়? শেষ বৃদ্ধকেই ডাকলাম—এসে আমার সুমুখে দাঁড়াল। তার নাম বল্লে বিশ্বনাথ, জাতিতে কৈবর্ত্ত! তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে বিবাহিত কি অবিবাহিত? উত্তর দিলে অবিবাহিত। এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত এসব জাতে আমি এই প্রথম দেখলাম। তার কারণ জিজ্ঞাস করলাম—বল্লে সে অনেক কথা। বল্লাম "বলতে কিছু বাধা আছে কি?" বল্লে "না—তবে শুনুন বাবু! এ হতভাগার জীবন শুধু দুঃখে পরিপূর্ণ!" সে বল্‌তে আরম্ভ করলে:—

নদীয়া জেলার কামার পাড় গ্রামে আমার বাড়ী! সংসারে আমরা তিনটী প্রাণী ছিলাম, বাবা, মা, আর আমি। বাবা সমস্ত দিন চাষ বাস কোরে যা উপার্জ্জন করতেন তাতে আমাদের এই তিনটে প্রাণীর জীবন বেশ সুখেই কাটছিল, কিন্তু গরীবের সুখ বুঝি ভগবানের সহ্য হয় না। একদিন এক জ্যোৎস্না সন্ধ্যায় বাবা আমাদের ছেড়ে কোন্ অজানা দেশের উদ্দেশে চলে গেলেন। বাবা মারা যাবার পরেই আমি মাকে নিয়ে মামার বাড়ীতে চলে এলাম। আমার আসার সঙ্গে সঙ্গে যত সুখ শান্তি সকলই আমায় ছেড়ে গেল—সঙ্গে রইলো শুধু আমার সারা জীবনের সাথী দুঃখ।

মামার বাড়ীতে একটা বছর কাল সুখেই কেটে গেল। কিন্তু তার পর থেকেই যখন মা-ও আমাকে ছেড়ে বাবার কাছে চলে গেলেন তখন থেকে আমার দুঃখজীবনের প্রথম অঙ্কের সূচনা হল। দিন রাত্তিরই মামা মামীদের তীব্র গঞ্জনায় আমার হৃদয়খানি ভরপুর থাকত। এমন কি সময়ে সময়ে প্রহারের চিহ্নগুলি আমার পিঠে নানারঙে রঞ্জিত হয়ে আমার বিবেককে ব্যঙ্গ করত। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে গভীর রাত্রে যখন শয্যায় আশ্রয় নিতাম তখন শৈশবের সুখস্মৃতি এসে আমার দুঃখ গুলোকে সান্ত্বনা দিয়ে যেত। আমার চোখের জলও কেন জানি না, সেই দুঃখ গুলোকে মন থেকে ধুয়ে বেরিয়ে এসে নীরবে মাথার বালিশে মিশে যেত। তখন আমার বয়সও অল্প মোটে আঠার কি উনিশ।

আমার এই গভীর দুঃখে সান্ত্বনা দেবার কেউ ছিল না একটী দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে ছাড়া। সে থাকত ঠিক আমার মামার বাড়ীর পাশেই একটা জীর্ণ কুটীরে, তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। রোজ রাত্রে যখন বাইরে এসে দুঃখের কথা স্মরণ করে নীরবে চোখের জল ফেলতাম—কেন জানি না বাবু, কোথা থেকে এই ছোট্ট মেয়েটা তার ভাসা ভাসা চোখ দুটো আমার চোখের ওপর রেখে সামনে এসে দাঁড়াত। তার সে করুণ চোখ দুটো দেখে আমার মন কেমন শান্ত হয়ে যেত। একদিন যে আমায় কি বল্লে জানেন বাবু? বল্লে পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি কেন এমন পরের বাড়ীতে নির্য্যাতন সহ্য করছ?—নিজের পথ দেখে নিতে পার না?" এইটুকু মেয়ের মুখে এমন জ্ঞানীর মতন কথা শুনে আমি আশ্চর্য্য হলাম—ভাবলাম সত্যিই ত। এরা আমার কে? আপনার লোক হলে এ রকম ব্যবহার ত কেউ করে না! লোকে কথাতেই বলে "যেন মামার বাড়ীর আবদার" কিন্তু এখানে ঠিক তার উল্টো দেখলাম। বাড়ীর মেনি বেড়ালটাও আমার চেয়ে আদর পেত।

এই মেয়েটিকে আমি বড় ভাল বাস্‌তাম্, সত্যি বাবু। যদি কোনদিন কাউকে যথার্থ ভালবেসে থাকি ত তাকেই বেসেছি আর কাউকেই নয়। কিন্তু সে আমায় বাস্‌ত কি না জানি না, আর জানতে চেষ্টাও করি নি। আমাদের দু'জনকে কথা কইতে দেখলে সকলেই ভারী বিরক্ত হতেন।

একদিন দুপুরবেলা খাওয়া শেষ করে উঠ্‌ছি এমন সময়ে সে এসে বল্লে, "একটা কথা রাখ্‌বে?" একটু হেসে বল্লাম, "রাখলেও রাখ্‌তে পারি।" বল্লে "তুমি এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও! এখানে আর থেকোনা, এখানে নির্য্যাতন করতে সবাই আছে কিন্তু সান্ত্বনা দিতে......"

বাধা দিয়ে বল্লুম, "কেন, তুমি?"......

একটু হাসলে। বল্লে, "আমি ত আর বেশী দিন এখানে থাকব না, আমার যে—

বলেই সে থেমে গেল. সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠ্‌ল।—ছুটে চলে গেল—আমিও ধীরে ধীরে চলে এলাম।

তার দু'দিন পরে তার বিয়ে হয়ে গেল! উঃ—সে সময় কি কষ্ট হল কি বল্‌ব বাবু? বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল! কিন্তু কে যেন একগাছা লক্‌লকে চাবুক মেরে আমার মনকে বুঝিয়ে দিলে "ওরে হতভাগা! ও স্বর্গের পারিজাত তোর মত বাঁদরের জন্যে সৃষ্টি হয়নি!"—মন তাতে বুঝ্‌ল না—গুমরে গুমরে কেঁদে উঠ্‌ল।

সে চলে গেল বটে, কিন্তু তার সেই কথা কয়টা আমার মনের ভেতর কেবল ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগ্‌ল! শেষকালে একদিন সত্যি সত্যিই পালিয়ে গিয়ে হুগ্‌লিতে ডাকাতের দলে যোগ দিলাম। কি করব, তা ছাড়া আর যে পথ দেখ্‌তে পেলুম্ না! আমাকে কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান দেখে অল্পদিনের মধ্যেই তারা আমাকে তাদের দলপতি করে নিলে।—জীবনের গতি বদ্‌লে গেল!

২

ডাকাতি করার পর থেকেই আমার দিনগুলো বেশ যাচ্ছিল! তখন বাল্যের সমস্ত স্মৃতিগুলি আমার মন থেকে বিদায় নিতে আরম্ভ করলে! তখনকার দিনগুলো কেমন নতুন নতুন ঠেক্‌তে লাগ্‌লো!

পুলিশে আমাদের দলটাকে ধরবার খুবই চেষ্টা করছিল—কিন্তু সফল হয়নি!

সে দিনটা কেবল বাদ্‌লা বাদ্‌লা বোধ হচ্ছিল—এমন বাদ্‌লা দিনটা বৃথা কাটাতে ইচ্ছে গেল না। আদেশ দিলাম্ সবাইকে প্রস্তুত থাক্‌তে—রাত্রে রায়দের বাড়ীতে ডাকাতি করতে হবে। রাত্রি তখন বোধ হয় একটা! সদলবলে রায়দের শয়নঘরে ঢুকলাম্। দেখলাম্ একটা স্ত্রীলোক একটা ছোট্ট ছেলেকে আঁকড়ে ধরে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছে! ছেলেটার গায়ে দামী দামী গয়না—লোভ হল! ধীরে ধীরে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম্—তার মা জেগে উঠে চীৎকার আরম্ভ করে দিলে। সহ্য করতে পারলাম্ না—তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়ে তার জীবন শেষ কোরে দিলাম।"

এই বলেই বৃদ্ধ কেঁদে উঠ্‌ল। আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে বলতে আরম্ভ করলে।

"হুঁ, তারপর যখন মশালের আলো জ্বাল্‌লাম্—শিউরে উঠলাম্। এ যে সেই মেয়েটা—যে শোকে দুঃখে আমার তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়ে শীতল করতো! যাকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসতাম্! আমার বুকটা ফেটে যেতে লাগল—পা দুটো থর থর করে কাঁপছিল। অত গয়না ফেলে শুধু তার হাতের আঙটীটা নিয়ে চলে এলাম্। ইচ্ছা সারা জীবন তার স্মৃতিটাকে আঁকড়ে রাখব!—এই দেখুন বাবু, এখনও সেই আঙটী আমার হাতে রয়েছে!"—এই বলে বৃদ্ধ আমাকে একটা আঙটী দেখালে। বল্লুম "তার পর?"

বল্লে—"হাঁ, তারপর ডাকাতিতে আর মন গেল না। ছেড়ে দিলাম্। এর পর আর বিয়ে করি-নি; নানাস্থানে চাকরি করেছি। শেষে চাকরীর যোগাড়ে ঘুরতে ঘুরতে পুরীতে এসে পৌছলাম।—তারপরেই আপনার সঙ্গে দেখা!"

এই বলে বিশ্বনাথ চুপ কোরে তার চোখের দুকোণের জল মুছতে লাগল! তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, ঘরের পাতলা অন্ধকারের মধ্যে খানিকটে জ্যোৎস্না এসে তাকে বিলীন কোরে দিয়েছিল—বাইরে সমুদ্র তখনও ভীষণভাবে গর্জ্জন করছিল!

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

"ভুবন ভুলানো হাসি"

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত সুকবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের "ভুবন ভুলানো হাসি" পাঠে)

অরসিক নহি, কঠিন পাষাণ—নহিগো নেহাইৎ চাষা
সিন্ধুর মত না হ'লেও আছে বিন্দুর ভালবাসা।
জানি কিছু কিছু প্রেম-সম্ভাষ
বিরহের প্রিয় চির হা হুতাশ,—
কুঞ্চিত নাসা বঙ্কিম ভুরু দেখিয়াছি বারমাসই।
তবু, ভাগ্যের দোষে চিনিতে নারিনু "ভুবন ভুলানো হাসি।"

পয়সার থলি শূন্য যখন—দিনে দেখা যায় তারা,
তখন যে এসে বলেন হাসিয়া প্রণয়ে আপন হারা—
"বড় ভালবাসি, ওগো হৃদয়েশ,
মুক্তা খচিত কন্ঠি নেকলেস"
যার দরশনে গলায় তখন জমে খুস্‌খুসে কাস!
ওগো, সেটা শুধু এই মস্তকোপরি হস্ত বুলান হাস।

কন্যাদায়ের বন্যায় যবে ভাসাইয়া আপনায়
ঘাটে ঘাটে ঘুরি লাঞ্ছনাঘাতে শ্রান্ত অবশ কায়
খুঁজিবারে বর ভাল ও সস্তা
হয়রে আমার কি যে অবস্থা!
চোখের সামনে ভেসে চ'লে যায় কেবল ধোঁয়ার রাশি—
তখন, বাবার নামটী ভুলায় যে, দাদা, "ভুবন ভুলান হাসি"!

পাঁচটীর পরে আবারও যখন প্রসব করেন মেয়ে,
সংবাদে উঠি মর্ম্মগলিত ঘর্ম্ম প্রবাহে নেয়ে!
সন্তান লাভে হইতে শীতল
পুরো দুই গ্লাস খেতে হয় জল
প্রাণ বায়ুটুকু আটকিয়া থাকে কণ্ঠ অবধি আসি
তখন, বেশ বোঝা যায়, কতগুণ ধরে "ভুবন ভুলানো হাসি।"

এই ভাবে সাধি জীবনের ব্রত হই যবে ঝুলি ঝাড়া,
কোথায় তখন লুকায় সে হাসি, নাহি পাওয়া যায় সাড়া!
ডাকিলে আর না আসে উত্তর
রাগে মনে হয় শুধু "দুত্তোর"
ইচ্ছা হয় যে সংসার ছেড়ে চ'লে যাই গয়া কাশী;
তখন, শক্তিশেলের মত বিঁধে গায় "জীবন জুড়ান হাসি"!

প্রথম হাসিতে অন্ধ করে যে কুন্দ দন্ত পাঁতি
শেষে দেখা যায় সেটা ঠিক যেন ইঁদুর কলের জাঁতি!
কলে ফেলে, দেয় শক্ত কষণ
ক্রমে বাহিরায় বিকট দশন—
লেজ নাড়াটুকু? তাও থেমে যায় সকল দুঃখ নাশি।
শুধু, তখনই ভুবন ভুলাইয়ে দেয় "ভুবন ভুলান হাসি"!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতা।
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কামারলজমান ও বেদৌর (আরব্যোপন্যাস)।

(চিত্রকর—এডমণ্ড ডুলাক)

Bengal Art Press 11, Shikdar Bagan St

১৬শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

মহারাষ্ট্রের নিম্ন জাতি ও শিবাজী মহারাজ

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী থেভেনো (Thevenot) ভারতবর্ষ পর্য্যটনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনোজ্ঞ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সপ্তদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকেই ইংরাজীতে অনুবাদিত ও লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল। মুসেঁা থেভেনো ভারতের নানা প্রদেশের চিত্তাকর্ষক বিবরণের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর অভ্যুদয় কাহিনীও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। থেভেনোর বিবরণ যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা একবার তাঁহার পুস্তকের পৃষ্ঠায় চক্ষু বুলাইয়া গেলেই বোঝা যায়। কিন্তু এক বিষয়ে বোধ হয় তাঁহার মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে শিবাজী প্রথম কতকগুলি দস্যু লইয়া তাঁহার দল গঠন করিয়াছিলেন। শিবাজীর দলে অভিজাত শ্রেণীর লোকের অভাব ছিল না। বহু সম্ভ্রান্ত দেশস্থ ব্রাহ্মণ এই তরুণ জননায়কের অসমসাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া অথবা হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে তাঁহার আদর্শের আকৃষ্ট মহত্বে হইয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন। বহু উচ্চবংশজাত মারাঠা বীরও এই মারাঠা কুলপ্রদীপের প্রতিভা-জ্যোতিতে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর প্রভু বংশীয় দেশ পাণ্ডেরাও দেবতার নামে "হিন্দবী স্বরাজ্য" প্রতিষ্ঠার আয়োজনে শিবাজীর পৃষ্ঠপোষকতা করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অভিজাত শ্রেণী লইয়া সৈন্যদল গঠন করা যায় না,—সৈন্যদলে কেবল হুকুম করিবার লোক থাকিলেই হয় না, হুকুম তামিল করিবার লোকও চাই। জাতীয় মহাসমরে জাতির সকল স্তরের লোকের সহায়তা দরকার, মস্তিষ্ক ও বাহু উভয়ের সহযোগিতা ভিন্ন দেশের কায সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই তীক্ষ্ণদর্শী শিবাজী মহারাজ সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই আপনার পতাকামূলে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বীয় চরিত্র প্রভাবে সমাজের সকল স্তরের

লোকেরই চিত্তজয় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মহাব্রত উদ্‌যাপনে রামদাস স্বামীর ন্যায় মহাপুরুষও যেমন অকাতরে সহায়তা করিয়াছেন, তেমনি কতকগুলি চৌর্য্য ব্যবসায়ী দস্যু তস্কর শ্রেণীর অসাধু ইতর জাতীয় লোকও তাহাদের বাহুর শক্তি, চরণের ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধির কৌশল শিবাজীর সেবায় নিয়োগ করিয়াছিল। শিবাজীর মাওলী সেনা দরিদ্র লইয়া গঠিত। মাওলীদের পেটে অন্ন ছিল না, পরিধানে বসন ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে সাহস ছিল, অন্তরে নিষ্ঠা ছিল—আর সেই গুণাবলীর আদর হইয়াছিল শিবাজীর নিকট। তাহার আগেও হয় নাই, তাহার পরেও বেশী দিন হয় নাই। কিন্তু দরিদ্র মাওলীরা দস্যু নহে। মহারাষ্ট্রে কোলী, মহার ও রামোশীরাই তস্কর বলিয়া বিখ্যাত।

ইহাদের মধ্যে রামোশীরাই সমধিক দুর্দ্ধান্ত। কেহ কেহ বলেন যে ইহারা মহীশূর রাজ্যের বেরড জাতির জ্ঞাতি। একজন বেরড বীর শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্রাট ঔরংজীবের বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে রামোশী ও বেরড এক নহে। মহারাষ্ট্রে কখন যাযাবর রামোশী জাতি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন। কোন পথে কোথায় তাহারা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তাহা স্থির করাও সহজ নহে। ১৮৩৮ সালে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত An Account of the origin and the Present Condition of the Tribe of Ramoosies নামক গ্রন্থে কাপ্তেন আলেকজেণ্ডার ম্যাকিণ্টস প্রচলিত প্রবাদ হইতে ইহাদিগের আদি বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছেন। মারাঠা আমলে রামোশীরা দুর্গে ও পল্লীগ্রামে প্রহরীর কার্য্য করিত, চাষবাসও করিত। গিরিদুর্গে প্রহরীর কার্য্যের জন্য তাহারা কিছু নিষ্কর জমি ভোগ করিতে পাইত। গ্রামের কাযের জন্য মিলিত, কোথাও বা কিছু নগদ মুদ্রা, কোথাও কিছু শস্য। তাহাদের বড় সর্দ্দারেরা হয়ত বিজয়া দশমীর দিন গ্রামবাসীদিগের নিকট একটা হৃষ্ট-পুষ্ট মেষই উপহার পাইত। এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ীদিগের পণ্যদ্রব্য রক্ষা করিবার দায়িত্বের জন্যও তাহাদের একটা পাওনা ছিল। এই সকল প্রাপ্যে তাহাদের পেট ভরিত না। তাহাদের পুরুষানুক্রমিক প্রকৃত পেশা ছিল চৌর্য্যবৃত্তি বা ডাকাতি। জঙ্গল ও পাহাড়ের ভিতর দিয়া গুপ্ত পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে, আরণ্যপশুর ডাকের সংকেতে নানা দিক হইতে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মিলিত হইতে, সংখ্যায় অল্প হইলেও অসম সাহসে বহু লোক রক্ষিত ঘর বাড়ী আক্রমণ করিতে, বিভিন্ন বনপথে ক্ষিপ্রভাবে পলায়ন করিতে, ছদ্মবেশে গ্রামে বা সহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহে ইহারা অদ্বিতীয়। নিশাকালে ইহারা অকুতোভয়ে শ্বাপদ-সঙ্কুল বনপথে ভ্রমণ করে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বন্য পশুর হস্তে রামোশীর প্রাণ যাওয়ার কথা বড় একটা শোনা যায় না। অতি সামান্য জঙ্গলের মধ্যেও ইহারা ঠিক বন্য পশুর মতই সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে লুকাইতে পারে। মহারাষ্ট্রে ইংরাজী অমল অস্ত হইবার পরও ইহাদের উৎপাত কমে নাই। রামোশী দস্যু উখিয়া বা উখাজির উৎপাতে বহু দিন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে, এবং তাহাকে ধরিতে ইংরাজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শোনা যায় যে রামোশী দস্যুরা এক রাত্রিতে কখনও কখনও ত্রিশ চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে।

এই সকল রামোশী দস্যু এমন দুর্দ্দান্ত যে একবার একজন রামোশী চক্রান্তকারীর দণ্ডের জন্য পেশবা দ্বিতীয় মাধব রাওর জননী গঙ্গা বাঈকে অন্নজল ত্যাগের ভয় দেখাইতে হইয়াছিল। ম্যাকিণ্টস সাহেব বলেন যে রামোশী বৃদ্ধদিগের মতে শিবাজীই তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে রাষ্ট্রের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বহু পুরুষ পর্য্যন্ত চৌর্য্য ও তস্কর বৃত্তিতে লিপ্ত থাকায় রামোশী-চরিত্রের যে গুণগুলি বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল, গিরিদুর্গের গুপ্তবর্ত্ম প্রভৃতি আবিষ্কারে, শত্রুর গতিবিধি ও শত্রু-শিবিরের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহে—সেই গুণগুলিই বিশেষ আবশ্যক।

তাই শিবাজী এই ডাকাতের দলকে দেশের সেবায় ডাকিলেন; আর তাঁহার ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে, এই নরহন্তা দস্যুরা যে কেবল শিবাজীর অধীনে দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে দুই একজন নেতার নাম মারাঠা ইতিহাসে একেবারে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। আজিও রামোশীরা শিবাজীর নামে সম্ভ্রমে মস্তক নত করে। এই-খানেই শিবাজীর প্রকৃত মহত্ব।

মহারাষ্ট্রের নিম্ন জাতির মধ্যে কেবল যে রামোশী দিগকেই তিনি দেশের কাযে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। রামোশীদিগের মত না হউক, দস্যু-বৃত্তির জন্য মহার দিগেরও কতকটা অখ্যাতি ছিল। মহারের জাতিগত পেশা পল্লীরক্ষা—কিন্তু পল্লী-প্রাচীরের ভিতরে এই অন্ত্যজ জাতির স্থান ছিল না। গ্রামের মহার পাড়া গ্রামের বাহিরে; সেইখানে ক্ষুদ্র অপরিসর, অপরিস্কার কুটীরে মহারেরা পশুর মত জীবন যাপন করে। রামোশীদিগের মত চৌর্য্যই মহারের কৌলিক বৃত্তি নহে। চোখা মেলার মত পরম বৈষ্ণবও মহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর পুর্ব্বেও তাহারা পল্লী সেবা করিত। শিবাজী তাহাদিগকে কোন কোন দুর্গ রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। কোলী, রামোশী ও মহারেরা কিন্তু দুর্গের ভিতরে থাকিতে পাইত না। তাহাদের স্থান দুর্গের বাহিরে। শত্রুসেনার আক্রমণ হইতে গিরিপথ রক্ষা করা, শত্রু সেনার আগমন সংবাদ জানাইয়া দুর্গরক্ষক দিগকে সতর্ক করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত রামোশী ও মহার দিগের সাহায্যে শিবাজী গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

মুসলমান আমল হইতে ইংরাজ আমলের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত কোলী দস্যুর উৎপাতে মহারাষ্ট্রের গিরি-পথ গুলি মোটেই নিরাপদ ছিল না। মারাঠা সরকার ইহাদের সঙ্গে একটা রফা করিয়াছিলেন। কোলা নাইকেরা পথিকদিগের নিকট হইতে একটা মাশুল আদায় করিত এবং এই অধিকারের বিনিময়ে রাজপথের শান্তি অব্যাহত রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিত। পেশবার পতনের পর এলফিন-ষ্টোন সাহেবও কিছুদিন এই ব্যবস্থাই চালাইয়া-ছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে ইংরেজের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর কোলী দস্যুদের উপদ্রব কমিয়া গিয়াছে। মুসলমান আমলে ইহাদের উপদ্রবে দক্ষিণ ভারতের বড় বড় পথগুলি কিরূপ বিপদ-সঙ্কুল হইয়াছিল তাহার বিবরণ বহু বিদেশী পর্য্য-টকের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শিবাজী মহারাজ এই কোলী দিগকেও নিজের কাযে লাগাইয়াছিলেন, বন্য বর্ব্বর বলিয়া তুচ্ছ করেন নাই।

তিনিই প্রকৃত জননায়ক যিনি সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোককে রাষ্ট্র সেবার অধিকার দেন এবং সে অধিকারের সুব্যবহার করিতে উৎসাহ দেন। শিবাজীও প্রকৃত জননায়ক ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে ছিল দেশের অদম্য অখণ্ড জন শক্তি নতুবা মহারাষ্ট্রের সামান্য জায়গীরদার-পুত্রের সাধ্য কি যে আলমগীর বাদশাহের সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয়?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

বেদান্ত-দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

(তর্কপাদ)

[১]

সে অনেক দিনের কথা। স্বর্গ-গত বৈদান্তিক পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়, বেদান্ত দর্শনের সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্য, বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎকালে এই অনুবাদ গ্রন্থ দ্বারা, বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, সুপ্রখ্যাত বেদান্ত দর্শনে কি অমূল্য তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার আস্বাদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনুবাদ দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকের আশানুরূপ তৃপ্তি লাভ হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের কেবল মাত্র আক্ষরিক অনুবাদ প্রদত্ত হইলে, বুঝিবার পক্ষে পথ তাদৃশ সুগম হয় না। শঙ্কর ভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া দিয়া যদি, অনুবাদটী করিতে পারা যায়, তবেই তদ্দ্বারা পাঠকের সম্যক্ উপকার হইতে পারে। সমুদয় কঠিন কঠিন স্থল যদি বিস্তৃত-ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তবেই সে অনুবাদের মূল্য বাড়িতে পারে। কিন্তু, পণ্ডিত কালীবর, তাদৃশ বিস্তৃত ব্যাখ্যা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আবার ঐ গ্রন্থের কেবল প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়াই, উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অদ্যাবধি আর কেহ উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতেও উদ্যম করেন নাই। বর্ত্তমানে আর ঐ গ্রন্থ পাইবার কোন আশা করা যায় না। যাঁহারা ভারতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের অমূল্য সিদ্ধান্ত গুলি জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহাদিগকে ভারতের উপনিষদ্‌গুলি এবং বেদান্ত দর্শন—এই মূল গ্রন্থগুলির সাহায্য লইতেই হইবে। আবার, মহামতি ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সকল গ্রন্থের উপরে যে সকল জগদ্বিখ্যাত ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাষ্যে কি আছে, তাহা জানিতে না পারিলে, ব্রহ্ম বিদ্যার ও ব্রহ্ম স্বরূপের কিছুই জানা হয় না। এই অভাব মোচনের জন্য আমরা "উপনিষদের উপদেশ" নাম দিয়া তিনখণ্ড বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলাম। শঙ্কর, যে দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমাদের এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল। প্রত্যেক খণ্ডের প্রথমে, একটী করিয়া বিস্তৃত 'অবতরণিকা' প্রদত্ত হইয়াছিল; উহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। পাঠক জানেন শঙ্কর মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ এই অনুবাদ করা হইয়াছিল এবং ভাষ্যকে সহজ ও সরল করিয়া দেওয়াই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই গ্রন্থত্রয় বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে কতদূর আদর লাভ করিয়াছিল, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই তিন সংস্করণ হইয়া যাওয়াতেই বুঝা গিয়াছিল। হিন্দি অনুবাদও, অতি অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ করিয়া, অযোধ্যার পণ্ডিত বাণীভূষণ শুক্ল মহোদয়, পুস্তক গুলিকে একরূপ সমগ্র ভারতে বিস্তৃত করিবার সুবিধা করিয়াছেন।

কিন্তু বেদান্ত দর্শনের আর কোন অনুবাদ বঙ্গভাষায় কেহ অদ্যাপি করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে "নব্য ভারতে" আমরা বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের অনুবাদ ধারাবাহিক রূপে বাহির করিয়াছিলাম। এই অনুবাদও, কেবলমাত্র আক্ষরিক অনুবাদ নহে। ভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়াই এই

অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। 'নব্য ভারতের' অনেক পাঠক তৎকালে এই ব্যাখ্যা পড়িবার জন্ম, মাসের পর মাস, উৎকণ্ঠিত ও উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। সেই প্রারব্ধ কার্য্যটী শেষ করিবার উদ্দেশে আমরা পুনরায় সেই অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিতেছি। "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় আমরা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদটী ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই পাদটী 'তর্কপাদ' নামে বিখ্যাত। সমগ্র বেদান্ত দর্শনের মধ্যে ইহা একটী অমূল্য সামগ্রী। এই পাদটী অতি দুরূহ ও অতি জটিল যুক্তি তর্ক দ্বারা পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা কার্য্য যে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহা পাঠক-পাঠিকাকে বলিয়া দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কঠিন হইলেও, আমরা শঙ্কর ভাষ্যের মহামূল্য রত্নরাজি, পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিতে মনঃস্থ করিয়াছি। এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রতি, পাঠক-পাঠিকার সানুগ্রহ ও সস্নেহ দৃষ্টি পতিত হইতে পারিলেই, আমরা সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

১। একমাত্র ব্রহ্মবস্তুর নির্ণয় করাই, সমুদয় উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য। একমাত্র এই উদ্দেশ্য লইয়াই উপনিষদ্ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই, সমুদয় উপনিষদের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতে হইবে। বেদান্ত-দর্শন, সেই তাৎপর্য্য প্রদর্শনের জন্যই অগ্রসর হইয়াছে। ব্রহ্মবস্তুর প্রতিপাদনই যে উপনিষদ্‌গুলির একমাত্র মুখ্য তাৎপর্য্য, বেদান্তদর্শনে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল তর্কের সাহায্যে কোন মত বিশেষের সংস্থাপন বা খণ্ডন করা, বেদান্ত দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তথাপি বেদান্তদর্শন বিবেচনা করেন যে, সাংখ্য ও ন্যায় প্রভৃতিতে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলি ব্রহ্মপ্রাপ্তির অনুকূল নহে, বরং সে পথের প্রতিবন্ধক, তজ্জন্যই বেদান্তদর্শনের এই পাদে, সাংখ্য প্রভৃতি মতের খণ্ডন করিবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হইতেছি। উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া দেখাইতে পারিলেই, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথটী সুগম হইয়া পড়ে; তজ্জন্যই বেদান্ত দর্শনে সর্ব্বপ্রথমে সেই তাৎপর্য্যই প্রদর্শিত হইয়াছে; সাংখ্যাদির মত প্রথমে খণ্ডন করা হয় নাই। উপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয় দ্বারা, আমাদের স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিবার পরে, সম্প্রতি আমরা অন্যের মত খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইতেছি।

যাহারা মুক্তি চায়, তাহাদিগের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান আবশ্যক এবং বেদান্তের নিজের মতটী সংস্থাপিত করিলেই, সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রদর্শিত হইল। এ অবস্থায়, পর-মত খণ্ডনের প্রয়াসে আবশ্যক কি? অপরের মত খণ্ডন করিতে গেলে, অপরের সঙ্গে একটা বিবাদ বিসম্বাদ, ঈর্ষা ক্রোধ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এরূপ কুফল-প্রসবকারী প্রয়াস করিবার আবশ্যক কি? এরূপ কথা উত্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইরূপ—সাংখ্য ও ন্যায়াদির মত, অনেক বড় বড় পণ্ডিত কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে; এবং ঐ সকল মতেও, মুক্তিতত্ত্ব প্রদর্শিত রহিয়াছে। সুতরাং অল্পবুদ্ধি লোকে, ঐ সকল মতকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা আছে এবং ঐ সকল মত গ্রহণ করিলেই মুক্তির পথ সুগম হইবে, ইহাও মনে করিতে পারে; এই আশঙ্কা ও সম্ভাবনা নিবারণের নিমিত্ত, আমরা পর-মত খণ্ডনের ইচ্ছা করিয়াছি। আমরা এ স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ঐ সকল মতের সারবত্তা কিছুই নাই।

সাংখ্যাচার্য্য ও ন্যায়াচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, আপন আপন মতের ও সিদ্ধান্তের সংস্থাপনার্থ ও দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত, স্বীয় গ্রন্থে উপনিষদ্ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, স্বমতানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে সেই সকল ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি, আমরা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে, তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যে নিতান্তই অসার, তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি।

প্রথমে সাংখ্য মত খণ্ডিত হইতেছে।

সাংখ্যের যুক্তি এইরূপ—ঘট, শরাব, পাত্র প্রভৃতি বস্তুগুলির প্রত্যেকের মধ্যে একটী সাধারণ ধর্ম্ম দেখিতে

পাওয়া যায় ; মৃত্তিকার স্বরূপই সেই সাধারণ ধর্ম্ম ; প্রত্যেকের মধ্যেই মৃত্তিকার স্বরূপটী অনুগত রহিয়াছে, দেখা যায়। অতএব, মৃত্তিকাই এই সকল বস্তুর 'কারণ'। এইরূপ, বাহ্য ও আধ্যাত্ম প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে, সুখদুঃখ-মোহরূপ একটী সাধারণ ধর্ম্ম (common characteristic) অনুগত রহিয়াছে (১) দেখা যায়। সুতরাং সুখ দুঃখ-মোহকে, ঐ সকল দ্রব্যের 'কারণ' বলা যায়। সাংখ্য দিগের 'প্রকৃতি' নামক উপাদানটী এই সুখ দুঃখ মোহ দ্বারা জড়িত। সাংখ্যের প্রকৃতি—অচেতন, জড়। ইহাই জগতের মূল উপাদান। এই উপাদানটি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ শক্তি বিশিষ্ট ; এই তিনটী শক্তি লইয়াই ঐ উপাদানটী রচিত। সুখ-দুঃখ-মোহ—এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমেরই ধর্ম্ম। এই প্রকৃতি, অন্তর্নিহিত শক্তিবলে, কোন চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়াই, বিবিধ বস্তুর আকারে পরিণত হইতেছে। প্রকৃতির এই প্রকার পরিণাম না হইলে, পুরুষের বা জীবের বিষয়ভোগ ও মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। সেই উদ্দেশ্য সম্মুখে লইয়াই, জড়ীয় প্রকৃতি হইতে, সর্ব্ববিধ বিকার উৎপন্ন হইতেছে। এই কারণে ও অন্যান্য কারণে (২) সাংখ্যাচার্য্যগণ, প্রকৃতি নামক বস্তুটীকে জগতের মূলকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সাংখ্যের প্রতি আমাদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—

যদি কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারাই বস্তু নির্ণয় করিতে হয় ; যদি জগতে সুখ-দুঃখ-মোহের সত্তা দেখিয়া, জগতের মূল কারণকে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক জড় বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয় ; তাহা হইলে আমরাও, দৃষ্টান্তের বলে, অন্য প্রকার সিদ্ধান্তেও ত উপনীত হইতে পারি। তুমি এই জগতে কোথায় দেখিয়াছ যে, একটা জড় অচেতন বস্তু, আপনা আপনি, কোন চেতন জীব কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া, জীবের প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী কোন একটা বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন করিল ? আমরা ত জগতে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট চেতন শিল্পিগণই,—সুখ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বা দুঃখ-পরিহারের উদ্দেশ্যে প্রাসাদ, গৃহ, শয্যা, রথ প্রভৃতি বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখিবে, একদিকে—জীবের কর্ম্মফলের ভোগের উপযোগী, পৃথিবী প্রভৃতি অশেষ প্রকার জড়ীয় বস্তু রহিয়াছে। অপর দিকে—ফলভোগের উপযুক্ত ক্ষেত্রস্বরূপ, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সমন্বিত, মাংস-শোণিতাদি অবয়ব সজ্জিত, এই দেহবিশিষ্ট চেতন জীব রহিয়াছে। আমরা আবার বলি, এই বিচিত্র জগতের দিকে দৃষ্টি-পাত কর ; নিতান্ত সুচতুর শিল্পীও এই জগৎ-রচনার কল্পনাও মনে আনিতে সমর্থ হয় না। একটা অন্ধ, জড় প্রকৃতি কি, এ প্রকার বিস্ময়কর জগৎ নির্ম্মাণে আপনা আপনি সমর্থ হয় ? লোষ্ট্র, পাষাণ, লৌহখণ্ড —প্রভৃতি কোন জড়ীয় বস্তুকে কি তাদৃশ সামর্থ্য বিশিষ্ট কোথাও দেখিয়াছ ? আমরা বরং এইরূপ অনুমানই করিব যে,—কাষ্ঠ পাষাণাদি বস্তু যেমন, নিপুণ শিল্পী দিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই, বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করে দেখিতে পাওয়া যায় ; তেমনি অচেতন প্রকৃতিও, কোন সজ্ঞান, চেতন পুরুষ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই, বিবিধ কার্য্যাকারে পরিণত হইয়াছে। জগতের মূল কারণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, কেবল যে উপাদান কারণের (Material Cause) ধর্ম্ম দেখিয়াই, মূল স্বরূপের অনুমান করিতে হইবে, এমন কোন কথা নহে। নিমিত্ত কারণের (Efficient Cause—যাহা উপাদান কারণ হইতে স্বতন্ত্র থাকে) ধর্ম্ম দৃষ্টে যে মূলস্বরূপের অনুমান করিতে হইবে না,—তাহাই বা কে বলিল ? (৩) বরং নিমিত্তকারণের ধর্ম্ম লইয়া অনুমান

১। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর মধ্যে যেটী সাধারণ ধর্ম্ম বা স্বরূপ, তাহাকেই 'অনুগত' ধর্ম্ম বলে। বেদান্ত বলেন, ঐ অনুগত স্বরূপটী স্বয়ং স্বতন্ত্র রহিয়াই অনুগত বা অনুস্যূত থাকে। "যে বিকারা যেন অন্বিতা স্তে তৎপ্রকৃতিকা" ইতি —রত্নপ্রভা। শঙ্করাচার্য্য সম্ভবতঃ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত 'সাংখ্য-কারিকার' ১৫ কারিকাটী স্মরণ করিয়া, এই ভাষ্য লিখিয়াছেন।

২। ১৫ সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্য।

৩। কার্য্য দ্বারা যদি উহার কারণটীর স্বরূপের পরিচয় পাওয়া

করিলেই শ্রুতি কথিত চেতন বস্তুকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, জগতের মূল কারণ কোন অচেতন জড় বস্তু নহে। কেন না, অচেতন জড় হইতে জগতের এ প্রকার 'বিচিত্র রচনা' (Orderly arrangement) সম্ভব হইতে পারে না। (৪) জড় প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ বলিয়া অনুমান করা যায় না, তাহার আরও হেতু আছে। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে সুখ-দুঃখ-মোহের 'অন্বয়' আছে, সাংখ্যাচার্য্যগণ একথা বলেন। কারণে যে ধর্ম্ম নাই, কার্য্যে সে ধর্ম্ম আসিতে পারে না। এতদ্দ্বারা তাঁহারা প্রকৃতিকে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু, জগতের বাহ্যিক ও আন্তর সমুদায় বস্তুতেই যে সুখ-দুঃখ-মোহের সমন্বয় (continued existence) আছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেন না, সুখ-দুঃখাদিকে আমরা ত আন্তর অবস্থা বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকি; তরুলতাদি বাহ্য বিষয়বর্গে ত আমরা সুখদুঃখাদি দেখিতে পাই না। বরং ইহাই দেখি যে, বাহ্য বিষয়-বর্গই আমাদিগের অন্তরে সুখ দুঃখাদি অবস্থার উদ্রেক করাইয়া থাকে। সুখ দুঃখাদি যদি বাহ্য বিষয় বর্গেরই স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণে একই রকমের বোধ বা অনুভূতি কেন জন্মায় না? চন্দন যদি সুখপ্রদ হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই ত চন্দন সুখপ্রদ হইবে। কিন্তু শীত-কালে কেন চন্দন সুখপ্রদ বলিয়া অনুভূত হয় না? কণ্টক-লতাকে কেবল উষ্ট্রই বা কেন সুখপ্রদ বোধে সুখে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে; মনুষ্যের কেন উহা সুখপ্রদ বলিয়া অনুভূত হয় না? সুখই যদি উহার চিরন্তন ধর্ম্ম বা স্বরূপ হয়; তাহা হইলে সকলের পক্ষেই উহা সর্ব্বদা সুখপ্রদ হয় না কেন? সাংখ্যের অপর যুক্তি এই যে পরিচ্ছিন্ন ও পরিমিত (Limited) বস্তুমাত্রেই দুই বা ততোধিক বস্তুর সম্মিলনে উৎপন্ন, ইহাই জগতে দৃষ্ট হয়। এই যুক্তি বলে ইহাও ত তবে অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে যে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী দ্রব্যই ত সাংখ্যের 'প্রকৃতি'; ইহার একটী অন্যটীকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে; সুতরাং এই তিনটী বস্তুও, অপর দুই বা ততোধিক মৌলিক বস্তুর সম্মিলন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে! সাংখ্যের আর একটী যুক্তি এই যে, যেটী যাহার উপাদান বা কারণ দ্রব্য, সেটী সেই কারণ দ্রব্য হইতে বিভক্ত হইয়া—পৃথক্ হইয়া— বিকৃত হইয়া—উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা, সাংখ্যাচার্য্যগণ, জড় অচেতন প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কারণের সঙ্গে উহার কার্য্যবর্গের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে, জড়ই কারণ হইবে, কোন চেতন বস্তু কারণ হইতে পারিবে না, এমন কোনও নিয়ম নাই। চেতন শিল্পী এবং তন্নির্ম্মিত শয্যা, গৃহাদি দ্রব্যের সহিত ত পরস্পর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে; আমরা এ তত্ত্বের ত উপরেই নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যে সকল যুক্তিবলে সাংখ্যাচার্য্য-গণ জড় প্রকৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল যুক্তির কোনই সারবত্তা নাই। বরং সে সকল যুক্তিদ্বারা আমরা সজ্ঞান কোন চেতনকেই জগতের মূলে পাইতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

যায়, তাহা হইলে অবশ্য মৃন্ময় ঘটদ্বারা উহার কারণ যে মৃত্তিকা, তাহা বুঝা যাব। কিন্তু ইহা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, একজন সজ্ঞান চেতন কুম্ভকারের সহায়তা ব্যতিরেকে ঘটটী কখনই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয় নাই।

৪। ইহাকেই Teleological argument বলা যাইতে পারে। "পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা রাখিয়া একই উদ্দেশ্যে যে স্থলে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডগুলি মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য উৎপাদন করে, সে স্থলে চেতনের প্রেরণা ব্যতীত সেই কার্য্যটী উৎপন্ন হয় নাই, ইহা বুঝিতে হইবে।" "যে স্থলে নিয়মিত ভাবে কোন উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, সে স্থলেও সজ্ঞান চেতনের প্রেরণাই উহার কারণ"—এই দুইটী যুক্তি-দ্বারাও বেদান্তদর্শনে, জগতের কার্য্যের মূলে এক চেতন পুরুষকে নিয়ন্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

নগবালা

(উপন্যাস)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শূন্য পকেট।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকমল পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে, বন্ধু জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহার অনুগামী হয় নাই। অন্যদিন হইলে, সে তাহাকে ফেলিয়াই চলিয়া যাইত। কিন্তু তাহাকে, তাহার একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কৃষ্ণকমল মনে করিয়াছিল যে, আজ জ্যোতিঃ-প্রকাশ যখন পরিচ্ছদের এতটা পারিপাট্য সাধন করিয়া নবীনা নবপরিচিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই সে শূন্য পকেটে আসে নাই। কৃষ্ণকমল জানিত কামিনীগণের মনোরঞ্জন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে অর্থেরই আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং জ্যোতিঃপ্রকাশ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছে, তখন এই সনাতন তত্ত্ব অবশ্যই অবগত আছে। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশের অর্থে কৃষ্ণকমলের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? তাহার প্রয়োজন সংখ্যাতীত—তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। এই সকল প্রয়োজন জন্য তাহার যখনই অর্থের আবশ্যক হইত, সে, তখনই জ্যোতির্ম্ময়ী কিংবা তাহার মাতার কাছে আসিত। আজও সে অর্থ সংগ্রহের জন্য জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে আসিয়াছিল কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ তথায় উপস্থিত থাকাতে সে কার্য্যের সুবিধা হয় নাই। সে মনে করিয়াছিল, আজ জ্যোতিঃপ্রকাশের অর্থেই তাহার প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবে। এই জন্য সে রাস্তার পাশে তাহার আগমন প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। অল্পকাল মধ্যেই সে জ্যোতিঃপ্রকাশকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে দেখিল; দ্রুত পদক্ষেপ হেতু তাহার পকেট মধ্যে টাকা সকল কিঞ্চিৎ আলোড়িত হইয়াছিল; কৃষ্ণকমল, নর্ত্তকীর নূপুর শিঞ্জিতের ন্যায় তাহার মধুর নিক্কণ শুনিল; তাহার হৃদয়ও আনন্দে সেই মধুর নিক্কণের তালে তালে নাচিয়া উঠিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশও প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া আহ্লাদিত হইল। তাহার আগমনের বিলম্ব ঘটিয়াছিল বলিয়া একটা হেতু প্রদর্শন করিয়া বলিল, "রমেশকে জানেন ত? সে হঠাৎ আমাকে ধরে বসলে, তাই আমার বিলম্ব হ'য়ে গেল।"

কৃষ্ণকমল বলিল, "আপনাকে ধরে বসবার কারণটা কি?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, "সে একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিল। দু'টো জামা কিনে তার দাম দিতে পারছিল না; তার পকেটে যে টাকা ছিল, জামা দুটোর দাম তার চেয়ে বেশী। তাই আমাকে ধরে কিছু টাকা ধার চাইলে। আমি বল্লাম, ধার আবার কি? এই তোমাকে পাঁচটা টাকা দিচ্ছি; এ আর তোমার শোধ করতে হবে না।"

কৃষ্ণকমল বলিল,—"Bravo! এই ত বন্ধুর কায। কিন্তু রমেশটার চিরকাল টানাটানি। ওকে কতবার যে কত টাকা আমি দিইছি, তা গণনা করতে পারা যায় না।"

রাস্তায় এইরূপ বহু মিথ্যা ছড়াইয়া, দুই বন্ধু অবশেষে হোটেলে প্রবেশ করিল।

সেখানে প্রবেশ করিয়াই, কৃষ্ণকমল আপন পকেটে হাত দিল, এবং মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "এই দেখুন, ভ্রম! আমি আমার টাকার ব্যাগটা শয়ন-ঘরের মার্ব্বেলের টিপয়ের উপর ফেলে এসেছি। হোটেলের খরচের জন্যে পকেটে ত একটা টাকাও নেই।"

এখন তোমরা অবগত হও যে কৃষ্ণকমলের কোনও গৃহ ছিল না; কোন গৃহে কোন শয়ন কক্ষ ছিল না; কোন গৃহে, কোন শয়ন কক্ষে তাহার কোন মর্ম্মর-মণ্ডিত বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত টীপয় ছিল না; এবং খুব সম্ভব, তাহার টাকার কোন ব্যাগ বা থলি ছিল না; থাকিলেও, আমরা জানি, তাহা চিরদিন শূন্যোদরে বিরাজ করিত। তাহার বাক্যের কিছুই সত্য নহে।

কিন্তু তাহার বাক্য, যুধিষ্ঠির কথিত বাক্যের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ, আপন পকেট মধ্যে রমেশের অর্থ ধ্বনিত করিয়া সগর্ব্বে কহিল, "তার জন্যে ভাববেন না। আজকের খরচটা আমাকেই বহন করতে দি'ন।"

অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া গরম চা, ও চপ্‌, কাটলেট-নামিত অজ্ঞানিত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিল; খাইতে খাইতে তাহারা আত্ম প্রশংসাময় নানারূপ মিথ্যা গল্প করিল; এবং খাওয়া শেষ হইলে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে অসংখ্য সিগারেটের ধূমপান করিল। তাহার পর জ্যোতিঃপ্রকাশ হোটেল-ওয়ালার প্রাপ্য সাড়ে চারি টাকা, তাহাকে গণিয়া দিল।

হোটেলওয়ালাকে টাকা দিবার সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ আপন শব্দায়মান পকেট হইতে, টেবিলের উপর সমুদায় অর্থ বাহির করিয়াছিল; হোটেলের পাওনা টাকা প্রদান করিয়া, বাকী অর্থ আবার পকেটে পুরিয়া রাখিল।

রমেশের চক্‌চকে টাকার সহিত, মাতৃদত্ত ট্রামভাড়ার পয়সা মিশ্রিত হইয়া, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ন্যায়, হোটেলের টেবিলের উপর জ্যোতিঃপ্রকাশ যে নয়নাভিরাম শোভা বিস্তার করিয়াছিল, নিকটে বসিয়া, তাহা কৃষ্ণকমল সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করিয়াছিল। কৃষ্ণকমলের স্বভাবের একটা ঈশ্বরদত্ত বিশেষত্ব এইরূপ ছিল যে, অন্যের টাকা বা পয়সা নয়নগোচর করিলেই তাহা আপন পকেটস্থ করিবার উৎকট সাধ জন্মিত। আজ জ্যোতিঃপ্রকাশের অর্থ অবলোকন করিয়া তাহা হস্তগত করিবার জন্য, তাহার প্রবল লোভ জন্মিল; তার উপর তৎকালে তাহার অর্থের প্রয়োজনও ছিল। কাযেই সে জ্যোতিঃপ্রকাশকে ঐ অর্থ পকেটস্থ করিতে দেখিয়া ভাবিল, কিরূপে ঐ লোভনীয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য হস্তগত করিতে পারিবে। হস্তগত করিবার দুইটা উপায় আছে। এক, কোনও প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া, উহা ঋণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ঐ ঋণ পরিশোধ না করা। এই উপায়ে সে তাহার বন্ধু মণ্ডলের নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটু হীনতা স্বীকার করিতে হয়; এবং ঋণ পরিশোধ জন্য একটু তাগাদাও সহ্য করিতে হয়; এবং ভবিষ্যতে তৎ তৎ ঋণদাতার নিকট, আবশ্যক হইলে, পুনরায় ঋণ চাহিবার সুবিধা না ঘটিবার ভয় থাকে। যদিও জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীর ভ্রাতাকে ঋণদান করিবার বিপুল গৌরব অর্জ্জন করিয়া, সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার নীচতা স্বীকার করিত না; পরন্তু পুনরায় ঋণদান করিয়া নিজের হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইত না; কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশের এই মনস্তত্ত্বের বা মহত্ত্বের বিষয় কৃষ্ণকমল অবগত হইতে পারে নাই। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে, তাহার নিকট হইতে ঋণস্বরূপ অর্থগ্রহণ করাটা সে মোটেই সুবিধাজনক মনে করিল না। সে অন্য এক প্রকৃষ্ট উপায় চিন্তা করিল। ভাবিল, রাত্রের অন্ধকারে, পাশাপাশি সুযোগে সে অনায়াসে বন্ধুর অগোচরে, তাহার দোদুল্যমান পাঞ্জাবীর পকেট মধ্যে, অতি সন্তর্পণে তাহার অভ্রান্ত দক্ষ হস্ত প্রবেশ করাইয়া টাকা কয়েকটা সংগ্রহ করিতে পারিবে, এবং এইরূপে সে ঋণ গ্রহণের অপমান ও তাহা পরিশোধ করিবার অসুবিধা হইতে সহজেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে।

রাত্র আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। রাজপথে তড়িৎ আলোকমালা আলোক রশ্মি ছড়াইতেছিল। আলোকের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া, অন্ধকার যেন কুণ্ডলীকৃত হইয়া, কৃষ্ণ বিভীষিকার ন্যায় গলিমুখে এবং অট্টালিকাশ্রেণীর পাশে পাশে জমিয়াছিল;—যেন কৃষ্ণ

পেচককুল, তড়িৎ আলোককে দিবালোক সন্দেহ করিয়া নিজ নিভৃত আশ্রয় স্থানে লুকাইয়াছিল।

দুই বন্ধু হোটেল ত্যাগ করিয়া, সেই তড়িৎ আলোকিত রাজপথে বাহির হইয়াছিল; এবং সিগারেটের ধূম উদ্গারণ করিতে করিতে, জ্যোতির্ম্ময়ীর সুমধুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, বড়ই আনন্দে, স্থানে স্থানে রাজপথস্থিত সেইরূপ জমাটবাঁধা অন্ধকার অতিক্রম করিয়া, আপন আপন বাসস্থানের উদ্দেশে মৃদুমন্থর গতিতে চলিতেছিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ পার্শ্বস্থ বন্ধুর সঙ্গলাভে ও জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রসঙ্গে বিভোর হইয়া চলিয়াছিল। এবং কৃষ্ণকমল বন্ধুর পকেটস্থিত অর্থসংগ্রহের অভিলাষে, যে দিকের পকেটে টাকা ছিল, সেই দিক অধিকার করিয়াই চলিয়াছিল।

চলিতে চলিতে একটা অন্ধ গলিরাস্তার মোড়ে কৃষ্ণকমল সহসা থামিল, এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবল সুখকর প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া, কহিল "গুড্ নাইট! আমি তা'হলে আমি, এই পাশের গলিটা দিয়ে গেলে, আমার গরীবখানা দু'মিনিটের পথ। ঐ ট্রাম আসছে আপনি ট্রামে উঠে পড়ুন।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পরমবন্ধুর সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া, এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর সরস প্রসঙ্গের আস্বাদন লাভ করিতে না পাইয়া, ম্রিয়মান হইয়া পড়িল; ভগ্নকণ্ঠে বন্ধুকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "গুড্ নাইট।"

অতঃপর কৃষ্ণকমল জ্যোতিঃপ্রকাশের করমর্দ্দন করিয়া অন্ধকার গলির মধ্যে, বিবরপ্রাপ্ত সরীসৃপের ন্যায়, অদৃশ্য হইয়া গেল।

সমাগত ট্রামগাড়ী থামিলে জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহাতে উঠিয়া বসিল। অনতিবিলম্বে, ট্রামের কণ্ডক্টর টিকিট বিক্রয়ার্থ তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে জ্যোতিঃপ্রকাশ একখানি শ্যামবাজারের টিকিট দিতে বলিল; এবং টিকিটের মূল্য প্রদান করিবার জন্য পঞ্জাবীর দক্ষিণ পকেট মধ্যে হাত পুরিয়া দিল।—আশ্চর্য্য! তাহাতে ত একটি পয়সাও নাই,—গজভুক্ত কপিথের ন্যায়, তাহা অন্তঃসারশূন্য! তখন সে আপন ভ্রম অনুমান করিয়া পাঞ্জাবীর বাম পকেটে অনুসন্ধান করিল, বুকের পকেট হইতে সৌগন্ধময় রেশমী রুমাল অপসারিত করিয়া লুপ্ত অর্থ খুঁজিল; দাঁড়াইয়া উঠিয়া পকেট ঝাড়িয়া দেখিল; কিন্তু কোথাও অন্তর্হিত অর্থের কোন সন্ধান পাইল না, কোথাও অর্থের মধুর নিক্কণ শুনিল না। সে নিজের স্মরণ শক্তিকে উৎপীড়িত করিয়া ভাবিল, তথাপি মনে করিতে পারিল না যে, টাকাগুলি সে হোটেলের টেবিলের উপর ফেলিয়া আসিয়াছে; তাহার বেশ স্মরণ হইল যে, মুদ্রা সকল টেবিল হইতে কুড়াইয়া সে পকেটেই রাখিয়াছিল। তবে তাহা কোথায় গেল? সে পল্লীগ্রামের ভূত নহে,—আজন্ম কলিকাতায় বাস করিয়াছে; মূর্খ নহে,—বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিলাভ করিয়াছে, জুয়াচোরে তাহার মত লোকের পকেট মারিয়াছে, ইহা ত সম্ভবই নয়। সমস্ত ব্যাপারটা একটা ভৌতিক কাণ্ডের মত বোধ হইতে লাগিল। সে ভূতগ্রস্তের ন্যায়, উদ্ভ্রান্ত নয়নে বসিয়া রহিল।

ইত্যবসরে, ট্রামের আরোহিগণের মধ্যে কেহ রসিক, হাস্যময় নয়নে তাহাকে দেখিল, কেহ সংশয়ী সন্দিগ্ধনয়ন তাহার প্রতি কটাক্ষ করিল, কেহ দয়ালু দয়ার্দ্র নয়নে তাহাকে অবলোকন করিল, কেহ সাধু তাহার অসাধু উদ্দেশ্য বুঝিয়া ঘৃণাভরে তাহাকে নিরীক্ষণ করিল,—এই সকল দৃষ্টি, সব্যসাচীর শরাসন প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় তাহার সর্ব্বশরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার উপর, কণ্ডক্টর ক্রমাগত পয়সা চাহিয়া না পাওয়ায়, তাহাকে টিকিটের দাম দিতে অপারগ বুঝিয়া, গাড়ী থামাইয়া, তাহাকে নামিয়া যাইতে বাধ্য করিল। নামিবার সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ অপমানিত ম্লান-মুখে আরোহিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার মনে হইল যেন, গাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোকপ্রভাসিত প্রত্যেক মুখখানিতে একটা বিদ্রূপের ও একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে অন্তর্হিত হইয়া পদব্রজে বিলম্বে বাটী ফিরিল।

বাটী আসিয়া সে মাতার নিকট আপনার চাকুরী প্রাপ্তির কথা শুনিল। আরও সঠিক সংবাদ শুনবার জন্য সে পিতার অনুসন্ধান করিল।

মাতা স্নেহার্দ্রস্বরে কহিলেন, "তোমার বাড়ী ফিরতে দেরী দেখে, তিনি এই আটটার পর লণ্ঠন নিয়ে তোমায় খুঁজতে বার হয়েছেন।"

বৃদ্ধ পিতার এই পাগলামী জ্যোতিঃপ্রকাশের হৃদয়ে বিষবৎ প্রতীয়মান হইল। সে ক্রোধকষায়িত লোচনে মাতার দিকে চাহিয়া কর্কশস্বরে কহিল, "তাঁর এ পাগলামী কেন? মাথায় একটু ঘি থাকলে, তিনি পঁচিশ বছরের লেখাপড়া জানা ছেলেকে, এই সন্ধ্যেরাত্রেই খুঁজতে বেরুতেন না। এখন আমার বাড়ী ফিরতে রোজই দেরী হবে। রোজই কি আমায় খুঁজতে বেরুবেন নাকি? কোথায় খুঁজবেন?"

মাতা কহিলেন, "রাগ কোর না, বাবা। বাপের প্রাণ—থাকৃতে পারেননি; তাই, বড় রাস্তা পর্য্যন্ত খুঁজতে গেছেন।"

ক্ষণকালমধ্যে রামপ্রাণবাবু নিরাশ হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া, তাঁহার অন্তর প্রদীপ পুত্রকে বাটী সমাগত দেখিয়া, কতখানি আনন্দলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার পিতাগণ সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমাভিনয়।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা ঔপন্যাসিক, আমরা সে সকল কথার বিচারে প্রবৃত্ত হইব না; যে সকল অপার্থিব উপদেশমালা সেই মহাত্মার সুপ্রতিষ্ঠিত নামে প্রচলিত আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই রচিত, কিংবা তাঁহারই ন্যায় অপর কোন মেধাবী প্রাজ্ঞের রচিত, গল্প লিখিতে বসিয়া তাহারও বিচার করা আমাদের কার্য্য নহে। যে কোনও কল্পিত কথা সত্য বলিয়া নির্ব্বিচারে প্রকাশ করিবার অধিকার আমরা রাখিয়া থাকি। সুতরাং আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া লইলাম যে, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথ আলো করিয়া, ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং ৮১৮ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ৩৩ বৎসর মাত্র বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পর, শঙ্করের ন্যায় মেধাবী ও প্রতিভাবান ব্যক্তি, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বুদ্ধদেবকে যেমন আমরা ভগবানের অবতার বলিয়া থাকি, মহা মেধাবী শঙ্করকেও আমরা তেমনই প্রতিভার অবতার বলিতে পারি। কথিত আছে, এই মহাপ্রতিভ সম্পন্ন মহাপুরুষকে রমণীর মনোমোহিনী রূপলীলা কখনও মোহিত করিতে পারে নাই। তিনি পীনোন্নত পয়োধরা, সরসপ্রবালবৎরক্তাধরা, ঢল-ঢল লোচনেন্দীবরা নিতম্বিনীগণের রূপের বিচার করিয়া, তাঁহার সেই যৌবন কালেই অর্থাৎ তাঁহার জীবন-কাল তেত্রিশ বৎসরের মধ্যেই বলিয়াছিলেন,—

> নারীস্তনভরনাভিনিবেশং
> 　মিথ্যামায়া মোহাবেশং।
> এতন্মাংসবসাদি বিকারং
> 　মনসি বিচারয় বারংবারম্॥

এক্ষণে আমরা শঙ্করাচার্য্যের এই মহা উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছি; সন্তানের জননী মহিমময়ী নারীকে কেবলমাত্র আমাদের ভোগ বিলাসের,—মহা পাপের সামগ্রী করিয়া ফেলিয়াছি; তাহার গৌরবান্বিত হৃদয়ের মধ্যে স্নেহ, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি যে অপার্থিব রত্ন সকল লুকায়িত আছে, তাহা না দেখিয়া আমরা কেবল, গলিতমাংসভুক্ সারমেয়ের ন্যায়, তাহার বাহিরের রূপ লইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সকল বিদ্যার চর্চ্চা হয় বটে, কিন্তু নীতিবিদ্যার কোনও চর্চ্চাই হয় না। আমরা আধুনিক বিদ্যালয়ে যাইয়া সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি অতি পরিশ্রমের সহিত শিক্ষা করিয়া

আমাদের ভঙ্গুর স্বাস্থ্যকে আরও ভঙ্গুর করিয়া ফেলি বটে, কিন্তু আমাদের সুনীতি জ্ঞান একটুকুও জন্মায় না। ইহার ফলে, আমরা এককালে দুর্জ্জন ও দুর্নীত হইয়া পড়ি;—বিদ্যাবিশারদ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব হারাই।

প্রতিভাবতার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যে মোহজনক রমণীরূপকে মাংসবসাদি বিকারং বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন, আমাদের শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র হইয়াও এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমালায় বিভূষিত হইয়াও, সেই রমণীরূপের উপাসনা করিবার জন্য প্রত্যহ বিকালে জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে আসিত, সেই সুসজ্জিত কক্ষে বসিত, জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতির্ম্ময়ী এবং অলক্তকরঞ্জিত রূপ দেখিত এবং তাহার মাতার, বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধে সদুপদেশ সকল শ্রবণ করিত। এইরূপে পক্ষকাল অতিবাহিত হইল; উভয়ের পরিচয় ঘনীভূত হইল, উভয়ে আপনি ছাড়িয়া পরস্পরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিল; আর, ভালবাসিল কি?

আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর শুভ্রবেশধারিণী মাতা, কন্যাকে এবং জ্যোতিঃপ্রকাশকে সেই নন্দনতুল্য আনন্দময় কক্ষে, একখানা সুদৃশ্য সেটীতে (settee) বসাইয়া কি একটা কার্য্যব্যপদেশে উঠিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং যুবতী ও প্রেমময়ী জ্যোতির্ম্ময়ীকে নিভৃত কক্ষমধ্যে একাকিনী পাইয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রণয়িনীর ললিত রূপের উপাসনা করিবার বাধাহীন সুযোগ পাইয়াছিল।

সেই রূপ-উপাসনার মন্ত্রগুলি শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিলোলকটাক্ষে লজ্জাহীনা লজ্জা মাখিয়া, আফ্রিকাবাসী বর্ব্বরদিগের হলাহল মণ্ডিত সায়কের ন্যায়, জ্যোতিঃপ্রকাশের দিকে তাহা নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ছি! তুমি আর এত ক'রে আমার এই ছাই রূপের প্রশংসা ক'র না। আমার বড় লজ্জা করে।" এই বলিয়া লজ্জাময়ী মহালজ্জায়—জ্যোতিঃ-প্রকাশের দিকে আর একটু সরিয়া বসিল।

জ্যোতিঃ সেই লজ্জাবিষমাখা কটাক্ষবাণে হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া, আরও সমীপবর্ত্তিনীর যৌবনবিলাস-পূর্ণ দেহের দিকে তাকাইয়া, আপন পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীকে ভুলিয়া, ধর্ম্ম ভুলিয়া, হৃদয়ের বিষমিশ্রিত পাপ উদ্গিরণ করিল; কহিল, "আমি কতদিন তোমাদের বাড়ীতে এসেছি; কতদিন এই ঘরে বসে তোমার ঐ ফুলের মত সুন্দর মুখখানি দেখেছি; কতদিন তোমার ঐ মধুর মত মিষ্টি গলায় গান শুনেছি, কিন্তু কখনও কিছু চাইনি। আজ যেন আমি আপনাকে ধরে রাখতে পারছিনে; আজ তোমার ছোট্ট সুন্দর ঐ শ্রীপায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, তোমার কাছ থেকে কৃপা ভিক্ষা করতে ইচ্ছা যাচ্ছে।"

প্রণয়িনীর পাদুকা সম্বন্ধে জ্যোতিঃপ্রকাশ আপন দুর্জ্জয় মনোভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলে, জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষিপ্রহস্তে, তাহার হস্ত ধরিয়া ফেলিল;—জ্যোতিঃপ্রকাশের চক্ষে তাহার রত্নালঙ্কার ভূষিত, যৌবনপুষ্ট বাহুর সুশিক্ষিত লীলা, নীরদ প্রান্তে ক্ষণদার লীলার ন্যায় অনুমিত হইল। আপন হস্ত মধ্যে জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্ত রাখিয়া কোকিল নিন্দিত স্বরে স্মিতমুখে কহিল, "ছি! তোমাকে আমি দেবতার মত দেখি, তোমাকে কি আমি আমার পা ছুঁতে দিতে পারি? তাহলে যে আমার নরকেও ঠাঁই হবে না। ছি!"

অপার্থিব রত্নের ন্যায়, জ্যোতিঃপ্রকাশ সেই অলক্তকরঞ্জিত হস্ত আপন হস্তমধ্যে মহাদরে গ্রহণ করিয়া রহিল; কামিনীর কর্ণের কাছে তাহার বিবর্ণ মুখ লইয়া কন্দর্পশাসিত কণ্ঠে কহিল, "তোমার কাছে কখনও কিছু অনুরোধ করিনি—আজ একটা অনুরোধ করবো। বল, রাখবে?"

জ্যোতির্ম্ময়ী অনুরোধ শুনিবার জন্যই মাতৃ আদেশে কক্ষমধ্যে জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত একাসনে বসিয়াছিল। সে তাম্বুলরক্ত অধরপ্রান্তে একটু হাসি আনিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি অনুরোধ? তুমি কি এত দিনেও বুঝতে পারনি যে তোমার এতটুকু অনুরোধও আমি

কখনও অমান্য করতে পারবো না? আমার এ বুকটার ভিতর তুমি যে কি করে দিয়েছ, তা তো তোমাকে দেখাবার উপায় নেই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া কহিল, "আমি তোমার—এই—এই পদ্মের মত হাতটিতে একবার আমার মুখ ছোঁয়াব, তুমি বারণ করো না।"

অনুরোধটা ঠিক আশানুরূপ বেশী না হইলেও, জ্যোতির্ম্ময়ী আপন করতল কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়া, রুজ-রক্ত কপোলদেশ কিঞ্চিৎ তরঙ্গিত করিয়া, ভয় চকিত বিলোল লোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, কহিল, "ছি, ছি! কেউ যদি দেখতে পায়?'

জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রেমতপ্ত বক্ষে সেই বরবর্ণিনীর কথাগুলি, মনসিজের কুসুমশরাসন নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায়, বর্ষিত হইল। সে আদরে এবং ধীরে ধীরে, আদরিণীর শিথিল হস্তখানি আপন বক্ষে উঠাইয়া লইল; এবং অধীর হইয়া বলিল, "না, না, কেউ কোথাও নেই; কেউ দেখতে পাবে না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বিলক্ষণরূপ অবগত ছিল যে তাহার মাতার সতর্ক ব্যবস্থায়, তাহাদের প্রেমলীলায় কেহ কোন প্রকার বাধা জন্মাইতে পারিবে না; তাহারা নির্ব্বিঘ্নে সেই নির্জ্জন কক্ষে সকল প্রকার প্রেম-লীলা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। তথাপি সে প্রেমলীলার চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্রীড়া বিজড়িত ও সভয়কণ্ঠে কহিল, "না, না, আজ আমায় ছেড়ে দাও।"

প্রেমবিহ্বল জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি, একমুহূর্ত্তের জন্যে তোমার এই মধুমাখা হাতখানি আমার মুখে তুলিতে দাও।" এই বলিয়া সে আর কোনও বাধা বা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীর আলতামাখা শ্লথ হস্ত আপন অধরাগ্রে ধরিয়া তাহা বার বার আবেগ ভরে চুম্বিত করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার বিম্বাধর হাস্যরসে সরস করিয়া, এবং বিলোল কটাক্ষে জ্যোতিঃপ্রকাশের অনুরাগরক্ত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "ছি ছি! তুমি এ কি করলে?

জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রণয়িনীর এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, পুনরায় সেই করতলে প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া, করলিপ্ত অলক্তকে আপন অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া লইল।

দারুণ লজ্জায় জ্যোতির্ম্ময়ী, জ্যোতিঃপ্রকাশের আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং তাহার পাঞ্জাবী আবৃত বক্ষে আপন সরম-সংকুচিত মুখ লুকাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "ছি ছি! তুমি কি বল দেখি? আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি, তবু আমায় ছেড়ে দেবে না?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

মাতার উপদেশ ও প্রণয়ীর প্রেম।

সন্ধ্যার সময়, জ্যোতিঃপ্রকাশ আপন বাটীর উদ্দেশে প্রস্থিত হইলে, জ্যোতির্ম্ময়ী কক্ষের বাহিরে আসল।

তাহাকে দেখিয়া শুভ্র বেশধারিণী মাতা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ লো, আজ কি বলে গেল?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল, "বল্লে যে, আমাকে বিয়ে করতে না পেলে, সে মরে যাবে। কাল তোমাকে বিয়ের কথা বলবে, বলেছে।"

মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "বাঁচা গেল। এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা হয়ে গেলে হয়। কিন্তু আমি বলে রাখছি, এখনও খুব সাবধানে থাকতে হবে।—ঐ কেষ্টা ছোঁড়ার সঙ্গে তোকে হাসি তামাসা আর মেশামিশি করতে দেখলে ওর মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিরক্তি মণ্ডিত করিয়া, কিছু রূঢ়স্বরে কহিল, "কেন, সন্দেহ হবে কেন? আমি কি কেষ্টকমল দাদার সঙ্গে কখনও

মেশামেশি করি? আর তার সঙ্গে হাসি তামাসাই বা করতে যাব কেন?"

ছলনাময়ী ও চতুরা মাতা কন্যার ছলনায় ও চতুরতায় ভুলিলেন। স্নেহ-নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "না; তুমি এই কয়েক দিন বেশ সাবধান হ'য়ে চ'লতে পেরেছ। আমি কেবল তোমাকে সতর্ক করবার জন্যে কথাটা বল্লাম। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, আর তোমার বুদ্ধিও আছে; তুমি ত বুঝতে পার যে, তোমার ভালর জন্যে, তোমাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি। এই বিয়েটা হ'লে তুমি একটা এম্ এ,বি,এল আর পদস্থ সরকারী চাকরের পরিবার হ'তে পারবে। সমাজে কত ভাল লোকের পরিবারের সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে মিশতে পারবে; তোমার ছেলেরা উৎকৃষ্ট কুলীন বামুনের ছেলে হ'বে; আর কত সুখে থেকে ধার্ম্মিক বলে পরিচিত হ'তে পারবে। তখন আমি যা করছি তা' তোমার পক্ষে কত ভাল তা' বুঝতে পারবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মাতার দীর্ঘ উপদেশের কোনও উত্তর দিল না। কেবল বিরক্তিপূর্ণ মুখ কিছু গম্ভীর করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তুমি কোথাও যাবে না?"

মাতা আবার প্রেমময়ী কন্যার বাক্যে প্রতারিত হইয়া, তাহার প্রশ্নের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কালীঘাটের কালী মায়ের পাঁচ টাকা পূজো' তুলে রেখেছিলাম; আজ সুখবরটা পেলাম; একবার কেবল কালীঘাটে গিয়ে, ঐ পাঁচ টাকা দিয়ে, কালীমাকে প্রণাম ক'রে আসবো। রাত হ'বে না; আট্‌টার আগেই ফিরে আসবো। তুমি কি কোথাও যাবে? তাহলে আমি গাড়ী নিয়ে যাব না; একখানা গাড়ী ভাড়া করে যাব।"

মাতৃহীন বাটীতে থাকিবার জ্যোতির্ম্ময়ীর কোন উদ্দেশ্য ছিল; সে কহিল, "নাঃ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে; সন্ধ্যার পর, বেহায়ার মত কোন যায়গায় যেতে ইচ্ছা করে না। আজ বাড়ীতেই থাকবো।"

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া, শুভ্র ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া, যেন নির্ম্মল ধর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া, শকটারোহণ করিয়া সত্বর চলিয়া গেলেন; বাটী মাতৃহীন হইল। দ্বারবান সুযোগ পাইয়া গঞ্জিকার অন্বেষণে ধাবিত হইল। মাতৃহীন, রক্ষকহীন বাটীতে একাকিনী থাকিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী কি একটা শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। মাতার শকটের চক্রনির্ঘোষ ও অশ্বপদধ্বনি ক্রমে শরণির সংহ্লাদ মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। অল্পকাল মধ্যে চিরপরিচিত ও চিরপ্রিয় ও প্রত্যাশিত পদশব্দ তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল; তাহার বিরক্তিপূর্ণ গম্ভীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পরক্ষণে কৃষ্ণকমল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মাই ডিয়ার! শালা যেন ছিনে জোঁক, কিছুতেই তোমাকে ছাড়তে চায় না। কি কষ্টেই যে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাপু গুণতে হ'চ্ছিল, তা বলবার নয়। কতক্ষণে তবে ব্যাটা বেরিয়ে গেল; পকেটে পয়সা থাকলে, আমি সওয়া পাঁচ আনার হরির লুট দিতাম। তার পরই বুড়ী মাগীও বেরিয়ে গেল;—খোদা জানে কোথায় গেল!—জন্মের মত যায় যদি একেবারে নিশ্চিন্ত হই—কোনও আপদ থাকে না। জ্যোতে ব্যাটা মনে করে, আমি সত্যি তার প্রাণের বন্ধু! বুড়ী মাঝখানে না থাকলে, ব্যাটার গলায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিতাম। তারপর মাই ডিয়ার, তুমি আমার আমি তোমার।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্যোতির্ম্ময়ী অর্থকে সব চেয়ে ভালবাসিত। অর্থের পরই সে কৃষ্ণকমলকে যত অধিক প্রিয় মনে করিত, তেমন আর কাহাকেও মনে করিত না। জ্যোতিঃপ্রকাশকে সে একটুও ভালবাসিত না;—লোকে পূজায় বলিদানের জন্য ছাগল পুষিলে, সেই ছাগলকে যতটুকু ভালবাসে, জ্যোতিঃপ্রকাশের দিকে, তাহার ততটুকু ভালবাসাও ছিল না;—স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া, মাতার কঠিন আদেশ পালনে বাধ্য হইয়া, দ্বিচারিণী একটা ভাল-

বাসার অভিনয় করিত মাত্র। কিন্তু কেন? কেন সে মাতার মনোনীত, সুন্দর ও সুশিক্ষিত জ্যোতিঃ-প্রকাশকে ভাল না বাসিয়া, কৃষ্ণবর্ণ, কুৎসিত, অশিক্ষিত ও মিথ্যাচারী কৃষ্ণকমলকে ভালবাসিত? তাহাতে কি ছিল, যাহা দেখিয়া সে মুগ্ধা হইত? আমরা এই কঠিন প্রশ্নের, আর একটি প্রশ্নের দ্বারা উত্তর দিব। দেশে এত সুরূপ ও পণ্ডিত লোক থাকিতে কেন এত দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়াও, তোমাদের পত্নীরা তোমাদেরই কালো রূপ অতুল অনুরাগ ভরে দেখিয়া থাকে? কেন তোমাদের মূর্খতা দেবদুর্লভ উপদেশের মত, সসম্ভ্রমে শ্রবণ করিয়া থাকে? কেন তোমাদের উদ্ধত ও কর্কশ ব্যবহার, স্নিগ্ধ চন্দনানুলেপনের ন্যায়, আপনাদের কোমল অঙ্গে মাখিয়া রাখে? ইহাই রমণীর ভালবাসার দুর্জ্ঞেয় বিচিত্রতা; ইহাই বিধাতার নির্দ্দেশ!

এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী জ্যোতির্ম্ময়ী কৃষ্ণকমলকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। যেদিন সে কৃষ্ণকমলের কৃষ্ণরূপ দেখিতে না পাইত, সে দিন তাহার হৃদয় জলহীন মৎস্যের ন্যায়, ছটফট করিয়া উঠিত; সে দিন তাহার জীবন লবণহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ হইয়া যাইত। মাতার নিষেধ ও সতর্কতা সত্ত্বেও সে প্রায় প্রত্যহই, সুযোগের সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণ-কমলের সহিত মিলিত হইত।

আমরা এই আখ্যায়িকার একস্থানে বলিয়াছি, জ্যোতির্ম্ময়ীর একটী চক্ষু সর্ব্বদা রাস্তায় লোক-সমাগম-সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিত। কেহই তাহার সেই চক্ষের অগোচরে তাহাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তায় আবির্ভূত হইতে পারিত না। আজ কৃষ্ণকমলের আগমন দেখিয়া, গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া কোন সুকৌশল সম্পন্ন ইঙ্গিত দ্বারা সে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, এক্ষণে বাটীতে জ্যোতিঃপ্রকাশ ও তাহার মাতা আছে; এখন আসিও না; তাহারা প্রস্থিত হইলে আসিও।

তদনুযায়ী কৃষ্ণকমল, মাতা ও জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রস্থান প্রত্যাশা করিয়া রাস্তার এক নিভৃত প্রদেশে দাঁড়াইয়াছিল; এবং তাহাদের প্রস্থানের অযথা বিলম্ব দেখিয়া তাহাদের প্রতি উত্তরোত্তর রুষ্ট হইতেছিল; এবং মনে মনে তাহাদিগের প্রতি প্রযোজ্য অকথ্য গালি রচনা করিতেছিল। কিন্তু তোমরা মনে করিও না যে, কৃষ্ণকমল জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রেমের আশায় এই-রূপ বিরক্তিজনক প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে প্রেমের কোন ধার ধারিত না। সে দাঁড়াইয়াছিল অভাবে—জ্যোতির্ম্ময়ীর কাছে কিছু অর্থের প্রত্যাশায়। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকটে আসিয়াই, প্রেমের পরিবর্ত্তে প্রথমেই অর্থ ভিক্ষা করা, সে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। সে প্রথমে জ্যোতিঃপ্রকাশের এবং মাতাঠাকুরাণী উপর হৃদয় সঞ্চিত গালাগালি বর্ষণ করিয়া, প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইল।

তাহার বাক্য শুনিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী শঙ্কিত নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, আদরে তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, "এস,—আমার কাছে একটু বসবে না?"

কৃষ্ণকমল জ্যোতির্ম্ময়ীর শয্যাপ্রান্তে, তাহারই কাছে বসিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী আদরমাখা স্বরে কহিল, "ছি! ওসব কথা কি অমন চেঁচিয়ে বলতে আছে? তুমি এখনও একটুও সাবধান হতে শেখনি।"

সেই অযথা প্রতীক্ষার ক্রোধ, কৃষ্ণকমলের এখনও প্রশমিত হয় নাই। সে বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে কহিল, "ড্যাম ইওর সাবধান। ঐ শালাকে আর ঐ বুড়ীমাগীকে আমি গ্রাহ্য করি? ঐ বুড়ীমাগীকে তুমি স্পষ্ট বলে রেখো যে, ঐ শালার সঙ্গে তোমার বিয়ের আগের দিন, আমি বুড়ীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেবো। তা' যদি না দেয়, আমি ছাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে, বিয়ে একবারে পণ্ড করে দেবো।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আপন প্রেমতপ্ত ও কোমল গাত্র, রোদে দেওয়া পালঙ্কের বালিশের মত, কৃষ্ণকমলের গাত্রে সংলিপ্ত করিয়া, ঈষৎ বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "ছি! লক্ষীটি! রাগ করো না। তোমার অমতে ত

আমি ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছিনে। তোমাতে আমাতে যে পরামর্শ করেছি, তা কি সব ভুলে গেলে? সেই পরামর্শ মত আমরা যদি চলি, তাহলে আমাদের ভালবাসার পথে কোনও কণ্টক থাকবে না। বল, আর রাগ করবে না?"

কৃষ্ণকমল শান্ত হইয়া বলিল, "আমি রাগ করবো না। কিন্তু ঐ হাজার টাকা আমার চাই; তুমি বুড়ীকে বলে রেখো।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বুঝিল, মাতাকে এই কথা বলিতে যাইলে, কৃষ্ণকমলের সহিত তাহার গোপন সাক্ষাতের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সুতরাং একথা মাতাকে বলিবার কোন উপায় ছিল না। তথাপি সে প্রণয়ীকে শান্ত রাখিবার জন্য কহিল, "তা' আমি বলে রাখব। —কিন্তু টাকাটা বিয়ের আগে না পেলেও, বিয়ের পর তুমি যা' চাবে আমি তোমাকে দেবো।"

কৃষ্ণকমল বলিল, "তা তো দেবেই, মাই ডিয়ার; কিন্তু বিয়ের আগে ঐ হাজার টাকাও বুড়ীর কাছ থেকে আদায় করতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী অনুরাগভরে কৃষ্ণকমলের বক্ষে হস্ত দিয়া বলিল, "তা' নিও। দেখ, কাল বোধ হচ্ছে, আমাদের দেখা শুনা করবার একটা সুযোগ হ'বে। মা কাল বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক করবার জন্যে বাড়ীতেই থাকবে। আমার নিজের বিয়ের কথা শোনবার জন্যে বাড়ীতে থাকা, বোধ হয়, ঠিক হবে না; সেটা বড় নির্লজ্জের মত দেখাবে। কাযে কাযেই আমি বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত ছুটী পাব। তুমি যেখানে বলবে সেইখানেই দেখা করতে পারবে।"

কৃষ্ণকমল বলিল, "ওঃ! তাহলে কি মজাটাই হবে। এই কাছেই একটা পোড়ো বাড়ী খালি আছে। সেখানে কেউ কোথাও নেই। নূতন রাস্তার মোড় থেকে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে' আমরা দু'টী প্রেমিক প্রাণীতে সেইখানে যাব। আর, একটা ব্যাগে ক'রে কিছু হুইস্কি সোডা আর কচুরী কাটলেট নিয়ে যাব।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল, "না, না, ওসব কিছু নিতে হ'বে না; আমি কি ওসব কিছু খাই?"

কৃষ্ণকমল বলিল, "তুমি না খাও, মাই ডিয়ার, আমি ত খাই। মাঝে মাঝে একটু আমোদ আহ্লাদ না করলে, হেল্‌থ থাকবে কেন? জান ত, ইংরেজেরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদ খাওয়াকে হেল্‌থ ড্রিঙ্ক করা বলে। কিন্তু মাই ডিয়ার, আমার পকেট শূন্য, খরচটা তোমাকেই বহন করতে হ'বে।"

তাহা জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিল, সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা চাই?"

কৃষ্ণকমল বলিল, "আপাততঃ গোটা কুড়িটাকা হ'লেই চলবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিকটে তখন তত টাকা ছিল না। কিন্তু মাতার বাক্স হইতে কিরূপে অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, সে জানিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতা পরিহিত শুভ্র বসন পরিত্যাগ করিয়া, গরদ পরিয়া কালীঘাটে গিয়াছিলেন। কোথায় সেই পরিত্যক্ত কাপড়খানি পতিত ছিল, তাহা চতুরা জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিয়াছিল। এক্ষণে সে একটা আশা করিয়া, কৃষ্ণকমলকে ছাড়িয়া ঐ বস্ত্রের নিকটে গেল। তাহার আশা ফলবতী হইল; দেখিল, বস্ত্রপ্রান্তে মাতার চাবির গুচ্ছ বাঁধা রহিয়াছে। সে চাবি সংগ্রহ করিয়া সত্বর মাতার বাক্স খুলিল, বাক্স হইতে আবশ্যক অর্থ আত্মসাৎ করিল, পুনরায় বস্ত্রপ্রান্তে চাবির গুচ্ছ বাঁধিয়া আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিল; এবং কৃষ্ণকমলকে প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিল।

কৃষ্ণকমল তাহা লইয়া, লঘুহস্তে আপন রিক্ত পকেটে রাখিল। ইহার পর, আর প্রেমালাপ করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, প্রেমময়ী প্রণয়িনীকে ফেলিয়া, সত্বর পদে রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল।

আটটার পর, মাতাঠাকুরাণী বাটীতে ফিরিয়া, প্রসন্ন নয়নে দেখিলেন যে, তাঁহার সাধ্বী কন্যা তাঁহারই প্রতীক্ষায়, নীরবে বসিয়া আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের বক্তব্য

(১)

শঙ্কর-বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক প্রকারের অপসিদ্ধান্ত দেশে ও বিদেশে প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তের যত আলোচনা হয়, ততই প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণের সুবিধা হইতে পারে। এই জন্য আমরা বেদান্ত বিষয়ক বাদ প্রতিবাদের বিশেষ পক্ষপাতী। "ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী" শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটী সংখ্যায় আমরা, কয়েকটীমাত্র বিষয় যে ঋগ্বেদ হইতেই বেদান্তে গৃহীত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই একজন তর্কতীর্থোপাধিক পণ্ডিত, ইহার একটী প্রতিবাদ গত কার্ত্তিক সংখ্যায় 'মানসী'তে বাহির করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের প্রতিবাদে অত্যন্ত ধীরতা আবশ্যক। কেবল যুক্তি তর্ক দ্বারাই বাদ প্রতিবাদ নির্ব্বাহ হওয়াই একান্ত বিধেয়। কিন্তু যদি প্রতিবাদ করিতে গিয়া, ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়, কিংবা যদি ব্যক্তিগত বিদ্রূপ প্রভৃতি প্রতিবাদে স্থান পায়, তাহা কেহই অনুমোদন করিতে পারিবেন না। এই প্রতিবাদটীর স্থানে স্থানে এইপ্রকার ব্যক্তিগত অসদুক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। যাঁহারা সবে মাত্র বেদান্তে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ অধীরতা প্রকাশ আমাদের বিশেষ বিস্ময় উৎপাদন করে নাই সত্য, কিন্তু পাঠক-পাঠিকা প্রতিবাদকারীর এ প্রকার অসংযত লেখনীকে কি ক্ষমা করিতে পারিবেন? যাহাহউক, আমরা প্রতিবাদটীর কয়েকটা স্থল লইয়া আমাদের বক্তব্য যাহা আছে তাহা বলিতেছি।

স্বদেশী ও বিদেশী অনেকেই শঙ্কর ভাষ্য বুঝিতে গোলযোগ করিয়াছেন, তাই শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের উপরে অবিচারের এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। আমাদের প্রবন্ধের এই প্রতিবাদটী তাহার প্রমাণ!

যাহাহউক, এখন প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহাই বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

বেদান্তে "মায়া" এবং "অবিদ্যা" শব্দ দুইটী পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মায়া শব্দের ব্যবহার দেখিয়াই কতকগুলি লোক অমনি স্থির করিয়া বসিয়াছে যে, তবে আর কি! শঙ্কর যখন জগৎকে মায়াত্মক বা অবিদ্যাত্মক বলিয়াছেন, তখন ত জগৎকে অসত্য, অলীক বলিয়া উড়াইয়াই দেওয়া হইল! তবে ত শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন!—এই শব্দ দুইটী কি অর্থে যে বেদান্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া দেখিবার আর কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন বোধ হইল না!

'মায়া' শব্দটী প্রথমে ঋগ্বেদেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। একটী বস্তু আপন স্বরূপে ঠিক্ থাকিয়া যে পুনঃ পুনঃ এক আকার ছাড়িয়া অন্য আকার গ্রহণ করে,—এই অর্থেই মায়া শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে দেখা যায়। *

শঙ্করাচার্য্যও এই শব্দটী ঋগ্বেদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি আপন ভাষ্যে ঋগ্বেদের অর্থেই শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন। জগতের সমস্ত বস্তু দুইটী মাত্র বিভাগে বিভক্ত। একটী 'নাম-রূপ' এবং নাম রূপের অন্তরালে একটী অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য বস্তু। কোন গুণই যখন নাম-রূপ বর্জ্জিত হইতে পারে না, তখন ইহার অন্তরালবর্ত্তী বস্তুটী নিশ্চয়ই নির্গুণই থাকিবে। এই নির্গুণের উপরেই, মনুষ্যের ইন্দ্রিয় নাম-রূপাদি বিবিধ বস্তুকে উৎপন্ন বলিয়া দেখিতে পায়। সাংখ্যদিগের প্রকৃতিকে যেমন স্বয়ংসিদ্ধ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, বেদান্তে নামরূপকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এই নামরূপ, ব্রহ্মেরই নিতান্ত অধীন; ইহা পরমেশ্বরেরই 'দৈবী মায়া' এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে 'ঈশ্বরাধীনা'। এতদ্ দ্বারা বেদান্ত আমাদিগকে ইহাই বলিয়া দিয়াছেন যে, এক নিত্য সত্য বস্তুর উপরে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিবিধ নাম-রূপের 'আরোপ' হইয়া

* "মায়াং কৃণ্বানঃ...তন্তদাকৃত্যা অনেকবিধাং কুর্ব্বাণঃ। অন্যোত-দৈধর্ব্যং...যদ্ যদিচ্ছতি রূপং তত্তৎ করোতি।"—নিরুক্ত, দৈবতকাণ্ড।

থাকে। ইহারই নাম—বিবর্ত্তবাদ। নাম-রূপ, ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া উহাকে নিত্য ও চিরস্থির ব্রহ্মের ন্যায় স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, নিত্য ও অনিত্য—এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ। একই সময়ে এই দুইএর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এই জন্যই বেদান্তে বিনাশী প্রকৃতি বা মায়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলা হয় নাই। কিন্তু এক নিত্য নির্গুণ ব্রহ্মেতেই মনুষ্যের ইন্দ্রিয় মায়ায় দৃশ্য দর্শন করিয়া থাকে; এই মায়া—নির্গুণ পরব্রহ্মেরই এক "অচিন্ত্যলীলা" (বেঃ সূত্র, ২।১।৩৩)। অর্থাৎ যখন অবধিই দেখিতেছি, তখন অবধিই নির্গুণব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই, নাম-রূপাত্মক নশ্বর মায়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই জন্যই মায়াত্মক নাম-রূপকে অনাদি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন, এই প্রকৃতি বা মায়া স্বতন্ত্র নহে, উহা "ভগবানেরই মায়া" (৭।১৪) এবং এই প্রকৃতি বা মায়া এবং পুরুষ "উভয়ই অনাদি" (১৩।১৯)। অর্থাৎ কথাটা এই যে, এই দৃশ্যজগৎ সুধু নামরূপ মাত্র নহে; কিন্তু এই নাম-রূপাত্মক আবরণের অন্তরালে আধারভূত এক স্বতন্ত্র অবিনাশী ব্রহ্মবস্তু আছেন।

এই নামরূপের অংশ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া, ইহার স্বরূপ চির-স্থির নহে বলিয়া, ইহার আকারের রূপান্তর হয় বলিয়া বেদান্তে নামরূপকে 'অসৎ' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই নামরূপের মূল, উহাদের আধারভূত, এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মবস্তুকে 'সৎ' বলা হয়। এই সত্য বস্তু সর্ব্বকালে নামরূপের মূলে এবং নামরূপের মধ্যেও অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু 'অসৎ' বলাতে নাম-রূপকে মিথ্যা বলিয়া উড়ান হয় নাই। সত্য ও মিথ্যা—এই শব্দ দুইটীর বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক অর্থ লক্ষ্য না করিয়া, অনেক পাশ্চাত্য দেশীয় ও স্বদেশীয় পণ্ডিত নামরূপকে মিথ্যা অলীক বলিয়া ধরিয়া লন। এবং না বুঝিয়াই অনেক লোক, বেদান্তের দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু দোষ বেদান্তের নহে, দোষ তাঁহাদেরই। নামরূপ—সদা পরিবর্ত্তনশীল এবং নশ্বর, সুতরাং নামরূপ সত্য নহে। যিনি চিরস্থায়ী সত্যবস্তু দেখিতে চান, তাঁহাকে নামরূপ ছাড়াইয়া নামরূপের বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিতে হইবে। একথা উপনিষদের সর্ব্বত্র (বৃহঃ ১।৬।৩; ছান্দোঃ ৭।১ ও ৬।১; মুণ্ডঃ ৩।২।৮) কথিত হইয়াছে। বেদান্তে ফেন ও তরঙ্গকে 'মিথ্যা' এবং সমুদ্রজলকে 'সত্য' বলা হয়। এ স্থলে, ফেন ও তরঙ্গ কি একেবারেই মিথ্যা অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর? উহাদের কি মূলেই কোন অস্তিত্ব নাই? এ স্থলে মিথ্যা শব্দটী কেবল উপরকার বাহ্য দৃশ্য অর্থাৎ আকৃতি ও বর্ণরূপাদি গুণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু আভ্যন্তরিক তাত্ত্বিক দ্রব্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। বস্তুমাত্রেরই নামরূপাত্মক আবরণের নিম্নে—মূলদেশে—কি তত্ত্ব আছে, বেদান্ত তাহাই দেখিয়া থাকেন।

নামরূপের আধারভূত, নামরূপ হইতে এই যে চিরসত্য ব্রহ্মবস্তু,—ইহা হইতে নামরূপকে স্বতন্ত্র করিয়া, ছাঁটিয়া লওয়া যায় না। এই দুই লইয়াই ব্রহ্ম। এই জন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"সদসচ্চাহমর্জ্জুন"।—আমি সৎ ও অসৎ দুই-ই। সৎ—পরব্রহ্ম এবং অসৎ—অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ এই দুইই আমি এইরূপ বলা হইয়াছে। পুরুষসূক্তেও "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—এইরূপ বর্ণনা আছে। তাহারও তাৎপর্য্য সহজে পরিস্ফুট হইবে। পরমাত্মা এই সকল নামরূপের অতীত; কিন্তু সমস্ত নামরূপ পরমাত্মারই মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু এই নামরূপকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"সামান্যানুবিদ্ধানাং বিশেষাণামদর্শনাৎ;—সর্ব্বসামান্যং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ নামরূপাদি তাবৎ অসীম ও নশ্বর পদার্থ, সামান্য পরমাত্ম বস্তু দ্বারা অনুবিদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি মনুষ্য বৃক্ষলতাদি বস্তুগুলিকে স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বয়ং-সিদ্ধ বস্তু বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য এই প্রকার বস্তুবোধকেও 'অসত্য' 'মিথ্যা' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ আত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসত্তাকং পশ্যতি, তং মিথ্যাদর্শিনং" (বেঃ ভাঃ ১।৪।১৯)।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যেও এই কথা বলা হইয়াছে—

"এতস্মাৎ...নিত্যতৃপ্তাৎ অন্যৎ...বস্ত্বন্তরং স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকসমমসারং" ইত্যাদি।

অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু হইতে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে যে ব্যক্তি নামরূপাদি বস্তুকে বোধ করে, তাদৃশ বস্তু স্বপ্নমায়ার ন্যায় অসার, মিথ্যা।

এইটাই বুঝাইবার জন্যই, বেদান্তে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধকে 'অনন্ত' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কোন কার্য্যকেই উহার কারণ-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' করিয়া লইয়া, উহাই একটী স্বয়ংসিদ্ধ স্বাধীন বস্তু—এরূপ মনে করা ন্যায়-সঙ্গত নহে। কেন না কার্য্য মাত্রেরই সত্তা উহার কারণ-সত্তার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অথচ আমরা অন্তরালবর্ত্তী কারণবস্তুর কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই এবং কার্য্যবর্গকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। তজ্জন্যই আমাদের নিকটে নামরূপাদিই একমাত্র বস্তু হইয়া উঠে; নামরূপের অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মবস্তু একেবারে আবরিত হইয়া উঠেন। শঙ্কর এ প্রকারে নামরূপকে গ্রহণ করাকে অসত্য, মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথায় নামরূপাত্মক বস্তু গুলি ত উড়িয়া যাইতেছে না। বস্তু মাত্রেই ব্রহ্মস্বরূপের বিকাশ। বস্তুকে বাদ্ দিয়া উহার বিকাশকে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। নামরূপের মধ্যে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না রাখিয়া, নামরূপের মূলে যে পরব্রহ্ম আছেন তাহাতে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখার কথাই শঙ্কর এতদ্দ্বারা আমাদিগকে বলিতেছেন। জগৎকে উড়াইয়া দিবার কথা বলিতেছেন না। কার্য্যবর্গকে বা জগৎকে মিথ্যা বলিলে উহার মূলে স্থিত কারণ সত্তাকেও মিথ্যা বলিতে হয়, শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া এ কথা মাণ্ডুক্যভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন। আনন্দগিরিও তাহার ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।—

"অসৎচেৎকার্য্যং জগৎ, ন তেন কারণস্য সম্বন্ধধীরিতি অসদেব কারণমপি স্যাৎ।"

কার্য্য এবং কারণ—এই দুইটী সম্বন্ধিবাচক শব্দ। সম্বন্ধ হইতে গেলেই দুইটী বস্তু থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে যদি দুইটীই অসৎ হয়, অথবা যদি দুইটীর মধ্যে একটীও অসৎ হয়, তাহা হইলে পরস্পর সম্বন্ধ হইতেই পারে না! সুতরাং জগৎকে মিথ্যা বলিলে জগতের মূল কারণ পরমাত্মাকেও মিথ্যা বলিতে হয়।

তাহা হইলেই পাঠক পাঠিকা দেখিতেছেন যে, যে ভাবে সাধরণ লোক মনে করে যে বেদান্ত জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, বেদান্তে সে ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলা হয় নাই। যে অর্থে শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত। পাঠক পাঠিকাকে আর একটি বিষয়ও প্রণিধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। শঙ্কর ভাষ্যে তিন শ্রেণীর অসত্য বস্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শঙ্কর, অসৎ এবং অলীক—এই দুইএর ভেদ দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন যে, শশ-বিষাণাদি কল্পিত বস্তুগুলি যেমন অলীক মিথ্যা বস্তু, নামরূপাদি বস্তুগুলি তাহা নহে। কিন্তু ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তাই আমরা আর এ সম্বন্ধে অধিক বলিলাম না।

কথাটা এই যে, বেদান্তে যে পারমার্থিক দৃষ্টি এবং ব্যবহারিক দৃষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক দৃষ্টি হইতেই বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা এই ব্যবহারিক দৃশ্য জগৎ মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যায় না। এই তত্ত্বটা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না বলিয়াই গোল পাকাইয়া তোলেন। উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ প্রতীয়মান হয়, তাহা আপাতত মাত্র। এই জন্যই ভাষ্যকার পরিণামবাদকে রাখিয়াই বিবর্ত্তবাদের প্রাধান্য দেখাইতে পারিয়াছেন। পরিণামকে উড়াইবার আবশ্যক হয় নাই। যদি জগতের মূলে যে ব্রহ্মসত্তা আছেন তাঁহাকে বাদ দিয়া জগৎকে গ্রহণ কর, তাহা হইলে জগৎ স্বাধীন স্বতন্ত্র হইয়া উঠে। আবার, জগৎ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া যদি ব্রহ্মকে লও, তাহা হইলে ব্রহ্মও শূন্য হইয়া উঠেন। ইন্দ্র প্রজাপতিকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই দোষ উপস্থিত হয় (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দেখ)—ব্রহ্ম একেবারে নির্বিশেষ (abstroat) সত্তা হইয়া উঠেন। বেদান্তে যে অপব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, এ বিষয়টীতে মনোযোগ না দেওয়াই উহার প্রধান কারণ। আমাদের মনে হয়, বেদান্ত এই তত্ত্বটীও ঋগ্বেদ হইতেই

গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতার দুই রূপের যুগপৎ বর্ণনা আছে। একটী দেবতাদের স্থূল চক্ষুগ্রাহ্যরূপ; অপরটী সেই স্থূলরূপের মূল আধারস্বরূপ সূক্ষ্মরূপ। এই সূক্ষ্মরূপটী ব্রহ্মসত্তাই।

নামরূপাদি দৃশ্য জগৎকে অসৎ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া, এই নাম রূপাদি দৃশ্যবর্গের মূলে স্থিত ও ইহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মবস্তুকে সৎ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দৃশ্য জগতের প্রতি সৎ শব্দ এবং দৃশ্য জগতের মূলে যে বস্তুতত্ত্ব আছে তাহাকে ত্যৎ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে।—

"সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ। নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ।"—অর্থাৎ যাহা মূলে ছিল সেই বস্তুই—সৎ (চক্ষের গোচর) এবং ত্যৎ (চক্ষের অতীত); বাচ্য ও অনিবাচ্য; জ্ঞাত এবং অবিজ্ঞাত (অজ্ঞেয়), সৎ ও অনৃত—এইরূপ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। পাঠকপাঠিকা দেখিবেন, এস্থলে ব্রহ্মকে অনৃত বলা হইয়াছে; কিন্তু অনৃত বলিলেও অনৃতের অর্থ 'মিথ্যা' হইতে পারে না। কেন না এই অনৃত ব্রহ্মকেই পরে আবার জগতের প্রতিষ্ঠা বা আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শব্দ ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, নিত্য সত্য ব্রহ্মবস্তু—এই সমস্ত সদাপরিবর্ত্তনশীল বিনশ্বর নাম রূপের মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছেন; এই সমস্ত নামরূপকে ব্যাপিয়া তিনি বর্ত্তমান, অথচ তিনি নামরূপের জাল হইতে স্বতন্ত্র।

এই সকল আলোচনা হইতে, কি অর্থে নামরূপাদি দৃশ্য জগৎকে অসত্য বলা হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহাদিগকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। আমাদের দৃষ্টি যদি কেবলমাত্র নামরূপের মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তবেই আমরা মরিলাম। কেননা, তখন এই নামরূপই একমাত্র বস্তু হইয়া উঠে; নামরূপের অন্তরালে যে অপর কোন বস্তু আছে, তাহা আর আমাদের মনে আইসে না। তখন এই নামরূপাদি দৃশ্য জগৎই স্বয়ংসিদ্ধ, স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে। শঙ্কর ইহাকেই মিথ্যা বলিয়াছেন। কেন না, নামরূপাদি বস্তুই স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইতে পারে না। ইহাদের মূলে যে ব্রহ্মতত্ত্ব রহিয়াছে, ইহারা ত তাঁহারই বিকাশ, তাঁহারই পরিচায়ক "লিঙ্গ" বা চিহ্ন। তাঁহাকে ছাড়িয়া ত ইহারা এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। তাঁহারই সত্তায় ইহাদের সত্তা; সুতরাং ইহারা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইবে কিরূপে? ব্রহ্ম এবং এই দৃশ্য জগৎ; সৎ এবং অসৎ; কারণ এবং কার্য্য; এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বস্তু এবং তাহাকে আবৃত করিয়া দৃশ্যমান এই পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ;—এই দুইটি লইয়াই ত ব্রহ্ম। এই তত্ত্ব ভুলিয়া কেবল নামরূপ লইয়া আচ্ছন্ন থাকিলে চলিবে কেন? অথচ আমরা অবিদ্যার প্রভাবে সেই রূপেই আচ্ছন্ন থাকি। শঙ্কর কেমন সুন্দর করিয়া দৃশ্যবর্গের "মিথ্যাত্ব" স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখুন। শঙ্কর বলিতেছেন—

"আমাদের যে স্বাভাবিক অবিদ্যা আছে, সেই অবিদ্যার প্রভাবে আমরা নামরূপাদি ছন্দ বর্গকে এক মাত্র বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকি; আমাদের দৃষ্টি কেবল এই নাম রূপের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় বস্তুগুলি স্বয়ং সিদ্ধ স্বাধীন বলিয়াই আমরা গ্রহণ করি এবং এক বস্তু অপর বস্তু হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এই প্রকারেই আমাদের প্রতীতি হয়। কিন্তু এ প্রকারে বস্তু গ্রহণ করিলে প্রকৃত বস্তু দর্শন হয় না। ইহা অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকের দৃষ্টি; সুতরাং মিথ্যা। কিন্তু নামরূপাদি দৃশ্য বর্গের মূলে এক নিত্য ব্রহ্মবস্তু আছেন, তিনি এই নামরূপ হইতে স্বতন্ত্র; এই নাম রূপাদি তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে না। সেই মূল বস্তুটী, এই সকল নামরূপাদি দৃশ্যবর্গ হইতে অন্য হইলেও, এই নামরূপাদি দৃশ্যবর্গ কেহই তাঁহা হইতে 'অন্য' নহে; তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন নহে। এই প্রকারে দৃষ্টিকে সত্যদৃষ্টি, পরমার্থ দৃষ্টি বলা যায়।" *

* যদা যেন রূপেণ বর্ত্তমানং কেনচিদস্পৃষ্টত্বতাবমপি সৎ... বিবেকেন নাবধার্য্যতে, নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্ব্বোঽয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্বব্যবহারঃ। অস্তি চায়ং ভেদকৃতো মিথ্যাব্যবহারঃ যেষাং ব্রহ্মতত্ত্বাৎ 'অন্যত্বেন' বস্তু বিদ্যতে।...

এই প্রকারে শঙ্কর, সত্য ও মিথ্যার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমরা উপরে যে আলোচনা করিয়া আসিলাম, তদ্দারাই ব্রহ্ম এবং নামরূপাত্মক জগৎ—এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা বুঝা যাইতেছে। নামরূপকে ব্রহ্ম-স্বরূপের অভিব্যক্তি বলাতে, নামরূপ যে ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ অভিব্যক্তি নহে, সুতরাং উভয়ে অভিন্ন নহে, একথাও এই আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। শঙ্করভাষ্যের নানাস্থানে জগৎ যে ব্রহ্মের অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি তাহার মীমাংসা রহিয়াছে। কেনোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে—"সূর্য্যচন্দ্রাদি আধিদৈবিক বস্তুর দ্বারা, কিংবা মনবুদ্ধি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বস্তু সকলের মধ্য দিয়া পরমাত্মার স্বরূপের যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশ ব্রহ্মের "দভ্র"রূপ মাত্র, পূর্ণস্বরূপ নহে। এ সকলের মধ্য দিয়া পরমাত্মার অতি অল্পমাত্র—পরিচ্ছিন্ন বা আংশিক পরিচয় পাইয়া থাকি। জগতের কোন বস্তুই তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের প্রকাশ করিতে পারে না।" বৃহদারণ্যকে এই জন্যেই "অকৃৎস্নো হি সঃ" প্রভৃতি দ্বারা ইহারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাণ, মন প্রভৃতিতে তাঁহার যে বিকাশ, তাহাকে 'কৃৎস্ন' পূর্ণ বিকাশ বলা যায় না। এইজন্যই বেদান্তে এগুলিকে 'উপাধি' শব্দে নির্দ্দেশ করা থাকে। জগতের কোন একটা কার্য্য বস্তুতে ব্রহ্মস্বরূপ কৃৎস্নরূপে বা পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া আছে, ঈদৃশ বোধকে গীতায় (১৮।২২) তামসিক বোধ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রতিবাদকারী যে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মের স্বরূপের বিকাশ—ইহার অর্থ এই যে 'ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন' এইরূপে পর্য্যবসিত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না"—একথা তিনি কোথায় পাইলেন? কার্য্যবর্গের মূলে স্থিত ব্রহ্মবস্তুর 'স্বাতন্ত্র্য' ভুলিয়া যদি আমরা নামরূপকে ব্রহ্মের নিঃশেষরূপে (Exhaustively) অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লই, নামরূপকেই স্বতঃসিদ্ধ, 'অন্য' বস্তু বলিয়া মনে করি, তাহা হইলেই ভুল হইল। ইহাকেই শঙ্করভাষ্যে 'অধ্যাস' বলা হইয়াছে। অবিদ্যার প্রভাবেই অজ্ঞ লোকের এইরূপ ভ্রম হয়। ফলতঃ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া, ছাঁটিয়া লইয়া, অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মকে একেবারে ভুলিয়া বা নিঃসম্পর্কিত করিয়া দিয়া যদি বিকারবর্গকেই স্বাধীন স্বতঃসিদ্ধ মনে করা যায়, তবেই 'অন্যত্ব' বোধ আসিল। ব্যবহারতঃ বা অজ্ঞের দৃষ্টি হইতে আমরা নামরূপকে এই প্রকারে 'অন্য' বস্তু বলিয়া মনে করি। কিন্তু পরমার্থতঃ এই নাম রূপ, অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মস্বরূপেরই বিকাশ—কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। অন্য ও অনন্য—শব্দের ইহাই সিদ্ধান্ত।

তর্কতীর্থ মহাশয়ের আর একটী আপত্তি পাঠক পাঠিকা দেখুন। তিনি বলিতেছেন "কর্ম্মের" অর্থ পরিস্পন্দন হইলে, উহা প্রপঞ্চস্বরূপ হইতে পারে না এবং ব্রহ্ম 'নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়' বলিয়া উহা ব্রহ্মেও থাকিতে পারে না।" শঙ্করভাষ্যের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারা তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই মন্তব্য পড়িয়া বিস্ময়ান্বিত না হইয়া পারিবেন না। সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ নামরূপকেই শঙ্কর "কর্ম্ম" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থলটী এই—

'কিং পুনস্তৎ "কর্ম্ম" যৎপ্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ীভবতি ইতি?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, শঙ্করাচার্য্য ইহার উত্তরে কি বলিতেছেন দেখুন—

"নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রুমঃ।"

তবেই দেখুন, অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ নামরূপাত্মক জগতের বীজকেই "কর্ম্ম" বলা হইতেছে কিনা? আরও একটী স্থল দেখাইতেছি। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে (১।৫।২৩) সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি তাবৎ আধিদৈবিক বস্তু এবং বাক্ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বস্তু—ইহারা সকলেই প্রাণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। অর্থাৎ জগতের সর্ব্ববিধ বস্তুর ক্রিয়ার মধ্যে প্রাণই অনুস্যূত রহিয়াছে। এই কথা বলিয়া প্রাণকে "পরিস্পন্দাত্মক" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পরিস্পন্দনক্রিয়া ও জগৎপ্রপঞ্চ এক কথাই

যদা তু পরমার্থদৃষ্ট্যা, পরমাত্মতত্ত্বাৎ -অনন্যত্বেন' নিরূপ্যমানে 'বস্ত্বন্তরে' তত্ত্বতো ন স্তঃ, তদা......পরমার্থদর্শনগোচরত্বং প্রতিপদ্যতে।" (বৃহঃ ভাষ্য, ৩।৪।১)

হইতেছে কি না, পাঠকপাঠিকা দেখিবেন। স্থলটী এই—

"এতদেব ব্রতং বাগাদিষু অগ্ন্যাদিষু চ অনুগতং যদেতৎ বায়োশ্চ প্রাণস্য চ পরিস্পন্দাত্মকত্বং সর্ব্বৈর্নৈবৈ-রনুবর্ত্ত্যমানং ব্রহ্ম্।"

এ স্থলের 'ব্রত' শব্দের অর্থ 'কর্ম্ম'ই দাঁড়াইতেছে। অথচ প্রতিবাদকারী বড়ই জোরের সহিত বলিতেছেন যে—"কর্ম্ম বা ক্রিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ হইতে পারে না।" অশেষ শাস্ত্রার্থদর্শী মহামতি তিলকও তাঁহার "গীতারহস্যে" কি বলিয়াছেন তাহাও দেখাইতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"তাই মায়া, নামরূপ ও কর্ম্ম, এই তিন মূলে এক-স্বরূপই।...মায়ার ব্যাপারের বিশিষ্টার্থক নামই—"কর্ম্ম।" তারপর, জগৎপ্রপঞ্চযে ব্রহ্মেই অবস্থিত বলিলে একত্বের হানি হয় না, সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি।

এই প্রকার প্রতিবাদই প্রায় সর্ব্বত্র করা হইয়াছে। আমরা বৃহদারণ্যকের শঙ্কর-ভাষ্য হইতে 'ব্যাপক' পরমাত্মা এবং 'তদ্ব্যাপ্য' এই জগৎ—এই উভয়ের সম্বন্ধ বলিতে গিয়া শঙ্করের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। প্রতিবাদকারী উহাকে আমাদের নিজের কথা মনে করিয়া লইয়া, ব্যাপ্যত্ব ব্যাপকত্বের শঙ্কর-কথিত সম্বন্ধের বিরুদ্ধেও লেখনী চালাইয়াছেন। এই কথাটা বেদান্ত-ভাষ্যেও আছে। তাহাতেও পণ্ডিতমহাশয়ের দৃষ্টি পড়ে নাই বুঝা যাইতেছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা সেই স্থানটী উদ্ধৃত করিতেছি—

"কর্ম্ম হি কর্ত্তৃক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানং ভবতি। অন্যচ্চ ব্যাপ্যং, অন্যৎ ব্যাপকং; ন তেনৈব তৎব্যাপ্যতে" (বৃঃ ভঃ, ৪,৪।৬)।

এই নিয়ম দ্বারা এস্থলটীতে শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞেয় বস্তু হইতে জ্ঞাতাকে স্বতন্ত্র হইতেই হয়। যাহা জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতার বিশেষণ বা ধর্ম্ম হইতে পারে না। জ্ঞাতার ধর্ম্ম বা বিশেষণ হইলে, তাহা জ্ঞাতার 'কর্ম্ম' বা দৃশ্য হইবে কিরূপে? সুতরাং 'ব্যাপক' জ্ঞাতাকে উহার 'ব্যাপ্য' জ্ঞেয়বস্তু হইতে ভিন্ন হইতেই হয়। নতুবা কর্ম্ম-কর্ত্তৃবিরোধ ঘটে। এই তত্ত্বটাই একটু ভিন্নভাবে বেদান্তভাষ্যে (২।১।২৭) বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মের একপাদ জগতে বিকাশিত; তদ্ব্যতীত অন্য তিনপাদই বিকারাতীত আছে।"—এস্থলে ব্রহ্ম যে নাম-রূপাত্মক জগৎ হইতে স্বতন্ত্র তাহা সিদ্ধ হইতেছে। রত্নপ্রভা টীকায় আছে যে "ন্যূনাধিকভাবেনাপি পৃথক্ সত্ত্বং শ্রুতমিত্যাহ।" টীকার এই ন্যূন অর্থে "ব্যাপ্য' এবং অধিক 'অর্থে 'ব্যাপক'। সুতরাং 'ব্যাপ্য-ব্যাপক' ভাবের দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ করিতেছেন, এই অর্থই পাওয়া যাইতেছে।

পরিশেষে পণ্ডিত মহাশয় "ঋগ্বেদ হইতে বেদান্ত কতটুকু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা দেখিবার ঔৎসুক্যে" তাঁহার প্রতিবাদ করা রূপ "কর্ত্তব্য শেষ" করিয়াছেন। আমরা "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের তৃতীয়খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি যে, বেদান্তের মূল সিদ্ধান্তগুলি ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। সে গ্রন্থের সঙ্গে, প্রতিবাদকারী পণ্ডিতমহাশয়ের পরিচয় হয় নাই দেখা যাইতেছে। প্রতিবাদ করিতে হইলে, সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া প্রতিবাদ করিতে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

নেওয়ার

নেপালে ও দার্জ্জিলিংএ নেওয়ার নামে এক জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আপনাদিগকে নেপাল উপত্যকার আদিম অধিবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। Ethnologist গণ ইহাদিগকে মংগর, গুরুং, মুর্ম্মী, লিম্বু প্রভৃতির ন্যায় মংগোলীয় বংশ সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Anthropologistগণ, নাসিকামূলের উচ্চতা ও নিম্নতা এবং মস্তকের দৈর্ঘ্য অনুপাতে প্রস্থের আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্য অনুসারে Naso-malar ও Cephalic Index ধরিয়া যে সকল Formula আবিষ্কার করিয়াছেন তদনুসারে নেওয়ারগণকেও পূর্ব্বোক্ত জাতি গুলির ন্যায় একই রকমের আকার প্রকার বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে গুর্খাগণের তুলনায় নেওয়ারগণের চক্ষু দুটী ঈষৎ বৃহত্তর এবং নাসিকা অনুন্নত হইলেও নাসিকা দণ্ডটি বেশ যেন চিহ্নিত বলিয়া মনে হয়। গুর্খাগণের মুখাকৃতি গোল এবং চওড়া, কিন্তু নেওয়ারগণের মুখাকৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। অধিকাংশ স্থলেই গুর্খাগণের ভ্রু ও চক্ষু দেখিলে মনে হয় যেন চিহ্নমাত্র বিশিষ্ট অথবা অস্তিত্ব বিহীন নাসিকা দণ্ডের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র দুটী চক্ষু তির্য্যগ্ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বহুকালাবধি নেপালের পার্ব্বত্য জাতি গুলির সহিত সমতল-প্রদেশাগত হিন্দুগণের যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সংমিশ্রণ ঘটিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে সকল জাতিই আজ নিজ নিজ আকৃতি প্রকৃতি হারাইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি পরস্পর বিসদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বিভাগে বিভক্ত হইয়া পরিয়াছে। এক্ষেত্রে Anthropologist মহাশয়গণের Formula গুলি যে কতদূর ফলদায়ক হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা সুকঠিন।

যাহা হউক, নেওয়ার ও মংগোলীয় জাতিগণের আচার ব্যবহারে কতকগুলি বিষয়ে এরূপ অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, এবং "নেওয়ারী" ভাষায় এমন অনেক তিব্বতীয় শব্দের পরিচয় পাওয়া যায় যে নেওয়ার গণকে মংগোলীয় বংশোৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে বিশেষ কোন বাধা বা আপত্তি থাকিতে পারে না।

নেওয়ার জাতীয়া স্ত্রীলোকের কেশ প্রসাধনের এমন এক বিশেষত্ব আছে যে মস্তকের উপর "ক্রশ্ বো" ধরণের খোঁপা দেখিলেই ইহাদিগকে নানাজাতীয়া স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে চিনিয়া বাহির করিতে পারা যায়।

ইহারা গৃহশিল্প ও কৃষিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ, এবং সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্য ও বেনেতি দোকান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা যায়, ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু বৌদ্ধগণের অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইলেও ইহারা মহিষ মাংস ভোজন করিয়া থাকে। আবার, হিন্দুগণের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক নেওয়ার আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পায়। এইরূপ হিন্দু নেওয়ার গণের পৌরোহিত্য কার্য্য জৈসী ব্রাহ্মণগণ করিয়া থাকেন।

কাশীতে "কেশেল ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত যেমন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, জৈসীগণও ঠিক তদ্রূপ। ব্রাহ্মণ হইলেও বিধবার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া জৈসীগণ সমাজে অতি হীন স্থান অধিকার করিয়া থাকে। জৈসী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন গুর্খালিরা কখনও ভোজন করে না।

নেওয়ার জাতির বিবাহ প্রথা বেশ একটু অভিনব ধরণের। ইহাদিগের সংস্কার এই যে কন্যা

পিতৃগৃহে ঋতুমতী হইলে পিতা মাতার দেহে পাপ স্পর্শ করে। এ নিমিত্ত ইহারা কন্যার কুমারী কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই একটি বিম্বফলের সহিত তাহার উদ্বাহ কার্য্য সমাধা করিয়া দেয়, এবং কন্যা বয়স্থা হইলে সুবিধামত কোন সৎপাত্রে কন্যার্পণ করিয়া থাকে। তবে অধিকাংশ স্থলেই সৎপাত্র নির্ব্বাচন কন্যার পছন্দ মত বা স্বয়ং কন্যা কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে।

বিম্বফলটি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং ইহাদিগের ধারণা ইহা তথায় অনন্তকাল জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে। এ নিমিত্ত নেওয়ার রমণী কখনও বিধবা হয় না এবং চিরায়তী থাকিয়া, এক স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে স্বচ্ছন্দে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে।

তিব্বতীয় ভুটীয়া, লেপচা ও নেপালের অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিগণের মধ্যে এরূপ প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয় না। একমাত্র বঙ্গদেশে কুলীন কুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে পিতার কৌলিন্যাভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে কুশ-পুত্তলিকার (কোন কোন স্থলে কদলীবৃক্ষ) সহিত "করণ বিবাহ" হইয়া থাকে। এইরূপ "করণ" প্রথার প্রচলন এদেশেও আধুনিক ভিন্ন পুরাতন নহে। এক্ষেত্রে বিম্বফলের সহিত বিবাহ প্রথা, অতি প্রাচীন যুগে কি ভাবে নেওয়ার সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া ছিল তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয়।

নেওয়ারগণের শব সৎকার প্রথাও উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইহাদিগের জাতীয় প্রথানুসারে শবানুগমনকারিগণের প্রত্যেককেই শোক প্রকাশ করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। হয়ত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নিয়মকারিগণ এরূপ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে লোকে এ প্রথার অন্তর্নিহিত সাধু উদ্দেশ্য বা গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হইয়া শুধু নিয়মের খাতিরে বাহ্যিক শোক প্রকাশ করিতে করিতে শব সমভিব্যবহারে শ্মশানে গমন করিয়া থাকে। এ জাতির মধ্যে একমাত্র অগ্নিসৎকার প্রথাই প্রচলিত আছে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে মৃত দেহটিকে একমাত্র "আটর" বিচালী খড় সাহায্যেই দাহ করিতে হয়।

তবে আবশ্যক বোধে এই সকল সামাজিক নিয়ম কানুন গুলিকে প্রায়ই দেশ কালোপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

প্রেম

ওগো প্রেম! ফুটেছিলে নন্দন কাননে;
একদা তোমারে হেরি, বিস্মিত আননে,
তরুণ দেবতা কোন্ সযতনে তুলে,
রাখিল সোহাগ ভরে প্রিয়ার কুন্তলে।
একটি পাঁপড়ি তার কি জানি কেমনে
পড়িল ধরণীতলে। অতৃপ্ত নয়নে—
চির পুণ্য প্রভা তার ধরাবাসী যত
আগ্রহে করিল পান, বুভুক্ষের মত।
শুভ্র অকলঙ্ক তুমি দেবতার দান,
সার্থক ক'রেছ তাই মানবের প্রাণ।

৺অমলা দেবী।

পদ্মা

(বড় গল্প)

৩

পর পর তিন কন্যার বিবাহের পর চতুর্থ কন্যা পদ্মা সনা বিবাহযোগ্য হইয়া তাহার পিতা মুকুন্দলালকে বেশ একটু বিব্রত করিয়া তুলিল। কারণ তিন কন্যার বিবাহ দিয়া বৈবাহিকদের তুষ্ট করিতে মুকুন্দলালের সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাতে এখনকার মত এই মহার্ঘতার বাজারে সুপাত্র ক্রয় করা সহজ নহে। তাহার উপর পদ্মা মেয়েটী গঠনে সুশ্রী হইলেও তাহার গাত্রবর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় ছিল না। তাহার বর্ণকে শ্যামবর্ণের একটু উপর মাত্র বলা যাইতে পারে। তাহার দিদিদের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল গৌর। সুতরাং সুব্রাহ্মণের ঘরের সুন্দরী কন্যার বিবাহে পিতাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। যা কিছু সমস্যা ছিল টাকার। তা যৌতুকের বাহুল্যে ও রূপের প্রভায় মুকুন্দলালের তিন কন্যা বেশ ভাল ঘরে ও বরে পড়িয়াছিল। বড় গীতা ভাগলপুরের বিখ্যাত ডাক্তার মথুরানাথ রায়ের পুত্র ইঞ্জিনিয়ার বিনয়কুমার রায়ের পত্নী। দ্বিতীয়া কন্যা সুজাতা জব্বলপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ এস্ চাটার্জ্জির পত্নী। তৃতীয়া নীতার স্বামী ধ্রুবজ্যোতিঃ মজুমদার—ধনবান না হইলেও উচ্চ শিক্ষিত যুবক। সে এম-এ পাশ করিয়া সরকারী স্কুলে মাষ্টারী করিত। কর্ম্ম উপলক্ষ্যে তাহাকে বঙ্গ ও বিহারের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। গীতা ও সুজাতা আপনাদের সংসার লইয়া এরূপ ব্যস্ত থাকিত যে তাহাদের পিত্রালয়ে আসিবার বড় একটা সময় হইত না। নীতা মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে আসিত। মুকুন্দলাল কন্যারা সুখে আছে জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে মুকুন্দ বাবুর জন্ম। এককালে ধনে ও মানে তাঁহাদের বংশ সমাজের মুকুট স্বরূপ ছিল। কিন্তু কালের গতিতে বংশের সুনাম ও ভগ্নপ্রায় জীর্ণ বিশাল অট্টালিকা ছাড়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য স্বরূপ এখন আর তাঁহাদের কিছুই ছিল না। পূর্ব্বপুরুষদের অসংযত চরিত্র ও অপরিমিত ব্যয়ের ফলে মুকুন্দলাল কয়েক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও জীর্ণ অট্টালিকাখানি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি যদি পিতা বা পিতামহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক প্রাপ্ত টাকা কোন্ কালে শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু মুকুন্দলাল উচ্চ শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র পুরুষ ছিলেন, তাঁহার পরম শত্রুও কখন তাঁহার খুঁত বাহির করিতে পারে নাই। তিনি কলিকাতার কোনও অর্দ্ধ সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইদানিং শরীর অসুস্থ হওয়াতে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিলেন। শিক্ষার তিনি অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। একমাত্র পুত্র মোহিত উচ্চশিক্ষিত হয় ইহা তাঁহার প্রাণের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু মোহিত পড়াশুনায় আগ্রহ প্রদর্শন করা অপেক্ষা বেশভূষার পরিপাট্যেই অধিকতর মনোযোগ প্রদর্শন করিত। ফলে বার দুই ম্যাট্রিক ফেল করিয়া তৃতীয়বার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদেবীর নিকট বিদায় লইল। লেখাপড়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পিতা একজন পদস্থ বন্ধুকে ধরিয়া কোনও সওদাগরী অফিসে পুত্রের একটা কর্ম্ম করিয়া দিলেন। ক্রমে মোহিত কর্ম্মদক্ষতার গুণে ঐ অফিসের হেডক্লার্ক পদে উন্নীত হইল। বেতন হইল ১০০৲ টাকা। পিতা পুত্রের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। বিবাহ দিয়া সুন্দরী বধূ]

ঘরে আনিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মস্তকে বিষম চিন্তার ভার চাপিল—তাহা তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা পদ্মাসনার পদ্মা।

পদ্মার জন্মের ছয় দিন পরেই তাহার জননী সদ্যোজাতা পদ্মাকে মাতৃহারা করিয়া ইহলোকের দেনা পাওনা মিটাইয়া দিয়া পরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। ছয় দিনের শিশু কন্যাকে বক্ষে করিয়া মুকুন্দলাল হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভগিনী গৌরীদেবী যৌবনের প্রারম্ভে সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া ভ্রাতৃগৃহে স্থায়ী ভাবে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনিই মাতৃহারা শিশুর পালনের ভার লইলেন। পিতা ও পিসিমার স্নেহ ও যত্নে পদ্মা বাড়িতে লাগিল। মুকুন্দলালের স্নেহ এই মাতৃহারা শিশুর প্রতি কিছু অধিক মাত্রাতে প্রকাশ পাইত বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অনুযোগ করিতেও ছাড়িত না। তিনি তাহাদের অনুযোগে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর দিতেন "আহা ওর মত হতভাগ্য কার? মায়ের স্নেহ যে কি তা জানলে না। আমি ওকে যতই স্নেহ করিনা কেন, ওর মায়ের অভাব ত কখনও পূরণ করতে পারব না।" ইহা ছাড়া পদ্মার প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্যের আরও একটা কারণ ছিল। পদ্মার আকৃতি ও বর্ণ ছিল অবিকল তাহার মায়ের মতন। মুকুন্দলালের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল গৌর। গীতা সুজাতা নীতা ও মোহিত হইয়াছিল পিতার মত। কিন্তু পদ্মা মাতার মত শ্যাম বর্ণ বলিয়া মুকুন্দলাল একটুও ক্ষুব্ধ হন নাই। পত্নীর সাদৃশ্য থাকাতে ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পদ্মার প্রতি তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতেন।

মাতার ন্যায় বর্ণলাভ করিয়া পদ্মা তাহার ও পিতার কতখানি ক্ষতি করিয়াছিল তাহা পদ্মার বিবাহের সময় হইলে মুকুন্দলাল হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পদ্মার বর্ণ শ্যাম হইলেও তাহার মুখশ্রী ও গঠনাদি চমৎকার ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল তাহার বিশাল শান্ত নয়নদ্বয়। তাহার কেশও অতি সুন্দর ছিল। ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি তাহার পৃষ্ঠদেশ ছাড়াইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে স্কুলে দিয়া, বাটীতে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া মুকুন্দলাল পদ্মাকে শিক্ষা দিতেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার তিনি অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণতঃ বাঙ্গালী পিতা কন্যার শিক্ষার যত্ন লন না। কিন্তু মুকুন্দলাল বলিতেন কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত ব্যক্তির উপযুক্ত করিয়া তবে শিক্ষিত পাত্রে সমর্পণ করা উচিত। তাঁহার অপর কন্যাদেরও তিনি স্কুলে দিয়া ও শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে বিবাহ হওয়াতে তাহাদের শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। পদ্মার দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হওয়ার পর হইতেই ভগিনীর অনুরোধে তিনি তাহার জন্য পাত্র খুঁজিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শ্যামাঙ্গিনী কন্যাকে উচ্চশিক্ষিত পাত্রে দিতে যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক মুকুন্দলালের তাহার অর্দ্ধেকও ছিল না। ক্রমে পদ্মা বেথুন হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিল। সুপাত্র পাওয়া কঠিন দেখিয়া মুকুন্দলাল কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু মোহিত তাহার ঘোরতর বিরোধী হইল। মুকুন্দলাল নিজের শরীরের অবস্থা দেখিয়া মোহিতের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করিলেন না।

পদ্মাকে উচ্চশিক্ষার আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু সে পড়াশুনার চর্চ্চা ছাড়িল না। পিতার নিকট বাড়ীতে নানা প্রকার উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই তাহার বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। এখন সে তাহার অবসর পাইল। তাহার প্রথম গল্প "ব্যথা" বাহির হইল বিখ্যাত মাসিক পত্র "বিশ্ববাণী"তে। বিশ্ববাণীর প্রবীণ সম্পাদক অনাদিবাবু এই নবীনা লেখিকার শক্তি ও সজীবতার পরিচয় পাইয়া বিশ্ববাণীতে তাহা প্রকাশ করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিলেন। পদ্মার প্রথম রচনা যেদিন প্রকাশিত হইল সেদিন পদ্মা যে আনন্দ লাভ করিল তাহা নূতন লেখক ছাড়া অপর কেহ বুঝিবে না। আর আনন্দ হইল

মুকুন্দলালের। সে দিন যাহারা তাঁহার বাড়ীত আসিল তাহাদেরই তিনি পদ্মার রচনাটি পড়িয়া শুনাইলেন।

বিশ্ববাণীতে পদ্মার রচনা বাহির হইবার পর অনেক পত্রিকার সম্পাদকগণ পদ্মসনা দেবীর রচনা আপনাদের পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পদ্মাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্যান্য পত্রেও তাহার রচনা প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাঙ্গালার পাঠকদের নিকট পদ্মসনা দেবী সুপরিচিতা হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু পদ্মার এই খ্যাতিতে মোহিত সুখী হইতে পারিল না। বিদুষী মহিলা সম্বন্ধে তাহার কোন কালেই উচ্চ ধারণা ছিল না। তাহার মতে নারী পুরুষের দাসী ছাড়া আর কিছুই নহে। শিক্ষিতা মহিলা যে তাহাদের সেই দাসীত্বের বিরুদ্ধে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইবে ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। এই কারণেই মুকুন্দলাল পুত্রবধূ অম্বাকে বাঙ্গালার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত করাইতে চেষ্টা করেন নাই। স্ত্রী স্বামীর ছায়ামাত্র এই নীতির অনুসরণ করিয়া অম্বা তাহার শিক্ষিতা ননদকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিত না। তবে শ্বশুর বর্ত্তমান বলিয়া প্রকাশ্যে বেশী কিছু বলিতে সাহস করিত না।

পদ্মা অম্বার মনের ভাব বুঝিলেও তাহার সহিত কখনও খারাপ ব্যবহার করিত না। তাহার প্রকৃতি ছিল কিছু অধিক মাত্রায় শান্তিপ্রিয়। সে পিতার সেবা করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া যখন শান্তিতে দিন কাটাইতেছিল, সেই সময় প্রজাপতির অভিশম্পাত তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে উচ্চশিক্ষিত উদ্ধত প্রকৃতি ধনীপুত্র প্রকাশের পত্নীত্বে বাঁধিয়া দিল।

৪

কাঁথিতে পদ্মার শ্বশুর উমানাথ বাবুর বাড়ী। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ছিলেন। উপস্থিত কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কাঁথিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ ছাড়া পৈতৃক সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। দেওঘরে ও মধুপুরে দুইখানা বাড়ী ছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকাশ ডাক্তারী পাশ করিয়া কাঁথিতেই চিকিৎসা করিতেছিল। কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশ এম-এ পাশ করিয়া ওকালতী পড়িতেছিল। কন্যা দেবরাণীর বিবাহ হইয়াছিল। তাহার স্বামী এলাহাবাদের একজন প্রোফেসর। বিকাশের বিবাহ হইয়াছিল; উমানাথ প্রকাশের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা খুঁজিতেছিলেন।

এই সময় ব্রজজ্যোতি কাঁথি স্কুলে বদলী হইয়া গেলেন। গ্রীষ্মের ছুটীতে নীতা পিতার নিকট কলিকাতাতে আসিল। পদ্মার বিবাহের তখনও ঠিক হয় নাই শুনিয়া পিতাকে বিস্তর অনুযোগ করিল। তাহার পর উমানাথবাবু তাঁহার পুত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী খুঁজিতেছিলেন তাহা বলিয়া পিতাকে চেষ্টা করিতে বলিল। আরও বলিল যে তাঁহারা টাকার দাবী করিবেন না।

মুকুন্দলাল কহিলেন, "হাঁ, ছেলেটী সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু পদ্মার রঙ ত ফর্সা নয়।"

নীতা কহিল "চেষ্টা করে দেখুন না। যদি তাদের পদ্মাকে পছন্দ হয়; রঙ ছাড়া ত পদ্মার আর কিছু খুঁত নেই।"

কিন্তু এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া মোহিত যে প্রস্তাব করিল তাহাতে মুকুন্দলাল প্রথমে কিছুতেই মত দেন নাই। নীতা গৌরীও আপত্তি করিলেন। কিন্তু অবশেষে উপযুক্ত পুত্রের জেদের কাছে মুকুন্দলালকে হার মানিতে হইল। তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা ছিল না। তাই মোহিতের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি উমানাথের নিকট তাঁহার কন্যার সহিত উমানাথের পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিলেন।

উমানাথ যথাকালে উত্তর দিলেন, কন্যা শিক্ষিতা ও সুন্দরী হইলে তাঁহার সহিত বৈবাহিক

সম্বন্ধ স্থাপনে তাঁহার আপত্তি নাই। মুকুন্দলাল উত্তর জানাইলেন যে তাঁহার কন্যা সুন্দরী ও শিক্ষিতা। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মুকুন্দলাল একদিন মোহিতকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশকে তাহার হষ্টেলে দেখিতে গেলেন। প্রকাশ সুপুরুষ কিন্তু উদ্ধত ও গর্ব্বিত প্রকৃতির যুবক। তাহাকে দেখিয়া মুকুন্দলাল প্রীত হইলেন না। বাড়ী আসিয়া ভগিনীকে কহিলেন, "গৌরী, ছেলের সব ভাল, কিন্তু বড় গর্ব্বিত। এরকম ছেলের হাতে কি পদ্মা সুখী হবে? আবার এ রকম জুয়াচুরী করে? কায নেই বিয়েতে। পদ্মা যেমন আছে তেমনই থাক, কি বল গৌরী?"

গৌরী কহিলেন, "কিন্তু দাদা, ভুলে যাচ্চ যে তোমার আর আমার শীঘ্রই ডাক পড়বে। তখন ও কার কাছে থাকবে?"

মোহিত ও গৌরীর মতের কাছে মুকুন্দলালের ক্ষীণ আপত্তি টিকিল না। উমানাথ মুকুন্দলালের আহ্বানে আসিয়া কন্যা দেখিয়া বিবাহ স্থির করিয়া গেলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। প্রতিবেশীরা প্রকাশের সুন্দর আকৃতি দর্শনে মুকুন্দলালের জামাতা ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। গৌরী দেবী সুন্দর জামাতা পাইয়া মৃতা ভ্রাতৃজায়াকে স্মরণ করিয়া অশ্রু মোচন করিলেন। পদ্মার স্কুলের সঙ্গিনীরা পদ্মার স্বামী-ভাগ্যের প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই পদ্মাকে যৌতুক দিল। কেবল মুকুন্দ বাবুর প্রাণে শান্তি ছিল না। তাঁহার কার্য্যের পরিণাম যে কি হইবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। বিশেষতঃ প্রকাশের গর্ব্বিত ও উদ্ধত আচরণে তাঁহার উদ্বেগ আরও বাড়াইয়া তুলিল।

৫

উমানাথ বাবুর বিশাল অট্টালিকায় সে দিন সকলে মহা ব্যস্ত। কাল তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশ বিবাহ করিয়া নববধূ আনিয়াছে। আজ তাহার ফুলশয্যা। স্বয়ং কর্ত্তা চারি দিক পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। অন্তঃপুর আত্মীয় কুটুম্বিনীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলেই কোনও না কোনও কর্ম্ম করিতেছে। কেহ বা ছেলে ঠেঙ্গাইতেছে। কেহ বা পুত্র বধূর নিন্দা করিতেছে। যাহার কোন কর্ম্ম নাই সে নব বধূর সহিত আনীত দ্রব্যের সমালোচনা করিতেছে।

গৃহিণী মহামায়া পদ্মার পিতার দ্রব্য সামগ্রীতে খুব সন্তুষ্ট না হইলেও, অসন্তুষ্ট হন নাই। তিনি মানুষ মন্দ ছিলেন না। তবে বড়মানুষের গৃহিণী বলিয়া একটু গর্ব্বিতা ও রাগী ছিলেন। তা—অতটুকু ধরিবার মধ্যেই নহে। বধূ তাঁহার মনের মত হইয়াছিল, কাযেই বধূর সহিত আনীত দ্রব্যের খুঁত বাহির করা তাঁহার আবশ্যক মনে হয় নাই! উমানাথ বাবু কিছু না চাহিলেও মুকুন্দলাল তাঁহার বড় আদরের কন্যাকে রিক্তহস্তে দান করিতে পারেন নাই। তিনি কন্যাকে বহুমূল্য অলঙ্কার ও জামাতাকে মূল্যবান বরাভরণ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দানের সামগ্রী প্রভৃতিও এত ব্যয় করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে পদ্মার বর্ণের কৃত্রিমতা ধরা পড়িলেও তাঁহারা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন। এজন্য বাড়ী বন্ধক রাখিয়া তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

কুটুম্বিনীদের মধ্যে একজন কহিল, "তা পেকাশের শ্বশুরের হাতটা দরাজ—দিয়েছে থুয়েছে ভাল।" মহামায়া কি কাযে সেখানে আসিয়া উক্ত মন্তব্য শুনিয়া কহিলেন, "এমন কি দিয়েচে বল? অমন ছেলে আমার! ও যে কেদ ধরলে পাশ করা বউ চাই। তাইত—নইলে নগদ কত হাজার টাকা ঘরে আসত। তা হোকগে, আমি ত আর কুটুমের ধনের প্রত্যাশা করিনা মামী। ছেলের সুখ আগে না টাকা আগে? প্রকাশ আমার সুখী হলেই হল।"

মামী কহিলেন, "তা আবার বলতে বৌমা। রাজার সংসার তোমার, কিসের অভাব বল? কিসের জন্যে তুমি কুটুমের ধনের জন্য ক্ষেপবে?

তা, বৌটী খাসা হয়েছে। যেমন ছেলে, তেমনি বৌটি হয়েছে। অত লেখাপড়া জানা বৌ, তা মুখে রাটী নেই।"

মহামায়া খুসী হইয়া কহিলেন, "সবই তোমাদের আশীর্ব্বাদ, মামী।"

একটী নবীনা কহিল, "তা মামীমা, তোমরা যে উদারতা দেখালে তা কাগজে ছাপাবার যোগ্য। তোমার জামাইকে বলব'খন।" এই যুবতীর স্বামী কোনও বাঙ্গলা সংবাদপত্রের লেখক শ্রেণীভুক্ত। মহামায়া কহিলেন, "না রে, পাগল! এ আবার কাগজে বের করবি কিরে?" তারপর ব্যস্তভাবে কহিলেন "ও চারু, ক্ষীরের ছাঁচ কটা তুলে ফেলনা মা। বৌমা কোথা গেলে, ছেলেদের জল খেতে দাও। এখনই ফুলশয্যের তত্ত্ব আসবে। কুটুমবাড়ীর লোকদের খাওয়ার বন্দবস্ত করতে হবে, গিয়ে যেন তারা নিন্দে করতে না পারে। আমি আর একা ক'দিক দেখব? মেয়েটা আর বৌটার ত মাথার টিকি দেখবার যো নেই। দেবু কোথা গেলি রে।"

মায়ের ডাক শুনিয়া কন্যা দেবরাণী উপর হইতে নামিয়া আসিল। মা কহিলেন, "কোথায় রয়েছিস দেবু? একবার কি এদিক দেখতে নেই? আমি অথব্ব মানুষ, তার উপর বাতের ব্যথায়—"

বাধা দিয়া, মুখ অন্ধকার করিয়া দেবরাণী কহিল, "মা, একবার উপরে আমার ঘরে চল।"

কন্যার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া জননী ভীত হইয়া কহিলেন, "কি হয়েচে দেবু?" দেবরাণী একবার চতুষ্পার্শ্বের রমণীদের দিকে চাহিয়া কহিল, "উপরে চল সব বলচি।"

মহামায়া বিস্মিত হইয়া কন্যার অনুসরণ করিয়া উপরে উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী নামিয়া আসিয়া গম্ভীর স্বরে দাসীকে কহিলেন "যা, কর্ত্তাকে ডেকে আন।"

দাসী কহিল, "এইখানে মা?"

গৃহিণী কহিলেন' "না আমার ঘরে।"

মহামায়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার গর্ব্বপ্রফুল্ল মুখে কে যেন একরাশ কালী ঢালিয়া দিয়াছে। নিমন্ত্রিতাগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। একজন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বৌ?"

মহামায়া উত্তর দিলেন না। একবার তাহার দিকে চাহিলেন মাত্র। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল।

দাসী আসিয়া কহিল, "মা, বাবু উপরে গেছেন।" গৃহিণী উপরে উঠিলেন।

উমানাথ পত্নীর অন্ধকার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "কি হয়েচে? এত ডাকাডাকি কেন?"

গর্জ্জন করিয়া মহামায়া কহিলেন, "ডেকেছি আমার পিণ্ডি দেবে বলে। এ কি জুয়াচোরের ঘরে আমার প্রকাশের বিয়ে দিলে? বিদেয় করে দাও ও বৌ এখনি।"

উমানাথ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, "কি হয়েচে? বৌমা কি করেচে?"

মহামায়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ। বাপ বেটায় গিয়ে দেখে শুনে এ কি বৌ আনলে? হায় হায়, বাছা আমার না দেখে বিয়ে করতে চায়নি। আমিই তাকে ফটো পাঠিয়ে মেয়ে সুন্দরী বলে রাজী করি। ওগো আমি কোথায় যাব গো!"

উমানাথ ব্যস্ত করিলেন "আঃ কি হয়েছে খুলেই বল না!"

মহামায়া কহিলেন, "আর বলব কি? বলবার কি আছে? তোমাদের ঠকিয়ে, রঙ মাখিয়ে কালো মেয়ে বিনি পয়সায় পার করেছে।"

পত্নীর কথায় উমানাথের বিস্ময় সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "অ্যাঁ? বল কি? এত বড় প্রতারণা?"

মহামায়া কহিলেন, "হাঁ, তোমাদের চক্ষে ধুলো দিয়েছে। দেবু সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুইয়ে দিতে গিয়ে দেখে, হাতে সাদা সাদা গুঁড়োর মতন কি উঠতে

লাগল। সে সন্দেহ করে আমায় ডাকলে। আমি গিয়ে গরম জল তোয়ালে দিয়ে ঘষতেই সব রঙ উঠে গেল।"

উমানাথ কহিলেন, "কি রকম রঙ দাঁড়িয়েছে এখন? খুব কালো কি?"

গৃহিণী কহিলেন, "না, খুব কালা নয়। এই আমাদের দেবুর মতন। কিন্তু প্রকাশ ত আমার অমন চায় নি। বিকাশের বৌ সুন্দর, আমার যে বড় সাধ ছিল প্রকাশের বৌও খুব সুন্দর হবে। শেষে এমনি করে ঠকিয়ে একটা কালো পেত্নী ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে! দেখনা তুমি। দেবু, নূতন বৌকে একবার এখানে আন তো।"

মাতার আদেশে দেবরাণী অবগুণ্ঠিতা পদ্মাকে লইয়া পিতার সম্মুখে আনিয়া দাঁড়াইল। দণ্ডপ্রাপ্ত খুনী আসামীর ন্যায় পদ্মা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। উমানাথ পদ্মার আপাদমস্তক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "বৌমা, তোমার বাবার প্রতি আমি ত কোন অন্যায় করিনি। তবে কেন তিনি আমার এমন সর্ব্বনাশ কল্লেন?"

উত্তরে পদ্মার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া উমানাথের কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, তাই ত, উহার কি দোষ? ও যে বাঙ্গালীর কন্যা, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ত উহার নাই।—তিনি কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেবু, বৌমাকে নিয়ে যাও। দেখো ওকে যেন কেউ কটু কথা না বলে।"

দেবরাণী পদ্মাকে লইয়া চলিয়া গেল। গৃহিণী কহিলেন, "এখন কি করবে?"

উমানাথ ভাবিয়া কহিলেন, "কি আর করবো? দেব সাক্ষী করে বিয়ে করেচে। ধর্ম্মপত্নী বলে গ্রহণ করেচে। ত্যাগ করা ত যায় না। যার সঙ্গে যার ভবিতব্যতা।"

গৃহিণী কহিলে, "ওসব আমি জানি না। আমি আবার প্রকাশের বিয়ে দেবো। সুন্দর বৌ আনব।"

উমানাথ কহিলেন, "আহা এখন অত গোল কচ্চ কেন? বৌভাতটা হয়ে যাক। তারপর ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে'খন। এখন গোলমাল কল্লে বড় কেলেঙ্কারী হবে।"

গৃহিণী কহিলেন, "আমি না হয় চুপ করে রইলাম। কিন্তু প্রকাশ—সে ত চুপ করে থাকবে না। সে শুনলে মহাকাণ্ড বাধাবে। এত খুঁজে বাছার কপালে কিনা এই জুটল?"

উমানাথ কহিলেন, "তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো। আমিও বলবখ'ন। কুটুম্বদের কাছে সমাজের কাছে আমাকে যেন লজ্জা পেতে না হয়।"

কর্ত্তা গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেলেন। গৃহিণী বধূর পিতার নিন্দা করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বাড়ীর সকলেই ব্যাপারটা জানিতে পারিল। তখন আর একবার নূতন করিয়া পদ্মাকে দেখিবার ঘটা পড়িয়া গেল। কেহ তাহার খোঁপা খুলিয়া দীর্ঘ কেশের গুচ্ছ টানিয়া কহিল, "চুলগুলোও কি পরচুলো নাকি?" কেহ তাহার বিশাল চক্ষুর কথা তুলিয়া কহিল, "চোখজুটোও কি জাল নাকি?" বেচারী পদ্মা ক্ষোভে অপমান ঈশ্বরের নিকট মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

বিকাশ আসিয়া মাতাকে কহিল, "মা, ও জুয়াচোরের মেয়েকে আজই বিদেয় কর। ওদের বাড়ী থেকে তত্ত্ব নিয়ে লোক আসবে, দাও তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে। আমরা প্রকাশের আবার বিয়ে দেবো।"

মা কহিলেন, "বিদেয় করব না ত কি ও পেত্নীকে নিয়ে আমি পূজো করব? তবে আজ নয়—বৌভাত হয়ে যাক। নইলে লোক হাসবে।"

এমন সময় বিকাশের স্ত্রী মিনতি আসিয়া কহিল, "মা, ঠাকুরপো তাঁর সুটকেসে কাপড় চোপড় নিয়ে চলে যাচ্ছেন।"

গৃহিণী কহিলেন, "ওমা কি হবে গো। আজ যে তার ফুলশয্যা! কি ছোটলোকের মেয়েই ঘরে

আনলাম মা! আমার সর্ব্বনাশ হল গো।" বলিয়া তিনি পুত্রের সন্ধানে ছুটিলেন।

প্রকাশ উচ্চশিক্ষিত, গর্ব্বিত ও যুবক। দয়া মায়াকে মানসিক দুর্ব্বলতা মনে করিত। পত্নীর আদর্শ তাহার বড় উচ্চ ছিল। সে যখন শুনিল যে তাহার শ্বশুর প্রতারণা করিয়া তাহার স্কন্ধে এক কালো বধূ চাপাইয়া দিয়াছেন, তখন ক্রোধে ও ক্ষোভে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। শ্বশুরকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য সে প্রতিজ্ঞা করিল যে জীবনে কখনও পদ্মার মুখদর্শন করিবে না। সেই দণ্ডে সে গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় মা আসিয়া বাধা দিলেন। মাতার অনেক অশ্রুবর্ষণের ফলে প্রকাশ সে দিন গৃহে থাকিয়া নিয়ম কর্ম্ম করিতে রাজী হইল। কিন্তু মাতাকে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া দিল।

মা কহিলেন, "এর পর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস। কিন্তু আজকের দিন আমার মুখ রক্ষে কর বাবা। তোর আবার আমি বিয়ে দোবো। তুই যদি না চাস ত ও বৌ নিয়ে আমি কি করব?"

সন্ধ্যার পর মুকুন্দলালের গৃহ হইতে তত্ত্ব আনিয়া তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিরা যেরূপ অভ্যর্থনা পাইল তাহা আর বলিয়া কায নাই। গৃহিণী ও পুত্রদের মতে তত্ত্ব ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু কর্ত্তা অনেক বুঝাইয়া বলাতে গৃহিণী তত্ত্ব রাখিতে সম্মত হইলেন। মুকুন্দলালের লোকেরা পুরস্কারের পরিবর্ত্তে প্রহার না পাইয়া আপনাদের সৌভাগ্য ভাবিয়া ফিরিয়া গেল।

রাত্রিতে নিয়ম কর্ম্ম শেষ হইলে গৃহিণী যখন এক প্রকার জোর করিয়াই প্রকাশকে শয়ন-কক্ষে ঠেলিয়া দিলেন, তখন পদ্মা নিঃশব্দে ঘরের একটা জানালায় বসিয়া ছিল। তাহার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল।

প্রকাশ ঘরে ঢুকিয়াই কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া কহিল, "তোমাকে পত্নী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর, এর জন্যে তোমার পিতাই দায়ী।" বলিয়া আর কোনও কথা না বলিয়া সে শয্যায় শয়ন করিল। আর পদ্মা, সমস্ত রাত্রি সেই জানালায় বসিয়া কাটাইল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রকাশকে কেহ বাড়ীতে দেখিতে পাইল না। ভৃত্যের নিকট সে একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছিল। পত্র পাঠে উমানাথবাবু অবগত হইলেন যে প্রকাশ ভোর চারিটার ট্রেণে ঢাকায় যাত্রা করিয়াছে। পদ্মা থাকিতে সে আর গৃহে ফিরিবে না। ছুটী ফুরাইলে সে কলিকাতায় যাইবে। পিতা যদি তাহাকে চান তাহা হইলে প্রতারকের কন্যাকে যেন অবিলম্বে বাড়ী হইতে বিদায় করেন ইত্যাদি।

পত্র পাঠ করিয়া উমানাথ বাবু স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বিকাশ মুকুন্দলালের উদ্দেশে কটূক্তি করিতে লাগিল। আর গৃহিণী কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিলেন। পদ্মাকে অবিলম্বে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বামীকে বলিলেন। বধূর জন্য পুত্র গৃহত্যাগ করিল, অমন বধূ লইয়া তিনি কি করিবেন? বাড়ীর সকলের মতে পদ্মাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

কিন্তু উমানাথ কিছু দ্বিধায় পড়িলেন। মুকুন্দলালের উপর তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পদ্মার অশ্রুসিক্ত বিষাদ মাখা মুখ তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার করিয়াছিল। তিনিও কন্যার পিতা। হায়, পিতা হইয়া কি প্রকারে অপরের কন্যার মাথায় এত বড় দুঃখের বোঝা তুলিয়া দিবেন? কিন্তু পত্নী পুত্রের জেদের নিকট তাঁহাকে হার মানিতে হইল। তিনি মুকুন্দলালকে অবিলম্বে কন্যা লইয়া যাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করিলেন। টেলিগ্রাফ পাইয়া, বলির পশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে মুকুন্দলাল বৈবাহিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

উমানাথ তাঁহার বুদ্ধিহীনতার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিয়া পদ্মাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। মুকুন্দলালের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতটা যে হইবে তাহা তিনি আশঙ্কা করেন নাই। উমানাথের দুই হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে হতভাগ্য পিতা কহিলেন,

"বেই, আমাকে যে দণ্ড দিতে হয় দিন। কিন্তু আমার দোষে মেয়েটাকে দণ্ড দেবেন না।"

উমানাথ কহিলেন, "আমিও সে কথা ভেবেছি। কিন্তু প্রকাশের মা আর প্রকাশ কিছুতেই আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিতে চায় না। এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? আপনার মেয়ে এখানে থাকলে আমার ছেলে বাড়ী আসবে না। আপনি ভেবে দেখুন আমার এতে কোনও হাত নেই। এখন ত নিয়ে যান, পরে ছেলের মন বুঝে যা হয় করব।"

অগত্যা মুকুন্দলাল পদ্মাকে লইয়া গেলেন। পদ্মা এই ক'দিনেই তাহার মধুর ব্যবহারে শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রিয় হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার হৃদ্যতা হইয়াছিল ননদিনী দেবরাণীর সহিত। পদ্মা চলিয়া গেলে দেবরাণী চক্ষু মুছিয়া মাতাকে কহিল, "মা, পদ্মা বড় ভাল মেয়ে। রঙ ময়লা ত আর ওর দোষে হয় নি! ওকে ত্যাগ কোরো না মা।"

গৃহিণীও এই কয়দিনে পদ্মার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "হাঁ, মেয়েটা ভাল। বড় নরম স্বভাব। বাপের বুদ্ধিতে মেয়েটার জীবনটাই মাটী হল। কেন যে মিন্সের অমন কুবুদ্ধি হল! এই ক'দিনেই মেয়েটার উপর আমার কেমন একটা মমতা জন্মে গেছে। দেখি পরে প্রকাশের মন বুঝে। যদি রাজী হয় ত আবার আনবো।"

৬

ভূপতি রায় ঢাকার কোনও প্রাইভেট স্কুলের মাষ্টার। সংসারটী তাহার ক্ষুদ্র। স্ত্রী দীপ্তি ও বৈমাত্রেয় শ্যালিকা তৃপ্তি এবং দুই কন্যা লইয়া তাহার সংসার। ভূপতির আয় সামান্য, কাজেই অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তাহার বাড়ীখানি তেমন বড় না হইলেও বেশ পরিষ্কার ও আধুনিক। এই বাড়ীখানি ছাড়া তাহার পৈতৃক সম্পত্তি বলিতে কিছুই ছিল না। বাড়ীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বাগান ছিল। তাহাতে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীও ছিল। সেদিন কি একটা কারণে স্কুল বন্ধ ছিল। স্কুলের তাড়া না থাকাতে ভূপতি স্বহস্তে তাহার ক্ষুদ্র উদ্যান পরিষ্কার করিতেছিল। কন্যা আসিয়া পিতাকে সাহায্য করিতেছিল। বেলা ১১টা বাজিয়া গিয়াছিল। তৃপ্তি আসিয়া কহিল, "আজ কি জামাইবাবুর কোথাও নিমন্ত্রণ আছে?"

একটা বেল ফুলের গাছের গোড়া খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভূপতি কহিল, "না, নিমন্ত্রণ আর কে করবে? কেন, কি হয়েছে?"

তৃপ্তি কহিল, "বেলার দিকে নজর আছে? চান করতে হবে না? ভাত খাবার বুঝি মতলব নেই?"

ভূপতি কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ দ্বারে শকট আসিবার শব্দে তাহার বক্তব্য আর বলা হইল না। সে কন্যাকে কহিল, "দেখে আয়ত অমু, কে এল।"

অমিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে আসিয়া কহিল, "বাবা, প্রকাশ কাকা এসেছেন।"

ভূপতি বিস্মিত হইয়া কহিল, "প্রকাশ! প্রকাশ এমন সময় এল? চল ত দেখি।"

ভূপতি বাহিরে আসিয়া দেখিল প্রকাশ গাড়ীওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিতেছে। তাহার মূর্ত্তি শুষ্ক, বেশ-ভূষার শৃঙ্খলা নাই। ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "একি প্রকাশ, এমন সময় যে? বউ কোথায়?"

প্রকাশ কহিল, "চল, সব বলছি।"

ভূপতি তাহার ভাব দেখিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া তাহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

স্নানাহার সম্পন্ন হইলে বিশ্রাম করিতে করিতে প্রকাশ সকল ঘটনা ভূপতির নিকট প্রকাশ করিল। শুনিয়া ভূপতি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ প্রকাশ ভূপতির হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "ভূপতি ভাই, আমাকে একটা ভিক্ষা দেবে?"

বিস্মিত ভূপতি কহিল, "কি চাও প্রকাশ? দরিদ্র আমি, আমি তোমাকে কি দিতে পারি?"

প্রকাশ কহিল, "ভূপতি, তুমি দরিদ্র হলেও তোমার

ভাণ্ডারে তা আছে। ভাই, বল, তুমি আমাকে তা দেবে?"

ভূপতি একটু ভাবিয়া কহিল, "তোমার প্রার্থনা সঙ্গত হলে অবশ্যই দেবো।"

তখন অনুনয়পূর্ণকণ্ঠে প্রকাশ কহিল, "ভূপতি, একদিন তুমি তৃপ্তিকে আমাকে দিতে চেয়েছিলে। কিন্তু বাবার মত ছিল না বলে' আমি তোমার দান গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু আজ আমার সে অপরাধ ভুলে যাও ভাই। তৃপ্তিকে আমায় দাও।"

প্রকাশের প্রস্তাব শুনিয়া ভূপতি স্তম্ভিত হইল। সে কহিল, "সত্যি একদিন তৃপ্তিকে তোমাকে দিতে ব্যগ্র হয়েছিলাম। কিন্তু সে দিনের সঙ্গে আজকের ঢের তফাৎ প্রকাশ। এখন কথাটা ভেবে দেখবার বিষয়। তুমি আবার বিবাহ করতে চাইছ কিন্তু চার দিন পূর্ব্বে দেবতা সাক্ষী করে যাকে ধর্ম্মপত্নী করে গ্রহণ করেছ তার কি হবে?"

প্রকাশ কহিল, "তাকে জীবনে কখনও আমি পত্নী বলে স্বীকার করব না। ওরকম প্রতারকের কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও ভূপতি।"

ভূপতি কহিল, "প্রকাশ, আমি দরিদ্র। আর তৃপ্তি আমার স্ত্রীর বৈমাত্রেয় ভগিনী—এক্ষেত্রে সতীনের উপর ওকে দিলে লোকে কি বলবে?"

প্রকাশ কহিল, "কেন ভূপতি, তাতে ক্ষতি কি? আমি ত সে স্ত্রীকে এখনও পর্য্যন্ত ভাল করে দেখিও নি। জীবনে তাকে পত্নীর স্থান কখনও দেবো না। ও বিবাহ একটা স্বপ্ন বলে ভাববো। তৃপ্তির এতে কিছুই ক্ষতি হবে না।"

ভূপতি কহিল, "তোমার বাবা পূর্ব্বে তৃপ্তিকে বধূরূপে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। এখন যে হবেন তার ভরসা কি? আর তুমি যেন ও বৌকে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তোমার বাবা যদি করেন?"

প্রকাশ কহিল, "বাবা যদি তৃপ্তিকে বউ বলে ঘরে না নেন, আর ঐ কাল পেঁচাকে গ্রহণ করেন, তাহলে তুমি কি আমাকে এতই অপদার্থ ভাব যে পরিবার প্রতিপালন করবার আমার ক্ষমতা নেই?"

ভূপতি কহিল, "আচ্ছা ওর দিদির সঙ্গে পরামর্শ করি—আর ওরও মত নিই।"

রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে প্রকাশের প্রস্তাব লইয়া অনেক আলোচনা হইল। দীপ্তির তৃপ্তির প্রতি বিশেষ যে ভালবাসা ছিল তা নহে। বরং সে তাহাকে তাহার স্বামীর স্কন্ধের বোঝা স্বরূপই মনে করিত। সে বোঝা নামাইতে পারলেই বাঁচে। সুতরাং তাহার মত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। আর তৃপ্তি—সেও মত দিল। প্রকাশের প্রতি বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর ভগিনীর গৃহে সে যেভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহার অপেক্ষা সপত্নীর যন্ত্রণা তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর মনে হইল না।

পদ্মাকে বিবাহ করিবার আটদিন পরে প্রকাশ আবার তৃপ্তিকে বিবাহ করিল। উমানাথ বাবু এই বিবাহের কিছুই জানিতে পারিলেন না। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে তৃপ্তি অনিন্দ্য-সুন্দরী—বিধাতা তাহার অঙ্গে যেখানে যাহা আবশ্যক তাহা দিয়া তাহাকে সাজাইয়াছিলেন। তবে সে প্রকাশের আদর্শের অনুরূপ ছিল না, কারণ সে ঘোর অশিক্ষিতা। ওরূপ হইলে যে সকল দোষ থাকা অপরিহার্য্য তাহার তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল।

উমানাথ বাবু তাহাকে দুই কারণে বধূ করিতে সম্মত হন নাই। প্রথম কারণ তাহার জননী ক্ষয়রোগে মারা যান। দ্বিতীয় কারণ সে অশিক্ষিতা। প্রকাশও এই দুই কারণে প্রথমে মত করে নাই। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইতে পারে কাহার সাধ্য? তাই প্রকাশ ক্রোধের বশে আবার তাহাকেই বিবাহ করিল।

বিবাহ রাত্রে তৃপ্তি স্বামীকে কহিল, "তুমি ত আবার সে বউকেও আনবে?"

প্রকাশ কহিল, "কখনও না। তুমিই আমার স্ত্রী। সে আমার কেউ নয়।"

"কিন্তু তুমি ত তাকে বিয়ে করেচ।"

প্রকাশ বুঝিল, তৃপ্তি পূর্ব্বের কথা তুলিতেছে। সে তাহার হাত ধরিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "তৃপ্তি, ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। আমিও একটা ভুল করেচি। তা বলে কি ক্ষমা করতে নেই? আমি তোমা ছাড়া কারো নই। ভুল করেছিলাম —ঈশ্বর ভুল ভেঙে দিলেন।"

তৃপ্তি আর কিছু বলিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারনলিনী দত্ত।

বৃদ্ধের গান

(প্রসাদী সুর)

মন রে, শোন্ এক কথা বলি।
তুই আসল রাস্তা ভুলে গিয়ে,
ঘুরে মচ্ছিস অলি গলি ॥
তুই, এতদিন যা করে এলি,
ছায়াবাজি সে সকলি।—
এখন, মৃত্যু ঘণ্ট শুনে কাণে,
ফেলে থো তোর ছেঁড়া পুঁটলি ॥
ওরে, ভাই বন্ধু দারা সুত,
এরা সব মায়ার পুতলি।—
তুই আসল কথা ভুলে গিয়ে,
সেই মায়াতে মজে র'লি ॥
তুই, না বুঝিয়ে না চিন্তিয়ে,
প্রবৃত্তির দাস হ'লি।
শেষে, কালসিন্ধুর তীরে এসে,
বেচিকিচ্ছায় মারা প'লি ॥

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

শাস্তি

(গল্প

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ধনী পিতার একমাত্র কন্যা রাধারাণীকে বিবাহ করিয়া সঞ্জীব যেন এই বিশাল সংসার-সমুদ্রে একটা কিনারা খুঁজিয়া পাইল। মাস তিনেক হইল, আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকিলী লাইসেন্স লইবে কি না তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছিল; এখন, শ্বশুরমহাশয়ের পরামর্শে এবং তাঁহারই অর্থে সে কলিকাতায় ওকালতি করিতে আসিল। সেখানে একখানি ছোটখাট বাড়ীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিছুদিন বাদে রাধারাণীকেও নিজের কাছে লইয়া আসিল। কিন্তু, রাধারাণী নিতান্ত ছেলেমানুষ না হইলেও এই বিদেশে এমন ভাবে থাকিতে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিল। স্বামীকে বলিল,—"তুমি দুপুর বেলা কাছারী চলে' যাও, আর আমার একলাটি এমনি কষ্ট হয়!"

সঞ্জীব চিন্তিত হইয়া কহিল,—"তা তো বুঝ্‌চি! দেখা যাক্‌; চেনাশোনার ভেতর যদি কেউ এসে এখানে থাকে ত' বেশ হয়!"

মাসখানেক পরে একদিন বৈকালে সঞ্জীব কাছারী হইতে ফিরিয়াই বুঝিল,—উপরের ঘরে একাধিক স্ত্রীলোক বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। ঘরে ঢুকিতে গিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। অবগুণ্ঠিতা রাধারাণীর নিকট বসিয়া আর দুইটি নারী,—একজন প্রৌঢ়া, অপরা যুবতী। দু'জনের কেহই সঞ্জীবের অচেনা নহে। প্রৌঢ়া সঞ্জীবকে দেখিয়া হাসিমুখে তাহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "কি বাবা, চিন্‌তে পার তোমার মাসিমাকে?"

একটু অপ্রতিভ হইয়া গিয়া সঞ্জীব কহিল,—"চিন্‌তে পারি বৈকি! তোমরা—"

প্রৌঢ়া কহিলেন,—"দশ'রায় এখানে গঙ্গা নাইতে এসেছিলুম, গঙ্গার ঘাটেই বৌমার সঙ্গে দেখা হল! তোমায় বলে নি?"

"কৈ, না!"

প্রৌঢ়া, রাধারাণীর দিকে তাকাইতে রাধারাণী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। প্রৌঢ়া কহিলেন,—"আমরা কি জানি আগে যে তোমরা এখানে রয়েছ! তা বেশ হয়েচে! বৌ ত' নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীটি!—ওলো ও সরি, শুন্‌চিস্‌?"

যুবতীটি এতক্ষণ ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া রাধারাণীর সহিত কথা কহিতেছিল; এখন মায়ের নিকট হইতে ইঙ্গিত পাইয়া একটুখানি জড়সড় হইয়া উঠিয়া, সঞ্জীবের পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিল। সঞ্জীব কি যেন একটা বলিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহার মুখ-চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল; কোন কথাই বলিতে পারিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া বরাবর অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে স্নানাদি সারিয়া সঞ্জীব যখন উপরের ঘরে আসিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, সেই সময় রাধারাণী জলখাবারের কাঁসি লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল,—"ওরা চলে' গেছে?"

"ওরা কারা? তোমার মাসি চলে' গেছেন; আর সরসী ঠাকুরঝি যে আমার কাছেই থাকবে!"

সঞ্জীব বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল। রাধারাণী কহিল,—"সেই সেদিন গঙ্গা নাইতে নিয়ে গিয়েছিলে; নাইতে নাইতে ওঁদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় হয়ে গেল। তোমাকে একেবারে চম্‌কে দেবো বলে' সে সব কিছু বলি নি! তা, ওর মা তোমার কি রকম মাসি হন্‌ গা?"

"কি-রকম আবার? পাড়া সম্পর্কে ডাক্‌তুম, ঐ পর্য্যন্ত!"

"সরসী ঠাকুরঝি বুঝি খুব কম বয়সে বিধবা হয়েচে?"

"হ্যাঁ।"

"আহা! ··তা, বিধবা মানুষ, ছেলেপুলেও নেই, আমার এখানে থাকা ওরও সুবিধে, আমারও সুবিধে! কি বল?"

"তা—মন্দ কি?"

"যাই, দেখি কি কর্‌চে! ওমা, হাত গুটিয়ে বসে' রইলে যে? খেয়ে নাও!"

২

পরদিন সকালে উঠিয়া রাধারাণী দেখিল, বামুন-ঠাকুর আসে নাই। ঝি উনানে আগুন দিয়া বসিয়া আছে। রাধারাণী তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিতে নামিল। সরসী কহিল,—"বড্ড তাড়া যে। কেন বল দেখি?"

রাধারাণী কহিল,—"দেখ্‌চ তো তাই বামুন ঠাকুরের আক্কেলটা! এত বেলা হয়ে গেল—"

সরসী কহিল,—"তা বেশ তো! আমার হাতে খেতে কর্ত্তা-গিন্নী কারু আপত্তি আছে?"

"বা-রে! মোটে কাল তুমি এখানে এসেচ, আর আজই বুঝি তোমার দিয়ে হাঁড়ি ঠেলিয়ে নেব?"

"নইলে আমি বুঝি এখানে বসে'-বসে' গিল্‌ব? যাও গো যাও! আমার এই কাপড় কাচা হ'য়ে গেল, কোথায় কি আছে আমায় দেখিয়ে দাও, আমি সব ঠিক

করে' নিচ্চি। কর্ত্তার কষ্ট হবে না, সে ভাবনা তোমার নেই।"

"দূর, তাই বুঝি? কিন্তু—"

"ফের 'কিন্তু'? ওগো ঠাক্‌রুণ, হাঁড়ি ঠেল্‌বার সময় তোমার নয়। এখন শুধু—"

"কি?"

"তাও বলে' দিতে হবে? এখন শুধু কর্ত্তা-গিন্নীতে মুখোমুখি হ'য়ে সোহাগ করবার দিন!"—রাধারাণীর মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সরসী কাপড় কাচিয়া উঠিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। রাধারাণী কহিল,—"তাহ'লে আমি ওপরে গিয়ে চুল ক'টা খুলে একটু তেল মেখে আসি, অনেকদিন চান্ করি নি!"—বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

প্রতিদিন ভোরের সময়টায় সঞ্জীব একগাছি ছড়ি লইয়া বেড়াইতে বাহির হইত; ভ্রমণান্তে বাড়ী ফিরিয়া উপরে উঠিবার পূর্ব্বে রান্নাঘরে উকি মারিয়া কহিল,—"রাধু!"

রাধারাণীর একখানি শাড়ী পরিয়া সরসী যে পিছন ফিরিয়া নতমস্তকে কায করিতেছিল, এতটা অনুমান করিয়া লওয়া সঞ্জীবের পক্ষে সহজ নহে। সরসী মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই সঞ্জীব একটু দ্বিধায় পড়িয়া গেল। সরসী কিন্তু দিব্য সপ্রতিভভাবে তাহার সহিত চোখো-চোখি চাহিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল,—"বৌ ওপরেই আছে।"

"ওঃ!"—বলিয়া চলিয়া যাইতে-যাইতে সঞ্জীব যেন কতকটা সৌজন্যবোধেই মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আজ বামুন আসে নি?"

সরসী কহিল,—"না। বৌ রাঁধ্‌তে আস্‌ছিল, আমি জোর করে' ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

কথাগুলার ভিতর বিশেষ কিছু না থাকিলেও সেগুলি উচ্চারণ করিবার ভঙ্গীতে সরসী যেন একটু পরিহাস করিল বলিয়া মনে হইল। সঞ্জীব শুধু একটু হাসিয়া উপরে চলিয়া গেল।

স্বামীকে দেখিয়া রাধারাণী কহিল,—"দেখ্‌চ তো, সরসী ঠাকুরঝিকে আস্‌তে না আস্‌তেই রাঁধ্‌তে দিয়েছি! কি কর্‌বো বল! কিছুতেই আমায় ওখানে যেতে দিলে না।"

সঞ্জীব স্ত্রীর চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া আদর করিয়া কহিল,—"তা সত্যিই ত! এই রূপ কি আর হাঁড়ি ঠেল্‌বার জন্তে তৈরী হ'য়েছিল?"

সেইদিন বৈকালে সঞ্জীব কাছারি হইতে ফিরিয়া স্নানাদি সারিয়া প্রসাধন করিতেছিল, এমন সময় পায়ের শব্দে ফিরিয়া দেখিল, খাবারের রেকাবি লইয়া সরসী। সরসী হাসিয়া কহিল,—"খুব রাগ হচ্চে, নয়? রোজ যে সময়টাতে রাধু যত্ন করে' খাবার দিতে আসে, আজ সেখানে কি না—"

সরসীর কথায় সঞ্জীব একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে চিরুণী-ব্রুস রাখিয়া চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িতে সরসী কহিল, "ওকি, চুল তো ভাল ফির্‌লো না!"

"ওই বেশ হ'য়েচে!"

সরসী নির্লজ্জার মত সঞ্জীবের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ হানিয়া কহিল,—"কিন্তু, আগে হ'লে ঐ চুলে কখনও মন উঠ্‌তো না!"

সঞ্জীবের মুখখানা হঠাৎ দুই কর্ণমূলে পর্য্যন্ত তাতিয়া উঠিল। সরসী চোখ ঘুরাইয়া কহিল,—"ভয় কি, রাধু তো আর এ সব কথা শুন্‌তে আস্‌চে না! খুব লজ্জা যাহোক্!" বলিয়া মাথার কাপড়টা আর একটু তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

আহার-সামগ্রী যেমন সাজান ছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল; সঞ্জীবের আহার করিবার বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না। সরসীর এই নির্লজ্জ ব্যবহারে সে এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে বুঝিতে পারিতেছিল না এখন সে কি করিবে! রাগে তাহার গা জ্বালা করিতেছিল; কিন্তু সেটা সরসী কি রাধারাণী কাহার উপর বেশী তাহা নিজেই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সে হতভম্বের মত সেই চেয়ারে চোখ বুজিয়ে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রাধারাণী ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল,—"কি হ'ল? খাওয়া-দাওয়া নেই, অসময়ে কার ধ্যান ক'রতে বসে গেলে গো?"

সঞ্জীব চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে কহিল,—"আমার ক্ষিদে নেই।"

"কেন, কি হয়েচে?"

সঞ্জীব গম্ভীরভাবে কহিল,—"হবে আর কি? খাবারটা এনে দেবার ফুরসৎও যদি তোমার না থাকে—"

"বাবা! রাগ হয়েচে বুঝি? নীচে বসে সেই সেমিজটা শেষ করছিলুম, তাহাতেই তো সরসী ঠাকুরঝিকে বল্লুম!...আচ্ছা, ঘাট হয়েচে; খাও!"

রাধারাণী জোর করিয়া স্বামীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আহারের সামনে বসাইয়া দিল।

৩

তারপর আর কয়েকদিন সরসীর ব্যবহারে সঞ্জীব কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিল না—তাছাড়া, সে দিনের পর হইতে সে নিজেও যেন যতটা সম্ভব তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু, বাড়ীর এই দুইটী লোকের মনের ভিতর যে এমনি একটা গোলযোগ চলিয়াছে, রাধারাণী তাহা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিতে পারিল না। সরসীর ব্যবহার তাহার নিকট বেশ লাগিত। তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সে তৃপ্তিই অনুভব করিত।

সেদিন রাধারাণী স্বামীকে কহিল,—"ওগো, আজ ছোট পিসিমার বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল; কাল সকালে আমার সেখানে যাবার জন্যে অনেক করে, বলে গেছে! কি হবে?"

সঞ্জীব শুনিয়াছিল, রাধারাণীর এক পিসিমা এই কলিকাতায় থাকেন। সে কহিল,—"তা' বেশ, যেও না! কালই আবার আসবে ত?"

"তা আসবো বৈকি! তা'হলে, তোমাকে কাছারী পাঠিয়ে তবে আমি যাব; কেমন?"

"আচ্ছা।" এবং পরক্ষণেই সে মনে মনে দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল,—নিশ্চয়ই। কাছারী যাওয়ার আগে রাধারাণীর কিছুতেই যাওয়া হইবে না। ঐ বেহায়া সরসী যে তাহাকে আহার করিতে দিবে, সে ভারি বিশ্রী!

পরের দিন সঞ্জীব যথাসময়ে কাছারী গেল বটে, কিন্তু বাড়ী ফিরিল অনেক দেরী করিয়া। সে মনে করিয়াছিল, সন্ধ্যা তো হয়-হয়, এতক্ষণ রাধারাণী অবশ্যই বাড়ীতে ফিরিয়াছে। কিন্তু, বাড়ী আসিয়াই সে নিরাশ হইল। তখন ধীরে ধীরে উপরে গিয়া পোষাক ছাড়িয়া ইজি চেয়ারে চুপটী করিয়া পড়িয়া রহিল। মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল, পুরুষ হইয়া জন্মিয়াও সে এমনি নারীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে কেন? সরসী তাহার কি করিতে পারে? কিন্তু একবার জোর করিয়া এই কথাটা মনের ভিতর খাড়া করিয়া ধরিলেও পরক্ষণে তাহা সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িল। এমনি করিয়া যখন নিজের মনেই সে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, সেই সময় পিছন হইতে চাপা হাসির উচ্ছ্বাস শুনিয়া চমকিয়া উঠিল।

সরসী কহিল,—"একটী বেলা না দেখেই এই অবস্থা! মুখ হাত ধুয়ে নাও, খাবার এনে দিই।"

সঞ্জীব একবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"হ্যাঁ—না,—আমি তো কিছু খাবো না।"

সরসী কহিল,—"কেন, আমার হাতে খেলে জাত যাবে, তারই ভয় নাকি?"

সঞ্জীব বিরক্ত হইয়া কহিল,—"কি যে বল তুমি, বুঝতে পারিনে! তোমার হাতের কি না খচ্চি?"

সরসী মেঝের উপর ভাল করিয়া বসিল। বলিল,—"তবে? খাব না বল্চো যে? আমাকে এত ভয় কিসের শুনি? অথচ, একদিন—"

বাধা দিয়া সঞ্জীব তাহার দ্রুত প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—"সে কথা ছেড়ে দাও। মানুষের জীবনে বদল হয়েই থাকে, সেটা খুবই স্বাভাবিক!"

এমনভাবে বাধা পাইয়া সরসীও যেন একটু দমিয়া গেল। তার মুখখানা আপনা-আপনি নত হইয়া পড়িল। সঞ্জীব এই সুযোগে পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তিরস্কার করিয়া কহিল,—"সত্যি বল্‌চি, তোমার এই বেহায়ার মত ব্যবহার অন্য কারু কাছে দূরে থাক্, আমারই চোখে ভারি বিশ্রী ঠেকে!"

ধাক্কা খাইয়া সরসীর বুকের ভিতর বিদ্রোহের ঝড় বহিল। সে সোজাসুজি সঞ্জীবের মুখের উপর চোখ তুলিয়া কহিল,—"কেন শুনি? রাধারাণীর ভয়ে? নইলে, একদিন এই বেহায়াপনার চূড়ান্ত দেখিয়েছিল কে?"

প্রথমটা সঞ্জীবের মুখ দিয়া ইহার কোনরূপ প্রত্যুত্তর বাহির হইল না। সে মুহূর্ত্তমাত্র তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া অর্দ্ধ-স্ফুটকণ্ঠে কহিল,—"কি অবধ! সেই জন্যেই তোমাকে এখানে রাখতে আমার একবিন্দু ইচ্ছা ছিল না!"

সরসীর মুখচোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই কিছুক্ষণ আগে যে চোখদুটী 'ভুবন-ভুলান' কটাক্ষ হানিতেছিল, হঠাৎ যেন সে দুটি সঞ্জীবের উপর স্থির নিবদ্ধ হইয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। সে বলিল,—"সে কথা আমিও জানি...কিন্তু, তবু যে বৌকে বারণ করবার সাহস তোমার হবে না, তাও বুঝেছিলুম।"—বলিতে বলিতে সরসী সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। খুব লম্বা একটা নিশ্বাস টানিয়া নিয়া সে পুনরায় কহিল,—"তুমি ভাবচ, তোমার লোভেই বুঝি আমি তোমার বাড়ীতে এসে বসেচি! কিন্তু, তা নয়—পেটের দায়ে। আর যেখানে দাসীগিরি কর্‌তে হোক্, তোমার কাছে কখনো আস্‌তুম না...কিন্তু, তবু যে কেন এলুম, সে কথা আজ নয়, একদিন বুঝিয়ে দেবো!"—বলিয়া সরসী মাথার স্খলিত কাপড়টুকু আবার তুলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সঞ্জীবের যেন হাত পা নাড়িবার ক্ষমতাটুকুও চলিয়া গিয়াছিল। যেন, সরসীর বিষাক্ত নিশ্বাস তাহাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় যখন রাধারাণী বাড়ী ফিরিল, তখনও সঞ্জীব ঠিক সেইখানে তেমনি করিয়া বসিয়া। রাধারাণী হাসিতে হাসিতে স্বামীর হাত খানি টানিয়া কহিল,—"রাগ হয়েছে বুঝি? কি করবো বল! কতদিন পরে দেখা পিসিমা ছাড়তে চান না!"

সঞ্জীব হাঁ না কোন উত্তরই দিল না। খানিকক্ষণ পরে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত রাধারাণীর হাত খানি বুকে চাপিয়া কহিল,—"আমি ভেবেছিলুম, আজ আর তুমি আস্‌বে না।"

রাধারাণী সলাজ হাসি হাসিয়া কহিল,—"পাগল! তোমায় ফেলে কি আমি থাকতে পারি?"

৪

সঞ্জীব কিন্তু ভয়ানক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। দিনরাত ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিয়াছিল, যেমন করিয়া হোক্, সরসীকে এখান হইতে বিদায় করিতেই হইবে। কিন্তু কি করিয়া হঠাৎ কথাটাকে রাধারাণীর নিকট পাড়িবে? তাহার মনে হইতেছিল, এখন অকস্মাৎ এই কথাটা বলিতে গেলে তাহার নিজের ভিতরের গলদটুকুই তাহার কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং, বাধ্য হইয়া সঞ্জীবকে অপেক্ষা করিতে হইল।

কিন্তু, রাধারাণী নিজেই অপ্রত্যাশিতভাবে সঞ্জীবের ঈপ্সিত সুযোগ ঘটাইয়া দিল। হঠাৎ সেদিন সে স্বামীর নিকট কহিল,—"দেখ, সত্যি বল্‌চি, সরসী-ঠাকুরঝিকে আমি যতটা শ্রদ্ধা করতুম আজ তার অনেকখানি কমে গেল।"

সঞ্জীব হঠাৎ অত্যধিক মনোযোগের সহিত কহিল, "কেন বল দেখি?"

রাধারাণী কহিল,—"আজ দুপুরবেলা আমার সঙ্গে খু-ব তর্ক হয়ে গেল। কাগজে একটা খবর বেরিয়েচে দেখনি,—কোন্ একটা বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে

হচ্ছে? তা, সরসী ঠাকুরঝি বলে কি জান? বলে বিধবার বিয়ে খুব ভাল!—আমি তো শুনে অবাক্! কি ঘেন্নার কথা! নিজে বিধবা হ'য়ে ও কথা মুখে আন্‌লে কি ক'রে?—আমি একটু ঠোক্কর দিতে সে বল্লে, 'আমার কিন্তু আর কারু কথা তো হচ্ছে না! তবে, যার বিয়ের ইচ্ছে আছে, সে কেনই বা বিয়ে করবে না? লোভে পড়ে' খারাপ হওয়ার চেয়ে সে তো ঢের ভাল!'...জানিনে মা, কি মন ওর! আমার তো শুনে অবধি মনটা এম্‌নি খারাপ হ'য়ে আছে কি বল্‌ব!"

সঞ্জীব কথাটাকে চাপা পড়িতে দিল না। হঠাৎ বলিয়া বসিল,—"তা তো বল্‌বেই ও! ওর অনেক কীর্ত্তির কথাই তো শোনা আছে!"

রাধারাণী আকাশ হইতে পড়িল।—"সে কি গো?"

"সে অনেক কথা! সে সব শুনে তোমার আর কায নেই! সেই জন্তেই তো ওকে স্থান দিতে আমার একফোঁটা মন ছিল না। তুমি রাখলে, আর কি বল্‌বো!"

"তুমি যদি সব জান, তো আমায় একবার বল্লেও না! বেশ মানুষ তো! না, সত্যি বল! তাহ'লে কিন্তু আর ওকে এখানে রাখতে আমার মন সরে না!"

সঞ্জীব জোর করিয়া বলিল,—"তা তো উচিতও নয়, কিছুতেই নয়! ওরকম কুলটাকে ঘরে জায়গা দেওয়া কি উচিত?"

যাহার বিরুদ্ধে স্বামীস্ত্রীর ভিতর এই আলোচনা চলিতেছিল, সেই মানুষই যে বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাগুলা শুনিতেছিল, তাহা কিন্তু কেহই একবার সন্দেহ পর্য্যন্ত করে নাই।—তখন রাত্রি গভীর। সরসী নিজের মনে পুড়িতে পুড়িতে শোবার ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। পড়িয়া পড়িয়াও সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, এমন একটা কিছু সে করিতে পারে, যাহাতে সংসারের এই পুঞ্জীভূত অত্যাচারের সমস্ত গ্লানি সঞ্জীবেরই মুখে-চোখে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলেই বরং তাহার এই অন্তর্দ্দাহ কতক পরিমাণে শান্ত হইতে পারে! ঐ যে লোকটা তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া এখন সাধু সাজিয়া তাহার বিচার করিতে বসিয়াছে, উহাকে সরসী কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না,—কিছুতেই না!......

সারারাত সরসী ঘুমাইতে পারিল না। প্রভাতে উঠিয়া যখন সে নীচে নামিল, তখন তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া রাধারাণী চমকিত হইল। কাল রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, কেমন করিয়া তাহা সরসীকে শুনাইয়া দিবে, তাহা লইয়া সে সমস্যায় পড়িয়া গেল। কিন্তু সে সমস্যা সরসী নিজেই ভাঙিয়া দিল। হঠাৎ একসময় সে কহিল,—"এ বেলা আমি এইখানেই থাকি, তারপর ওবেলা চলে যাবো'খন। কি বল?"

রাধারাণী বিস্ময়ে সঙ্কোচে একেবারেই জড়সড় হইয়া পড়িল। কোন কথাই তার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার সরল তরুণ মনখানি মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া এই হতভাগিনীর প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। এবং সরসীর মুখ দেখিয়া, কোন কথা বলিবার আর তার সাহস রহিল না। কাল রাত্রে যে পরামর্শ তারা নিজেরাই করিয়াছে, এবং সরসী যে কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছে, আজ হঠাৎ তাহার উল্টা কথা বলিতে গেলে মুখরা সরসী না-জানি কি বলিয়া বসিবে! এই দ্বিধায় পড়িয়া রাধারাণীর কান্না আসিতে লাগিল।

৫

আজ কাছারী হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে পা দিয়াই সঞ্জীবের মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। সারা বাড়ীখানা নিস্তব্ধ। সে বুঝিল, সরসী সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। কথাটা মনে করিতেও তার বুকের ভার অনেকটা কাটিয়া গেল। উপরে উঠিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মেঝের উপর রাধারাণী

নিস্পন্দ অবস্থায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সঞ্জীব তাহাকে ডাকিতেই রাধারাণী চকিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কি-কতকগুলা কাগজ বুকের কাছে লুকাইয়া ফেলিল। সঞ্জীব হাসিমুখে খপ করিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"কি লুকোচ্চ দেখি না?"

কিন্তু রাধারাণী তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিতেই সঞ্জীবের সে হাসি অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। তার মুখখানি চোখের জলে ভিজিয়া যেন একটা শিশিরে ভেজা বাসি গোলাপের মত দেখাইতেছিল। এ ক্রন্দনের কারণ সঞ্জীব সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। রাধারাণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"সে চলে' গেছে।"

সঞ্জীব যেন জোর করিয়া কথা কহিল,—"তা, তার জন্যে তুমি কাঁদচো কেন?"

রাধারাণী স্বামীর মুষ্টি হইতে নিজের হাত খানি মুক্ত করিয়া কহিল,—"তুমি কাপড়-চোপড় ছাড়, সব বল্‌ব।"

একটা দারুণ সন্দেহের অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া সঞ্জীবের মন তখন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। সে কোন রকমে কাছারীর পোষাক বদ্‌লাইয়া পুনরায় স্ত্রীর নিকট আসিয়া দেখিল,—রাধারাণী তখন চোখের জল মুছিয়া বসিয়া স্থিরদৃষ্টিতে একখানা চিঠির দিকে চাহিয়া আছে। স্বামীকে দেখিয়া কহিল,—"আমার কেবলি কান্না আস্‌চে যে, তাকে আমি বিনাদোষে বিদেয় করেচি! এই দেখ, কি তখন লুকিয়েছিলুম!"—বলিয়া এক-একখানি করিয়া পাঁচ পাঁচ-ছয় চিঠি সঞ্জীবের চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সঞ্জীবের মুখখানা মুমূর্ষুর মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। এ সব চিঠিগুলি যে সঞ্জীবই একদিন সরসীকে লিখিয়াছিল! ইহার প্রত্যেকখানিতে সেই বিগত দিনের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির কত অকাট্য প্রমাণ মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে! পাপিষ্ঠা সরসী কি তাহা হইলে এই চিঠিগুলা রাধারাণীকে দিবার জন্যই এখানে লইয়া আসিয়াছিল?...সঞ্জীবের মনের ভিতর যে কাল বৈশাখীর ঝড় বহিতেছিল, তাহারই দাপটে যেন তাহার দেহের প্রতি অণুপরমাণু পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, এইক্ষণে সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। রাধারাণীর চোখের সম্মুখে নিজের পাপ-প্রণয়ের এই বিষাক্ত প্রমাণগুলা লইয়া বসিয়া থাকার চেয়ে বড় শাস্তি সে বোধ করি আর কিছু কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। আজ যেন এক অভ্রভেদী সত্য হঠাৎ সঞ্জীবের চোখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল; সরলা বাল-বিধবাকে প্রলোভনে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া সে যে অপরাধ করিয়াছিল,—আজ—এতদিনে তাহার শাস্তি আরম্ভ হইয়া গেল। আবার সেই হতভাগিনীকেই আজ সে কুলটা বলিয়া তাহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে! তাহার অন্তরাত্মা বারংবার চোখ রাঙাইয়া শাসাইতে লাগিল,—এ অন্যায়! এ ঘোরতর অন্যায়!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

আঁধার দুরিয়া জাগে অরুণ-কিরণ,
সুনীল গগন-বুকে ছড়ায় হিরণ।
রাত্রি শেষ, পাখী গাহে, টুটে নীরবতা
ভাষাহীন কণ্ঠে জাগে সুর শতকথা।

সুপ্ত জাগে, শুষ্ক গাহে; পুলকের ধারা
বিশ্বের আলোকস্রোতে হ'য়ে যায় হারা।
আঁখি মেলি' জেগে ওঠে স্ফুট পুষ্পদল,
স্নান করে দিবালোক, অশ্রু-টলমল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোরের কথা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অভিযান।

১৫ই নভেম্বর (১৯১৫) দ্বিপ্রহরে আজিজিয়া হইতে যাত্রা করিয়া সেদিন বৈকালে প্রায় সূর্য্যাস্তের সময় আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত এল্-কুটনিয়া নামক গ্রামে পৌছিলাম। গতবারের নৈশ অভিযানের সময় রাত্রে চারিদিকের দৃশ্যাবলী দেখিতে পাই নাই; এখন দেখিলাম যে আমরা পূর্ব্ব বৎসরের কর্ষিত শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। প্রায়ই শুষ্ক জলের নালা অতিক্রম করিতে হইল। শীতকালে বর্ষার সময় এগুলি জলপূর্ণ হইবে এবং নদীর জল স্ফীত হইলে এই নালাগুলি দ্বারা ক্ষেত্রে জল নীত হইবে। আমরা বাগদাদ অভিমুখ কাঁচা রাস্তার নিকট দিয়া চলিতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে রাস্তার অতি নিকটে বামপার্শ্বে শরবনের জঙ্গল দেখিয়া অনুমান করিয়া লইলাম শীতকালে জল-প্লাবনের সময় নদীর জল কতদূর বিস্তৃত হয়। রাস্তাটি নদী হইতে প্রায় তিনপোয়া মাইল দূরে অবস্থিত। এল-কুটনিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া আমরা বিশ্রামের অনুমতি পাইলাম। তাহার পূর্ব্বে ক্যাম্পের অবশ্য প্রয়োজনীয় সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া লইতে হইল। সফরের সময় সিপাহীদের বিশ্রাম অর্থে আরাম করা নয়।

আমাদের পূর্ব্বেই আর দুটি ব্রিগেড এল্-কুটিনিয়াতে তাঁবু ফেলিয়াছিল। আমরা তাঁবু ফেলিবার অনুমতি পাই নাই সুতরাং মুক্ত আকাশের তলে বিভোয়াক্ (নৈশবিশ্রাম) করিতে হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে কার্ণেল সাহেব আমাদিগকে ড্রিল অভ্যাস করিতে আদেশ দিলেন। আমরা ক্যাম্পের বাহিরে ড্রিল করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় দেখিলাম যে আমাদের ব্রিগেড ষ্টাফ ক্যাম্প পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। আমরা 'আইজ্ রাইট্' বা ডাইনে চোখ করিয়া সেলাম দিয়া চলিয়া যাইতেছি এমন সময় জেনারেল ডিলামেইন (Delamain) স্বয়ং হল্ট করিবার হুকুম দিলেন। সেনাপতি চম্পটীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তিনি আমাদের সুখ্যাতি শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন এবং তিনি বিবেচনা করেন যে আমরা যুদ্ধে কার্য্য করিতে আসিয়া বেশ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছি। ব্রিগেড সেনাপতির নিজমুখের প্রশংসা শুনিয়া আমরা স্ফীতবক্ষে ক্যাম্পে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আজিজিয়া হইতে ৩০শ সংখ্যক ব্রিগেডটি আমাদের পূর্ব্বে জেনারেল গরীঞ্জের সহিত আসিয়াছিল। ইহারা ইউফ্রেটীশ বিভাগে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। এখন নেতা জেনারেল স্যর চার্লস্ মেলিস্ ভিংসি। ইনি অসাধারণ শৌর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। অনেক সময় একটি সিপাহী দলের আত্মবিশ্বাস (morale) তাহাদের নেতার সুনামের উপর নির্ভর করে। নেপোলিয়নের সৈন্যদলে এইটি বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইত।

১৬ই নভেম্বর অপরাহ্ণে আমরা আদেশ পাইলাম যে বৈকালে ৫টার সময় সমগ্র অ্যাম্বুলেন্সের লোকদিগের সহিত ফল্ ইন্ করিতে হইবে; কারণ প্রধান সেনাপতি স্যর জন নিক্সন বাহিনী পরিদর্শন করিবেন। আমরা বেলা ৪॥টিকার সময় অনড্রেস্ অর্ডারে (কোমরবন্ধ খুলিয়া) ফল্ইন্ করিলাম। সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠে দেখা দিলেন এবং এক একটি শ্রেণীর সম্মুখে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "আচ্ছা খানা মিল্‌তা হায়? তাক্‌রা হায়?" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য সর্ব্বত্রই সন্তোষজনক উত্তর প্রদত্ত হইল। আমাদের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কারা? মেজর ল্যাম্বার্ট উত্তর করিলেন—বেঙ্গলিজ্। সেনাপতি বলিলেন, হাঁ

ইহাদের কথা শুনিয়াছি। পরে আমাদের পুরোবর্ত্তী চম্পটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Enough to eat and enough to do?" অর্থাৎ আমরা যথেষ্ট খাইতে ও কার্য্য করিতে পাইতেছি কি না। চম্পটী বলিলেন যে যথেষ্ট খাইতে পাইতেছি কিন্তু কায যথেষ্ট নয়। সেনাপতি উচ্চ হাস্যে বলিলেন যে শীঘ্রই পাইবে।

এল্-কুটনিয়া পৌঁছানর পরই সাবধানতার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের চারিদিকে ট্রান্সপোর্ট গাড়ীগুলি ও ঘাসের বেল গুলি সাজাইয়া রাখা হয় যাহাতে ক্যাম্প সহসা আক্রান্ত হইলে কেহ আহত না হইয়া পড়ে। অধিকাংশ কর্ম্মচারী সুরক্ষিত স্থানে শয়ন করিতেন; সিপাহীরাও রাত্রে শয়নের জন্য বড় বড় 'ডাগ্ আউট্' (গর্ত্ত) খনন করিয়া লইয়াছিল। আমরা দ্বিতীয় রাত্রে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিবার সময় দেখিলাম যে জেনারেল মেলিস্ উন্মুক্ত ও অরক্ষিত স্থানে তাঁহার ক্যাম্প খাটিয়ায় শয়ন করিয়া আছেন, নিকটে সঙ্গীন-ধারী প্রহরী এবং কিছু দূরেই একটি ১৬ পাউণ্ডার কামানের উপর লতা গুল্ম প্রভৃতি চাপাইয়া একটি গোলন্দাজ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নদীর অপর পারে তাকাইয়া বসিয়া আছে। পরে শুনিলাম যে জেনারেল মেলিস্ অতি সাবধানতার পক্ষপাতী নহেন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে অদৃষ্টবাদী।

সে দিন বৈকালে এয়ারোপ্লেন আসিয়া খবর দিয়াছিল যে একটি ছোট শত্রুদল নদীর অপর পার দিয়া চলা-ফেরা করিতেছে। অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া এক ডবল কোম্পানী ভারতীয় পদাতিক নদী পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যায় এবং দুটি কামান নদীর তীরে আনয়ন করা হয়। কামান দুটিকে গোপন করিবার জন্য তাহাদের উপর কাঁটা গাছ ও নদীর জলজ উদ্ভিদ রাখা হয়। সে রাত্রে আমরা ঘুমাইয়া আছি এমন সময় বন্দুকের শব্দে জাগরিত হইয়া উঠিলাম। মাথার উপর দিয়া কয়েকটি গুলি ভ্রমর গুঞ্জনে চলিয়া গেল। আওয়াজে বুঝিলাম যে গ্রাম বাসী বেদুইনরা গুলি চালাইতেছে। তুর্কি রেগুলার পল্টনের বুলেট ইহা অপেক্ষা মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ আওয়াজ করিয়া থাকে। আমাদের সিপাহীরাও, যাহারা বৈকালে নদী পার হইয়া গিয়াছিল, গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। আরবীদের বন্দুকের আলোক দেখিয়া, আমাদের অতি নিকটস্থ ফায়ার ফ্লাই নামক মনিটর শ্রেণীর নদীগামী মানোয়ারী জাহাজ হইতে দুইটি ৪ইঞ্চি শেল্ নিক্ষেপ করা হয়। ফায়ার ফ্লাইয়ের কামানের আওয়াজের পর এত শীঘ্র আরবীদের বন্দুক চালান থামিয়া গেল যে, আমরা ঘটনাটিকে ক্লাশে শব্দায়মান ছাত্রদের উপর হেড মাষ্টারের হুমকির সহিত তুলনা করিলাম।

১৯শে নভেম্বর বেলা ৯টার সময় আমাদের ফৌজ এল্-কুটনিয়া ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল। অসুস্থতার জন্য এ দিন আমি প্রথম দলের সহিত যাইতে অনুমতি পাইলাম না। কার্ণেল বলিলেন যে আমাকে সেকেণ্ড লাইন অফ ট্রান্সপোর্টের সহিত যাইতে হইবে। সিপাহীরা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে তখন তাহাদের রসদ ও অন্যান্য মালামাল লইয়া ও মালবাহী গাড়ী গুলির সহিত একদল সিপাহী তাহাদের প্রায় তিন মাইল পশ্চাতে অবস্থান করে। ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের প্রধান হাঁসপাতাল এই দলটির সহিত অবস্থান করে এবং এই স্থান হইতেই ক্লিয়ারিং হস্পিটাল ও হসপিটাল ট্রান্সপোর্টের লোকেরা আহত সিপাহীদিগকে বেস্ (base) ও ষ্টেশনারি হাঁসপাতালে লইয়া যায়।

বেলা ১টার সময় রওনা হইয়া রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমাদের লাইন ক্যাম্প জিউর (Zeur) নামক স্থানে পৌঁছে। প্রধান দলটি সন্ধ্যা ৬টায় সেস্থানে পৌঁছিয়াছিল। রাত্রে অন্ধকারে তাহাদের অবস্থান বুঝিতে না পারিয়া আমাদের দলটি ভিন্ন পথে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিল। রাত্রি ৮টার সময় প্রধান দলটি চারটি হাউই ছুড়িয়া তাহাদের অবস্থান আমাদের জ্ঞাপন করে এবং আমরা তাহা দেখিয়া ক্যাম্পে পৌঁছিতে পারি।

ক্যাম্পে পৌঁছিবার কিছুপরে একটি হাস্যজনক

ঘটনা হয়। আমরা তখনও ডিস্‌মিসের হুকুম পাই নাই। প্রতি রেজিমেণ্ট হইতে এক একজন অফিসার নিজের লোকদের লইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ডিসমিসের হুকুমের পর আমরা ক্যাম্পে যাইতেছি এমন সময় একজন সাহেব কর্ম্মচারী বিনোদ চট্টোপাধ্যায়কে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন "এই গুর্খা যোয়ান্ সব ইধার আও।" বিনোদ প্রথমে ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া একটু হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। পরে যখন বুঝিল যে,সাহেবের ভুলের জন্য আমাদের মাথার গুর্খার টুপি গুলিই দায়ী, তখন সে ইংরাজিতে বলিল যে আমরা গুর্খা নই বাঙ্গালি। সাহেবটি একটি ক্রুদ্ধ শপথ উচ্চারণ করিয়া চলিয়া গেল।

আমরা ক্যাম্পে পৌছিয়া আহারাদির আয়োজন করিয়া নদীতে স্নান সমাধা করিয়া লইলাম। নদীতীর তখন বহুসংখ্যক ষ্টীমারে পরিপূর্ণ, তাহাদের উপরিস্থিত বেতার টেলিগ্রাফের যন্ত্রের ঝঙ্কারে মুখরিত।

ক্যাম্প জিউরে তুর্কিরা একটি মাত্র গভীর ও প্রশস্ত খাত কাটিয়া অবস্থান করিতেছিল। আমাদের তোপ চলিবার কিছু পরেই তাহারা স্থানটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ২০শে নভেম্বর অতি প্রত্যুষে আমরা জিউর ত্যাগ করিয়া সেইদিন বৈকাল ৩টার সময় ক্যাম্প লজ্জ (Lajj) নামক স্থানে পৌছিলাম। আজিজিয়া হইতে এল্ কুটনিয়া ৭ মাইল, এল্ কুটনিয়া হইতে জিউর ৮ মাইল এবং জিউর হইতে লজ্জ্ ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। সব গ্রাম গুলিই নদীতীরস্থ। নদীতীর অথবা প্রচুর পানীয় পাওয়া যাইতে পারে এরূপ স্থান ব্যতীত একটি বিরাট বাহিনীর শিবির সন্নিবেশ সম্ভবপর নহে।

ক্যাম্পে পৌছানর পরই আমি সেকেণ্ড লাইন অফ ট্রান্স পোর্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়া পুনরায় প্রধান দলে আসিয়া যোগদান করিলাম। আমার স্থানে প্রাইভেট নারায়ণদাস গাঙ্গুলি সেকেণ্ড লাইন অফ ট্রান্সপোর্ট যাইতে আদিষ্ট হইল। আমরা এই স্থানে শুনিতে পাইলাম যে, আমরা তুর্কিদের প্রধান ঘাটির অতি নিকটে আসিয়াছি। আমাদের সহগামী বহুসংখ্যক ষ্টীমার ছিল তাহারা এইস্থানে নঙ্গর ফেলিয়া প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ সম্ভার নামাইয়া দিল। নদীর তটভূমি তাঁবুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মালবাহী ও হাঁসপাতাল ষ্টীমার ব্যতীত আমাদের সঙ্গে ফায়ার ফ্লাই, কমেট, সাইতান, মার্শামর, সুমানিয়া নামক কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি বর্ম্মাবৃত নদীগামী যুদ্ধজাহাজ ছিল। ইহা ব্যতীত কয়েকটি ফ্ল্যাটে নৌযুদ্ধের দীর্ঘাকৃতি কামান বসান হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আনীত ষ্টীম লঞ্চগুলি এই কামানের নৌকা বা ভাসমান তোপখানা গুলি টানিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

ক্যাম্পে পৌছিবার কিছু পরে কাপ্তেন ম্যাক্‌রেডি আসিয়া চম্পটীকে বলিলেন যে শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে, আজও হইতে পারে কালও হইতে পারে, যদি বাঁচিয়া থাক তো বলিও কেমন দেখিলে। এই স্থানেই আমরা কাপ্তেন ম্যাকরেডির অদ্ভুত উপদেশ পাই যে, সম্মুখে শেল পড়িতে দেখিলে সেদিকেই ছুটিয়া যাইতে হয়, গোলা হইতে পলাইতে গেলে প্রাণে লাগিবার সম্ভাবনা বেশী। তাঁহার এই উপদেশ শুনিয়া আমরা চেষ্টা করিয়াও দন্তবিকাশ নিবারণ করিতে পারি নাই।

পরদিন আমরা বৈকাল পর্য্যন্তও ক্যাম্প লজ্জেই অবস্থান করিলাম। আমরা সেদিন উত্তমরূপে স্নান ও ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া লইয়, রান্নের প্রস্তুত খিচুড়ি আহার করিয়া, আমাদের রেশনটিন গুলি লুচি ও গুড়ে পূর্ণ করিয়া লইলাম এবং হ্যাভারস্যাক্ গুলি যতদূর সম্ভব হাল্কা করিয়া লইলাম। বৈকালে আদেশ পাইলাম যে সন্ধ্যা ৭টার সময় কুচ আরম্ভ হইবে এবং আমরা টেসিফোন স্থিত তুর্কিবাহিনী আক্রমণ করিব।

তুর্কিরা তখন লজ্জ হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে সুলেইমানপাক্ নামক গ্রামের নিকট সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহার অতি নিকটেই সম্রাট খসরুর বিজয় তোরণের ভগ্নাবশেষ

বর্ত্তমান এবং পুরাকালীন গ্রীক্ নগরী টেসিফোনের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। গ্রীক্ রাজধানী টেসিফোন এখন কতক গুলি মৃত্তিকা স্তূপে মাত্র পর্য্যবসিত। টেসিফোনের অতি নিকটে এই যুদ্ধটি হইয়াছিল বলিয়া ইংরাজেরা ইহাকে টেসিফোনের যুদ্ধ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তুর্কিরা ইহাকে সুলেইমান পাকের লড়াই বলেন। আমাদের হিন্দুস্থানী সিপাহীদের নিকটও এই যুদ্ধটি সুলেইমান পাকের যুদ্ধ বলিয়াই খ্যাত।

সন্ধ্যা ৭টার সময় আমরা কিটব্যাগগুলি মাল গাড়ীতে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া কুচ্ আরম্ভ করিলাম। এ রাত্রেও আমরা যতদূর সম্ভব সংগোপনে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। নভেম্বর মাসে। উন্মুক্ত স্থানে তাহার কঠোরতা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এবার আমাদের সহিত বৃটিশ ওয়ার্মার নামক গরম ভারি কোটগুলি ছিল বলিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে চলিতেছিলাম। আমরা মিটন্ বা পশমী দস্তানার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম না; কিন্তু এরাত্রে অত্যধিক শীতে বাধ্য হইয়া সেগুলি ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

আমরা যে স্থান দিয়া যাইতেছিলাম তাহা অন্যান্য বারের ন্যায় সমতল ভূপৃষ্ঠ নহে। স্থানটিতে বেশ একটু চড়াই উৎরাই দেখিতে পাইলাম এবং শুনিলাম আমরা স্যাণ্ড্ হিলের উপর দিয়া চলিয়াছি। কখনও সমতল কখনও ঐরূপ ঢেউ খেলান ভাব, এইরূপ স্থান দিয়া আমরা ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনও এরূপ স্থানে আসিয়া পড়িতেছিলাম যাহা সমতল অথচ বহুদূর হইতে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার উচ্চ টিলায় পরিবেষ্টিত। পরে শুনিয়াছিলাম সেগুলি পুরাকালীন গ্রীক্ আমলের জলাধার। বর্ষায় এগুলি জলপূর্ণ করিয়া সমগ্র বৎসরের কৃষি কার্য্য সমাধা হইত। গ্রীক্ আমলে কৃত্রিম উপায়ে সমগ্র নিম্ন মেসোপটেমিয়ার জল সেচনের আয়োজন ছিল বলিয়া সেকালে নিম্ন মেসোপটেমিয়া Granary of the East বা প্রাচীর শস্যক্ষেত্ররূপে পরিচিত ছিল। বহু শতাব্দীর পর মেসোপটেমিয়ার উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি চেষ্টা হইতেছিল এবং ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে ইউফ্রেটিশের নিকট হিন্দিয়া ব্যারেজ নামক বাঁধ প্রস্তুত হইতেছিল। তাহা সমাপ্তির কিছু আগেই যুদ্ধ হয়।

এইভাবে চলিয়া রাত্রি তিনটার সময় আমরা একটি সুদীর্ঘ টিলার উত্তরে হল্ট করিলাম। এই টিলাটীও নদীর জল ধরিবার জন্য প্রস্তুত একটি বাঁধ। আমরা সেখানকার নরম মৃত্তিকার উপর শুইয়া কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লইলাম। ৫টার সময় আমাদের সেকেণ্ড লাইন অব ট্রান্সপোর্ট আসিয়া পৌঁছিল। তখন অন্ধকার পাৎলা হইয়া গিয়াছে। আমরা গাড়ী হইতে শুক ঘাস নামাইয়া রেশন টিনে চা প্রস্তুত করিলাম এবং লুচি ও চা দ্বারা প্রাতরাশ সমাধা করিয়া লইলাম।

ভোর ছয়টার সময় আমাদের বাম দিকে তোপ্ চলিতেছে শুনিতে পাইলাম। তোপের আওয়াজ ক্রমেই ঘন ঘন ও গভীর হইতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে জেনারেল হাউটন (Houghton) তাঁহার ১৮ সংখ্যক ব্রিগেড লইয়া তুর্কি ব্যূহের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিয়াছেন। আমরা জেনারল ষ্টাফের এক আরবী দোভাষীর দূরবীণ দিয়া দেখিতে পাইলাম যে আমাদের ডান দিকে বহুদূরে তুর্কি অশ্বারোহীরা স্কাউটের কায করিয়া বেড়াইতেছে।

সকাল প্রায় ৭টার সময় আমাদের ১৬ ব্রিগেডের সিপাহীরা তাহাদের গরম কোট খুলিয়া মাটিতে রাখিয়া দিল এবং কোমরবন্ধ ও তোষদান শক্ত করিয়া আঁটিয়া লইল। পরে দীর্ঘ সরল রেখায় টিলাটি অতিক্রম করিয়া তুর্কি ব্যূহের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। সাতটার সময় আমাদের ব্রিগেডের কামানগুলি গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং তিন সহস্র রাইফেলের কড়্ কড়্ ধ্বনি শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিল যে, টেসিফোনের বিখ্যাত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

স্যার আশুতোষ

স্যার আশুতোষের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রক্তের সম্পর্ক নহে—একদিকে অগাধ স্নেহ, অন্যদিকে যৎসামান্য ভক্তি। যে কয়েকমাস তিনি পাটনায় ছিলেন, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতা হইতে পাটনার বাসায় পৌঁছিয়াই "যোগীনের ছেলেদের" কথা মনে করিয়া কলিকাতা হইতে আনীত দ্রব্যাদির শ্রেষ্ঠাংশ তাহাদিগকে প্রেরণ করিতেন। আপদ বিপদে বুক পাতিয়া রক্ষা করিতেন। যখন যে বিপদে পড়িয়াছি, অকাতরে, অম্লানবদনে নিবেদন করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে সুযুক্তি পাইয়াছি; উপদেশে হৃদয়ে বল পাইয়াছি।

১৯০৮ সালে স্যার আশুতোষের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেই বৎসর আমি রাজকীয় ঐতিহাসিক সমিতির (Royal Historical Society) সদস্য হই। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব না থাকিলেও বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই সমিতির সদস্য হই বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রশংসাভাজন হই। অবশ্য এই সম্মানের মূল ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পরলোকগত প্রথেরো সাহেব। তাঁহার অন্যতম ছাত্ররূপে আমি তাঁহার স্নেহাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং তাঁহারই সুপারিশে আমি মনোনীত হই। কোন ঘটনাই স্যার (তখন তিনি স্যার হন নাই) আশুতোষের দৃষ্টি এড়াইত না—আমার এ নির্ব্বাচন ব্যাপারও তিনি অনবগত ছিলেন না। গৃহদাহের পরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন চাকুরীর অনুসন্ধানে ব্রতী হই, তখন কেহ কেহ স্যার আশুতোষের সহিত সাক্ষাতের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার সহিত দেখা করা অসম্ভব ব্যাপার মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। একদিন অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণের নিকট পরামর্শ লইতে গেলে তিনি ত প্রথমে হাসিয়াই খুন। আমি এ হাসির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পরে বুঝিলাম হাইকোর্টের জজ এবং ভাইস্‌চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা করা অতি সহজ ব্যাপার; ইহাতে সাক্ষাতের দরখাস্ত কার্ড পাঠান, দারোয়ানের ভয়, চাপরাশীর ধাক্কা কিছুরই আশঙ্কা নাই। সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠা এবং বক্তব্য শেষ করা ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রয়োজনীয়তা নাই। বিদ্যাভূষণ দাদার কথাতেও প্রাণে ভরসা পাইলাম না। একটু ভয়ে ভয়ে ভবানীপুর যাইয়া, সন্তর্পণে দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম ঘরটী লোকে পরিপূর্ণ। কোথায় বা হাইকোর্টের জজিয়তি, আর কোথায় বা ভাইস্‌চ্যান্সেলারী। খালি গায়ে চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া আশুতোষ সকলকে তুষ্ট করিতেছেন। তথাপি সাহসে কুলাইল না, সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

একটু স্থির হইতেই, তিনি আমার দিকে চাহিলেন—সে দৃষ্টি ভুলিব না। শুনিয়াছি স্যার আশুতোষের চোখের দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ভয় পাইতেন। শিক্ষা বিভাগীয় একজন বড় সাহেব আমাকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, সেনেটে একবার আশুতোষের কোন এক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য তিনি বিশেষ যত্নসহকারে, অনেক তথ্য (facts aud figures) সংগ্রহ করিয়া বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনেটে বক্তৃতা করিতে উঠিবামাত্র, ভাইসচ্যান্সেলার আশুতোষ, সাহেবের দিকে চাহিলেন—সাহেবের আর কথা বলিবার সাহস রহিল না। অবশ্য এই ঘটনা আশুতোষের সহিত আমার সাক্ষাতের বহু পরে ঘটিয়াছিল। আমি দেখিলাম, এ দৃষ্টি অতি স্নিগ্ধ, অতি শান্ত—অন্তর

দান করিয়াছে। ধীরে ধীরে, তাঁহাকে যাইয়া প্রণাম করিয়া নিজের নাম বলিলাম। বলিবামাত্র বলিলেন, "তোমার কথা প্রথেরো সাহেবের কাছে শুনছিলাম। তিনি ত তোমাকে খুব ভালবাসেন দেখলাম।" আমি উত্তর করিলাম, "তিনি তাঁর সকল ছাত্রকেই ভালবাসেন; আমি তাদেরই একজন!" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে যা হোক! এখন কি দরকার?" আমি বলিলাম, "গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। চাকরী করতে হবে।" তিনি বলিলেন, "টাঙ্গাইল প্রথম মন্মথ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের দরকার। তুমি দরখাস্ত কর।" আমি আমার অসুবিধার কথা বলিলাম। আমি এম এ দিতে পারি নাই—সেখানে ত এম-এর দরকার! তিনি বলিলেন "তুমি প্রেসিডেন্সিতে পুরা সেসন (session) এম-এ পড়েছ, প্রথেরো সাহেবের দ্বারা এই কথা লিখিয়ে নিয়ে দরখাস্ত কর। সিণ্ডিকেটে কোনই আপত্তি হবে না।" তাঁহারই আদেশানুসারে দরখাস্ত করিলাম—চাকুরী পাইলাম। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। সেই প্রথম দেখা—প্রথম সাক্ষাতেই মনে হইল যেন তিনি কতকালের আত্মীয়!

* * *

তারপর কতবার দেখা করিয়াছি। সেবার যখন অসহযোগিতার জন্য কলিকাতার স্কুল কলেজে দলে দলে ছাত্রেরা পড়া ছাড়িতে লাগিল, সেই সময়কার বড়দিনের ছুটীতে ভবানীপুরে গেলাম। বৈঠকখানায় একাকী ছিলেন। প্রণাম করিবামাত্র বলিলেন, "যোগীন! দেশের কি সর্ব্বনাশ হচ্চে দেখছ? বিশ্ববিদ্যালয় টলমল। যারা এটা করছে তারা কি অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখছে না? তারা কি আমার চেয়ে বেশী স্বদেশী? আমি ধুতি পরে' জীবনটা কাটালাম.........। ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার আমরা। এই যে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়, এ কি এক দিনে হয়েছে? কত টাকার দরকার একবার দেখ ত। এসকল বিষয় কেউ ভাববে না—অথচ একদিনে বিশ্ববিদ্যালয় চাই ই চাই।" সেই দিন দেখিলাম, বুঝিলাম, আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে কি চক্ষে দেখেন; কিরূপ ভালবাসেন। ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে প্রতি কথায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল; চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। প্রাণে দারুণ আঘাত পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি ইঙ্গিতে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

* * *

লাহোরের কন্‌ভোকেশনে স্যার আশুতোষ বক্তৃতা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পাটনা জংসন ষ্টেশনে আমরা অনেকে দেখা করিতে গিয়াছি। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয়ও সেখানে—কি করিয়া খবর পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় স্যার আশুতোষের শিক্ষক ছিলেন। গাড়ী থামিবামাত্র দাস মহাশয় ছাত্রকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র—গাড়ীতে দণ্ডায়মান ছাত্রও দাস মহাশয়কে দেখিয়া উদ্‌গ্রীব। আমরা রাস্তা ছাড়িয়া দিলাম। দাস মহাশয় আশুতোষের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ্‌জাষ্টিস্, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা, অতবড় স্যার আশুতোষ তাঁহার শিক্ষকের নিকট মাথা নত করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং, পাটনায় যেদিন স্যার আশুতোষের শোকসভা হয় সে দিন যে বৃদ্ধ দাস মহাশয় বালকের ন্যায় কাঁদিয়াছিলেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

* * *

স্যাডলার কমিশনে স্যার আশুতোষ কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। ব্যারিষ্টার জয়সোয়াল ও আমাকে সংবাদ দিয়াছেন। পাঞ্জাব মেলে আসিবার কথা কিন্তু মেলে আসিতে পারেন নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম কনেকশন্স (connection) ধরিতে পারেন নাই; তাই তাঁহারা ৭-৩০টার মেলে না আসিয়া ৯-৩০টার গাড়ীতে আসিবেন। সুতরাং যাঁহারা

দেখা করিতে গিয়াছিলেন, অনেকেই ফিরিয়া গেলেন। জয়সোয়াল সাহেব ও আমি এবং আরও কয়েকটী বন্ধু বসিয়া থাকিলাম। গাড়ী পৌঁছিলে স্যার আশুতোষ আমাদিগকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। গায়ে সামান্ত একটী গেঞ্জি। গাড়ী ছাড়িয়া গেলে একজন উচ্চপদস্থ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার সহিত কথা কহিতেছিলে?" আমি বলিলাম, "স্যার আশুতোষ।" সাহেব অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন—বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না যে সামান্ত (বোধ হয় একটু ছেঁড়াও ছিল) গেঞ্জি পরিহিত ব্যক্তিটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্ত্তা-কর্ত্তা স্যার আশুতোষ। কিন্তু গেঞ্জি ত ভাল। খালি গায়ে উপবিষ্ট স্যার আশুতোষের নিকট অনেক বড় বড় সাহেব মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। একবার ভবানীপুরের দ্বিতলে তাঁহার নিকটে আমরা ৩।৪জন বসিয়া আছি। এমন সময়ে সিঁড়িতে একটী সাহেব দেখা দিলেন। অর্দ্ধ পথে থাকিয়া সাহেব (ইনি তখন একজন খুব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন; এখনও জীবিত) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি আসিতে পারি?" নগ্নদেহ আশুতোষ একবার টেবিলের উপরে স্থাপিত গেঞ্জীটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অবশ্য।" সাহেব আসিলেন, কথা কহিতে লাগিলেন। আমরা সে দিন যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

* * *

মোকর্দ্দমার ব্রীফ লইয়া পাটনায় আসিলে আমাদের সম্পর্কটা বেশী গাঢ় হইল। প্রত্যহই দেখা হইত। বিশেষতঃ, সেই সময় নেপালের প্রধান মন্ত্রীর পৌত্র, মান্যবর নেপালপ্রতাপ স্যার বাবর স্যামসেরজঙ্গের পুত্র শ্রীমান্ কর্ণেল মৃগেন্দ্রস্যামসের পরীক্ষা দিতে পাটনা আইসেন এবং আমি মৃগেন্দ্রের শিক্ষক নিযুক্ত হওয়ায় প্রত্যহই তাঁহার সহিত দেখা হইত। উভয়ের বাসা রাস্তার এপার ওপার। স্যার আশুতোষ প্রত্যহ প্রভাতে "লনে" (বাঁকিপুরের ময়দানে) বেড়াইতে আসিতেন। আমি বাসা হইতে গাড়ী করিয়া যাইয়া লনে নামিয়া পড়িয়া, পরে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাসায় যাইতাম। বৈকালেও তিনি কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিলে দেখা হইত। অনবরত তিনি মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র লইয়া থাকিতেন—কিন্তু সে সময় আমি তাঁহার নিকটে যাইতাম না। রমাপ্রসাদ বা প্রমথকে ইসারা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া কথাবার্ত্তা কহিতাম।

ডাক্তার জলী (Jolly) সম্পাদিত অর্থশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দেখিলাম জলী সাহেব নিজগ্রন্থে আমার Lectures on the Economic Codition of Ancient India গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। আমার এই বই খানির মূল স্যার আশুতোষ; সুতরাং জলীর উল্লেখে তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া বইখানি লইয়া তাঁহার নিকট গেলাম। দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরক্ষণেই রমাপ্রসাদকে বলিলেন, "দেখ, যোগীন আমাদের আগেই এই বইখানি সংগ্রহ করেছে! আমাদেরই আগে করা উচিত ছিল। লাহোরে এখনই চিঠি লেখ যে প্রকাশক যেন পত্রপাঠ বই ভিপিতে পাঠায়।" ক্যাম্বে কোম্পানীর অন্যতম সত্ত্বাধিকারী আমাকে বলিয়াছেন যে, স্যার আশুতোষ তাঁহার তিরোধানের মাত্র ৮।১০ দিন পূর্ব্বে ১৪।১৫ হাজার টাকার পুস্তকের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ভবানীপুরের বাটীতে ঘর ভরা বই। উপরে তিন তলার যেখানে বসিয়া তিনি নীরিবিলি কায করিতেন এবং যেখানেও আমাকে অনুগ্রহ করিয়া কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন, সেখানে স্তুপীকৃত বই, দ্বিতলের বসিবার ঘরে, আশেপাশের ঘরগুলিতে, নীচের সব ঘর বইয়ে পরিপূর্ণ—তথাপি বই কিনিবার সাধ মিটিত না। আমরা মনে করিতাম তিনি অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকই পাঠ করেন বা পড়িবার অবসর পান। কিন্তু, যাহারাই তাঁহার দুইটী অভিভাষণ (একটী কলিকাতায়

প্রথম Oriental Conferenceএ এবং দ্বিতীয়টী Bihar and Orissa Research Soceitytর সভায়) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে স্যার আশুতোষের পাঠ নিজ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ছিল না। শুধু তাই নয়। Oriental Conferenceর অতবড় ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অভিভাষণ, শুনিয়াছিলাম, ২৷৩ ঘণ্টার পরিশ্রমে লিখিত হইয়াছিল। বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুষ্ঠান সমিতির অভিভাষণ দুই ঘণ্টার অনধিক সময়ের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল, দেখিয়াছি। শেষোক্ত সময়ে অতবড় একটা মোকর্দ্দমা পরিচালিত করিতেছিলেন। ইহা মহা মনীষা ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে এরূপ সম্ভবপর হইত না। ভোরে উঠিয়া প্রাত্যহিক ভ্রমণের পরে ডুমরাঁও মোকর্দ্দমার কায, দ্বিপ্রহরে হাইকোর্টে, বৈকালে আবার বেড়ান, সন্ধ্যা হইবামাত্র আবার কাগজ পত্র লইয়া বসা—পাটনায় দৈনিক কার্য্য ছিল। প্রতি শুক্রবার কলিকাতায় যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কায, আবার পরদিন ফিরিয়া আসিতেন। ভবানীপুরে কত লোক তাঁহার সহিত দেখা করিত। প্রার্থী, ছাত্র, উমেদার, বন্ধু, অথচ কি করিয়া যে তিনি হাইকোর্টের জজীয়তী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারী করিতেন বাস্তবিকই ইহা বুঝা দুষ্কর। কলিকাতায় এক রাত্রি Bioscope দেখিয়া রাত্রি ন'টার পরে ফিরিতেছি, দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। গিয়া দেখিলাম তিনি কায করিতেছেন—অথচ তিনি তখন ভাইস—চ্যান্সেলার ছিলেন না। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা অনেকে বুঝেনা। তাই স্যার আশুতোষ বাঁচিয়া থাকিবার সময় কেহ কেহ ইহা বুঝিতেন না—অথবা বুঝিয়াও বুঝিতেন না। বলা বাহুল্য, এই দলেরই ২৷১ জন তাঁহার তিরোভাবের পরেও মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাঙ্গালীর তাই এত দুর্গতি। কিন্তু স্যার আশুতোষ এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখিতেন। বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার ঘোষ একদিন কথা প্রসঙ্গে এই কথা উত্থাপন করিবামাত্র স্যার আশুতোষ বলিয়াছিলেন, "দেখ ললিত, ২০ বৎসর হাইকোর্টের জজীয়তী করিয়াছি; দুইবার চীফ জষ্টিসী করিয়াছি; ১০ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারী করিয়াছি; সুতরাং ইহাদের নিন্দা বা প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না—একটু হাসি পায় মাত্র।"

* * * *

২রা মে আমাদের কলেজ বন্ধ হইয়া গেল। আমি ৪৷৷০টার এক্সপ্রেসে কলিকাতায় গেলাম; আশুতোষ সন্ধ্যার পাঞ্জাব মেলে গেলেন। পরদিন সেনেট সভায় তাঁহার সহিত দেখা হইল। জানিতাম না যে উহাই শেষ দেখা।

কন্যার বিবাহের বাজার করিতে কলিকাতায় আসিয়াছি। যেদিন পৌঁছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পাটনায় তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। কলিকাতায় বাসায় পৌঁছিয়াছি, আমি কিছুই জানি না। বাসায় আসিয়া বাঁকিপুরের অন্যতম কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পত্রে জানিলাম "স্যার আশুতোষ বড় অসুস্থ; কলিকাতা হইতে ডাক্তার নন্দীকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছে।" আহারাদি করিয়া বাহির হইয়া, কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে দেখিলাম ভীষণ জনতা। একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কেওড়াতলা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম—শেষ দেখা দেখিয়া আসিলাম।

আমার কন্যার শুভবিবাহে তাঁহার যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল। কোন রকমে বিবাহ শেষ হইয়া গেল। ভোর রাত্রে লোকজনের আহারাদি শেষ হইয়াছে, আমি প্রাঙ্গণের এককোণে একটী টুলের পর বসিয়া সেই অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। শুনিলাম—"বেশ যোগীন! আমি তোর মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি; আর তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস?" ধড়ফড়

করিয়া উঠিয়া বসিলাম—কোথায় তিনি? তখন বুঝিলাম, যে মহাপুরুষ আজ সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর আমাকে স্নেহ করিয়া আসিতেছিলেন, অমরধামে যাইয়াও তিনি আমাকে বিস্মৃত হন নাই। এ মর্ত্যলোকে যে আশীর্ব্বাদে আমাকে পূত করিয়াছেন, অমর লোক হইতেও আমাকে সে আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত করিবেন না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৺ স্যর আশুতোষ চৌধুরী

বাঙ্গালার গৌরবাকাশ হইতে আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে! যাঁহার নানাবিষয়িণী গভীর বিদ্যা, অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ, অপূর্ব্ব বদান্যতা, আন্তরিক স্বদেশপ্রেম ও মধুর চরিত্র তাঁহাকে তাঁহার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে এক গৌরবময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই অজাতশত্রু, ধর্ম্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মবীর ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। স্যর আশুতোষ চৌধুরীর পরলোকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে।

পূর্ব্বে রাজসাহী এবং এক্ষণে পাবনা জিলার অন্তর্গত হরিপুর নিবাসী অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন দিবসে, আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষের পূর্ব্বপুরুষগণ শাক্ত ছিলেন; কথিত আছে ইঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ—যাদবানন্দ চৌধুরী (যদু কীর্ত্তনিয়া নামে সমধিক পরিচিত) শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তনে মোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ স্বীয় বাসগ্রামের নাম হরিপুর রাখিয়াছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ইঁহাদের অপর একজন পূর্ব্বপুরুষ রামদেব সাঁওতাল রাজগণের দেওয়ান ছিলেন। মুসলমান সুবাদার তাঁহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া নাটোর মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণকে তাঁহাদের ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করেন এবং দেওয়ান রামদেব মুসলমানগণ কর্ত্তৃক দেব-মন্দির কলুষিত হইবে এই ভয়ে মন্দির হইতে শ্যামরায় ও মঙ্গলচণ্ডীর বিগ্রহ লইয়া গভীর রজনীতে সঙ্গোপনে নদী পার হইয়া হরিপুরে আগমন করেন। এখনও চৌধুরী বংশে এই বিগ্রহদ্বয়ের পূজা হইয়া থাকে। সাঁওতাল রাজ-বংশীয়গণ নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা না থাকায় বিলের জলে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দেহত্যাগ করেন। এই বিল এখনও সাঁওতাল বিল নামে খ্যাত।

আশুতোষের পিতা দুর্গাদাসের জননী কুমারী দেবী এবং নাটোরাধিপতি মহারাজ বিশ্বনাথ বাহাদুরের পত্নী কৃষ্ণমণি (পিতৃদত্ত নাম দয়াময়ী) সহোদরা ভগিনী ছিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয় এক পুত্রসন্তানকে হারাইয়া শোকাকুলা কুমারী দেবী কথঞ্চিৎ শান্তিলাভার্থ যৎকালে নাটোর রাজ-প্রাসাদে সহোদরা কৃষ্ণমণির নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুর্গাদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় দুর্গাদাসের পৈতৃক সম্পত্ত্যাদির অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া যায় এবং তৃতীয়া ভগিনী মৃণ্ময়ী দেবীর সাহায্য না পাইলে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা অসম্ভব হইত। তাৎকালীন জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রাজসাহী কলেজের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক (পরে কলিকাতার ছোট আদালতের বিচারপতি) কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশে দুর্গাদাস কলিকাতায় আগমন করেন এবং হিন্দু কলেজে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসনের নিকটে ইংরাজী সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুর্গাদাস পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের আত্ম-জীবন-চরিত পাঠে দুর্গাদাসের হৃদয়ের উদারতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

"ছাতকের বসন্ত রায়" বাঙ্গালার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণের অন্যতম। এই বসন্ত রায়ের অন্যতম বংশধর বাগের কালী রায় মহাশয়ের পরমাসুন্দরী কন্যা মগ্নময়ী দেবীর সহিত দুর্গাদাস পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের ফলে সর্ব্বপ্রথমে এক কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠা হন—ইনিই বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিতা সুকবি শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী। অতঃপর দুর্গাদাসের প্রথম পুত্র সন্তান বঙ্গ-গৌরব আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পর আশুতোষের অন্যান্য সহোদর—প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র, কুমুদনাথ, প্রমথনাথ, অমিয়নাথ, এবং খ্যাতনামা চিকিৎসক কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী ও সুহৃদনাথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী

জননী যে যথার্থই রত্নগর্ভা তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী প্রণীত "পূর্ব্ব কথা" নামক অতীব চিত্তাকর্ষক গ্রন্থের স্থানে স্থানে আশুতোষের শৈশব ও বাল্য-জীবনের কতকগুলি ঘটনার মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই গ্রন্থ হইতে কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :—

"আমার পাঁচ বৎসর কয়েক মাসের ছোট আশু, পিতা-মাতার প্রথম পুত্র। তাহার জন্মের পরেই বাপ-মার এমনি কঠিন পীড়া হইয়াছিল যে জীবন-সংশয়। তাঁহারা যদি ঈশ্বর কৃপায় আরোগ্য-লাভ করিয়া উঠিলেন, তখন আবার নবপ্রসূত শিশুর জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। পরিবারস্থ সকলে যেখানে যে গণৎকার ওঝা ও বৈদ্য পাইতে লাগিলেন, তাহাকেই আনিয়া জীবন রক্ষার নানা প্রকার উপায় দেখিতে ছিলেন। ভাগ্য গণনায় উঠিয়াছিল যে শিশু অতি ভাগ্যবান ও ফাঁড়া যদি কাটাইয়া উঠে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল বড় "ইউনিক।" ঝাড়া, জলপড়া, সেকালের যাহা কিছু শিশু-চিকিৎসা ছিল, তাহাতেই শিশু সারিয়া শেষে বেশ সুস্থ সবল-কায় হইয়া উঠে। আমাদের জন্ম মাতামহালয়ে; ছয় মাস বয়সে, পিত্রালয়ে যাওয়া প্রথা। আশুকে লইয়া মাও সময় মতন হরিপুরে রওনা হইয়া গেলেন। শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করা হইল। পুরাতন নিয়মানুসারে বাদ্য বাজাইয়া পূর্ব্বে কাছারী বাড়ীতে তুলিয়া গ্রামের গুরুজন সকলে দেখিলে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইত ও প্রধান প্রধান প্রজারা কিছু কিছু নজর সম্মুখে ধরিত। আশুরও তাহাই হইয়াছিল। শিশুর হাতে টাকা দিলে কখনও মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারিত না, শুনিয়াছি। জীবনে তাহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ।

স্যর আশুতোষ চৌধুরী

আশুর জন্ম বৎসরেই আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ৺নবকুমার চৌধুরী ঠাকুর দাদার প্রথম বিবাহ অতি সমারোহে হয়। পিতৃদেব সে বিবাহে সবই করিয়াছিলেন ও বাড়ীর সকলে তাহাতে ভাবিয়াছিলেন, জ্যাঠামহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনে খুব ধুমধাম করিবেন। কিন্তু নব-বধূর পাকস্পর্শের দিন আশুর মুখে ভাত দিবার প্রস্তাব শুনিয়া পিতা অভিমানে তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, সে যাত্রা অন্নপ্রাশন রহিত হইয়া গেল।

স্যর আশুতোষের পিতা দুর্গাদাস ও মাতা মগ্নময়ী

*   *   *   *

ব্রাহ্মণ পুত্রের দশকর্ম্ম রীতিমত না হইলে চলিতে পারে না। জাঁক-জমকে অন্নপ্রাশন না হইয়াও আশুর মুখে ভবানীপুরের (নাটোর রাজের দেবস্থান) প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং পিতৃদেব স্বয়ং নাম রাখেন "আশুতোষ।" সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তানের অন্নপ্রাশন আশানুরূপ হইল না, তাহাতে মা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না, বরং ভবানী দেবীর প্রসাদই তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পুত্রের মুখে দিয়া তিনি পরিতৃপ্তি বোধ করিলেন।

আশুর পরে যোগেশ, তিন বৎসরের ছোট। এবার পিতৃদেব পিসমাতাদিগের হস্তে দ্বিতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশনের ভার দিয়া বনগ্রামে কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রানু-

সারে জ্যেষ্ঠের উচিতমত 'নান্দিমুখ' 'বৃদ্ধ শ্রাদ্ধ' না করিয়া অন্নপ্রাশন হইলে কনিষ্ঠের তাহা হইতে পারে না। অগ্রে আশুর হইয়া ছোট ভ্রাতার মুখে ভাত দিতে হইবে। পুরোহিত মহাশয়েরা পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া তাহার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, আর গৃহ কুটুম্ব আগমনের ধূম পড়িয়া গেল। এ অন্নপ্রাশনে বড় আমোদ, যুগল কুমার লবকুশের ন্যায়। সাড়ে তিন বৎসরের আশুতোষ সর্ব্বাঙ্গে গহনা ও লাল পোষাক পরিয়া চন্দন চর্চ্চিত ললাটে ছোট পুঁটে বর সাজিয়া চিত্রিত পিঁড়িতে ভাত হইতে বসিয়া গেল যোগেশ নয় মাসের, জ্ঞাতি ক্রোড়ে রহিল। সম্মুখে পঞ্চ ব্যঞ্জন ও উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সব সজ্জিত দেখিয়া ক্ষুদ্র আশু সুবর্ণ অঙ্গুরীয় পরিয়া জ্ঞাতি হস্তে পরমান্ন খাইবার প্রতীক্ষায় না রহিয়া দিব্য খুসি মনে নিজ হস্তে অন্নপ্রাশনের অন্নব্যঞ্জন খাইতে লাগিল। এ কৌতুকাবহ দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি হইতে লাগিল। রসনচৌকী নহবৎ বাদ্য থামিয়া গেল এবং আশু, যোগেশের অন্নপ্রাশনের গল্পটা পল্লীর চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আশুর অন্নপ্রাশন সাড়ে তিন বর্ষে, ও হাতে খড়ি একেবারেই হয় নাই। তবুও মা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর কৃপায় কখন বঞ্চিত নহেন।"

বাল্যকালে আশুতোষ প্রধানতঃ তদীয় পিতৃদেবের নিকটেই বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :—

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী

"বনগ্রামে আমাদিগের রীতিমতন লেখাপড়া আরম্ভ হইল। পিতৃদেব স্বয়ং গুরু ও আমরা সব শিষ্য। প্রাতে স্কুল বসিত, সায়াহ্নে পড়া দিতে হইত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশীল আশু সর্ব্বোপরি থাকায় আমরা একটু ভীত থাকিতাম। পড়া দিবার ঐ সময় প্রায়ই মা আমার বেণীবন্ধন করিতেন ও রচনার কারুকার্য্যে বিলম্ব হইয়া যাইত। সেকালের খোঁপার নাম 'জিলপী পাক, মোড়া এবং বিবিয়ানা।' কপালের ও কাণের পার্শ্বের চূর্ণিত কুন্তলের বেণীর পারিপাট্যে দেরী হইবার কথা, ও তাহাতে আশুর নিকট আমার পড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। সেটা দণ্ডস্বরূপ মনে করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম। ছোট ভাইএর গুরুগিরি আমার ভাল লাগিত না, চক্ষের জলে সমস্ত বস্ত্র ভিজিয়া যাইত, রাত্রে আহার প্রায়ই হইত না, তথাপি পিতৃঠাকুরের কথায় অবাধ্য হওয়া তাঁহাকে অমান্য করা সাধ্যাতীত। নীরবে আশুর মাষ্টারী মানিয়া লইতাম। গদ্য পদ্য ভূগোল ইতিহাস ও লোহারাম শিরোমণির ব্যাকরণ সকল বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলাম, কেবল অঙ্কে নীচে থাকিতাম ও পরে ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত উঠিয়া সেইখানেই বিদ্যা থামিয়া গেল। ইংরাজী তখনও পড়িতাম না। আশু স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া নিয়ম মত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। আমি গৃহের পাঠশালেই তেমনি রহিয়া গেলাম।"

বনগ্রাম হইতে দুর্গাদাস যশোহরে স্থানান্তরিত হন। এই স্থানে আশুতোষের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করায় সকলে শোকে মুহ্যমান

হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে যশোহর স্কুলে আশুতোষ ভ্রাতৃগণের সহিত প্রবিষ্ট হন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন;—

"যশোহর স্কুলে ভ্রাতারা ভর্ত্তি হইয়া পূর্ব্বে যেমন রীতিমত পড়িতেছিল, তেমনি সব রহিয়া গেল। পিতৃদেবের আশ্রয়ে যাহারা ছিলেন, তাঁহারাও তেমনি তাহাদিগের গৃহপাঠের সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাজসাহী জেলার একজন উপাধিধারী (M. A., B. L.) যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক আশুকে ইংরাজী পড়াইতেন ও অন্য একজন ভদ্রলোক, কেরাণীবাবু অঙ্ক কসাইতেন এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের বংশধর এক বৈদ্যরাজ সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন।

ক্রমে আমাদিগের গৃহশিক্ষকের পদ পিতৃদেব স্বয়ং আবার গ্রহণ করিয়া অতি পরিশ্রম সহ রাত্রিদিন আশুকে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক বাদে অন্য সব সাহিত্য ইতিহাস পড়াইতে লাগিলেন ও তাহার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া স্কুলে 'ডবল প্রমোসান' হইতে লাগিল। তখন ষোল বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ম ছিল, সেই জন্য তাহাকে তিন বৎসর বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কয়েক বৎসর মধ্যে আশু অনেক পড়িয়া অনেক শিখিয়া একটা বিজ্ঞ বালক হইয়া উঠিল। 'বয়সে কি বিজ্ঞ হয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে' এ বাক্য তাহার পক্ষে খাটিয়াছিল।"

যশোহরে অবস্থান কালে চৌধুরী পরিবারের সহিত কবিবর দীনবন্ধু মিত্র ও নবীনচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। দুর্গাদাসের বাসায় প্রায়ই তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুগণ সমবেত হইয়া কাব্যামৃত রসাস্বাদন করিতেন এবং প্রসন্নময়ী ও আশুতোষ সেই রসধারায় তাঁহাদের তরুণ হৃদয় সিঞ্চিত করিয়া লইতেন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন:—

"প্রতি শনি রবিবারে আমাদের গৃহে সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণের আসর জমিত, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের 'সদ্ভাব শতক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনা, 'বীরাঙ্গনা, মৃণালিনী' নবীনের নবজাত 'অবকাশ রঞ্জিনী' প্রভৃতির আলোচনা আবৃত্তি চলিত। এই মজলিসের প্রধান ছিলেন রসজ্ঞ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়। বটতলার 'কি মজার শনিবার'ও এখানে বাদ যাইত না। সে সব অশ্রুতপূর্ব্ব ছড়া আজকাল শুনিতে পাই না। যেমন গঙ্গা যে ডার্টি রিভার হয় সে ফিভার, সে জলে আর কেউ নেও না,—একটা পুতুল গড়ে মন্ত্র পড়ে ফুল দিয়া আর ফুল (fool) হয়ো না।' আবার চাকুরী সন্তপ্ত হৃদয় কেরাণীর কবিতা, 'অসুখী ভিষক মণ্ডপ অ'ত, অসুখী রূপসী বিধবা সতী—অসুখী যে জন যৌবনে জরা, অসুখের শেষ চাকুরী করা।" বাহির বৈঠকখানায় যখন বাগ্দেবীর বাণী ও বীণা ঝঙ্কারে দর্শক এবং শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ ও উৎফুল্ল, তৎকালে অন্তঃপুরে লক্ষী সহায় অন্নপূর্ণার রন্ধনস্থালী বিবিধ মিষ্টান্ন ও সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত—মা ও মাসীমা নিজেরাই অক্লান্ত শ্রম সহ স্বহস্তে সকল প্রস্তুত করিতেন। আমরা ভাই বোনে মিলিয়া দুই দিকের রসাস্বাদনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম। অন্দরের সব পরিবেশন শেষ হইলে আহারের জন্য বন্ধুগণ একত্র প্রীতিভোজনে বসিতেন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন

সে সময়ে হাস্যোচ্ছ্বাস ও আমোদজনক গল্পের লহরী বহিয়া যাইত। মিত্রজা এক একটা সরল গল্প বলিতেন আর চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিত। ইহার মধ্যেও ভোজনের কোনদিকে কোনরূপ শৈথিল্য দেখা যাইত না। মাংসের গরম চপ পাতে পড়িবামাত্র উষ্টার সস্ (Worcester sauce) ঢালিয়া তাহা উপভোগ করিতেন।

একবার শ্রীপঞ্চমীর বন্ধে আমাদিগের যশোহর ভবনে ৺দীনবন্ধু বাবু লীলাবতীর নদের চাঁদের অংশটা (part) অভিনয় করিয়াছিলেন। নাটক অভিনয় আমরা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই ও তাহার কোন ধারণাও ছিল না। কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই, আখড়াই, হাফ আখড়াই, মনোহর সাই এবং ঢপের গান শৈশব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলাম। এ আমাদের নিকট নূতন দৃশ্য। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং নদেরচাঁদ সাজিয়া হাব-ভাব সহকারে অভিনয় করিবেন শুনিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে রঙ্গস্থল অধিকার করিয়া বসিলাম। ক্রমে বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পিসী মাতারা পর্য্যন্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া যখন নদেরচাঁদ 'অয়ি হরিণ-নয়নে তুমি কি পড়ো' বলিতে যাইয়া যেই 'আই হরিণের সিং তুমি কি পড়ো' বলিয়া ফেলিল এবং অপসারিত চৌকীতে বসিতে যাইয়া ভূপতিত হইয়া চীৎকারস্বরে কাঁদিয়া 'মলাম রে মেরে ফেল্লেরে' বলিল তখন দর্শকমণ্ডলীর অট্টহাস্যে যশোর নগরী প্রকম্পিত হইতে লাগিল, তাহার প্রতিধ্বনিতে ভৈরবনদও বোধ হয় উজান বহিয়াছিল। অভিনয় সমাপ্ত হইবামাত্র পিসীমাতারা পিতৃদেবকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তিনি যাইবামাত্র তাঁহারা দুঃখিত ভাবে বলিলেন, 'দুর্গা, দীনবন্ধুকে ভাইএর মত স্নেহপাত্র মনে করি, সে ত খুব ভালই জানিতাম, আজিকার একি কাণ্ড? মাংস ভাজার (চপ) সঙ্গে মদ ঢালিয়া ঢালিয়া খাইয়া এখন ত মাতাল হইয়া রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া মাটিতে পড়িয়া চেঁচামেচি করিতেছে ও লোকজন হাসাইতেছে, ইহাতে আমরা বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া তোমাকে সব বলিবার জন্য ডাকিয়াছি।' পিতৃদেব তাঁহাদিগের কথায় উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, 'দীনবন্ধু মাংস ভাজার সঙ্গে মদ ঢালিয়া খান নাই, ও এক রূপ চাট্‌নী (sauce), মদ না, ইহাকে অভিনয় বলে মাতলামী নহে। বিলাতে কত বড় বড় লোক এই অভিনয় করিয়া রাজদরবারে গণ্যমান্য হইয়া থাকে, কত অর্থ উপার্জ্জন করে, বড় মানুষ হইয়া যায়। দীনবন্ধু রহস্যপ্রিয়, গুণী ব্যক্তি, এই জন্য তাঁর নিজের বই 'লীলাবতী' অভিনয় করিতেছেন।' এই শুনিয়া তাঁহারা ত খুসি হইলেন ও সুচতুর মিত্র মহাশয়ও পিতৃঠাকুর প্রমুখাৎ সকল অবগত হইয়া আমাদের গৃহে আবার নৈশ ভোজনের কথা তাঁহাদিগকেই বলিয়া খুব আপ্যায়িত করিলেন। সে রাত্রে আহারীয় একটু নূতন রকমে প্রস্তুত করা হইল—(নবান্নের নূতন তণ্ডুলের ফ্যান্‌সা ভাত ও যত প্রকার সিদ্ধ পোড়া তরকারী, গব্য ঘৃত মিশ্রিত), তাহা খাইয়া একবাক্যে সকলে বলিয়াছিলেন "পোলাও কোথায় লাগে, এ অমৃত।"

৺দীনবন্ধু মিত্র

যথাসময়ে শুভদিনে আশুতোষের উপনয়ন হয়। প্রসন্নময়ী ইহারও চিত্র তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন :—

"আশু যোগেশের অন্নপ্রাশন যেমন একত্র হইয়াছিল তেমনি তাহাদিগের উপনয়নও এক সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ছোট ভাই দুইটী এক পালকী চড়িয়া পুরাতন চাকর সহ হরিপুর যাইয়া পৌছিলে সেখানে উৎসবের স্রোত বহিয়া গেল, আমিও তখন সেখানে ছিলাম। জ্যাঠা

মহাশয় স্বয়ং আশুর গলায় যজ্ঞোপবীত ও কাণে গায়ত্রী মন্ত্র দিলেন আর অন্য একজন জ্ঞাতি যোগেশের দীক্ষা-গুরু হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত আশুকে ব্রত ভিক্ষা স্বরূপ কয়েকখানি লাভজনক গ্রাম দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পিতৃঠাকুর তাহা লইতে দেন নাই। তাঁহার দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল, ভাবীকালে পুত্র কৃতী হইয়া বংশগৌরব রক্ষা করিবে। উপনয়নের ভিক্ষায় পঞ্চখানি গ্রাম লইয়া পরে জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের সহিত মনোমালিন্য ঘটিতে পারে সেটা ইচ্ছনীয় নহে। ভূমি দানের নিয়ম, গঙ্গামৃত্তিকা মন্ত্রপূত করিয়া নবীন ব্রহ্মচারীর হস্তে দেওয়া তাহাতে রীতিমতন লেখাপড়া না থাকিলেও কিছু আইসে যায় না এবং ভবিষ্যতে বংশানুক্রমে স্বত্ব রহিয়া যায়। মঘ মাসের শীতে ব্রহ্মচারিবেশী ক্ষুদ্র দুটী বালক প্রাতঃস্নানান্তে যখন বেদপাঠ শিক্ষা করিত, তখন তাহাদিগের সেই শান্তিপূর্ণ দিব্য মুখকান্তি ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া ভ্রাতুস্পুত্রগতপ্রাণা পিসীমাতারা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। উপবীত ধারণের পূর্ব্বে যদি অসময়ে মেঘ গর্জ্জন হয় তাহাতে উপনয়ন অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ভ্রাতাগণের যজ্ঞোপবীতের দিনে হঠাৎ ঘন মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টিপাতে সব আবার তিনদিন পর নূতন করিয়া করিতে হইয়াছিল। বর্ষার জল ঝড় ও মেঘের ডাকে কোন ক্ষতি নাই, অকালে তাহা হইলেই গোল। এই কারণে আশুর উপনয়নও অন্নপ্রাশনের ন্যায় দুইবার হয়।

উপনয়নের এক বৎসর আশুরা পূর্ণমাত্রায় ব্রহ্মচারী থাকিয়া কাহারো অন্ন-জল ও অখাদ্য স্পর্শ করিত না। রীতিমত একাদশী পালন ও মৌনভাবে বসিয়া আহার করিত। বাড়ী হইতে যশোহর প্রত্যাবর্ত্তন কালে রন্ধনের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইবার আগেই আমাদের পাল্কী স্কন্ধে বাহকগণ গ্রাম্য তাল-লয়ে গীত গাহিতে গাহিতে চলিতে আরম্ভ করিলে আমরাও উষার মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে ও বিহঙ্গের সঙ্গীতে জাগিয়া উঠিতাম। কত গ্রাম কত প্রশস্ত মাঠ-ঘাট অতিক্রম করিয়া দ্বিপ্রহর বেলায় কোন এক নদীতীরে ছায়াময় অশ্বত্থ বৃক্ষতলে পাল্কী নামাইয়া স্নানাহারের আয়োজন হইত। ব্যবস্থা সব ভৃত্য ঈশ্বর দাস করিয়া দিত, আমি উপলক্ষ মাত্র। ভ্রাতারা স্নাত দেহে গরদ পরিয়া আহারে বসিয়া যাইত ও শিবের নন্দীরূপী ঈশ্বর দাস দূরে দাঁড়াইয়া অন্য জাতির গমনাগমন বন্ধ জন্য পাহারা দিত। তাহার ত্রিসীমায় কাহারো ছায়াপাত হইবার হুকুম ছিল না, এমনি কড়া প্রহরী। তিন দিবস পথের মুক্ত বায়ুতে রহিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে ভ্রাতাগণ সহকারে যৎকালে আমরা যশোহর পৌছলাম, আমাদিগকে দেখিয়া পিতা মাতার এবং অন্য পরিজনবর্গের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসাধ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজত্ব লাভেও এমন পূর্ণ সুখ তাঁহাদিগের নিকট স্পৃহনীয় ছিল না।"

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার

যশোহর হইতে দুর্গাদাস কৃষ্ণনগরে বদলী হন। এই স্থানে অবস্থিতিকালে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, রামতনু লাহিড়ী এবং মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিবারের সহিত চৌধুরী পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আশুতোষের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অপ্রাপ্ত বয়সের জন্য আশুতোষ তিন বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। বিদ্যানুরাগী আশুতোষ এই সময় আলস্যে অতিবাহিত করেন নাই। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :—

"অপ্রাপ্ত বয়সের জন্য আশুর প্রবেশিকা পরীক্ষার কাল-বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই কয়েক বৎসর কলেজ লাইব্রেরীর কাগজ-পত্র গ্রন্থ সব তাহাকে অমনি পড়িতে দিত ও দয়ালু প্রিন্সিপাল মিঃ রো বালকের প্রতিভার মর্য্যাদা বুঝিয়া সাপ্তাহিক ছাত্র-সভার অধিবেশনে তাহাকে প্রবন্ধ লিখিতে দিতেন, তাহা অদ্যাপি কালেজ ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেই সভার শাখা সমিতি প্রতি রবিবারে আমাদিগের গৃহে বসিত। বঙ্গ-সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তক সেখানে পাঠ আলোচনা ও সেই সব গ্রন্থের সমালোচনা প্রবন্ধাকারে লিখিত হইত। সভায় সকল সভ্যই ছাত্র এবং আমিই একমাত্র মহিলা সভ্য ছিলাম। মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল ('স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়', কবিতার রচয়িতা) শেলী বাইরণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কবিগণের কবিতা মুখস্থ, তাহার অনুকরণ বা কথায় কথায় অনুবাদ করা হইত, ভারত-সঙ্গীত, ভারত-বিলাপ আবৃত্তি চলিত। পিতৃদেব আমাদিগকে সমবেত আত্মীয়গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া তাহা বলাইতেন এবং তাঁহারাও একবাক্যে প্রশংসা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই পারি-বারিক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় উপন্যাস, সঞ্জীববাবুর 'কণ্ঠমালা' ও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী এবং জ্ঞানী অক্ষয়কুমার দত্তজার 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রভৃতির চর্চ্চা ও দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া অধ্যয়নে আশাতীত ফল পাইয়াছিলাম।"

এই কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে কিশোর বয়স্ক আশুতোষ সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। তিনি সাধারণীতে লিখিবার জন্য প্রসন্নময়ীকে অনুরোধ করিতে কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন "তাঁহার সেই আগমনে আমরা অপার আনন্দানুভব করিয়াছিলাম।"

যথাসময়ে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও মধ্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এক সঙ্গে বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন।

এই সময়ে কোনও সান্ধ্য সম্মিলনে বাঙ্গালার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা স্যর এশলি ইডেনের সহিত দুর্গাদাসের সাক্ষাৎ হয়। আশুতোষও সেই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। স্যর এশলি আশুতোষের সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত হন এবং কোনও কাযকর্ম্ম গ্রহণ করিতে তিনি ইচ্ছুক কি না জিজ্ঞাসা করেন। দুর্গাদাস সবিনয়ে উত্তর দেন, "উঁহাকে দাসত্ব করিতে দিব না, বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করাইয়া আনিব।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কৈলাস পর্ব্বত ও মানসরোবর দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অদূরে বোধ হইতেছে পিথোরাগড় সহর। আরও দুই তিনটি ছোট ছোট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দূরে পিথোরাগড় বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতে লাগিল। পিথোরাগড়ের কেল্লা যাহাতে এখন কাছারি ইত্যাদি আছে, ও বাজারের ঘরগুলি দূর হইতে খেলার ঘরের মত দেখাইতে লাগিল। আজ সমস্তদিন বড় রৌদ্রতাপ লাগিয়াছে, কারণ পথে কোথাও গাছপালা নাই—সেই কারণ একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, পিথোরাগড় দেখিতে পাইয়া একটু আশার সঞ্চার হইল। আরও মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করিয়া আমরা বেলা ৪টার সময় পিথোরাগড় পৌঁছিলাম।

বাজারের বাহিরে হাঁসপাতালের কাছে একটি নূতন ধর্ম্মশালা তৈয়ারি হইতেছে। এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, আমরা সেই নূতন স্থানটিতে বাসা লইলাম। কারণ জায়গাটি বেশ পরিষ্কার ও বিশেষ করিয়া জলের বড় সুবিধা আছে। পিথোরাগড় স্থানটি যদিও খুব ভাল, কিন্তু এখানে বড়ই জলকষ্ট। সমস্ত গ্রামটিতে মাত্র ৩টি জলের নালা বা ঝরণা আছে। এ সব স্থানে ইচ্ছা করিলেই যেখানে সেখানে জল পাওয়া যাইতে পারে না। কোন কোন স্থানে পাথরের ভিতর দিয়া একটু একটু জল আসিতেছে, সেই স্থানগুলিতেই একটু কুয়ার মত করিয়া বাঁধিয়া দিলে ধীরে ধীরে জল সংগ্রহ হইতে থাকে, ও চৌবাচ্চার মত জলে ভরিয়া যায়। এই গুলিকে নৌলা বা বাউড়ি বলে। পিথোরাগড়ে মাত্র ৩টি নৌলা আছে। আমাদের বাসা একটি নৌলার একবারে কাছে, সেই জন্য জলের খুব সুবিধা। সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনও দেরিতে হইয়াছিল, সেই জন্য আমার নেপালি বন্ধুরাও আর রাত্রে রন্ধনাদি করিলেন না।

কাল সকালে আমার নেপালি বন্ধুরা পূর্ব্বাভিমুখে যাইবেন, আমাকে উত্তরাভিমুখে যাইতে হইবে। সেই কারণ এইবার তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে। পিথোরাগড় হইতে সোজা ঝুলঘাট পর্য্যন্ত, ভারত সীমান্তের শেষ পর্য্যন্ত নেপালি সীমান্তের ধারে কালী নদীর তীর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তা ধরিয়া আমার নেপালি বন্ধুরা ঝুলঘাটের ঝোলা পুলে কালী নদী পার হইয়া নেপালের ডোটি এলাকার ব্যয়টারি স্থানে যাইবেন। উহা এখান হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে। লোহাঘাট হইতে পিথোরাগড় পর্য্যন্ত ঘোড়া ভাড়া করা হইয়াছিল, অতএব আবার নূতন ঘোড়া ভাড়া করিতে হইবে। কয়েকটি ঘোড়াওয়ালা আসিল, একটি ঘোড়া ৪ টাকায় ঝুলঘাট পর্য্যন্ত ভাড়া করা হইল। একটি ঘোড়াতেই হইবে, কারণ আমি এখন তাঁহাদের সহিত যাইব না। ঘোড়াওয়ালাকে সকালে আসিতে বলিয়া আমরা বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ ৭ই জুন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া শীঘ্র স্নান করিয়া লইলাম। বেলা হইলে অধিক লোকের সমাগম হইবে ও সেই কারণ নৌলায় জল পাইবার অসুবিধা হইবে, অতএব প্রত্যূষেই স্নানাদি করা প্রয়োজন। আমার নেপালি বন্ধুরাও স্নানাদি করিয়া পাকের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা খাইয়াই বাহির হইবেন। আজ আমিও তাঁহাদের সহিত ভোজন করিব, কারণ আজ তাঁদের সহিত কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইবে। ইতিমধ্যে আমি একবার বাজারের দিকে বেড়াইয়া আসিলাম। টনকপুর হইতে আমাকে পণ্ডিত কানাইয়ালাল এখানকার একটী ভদ্রলোক লালা জয়রাম ক্ষত্রির নামে পত্র দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বড়ই সমাদরে

আমার সহিত আলাপ করিলেন, ও আমার থাকিবার জন্য নিজের বাসবাটির সংলগ্ন একটি আলাহিদা ঘরে বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বাজার হইতে ফিরিয়া ভোজনান্তে আমার পাহাড়ী বন্ধুগণ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঘোড়ার উপর জিনিষগুলি চাপাইয়া তাঁহারা রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এইবার আমি ও তাঁহারা পরস্পরকে নমস্কার করিলাম। সকলেই মনে মনে একটু কষ্ট অনুভব করিলাম। আজ ৬।৭ দিন আমরা বেশ এক সঙ্গেই কাটাইয়াছি, আমরা সকলেই যেন ভ্রাতা ভগিনীর মত ছিলাম। আমি বাঙ্গালী তাঁহারা নেপালি, কিন্তু আমাদের দুইজনের মধ্যেই দৃঢ় সম্বন্ধ, কারণ আমরা সকলেই হিন্দু, সকল সময়েই এক ভগবানের পরিবারবর্গের মতন হিমালয় বক্ষে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম। পবিত্র স্থানে মন পবিত্র হয়, সেই কারণ এই কয়েকদিনেই যেন আমাদের মধ্যে ভালবাসা দৃঢ় হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই আমার দুঃখে দুঃখী হইতেন, তাঁহাদের সৎসঙ্গ বুঝি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহারা নিজের পথ অবলম্বন করিলেন। যতদূর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম দাঁড়াইয়া দেখিলাম। পরে অদৃশ্য হইলে, নিজের জিনিষ পত্রাদি গোছাইয়া ঠিক করিলাম।

ইতিমধ্যে লালা জয়রাম তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন, সমস্ত জিনিষ পত্র লইয়া তাহার সহিত বাজারে আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতেই যাইয়া উঠিলাম। আমার পায়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছে, সমস্তটি প্রায় ফোস্কায় পরিপূর্ণ। দিনকয়েক পিথোরাগড়ে থাকিয়া রাস্তার তথ্য আরও অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে, সেই জন্য এখানে দিনকয়েক থাকা স্থির করিলাম।

লালা জয়রাম ক্ষত্রি মহাশয় পিথোরাগড়ের একজন সমৃদ্ধিশালী গণ্যমান্য ব্যক্তি। পূর্ব্বে পিথোরাগড়ে পল্টন থাকিত, সেই সময় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ পাঞ্জাব হইতে এই সুদূর পার্ব্বতীয় দেশে আসিয়া পল্টনের বণিক হইয়া এইস্থানে তেজারতি কাষ আরম্ভ করেন। লালা সাহেবের যদিও আর তেমন ব্যবসা বাণিজ্য নাই, কিন্তু যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ও দোকান বাড়ী আছে, তাহা লইয়াই থাকিতে হয়। পিথোরাগড়ে ছোট ছোট দুইটি বাজার। একটি নূতন, ও একটি পুরাতন। নূতন বাজারের দোকানগুলি একটু বড় বড়, রাস্তাটিও একটু প্রশস্ত, কিন্তু ইহার এখনও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। পুরাতন বাজারটি বেশ জাঁকজমকের। রাস্তাটি সংকীর্ণ ও বাড়ীগুলি ছোট ছোট। রাস্তাটিও একটি পার্ব্বতীয় চড়াই, তাহারই দুইধারে বসতি। বাটিগুলি দ্বিতল, সম্মুখভাগে দোকান, পশ্চাতে ও দ্বিতলে থাকিবার স্থান। মাত্র নামেই দ্বিতল, উপর তালাটি এতই সংকীর্ণ যে শীতপ্রধান দেশ বলিয়াই বাসের উপযুক্ত। এই বাজারের এক অংশ সমস্তটাই লালা সাহেবের। তিনি আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাও দ্বিতল। নীচে একটি দোকান আছে, উপরে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এটি নেহাৎ সংকীর্ণ নয় সেই জন্য থাকিবার কোন কষ্ট নাই। কিন্তু অন্য কষ্ট না থাকিলেও মাছির জন্য এত কষ্ট যে দিনের মধ্যে একবার সুস্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ যেখানেই যাও মাছির জন্য ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয়। চামরী গাইয়ের চামর পুচ্ছ হাতে থাকিলে একটু নিষ্কৃতি, নতুবা বসতি ছাড়িয়া পাহাড়ের ধারে না যাইলে আর উপায় নাই। পিথোরাগড়ে কয়েক জন আছেন যাঁহারা কৈলাস যাত্রা করিয়াছিলেন, এতদূর হিমালয়ের মধ্যে আসিয়া তবে এই সর্ব্বপ্রথমে এমন ভাগ্যবান ও পুণ্যাত্মা পুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর হইল। থাকিতে থাকিতে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া রাস্তার কথা বিশেষ বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বে অবশ্যই জানিতাম কৈলাস যাত্রা বড়ই কঠিন; সেইটি যেন আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম। যাঁহার কৃপায় এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, বাকিটা অবশ্যই তাঁহার দয়ায় হইয়া যাইবে।

পণ্ডিত পূর্ণানন্দ ও কেশব দত্ পুনেরা—ইঁহারা

সরকারের খুব বড় ঠিকাদার। টনকপুর হইতে গারবিয়া পর্য্যন্ত যে পার্ব্বতীয় সরকারি পথ আছে তাহার মেরামতের ঠিকা, তাঁহাদেরই হাতে। তাঁহারা রাস্তার বিষয় বিষদভাবে অবগত। আমাকে তাঁহারা ভাল করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন। রাস্তার যে সকল গ্রাম আছে সেই গুলিতে যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন সকলেই তাঁহাদের পরিচিত। তাঁহারা পাঁচ সাত খানি চিঠি ঐ সকল ব্যক্তিদের নামে লিখিয়া দিলেন। যাহাতে রাস্তায় আমার কোনও রকম কষ্ট না হয় তাহার জন্য অনুরোধ করিলেন।

পিথোরাগড়ে থাকায় সকল প্রকারেই অনেকটা সুবিধা হইল। শরীরের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়া গেল, পায়ে ফোস্কাগুলির কষ্ট অনেকটা উপশম হইল। আমি এক যোড়া খুব মোটা রবারসোল জুতা পরিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু সেটি দেখিতেছি পায়ে ঠিক হয় নাই, আর এক যোড়া জুতার অবশ্য প্রয়োজন, নতুবা এক পদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আর এক যোড়া জুতা পাওয়া বড়ই কঠিন। এ পার্ব্বতীয় দেশে যেখানে সেখানে জুতা পাইবার উপায় নাই। লোহাঘাটে অতি মজবুত পাহাড়ী জুতা তৈয়ারি হয়, কিন্তু তাহার পরে আর কোথাও জুতা পাইবার আশা নাই। বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম। বাজারে জুতার দোকান নাই। বাজারে মাত্র একটি মুসলমানের দোকান আছে, তিনি অনেক কাল পূর্ব্বে কয়েক যোড়া জুতা আনাইয়াছিলেন তাহারই মধ্যে এক যোড়া বাছিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। পিথোরাগড়ের পথে আর কোথাও জুতা বা জুতা মেরামতের উপায় নাই। তিব্বতে পৌঁছিলে তিব্বৎ দেশীয় বনাতের লম্বা লম্বা জুতা বৌক্ (এক রকম বুট জুতা) বা লাম পাওয়া যায়, তাহা তিব্বৎ দেশীয় বরফে ব্যবহারে করিবারই সুবিধা, কিন্তু অন্যত্র ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নয়। তিব্বৎ পার হইয়া বদরী নারায়ণ ও তাহার অনেক নীচে পর্য্যন্ত বা কেদারনাথের কাছাকাছি না হইলে জুতা পাইবার কোনও আশা নাই। আমার পিথোরাগড়ের জুতা যোড়াটি ছিঁড়িয়া যাওয়ার পরে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম। বদরী নারায়ণে সোনা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জুতা পাওয়া যাইতে পারে না। যদি কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম করিয়া জুতা আনান হয়, তাহা হইলেও পার্শেল বদরী নারায়ণে এক মাসের পূর্ব্বে পৌঁছিবে না। কারণ বদরী নারায়ণের রাস্তায় পার্শেল পৌঁছিতে বড়ই দেরি হয়। ভগবৎ কৃপায় আমার সমস্ত সহায়ই ছিল, ও কোন রকম চেষ্টার ক্রটিও হয় নাই, কিন্তু বদরী নারায়ণ হইতে ফিরিবার সময় খালি পায়েই বাহির হইতে হইয়াছিল।

এখন সঙ্গিহীন হইয়াছি, যদি কেহ পথের সাথী মিলিয়া যায়, তাহ'লে বড়ই সুবিধা হয়। কয়েকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কাহারও দেখা পাইতেছি না। একটা চাকর হইলে অনেকটা সুবিধা হয়, তাহার জন্য আমার বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। যাহাকে তাহাকে ধরিয়া চাকর করিয়া লইলে কোন উপকার নাই, কারণ তাহারা মাত্র কুলির কায করিবে, ভৃত্যভাব কিছুই থাকিবে না। পূর্ব্ব লিখিত আমার নেপালী বন্ধুরা যে চাকর আনিয়াছিলেন তাহার ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে সেরকম চাকর হইলে কোনও উপকার নাই। স্বদেশ হইতে চাকর আনিলে একবারেই কোন উপকার হইত না, কারণ এই কষ্টকর পার্ব্বতীয় রাস্তায় তাহারা কেবল পেটের দায়ে কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না। মানসিক বল ও আন্তরিক ইচ্ছা না হইলে এই দুর্গম পথ, শারীরিক বলের দ্বারা কোনও কায হইবে না।

এক সপ্তাহ হইয়া গিয়াছে পিথোরাগড়ে আছি,। সকলের সঙ্গে বেশ আত্মীয়তা হইয়া গিয়াছে। বিশেষ লালা জয়রাম ও পণ্ডিত পূর্ণানন্দ, তাঁহাদিগকে যখনই আমি এইবার যাইব বলি, তখনই তাঁহারা বন্ধুস্নেহবশতঃ দয়ার্দ্র হইয়া আমাকে ছাড়িতে অসম্মত হইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি আর বন্ধুদের মায়াতে

ভুলিলাম না। ১২ই জুন প্রাতে প্রস্থান করিব স্থির করিলাম। ডাক্তার কাওয়াগুচি (Dr. Kawaguchi) যেমন নিজের বন্ধুর গৃহে জারং (Tsarang) হইতে লুকাইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমারও সেই অবস্থা হইল।

সন্ধ্যার সময় সমস্ত জিনিষগুলি ঠিক করিয়া লইলাম। সমস্তই নিজে বহিতে হইবে সেই কারণ বিশেষ করিয়া গোছাইয়া লইতে লাগিলাম। সমস্ত কাপড়গুলি এখন ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ দিনে খুবই গরম হয় ও রাত্রেও প্রায় দরকার হয় না। কম্বলগুলি ছাড়িয়া কাপড় গুলির একটি গাঠরি করিলাম। যে কয়েকটি বাসন ছিল তার ছোট ছোট গুলি গাঠরির ভিতরেই দিলাম। ডেকচি ছুটি কমণ্ডলুর তলায় বাঁধিয়া একটি রশি দিয়া খুব দৃঢ়ভাবে কমণ্ডলুর মুখে বাঁধিয়া দিলাম। যে সকল ছোট ছোট পুটলিতে মেওয়া ইত্যাদি ছিল, সেগুলিকে কোটের পকেটে পকেটে রাখিলাম। গাঠরিটি পিঠের উপর দিয়া সম্মুখের দিকে টানিয়া বাঁধিলাম। এক কাঁধের উপর যে দিকে গাঠরির ভারটি কম আছে, দুইটি কম্বল ও অপর একটি গাঠরি অন্য কাঁধে রাখিয়া একটি স্বতন্ত্র রশি দিয়া সমস্ত গুলিকে আবার দেহের সহিত কসিয়া বাধিয়া দিলাম। ডান হাতে কমণ্ডলু মায় বাসন গুলি সমেত ও বাম হাতে ছাতাটি লইলাম। এইরূপে একবার প্রস্তুত হইয়া ঘরের ভিতর কয়েকবার পায়চারি করিয়া বুঝিয়া লইলাম চলিবার সময় কি অবস্থা হইবে। আমার সমস্ত ভারের ওজন ১৫ সের হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত হইবে। দেখিলাম বহন করিতে পারিব। তবে পরে কি রকম হয় বলা যায় না।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ ইংরাজি ১২ই জুন অতি প্রত্যূষে রাত্রি থাকিতে উঠিলাম। জিনিসগুলি উপরে বর্ণিত উপায়ে স্বশরীরে চাপাইয়া দিলাম, ও ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে চাবিটি রাখিয়া দুর্গাশ্রীহরি বলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। একটু দ্রুতপদেই চলিলাম। সকাল হইয়া আসিতেছে, পাছে কেহ পরিচিত ব্যক্তি আমাকে এভাবে সজ্জিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়। শীঘ্রই খৃষ্টান মিশনরিদিগের বসতি পার হইয়া এবারে পাহাড়ের নীচে নামিতে লাগিলাম। প্রায় মাইল খানেক নীচে নামিয়া একটি নদী আছে। ভাবিতেছি পিথোরাগড় পার হইয়া আসিয়াছি, আর কোন ভয় নাই, অমনি একজন পরিচিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার গৃহ সন্নিকট, "উরগ সাত সিলিং" গ্রামে। তিনি আমাকে এরূপভাবে কোন মতে যাইতে দিবেন না বলিয়া আমাকে তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা অনেকক্ষণ এই কথা লইয়াই তর্ক বিতর্ক করিলাম, কিন্তু ভদ্রলোক যখন দেখিলেন যে আমি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, তখন বড় দুঃখের সহিত ছাড়িয়া দিলেন।

"উরগ সাত সিলিং" পর্য্যন্ত রাস্তাটি প্রায় খুব সমতল ছিল এবং গ্রামের ধারের জমিগুলিতে বেশ চাষবাসও হইয়াছে। সম্মুখে একটী উচ্চ পর্ব্বত, ইহা চড়াইয়ের পরে কিছুদূর সমতল যাইয়া আবার ধ্বজ পর্ব্বতের চড়াই আরম্ভ হইবে। ধ্বজ পর্ব্বত আমাদের শাস্ত্রলিখিত পতাকা পর্ব্বত। রৌদ্রও বেশ উঠিয়াছে কিন্তু এখনও বিশেষ কষ্ট হইতেছে না। ধ্বজ বা পতাকা পর্ব্বতে যখন চড়াই চড়িতে লাগিলাম, একটু কষ্টবোধ হইতে লাগিল; কারণ রৌদ্রের উত্তাপ তখন প্রখর হইয়াছে।

আধমণ বোঝা লইয়া একটু কষ্ট অনুভব করিতেছি। প্রথম দিন একটু কষ্ট হইবে, এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া বেশ উৎসাহের সহিত চলিয়াছি। রাস্তার ধারে একটি গ্রাম পাইলাম। ছেলেরা গরু চরাইতে যাইতেছে, স্ত্রীলোকেরা ঘাস কাটিতে যাইতেছে, ও পুরুষেরা কোথাও কোথাও হলপ্রবাহ করিতেছে। এ দেশের লাঙ্গল আমাদের দেশের লাঙ্গল হইতে বিভিন্ন। লাঙ্গলের ফলাটি মাত্র একটি শলাকার মত মোটা, লাঙ্গলের বোঁটাও অন্যরকম। এ দেশের গরুগুলিও খুব

ছোট ছোট তবে বেশ বলিষ্ঠ, রং প্রায় কালো কিংবা লাল। সাদা রং এ দেশে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। লাঙ্গল চালাইবার বড় অসুবিধা, কারণ জমিগুলি যদিও লম্বা কিন্তু প্রস্থে মাত্র ৪.৫ হাত। তবে পাহাড়ের ধারে উচ্চ নিম্ন জমিতে ও সঙ্কীর্ণ প্রস্থে পাহাড়ী গরুর দ্বারা পাহাড়ীরা বেশ চাষ করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের পর পতাকা পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সৎগড় গ্রামের কাছে পৌঁছিলাম। গ্রামের তলদেশে একটি ছোট নদী আছে, এই স্থানে পাকশাক করিব মনস্থ করিলাম। বোঝাগুলি খুলিয়া রাখিয়া জঙ্গল হইতে কিছু ইন্ধন সংগ্রহ করিলাম। এ সমস্ত দেশে জ্বালাইবার কাষ্ঠ সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টকর নয়; যেখানে সেখানে পাওয়াও যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঝরণা হইতে পিথোরাগড় পর্য্যন্ত পাহাড়ে বেশী গাছপালা নাই, জঙ্গলের অভাব। ধ্বজ পর্ব্বত হইতে আবার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। যদিও খুব ঘন নহে কিন্তু বড় বড় দেবদারু গাছ আছে। পথে অনেক দেবদারু গাছ পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে, আবার কোথাও কাটা পড়িয়া আছে। এ সমস্ত দেশে গাছের দাম নাই, কারণ এ কাঠ কোন রকমেই ভারতবর্ষের সমতল স্থানে পাঠাইবার উপায় নাই। কাছে একটা গাছ কেহ কাটিয়াছিল, তাহারই সন্নিকটে অনেক শুকনা কুচি কাঠ পড়িয়া ছিল সেইগুলি আহরণ করিলাম। একটি কুঠার বা নেপালি কুখ্‌রি, থাকিলে আর আহরণে কষ্ট পাইতে হয় না। পাথরের দুইটি চুল্লি তৈয়ার করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম। একটিতে ভাত ও একটিতে ডাল চড়াইয়া দিলাম। ডালগুলি সিদ্ধ হইতে একটু সময় লাগিল। নিজ হস্তে রাঁধিয়া বেশ আনন্দের সহিত ভোজন করিলাম। ভোজনান্তে বাসনগুলি মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। আজ আমি নিজেই মালিক, নিজেই কুলি, ও নিজেই পাচক। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনশ্চ চলিবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম।

কিন্তু অনভ্যস্ত হওয়ার কারণ আজ প্রথম দিন ভারের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম। মনে মনে ভাবিতেছি, যদি ভগবানের কৃপায় একটা কিছু বন্দোবস্ত হইয়া যায় তাহা হইলে বড়ই সুবিধা হয়। এমন সময় সেই স্থানে একটি লোক জল খাইতে আসিল। লোকটি জল খাইলে তাহাকে বলিলাম, "যদি আমার কাপড় ও কম্বল কয়েকখানি কানালিছিনা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দাও, তাহা হইলে তোমাকে আমি কিছু দিব ও বড় উপকৃত হইব।" লোকটিকে বুঝাইলাম, কিন্তু সে পয়সার লোভে কোন মতেই ভুলিল না। শেষ কালে তাহাকে একটু রুক্ষ ভাবে বলিলাম, "আমি তোমাদের দেশে পরিব্রাজক হইয়া কষ্ট পাইতেছি, তুমি যদি আমার সাহায্য না কর তাহা হইলে তোমার বড়ই অধর্ম্ম হইবে।" ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অনেক অবনতি হইয়াছে, কিন্তু এখনও অধর্ম্মের কথা শুনিলে তাহাদের প্রাণ ব্যথিত হয়। লোকটির ধর্ম্মের প্রাণে আঘাত লাগিল বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ জিনিসগুলি উঠাইয়া লইল, আর বাক্যব্যয় করিল না।

আবার আমরা চড়াই উঠিতে লাগিলাম। সৎগড় গ্রামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছি। এবারে চড়াইটি যেন বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল। রাস্তাটি বড় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু চড়াই যদিও কঠিন ছিল, এক মাইলের বেশি উঠিতে হইল না। উচ্চ শিখরে উঠিয়াই সম্মুখে কানালিছিনা গ্রামে উতরাই। উতরাই আরম্ভ করিয়াই পথের ও আশপাশ পাহাড়ের দৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখিলাম। এখন পর্য্যন্ত সমস্ত পথেই পাথর ছিল, কিন্তু এইবার পথ সম্পূর্ণ ধূলিময়। পথে প্রায় ৮।১০ ইঞ্চি ধূলা, পা ফেলিলেই ধূলায় পা ঢুকিয়া যাইতেছে। এত উচ্চ পর্ব্বতে কোথা হইতে এমন ধূলা হইল বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কাছের পাহাড়গুলিও যেন মাটির পাহাড়, কোথাও একটি পাথর নাই। বেশ চাষবাসও হইতে পারে, কারণ পাথর না থাকায় জমিগুলি উর্ব্বরা।

খুব উতরাই নামিতে লাগিলাম। প্রায় দুই মাইল নামিয়া কানালিছিনার বাজারে পৌঁছিলাম। এখানে একটি স্কুল, দুটি ছোট ছোট দোকান আছে। এখনও কিছু বেলা আছে, কিন্তু আজ এখানেই থাকা স্থির

হইল। কারণ রাস্তায় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ মেঘাবৃত থাকার কারণ বৃষ্টি হইবার আশঙ্কাও আছে। অতএব ভারবাহী লোকটিকে কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলাম।

৭। কানালিছিনা।

কানালিছিনা বড়ই ছোট স্থান, কিন্তু অতিশয় রমণীয়। স্থানটি একটি পাহাড়ের উচ্চ শিখরের নিম্নেই অবস্থিত। এখান হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত উচ্চ পাহাড়গুলি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অদূরে পাহাড়ের নিম্নদেশে একটি নদী। আজ জল হইয়া গরম একটু কম হইয়াছে ও হাওয়া চলিতেছে। সুরম্য দৃশ্যগুলি ও সুশীতল বায়ুতে প্রাণ ও মন শীতল হইল। আজ সমস্ত দিন রৌদ্রে ও ভার বহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম পাইয়া শ্রান্তি দূর হইল। আবার বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল ও বেশ ঠাণ্ডা বোধ করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে একটি দোকানের বারাণ্ডায় বিছানা পাতিয়া নিদ্রা গেলাম। এ সমস্ত পার্ব্বতীয় দেশে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে হয় না, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। সুখশয্যায় পড়িয়া অনেক আরাধনার পরেও যে দেবীর দর্শন পাওয়া যায় না, এই সমস্ত স্থলে পাথরের উপর শুইলেও তৎক্ষণাৎ তাঁহার কৃপালাভ হইয়া থাকে।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ ইং ১৩ই জুন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিজের বোঝাগুলি ঠিক করিয়া বাঁধিয়া লইলাম। আবার চলিতে লাগিলাম। সামান্য চড়াইয়ের পর যেন রাস্তাটি সমতল হইয়া আসিল। পথে জনমানব কেহ নাই, একাই চলিয়াছি। দুই একটি লোক পিথোরাগড়ের দিকে কাছারী করিতে চলিয়াছে; কিন্তু আমি যে দিকে যাইতেছি সে দিকে কেহই যাইতেছে না। এই সকল পার্ব্বতীয় দেশের লোক নিজেদের কাযকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, সেই কারণ ইহাদের অন্য স্থানে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। পার্ব্বতীয় দেশে মেয়েরাই বেশীর ভাগ কায করিয়া থাকে। পুরুষেরা মাত্র হলপ্রবাহ ছাড়া আর কৃষিকার্য্যের কোন বিশেষ কায করে না। স্ত্রীলোকেরা বীজবপন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষিকর্ম্মের আর সমস্ত কায করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া প্রত্যহ পাহাড়ের নানাস্থান হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া গো মহিষাদির খাদ্যের বন্দোবস্ত করে। আবার কাষ্ঠ সংগ্রহ একটি বৃহৎ কার্য্য, অনেক দূর হইতে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া পিঠে বোঝা বহিয়া আনিতে হয়। মেয়েরা বড়ই কর্ম্মপটু, তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যেন সকল কর্ম্ম তাহারা আনন্দের সহিত করিতেছে। মেয়েরা কখনও একাকী বাহির হয় না, দুই চারি জন হইতে বিশ পঁচিশ জন এক সঙ্গে বাহির হয়। তাহারা যখন গান করিতে করিতে ঘাস বা কাষ্ঠ লইয়া ফিরিতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন তাহাদের কত আনন্দের জীবন। আবার যখন উচ্চ শিখরে দুই একজন একত্র বসিয়া থাকে তখন বোধ হয় যেন পার্ব্বতীয় দেবীরা বসিয়া আছেন।

রাস্তায় যাইতে যাইতে এইরূপ নানারকম দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। প্রায় বেলা ১০ টার সময় চরমাঘাটের উতরাই আসিল ও তাহার পরেই চরমাঘাটের চড়াই। লোকে এই স্থানকে চরমাগাড় বলে—চরমাঘাট বলে না। উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নভাগে ছোট ছোট নদী প্রবাহিত থাকে, এই ছোট নদীগুলিকে গাড় বা গাধেরা বলে। এই স্থলে একটী ছোট নদী আছে তাহারই নাম চরমা গাড়। চরমাগাড়ের উতরাই যদিও অনেকটা ও কঠিন, কিন্তু বিশেষ কষ্টকর নহে।

উতরাই নামিয়া চরমা নদীর উপর একটি কাঠের পুল দিয়া নদী পার হইলাম। নদী পার হইয়াই খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, কারণ সম্মুখেই চমরা গাড়ের চড়াই। চড়াই চড়িতে আরম্ভ করিয়াই বড়ই দম ফুরাইতে লাগিল। খাড়া চড়াই—রাস্তাটীও ভয়ানক খারাপ! আরম্ভেই পাথরগুলি খানিকটা সিঁড়ির মত সাজান, কিন্তু সেই কারণেই যেন আরও কষ্টকর হইয়াছে। যখন উঠিতেই হইবে, তখন আর কষ্ট হইলে উপায় কি, ধীরে ধীরে চড়িতে লাগিলাম। সকলেরই

শেষ আছে, অতএব এ সামান্য চড়াইয়ের শেষ হইতে আর বেশীক্ষণ লাগিল না।

গ্রামের ভিতর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। এখনও চড়াই অনেকটা আছে, একবার মনে করিলাম এই গ্রামেই আজ আহারাদি করিয়া তারপর অগ্রসর হইব। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আস্‌কোট (Askot) পৌঁছিব মনস্থ করিয়াছি, অতএব আর কিছুদূর চড়াইয়ের পর বস্তড়ি গ্রামে যাইব স্থির করিলাম। সেই গ্রামে একজন রাস্তার ঠিকাদারের নামে পত্র লেখা হইয়াছে, সেখানে পৌঁছিলে আহারাদির ব্যবস্থা হইবে।

আবার চড়াই চড়িতে লাগিলাম। সম্মুখে যে পাহাড় দেখা যাইতেছে, বোধ হইল উহার উপর চড়িলেই বস্তড়ি পৌঁছিব। বোঝার জন্য, বিশেষ কষ্ট হইতেছে, রৌদ্র প্রখর হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম। কোনও রকমে পাহাড়ের উপর উঠিলাম, কিন্তু সম্মুখেই দেখি আর একটি চড়াই, তাহার পর গ্রাম পাওয়া যাইবে। পার্ব্বতীয় দেশে একটি পাহাড়ের পর আবার একটী পাহাড় এই রকম করিয়া প্রায় চড়াইয়ের পর চড়াই আসিয়া থাকে। বোধ হয় এইবার চড়াই শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যেন শেষ হইয়াও শেষ হইতে চায় না। ক্ষুৎ-পিপাসা খুব লাগিয়াছে, আমার সঙ্গে রন্ধনের দ্রব্যাদি আছে, কিন্তু কাছে জল না থাকায় রন্ধনের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই। অতএব কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

এইবার চড়াই অতিক্রম করিয়া বস্তড়ি গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামটি রাস্তা হইতে অল্প দূরে। রাস্তা ছাড়িয়া সোজা গ্রামে ঢুকিলাম। যখন আমি জয়দেব ঠিকাদারের গৃহে পৌঁছিলাম (তাঁহারই গৃহে আজ অতিথি হইবার কথা ভাবিয়াছিলাম) তখন আমি ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বসিয়া জিনিসগুলি পিঠ হইতে খুলিলাম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জয়দেব আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিচয় পাইয়াই আমার ভোজনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমাদের রন্ধন প্রস্তুত আছে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে ভোজন করিলে বড়ই আনন্দিত হইব।" আমার আর বিশেষ আপত্তি কিছু ছিল না, তিনি তো ব্রাহ্মণই, তা পার্ব্বতীয় হউন আর দেশীয়ই হউন। তাহা ছাড়া, আমি পরিব্রাজক। আমি কোথাও জাতিভেদ বিচার করিয়া কায করি না।

গ্রামে একটি জলের ঝরণা আছে, স্নানাদি করিয়া আসিয়া ভোজনে বসিলাম। বৃদ্ধ জয়দেব স্বহস্তে পরিবেষণ করিলেন ও বড় যত্নের সহিত খাওয়াইলেন। ভাত আর ডাল, তরকারির মধ্যে কিছুই ছিল না। বেসন সিদ্ধ করিয়া তরকারির মত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, ইহা খাইয়াই বেশ তৃপ্তি লাভ করিলাম। ক্ষুধা থাকিলে সকল খাদ্যই ভাল লাগে।

আহারান্তে মনে করিলাম এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া আবার চলিব। কিন্তু মাছির জালায় এক দণ্ডের জন্যও বিশ্রাম করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সকল পার্ব্বতীয় দেশে মাছির বড়ই উৎপাত। পার্ব্বতীয় দেশের গ্রামগুলিও বড় অপরিষ্কার, সেই জন্যই বোধ হয় মাছির এত দৌরাত্ম্য। পথে কিংবা পর্ব্বতের অন্য কোন স্থানে মাছির জন্য কষ্ট পাইতে হয় নাই, কিন্তু বসতিতে ঢুকিলেই মাছির বড় উপদ্রব। পার্ব্বতীয় দেশের ঘরগুলিও বড় ছোট ছোট। গ্রামগুলি পর্ব্বতের ধারে অবস্থিত বলিয়া স্থানাভাব বড় বেশী। এই সকল গ্রামের গৃহগুলি দ্বিতল। প্রথম তালার ঘরগুলি প্রায় ৬ফুট মাত্র উঁচু ও সমস্তটা একটি লম্বা গোয়াল ঘরের মত। যাঁহারা গোয়াল কখনও দেখেন নাই (সহরে এ রকম অনেক ভদ্রলোক আছেন) তাঁহাদিগকে একটা লম্বা হল বলিয়া বুঝাইতে হইবে। এই লম্বা ঘরটি গোয়ালের কার্য্যেই ব্যবহার হইয়া থাকে। পার্ব্বতীয়রা নিম্নতলে গো-মহিষাদি রাখে, পশুদিগের খাইবার ঘাস ইত্যাদিও জমা করিয়া থাকে। প্রত্যেক পার্ব্বতীয়েরই অনেকগুলি করিয়া গো-মহিষাদি থাকে। এই উচ্চ পর্ব্বতেও বেশ ভাল ভাল মহিষ আছে। দ্বিতলে একটি বারান্দা ও দুইটি ঘর থাকে। বারান্দাটি নেহাৎ নিচু করা হয় না, কিন্তু

তাহার দরজা জানালাগুলি বড়ই ছোট ছোট। ঘর দুইটিও বড়ই ছোট ও উর্দ্ধেও খুব কম—প্রায় অন্ধকার বলিলেই হয়। দরজা জানালা প্রায় থাকে না। এই সকল শীতপ্রধান দেশে দরজা ও বড় জানালা রাখিলেই বড় কষ্টকর হইবে, সেই কারণ খুব ছোট ছোট দরজা জানালা রাখা হয়। ঘরগুলি অন্ধকার বলিয়া মাছি হইতে পরিত্রাণ পাইবার অনেকটা উপায় আছে। পার্ব্বতীয় লোক গুলিও বড় পরিষ্কার নয়; বাড়ী ঘর গুলির সর্ব্বত্রই, যাহা তাহা পড়িয়া থাকায় খুবই মাছি হয়। গ্রামের সর্ব্বত্রই আবর্জ্জনা। লোকগুলি বলিষ্ঠ নয় তাহারা সকলেই প্রায় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, ব্যাধিও যথেষ্ট আছে, দেখিতেও তেমন সুশ্রী নয়। নেপালের লোকগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান, দেখিতেও খুব সুন্দর, কিন্তু বুঝিতে পারা গেল না নেপালের হিমালয়বাসী ও কুমায়ুনের হিমালয়বাসীদিগের মধ্যে কেন এত প্রভেদ।

যখন বিশ্রাম করিতে পারিলাম না, তখন রৌদ্রের প্রখরতা স্বত্বেও আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। জয়দেব পণ্ডিত আমাকে গ্রামের বাহির পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার পর আমি আবার পাহাড়ের চড়াই চড়িতে লাগিলাম। বেশ চড়াই আছে, প্রায় এক মাইল চড়িয়া পর্ব্বতের শিখরে পৌঁছিলাম। এইবার সম্মুখে আসকোট দেখা যাইতেছে। পাখী উড়িয়া গেলে বোধ করি কোন ক্রমে এক মাইলের বেশী হইবে না। কিন্তু পার্ব্বতীয় হাঁটা পথ ৬।৭ মাইলের কম নয়। স্থানটি দেখিতে বড়ই রমণীয়। দৃশ্যপটের যেন একবারেই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সম্মুখেই খুব উচ্চ উচ্চ পাহাড়, যেন এইবার প্রকৃত হিমালয়ের কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একটি উচ্চ পাহাড়ের পর আর একটি উচ্চ পাহাড়, তার পর আর একটি। ক্রমান্বয়ে এই রূপই চলিয়াছে—কি সুন্দর দৃশ্য! এইবার সকলের শেষে তুষারাবৃত স্বয়ং হিমাচল দেখা দিবেন। তবে তাঁহার দর্শন পাইতে এখনও বিলম্ব আছে।

হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। কাছেই সিঘাল গ্রাম, নিকটেই গ্রাম্য স্কুল, কিছুক্ষণ স্কুলে বিশ্রাম করিলাম। পার্ব্বতীয় দেশে যেমন হঠাৎ বৃষ্টি আসে সেই রকম তৎক্ষণাৎ যায়। সিঘালের একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পূর্ব্বে সিঘালের ভিতর দিয়া সোজা জিউলজীবি পর্য্যন্ত রাস্তা গিয়াছিল। সেই রাস্তা দিয়া গেলে কয়েক মাইল পথ কম হইত। কিন্তু পথে নদীতে পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখন আসকোট (Askot) হইয়া গার্জ্জিয়াস্থানে পুল না পার হইলে আর জিউলজীবি পৌঁছিবার ও সেখান হইতে কালীগঙ্গার তীরস্থ রাস্তা ধরিবার কোন উপায় নাই। তিনি আজ আমাকে তাঁহাদের স্থানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু যদিও সন্ধ্যা আগতপ্রায় তথাপি আজ বেশি চলি নাই, সেই কারণ আসকোট যাওয়াই স্থির করিলাম।

প্রায় এক মাইলের অধিক নামিয়া একটি পুল পার হইলাম। পুল পার হইয়া কিছু চড়াই পাইলাম, তাহার পরেই প্রায় সমতল রাস্তা; অবশ্য পার্ব্বতীয় দেশের সমতল বুঝিয়া লইতে হইবে। বড় বড় দেবদারু গাছের জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। দৃশ্য অতি মনোরম। সমস্ত দিন গ্রীষ্ম ও কষ্টের পর সন্ধ্যার শীতল বায়ুতে একটু শান্তি বোধ করিতেছি। কোথাও কোথাও গাছে বানরেরা কিচমিচ করিতেছে— তা ছাড়া সমস্ত শান্ত ভাব। রাস্তার ধারেই একটি গ্রাম, সেইখানেই প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পাখীরা গাছে বাসা লইয়াছে ও এক একবার যেন বলিতেছে, পথিক তুমিও বিশ্রাম কর আমি একবার দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, তাহাদের কথামত কায করি। কিন্তু আজ আসকোট পৌঁছিতেই হইবে স্থির করিয়াছিলাম। আবার চলিতে লাগিলাম। যথাসাধ্য দ্রুতবেগে চলিতেছি, কিন্তু পিঠে অধমণ বোঝা বাঁধা থাকায় বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। অতি প্রত্যুষেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছি, প্রায় বিনা বিশ্রামে সমস্ত দিনই চলিতেছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, বড়ই ক্লান্ত

হইয়া পড়িলাম। প্রতি পদেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি, কিন্তু মানসিক উৎসাহের কারণ শারীরিক কষ্ট তেমন বোধ হইতেছে না।

ক্রমে বেশ অন্ধকার হইয়া পড়িল। জঙ্গলের মধ্য দিয়াই চলিয়াছি। সমস্তই যেন তমোময় বোধ হইতেছে; কিছুদূর অগ্রসর হইতেই যেন পর্ব্বতের গায়ে একটি দীপমালা দেখা দিল, বুঝিতে পারিলাম উহাই আস্কোট।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

দেবী

(Ben Jonson)

তব প্রসন্ন দৃষ্টিতে শুধু করো করো মোরে গৌরবী,
আঁখি দিয়ে শুধু পিই তব রূপ সিন্ধুটি,
পিয়ালাতে শুধু চুম্বন রাখ, তুষ্ট রহিব তাই লভি,
খুঁজিব না তাহে না থাকুক সুরা বিন্দুটি।

গভীর অন্তরাত্মা হইতে যেই তৃষা জাগে, সুন্দরি,
চাহে তা দিব্য জীবন-পানীয় বৈভব,
ইন্দ্রও যদি পিইতে বলেন অমৃতভাণ্ড দান করি,
তবুও তা ফেলে অধর সুধাই চাই তব।

অমল কমলে মালিকা গাঁথিয়া প্রেরিলাম তোমা, সুন্দরি,
তব মহিমার যোগ্য অর্ঘ্য নয়, তবু
ভাবিয়াছিলাম চির অভিরাম জাগিবে তা' দিবাশর্ব্বরী
তোমার কণ্ঠে লভিবে না তাহা ক্ষয় কভু।

নিঃশ্বাস দিয়ে ফিরায়ে দিয়েছ, দল রেণু মকরন্দেরে
পাবন করিয়া, নাসার পবন গৌরবে,
সেই হতে দেখি নিখিল কমল হারাইয়া নিজ গন্ধেরে
সুরভি হয়েছে তোমার তনুর সৌরভে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পল্লী প্রণয়

(Lord ittleton)

মাঠ দিয়ে সে চলে যখন আঁচল উড়ে যায়,
যদ্দূর মোর দৃষ্টি চলে দাঁড়িয়ে থাকি ঠায়।
সাধ যায় যাই পিছন পিছন, হয়না সাহস মোটে,
দেখলে তারে প্রাণটা আমার কেমন করে' ওঠে।

সইতে নারি, চায় যদি সে অন্য কারো পানে,
সইতে নারি, কথা যদি কয় আর কাহারো কাণে!
মোদের দলের আর কারো সে তারিফ যদি করে,
অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও চটি তাহার 'পরে।

সাঁতার কাটা, গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ খেলা,
ঠাকুর বাইচ, চড়ক, গাজন, দোল ঝুলনের মেলা,
সে যদি রয় উপস্থিত—সবেই লাগে মন,
তার বিহনে সব লাগে বিষ—বিফল আয়োজন।

সে যেন ভাই গাঁয়ের রাণী, রূপের দেমাক ভারি—
গ্রাহ্য তারে করবোনাক ভাবি, কৈ আর পারি?
নিজের দশা ভেবে আমার নিজেরই পায় হাসি,
এই কি স্যাঙাৎ ভালবাসা? তায় কি ভালবাসি?

শ্রীকালিদাস রায়।

মিনতি

আজ বাদলের আব্‌ছা আলোয় তোমায় কথা পড়্‌চে মনে
শাল পিয়ালের বিপুল ছায়ায় জাগ্‌চে ব্যথা সঙ্গোপনে।
তৃণশিশুর পরাণ খানি
শুন্‌লে কাহার চরণ বাণী
দূরের সীমায় নয়ন তুলে ডাক্‌চে কারে বুকের কোণে!

এই জীবনের একটি নিশায় পাইনি তোমায় বক্ষে একা
রাত্রি দিনের অধীর আশায় সার হয়েচে হরফ লেখা।
চুমুর পরশ চিঠির বুকে
এ জীবনে রইলো লুকে
সত্যি করে পাইনি তোমায় মনের মণি-সিংহাসনে।

কল্পনারি স্বপন-কুহক বুন্‌তেছিনু তোমায় মাগি
ছিঁড়্‌লো সে তার একটুখানিক অভিমানের আঘাত লাগি।
হে মোর চপল বিজয় রাণী
ত্রুটি আমার নিলাম মানি—
ক্ষমা করে' ভাঙ্‌তে কি নেই সে অভিমান একটি ক্ষণে

তোমার মুখে সরম মাখা হাসির আলো একটু খানি
দেখ্‌তে পেলে সান্ত্বনা মোর আস্‌তো বুকে অনেক, জানি।
কারণ-বিনায় ও মুখ-ভারী
আর যে প্রিয়া সইতে নারি—
দিও না আর প্রাণে ব্যথা নয়ন তোলো হাসির সনে।

বন্দে আলী মিয়া।

দুর্য্যোগে

ঢেউএর ভীষণ নৃত্য দেখে
করিস্ নে তুই ভয়,
মরণটাকে তুচ্ছ করে'
ঝাঁপিয়ে ওতে পড়্।
আজ ভাদরের বুকের পরে,
মেঘ সাজানো স্তরে স্তরে,
মাঝিরা সব পালিয়ে গেছে
সুদূর দুরান্তর;
শিকার-হারা বাঘের তেজে
ঝাঁপিয়ে ওতে পড়্।

নেইক তরী নদীর 'পরে
নেইক পথে গায়,
গাছগুলি সব ঠায় দাঁড়িয়ে
ভিজচে অবিশ্রান্ত,
দাঁড়িয়ে কেন নদীর কূলে
আকুল ভরে? যাত্রা ভুলে—
কাথের বোঝা জড়িয়ে পিঠে
ঝাঁপিয়ে পড়্ উদ্‌ভ্রান্ত,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরুক বারি
যতই অবিশ্রান্ত।

নদীর পারে আছে মা তোর
তোরই প্রতীক্ষায়;
কাঁদিস্ কেন? বুক বেঁধে নে
সময় বয়ে যায়।
ঘূর্ণ স্রোতের কণ্ঠ টুটে',
শোন্ কি বাণী উঠ্‌চে ফুটে!
দেখ্ কি হাসি খেল্‌চে মুহুঃ
জমাট মেঘের গায়
কাঁদলে বসে চল্‌বে নাকো
সময় বয়ে যায়।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঘুপি শিকার।

'ঘুপি' শিকার সচরাচর আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর শিকারীরাই করিয়া থাকে। যাহাদের সর্ব্বদা হাতী চড়িয়া শিকার করিবার সুবিধা নাই, অথচ বনের নিকটেই বাড়ী, তাহারাই ঘুপি শিকার করে।

রাত্রে যে সব স্থানে হরিণ চরিবার জন্য বাহির হয়, দিনে তাহার নিকটবর্ত্তী সুবিধা মত স্থানে, 'ঘুপি' প্রস্তুত করিতে হয়। বনের কোন কোন ঝোপের বহিরাবরণ সম্পূর্ণ ঠিক্ রাখিয়া ভিতরে দুই একজন বসিবার মত স্থান পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ইহাতে বাহির হইতে কোন জানোয়ার, উহার অভ্যন্তরস্থ শিকারীদের অস্তিত্ব একেবারেই বুঝিতে পারে না।

সন্ধ্যার পর হইতেই, এইসব 'ঘুপি'তে এক কি দুইজন শিকারী যাইয়া বসিয়া থাকে। ঘুপির মধ্যে তামাক ইত্যাদি খাওয়া বা 'কাণাকাণি' করিয়া বেশী কথাবার্ত্তা বলাও উচিত নয়। জ্যোৎস্না রাত্রি ছাড়া এই প্রণালীতে শিকার করা চলে না। খুব পরিষ্কার জ্যোৎস্না না হইলে শিকার ভালরূপ দেখা যায় না; যেন কালো একটা ঢিপির মত মনে হয়।

এইসব ঘুপির নিকটে কোন্ সময় শিকার আসিবে ঠিক্ নাই, কাযেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি মশকদংশনের সুখ উপভোগ করিয়া, বিফল হইয়াও বাড়ী ফিরিতে হয়। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে, কোন কোন স্থানে আবার সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই হরিণ বাহির হইয়া আইসে, কখনও বা শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত হরিণের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। খুব চুপ করিয়া থাকিলে ইহারা চরিতে চরিতে এত নিকটে আইসে যে, প্রায় বন্দুকের নল গায়ে ঠেকাইয়াই মারা যায়। দূর হইতে দেখা গেলেই তাড়াতাড়ি করিয়া মারা ঠিক্ নয়, খুব নিকটে নিশ্চিতের মধ্যে আসিলেই মারা উচিত। একে রাত্রে ইহাদিগকে কালো ঢিপির মত দেখায়, তারপর আবার এক চক্ষু বুজিয়া রীতিমত নিশানা করিয়া মারিলে, অনেক সময়ই গুলি 'মিস' হয়, এইসব কারণে দূর হইতে মারা ঠিক্ নয়, বরং দুই চোখ চাহিয়া বন্দুক সোজা করিয়া মারিলে গুলি ঠিক্ লাগে। আমি প্রথম প্রথম এক চক্ষু বুজিয়া কয়েকদিন ঠকিয়াছি, পরে স্থানীয় আমজাদ আলী মুন্সী নামক একজন খুঁজি ও শিকারী, আমাকে এই কৌশলটী শিখাইয়া দেয়। তাহার পর হইতে আমি এই উপায়ে খুব ভাল ফল পাইয়াছি।

গারো পাহাড়ের নিচে ও সিলেটে সচরাচর যে সব স্থানে আমরা শিকার করিয়া থাকি, উহাতে গাছ বড় কম, কাযেই অধিকাংশ স্থানে মাটিতে 'ঘুপি' করিয়া শিকার করিতে হয়; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে গাছড়া জঙ্গলে মাচা তৈয়ারী করিয়া শিকার করাই সুবিধা।

আজকাল রাত্রে শিকার করিবার জন্য, বন্দুকের মাছিতে রেডিয়ম প্রভৃতি লাগাইয়া, নানা রকম 'নাইট সাইট' হইয়াছে, পূর্ব্বে এসব ছিল না। আমি কোন কোন সময় বন্দুকের মাছিতে চুণের ফোঁটা দিয়া, কখনও বা আঠা দিয়া জোনাকী পোকা লাগাইয়া 'নাইট সাইট' করিয়া লইয়াছি, ইহাতেও বেশ কায হয়। জ্যোৎস্না রাত্রে রেডিয়ম অপেক্ষা জোনাকী পোকায় ভাল দেখা যায়। পূর্ব্বে যখন আমার বঁড়শী শিকারের বড় বাতিক ছিল, তখন

বঁড়শীর 'ফাৎনার' উপর জোনাকী পোকা লাগাইয়া রাত্রে মাছ ধরিয়াছি।

অনেকদিন আমি একজন মাত্র লোক সঙ্গে লইয়া, রাত্রির পর রাত্রি ঘুপিতে কাটাইয়া, অনেক শিকার করিয়াছি; তবে অধিকাংশ সময়ে বিফল হইতে হইয়াছে।

অনেক দিনই গভীর রাত্রে ঘুপিতে বসিয়া এক অনির্ব্বচনীয় বিরাট ভাব উপলব্ধি করিতাম। দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যে যখন কেবল নৈশ বায়ু সঞ্চালিত বৃক্ষপত্রের সন্ সন্ শব্দ ব্যতীত কচিৎ নিশাচর পক্ষীদিগের বিকট কর্কশ রব ও দূর গ্রাম্য কুক্কুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুদ্ধ প্রকৃতিকে আলোড়িত করিয়া তুলিত, পরম কারুণিক জগৎপিতার রচনা-কৌশল মনে হইয়া চক্ষু আপনা আপনি সজল হইয়া উঠিত। বনচারী পশুদের জন্যও তিনি সমস্তই অপূর্ব্ব কৌশলে যেখানে যেটী দরকার, পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন :—

"এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি, সাজায়ে রেখেছ।"

অনেক সময় ঘুপিতে হরিণের উদ্দেশে বসিয়া থাকিলেও, বাঘ কি মহিষ আসিয়াও উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহিষগুলি বাঘ অপেক্ষা হিংস্র; ইহারা বনে মানুষের গন্ধ পাইলেই, মাথা উচু করিয়া শুঁকিতে শুঁকিতে আন্দাজে আন্দাজে সেই দিকে আসিতে থাকে। সেই সময় উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব ঘটিলে বিপদ অনিবার্য্য। এইরূপ বিশালকায় কোপন স্বভাব পশুকে, বিশেষতঃ রাত্রে বিপদের সময় প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন।

একবার গারো হিলের নীচে মহিষখোলার নিকট-বর্ত্তী গোপালপুরের জঙ্গলে একজন স্থানীয় মুসলমান শিকারী, এইরূপে একটী মহিষ কর্ত্তৃক অতি শোচনীয় ভাবে নিহত হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, আমরা তথায় শিকার করিতে গিয়া একপাল মহিষ পাইয়া, একদিনে ৫।৬টা শিকার করিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে একটী হাস্য-কর গল্প বলিতেছি ;—

আমাদের শিকার পার্টিতে এপর্য্যন্ত বহুস্থানে বহু মহিষ শিকার করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। আমাদের ময়মনসিংহ জেলার ভাটি অঞ্চলে ও শ্রীহট্টে, মুসলমানদিগের মহিষ খাওয়ার লোভ এত প্রবল যে, উহারা মহিষ পাইলে যেন আর কিছুই চাহে না। আমরা কোন স্থানে মহিষ শিকার করিলেই ইহারা দলে দলে, জঙ্গল যতই দুর্গম হউক না কেন, প্রত্যেকে এক একটী বড় বাঁশের চ বা লোহার কাঁটা ও একগাছি সরু গুণ এবং এক একখানা বড় ছুরি হস্তে আসিয়া হাজির হইবেই। মহিষ মারা পড়িলেই একদিকে যেমন উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়িতে থাকে, তেমনি নীচেও দলে দলে ইহারা মৃত মহিষের চামড়া ছুলিয়া ছুরি দ্বারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া মাংস কাটিয়া, ঐ বড় বড় ছুঁচ দিয়া ফুঁড়িয়া, গুণের মধ্যে মালা গাঁথার মত গাঁথিতে থাকে। তখন শকুনের সাধ্য কি যে, এই সব নর-শকুনের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে। উহারা চলিয়া গেলে উহাদের পরিত্যক্ত যে নাড়ীভুড়িগুলি থাকে, তাহা খাইয়াই শকুন বেচারাদের পরিতুষ্ট হইতে হয়। কিন্তু কোন সময় আবার গারো আসিয়া জুটলে, নাড়ীভুড়িগুলি পর্য্যন্তও উহাদের পক্ষে লোভনীয় হইয়া উঠে। ইহারা মাংস লইয়া যেরূপ মারামারি কাটাকাটি করে, শকুনের পক্ষেও তাহা অসাধ্য। অনেক সময় দুই দল হইয়া লাঠালাঠি মারামারি করিয়া জখম পর্য্যন্ত হয়; ইহাই ইহাদের চিরন্তন প্রথা। ঐ দৃশ্য যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে তাহার উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই।

সেদিনকার শিকারে, ৫।৬টী মহিষ মারা হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বয়ার (মদ্দা) এবং অন্যগুলি কাকিনী (মাদি) ছিল। এদিনও যখন ইহারা পূর্ব্বোক্ত-রূপে ছুরি চালাইয়া মাংসের টুকরাগুলি গুণে গাথিতে-

ছিল, তখন আমরা মহিষের কর্ত্তিত মস্তকগুলি হাতীতে তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। হঠাৎ 'মাংস চুরি করে, মাংস চুরি করে' বলিয়া একটা সোর গোল উঠিল। বাস্তবিকই দেখা গেল যে, একজনের গুণে গাঁথা মাংস অপর একজন চুরি করিয়া তাহার গুণ পূর্ণ করিতেছে। যাহার মাংস চুরি হইতেছিল, সে নিমেষের মধ্যে ঘুরিয়া চোরের ডান কাণ ধরিয়া ছুরির একটানেই আমূল ছেদন করিয়া ফেলিল। আমরা ত একেবারে অবাক্! এত শীঘ্র এই ঘটনা ঘটিল যে, কাহারও প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, কথাটী বলারও অবসর হইল না। ইহার পরই উহারা দুই দল হইয়া, বিষম দাঙ্গা হাঙ্গামার সূচনা করিয়া তুলিল। তখন আমরা নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া দুই দলকে পৃথক করিয়া দিলাম। কাণকাটা বেচারার পক্ষে "লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং" প্রবাদটী ফলিয়া গেল।

ইহার পর হইতে, আর আমরা ইহাদিগকে মহিষ ছুঁইতে দিতাম না। আমরা মাথা ও চামড়া নিয়া আসিলে পর যাহা হয় হইত। ঘুপি শিকার প্রসঙ্গে আমাদের হাওদা শিকার উপলক্ষে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার গল্পটী বলিলাম। এখন ঘুপিতে বসিয়া, আমি যেরূপে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি।

হাতী খেদা উপলক্ষে একবার আগরতলার পাহাড়ে আমি কিছুদিন অবস্থান করি। একদিন পাহাড়ের উপর কোন একটী 'থলা'তে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে প্রায়ই হরিণ চরিতে আইসে জানিতে পারিয়া, ঐ থলার নিকটে একটী ঘুপি প্রস্তুত করিয়া বসি। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বেই, আমাদের সম্মুখে বনের অপর দিক হইতে যেন অতি গম্ভীর ভাবে রাজকীয় চরণবিন্যাসে, বনাধিপতি এক বৃহৎ ব্যাঘ্র সস্ত্রীক আসিয়া আমাদিগের নিকট হইতে ২।২॥শত গজ দূরে বেশ আরাম করিয়া বসিল। আমার সঙ্গে একটী মাত্র ছর্‌রার বন্দুক ও কয়েকটী Buck shot cartridge এবং দুইটী মাত্র গুলি ছিল। ছোট হরিণের খবরে আসিয়াছিলাম বলিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে এ জন্য যথেষ্ট অনুশোচনা করিতে হইয়াছিল।

ব্যাঘ্র দম্পতীর স্বাধীনভাবে বিচরণ ও ক্রিয়া কলাপে এত অভিভূত হইয়াছিলাম যে, আমার কেবলই মনে হইতেছিল, একটী 'কোডাক্' ক্যামেরা সঙ্গে থাকিলে এই প্রণয়ী যুগলের স্বাভাবিক অবস্থার ছবিখানি তুলিতে পারিতাম। অবশেষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া হাতী আনাইয়া তবে ক্যাম্পে ফিরিয়া যাই।

এই ক্যাম্প হইতেই, আর একদিন অন্য এক পাহাড়ে, এক আমড়া গাছের নীচে প্রায়ই আমড়া খাইতে হরিণ আইসে খবর পাইয়া নিকটস্থ একটী প্রকাণ্ড উই ঢিপির উপর যাইয়া আমরা বসি। বলা বাহুল্য, গাছের ডালপালা কাটিয়া উহার চতুর্দ্দিকে আড়াল করিয়া কৃত্রিম বন করিয়া লইয়াছিলাম। তখনও পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রক্তিমচ্ছটা মিলাইয়া যায় নাই, বন্য কুক্কুটের দল গাছের নীচে নীচে পাহাড়ের গায়ে ছুটাছুটি করিতেছে। হঠাৎ একটী ছোট হরিণকে আমাদের সম্মুখ দিয়া চকিতের মধ্যে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বনস্থলী কম্পিত করিয়া বামদিকে ভীষণ গর্জ্জন উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহার প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই, দক্ষিণ দিক হইতে আর একটী গম্ভীর ধ্বনি দ্বারা ইহার প্রত্যুত্তর শোনা গেল। তখন আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, ব্যাঘ্রদম্পতী আমাদের উভয় দিক হইতে পরস্পরকে প্রণয় সম্ভাষণ করিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গভীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, ব্যাপারও ক্রমেই যেন গুরুতর হইতে চলিল। এক একবার দুই দিক হইতে দুইটী বাঘই ডাকিতে ডাকিতে প্রায় আমাদের উই ঢিপির নিকট আসিয়া, আবার দূরে চলিয়া যায়। আবার আসে, আবার যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর্য্যন্ত এই অভিনয় চলিতে লাগিল। তখনও

কিন্তু জ্যোৎস্না উঠিবার বিলম্ব ছিল। যাহা হউক একবার যাই বুঝিলাম উহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে, তখনই আমরা তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া, পাহাড়ের নীচেই হাতী ছিল, তাহাতে উঠিয়া প্রস্থান করিলাম।

ঘুপিতে ছোট শিকারের উদ্দেশ্যে গেলেও, যে কোন বিপদ উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া, প্রস্তুত হইয়া যাওয়াই উচিত।

হাঁটা শিকার।

যাঁহারা হাটিয়া শিকার করেন, তাঁহাদের হাওদা শিকারী অপেক্ষা ধৈর্য্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া দরকার। হাওদা শিকারে অনেক সময় নিষ্ফল হইলেও সফলতার সংখ্যাই অধিক, কিন্তু ইহাতে তাহার বিপরীত। হাঁটা শিকারীকে, পাহাড়ে বা সমতল ভূমির যে জঙ্গলেই শিকার করিতে হয়, খুব নিরাপদ অথচ জানোয়ার আসিবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বৃক্ষ বা প্রস্তরের অন্তরালে চুপ করিয়া দাঁড়াইতে হয়। বন বা পাহাড়ের অপর দিক হইতে কুলী দ্বারা হাঁকোয়া (drive) করিতে হয়। অপর দিক হইতে তাড়া পাইয়া জানোয়ার প্রায়ই শিকারীর দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়; কোন কোন সময় জঙ্গল একটু পাতলা হইলে দৌড়াইয়াও আইসে। সেই সময় খুব ধৈর্য্য সহকারে গুলি করিলে প্রায়ই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না ও একাধিক গুলিরও বড় প্রয়োজন হয় না।

স্থান নির্ব্বাচনের দোষে, শিকারীকে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। জানোয়ার বাহির হইয়াই যদি শিকারীকে দেখিতে পায়, এরূপ স্থানে বসিলে বিপদের সম্ভাবনাই অনেক সময় থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় জঙ্গলের অবস্থানুসারে এইরূপ না করিয়াও উপায় নাই; কাযেই শিকার করিতে ইচ্ছা হইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব তাঁহাদের নিতেই হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্র এই অবস্থা ঘটে না। যাঁহারা নূতন শিকারী, তাঁহাদের এইরূপ ব্যবস্থা এড়াইয়া চলাই ভাল।

জানোয়ার চলিয়া যাইবার পাশে (sideএ) স্থান নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য। এই জাতীয় শিকারে ২।৪ হাতের মধ্যেও জানোয়ার দেখা যাইতে পারে, ইহা মনে করিয়া প্রস্তুত হইয়া যাওয়াই উচিত। যাঁহাদের মনে এ সাহস নাই, তাহাদের এ ভাবে শিকার করিতে যাওয়াই মূর্খতা। হাঁটা শিকারীদের একটু উপস্থিত বুদ্ধি থাকাও দরকার, হঠাৎ কোন সময় বিপদগ্রস্ত হইয়া উত্তেজিত বা 'নার্ভাস' হইয়া পড়িলে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

স্থান নির্ব্বাচনের দোষে আমি একবার অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। ২৪ পরগণার শ্রীনগর নামক স্থানে, আমি ও স্বর্গীয় মনু বাবু একবার শিকার করিতে যাইয়া, দুইজন দুই স্থানে বসিয়া, হাতী ও লোক দিয়া জঙ্গল drive করাইতেছিলাম। আমি একটী শুকনা পুকুরের মধ্যে, ফাঁকা স্থানে বসিয়াছিলাম। পুকুরের পাড়ে drive করান হইতেছিল, হঠাৎ এক প্রকাণ্ড চিতাবাঘ বাহির হইয়া, আমাকে ফাঁকায় দেখিয়াই একেবারে চার্জ্জ করিয়া, আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। এত তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িল যে, আমি অতি কষ্টে এক গুলিতেই উহাকে হীনবীর্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমার সম্মুখে তিন হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িলে, আমি উহাকে আঘাত করি; কিন্তু দৌড়ের (charge) ঝোঁকে সে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়ে, আমিও ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া উল্টাইয়া পড়িয়া যাই। উহার বুক হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল; আমারও বুট ও প্যাণ্ট ইত্যাদি রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তাড়াতাড়ি উঠিয়াই বন্দুকের দ্বিতীয় নলের সদ্ব্যবহার করি,—কিন্তু তাহার দরকার ছিল না। যদি আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইত বা 'মিস্‌ফায়ার' হইত, তাহা হইলে হয়ত আজ আমার এখানে বসিয়া গল্প লেখার অবসর হইত না।

এইরূপ হাঁটিয়া শিকারের আর এক রকম নূতন পদ্ধতি কৃষ্ণনগর, সোনাডাঙ্গা, মুড়াগাছা প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিয়াছি। ইহা আমার নিকট আরও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। ঐ সব স্থানের মধ্যবিত্ত সৌখীন

শিকারিগণ, কেহ একটী কেহ বা ২।৩টী করিয়া কুকুর পোষেন। সাধারণতঃ টেরিয়ার স্প্যানিয়েল কুকুরই বেশী; দুই একটী বুল টেরিয়ারও দেখা যায়।

গ্রামের মধ্যে বা গ্রামান্তরে কোন বাঘের সংবাদ পাইলে ৪।৫টী, কখনও কখনও ৬।৭টী কুকুর লইয়া ২।৪ জন শিকারী যাইয়া জঙ্গলে কুকুর ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরা জঙ্গলের অবস্থা বুঝিয়া, যে সব স্থান দিয়া বাঘ যাইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সব স্থানে এক বা দুইজন করিয়া দাঁড়ান। কুকুরগুলিও একত্র শিকার করিতে অভ্যস্ত হওয়াতে আর নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করে না। ছাড়িয়া দিলেই জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িয়া, যাহার যে দিকে ইচ্ছা শুঁকিতে শুঁকিতে যায়, বাঘ না পাইলে কতক্ষণ ঘেরাফেরা করিয়া বাহির হইয়া আসে। যদি বাঘডাসা, গো-সাপ, শেয়াল কি অন্য কোন জন্তু দেখে, তবে ঘেউ ঘেউ করিয়া ২।১ বার ডাক দিয়াই ক্ষান্ত হয়; কিন্তু হঠাৎ বাঘ দেখিতে পাইলে ভয়ানক জোরে ডাকিতে আরম্ভ করে, সে ডাকের আর বিরাম নাই। একটা বা দু'টা কুকুর প্রথমে বাঘ খোঁজ করিলে, পরে অবশিষ্টগুলিও যাইয়া উহার চারিদিক ঘিরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় বাঘ এত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে প্রায় নড়িবার শক্তি থাকে না। কোন গাছ বা ঝোপের দিকে পিছন করিয়া "কোণ ঠাসা" হইয়া বসিয়া সেও ক্রমাগত ডাকিতে থাকে। তখন বাঘের ও কুকুরের ডাক মিলিয়া এক বিকট ধ্বনি উত্থিত হয়। বাঘ এক একবার চার্জ্জ করিয়া, কোন কুকুরের দিকে ছুটিয়া যাইতেই, কুকুরটী দৌড় দেয়। অমনি পিছন দিক হইতে অন্য কুকুর গিয়া বাঘের পিছে ডাকিতে থাকে বা কামড়াইয়া ধরে। ইহাতে অগ্রগামী কুকুরকে ছাড়িয়া দিয়া, পিছনের দিকে ফিরিতেই, আবার আর একদিক হইতে আর একটী আসিয়া ঐরূপ ডাকিতে থাকে বা কামড়াইয়া ধরে। এইরূপ দুই চারিবার করার পরই বাঘ নিজকে অত্যন্ত বিব্রত মনে করিয়া, কোন গাছ বা ঝোপের আশ্রয় লইয়া, আবার 'কোণ ঠাসা' হইয়া বসিয়া ডাকিতে থাকে। অনেক সময় গাছে উঠিয়াও আত্মরক্ষা করে। তখন কুকুরগুলিও নীচে দাঁড়াইয়া, উপর দিকে তাকাইয়া ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। কখনও কখনও বাঘ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইয়া, আর এক জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লয় কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই; কুকুরগুলি পাছে লাগিয়া আছেই। কোন কোন সময় চার্জ্জ করিয়া, ২।১টা কুকুরকে ধরিয়া জখম করিয়াও দেয়। কিন্তু অন্য কুকুরগুলি তাহাতে ভীত না হইয়া, সমভাবেই পূর্ব্ববৎ বিরক্ত করিতে থাকে। আবার কখনও বা খপ্ করিয়া এক আধটা কুকুর ধরিয়া, বুকের নীচে চাপিয়া রাখিয়া ডাকিতে থাকে। অন্য কুকুরের উৎপাতে, যখন উহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়, তখন দেখা যায়, উহার গায়ে একটী আঁচড়ও লাগে নাই! মুক্ত হইবা মাত্রই আবার ক্ষুদ্র প্রাণী দলে মিশিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে। বাস্তবিক ছোট ছোট এই কুকুর গুলির সাহস দেখিয়া, আমি অবাক্ হইয়া যাইতাম।

এইরূপে বাঘ সন্ধান হইলে, শিকারীরা আসিয়া একটু দূরে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলে। কোন কোন সময় কুকুরকে তাড়া না করিয়া, শিকারীকে চার্জ্জ করিয়া আইসে, তখন সেই চার্জ্জের মুখেই মারিতে হয়। কাজেই এই সব শিকারে দুইজন করিয়া এক এক স্থানে থাকাই নিয়ম; হঠাৎ এক জনের গুলি মিস হইলে অপর জন যেন রক্ষা করিতে পারে। আমি ২।৪ বার এই প্রণালীতে শিকার করিয়াছি। হাঁটিয়া আত্মগোপন করিয়া শিকার করা অপেক্ষা ইহাতে অনেক বেশী সাহসের দরকার, আমোদও খুব বেশী। সৌভাগ্যক্রমে এই ভাবে আমি একবারও বিপদগ্রস্ত হই নাই। স্থানীয় ভদ্রলোক শিকারীদের মধ্যে ২।১ জনের শরীরে, বাঘের জখমও দেখিয়াছি। একবার একটী বাঘ, কুকুরের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া এক কুলগাছে উঠিয়া পড়িয়াছিল; সেই অবস্থাতেই আমরা উহাকে শিকার করিয়াছিলাম। কুকুর ও বাঘ যখন এক সঙ্গে গোল করিতে থাকে,

তখন শিকার করা এক কঠিন ব্যাপার—বাঘ মারি কি কুকুর মারি! এই অবস্থায় কুকুরের গায়ে গুলি লাগিবার আশঙ্কা থাকে বলিয়া, খুব সাবধানে গুলি চালাইতে হয়।

কুকুরগুলিকে এই ভাবে শিকারী করিয়া তুলিতে তাহাদের বিশেষ কিছু বেগ পাইতে হয় না। কয়েক বার জঙ্গলে লইয়া গেলে, নিজেরাই আপনা আপনি শিকারী হইয়া উঠে। নূতন কুকুরও পুরাতন কুকুরের সঙ্গে মিলিয়া, দুই একবারেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। ইহাতে খরচ কম, আমোদও অত্যন্ত বেশী। চিতাবাঘ শিকারই আমি এই প্রণালীতে দেখিয়াছি এবং মুড়াগাছা, সোনাডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে নিজেও করিয়াছি অন্য শিকার এই উপায়ে করা যাইতে পারে কিনা বলিতে পারি না। গ্রাম্য গাছড়া জঙ্গলে এই শ্রেণীর শিকার করা চলে, কিন্তু নল আগড় প্রভৃতি জঙ্গলে ইহা একেবারেই সম্ভবপর নয়। এই প্রণালীতে শিকার করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, জানোয়ারের চার্জ্জের জন্য প্রস্তুত হইয়াই তাঁহাদের এই কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

"ঘুপি" হইতে সম্বর শিকার

আদ্রিয়াতিক কূলের বণিক-নগর

"শাইলক দি জ্যু লিভ্‌ড্‌ আট্‌ ভেনিস।" ইহুদি শাইলকের মোকাম ছিল ভেনিসে। চার্লস্‌ ল্যাম্ব্‌ প্রণীত "শেক্‌স্‌পিয়রের গল্পমালায়" এই সংবাদ ভারতের পাঠশালায় পাঠশালায় প্রচারিত আছে। সেই ভেনিসেই আজ হাজির।

এই সহরের ইতালিয়নে স্বদেশী নাম "ভেনেৎসিয়া।" জার্ম্মাণরা ইহাকে জানে "ফেনে'ডগ্‌" বলিয়া।

ভেনিসের আদালতে শাইলক এক মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে উকিল আসিয়া ছিল পাদোভার এক "যুবা নারী।" নাম তাহার পোর্সিয়া। কিন্তু পোর্সিয়ার যান ছিল গো-শকট কি খালবাহী পান্সী সে খবরটা শেক্‌স্‌পীয়র দেন নাই।

আজকাল অংশু রেলে পৌঁছিতে লাগে মাত্র ঘণ্টা-খানেক। এই পথেই বিলাতী কবি বায়রণ অশ্বপৃষ্ঠে আদ্রিয়াতিক সাগর কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। "লর্ড" কবিবরের মালামাল ছিল পাঁচ গাড়ীতে বস্তাবন্দি। তাঁহার গৃহস্থালীর অন্তর্গত ছিল সাত ভৃত্য, নয় ঘোড়া, এক গাধা, দুই কুকুর, দুই বিড়াল, চার ময়ূর আর কতকগুলা মোরগা মুরগী। সাহিত্য-প্রেমিকদের নিকট বায়রণের "দেশত্যাগ" এবং ইয়োরোপে শফরের কাহিনী অজ্ঞাত নয়।

বিশেষতঃ আজ ১৯২৪ সাল চলিতেছে, শীঘ্রই আসিবে ১৯শে এপ্রিল। বায়রণের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। পৃথিবীর লোকেরা বায়রণ মৃত্যু-তিথিটা পালন করিবার ব্যবস্থা করিবে সন্দেহ নাই। ভারত-বর্ষেরও মহলে মহলে বায়রণ কথা সমারোহের সহিতই বোধ হয় আলোচিত হইবে। ভেনিসে পৌঁছিতে পৌঁছিতে পথে তাই বায়রণের নামটাই বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছিল।

ভেনিস—"কানাল গ্রান্দে" বা বড় খাল
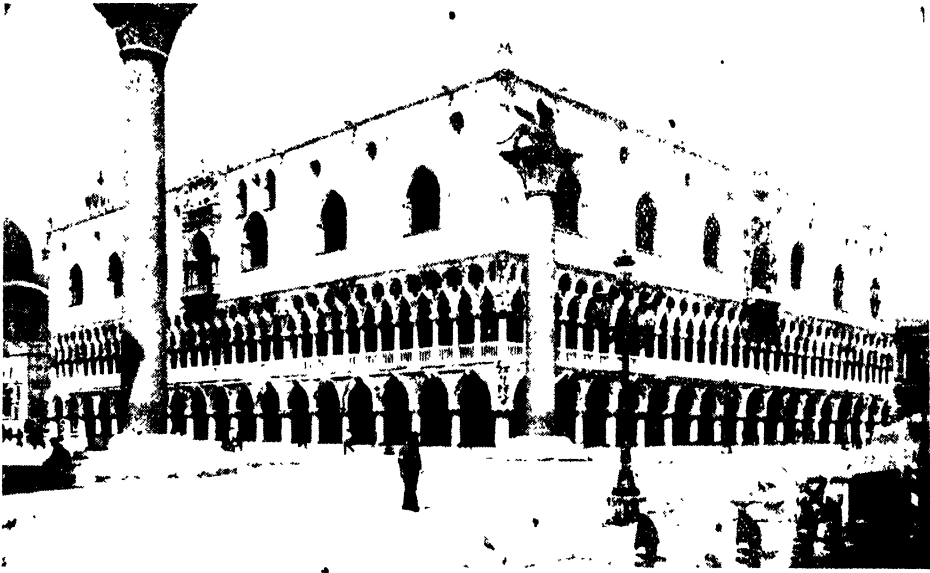
দোজে প্রাসাদ—ভেনিস

একটা মজার কথা অনেক দিনই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কি ফরাসী কি জার্ম্মাণ দুই জাতীয় নর নারীই বিলাতী সাহিত্যের প্রতিনিধি বলিলে প্রথমেই বুঝে শেক্‌স্‌পীয়রকে, তাহার পরেই ইহারা চিনে বায়রণকে। অন্য কোন ইংরেজ সাহিত্যবীর "ইয়োরোপীয়ানদের" চিত্ত অধিকার করিতে পারেন নাই। মিল্টন কিংবা ব্রাউনিঙ্‌ ইত্যাদির নাম নেহাৎ বিশেষজ্ঞ মহলের দু'চার জনের নিকট পরিচিত। শেলী, কীট্‌স্‌ ইত্যাদি যাঁহারা ফ্রান্স হইয়া সুইস আল্‌স্‌ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ভৌগোলিক কারণে কিছু কিছু জানা লোক বটে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রকে বাদ দিলে একমাত্র বায়রণই ইয়োরোপে ইংলণ্ডীয় বাণীর প্রচারক।

তারতে বায়রণ বিপ্লবের অবতার। ইয়োরোপীয় মজলিশেও বায়রণের এই খ্যাতি। আবার শেলীর দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যেই বায়রণের "চাইল্ড হারল্ড" গড়িয়াছে। একথা ভারতবাসীর মত পশ্চিমারাও জানে।

জেনেভা হ্রদের আকাশ পাহাড়ের বর্ণনায় বায়রণ প্রকৃতি পূজার পুরোহিত। ষোড়শ শতাব্দীর কবিবর তাস্‌সো তাঁহার গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ করিবামাত্র দুঃখে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া বায়রণের যে কবিতা আছে সেটা অনন্ত-পিপাসার ভাবুকতায় পরিপূর্ণ।

গ্রীসকে উপলক্ষ্য করিয়া, ইতালিকে উপলক্ষ্য করিয়া, নেপোলিয়নকে উপলক্ষ্য করিয়া বায়রণের যে সকল কবিতা তাঁহার রচনার এখানে ওখানে দেখা যায়, সেগুলা আদর্শবাদের দানা বিশেষ। "শিয়ঁ"-র (Chillon) বন্দী" কবিতাটাও সুইস ফরাসী সমাজের সর্ব্বত্র-স্বাধীন আত্মার গাথারূপে সমাদৃত।

কি বেদনা, কি স্বাধীনতা, কি অসীম উৎসাহ, কি প্রকৃতি প্রেম, সকল দিক হইতেই বায়রণ চরম "রোমান্টিকতার" প্রতিমূর্ত্তি। সেই রোমান্টিক ঝাঁঝের জন্যই বায়রণ গোটা ইয়োরোপকে "মাৎ" করিতে পারিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের লামার্টিন, মুসে, ভিঞি সকলেই বায়রণকে গুলিয়া খাইতেন। ভিক্টর হুগোর "হার্ণানি" এবং এমন কি "রুই ব্লা" পর্য্যন্ত বায়রণের "মান্‌ফ্রেড্‌" কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত। স্পেনের রোমান্টিক আন্দোলনে বায়রণ

রসদ জোগাইয়াছেন। ইতালির লেওপার্দি ছিলেন বায়রণের রসে মসগুল। রুশ রোমাণ্টিক পুশ্‌কিনের সাহিত্যেও বায়রণের সুর বাজিতেছে।

ভেনিসের কাছাকাছি আসিয়া পুলে সাগর পার হইতে হইল। সাগর এখানে গভীর নয়—"লাগুনা" বলে। রেলের জন্ম যে "পোন্তে" বা পুল নির্ম্মিত হইয়াছে সেটা প্রায় দুই মাইল লম্বা। বোম্বাইয়ের মত ভেনিসও একটা দ্বীপ বিশেষ। ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম। জাঁক জমক কিছু পাইলাম না।

ছোট্ট ষ্টীমারে সওয়ারি হওয়া গেল। এই খাল ই শিল্প-প্রসিদ্ধ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশ্ববিশ্রুত কবি-প্রশংসিত "কানাল গ্রান্দে" বা বড় খাল। চওড়ায় প্রায় প্যারিসের সেইন নদীর সমান হইবে,—হয়ত বা কিঞ্চিৎ ছোট।

সমুদ্রের দিকে—অর্থাৎ ভেনিস উপসাগরের দিকে—চলিতেছি। দুই কিনারায় দেখিতেছি কেবল প্রাসাদ, প্রাসাদের পর প্রসাদ,—সবগুলাই যেন পাথরের ফুল বাগান। কোনও ইমারতকেই একটা মামুলি বাড়ী বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। পাঁচ সাততলার
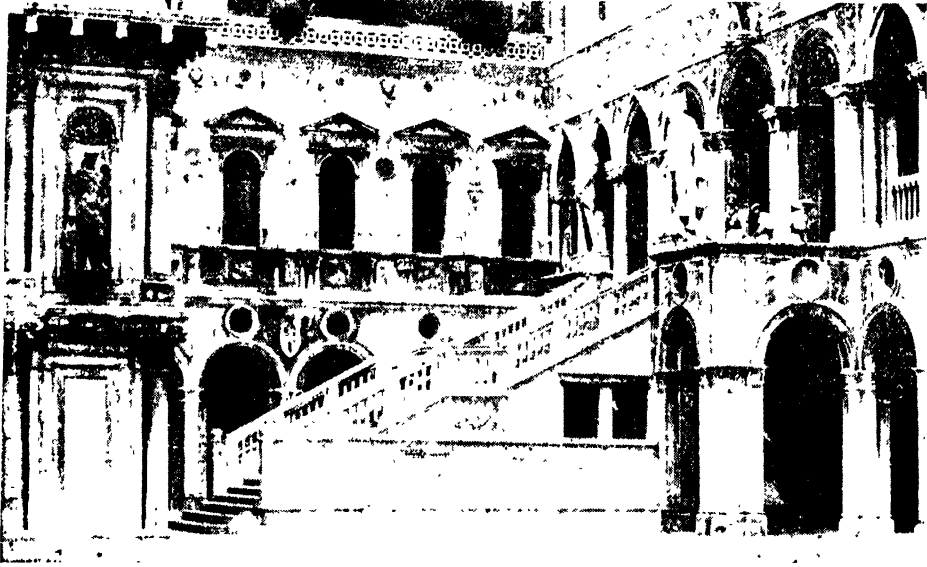
দোজে প্রাসাদে উঠিবার সিঁড়ি

খালের কিনারায়ই ষ্টেশন। অঞ্চলটা নেহাৎ নোংরা। ঘরবাড়ী গুলায় সম্পদের চিহ্ন নাই। খালে বহু সংখ্যক "গোন্দোলা" ভাসিতেছে। মার্চ্চ মাস, শীত এখনো চলিতেছে। এ বৎসর বিশেষতঃ, ইতালিতেও বরফের প্রাদুর্ভাব। কিন্তু "গোন্দোলা'র মাঝিরা পোষাকে প্রায় ভারতীয় মাঝিদের আধ্যাত্মিকতায়ই আসিয়া ঠেকিয়াছে। নৌকাগুলার গড়ন কিছু বিচিত্র। কিন্তু দেখিবা মাত্রই লাফাইয়া তাহার ভিতর উঠিয়া দাঁড়াইতে বা বসিতে প্রবৃত্তি হয় না। সোজা কথায়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব।

সৌধ ইহাদের একটাও নয়,—লম্বায় চওড়ায় ভিয়েনার ও প্যারিসের বিপুলতাও লক্ষ্য করিতেছি না। কিন্তু প্রত্যেকেই চাঁছা ছোলা সুশ্রী সম্মুখভাগ দেখাইয়া দর্শকের মন ভুলাইতেছে। পাথরের রেখাগুলায় ঠিক যেন ফিতার জালি।

এইরূপ, চিত্তাকর্ষক প্রাসাদশ্রেণী দেখিতে দেখিতে মাইল দুয়েক চলা গেল। এইখানেই কানাল গ্রান্দের খতম। তারপর এই খালের জের অন্য এক নামে অভিহিত। এখানে অবশ্য খাল নামটা চালানো চলে না। উপসাগরের এক টুকরা বলিলেই চলে।

"দোজে" প্রাসাদ, আর সুবর্ণমণ্ডিত সান্ মার্কো-গির্জ্জা এইখানে অবস্থিত।

সহরের ভিতর এক পা চলিতে না চলিতেই এক একটা খাল পার হইতেছি। আঁকা বাঁকা খালগুলা জলের সরু নর্দ্দমার মতন দেখাইতেছে। ফলের খোলা কাগজের টুকরা, পুরাণা পচা মাল ইত্যাদি তাহাতে ভাসিতেছে। জল একদম নির্জ্জীব।

কোন কোনও খাল কিছু বড়ও বটে। তাহার উপর গোন্দোলায় করিয়া মাল চলাচল হইতেছে দেখিতেছি। দুই ধারের ঘরবাড়ী গুলা একবারে জলের উপর হইতে উঠিয়াছে। ঘাটে ঘাটে শেওলা। বলা বাহুল্য এ পারের ঘরের লোকেরা ও পারের ঘরের লোকের কথা শুনিতে পায়।

ভেনিসে পথ হারাইয়া "বাঙ্গাল" প্রমাণিত হওয়া অতি-বড় ওস্তাদের পক্ষেও অসম্ভব নয়। একে ত খালের গোলক ধাঁধা। তাহার উপর গলিগুলার চক্রান্ত। একবারে কাশীর গলি কোনো কোনো গলি খালের ধারে ধারে,—অধিকাংশই খালের উপর কাটাকাটি করিয়া চলিয়াছে। পুলের জঙ্গল খুব গভীর।

ঘরবাড়ীগুলা দোতলা তেতলা মাত্র। কিন্তু সূর্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া আদৌ সম্ভবপর কিনা সন্দেহ হইতেছে। হাওয়ার চলাচলও কম। ভেনিস সম্বন্ধে কবিরা শিল্পীরা কেন যে অত রোমাঞ্চকর ছবি আঁকিয়াছেন তাহার কারণ খুঁজিতে যাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছি। ভেনিসকে 'ম্যালেরিয়ার বাথান ছাড়া আর কিছুই বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু জগতের লোকে এই সহরের নামে মূর্চ্ছা যায়।

ধনীগণের ঘরবাড়ীতে আর দরিদ্র লোকের ঘরবাড়ীতে তফাৎ "আবিষ্কার" করিতে "রিছার্চ্চ" দরকার হয় না। ভেনিসেরও গরীব-পাড়া আর ধনী-পাড়া দুইই আছে। দোকানপাট হাট বাজারের বহর দেখিয়াও সহজেই মনে হয়।

ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক অঞ্চলকে "গেত্তো" বলে। নামেই প্রকাশ ইহা ইহুদিটোলা। "কুটীর-শিল্প" বলিলে যে ধরণের হাতের কায বুঝায় এই অঞ্চলে তাহা যথেষ্ট। ফিতার বুনন ভেনিসে প্রসিদ্ধ। মার্কো-মন্দিরের আশে পাশে যে সকল দোকান দেখিতেছি সে সবে সৌখীন নর-নারীর সওদা কেনা বেচা হয়।

তিন্তোরেত্তোর আঁকা ছবি (দোজে প্রাসাদ)

এক জার্ম্মাণ মহিলা পাঁচ হাজার লিয়ার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতশো টাকা দিয়া ফিতা কিনিলেন। আরও হাজার দশেক লিয়ার খরচ করিয়া সেই এক দোকানেই রেশমের কিংখাবের থান ইত্যাদির অর্ডার দিলেন। মহিলা চলিয়া যাইবার পর দোকানের লোকেরা বলাবলি করিতেছে:—"জার্ম্মাণরা গরীব হইয়া পড়িয়াছে! একথা ঠিক কি?" একজন বলিল:—
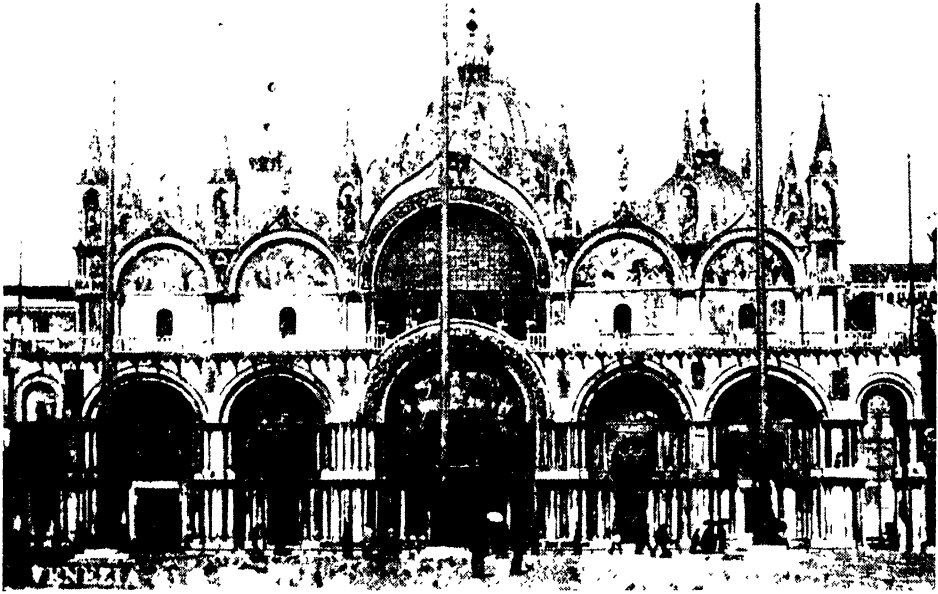
সান মার্কো গির্জ্জা—ভেনিস

"চুপ চুপ,—জার্ম্মাণেরা গরীব কি ধনী তাহাতে আমাদের যায় আসে না। মালগুলা বেচিতে পারাই আমাদের স্বার্থ।" আর একজন বলিতেছে:—"সে কথা আলাদা,—কিন্তু খবরের কাগজে ত রটানো হইতেছে যে জার্ম্মাণদের টাকা কড়ি কিছু নাই;—পৃথিবীর লোক জার্ম্মাণ নরনারীদিগকে সাহায্য করুক। অথচ জার্ম্মাণ নারী বিদেশে আসিয়া বহুমূল্য বিলাসের সামগ্রী কিনিয়া অঙ্গ ঢাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন!"

ছোট খাটো গলির ভিতরও সুন্দর কারুকার্য্য সম্বলিত ইমারত অনেক দেখিতেছি। সবই "রেনেসাঁসের" গড়ন। বারান্দা, জানালা ও স্তম্ভের সুকুমার শিল্প—মিস্ত্রীরা যেন পাথরের ফিতা বুনিয়া রাখিয়াছে।

গির্জ্জার সংখ্যাও কম নয়। গেত্তো পাড়ারই অদূরে, একবারে সমুদ্রের কিনারায় দেখিতেছি "মাদোনা দেল ওর্ত্তো"। এই মন্দির "গথিক" রীতির বাস্ত। কিন্তু বাস্তুর সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য যে সব ছবি দেখা যাইতেছে সে সব "রেনেসাঁসের" জিনিষ। প্রসিদ্ধ ওস্তাদ তিন্তোরেত্তো (১৫১৮-১৫৯৪) এই মন্দিরের জন্য ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার সমাধিও এই মন্দিরেই রহিয়াছে। তিন্তোরেত্তোর কাযে রূপের গতিভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। সে যুগে রঙের কায়দায় সকল শিল্পীই দক্ষ ছিলেন। বাস্তব জীবনকে যথা সম্ভব কবিত্বময় করিয়া তোলা তিন্তোরেত্তোর এক বিশেষত্ব। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ছবি আঁকিবার দিকেই তাঁহার মাথা খেলিয়াছিল।

গথিক রীতির মন্দির অথবা গথিকের প্রভাব সমন্বিত মন্দির ভেনিসের এখানে ওখানে অনেকই দেখা যায়। এই সকল গির্জ্জায় কিন্তু প্রধানতঃ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস যুগই চিত্রশিল্প যোগাইয়াছে।

"জোভান্নি এ পাওলো" মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীর গথিক রীতি চিহ্ন বহন করিতেছে। কি ফটকের কারু-কার্য্য, কি ভিতরকার দেওয়াল ও কবরগুলা সবই চরম বিলাসের সাক্ষী। ভেনিসের বড় বড় "দোজে" বা নবাব এবং সেনাপতি ইত্যাদি শ্রেণীর লোকে

এই গির্জ্জায় কবর পাইয়াছেন। প্রকারান্তরে মন্দির-টাকে এই সহরের "পান্থেয়ন" বা বীর ভবন বলা চলে।

পাদোভার মত ভেনিসেও মনুমেণ্ট চোখে পড়িতেছে। জোভানি মন্দিরের সম্মুখেই অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতি কোপেওনি। পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। পিতলের মূর্ত্তি। সরকারী বা সার্ব্বজনিক বাগানে যাইবার পথে গারিবাল্‌দির মূর্ত্তিও দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভেনিসে একবার প্লেগের মড়ক লাগিয়াছিল। তাহাতে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক লোক মারা পড়ে। মড়কের হাত হইতে নগরবাসীরা কোন মতে রক্ষা পায়। সেই উপলক্ষ্যে একটা মন্দির "মা-মেরীর" নামে মানত করা হইয়াছে। মেরী এখানে স্বাস্থ্যের দেবী রূপে পূজা পান। "রক্ষাকালী" বলিলে হিন্দুরা যা বুঝে "মারিয়া দেল্লা সালুতে" বলিলে খৃষ্টান চিত্তে মেরীর সেই রূপই ফুটিয়া উঠে। "দোজে" প্রাসাদের অপর পারে, খালের প্রায় শেষ সীমানায় মন্দিরটা মুসলমানী গম্বুজ মাথায় দিয়া খাড়া আছে।

নানা যুগে নানা মন্দির মাথা তুলিয়াছে। কাযেই বিভিন্ন বাস্তু রীতির গড়ন সহরের সর্ব্বত্র ছড়ানো দেখিতে পাই। "সানভাতোরে" "জুলিয়ানো" ইত্যাদি মন্দির রেনেসাঁসের সাক্ষী।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

"রক্ষা মেরী"র মন্দির—ভেনিস

লোকান্তরে গৌরহরি

গত ১৫ই কার্ত্তিক সর্ব্বজনপ্রিয় গৌরহরি সেন মহাশয় ৫৫বৎসর বয়সে বিধবা জননীকে ও আত্মীয়বান্ধবগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে লোকোত্তর ধামে গমন করিয়াছেন। কর্ম্মবীর কর্ম্মের অবসানে শান্তিলাভ করিয়াছেন—নশ্বর জগতে চর্ম্মচক্ষু দিয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না—তাঁহার অমিয় মধুর উপদেশাবলী, সদালাপীর রসভাষণ শুনিতে পাইব না; কিন্তু তাঁহার চারিত্র্য-মাধুর্য্য, চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ়তা, আবার বালসুলভ কোমলতা—এবং দীনদুঃখীর দুঃখ মোচন-প্রবণতা ও সহানুভূতি চিরদিনই আমাদের নিকট আদর্শস্বরূপ থাকিবে। সৌম্য, শান্ত, জ্ঞানী গৌরহরি অজাতশত্রু ছিলেন। দুঃখে কোন দিন তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে—অধীর হইতে মুহ্যমান হইতে—দেখিতে পাই নাই, আবার সুখেও তাঁহাকে কোন দিন হর্ষোৎফুল্লও দেখি নাই। তিনি নির্ব্বাত নিষ্কম্প অচঞ্চল প্রশান্তমহাসাগরের ন্যায় ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার হাস্যানন দেখিলে শোকদুঃখ আপনি দূর হইয়া যাইত। তাঁহার মুখ হইতে সহানুভূতি-সূচক বচন বাহির হইলে দুঃখী জন দুঃখজ্বালা ভুলিয়া যাইত, হৃদয়ে বল পাইত। নীরবকর্ম্মী, সমাহিত-চিত্ত সাধক গৌরহরির কর্ম্মের তালিকা দিয়া পাঠক-দিগকে আজ বিব্রত করিব না। করিবার সময়ও ইহা নয়। আজ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বন্ধুর তিরোধানে শ্রদ্ধার অশ্রুচন্দন দিয়া বন্ধুর গুণকীর্ত্তন করিব।

৺গৌরহরি সেন

গৌরহরি বিডন ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক্-কুলতিলক ধর্ম্মভীরু বিশ্বম্ভর সেন মহাশয়ের পুত্র। বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ পিতামাতার তিনি একমাত্র পুত্রসন্তান। অকৃত-দার গৌরহরির নির্ম্মল দেবোপম চরিত্র, আদর্শস্থানীয় ছিল। পিতামাতার সমস্ত সদ্গুণ তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছিল। নির্ভীক সত্যসন্ধ গৌর-হরি সত্যের পথ হইতে কোন দিনও বিচলিত হন নাই। হৃদয়ে যে সত্য তিনি অনুভব করিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে কোনদিনই তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এফ্-এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া ২০বৎসর বয়সের সময় কলেজের পড়া ছাড়িয়া দেন। ১৩২৯ সালের চৈত্রমাসের "গোব-র্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের" মাসিক অধিবেশনে 'চৈতন্য লাইব্রেরী' সম্বন্ধে 'যৎকিঞ্চিৎ' নামক পঠিত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন —"কুড়ি বৎসর বয়সে, কলেজের লেখা পড়ায় ইস্তফা দিয়া যখন বাজে বই পড়িতে আরম্ভ করিলাম, দুই চারি লাইন
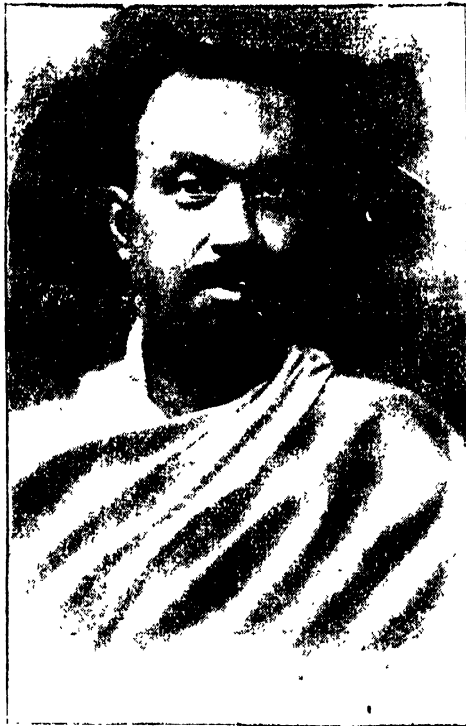
ইংরাজী লিখিতে শিখিয়া যখন ল্যাজ ফুলিল, তখন মনকে আঁখি ঠারিয়াছিলাম—কেশব সেন, কৃষ্ণদাস পাল কটা পাশ করিয়াছেন? লাইব্রেরীর ছিড়িকে public man সাজিয়া পিতৃদেবের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ যখন বিধবা কন্যার ন্যায় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম, আধলা পয়সা রোজগার করিবার সামর্থ্য জন্মিল না, তখন মনকে আঁখি ঠারিয়াছিলাম - পয়সা কি সবাই রোজগার করে?"—কলেজের পড়ায় ইস্তাফা দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পড়াশুনায় কখনও তিনি ইস্তফা দেন নাই—তাঁহার ন্যায় অধ্যয়নশীল ছাত্র বড় বিরল। তিনি ঐ প্রবন্ধে আপনাকে 'ছাত্র হিসাবে পল্লবগ্রাহী ফক্কড়চন্দ্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু বিনয়ী গৌরহরির ইহা বিনয়-ভাষণ মাত্র। পল্লবগ্রাহী তিনি কোনদিনই ছিলেন না। প্রকৃত সমালোচকের ন্যায় অধীত পুস্তকের সারাংশ তিনি গ্রহণ করিতেন। পুস্তক-পঠনস্পৃহা তাঁহার এত অধিক ছিল যে, প্রত্যহ তিনি সান্ধ্য ভ্রমণের সময় দোকান হইতে নবপ্রকাশিত পুস্তক চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্য খরিদ করিতেন ও সর্ব্বাগ্রে নিজে পড়িতেন। তাঁহার সহিত যাঁহাদের সাহিত্য-বিষয়ে কোন দিন আলোচনা হইয়াছে তাঁহাদিগকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞানের পরিধি তাঁহার কত বিস্তৃত ছিল। আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রায় ২৬,২৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার আমার প্রথম সুযোগ ঘটে। তখন আমি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের সমিতিতে বৈষ্ণব কবিদের 'পীরিতি' লইয়া সেদিন আলোচনা হইতেছিল। বন্ধুবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ চৈতন্য লাইব্রেরীর সভ্য ছিলেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে গৌরহরি বাবু উপস্থিত হন ও বন্ধুবরের বাহিরের ঘরে সেদিন উক্ত সভার অধিবেশন হইতেছিল। গৌরহরি বাবু বসিয়া আলোচনাগুলি শুনিলেন, পরে আমাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, আমি তোমার দাদার মত, তোমার সমালোচনা করিবার শক্তি বেশ রহিয়াছে দেখিতেছি; পুরাতন পুস্তকের যখনই তোমার দরকার হইবে, তখনই চৈতন্য লাইব্রেরীতে গিয়া লইয়া আসিবে।" তারপর বহুদিন তাঁহার সহিত সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে কত জ্ঞান লাভ করিয়াছি—কত শিক্ষা পাইয়াছি ভাষায় তাহা বলিতে পারি না। অনেক নবীন লেখককে তিনি সাহিত্যালোচনায় ব্রতী করিয়াছেন; সে কথা বলিবার দিন আজ নয়। আমরা তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আমাদের বড় সাধের বড় আদরের 'মানসী' পত্রিকার বিষয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া তাঁহাকে কলম ধরাইয়াছি। মানসীর ২য় বর্ষে ১৩১৬-১৭ সালে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত ও ৪র্থ ও ৫ম বর্ষে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-স্মৃতি ধারাবাহিকভাবে লিখিয়াছেন। বাঙ্গালায় এই দুই মনীষী মহাত্মার জীবন-চরিত এমন সুন্দরভাবে ইতঃপূর্ব্বে আর আলোচিত হয় নাই। এই দুই প্রবন্ধে পাঠক মহাশয়েরা তাঁহার ভাষায় গাম্ভীর্য্য, ভাবের উদারতা, চরিত্র বিশ্লেষণের অসাধারণ শক্তি ও দূরদর্শী সমালোচকের তীক্ষ্ণধীর বিপুল নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। তাঁহার সমালোচনা-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় আর একটী প্রবন্ধে বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—সেটী ভক্তকবি দেবেন্দ্রনাথের কাব্য পরিচয়ে (কাব্যপ্রসঙ্গ—৪র্থ বর্ষ মানসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)। বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত সাহিত্য-রস-পিপাসু সাহিত্যিক গৌরহরি সেন মহাশয়ের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। লেখাগুলি সংখ্যায় অধিক না হইলেও উৎকর্ষে চিরদিন বাঙ্গালীকে প্রকৃত আনন্দ ও শিক্ষাদান করিবে। তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণ ছিল—অপরের রচনার উৎকর্ষ-সঙ্কলন করিবার শক্তি। তিনি কোন ভাল পুস্তক বা প্রবন্ধ পাঠ করিলে সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইতেন তাহাকেই উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। লেখকের গুণ-ব্যাখ্যানে তাঁহার ন্যায় মুক্তপ্রাণ ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার এই গুণে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলাম। নবীন সাহিত্যিককে উৎসাহ দিতে কোনদিন তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। বাঙ্গলার মাসিক পত্রেও এই সঙ্কলন-প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে বহুবার অনুরোধ করি। পাশ্চাত্য দেশের পত্র পত্রিকায় যেমন অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত

উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকলের সার-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য মানসীর তদানীন্তন সম্পাদকগণকে অনুরোধ করায় তাঁহারা প্রকাশ করিতে রাজী হন; কিন্তু এ কার্য্যের ভার কে লইবে? প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার হ-পাসং কোম্পানির অফিস ঘরে তখন মানসী-কার্য্যালয়। প্রত্যহ সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়া গৌরহরি বাবু পদব্রজে সেখানে যাইতেন। সেদিন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে লিখিতে অনুরোধ করা হইল। তিনি স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার অনবদ্য সুন্দর 'নিদর্শন' 'মানসী'র ৩য় বর্ষ হইতে মাসে মাসে বাহির হইতে লাগিল। এরূপ সঙ্কলন মাসিক পত্রে বিরল ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তারপর এ প্রথা অন্যান্য পত্রে অনুসৃত হইয়াছে। ৮ম বর্ষে মানসী যখন মর্ম্মবাণীর সহিত মিলিত হইয়া নববেশে সাহিত্যের আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন ইহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য গৌরহরি বাবুকে আবার ধরিলাম। এবার অনুরোধ করিলাম দেশীয় পত্রের প্রবন্ধ বিশেষের সার-সঙ্কলন পাঠে দেশীয় মনীষীদের ভাবধারার সহিত আমরা পরিচিত হইতে পারি; কিন্তু বিদেশের মনীষীদের ভাব-ধারার সহিত পরিচিত না হইতে পারিলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও দু'একখান ভিন্ন মাসিক পত্রিকার পাঠক নন। অনেকগুলি পত্রিকা পাঠ করিবার সময় ও সুবিধা তাঁদের নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইংরাজী ভাষায় লিখিত মাসিক পত্র হইতে নিদর্শনের অনুরূপ সার সঙ্কলন করিয়া পাশ্চাত্য মনীষীদের ভাবধারার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিন। এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইয়া প্রথম মাস হইতেই 'বৈদেশিকী' নাম দিয়া ইংরাজী প্রবন্ধের সার সঙ্কলন ও সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নানা বিষয়ের সংবাদ তিনি কত অধিক রাখিতেন তাহা এগুলির পাঠকেরা অবশ্য দেখিয়াছেন। মানসীর তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের নবপ্রকাশিত "শান্তি" উপন্যাসের সমালোচনায় তিনি একটী নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন, গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করিয়া—লেখকের রচনা হইতে উদ্ধার করিয়া আখ্যান-বস্তু বিবৃত করিয়া সমগ্র চিত্রখানি সাধারণের সমক্ষে ধরিয়াছেন। অবশ্য এ পন্থা ভাল কি মন্দ, লেখকের প্রতি ইহাতে সুবিচার করা হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে কোন কথা এ ক্ষেত্রে বলিতে চাই না। বলিতে চাই তিনি প্রাণে প্রাণে যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে কোনদিন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। জীবনে কখনও তাঁহাকে কোন বিষয়ে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখি নাই। আলোচনা যে সর্ব্বত্র তাঁহার অভ্রান্ত হইত তাহা বলি না; তবে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিব, লেখক মহাশয়দের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষবশে কোন দিন তিনি কোন কথা লেখেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি মানুষকে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। অতি বড় দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির প্রতিও তিনি কখনও বিরূপ হইতেন না। 'প্রকৃতি' নামক নবপ্রকাশিত দ্বৈমাসিক বিজ্ঞান পত্র প্রকাশিত হইলে তিনি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন ও গত ভাদ্র মাসের মানসীতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী সমালোচনা লেখেন। ইহাই বোধহয় তাঁহার শেষ রচনা। অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় কখনও কখনও তিনি লিখিতেন।

এইবার আমরা কর্ম্মবীরের কর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভের একটু আলোচনা করিব—সেটী 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা। এ সম্বন্ধে গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সাহিত্য সমাজে পঠিত প্রবন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর অনুকরণে, ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের আনুকূল্যে, টমরি সাহেবের নেতৃত্বে, বিডনষ্ট্রীটের ৮৩নং বাটীতে, ১৮৮৯সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়।"

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন—"১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর সভ্য ছিলাম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিডন ষ্ট্রীটের প্রতিবেশী বন্ধু কুঞ্জবিহারী দত্তকে ঐ লাইব্রেরীতে ভর্ত্তি করাই। কুঞ্জর তখন গাড়ী ঘোড়া ছিলনা। বর্ষাকালে কম্বুলেটোলা যাইতে কষ্ট হওয়ায় তাহার বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী করিতে সাধ হয়। কুঞ্জর দ্বিতীয় ভ্রাতা নিতাইচাঁদ খুব উৎসাহী ছিল। আমাদের

কথাবার্ত্তা শুনিয়া, তাহারও লাইব্রেরী সম্বন্ধ ব্যক্তিক জন্মে। দুই একদিনের মধ্যে নিতাইএর গৃহ শিক্ষক হরলাল শেঠ ও আমাদের প্রতিবেশী রঙ্গলাল বসাক আমাদের দলভুক্ত হইলেন।

"কিন্তু টাকা কোথা? ঘর কই? হরলালবাবু মাষ্টার, রঙ্গ সামান্য মাহিনার কেরাণী নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফএ ক্লাসের ছাত্র, আমি এফএ পরীক্ষায় ফেল হইয়া টো টো কোম্পনীর কার্য্য করি। কুঞ্জ ও নিতাইয়ের পিতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী চিঠিপত্র লিখিয়া আমি তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। কুঞ্জ ও নিতাই-এর পরামর্শে তাঁহার নিকট লাইব্রেরীর কথা পাড়িলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বিড়ালের ভাগ্যেও শিকা ছিঁড়িল। তিনি বলিলেন,—'তোমাদের কিছু টাকা আর এই ঘরটা দিব।' এই ঘরটা মানে বিডন ষ্ট্রীটের ৮৩নং বাড়ীতে ঢুকিয়া বাঁ ধারের ঘর ......। লাইব্রেরী ঐ ঘরে বিনা ভাড়ায় কিয়দধিক চারি বৎসর ছিল।

"নিতাই তাহার দাদার, মাষ্টারের, রঙ্গর ও আমার খান কতক বই লইয়া একটা আলমারিতে পুরিল। প্রথম মাসে দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকায় খানকতক বাঙ্গালা পুস্তক কেনা হইল। একদিন ভূপেন (এখন বাবুডাঙ্গা-নিবাসী) আসিলে, তাহার নিকট খান ছয় সাত বই পাওয়া গেল। কিন্তু দুই মাসের চেষ্টায় কিছুতেই একটা আলমারি ভরিল না। কুঞ্জর শ্বশুর মহাশয় প্রত্যহ "Indian Mirror" পাঠাইয়া দিতেন। প্রতি সপ্তাহে বঙ্গবাসী ও সঞ্জীবনী কেনা হইত।"

তারপর লাইব্রেরীর নামকরণ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। গৌরহরি বাবুর কথায় বলি—"আমি নাম দিয়া- Beadon Square Literary Club. [গঙ্গা. না. দত্ত] দত্ত মহাশয় বলেন—"না, ঠাকুরদের নাম দাও না?" অনেক তর্কাতর্কির পর Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club এই নাম স্থির হইল। আমরা ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারী সাইনবোর্ড লাগাইব স্থির করিয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় পাঁজী দেখিয়া বলিলেন দিনটা খারাপ। সুতরাং সরস্বতী পূজা (৫ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত দিন পিছাইতে হইল।"

ইহাই চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্মের কাহিনী।

প্রথম বৎসরের কার্য্য-বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয় ৩০০৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ২০৲ টাকা এক কালীন দান করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসরে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—টমরি সাহেব

সহঃ সভাপতি ছিলেন—ডাঃ এম এন ব্যানার্জ্জি ও সোমপ্রকাশের সম্পাদক বিধুভূষণ মহাশয়।

সম্পাদক ছিলেন শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
সহকারী ঐ " শ্রীগৌরহরি সেন
গ্রন্থরক্ষক " শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী ঐ " শ্রীনিতাই চাঁদ দত্ত
ও শ্রীরঙ্গলাল বসাক
ধনাধ্যক্ষ " শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত
হিসাব নিকাশ পরিদর্শক " শ্রীহরলাল শেঠ

১৮৯৪ সালে গৌরহরি বাবু সম্পাদক পদে মনোনীত হন। তদবধি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এই সামান্য আরম্ভ হইতে পাড়ার যুবক বৃন্দের উৎসাহে ও গৌরহরি বাবু ও তদীয় বন্ধুবর্গের চেষ্টায় আজ চৈতন্য লাইব্রেরী কলিকাতায় উত্তরাঞ্চলের লাইব্রেরী গুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

তৎপরে "কুঞ্জর আন্তরিক যত্নে ও রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ব্যয়ে ১৮৯৩ সালের শেষভাগে, ৪।১নং বিডন ষ্ট্রীটে লাইব্রেরীর জন্য দ্বিতল বাড়ী তৈয়ারী হয়। ভাড়া সস্তা, বৎসরে দুই শত টাকা।'

লাইব্রেরীর স্থায়ী নির্ম্মাণ তহবিলে অনেক টাকা মজুদ থাকে সত্য, কিন্তু গৌরহরি বাবু ব্যয়ের অনুরূপ টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলি, "আরম্ভ করিয়া দিন, টাকা সংগ্রহ হইয়া যাইবে। রামমোহন লাইব্রেরীর

টাকা কিরূপে যোগাড় হইল?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি বেণের ছেলে। সংস্কার বশে হিসাবী হয়ে কায করতে শিখেছি। বামুন কায়েতের ঘরে জন্মালে তোমার কথা মত কায সুরু করে দিতাম; আর ঐ রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে বামুন কায়েতই বেশী। তাই তাঁরা কাযে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন—অবশ্য টাকাটা উঠে গেল। আর যদি না উঠতো তা হলে কি অপমানের কথা হ'ত? আমি তা করতে পারবো না। যতক্ষণ না ব্যয়ের মত টাকা উঠবে, ততদিন ঐ কার্য্যে হাত দিতে পারবো না।"

জগতের বড় বড় প্রতিষ্ঠান গুলির উন্নতি এইরূপ একনিষ্ঠ সাধকের ঐকান্তিক কামনা ও সাধনাবলেই সাধিত হয়। বাস্তবিক গৌরহরি বাবুকে তন্ময়ভাবে আমরা চৈতন্য লাইব্রেরীর কার্য্য করিতে দেখিয়া অনেক সময় মনে করিয়াছি তিনি যেন জগতের অস্তিত্বই ভুলিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী তাঁহার এতদূর প্রিয় ছিল যে ইহার সকল কার্য্য তিনি স্বয়ং না করিলে বা দেখিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। আমাদের দেশের বালবিধবারা যেরূপ গৃহদেবতা শ্রীবিগ্রহ গোপালের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, গৌরহরিবাবুও চৈতন্য লাইব্রেরীর কার্য্যে ঠিক সেইভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন, সেকথাটা এখানে তুলিয়া দিলাম—"লাইব্রেরীর বিস্তর সভ্য কেবলমাত্র গল্পের বই পড়েন; ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। ক্রমাগত উপন্যাস পড়িয়া দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের রস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা যে মানসিক হিসাবে আত্মহত্যা তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাও বলা আবশ্যক যে নাটক নভেল ছুঁইব না এই জিদও বোকামির নামান্তর মাত্র।"—এ বিষয়ে আমি বঙ্গীয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই।

গৌরহরি বাবু মানুষ কি রকম ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য দুইচা'র কথা বলিলাম। তাঁহার জীবনের কাহিনী এত অল্পের ভিতর বলিয়া শেষ করা যায় না—বিষণ্ণ হৃদয়ে সে সকল কথার আলোচনা করিবার মত মনপ্রাণও আমার এখন নাই। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার জীবনবৃত্তের আংশিক চিত্র দিলাম। জীবনে তাঁহার প্রধান গুণ ছিল নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সংযম। ঘড়ির কাঁটার মত তিনি নিয়মবশে জীবন পরিচালন করিতেন। আহারে ভ্রমণে কথাবার্ত্তায় লেখনীধারণে-সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতাম—সংযমী গৌরহরি।

তাঁহার ন্যায় আদর্শ পুরুষকে হারাইয়া আমরা আজ শোকসন্তপ্ত। তাঁহার শোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ভাষায় তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভগবান্ তাঁহাকে শান্তি দিন।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

অভিনেত্রী

(গল্প)

রূপ, যৌবন, কণ্ঠস্বর তেমনি অটুট—তবুও সে আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কত কাঁদিলাম, অনুনয় করিলাম, পায়ে ধরিলাম, কিন্তু সে ফিরিয়াও চাহিল না। অম্লান বদনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া গেল।

আর 'আমি'? রুদ্ধদ্বার গৃহের বাহিরের হতাশ অতিথি। আমারই গৃহে আমার প্রবেশ করিবার এতটুকু অধিকার নাই! জীবনের একটিমাত্র ভুলে—কুলগণ্ডীর বহিঃসীমায় মুহূর্ত্তমাত্র পদক্ষেপে, আমি আমার সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি। বিশ্বের লাঞ্ছনা,

উপেক্ষা, ঘৃণা মাথায় করিয়া কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্ধকার ভবিষ্যতের অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিয়াছি।

জীবন-প্রভাতে বাপ মা যাহার সহিত নিতান্ত আপনার বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন, অন্তর খুঁজিয়া দেখিলাম, এতদিনে তাহার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ডাকিবার চেষ্টা করিলাম, "ওগো বাঞ্ছিত! বল্লভ! এই আর্দ্র আঁখিতারার সম্মুখে একবার তেমনি করিয়া দাঁড়াও!" কিন্তু কে যেন জোরে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। ভাস্কর-খোদিত মর্ম্মর প্রতিমার ভুজদ্বয়ের ন্যায় আমার এই সুডোল বাহুযুগল এবং দেহে এই অনিন্দ্য যৌবনের পূর্ণ জোয়ার দেখিয়া—আমার হৃদয় মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল। ছি ছি! আমি দেবভোগ্য নৈবেদ্য পিশাচের পায়ে ডালি দিয়াছি!

মহাশ্মশানের ক্ষুধিত হাহাকার শুধু আমার কাণে বাজিতে লাগিল।

ভাবিতে বসিলাম, ডুবিয়া মরি, না ভাসিয়া যাই?

বাড়ীওয়ালীর মেয়ে হিরণকে ডাকিলাম। সে মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "কতজন এমন আসে—চলে যায়, ভাবলে কি আর ভাবনার শেষ হয় ভাই?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখন উপায়?"

বিশৃঙ্খল কেশপাশ সংযত করিতে করিতে সে বলিল, "আছে।"

আমি আকুল আগ্রহে তাহার প্রতি চাহিলাম।

রাত্রি জাগরণ-জনিত-অবসাদক্লিষ্ট নয়নযুগল আমার মুখের উপর নশ্বর করিয়া হিরণ বলিল, "আমার ব্যবসায়।"

অভিনেত্রী! যে লাবণ্যরাশি লোকলোচনের সম্পূর্ণ অগোচরে রাখিবার জন্য গৃহের চতুর্দ্দিকে গগন-স্পর্শী পাষাণ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, পুরুষ প্রবেশাধিকার বিহীন শুদ্ধান্তের চতুঃসীমা মধ্যে যাহা সাবধানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, একজন ভিন্ন আজও কেহ যাহার সন্ধান পায় নাই, ইতর ভদ্র সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইবার তাহার প্রকাশ্য পরীক্ষা দিতে হইবে? এই পরিপূর্ণ দেহের হাবভাব, আয়ত লোচনের তরল কটাক্ষলীলা, সুললিত কণ্ঠস্বরের অবিরাম বিনিময়ে অসংখ্য বাহবা লাভ করিতে হইবে?

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। বিহ্বল নেত্রে তাহার দিকে তেমনি ভাবে চাহিয়া রহিলাম।

গত রজনীর অভিনয় সজ্জার চিহ্ন তখনও তাহার দেহে বর্ত্তমান। পায়ে আলতার ক্ষীণ রেখা, হাতে মুখে লাল রঙের দাগ, শীর্ণ পাণ্ডুর কপোল দেশে পাউডারের ছোপ। বলিলাম, "থিয়েটারে হাজার লোকের সামনে আমি কি কথা কইতে পারবো?"

"প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল।"

"আর এখন?"

"মানুষগুলোকে মানুষ ব'লেই মনে হয় না। যেন কতকগুলো ইট কাঠের সাম্‌নে অভিনয় করছি। তাদের না আছে চোখ কাণ, না আছে প্রাণ।"

"আচ্ছা ভেবে দেখি।"

২

দুই একদিন হিরণের সহিত তাহাদের রিহার্সালে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম অনেকেই তাহাদের ব্যর্থ জীবনটা একরূপে কাটাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের ভ্রষ্টরূপ কঙ্কালগুলির সৌষ্ঠববৃদ্ধির চেষ্টা দেখিয়া বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলাম। সেই অভিশপ্ত সমাজের মধ্যে আমার মত একজনকে দেখিয়া তাহারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম।

একজন বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। হিরণ আমাকে দেখাইয়া বলিল, "এই মেয়েটির কথাই আপনাকে বলেছিলাম, ম্যানেজার বাবু।"

ম্যানেজার আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, "একটা গাও না।"

আমি গায়ের কাপড়খানা বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া, হারমোনিয়মটা কোলের উপর রাখিয়া গাহিতে লাগিলাম।

আমার সঙ্কোচ-মৃদু কণ্ঠ হইতে যাহা বাহির হইল, দেখিলাম, ম্যানেজার বাবু তাহা নিবিষ্ট মনে শুনিতেছেন।

গান শেষ হইলে তিনি আমার পিঠে কয়েকটা চাপড় দিয়া বলিয়া উঠিলেন "বা বা বেশ! চলবে এখন। চেষ্টা ক'রলে ভালই হবে।"

ম্যানেজারের সব কথাগুলা আমার কাণে গেল না; কেবল তাহার কথার অশিষ্ট ভঙ্গিটা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। সে সময়ে আমার এমনি লজ্জা করিতে লাগিল যে, মনে মনে মাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইবার প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

বেতন স্থির হইল; পরদিন হিরণ ম্যানেজার বাবুর স্বাক্ষরিত একখানি নিয়োগপত্র আনিয়া আমার হাতে দিল।

ক্রমশঃই সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। নিয়মিতভাবে রিহার্সালে যোগ দিতে লাগিলাম।

প্রথম যেদিন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতে হইল সেদিনকার কথা আজও আমার মনে আছে। সে কি বিপদ! ঐক্যতান বাদন থামিয়া গেল, ঢং করিয়া শব্দ হইবামাত্র ড্রপ উঠিয়া গেল। বাহিরে পাণ সিগারেট বিক্রেতার চীৎকার এবং দর্শকগণের কোলাহল থামিয়া গেল, সকলেই আগ্রহপূর্ণ নেত্রে পাত্র পাত্রীর প্রবেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমাকেই সর্ব্ব প্রথমে প্রবেশ করিতে হইবে। কতবার পা বাড়াইলাম, কিন্তু কে যেন তাহা টানিয়া ধরিতে লাগিল। বুকখানা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম। রিহার্সাল মাষ্টার আসিয়া আমাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিলেন। অসংখ্য দর্শকের নিষ্ঠুর দৃষ্টি আমার সর্ব্বাঙ্গে সূচীর ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগল। আমি আমার সমস্ত বক্তব্য ভুলিয়া হতাশনয়নে নেপথ্যের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম মাষ্টারের ক্রূর চক্ষু এই অর্দ্ধমৃত নারীমূর্ত্তির উপর উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। আমাকে নীরব দেখিয়া দর্শকগণ নানাবিধ উপহাস বাক্যে আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

কোন স্থানে একবিন্দু করুণার আশা নাই জানিয়া আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলাম। একটি একটি করিয়া তখন আমার ভূমিকাটি মনে পড়িতে লাগিল। কোন রকমে কথাগুলা উচ্চারণ করিয়া দিয়া ভিতরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

৩

তারপর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। হিরণের কথাটা এখন বেশ বু'ঝতে পারিতেছি। মানুষের সামনে যে অভিনয় করিতেছি, আর তাহা মনে হয় না। পুনঃ পুনঃ এন্‌কোর দিলেও বেদ করিয়া থামিয়া যাই। পায়ের নীচে ফুলের তোড়া আসিয়া পড়িলে লাথি দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই। প্রথম প্রথম অভিনয়ে যশ উপার্জ্জন করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমার অভিনয়ে কে কি মত প্রকাশ করিতেছে জানিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহ জন্মিত। যাহার ভূমিকা অভিনয় করিতাম, প্রাণ দিয়া তাহাকে অনুভব করিতাম। যেখানে কাঁদিবার, সেখানে যথার্থই কাঁদিতাম। যেখানে হাসিবার সেখানে প্রকৃতই হাসিতাম। রূপ-জীবিনীর প্রাণহীন কপট মায়া হইতে বীরাঙ্গনা সতীলক্ষ্মী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের ভূমিকাই এখন পর্য্যায়ক্রমে অভিনয় করিয়া যাই, কিন্তু হৃদয়ে এতটুকুও দাগ পড়ে না।

শুনিয়াছি বাহিরে আমার খুব নাম। প্রত্যেক প্ল্যাকার্ডে আমি কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইব, তাহার বিশেষ করিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। শুধু আমাকেই দেখিবার জন্ম, আমারই গান শুনিবার জন্ম, থিয়েটারে দর্শকগণের স্থানাভাব হয়। কর্ত্তৃপক্ষ অধিক বেতন দিবার ভয়ে ব্যাপারটা চাপিবার চেষ্টা করিলেও আমার নিকট তাহা গোপন নাই। আমিও অধিক বেতনের প্রত্যাশী নহি। কোন রকমে চলিয়া গেলেই যথেষ্ট। আফিসের কাযের মত দিনের বেলায় রিহার্সালে যোগ দিই। অভিনয়ের রাত্রে, নিজের কায সারিয়া দিয়া আসন্ন প্রভাতে বাড়ী ফিরিয়া আসি।

কিসে কি হইল জানি না। হিরণ্ময়ী আর বড়

আমার কাছে আসে না। ডাকিয়া কথা কহিতে গেলেও অনিচ্ছায় দুই চারি কথার উত্তর দিয়া সরিয়া পড়ে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমার অভিনয়ের প্রশংসা হইলে, সে বড় আনন্দিত হইত, নিজেও শতমুখে তাহার ব্যাখ্যা করিত। শুনিতে পাই, সে এখন আমার সমস্ত ভাব-ভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকে। কেহ আমার স্বপক্ষে কোন কথা কহিলে তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেয়।

ইতোমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটিল। ইহাতেই তাহার ব্যবহারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন বিখ্যাত গ্রন্থকার রচিত 'বাঞ্ছিত-মিলন' নামক একখানা অপেরা অভিনয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উপাখ্যান ভাগটা মোটামুটি এইরূপ। কাশ্মীরের রাজকুমার জয়াপীড় চিত্রে চম্পা দেশীয় রাজকুমারী মেঘমঞ্জরীর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। মেঘমঞ্জরীও স্বপ্নে রাজকুমারকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলেন। সখীগণের সাহায্যে উভয়ের পত্র বিনিময় হইলে পরস্পর পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। মেঘ-মঞ্জরীর পিতা এই সকল ব্যাপার অবগত না থাকায় অন্যত্র কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া বসেন। মেঘ-মঞ্জরী লজ্জায় পিতাকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া গোপনে বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া এক গহন বনে আশ্রয় লন। বসন্তকালে নবপত্র-কুসুম-সম্ভারে বন-রাজি যৌবনশ্রী ধারণ করিলে মেঘমঞ্জরী একদিন আত্ম-হারা হইয়া সেই বাসন্তী সুষমা দেখিতেছিলেন, এবং আপন মনে হতাশ প্রণয়ের গান গাহিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে জয়াপীড়ও সেই সময়ে সেই বনে শিকার করিতে গিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। গানের সুরে আকৃষ্ট হইয়া তিনি মেঘমঞ্জরীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। দেখিবামাত্র উভয়ে উভয়কে চিনিয়া ফেলেন। এইরূপে বাঞ্ছিত মিলন সংঘটিত হয়।

নাটকের মধ্যে জয়াপীড় ও মেঘমঞ্জরীর ভূমিকাই প্রধান। স্ত্রীলোকের প্রধান ভূমিকা এতদিন হিরণই অভিনয় করিয়া আসিতেছিল। নাচে গানে অভিনয়ে, তাহার তুল্য অধিকার। এই কায করিয়া সে আপনার চুল পাকাইতে বসিয়াছে। কি কারণে বলিতে পারি না তাহার রিহার্সাল দেখিয়া মাষ্টার সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। দুই একদিন পরেই মেঘমঞ্জরীর ভূমিকাটি পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে দেওয়া হইল। আমি অনেক আপত্তি তুলিলাম, কিন্তু সব ভাসিয়া গেল। তিন চারিদিন মহলা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে আমার অভিনয় কৌশলের প্রশংসা করিতে বসিয়া গেল। মাষ্টার বুক ফুলাইয়া অপেরাখানির সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিলেন।

একদিন মহলার পর গাড়ীতে উঠিবার জন্য বাহিরে আসিতেছি, পাশে কতকগুলা পরিত্যক্ত ছিন্ন সিনের অন্তরালে দুইটি নারীকণ্ঠের গোপন আলাপের শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বুঝিতে পারিলাম, হিরণ অপর একটি নূতন অভিনেত্রীর সহিত কথা কহিতেছে। হিরণ বলিতেছে, "সোণা বাইরে আঁচলে গিরো। আমিই তাকে থিয়েটারের পথ চেনালাম, হাতে ধরে শিক্ষা দিলাম, আজ সে আমায় টেক্কা মেরে চ'লে যাচ্ছে। মাষ্টারের বিচারটা ভাল।"

এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, হিরণ আমার উপর বিরূপ কেন। আমি কি করিব? ইচ্ছা করিয়া ত আমি তাহাকে আসনচ্যুত করি নাই। যাহারা বেতন দেয় তাহাদের কথা ত মানিতে হইবে। একবার মনে হইল, হিরণের সম্মুখে মাষ্টারকে সকল কথা খুলিয়া বলি। কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া আর ঘাঁটাইতে ইচ্ছা হইল না।

বাড়ী আসিয়াই ম্যানেজারকে একখানি পত্র লিখিয়া কাযে ইস্তফা দিলাম।

কর্ত্তৃপক্ষগণ আকাশ হইতে পড়িলেন। নাটিকা-খানির মহলা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য তাঁহারা অনেক খরচ পত্রও করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দুই

পয়সা পাইবার আশাও যথেষ্ট ছিল। অকস্মাৎ আমার এই কর্ম্মত্যাগ পত্র পাইয়া তাঁহারা সদলবলে আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে নানাপ্রকারে আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। অনেকে ন্যায় ধর্ম্মের দোহাই দিতেও ছাড়িলেন না। অবশেষে প্রচুর বেতন বৃদ্ধির প্রলোভন পর্য্যন্ত দেখাইলেন। কিন্তু আমার মন যে কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছিল, আমি কোন ক্রমেই তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না।

শুনিলাম হিরণকেই পুনরায় মেঘমঞ্জরীর ভূমিকাটি দিবার প্রস্তাব চলিতেছে। কিন্তু হিরণ একবার অপমানিত হওয়ায় সে কোন ক্রমেই তাহা লইতে সম্মত হইল না। অগত্যা 'বাঞ্ছিত মিলনের' অভিনয়ের আয়োজন স্থগিত হইয়া গেল।

৪

আমার কর্ম্মত্যাগের পর নানাস্থান হইতে নূতন কাযের আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। আমার ক্ষুধা মিটিয়াছিল। এই কয়বৎসর যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে একটা মানুষের জীবন বেশ চলিয়া যাইবে। আর রূপের বেসাতি করিয়া বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা হইল না। দৃঢ় চিত্তে সকল আমন্ত্রণই অস্বীকার করিলাম।

হিরণ কিছু না বলিলেও আর তাহাদের বাড়ীতে বাস করিতে ভাল লাগিল না। একদিন তাহার কাছে বিদায় লইয়া জনবহুল কলিকাতার একটি সরু গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

পৌষ মাসের রাত্রি। কন্‌কনে শীত। আমি র‍্যাপারখানা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে গাহিতেছিলাম—

"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।"

হঠাৎ ঝি আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "একটি বাবু এসেছেন।"

"রাগে জেনে আর লোকটা কে?" বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম।

বাধা পাওয়ায় গানের সুরটা আর তত জমিল না। উঠিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া মুখে লাগিল।

শীতের কুয়াসা জমাট বাঁধিয়া সমস্ত কলিকাতা সহরের উপর একখানা ধূসর চাঁদোয়া টাঙাইয়া দিয়াছিল। পথে মোটর গাড়ীগুলা এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহাদের তীব্র আলোগুলা ঝাপসা দেখাইতেছিল। সান্ধ্য ফিরিওয়ালাগণ 'গরম চা' ও 'আলু নারকেলের ঘুগ্‌নিদানা' হাঁকিতেছিল।

ঝি আসিয়া বলিল, "তিনি 'সিটি' থিয়েটারের ম্যানেজার বাবু।"

ঝিকে বলিলাম, "সকালে আস্‌তে ব'লে দে।"

সে যেন একটু কুণ্ঠিত হইল। একটিবার দেখা করিবার ওজরে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার যেন তাহার ভাল লাগিতেছিল না। অগত্যা বলিলাম, "ডেকে আন।"

জুতার শব্দ পাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম বাবুট প্রবীণ। মাথার চুল ও গোঁফ যোড়াটা প্রায় সাদা হইয়া আসিতেছে। মানুষ যে বয়সে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিয়া থাকে, ইঁহার সেই রকম হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সম্মুখের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলাম।

বাবুটি বসিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামই কি প্রতিভাসুন্দরী?"

এই ছদ্মনামেই আমি থিয়েটার মহলে পরিচিত ছিলাম। মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম।

"বড় বিপদে প'ড়েই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। কোন রকমে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।"

"বলুন।"

'কৌস্তভ' থিয়েটারে 'বাঞ্ছিত মিলন' বন্ধ হ'য়ে গেল দেখে, আমরা সেটা খোলবার ইচ্ছা করেছিলেম। কা'ল বড়দিনে অভিনয় হবে ব'লে বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। যে মেঘমঞ্জরীর পার্ট নিয়েছিল সে আজ হঠাৎ মারা গেছে। কা'ল ত প্লে হবার কোন উপায় দেখছিনে। 'বাঞ্ছিত মিলনের বদলে যদি আমরা কাল অন্য প্লে দিই, তাহ'লে বিশেষ অপ্রস্তুত হ'তে হবে।"

"আমায় কি করতে বলেন?"

"আপনার ত মেঘমঞ্জরীর পার্ট তৈরীই আছে। যদি অনুগ্রহ ক'রে—"

"আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি থিয়েটারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ ক'রেছি।"

"আমাদের থিয়েটার অবশ্য আপনার মত লোকের মর্য্যাদা রাখবে।"

"অর্থাৎ।"

"আপনি যা চান, আমরা তাই দিতে স্বীকার।"

"তা হোক, আমার আশা ছেড়ে দিন।"

বাবুটি হতাশ হইয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে একটু দয়া হইল। বলিলাম, "বুঝেছি, আপনারা একেবারে নিরুপায়। যখন নিতান্তই ধরেছেন, তখন কালকের জন্যে কোন রকমে আপনাদের মুখ রক্ষা করতে পারি—কিন্তু আর না। টাকাকড়ি নেবার জন্যে কোন অনুরোধ করবেন না।"

বাবুটি তাহাতেই সম্মত হইলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া ধারণা হইল টাকা না লইবার প্রস্তাবটা তাঁহার কাছে খুব নূতন ঠেকিয়াছে।

কথাটা পাকা করিয়া লইবার জন্য তিনি পুনরায় বলিলেন, "তা হ'লে আমি এখন নিশ্চিন্ত?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "যদি আপনাদের পূর্ব্ব অভিনেত্রীর মত দশা না হয়, তা হ'লে আপনাকে ভরসা দিতে পারি।"

বাবুটি একটু হাসিয়া বিদায় চাহিলেন।

নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম।

বাবুটি চলিয়া গেলে ভাবিতে লাগিলাম, আবার সেই মুখে রঙ মাখিতে হইবে! আবার সেই মাজা ঘষা রূপ লইয়া অসংখ্য পিপাসিত চক্ষুর সম্মুখে নানা বিভঙ্গে দাঁড়াইতে হইবে!

কিন্তু আর সময় নাই। বাক্স হইতে পার্টের পুরাতন খাতাখানা বাহির করিয়া বিস্মৃত অংশগুলি নূতন করিয়া লইতে লাগিলাম। গান কয়খানিতে আর একবার সুর সংযোজন করিয়া লইলাম।

পরদিন সকালে ছাদে আসিয়া রৌদ্রে বসিতেই সম্মুখের বাড়ীর দেওয়ালের বিজ্ঞাপনগুলির উপর দৃষ্টি পড়িল। সিনেমা, সার্কাস, পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি বহুবিধ বিজ্ঞাপনের মধ্যে মোটা মোটা লাল নীল হরফে 'সিটি' থিয়েটারের 'বাঞ্ছিত মিলনের' প্ল্যাকার্ড সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। অভিনেতৃগণের নামের তালিকার মধ্যে লিখিত রহিয়াছে—

জয়াপীড়—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় (বিশুবাবু)।

মেঘমঞ্জরী—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী।

বিশ্বনাথ রায় নামটি পড়িয়াই যেন আমার মনটা অবসন্ন হইয়া পড়িল। বহুদিন—বহুদিন পূর্ব্বে এক আসল বিশ্বনাথ আমার জীবন আলো করিয়াছিল। আজ শ্মশানের ধূলায় ঝুটা বিশ্বনাথকে লইয়া কারবার করিতে হইবে।

৫

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই থিয়েটারের গাড়ী আসিল। ঝিকে বাড়ীর ভার দিয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম।

দেখিলাম 'কৌস্তভ' থিয়েটার অপেক্ষা 'সিটি' থিয়েটারের ব্যবস্থা অনেক ভাল। স্ত্রী পুরুষের সজ্জার স্থান পৃথক। অভিনেত্রীদের বিশ্রামের স্থানও পর্দ্দার অন্তরালে।

যথা সময়ে থিয়েটার আরম্ভ হইল। দর্শকের হুড়াহুড়ি ও ম্যানেজারের স্মিতমুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, 'সেল' ভালই হইয়াছে।

পুস্তকের মাঝখানেই আমার ভূমিকার অধিকাংশই শেষ হইয়া গেল। শেষের দৃশ্যে একবার আসিলেই আমার কায শেষ। শেষদৃশ্যের তখনও অনেক বিলম্ব। কে কিরূপ অভিনয় করিতেছে দেখিবার সাধ আর আমার ছিল না। আমি বিশ্রাম কক্ষের একখানা বেঞ্চের উপর সটান শুইয়া পড়িলাম।

বাহিরে কনসার্ট বাজিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে শিশুর চীৎকার, পুরুষ কণ্ঠের শাসনবাণী এবং অভিনেতা বিশেষের প্রতি বিদ্রূপ বাক্য সকলে মিলিয়া একটা তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল।

কি একটা ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রা আসিয়া পড়িল। কাণের কাছে নূপুর শিঞ্জন, নৃত্যের তাল এবং গানের সুর ক্রমশঃ মিলাইয়া আসিল। আমি যে আজ অভিনেত্রী বেশে থিয়েটারের বিশ্রামগৃহে অপেক্ষা করিতেছি তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলাম।

একটা ব্যস্ত আহ্বানে আমার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেরি হ'য়ে গেছে নাকি ?"

"না, এইবারে আপনার সময় হয়েছে, প্রস্তুত হ'য়ে নিন্।"

আমি গিয়া রঙ্গমঞ্চের প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গহন বনে পরিণত হইল। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোগুলা একবারে বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচীন কোটরবহুল বৃক্ষশাখা সমূহ হেলিয়া পড়িল। উপলময় আঁকা বাঁকা ক্ষুদ্র তটিনী, পাপ শ্রেণীর চরণ নিম্ন দিয়া কোন্ সুদূরে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। বনের যেখানে একটু ফাঁক—যেখানে একটু অবকাশ, সেইখানে লতাপাতার জড়াজড়ি। নবোদ্গত পত্ররাজির উপর নানা বর্ণের বিবিধ ফুল মন্দ মারুতে ঈষৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল। উপরে পূর্ণচন্দ্র অফুরন্ত কিরণ ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল।

আমি স্থান কাল ভুলিয়া গেলাম। চিরপিপাসিত অন্তর, বাঞ্ছিতের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তন্ময় হইয়া গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলাম—
"দিন রাতি তুহু গুণ ঝুর—দূর সো উরপর যব নাহিয়ে—
তবহিঁ হতচিত হোত সচকিত হেরি পুন নাহি বাইয়ে।"

ব্যথা-ভরা করুণ বিরহ রাগিণী রঙ্গস্থল পরিপূর্ণ করিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি সুরের প্রত্যেক মূর্চ্ছনাটি আমার সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত। মাটীর পুতুলের মত নীরবে একাগ্রচিত্তে তাহারা আমার হৃদয়ের প্রকৃত বেদনা উপলব্ধি করিতেছিল।

আপনিই কখন সুর থামিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না। একটা বৃক্ষ কাণ্ডে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

ইহারই মধ্যে ধনুঃশর হস্তে জয়াপীড় আমার অলক্ষিতে পশ্চাতে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমার গান শুনিতেছিল।

আমি থামিলে সে ডাকিল "মঞ্জরী!" কার স্বর! সেই বিস্মৃতপ্রায় চিরপরিচিত কণ্ঠের আবাহনধ্বনি! সেই টিকালো নাক, পরিপূর্ণ কপোলদ্বয় এবং দীর্ঘ মসৃণ ললাটদেশ, কৃত্রিম গোঁফ ও পরচুলায় আবরণে একেবারে ঢাকিয়া যায় নাই।

আমার হাত পা অবশ হইয়া আসিল। শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহের শব্দ স্পষ্ট কাণে শুনিতে পাইলাম। একখানা উইং অবলম্বন করিয়া আপনাকে খাড়া রাখিলাম।

বোধ হয় সেও আমায় চিনিতে পারিয়াছিল। পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমার মুখ দিয়া একটাও কথা সরিল না। ভিতর হইতে প্রম্টারের পুনঃ পুনঃ চাপা চীৎকার আসিতে লাগিল—"এস এস প্রিয়তম, আমার এই দীন জর্জ্জরিত বক্ষপঞ্জরে ফিরে এস!"

কিছুতেই সে যখন আমাদের কাহাকেও কথা কহাইতে পারিল না, তখন অগত্যা তাড়াতাড়ি যবনিকা ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল।

বাহির হইতে অসংখ্য দর্শকের করতালিধ্বনি কাণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

লজ্জায়, ক্ষোভে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন দেখিলাম 'দৈনিক সমাচার' সিটিতে 'বাঞ্ছিত মিলন' অভিনয়ের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছে, নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। অভিনয়ের প্রশংসায় সমালোচক শত মুখ। শেষ দৃশ্য সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন "এই দৃশ্যে মেঘমঞ্জরী ও জয়াপীড়ের অভিনয় অপূর্ব্ব। শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী ও বিশুবাবু উভয়েই বিশেষজ্ঞ এবং নিপুণ শিল্পী। তাঁহারা গতানুগতিক ভাবে গ্রন্থের ভাষা অনুসরণ না করিয়া যে নীরব অভিনয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ স্বাভাবিক অভিনয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে কখন দেখিয়াছি মনে হয় না। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রন্থকার এই দৃশ্যে মেঘমঞ্জরী ও জয়াপীড়ের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

বধূ জীবন

বাঙ্গালীর মেয়েদের বধূ জীবন অনেক সংসারেই দুঃখময়। কন্যাগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জননীগণ নিজেদের হৃদয়-ভীতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রাণেও ভয় জাগাইয়া তোলেন—"দেখিস শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে মজা টের পাবি!" "গরম ভাত খাওয়া বেরিয়ে যাবেখন; "রাত পোয়াতে ক্ষিদে লাগে কোথায় পাবি? শাশুড়ী হয়ত একটা মিষ্টি ধরিয়ে দেবে দুপুর বারোটার সময়।"

এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া জননীগণ কন্যার হৃদয়খানিতে নারী জন্মের প্রতি সহস্র ধিক্কার উপস্থিত করাইয়া দেন। তাহারা শিশুকাল অবধি শ্বশুর বাড়ীর সম্বন্ধে ভূতাবিষ্টের মতই ভয় পায় এবং পতিগৃহে যাইবার দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে কন্যাগণ ততই যেন বিষাদময়ী হইতে থাকে। কোন কোন মেয়ের উৎকট ব্যাধি হইতেও দেখা যায়।

কিন্তু কেন? এই বালামেঘ বজ্র কতদিনে বাঙ্গালীর সংসার হইতে উঠিয়া যাইবে? শাশুড়ীরা সকলেই একদিন বধূ জীবন বহন করিয়াছেন, এখন পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া যান কেন? বধূকে বরং কথার পৃষ্ঠে কহেন, "তুমিত ঢের সুখ করছ বৌমা, আমি যখন বৌ ছিলাম কত কষ্ট করেছি, ননদের যায়ের শাশুড়ীর কত মুখনাড়া খেয়েছি, কত রাত্তির পর্য্যন্ত পা টিপেছি!"

এই স্থানেই কত বড় ভ্রম দেখুন! নিজের সেবা ও সংযমকে বিকৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া বধূকে কি শিক্ষা দেওয়া হইল? বধূও যাহাতে মনে করে তাহারও বর্ত্তমান অবস্থা দুঃখজনক এবং শাশুড়ী ননদ যায়ের সেবা করা বড়ই নিন্দনীয় এবং কষ্ট-কর।

কাহারও যদি দাস দাসী রাখিবার ক্ষমতা না থাকে তবে বধূ কন্যাগণ কিংবা নিজেরা সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন না ত কে করিবে? আজকাল দাস দাসী রাখাও ব্যয়সাধ্য, সকলের সামর্থ্যে কুলাইয়া উঠে না। সাংসারিক কায করা বধূগণের কিছু কষ্ট মনে করা উচিত নহে। প্রয়োজন

অনুসারে শ্বশ্রূ বা ননদের সেবা করাও উচিত কার্য্য। তবে তাহাতে সমবেদনা থাকা চাই, মিষ্ট কথায় বধূর চিত্ত বশ করা চাই।

ন্যায় অন্যায়ের সুবিচার করা আবশ্যক। তুমি মা, কত বড় দায়িত্বপূর্ণ অধিকার লইয়া তুমি সংসারে অধিষ্ঠিতা! যদি সেই মা নামের মর্য্যাদা রাখ, স্নেহে যত্নে বধূর মাতৃস্থান অধিকার কর, তবেই ত মা! তবেই বাঙ্গালীর গৃহ শান্তিপূর্ণ হইবে, নারীগণের নয়নের বারি শুকাইবে।

প্রথমতঃ তুমি বধূর পিতার বাস্তভিটা বিক্রয় করাইয়া তাহাদিগের সংসারে দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া তবে ভীতা ত্রস্তা বধূকে সংসারে আনিলে। তারপর প্রতিপদে সহস্র ছিদ্র বাহির করিতে লাগিলে "ওগো ছোটলোকের মেয়ে! চামারের মেয়ে! বলি আমার বি-এ পাশ ছেলের কি এই বরশয্যে? এই ঘড়ি চেন? এই রূপের বউ।"

তারপর প্রতি দ্রব্যে খুঁত, প্রত্যেক কাযে ছল ধরা খোঁটা দেওয়া চলিতে লাগিল; এরূপ স্থলে কিরূপে বধূর নিকট ভক্তির আশা কর? জোর করিয়া কায আদায় করিতে পার, মৌখিক ভক্তি আদায় করিতে পার, কিন্তু তাহা কি চিরস্থায়ী? না না, অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী তাহা, ভবিষ্যতে অন্ধকারময়!

তাই আজ বাঙ্গালীর পরাধীনা নারীজাতি কেবলি কাঁদিতেছে! যে সকল সংসারে লক্ষ্মীরূপিণী মাতা ভগ্নী ভাগিনীগণ অনবরত রোদনে রতা সে সকল সংসারে উন্নতির আশা কোথায়? এইরূপ অশান্তিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া কত পুরুষ নিজ জীবনের গতি পঙ্কিল করিতেছে, মাতাল হইয়া চরিত্রহীন হইতেছে।

বধূ অবস্থায় নারীগণ শ্বশ্রূর বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বিরলে রোদন করে, এবং সুযোগমত স্বামীকে নিজ অভাব দুঃখ জ্ঞাত করাইতে ভুলে না। কত স্বামী শিক্ষিত হৃদয় লইয়া পরাধীনা স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, কত স্বামী তাহাও করেন না। স্ত্রী যখন পুত্র কন্যার জননী পদে অভিষিক্তা হন, তখন নিজের সন্তানের গর্ভধারিণী বলিয়া অনেক নিষ্ঠুর স্বামীও কৃপাবান হন। তখন হইতে শ্বশ্রূর দুঃখ আরম্ভ হয়। বধূরা নিজের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন।

স্বচ্ছ কোমল নব প্রভাতের ন্যায় সুনির্ম্মল হৃদয় খানি লইয়াই দশ কিংবা বারো বৎসর বয়সের কিশোরী বধূই আমাদের সংসার আলো করিতে আসে, সংসারের কঠিন ঘোলাঘাতে ক্রমে তাহাদের কুসুম পেলব হৃদয়খানি পাথরের মতই কঠিন হইয়া উঠে, এবং প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়!

এই বধূও আবার গৃহিণীপদে উন্নীত হইলে নিজের পূর্ব্বে দুঃখ অভাব সমস্ত ভুলিয়া যান কিংবা চাপা দিয়া রাখেন। ইঁহার বধূ আসিলে, নিজে যত ভোগ ভুগিয়াছেন তাহার দ্বিগুণ আরম্ভ করেন; বধূকে ভীষণ আঁটা-আঁটির মধ্যে রাখা প্রয়োজন মনে করেন, পাছে তাঁহার মতই বধূ তাহার স্বামীকে আয়ত্ত করিয়া লয় এবং তিনি পরাধীনা হন!

এ সমস্তই কুশিক্ষার ফল এবং পরাধীনতার ফল। নারীগণ চিরজীবন পরাধীন ও শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়াই অন্তঃপুরে যতটুকু পারে কর্তৃত্ব করিতে ছাড়ে না। আজ যদি রমণীগণ সুশিক্ষা ও স্বাধীনতা পায়, তবে এই অবস্থা থাকিবে না। বধূ আর বধূ-জীবন দুঃখময় মনে করিবে না, মাতাগণ কন্যাদের শ্বশ্রূগৃহের ভয় প্রদর্শন করিবে না, গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করিবে। পুরুষগণকেও দারুণ অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না, মাতা ভগিনী ভ্রাতার প্রতি যথাকর্ত্তব্য করিবেন, স্ত্রীর প্রতিও কর্ত্তব্য থাকিবে।

কিন্তু কত দিনে তাহা হইবে? কবে আমাদের নয়ন উন্মীলিত হইবে? এখন ত শ্রদ্ধেয় পুরুষগণ, রমণীগণের ফাঁকা আবেদন মাত্র শুনিয়া ভয়ানক রোষ-অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিতেছেন, কত কি-ই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন দেখিলে ভয়ও হয় হাসিও পায়!

যুগের বাতাস এখন অন্যদিক হইতে বহিতেছে। পরাধীনা নারীগণ আজ এক সঙ্গে জাগিতে চাহে, তাহা-

দের দুঃখ কষ্ট সীমার উর্দ্ধে উঠিয়াছে—তাহারা অনেক দিন নীরবে গৃহ-কোণে নয়ন নীর ঢালিয়াছে, আর পারে না। ওগো মহাত্মা পুরুষগণ, আর কেন তোমরা চরম নিষ্ঠুরতা দেখাও? তোমরা কেন চিরদিন স্বার্থের মাঝে ডুবিয়া রহিতে চাও? নারীগণের দুঃখ কেন বুঝ না?

তোমরা সতীত্বের দোহাই দিতেছ, স্বাধীনা হইলে রমণীগণ অসতী হইবে বলিয়া তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা কেন? কিংবা নিজেরা যে পথে চল সেই পথ নারী-গণের জন্যও কল্পনা করিয়া ভয় পাও বুঝি? কিন্তু যাহা কল্পনায় ধরিয়া তোমরা ক্রোধান্বিত হও, সেই সমস্ত অত্যাচার তোমাদের স্ত্রীগণ মাতা ভগিনীগণ কিরূপ নীরবে বুক বাঁধিয়া মুখ বুজিয়া সহিতেছেন ভাব দেখি একবার!

কেবলি কি নিজেদের সুখ খুঁজিবে? প্রভুত্ব খুঁজিবে? নারীগণকে চিরটা জীবন দাসীত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের বক্ষ শোণিত পান করিয়া সমাজের মধ্যে দেশের মধ্যে তোমরা মহানন্দে সুখে বিচরণ করিতে থাকিবে?

রমণীগণের দুঃখ কষ্ট জানাইবারও অধিকার নাই! সকলে মিলিয়া অমনি হাঁ হাঁ করিয়া উঠ, একি কথা? দুঃখের চাপ সহিতে না পারিয়াই আজ বাঙ্গলার নারীগণ নিজেদের শৃঙ্খল মুক্ত করিতে চাহিতেছে—তাই কাতর আবেদনে তোমাদিগকে কষ্ট জানাইতেছে—কিন্তু তোমরা তাহাতে গরম হইতেছ। ইহা কি তোমাদের কর্ত্তব্য?

কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে বাঙালীর গৃহে গৃহে কেন অশ্রু প্রবাহিত হয়? কেন নিরানন্দে জনক-জননীর বক্ষ-স্থল বিদীর্ণ হয়? পুত্র ও কন্যা মাতা-পিতার নিকট কেন সমতুল্য হয় না? তোমাদের জন্যই নয় কি? হায়, তোমাদের পণ দিয়া প্রাণাধিকা কন্যাকে বিদায় করিতে হইবে মনে ভাবিয়া, বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে হইবে, মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইয়া নিয়ত অপমানিত হইতে হইবে ভাবিয়া কন্যা কোলে জননী কাঁদেন!

রমণীগণের জন্মের সহিত তোমাদের দারুণ অত্যাচার জড়িত! মাতা পিতার মধুময় স্নেহ, তোমাদের আশঙ্কায় ভীতি-সঙ্কুল কণ্টকময়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমরা সকল বিষয়ে রমণীগণের সুখের পথে বাধা স্বরূপ হইয়া আছ! পুত্র কন্যা, মাতা পিতার নিকট কখনও ভিন্ন হইতে পারে না, একই স্নেহ মমতায় যত্ন আদর—কিন্তু বিবাহ-ভীতি অন্তরায়।

কত গৃহে বালাগণ বিবাহের পর শ্বশুর গৃহে আসিয়াই জন্মের মত পিতৃগৃহ চ্যুতা হন। তাঁহার ছোটলোক পিতা নেকলেস দেয় নাই—বর-শয্যায় পালঙ্ক দেয় নাই, সুতরাং মেয়ে আটক করিয়া নীচ লোকটাকে জব্দ করিতে হইবে।

কেন তোমরা এই নারীমেধ যজ্ঞে মন দিয়াছ? ইহাতে তোমাদের গৃহস্থালী কত সুখে পূর্ণ হয়? তোমরা পুত্র কামনা কর—তাহাকে পালন কর—তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা দাও কি এই নিদারুণ অত্যাচারের নিমিত্ত?

এই যে কচি মেয়েগুলি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া সংসারের দাসী এবং পাচিকাতে পর্য্যবসিত হইতেছে—আহা, তাহাদের মুখের দিকে চাহে কে? তাহাদের রোগ হইলে তোমরা বলিবে ন্যাকাম, ক্ষুধা পাইলে বলিবে রাক্ষসী, ঘুম পাইলে বলিবে অলক্ষণা! তাহাদের রূপ থাকিলে দোষ, চুল থাকা দোষ—কথা বলা হাসি সকলই দোষ; এ সমস্ত অত্যাচার নয়?

তাহার যৌবন তাহার রূপ রস গন্ধ প্রেম আশা সে কিরূপে সমাজের পদে বিসর্জ্জন দিবে? দেশাচারের এত কড়াকড় পাহারা,—তবুও তাহার মধ্যেও কত স্থানে কুফল ফলিতেছে না কি? উপন্যাসে তোমরা প্রমদা সরলাকে দশম বৎসরে বিধবা করিয়া যৌবনে যোগিনীর সাজে অঙ্কিত করিতে পার বটে, কিন্তু সজীবে তাহা অতিশয় কঠিন কায!

তোমরা পুরুষ বলিয়া পাঁচবার দশবার বিবাহ করিতেছ, তাহাতে কোনই দোষ নাই, কথা নাই। রমণী বলিয়া তাহাকে কি তোমরা লৌহ এবং প্রস্তরে

গঠিত মনে কর? সংসারের অত্যাচারে গৃহ ত্যাগ করিয়া কত রমণী নিজেদের কলুষিত করিতেছে, কত প্রকার দুঃখক্লেশ সহিয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে তাহা কি সমাজের পক্ষে হিতকর এবং পুণ্যময় দৃষ্টান্ত!

হিন্দু সমাজের পুরুষগণ সবুজ চসমা চোখে দিয়া নিজেদের অন্তঃপুর কাহিনী ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন, তাই নারীগণের কারামুক্তির সংবাদ তাঁহাদের নিকট কণ্টক সমান মনে হয়! মাসিক পত্রিকায় যে দুইচারি জন রমণী নিজেদের দুঃখ অভিযোগ জানাইতেছেন, তাহাতে সুবুদ্ধি পুরুষগণ অতিশয় চটিতং হইতেছেন। ইহাও কি তাঁহাদের এক প্রকারের দেবত্ব? না অন্য কিছু নারীগণ মনে করিবে?

খাইতে পরিতে দিয়া এবং অনেক স্থলে স্নেহময় স্বামী যাঁহারা—স্ত্রীর সমস্ত অভাব অভিযোগ পূর্ণ করিয়া রমণীগণকে সুখী করেন সত্য, কিন্তু তাহা বিরল। অনেক সংসারে নারীগণ আজন্মকাল নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা অপমানিতা, কেহ তাহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহে না। হিন্দু সমাজে কন্যার পিতামাতা নীরবে জামাতার এবং বেহাই বেহানের পাশবিক অত্যাচার দেখিতে থাকে কিন্তু প্রতীকারের উপায় নাই! সমস্তই সহ্য কর—নয়ত স্ত্রী ত্যাগ করিয়া জামাই পুনরায় বিবাহ করিবে, দশজনে নিন্দা করিবে, কন্যা অনাথিনী হইয়া তাঁহার আবাসে ফিরিয়া আসিবে। পিতা মাতার পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু এ প্রথা হইয়াছে কেন? পরাধীনতাই ইহার কারণ! এইরূপ স্থলে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়, কন্যাগণকে জন্ম মাত্র পৃথিবী হইতে শেষ বিদায় করা ভাল।

কোন যুবক স্ত্রীকে পাদুকা দ্বারা প্রহার করিতেছে আর স্ত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া কহিতেছে "চুপ কর্, চুপ কর্ একটুও আওয়াজ বাহির না হয়!" অবশ্য সে যুবক তখন নেশার' ভরপুর ছিল। কিন্তু এ যে পুরুষগণ প্রকৃতিস্থ শীতল মস্তকে স্থিরচিত্ত হইয়া নারীগণকে নির্য্যাতিত করিতেছেন আর ধমক দিতেছেন "চুপ কর, কান্নার আওয়াজ না বাহির হয়, চুপ!"

শ্রীসরযূবালা বসু।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রেল ষ্টেশনের প্লাটফরম ছাড়াইয়া গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। রাত্রির অন্ধকারে দুই পার্শ্বের তরুলতা গুল্ম পুষ্প পত্র সমাচ্ছাদিত শ্যামশোভাসমন্বিত শান্ত গ্রাম গুলির কোন শোভাই আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম না, কেবল যে যে ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেছিল সেই সেই প্ল্যাটফরমের ল্যাম্প পোষ্টের উপর সংস্থাপিত কেরোসিন ধূমায়মান ক্ষীণ দীপশিখা এবং আরোহী অবরোহী যাত্রী সত্ত্বের অকারণ কোলাহল এবং রেল পুলিশের ও ষ্টেশন কর্ম্মচারিগণের যাত্রীদিগের প্রতি আদেশ প্রচারের উচ্চরব শুনা যাইতেছিল—রব মাত্র বলিলাম, কারণ গুজরাটী ও মারাঠী ভাষা না জানা হেতু কেবল শব্দই শুনিতেছিলাম, শব্দের অর্থবোধ হইতে পারে নাই। আমাদের গন্তব্য স্থান বরোদা, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বোম্বাই হইতে বরোদা অধিক দূরের পথ নহে। সেদিনে গাড়ী ছয় সাত ঘণ্টায় যাইত—আজ তদপেক্ষা কম সময়েই গুজরাট মেল পঁহুছিয়া যায়।

আহারাদির পর রাত্রি অনুমান নয়টার সময়ে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম। প্রভাতের বহু পূর্ব্বেই বরোদা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল—তখনও পরিপূর্ণ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত। ষ্টেশনের ক্ষীণালোকে কষ্টে জিনিষপত্র

সহ নামিলাম। বাহিরে আসিয়া গাড়ী ভাড়া করা হইল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "শেঠ, কাঁহা যায়েঙ্গা?" সে দেশে "বাবু" "হুজুর" প্রভৃতি সম্মান সূচক সম্বোধন অধিক শুনি নাই, যাহাকে সম্মানের সহিত সম্বোধন করিবে তাহাকে "শেঠ"ই বলিয়া থাকে, এবং তাহাদের হিন্দী ভাষাও, আমাদের বাঙ্গালীর মুখনিঃসৃত কায়ক্লেশের হিন্দী—"যায়েঙ্গা" "করেঙ্গা" "খায়েঙ্গা" প্রভৃতি "ঙ্গ" অন্ত শব্দ বলিয়াই তাহারা মনে করে খুব উচ্চ অঙ্গের হিন্দী বা উর্দ্দু বলিল। গাড়োয়ানের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু বিপন্ন হইলাম, কারণ সেখানে হোটেল আছে কিনা জানিনা, থাকিলেও কিরূপ হোটেল তাহার কোন জ্ঞানই নাই. যদি সে দেশের হিন্দুর হোটেল হয় তাহা হইলে পুণা সহরে শশিশেখরের দশার কথা স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, মৎস্যাশী বাঙ্গালীর স্থান সেখানে হইবে কিনা সন্দেহ। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম "ডাকবাঙ্গলা যাও।" ভাবিলাম, রাজধানী স্থান, ডাকবাঙ্গলা নিশ্চয়ই থাকিবার কথা। গাড়োয়ান বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ী হাঁকাইল। দেখিয়া জানিলাম আমার অনুমান সত্য, রাত্রি প্রভাত না হইতেই গাড়ী ডাকবাঙ্গলায় পহুঁছিল। গাড়োয়ানের হাঁকে ডাকে বাঙ্গলার চৌকীদার দরজা খুলিয়া দিল। গাড়ী ডাকবাঙ্গলার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে আমরা দেখিলাম বাঙ্গলাটি বৃহৎ পাকা ইমারত, বৃটিশ ইণ্ডিয়ার বহুস্থানের ডাকবাঙ্গলার ন্যায় খড়ের চালা নহে। গাড়োয়ান, চৌকীদার এবং বাঙ্গলার আরাপর ভৃত্যবর্গের সহায়তায় জিনিষপত্র নামাইয়া আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম আমাদের পূর্ব্বে অন্য কোন ব্যক্তি আসিয়া ডাকবাঙ্গলা অধিকার করে নাই; অনুসন্ধানে জানিলাম, আমরা ইচ্ছা করিলে দুই চারি দিন থাকিতে পারি, ডাকবাঙ্গলায় চব্বিশ ঘণ্টার নিয়ম সেখানে তেমন প্রবলভাবে জারি নাই; আহারাদির ব্যবস্থা নিজেরাও করিতে পারি; বাঙ্গলার ভৃত্যবর্গের উপর নির্ভর করিলে তাহারাও করিয়া দিতে পারে; মৎস্য মাংসাদি সম্বন্ধে পুণার ব্রাহ্মণের হোটেলের কড়াকড়ি নাই শুনিয়া শশিশেখর 'শিসে' গান সুরু করিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ চা, রুটি প্রভৃতি ত্বরায় আনিবার জন্য বাঙ্গলা হিন্দীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে অদ্ভুত ভাষায় গম্ভীর ভাবে আদেশ প্রচার করিল।

সমস্ত দিবস ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাজধানীর দ্রষ্টব্য পদার্থগুলি দেখিতে হইবে, সুতরাং যানবাহনের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে; যে গাড়োয়ানকে ষ্টেশনে পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিলাম লোকটি মন্দ নহে, এবং সে যেখানে যাহা দেখিবার আছে এবং পাশ প্রভৃতি কোথা হইতে কেমন করিয়া বাহির করিতে হইবে সে সমস্ত সন্ধান রাখে। তাই আর অন্য গাড়ীর ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকেই সমস্ত দিন রাত্রির জন্য নিযুক্ত করিলাম এবং কহিলাম, যত দিন আমরা থাকিব তাহার গাড়ীই ব্যবহার করিব। ডাকবাঙ্গলায় গাড়ী রাখিবার স্থান ছিল, সে গিয়া গাড়ীর ঘরে গাড়ী রাখিয়া ঘোড়ার সাজ খুলিয়া 'দানা' খাওয়াইবার ব্যবস্থায় মন দিল। শশিশেখরের আদেশ অনুসারে যখন গরম চা আসিয়া পঁহুছিল, তখন দেখিলাম ডিসেম্বরের শীতল প্রভাতে শশী তাড়াতাড়ি উষ্ণ পানীয়ের ব্যবস্থা করাইয়া ভালই করিয়াছিল।

অনুসন্ধানে জানিলাম রাজপ্রাসাদ গুলি, পশুশালা এবং সাধারণের ভ্রমণার্থ সুবৃহৎ উদ্যান (Park) বরোদার দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজপ্রাসাদ দেখিবার জন্য পাশের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সে ছাড়পত্র পাওয়া কঠিন নহে, হায়দ্রাবাদের ন্যায় কড়াকড়ি নিয়ম এখানে নাই। পাশ দিবার জন্য যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তাঁহার আফিস প্রাসাদের সন্নিকটে। বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যখন ইচ্ছা পাশ পাওয়া যায়; সেখানে উপস্থিত হইয়া চাহিলেই অনুমতি পত্র পাইতে বিলম্ব হয় না। আমরা একটু তাড়াতাড়ি স্নান আহার সমাধা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়ানের গাড়ীতে প্রসিদ্ধ "লক্ষ্মীবিলাস" প্রাসাদ দেখিবার জন্য চলিলাম।

ডাকবাঙ্গলা হইতে "লক্ষ্মীবিলাস" অধিক দূরে]

নহে, অল্প সময়েই প্রাসাদসংলগ্ন মনোরম বৃহৎ উদ্যানের প্রশস্ত তোরণে সমুপস্থিত হইলাম। দূর হইতে দেখিলাম "লক্ষ্মীবিলাসে"র গুম্বজ সমুন্নত শীর্ষ উর্দ্ধে মস্তকোত্তলন করিয়াছে—সমগ্র প্রাসাদটি দৈর্ঘে প্রস্থে উচ্চতায় এবং শিল্পসৌন্দর্য্যে ভারতের রাজন্যবর্গের প্রাসাদ সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও শ্রেষ্ঠতম সৌধগুলির মধ্যে ইহা যে একতম সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা তোরণ পথ দিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রশস্ত পথ বাহিয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দুইদিকে নবদূর্ব্বাদলাস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপরে বিবিধ বর্ণের কুসুমাকীর্ণ তরুলতার অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইতে লাগিল; কত বিভিন্ন প্রকারের দেশী বিলাতী বৃক্ষ লতাই যে দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিব না, অনেকগুলির নামই জানি না। বহু প্রকারের তরুলতা যাহা দেখিলাম, তাহা পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। বৃক্ষের শাখায় শাখায় লতাগুলির অঙ্গে অঙ্গে পুঞ্জ পুঞ্জ ফুল ফুটিয়া দিক্ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। দুর্ব্বাদলখচিত ভূখণ্ডের উপরে বিচিত্র বর্ণের বিলাতী ফুলের গালিচা (carpet bedding) যেন পাতা হইয়াছে খনিত দীর্ঘিকার উচ্চ তটভূমি হইতে জলের সীমারেখা পর্য্যন্ত নবীন শস্পের শ্যাম শোভা আমাদের নয়ন মনকে যে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা আজ বলিবার সাধ্য আমার নাই। দীর্ঘিকার জল যেন কাকচক্ষু!

সৌধসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহে ছাড়পত্র দাতা কর্ম্মচারীর আফিস। সেখানে গিয়া চাহিবামাত্র পাশ পাওয়া গেল এবং প্রাসাদের রক্ষক ভৃত্যবর্গের মধ্যে দুইজন আমাদের সঙ্গে চলিল, উদ্দেশ্য কক্ষে কক্ষে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে এবং কক্ষস্থিত আসবাব পত্রের জ্ঞাতব্য তথ্য সমূহ আমাদিগকে বলিয়া দিবে। রাজধানীর ভৃত্যবর্গ কোন কালেই বিনীত নম্র এবং ভদ্র স্বভাব-সম্পন্ন হয় না। কিন্তু বরোদায় দেখিলাম এই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে দেখিয়াছি যে রাজভৃত্যগণ সর্ব্বদাই গর্ব্বোন্নত বক্ষে বিচরণ করিতেছে, এবং যাহারা প্রাসাদ দেখিতে গিয়াছে তাহারা নিতান্তই নগণ্য ব্যক্তি, তাহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই নাই, এবং সৌধস্থিত দ্রব্য সম্ভারের গর্ব্বিত বর্ণনা করিয়া যেন সেই সকল কৌতূহলী দীনজনকে কতই না কৃতার্থ করিতেছে। বরোদার রাজভৃত্যগণ সেরূপ একেবারেই নহে। বিদেশী ভদ্রসন্তানগণকে যত প্রকারে আপ্যায়িত করিতে পারে তাহার চেষ্টায় তাহারা সতত ব্যস্ত। আমাদিগকে সসম্মানে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল এবং জিজ্ঞাসা না করিলে প্রাসাদের বহুমূল্য আসবাব সম্বন্ধে বাহুল্য বর্ণনা দূরের কথা, কোনরূপ বর্ণনাই তাহারা করিতে অনিচ্ছুক দেখিলাম।

প্রাসাদের দ্বিতলে ত্রিতলে উঠিবার সিঁড়ি অনেকগুলি। কোনটি মর্ম্মর নির্ম্মিত কোনটি বা কাষ্ঠের। উহাদের নির্ম্মাণ কৌশল চমৎকার। কাষ্ঠ বা প্রস্তর যে পালিশ করিয়া একেবারে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ করা যাইতে পারে সে ধারণা আমার তৎপূর্ব্বে ছিল না। সোপানাবলীর মধ্যভাগ চিত্রিত গালিচায় মণ্ডিত, তাহাদের উভয় পার্শ্বে কতকখানি স্থান খোলা রহিয়াছে, আরোহণ ও অবরোহণ কালে দেখিলাম যে, সেই খোলা স্থানে আমাদের ছায়া দর্পণে পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখা যাইতেছে।

ভৃত্যদ্বয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আমরা বৃহৎ প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কক্ষে যখন যাই, সেই কক্ষস্থিত আসবাব পত্র দেখিয়া সে স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে আর ইচ্ছা করে না। বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ভিত্তিগাত্রে, প্রস্তর বা গালিচা মণ্ডিত কক্ষতলের বর্ণ বৈচিত্র্য প্রতি কক্ষের বিভিন্ন প্রকারের আসবাব পত্র সকলই মনোহর। আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন হঠাৎ কোন এক মায়াপুরীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, গৃহ এবং গৃহসজ্জা সমস্তই যেন ইন্দ্রজাল বলে নির্ম্মিত, আমাদের চক্ষু এবং মন ও যেন সেই মায়া প্রভাবেই

মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন দেশ হইতে সমাহৃত নানা প্রকারের বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার দিয়া সমস্ত রাজপুরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ধরণীর চারি মহাদেশে, যেখানে যে বাঞ্ছনীয় পদার্থ আছে, বরোদার মহারাজ সে সমস্তই আহরণ করিয়া আনিয়াছেন এবং প্রাচী প্রতীচী দেশভেদের বিভিন্ন পদার্থসমূহ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে সজ্জিত করিয়া রাখাইয়াছেন। কতকগুলি কক্ষ দেখিলাম কেবল ভারতজাত দ্রব্য-সম্ভারে সজ্জিত। সেই দিন বুঝিলাম আমাদের ভারতের শিল্পজাত কত প্রকারের রহিয়াছে এবং সেগুলি অন্য দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কত সুন্দর। সেই সকল কক্ষের ভিত্তিগাত্রে ভারতীয় শিল্পীর তুলিকায় অঙ্কিত চিত্রপট দেখিলাম। তন্মধ্যে ভারতের শিল্পীশ্রেষ্ঠ রাজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত ছবিগুলিই সর্ব্বপ্রধান; সুবৃহৎ পটের উপরে "অর্জ্জুন সুভদ্রা," "বিশ্বামিত্র মেনকা," "গঙ্গার অবতরণ," "কীচক সৈরিন্ধ্রী", "শকুন্তলার পত্র" প্রভৃতি প্রায় বিংশতিখানি চিত্র দেখিয়াই যথার্থই চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

চীন, জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স কোন দেশই বাদ যায় নাই। সকল দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ সুন্দর ও মূল্যবান পদার্থ সমূহ সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সযত্নে রক্ষিত আছে দেখিলাম। প্রাসাদের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকের উদ্যান শোভা দেখিয়া মনে হইল নন্দন কানন বুঝি ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর হইবে না; উদ্যানস্থ তৃণমূল হইতে বিশাল ন্যগ্রোধের শীর্ষ পর্য্যন্ত সমস্তই এমন যত্নে রক্ষিত এবং এরূপ পরিচ্ছন্ন যে, মনে হয় তাদৃশ উদ্যান তেমন করিয়া রক্ষা করিতে কত শত শত লোকই না জানি নিয়ত শ্রম করিতেছে এবং কত অর্থই না ব্যয়িত হইতেছে! সমস্ত উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেও কেহ একটি তৃণও অযত্নে রক্ষিত দেখিতে পাইবে না, একটি শুষ্ক পত্রও বৃক্ষে বা বৃক্ষতলে খুঁজিয়া কেহ পাইবে না, উদ্যান মধ্যস্থ সরোবরে একটিমাত্র শৈবালদলও কাহারও চক্ষুগোচর হইবে না। বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে, "বামুন গেল ঘর, তো, লাঙ্গল তুলে ধর" অর্থাৎ গৃহস্বামী না থাকিলে ভৃত্যের দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন বরোদায় গিয়াছিলাম, তখন মহারাজ বিলাতে ছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতির সময়েও কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ এরূপভাবে স্বামীর সামগ্রী রক্ষা করিতেছে দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। অনেক স্থানেই এরূপ দেখা যায় না। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন না কোন বিষয়ে ত্রুটি লক্ষিত হইবেই, বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গলা দেশে ইহাই আমাদের চিরন্তন ধারণা এবং সে ধারণা নিতান্ত অকারণ বা অমূলক নহে। ইচ্ছা ছিল না যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সেই অপূর্ব্ব শোভা-ময় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাই, কিন্তু তখন সেই রাজাধিরাজের সৌধ হইতে না গেলে সেদিনে আর সাধারণের সেব্য উদ্যান ও তন্মধ্যস্থ পশুশালা দেখিবার সময় থাকিবে না ইহা পূর্ব্বেই আমাদের গাড়োয়ান বলিয়া দিয়াছিল, তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় সেই ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত ধামসদৃশ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলাম এবং নানাবিধ জীবজন্তুর বাসভবন সাধারণ উদ্যান ভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

উপসংহার

মল্লিক সাহেব সেই রাত্রেই ভৃত্যমুখে থানায় খুনের সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আসিয়া যখন সাক্ষিগণের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় দুইজন পাহাড়ী মংলুর আহত দেহ খাটিয়াই বহন করিয়া মল্লিক সাহেবের বাঙ্গালায় লইয়া আসে। সকলেই দেখিল মংলু মরে নাই—আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে—প্রশ্ন করিলে ২৷১টি কথার উত্তরও দিতেছে। ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া, কিশোরীকে গেরেপ্তার করিবার জন্য স্যানিটেরিয়মে গিয়া দেখিলেন, আসামী "ফেরার"। ট্রেণের সময় প্ল্যাটফর্ম্মে খোঁজ হইল; যদি হাঁটা পথে সিলিগুড়ি অভিমুখে গিয়া থাকে, এই ভাবিয়া কার্টরোডে অশ্বারোহী কনেষ্টবল পাঠানো হইল; কার্সিয়ং, সিলিগুড়িতে তার করা হইল, কিন্তু কোথাও আসামীর খোঁজ মিলিল না। অবশেষে কলিকাতার পুলিস কমিশনরকে তার করিয়া দিয়া, দার্জ্জিলিঙ পুলিস বিষয়ান্তরে মন দিলেন। এদিকে হাঁসপাতালে মংলুও ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

সে রাত্রে, সত্যবালা ছাড়া, ঘোষ ভিলায় অপর কেহ এ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রাতে গোলমালটা হইলে, সত্যবালা তার মাকে সমস্তই খুলিয়া বলিল। শুনিয়া ঘোষ গৃহিণী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন মাতার সম্মতিক্রমে, বেলা দশটার সময় সত্যবালা সঙ্গে দ্বারবান লইয়া সানিটেরিয়মে গিয়া [illegible] দিয়া তা [illegible] বিছানা [illegible] কুকুরকে বাড়ী [illegible]

[illegible] সপ্তাহ পরে, ঘোষ গৃহিণী কন্যাদ্বয়কে লইয়া দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিলেন। মল্লিক সাহেবের তখনও ছুটী রহিয়াছে, তিনিও কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঘোষগৃহিণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কলকাতায় যেতে চাচ্ছ, চল; কিন্তু এখন কিছুদিন সতীর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল, বাবা। যে সব ঘটনা ঘটে গেল, তাতে ওর মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় তুমি ওকে পীড়াপীড়ি করলে হিতে বিপরীত হতে পারে; হয়ত ওর মন তোমার প্রতি চিরদিনের জন্যে বেঁকেও বসবে। তার চেয়ে ওকে এখন ধীরে সুস্থে সামলে উঠতে দেওয়াই ভাল। কিছুদিন বাদে, ওসব ওর মন থেকে মুছে টুছে গেলে, তুমি আবার চেষ্টা করলে তখন হয়ত ভাল ফল হতেও পারে।"

আসলে মল্লিককে জামাতা করিবার স্পৃহা ঘোষ গৃহিণীর আর ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সত্যবালা ও মল্লিকের চরিত্রগত পার্থক্য এত বেশী যে, বিবাহ হইলে উহারা পরস্পরকে লইয়া সুখী হইবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। উহাদের রুচি বিভিন্ন আদর্শ বিভিন্ন—বিভিন্ন কেন, বিপরীতও বলা যাইতে পারে। কিশোরীর সঙ্গে সকল বিষয়ে সতীর যেমন মিশটি খাইয়াছিল, মল্লিক যদি মাঝে পড়িয়া এই গণ্ডগোলটা না বাধাইত, তবে হয়ত সময়ে তিনি স্বামীকে সম্মত করিয়া, উভয়ের মিলন ঘটাইতে পারিতেন। সেই কারণে মল্লিকের প্রতি তাঁহার মন বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। তবে তিনি বুদ্ধিমতী রমণী, স্পষ্ট কথা কিছু না বলিয়া, স্তোকবাক্যে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "আচ্ছা বেহায়া পুরুষ মানুষ কিন্তু! দেখছিস যে ও আর-একজন-গত প্রাণ, তার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত—তোর ছায়া পর্য্যন্ত সে মাড়াতে চায় না—তবু তার প্রাণের কাল হয়ে তার পিছনে লেগে থাকবি?"

মল্লিক সাহেব, দার্জ্জিলিঙেই রহিয়া গেলেন।

কিশোরী, সত্যবলাকে বলিয়া গিয়াছিল, বৎসর খানেক পরে, এ সব গোলমাল চুকিয়া গেলে সে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। কলিকাতায় গিয়া সতী আশা করিতে লাগিল, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই সে কিশোরীর পত্র পাইবে। পিতার নিকট সে শুনিয়াছিল, কিশোরীর অপরাধ, বড় জোর "গুরুতর জখম উৎপন্ন করা"—এই ধারা আপোষে মিটমাট হইবার বিধান আইনে আছে, কিশোরী ফিরিয়া আসিলে, মংলুকে কিছু টাকা দিলেই সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে।—সতী মনে মনে ভাবিত, কোথায় তিনি তাও জানি না; কেমন করিয়াই বা এ সংবাদ তাঁহাকে দিব? যদি কোনও চিঠি আসে, কোথায় তিনি যদি জানিতে পারি, তবে সংবাদ দিতে পারি।—চিঠির আশায় আশায় সতী এক বৎসর যাপন করিল, চিঠিও আসিল না, কিশোরীও ফিরিল না।

দ্বিতীয় বৎসর, সতী আশা করিতে লাগিল, এ বৎসর হয় তিনি ফিরিয়া আসিবেন, নয় নিশ্চয়ই তাঁহার একটা সংবাদ পাইব। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল—তাহার আশা অপূর্ণ রহিল।

তখন সতী স্থির করিল, কিশোরী আর বাঁচিয়া নাই—পাহাড়ে জঙ্গলে, বিঘোরে সে প্রাণ হারাইয়াছে।

দিবসে সে তাহার পড়াশুনা ও গৃহ-কর্ম্ম করিয়া কাটাইয়া দেয়—প্রায়ই রাত্রে, বিছানায় শুইয়া খানিকক্ষণ কাঁদে, তারপর ঘুমাইয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে মাঝে সতীর রূপে গুণে, অথবা তাহার পিতার সহায়তার লোভে আকৃষ্ট হইয়া, মক্কেলহীন অবিবাহিত ব্যারিষ্টারগণ আসিয়া সতীর সঙ্গে "ভাব" করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোনও সুবিধা করিতে না পারিয়া, অন্য শিকারের উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে।

তৃতীয় বৎসর, সতী তার মা-বাপকে বলিল, এমন করিয়া তাহার দিন আর কাটে না—সে একটি মেয়ে স্কুল খুলিয়া, কাযে ব্যাপৃত থাকিতে ইচ্ছা করে; কিছু টাকা চাই।

পিতামাতা, তাঁহাদের বিষাদময়ী কন্যার এই প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

বালিগঞ্জেই, একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া, নিজ সখীদের মধ্যে কয়েকজনকে সহকারিণী করিয়া, সতী তাহার স্কুল খুলিয়া বসিল। দুই বৎসর স্কুল চালাইবার পর, ছাত্রী অনেক বাড়িল, স্কুলের বেশ সুনাম রটিল। কিন্তু এই বৎসর তাহার পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন। উইলে দেখা গেল, সতীকে তিনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

প্রথমটা পিতৃশোকে সতী বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মাস খানেক ত সে তাহার স্কুলে পর্য্যন্ত যায় নাই। ক্রমে একটু সামলাইয়া উঠিয়া, পিতৃদত্ত টাকা হইতে স্কুলের জন্য একটি বড় বাড়ী ভাড়া করিল, ছাত্রীদের আনিবার ও বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য দুইখানি লম্বা গাড়ী (Bus) কিনিল, ইহাতে ছাত্রী সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—শিক্ষয়িত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, সতী ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিল, এবং আশু বাবুকে ধরিয়া, স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাধীন করিয়া লইল।

হিন্দু ঘরের বড় বড় মেয়ে যাহাতে অসঙ্কোচে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই স্কুলের নাম হইল "হিন্দুকন্যা পর্দ্দা পাঠশালা।" দ্বারবান ও সহিস কোচম্যানগণ ছাড়া, আর কোনও পুরুষের তথায় প্রবেশাধিকার রহিল না।

পর বৎসর, সতীর জননীও স্বর্গারোহণ করিলেন। সতী আরও অনেক টাকা হাতে পাইয়া, স্কুলের সংলগ্ন বাড়ীটিও ভাড়া লইয়া, মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং স্থাপনা করিল, এবং নিজেও তথায় বাস করিতে লাগিল। তাহার বোন বীণার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল—সে তাহার স্বামিগৃহে গৃহিণী হইয়াছিল।

এইরূপে একটি একটি করিয়া—সুদীর্ঘ কুড়িটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

সতী এখন আর যুবতী নাই—তাহার মাথার কালো চুলের মাঝে মাঝে ২।১ গাছি করিয়া পাকা চুলও দেখা দিয়াছে। সে এখন আর ক্লাসে পড়ায় না; তবে

সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করে। তাহার শৃঙ্খলা ও শাসনের গুণে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং বেশ ভালই চলিতেছে।

একদিন সতী স্কুলের আপিস ঘরে বসিয়া আছে, স্কুল তখন বসিয়া গিয়াছে—শিক্ষয়িত্রীগণ স্ব স্ব ক্লাসে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ফটকের বাহিরে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে সতী দেখিল, একটি মহিলা, অনুমান তাহারই বয়স, একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারবানকে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বারবান অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আপিস কক্ষ দেখাইয়া দিল। মহিলাটি, মেয়েটির হাত ধরিয়া আপিসের দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গে তিব্বতীয় রমণীর পরিচ্ছদ—কিন্তু পায়ে ইংরাজি ধরণের জুতা মোজা আছে। মেয়েটির গায়ে ইংরাজি পোষাক।

সতী ভাবিতে লাগিল, ইনি ইংরাজি জানেন কি না—না জানিলে, ইঁহার সহিত কোন্ ভাষায় আলাপ করা সম্ভব হইবে?

মহিলাটি প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিলেন, "নমস্কার। আপনিই কি এই বিদ্যালয়ের—"

ইঁহার মুখে বাঙ্গলা শুনিয়া সতী একটু আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর দিল—"হাঁ, আমিই এই বিদ্যালয়ের লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। বসুন।"—বলিয়া সতী চেয়ার দেখাইয়া দিল।

মহিলাটি বসিলেন। মেয়েটিও অপর একখানি চেয়ারে বসিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি প্রয়োজন?"

মহিলা উত্তর করিলেন, "আমার নাম নিনা নাঙ্গা-লামা। আমার এই মেয়েটিকে আপনার স্কুলে ভর্ত্তি করে দিতে চাই। কিন্তু আমরা বৌদ্ধ—আপনার এ হিন্দুকন্যা পাঠশালা। আমার মেয়েকে নিতে আপনাদের কোনও আপত্তি আছে কি?"

সতী বলিল, "কিছুমাত্র না। বৌদ্ধধর্ম্ম ত হিন্দু-ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বুদ্ধদেব আমাদের একজন অবতার।"

"হাঁ। তা জানি। বেশ, তাহলে কাল এই সময় এসে মেয়েকে আমি ভর্ত্তি করে দিয়ে যেতে পারি?"

"অবশ্য। বাড়ীতে আপনার মেয়ে কিছু পড়েছে?"

নিনা বলিল, "বল খুকী, তুমি কি পড়েছ, গুরুমাকে বল।"

খুকী বলিল, "আমি এখন দ্বিতীয় ভাগ পড়ি।"

নিনা বলিল, "আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্চেন, এত বড় মেয়ে এখনও দ্বিতীয় ভাগ পড়ে! আসল কথা, আমরা আজ ৩।৪ মাস মাত্র কলকাতায় এসেছি। যেখানে এতদিন আমরা থাকতাম, সেখানে বই কেতাব কিছুই পাওয়া যায় না। এই কলকাতায় এসে, পণ্ডিত রেখে খুকীকে বাঙ্গলা পড়াতে সুরু করেছি।"

সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথায় থাকতেন?"

"আমরা ছিলাম কাংপাচেনে—প্রায় তিব্বতের কাছাকাছি। আমার পিতা পূর্ব্বে সেই কাংপাচেন মঠের লামা বা পুরোহিত ছিলেন।"

সতী বলিল, "আপনি ছেলেবেলায় বাঙ্গালা দেশে ছিলেন বুঝি?"

"না। পাঁচ মাস আগে পর্য্যন্ত, আমি নিজের দেশের বাইরে কখনও পাও দিইনি।"

"তবে, এমন সুন্দর বাঙ্গলা আপনি শিখলেন কোথায়?"

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "সে কথা, আর একদিন আপনাকে আমি জানাবো। এখন ত আমি কলকাতেই রহিলাম; আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল, আশা করি মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হবে। আমার জীবনের ইতিহাস একটু আশ্চর্য্য রকমের—সব কথাই একদিন আপনাকে বল্‌বো।"

"আপনি এখানে আছেন কোথা?"

"ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমরা আছি।"

"সেখানে আর কে কে আছেন?"

"আমি আর আমার ছেলে মেয়েরা। আমার দুটি

ছেলে—একটির বয়স ১৮, আর একটি ১৫। আর এই মেয়েটি—এ সাত বছরে পড়েছে।"

"আপনার স্বামী? তিনি বুঝি দেশেই আছেন?"

নিনা মাথাটি নীচু করিয়া বলি, "আমি বিধবা। আজ একবৎসর হ'ল আমি বিধবা হয়েছি।"

সতী বলিল, "মাফ করবেন—না জেনে জিজ্ঞাসা করে' আমি আপনার মনে কষ্ট দিলাম।"

নিনা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কষ্ট আর আপনি নূতন কি দিলেন? কষ্ট ত জীবন-ভরাই রয়েছে। আচ্ছা, আজ আর আমি আপনার সময় নষ্ট করবো না—কাল আবার আস্‌বো, খুকীকে ভর্ত্তি করে দিয়ে যাব।"

সতী, নিনার সঙ্গে ফটক অবধি আসিল। নিনা নমস্কার করিয়া, ফটকের বাহির হইয়া, গাড়ীতে উঠিল। সতী লক্ষ্য করিল, গাড়ীখানি নিজস্ব—ট্যাক্সি নহে।

আপিস কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সতী এই আশ্চর্য্য মহিলাটির কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একটা সুদূর সম্ভাবনাও তাহার মস্তিষ্কে এই সময় প্রবেশ করিল।

পরদিন সতী অধীর ভাবে এই মহিলার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে আসিয়া, নিনা মেয়েকে যথারীতি ভর্ত্তি করিয়া দিল। সতী বলিল, "সাড়ে তিনটের সময় ছুটি হবে। আপনি কি মেয়েকে নিয়ে যেতে নিজের গাড়ী পাঠাবেন, না, আমাদের স্কুলের গাড়ীতে ও যাবে?"

নিনা বলিল, "না, আমি নিজেই এসে মেয়েকে নিয়ে যাব। আর একটা কথা—বলতে সাহস হচ্চে না। আপনিও যদি সেই সময় দয়া করে আমার বাড়ী যান, তবে দুজনে একত্র চা খাওয়া যায়—একটু কথা-বার্ত্তাও হয়।"

"তা বেশ—আমি যাব।"

তিনটার পর আবার আসিয়া নিনা, কন্যাকে ও সতীকে নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া গেল। কন্যাকে খাওয়াইয়া, আয়ার জিম্মায় বাগানে তাহাকে খেলা করিতে পাঠাইয়া, সতীকে নিজ শয়নকক্ষে বসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

নিনা বলিল, "আপনি আমায় কাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি আজীবন তিব্বৎ বাসিনী হয়েও এমন বাঙ্গলা শিখলাম কোথা থেকে? আচ্ছা, আপনার মনে কি এ প্রশ্নের কোনও উত্তর আপনা-আপনি উদয় হয়েছে?"

সতী বলিল, "হ্যাঁ, তা হয়েছে।"

"তা হলে আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।"—বলিয়া নিনা নতমুখে বসিয়া রহিল।

সতী বলিল, "সব কথা আমায় খুলে বলুন। অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আমি বড় যাতনা পাচ্চি।"

নিনা বলিল, "আমার স্বামী ছিলেন তিনিই—যিনি আপনাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন—বিবাহের ধার্য্য দিনে ভোর বেলা যাঁকে অবস্থার গতিকে দার্জ্জিলিঙ থেকে পালাতে হয়।"

এই কথা শুনিয়া, সতীর মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। চেয়ারের বাজুতে হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে নীরব হইয়া রহিল। নিনাও নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া তাহার বক্ষে পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া সতী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর কি হয়েছিল?"

"জ্বরবিকারে মারা গেলেন। যাবার দিনও তোমার কথা আমায় বলেছিলেন। তাঁরই শেষ আদেশ অনুসারে, আমি ছেলে দুটিকে মেয়েটিকে নিয়ে কলকাতায় এসেছি, তোমার বিষয় সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে, তারপর কাল তোমার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছিলেন, যদি এসে আমি খবর পাই যে তুমি বিবাহ করে' সংসার-ধর্ম্ম পালন করছ, তাহলে যেন কোনও কথা তোমার কাছে না ভাঙ্গি—এমন কি, তোমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে মানা করেছিলেন। আর যদি দেখি

তুমি বিবাহ কর নি, তাহলে সব কথাই তোমায় যেন বলি—তোমায় সঙ্গে সখীত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হই।"

সতী কোনও কথা বলিতে পারিল না—গালে হাত দিয়া বসিয়া, খোলা জানালা পথে বাহিরের নারিকেল গাছের পানে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিনা বলিল, "আমার প্রতি তোমার মনের ভাব এখন কি রকম হচ্চে, বা এরপরে কি দাঁড়াবে তা জানি না। কিন্তু আমার প্রতি কোনও বিদ্বেষের ভাব মনে তুমি পোষণ কোর না ভাই। সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলবার সময় এ নয়—যদি শুনতে চাও—ক্রমে ক্রমে সে সবই তোমায় আমি বলবো। সব কথা শুনলে, তিনি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দোষে নিতান্ত দোষী বলে' তোমার মনে হবে না। এখন আর মন খারাপ করে কি হবে—চল, দুজনে একটু চা খাইগে—আমার ছেলেদের স্কুল থেকে আসবারও সময় হল—তাদেরও দেখবে চল। আমার ত আশা, তোমাতে আমাতে দুটি বোনের মত থেকে, তাঁর ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করবো। তবে তোমার যদি তা পছন্দ না হয়, ভবিষ্যতে আর আমি তোমায় বিরক্ত করবো না।"

সতী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল, নিনা।"

নিনা তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "চল—তোমায় আমি কি বলে ডাকবো, আমায় বলে দাও।"

"তুমি আমার দিদি বলে ডেকো। এখন থেকে দুই বোনের মতই আমরা থাকবো।"—বলিয়া সতী, নিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিল।

সমাপ্ত

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রোগী ও ব্যাধি

রোগী কহে, ব্যাধিগুলা মরণের আগে
প্রহরীর মত কেন কাছে মোর জাগে?
শান্তিতে মরিতে চাহি—যা'ক দূরে সরে'!
ব্যাধি কহে, যাবে তুমি দেবতার ঘরে
শুচি হয়ে যেতে হবে, আমার যন্ত্রণা
ভেঙ্গে দেয় ইন্দ্রিয়ের কলুষ কামনা।
স্নাত পূত ভক্ত সম দেবতার ঘরে,—
নিয়ে যাব তোমা সঁপি শমনের করে।

শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

প্রমোদ

১ম লহরী—২য় সংস্করণ। রায় শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর প্রণীত। কলিকাতা কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০

এখানি হাসির গ্রন্থ। বিলাতের Titbits পত্রিকায় অথবা এদেশে Statesmanএ Varietiesএর মধ্যে যেরূপ চুটকি হাসির গল্প থাকে, এ গ্রন্থে সেই জাতীয় ৩১৯টি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকাংশই ইংরাজি হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হইল, তবে গ্রন্থকার সে গুলিকে দেশীয় পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন। ইহার অনেকগুলিই বেশ উপভোগ্য।

মহাত্মাজীর বাণী

বা চরখা। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, বিচিত্র প্রেসে মুদ্রিত ও কালীঘাট হইতে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ৬৩ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট মূল্য ৵০

এই পুস্তিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে চরখার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহাত্মা গান্ধীর রচনা হইতে অনুবাদ করা। পুস্তকখানি সময়োপযোগী, সন্দেহ নাই।

সপ্ত চিরজীবী

খণ্ড কবিতা। শ্রীভূদেব শোভাকর বি-এ, বি-ই প্রণীত। কলিকাতা কালিকা প্রেসে মুদ্রিত। কোথায় প্রকাশিত লেখা নাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১১ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ৵০

অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম—পুরাণোক্ত এই সপ্ত চিরজীবীকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি লিখিত। সদর পৃষ্ঠায় ছাপা আছে —"সপ্ত চিরজীবগণ প্রবুদ্ধ হও···আমাদের অধর্ম্ম, মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, মোহান্ধতা ও কলিকলুষিত বুদ্ধি দূর কর।" এই উপলক্ষে কবি বিভীষণকে যাহা বলিয়াছেন তাহা উপভোগ্য, পরশুরামকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও মর্ম্মস্পর্শ করে।

চিত্রলেখা

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম এ প্রণীত। কলিকাতা আইডিয়াল প্রেসে মুদ্রিত ও বরেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৪০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১ ০

এ পুস্তকখানিতে ১৬টি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে —ঠিক গল্পও বলা যায় না, অথচ গল্পেরই মত— ইংরাজিতে যাহাকে Sketch বলে, তাহার বাঙ্গলা যদি নক্সা হয়, তবে এগুলি তাই। গল্প না হইলেও গল্পের রস এগুলিতে আছে, এবং সকলগুলি 'নক্সা'ই সুপাঠ্য হইয়াছে। লেখকের ভাষাটি প্রাঞ্জল, বর্ণনা ভঙ্গিও মনোহর। রস সৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁহার বেশ আছে দেখা গেল।

নূর নগরের চৌধুরী বংশ

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল সঙ্কলিত। ঢাকা মনোমোহন প্রেসে মুদ্রিত এবং উয়ারি হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজি ৫৮ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ৷৷০

নামেই গ্রন্থের পরিচয়। গ্রন্থকার, নিজ বংশের একটি বৃত্তান্ত ইহাতে সঙ্কলন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নির্ম্মাল্য—১ম ভাগ

কবিতা-গ্রন্থ। শ্রীবিভূতিভূষণ দাস প্রণীত। কলিকাতা তারা প্রেসে মুদ্রিত ও চিড়িমারসাই (মদিনীপুর) হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি ১৮ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট মূল্য ৷৷০

পরমহংসদেব ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যে সকল গল্প ও উপমাদির প্রয়োগ করিতেন, তাহারই কয়েকটি অবলম্বনে গ্রন্থকার এই কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন কবিতাগুলির ভাষা সরল, বলিবার ভঙ্গিও মনোজ্ঞ।

পাবনা জেলার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড

শ্রীরাধারমণ সা বি-এল প্রণীত। ১ম খণ্ড পাবনা নববিভাকর প্রেস মুদ্রিত ও ২য় খণ্ড তত্রত্য হিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত। উভয় খণ্ড সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজি, প্রত্যেক খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা করিয়া, কাগজের মলাট, মূল্য প্রতি খণ্ড ১।০

১ম খণ্ড ১ম অধ্যায়ে সাধারণ বিবরণ (জেলার অবস্থান, প্রাচীনত্ব ও পাবনা নামের উৎপত্তি) দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাকৃতিক বিবরণ, যাতায়াতের উপায় কলিকাতা হইতে জেলার নানা ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া, ও পোষ্ট আপিস টেলিগ্রাফ আফিসের তালিকা এবং ৪র্থ অধ্যায়ে থানা, গ্রাম, আদালত ও আফিসাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কানিংহাম সাহেবের মতে, পোদ জাতির রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি। চুইশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত "ঢাকুর" নামক কুলজী গ্রন্থে, অন্যান্য স্থানের সহিত "পাবনা"রও উল্লেখ আছে ইহা গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পাবনা জেলার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থ, সমসাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি, পুরাতন দলিল পত্র ঘাঁটিয়া এবং "অনেক বিষয় লোকমুখে শুনিয়াও"—গ্রন্থকার এই খণ্ডটি রচনা করিয়াছেন। এই কার্য্যে যে তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। গ্রন্থকারের স্বদেশ ভক্তিই যে তাঁহাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।—বাঙ্গালা দেশে উপন্যাস ছাড়া অন্য বিষয়ের পুস্তক যে বড় বিকায় না, তাহা সকলেই জানেন, গ্রন্থকারও নিশ্চয় জানেন। বাঙ্গলার আরও কয়েকটি জেলার এই জাতীয় ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে—এগুলি, ভবিষ্যতে বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস রচনাকারিগণের কাযে লাগিবে। লেখক মহাশয়, আর তিন খণ্ডে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিবেন এবং সে খণ্ডগুলির বিষয়সূচীও ২য় খণ্ডের মলাটে প্রকাশ করিয়াছেন।

বেনো জল

উপন্যাস। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে মুদ্রিত ও ৯ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, ভোলানাথ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২২৯ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ২৲

হেমেন্দ্রকুমার বাবু এখন বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত, গদ্যে পদ্যে তাঁহার সমান হাত খেলে। ইতঃপূর্ব্বে আরও কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়া তিনি একজন শক্তিশালী লেখক বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন। বর্ত্তমান উপন্যাস খানি "প্রবাসী" মাসিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন অনেকেই ইহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এখন পুস্তকাকারে এখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। ইহা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের একটি প্রণয় কাহিনী—যদিও নায়ক, রতন বাবু, মোটেই ইঙ্গ নহেন, ভয়ানক বঙ্গ। আখ্যান ভাগের অনেক খানি পুরীর সমুদ্রতীরে ঘটিয়াছিল; প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলি উপভোগ্য হইয়াছে। লেখক এই গ্রন্থে প্রাসঙ্গক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ব্যায়ামচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

কলিকাতা।
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কামারলজমান ও বেদৌরা। বিবাহের শোভাযাত্রা

(চিত্রকর—এডমণ্ড ডিউলাক)

Bengal Art Press, 41, Shikdar Bagan Street.

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩১

২য় খণ্ড
৫ম সংখ্যা

অগ্নি

অগ্নিপূজা প্রায় সকল জাতির মধ্যে একটী সাধারণ ব্যাপার। ভারতবর্ষ হইতে পেরু পর্য্যন্ত সকল স্থানের সকল মানব-জাতি বেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। সকল জাতির মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত, যাহাতে অগ্নি নিবিয়া না যায় সেইজন্য তাঁহারা অনবরত অগ্নিতে কাষ্ঠ যোগাইয়া আসিয়াছেন। সাগ্নিকদিগের রক্ষিত অগ্নিমধ্যে কোন অপবিত্র বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই। সকল জাতিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে—অগ্নি সর্ব্বোচ্চ শক্তির বরেণ্য আদর্শ। জ্যোতিরূপে অগ্নি সত্যের আদর্শ। বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই অগ্নি হইতে উৎপন্ন; অণুপরমাণু সকল অগ্নিরই লীলাসম্ভূত। অগ্নি বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

আসিরিয়া, কালডিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশবাসীরা প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল। পারস্যবাসীদের অগ্নির উপাসনা সুবিখ্যাত, ইহাদের বংশীয় বোম্বাইয়ের পার্সীরা আজও অগ্নির পূজা করিয়া থাকে।

এসিয়ায় অগ্নির পূজা বড় কম ছিল না। জাপানের য়েসো-প্রদেশবাসীদের অগ্নিই প্রধান দেবতা। এসিয়ার কঞ্চড়লেরা অন্যান্য দেবপূজার সহিত অগ্নির পূজা করে। তুঙ্গুজ মোগল ও তুর্কীরা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে।

ইউরোপেও গ্রীকদিগের মধ্যে ভল্‌কান (Vulcan), হেফাইস্‌টাস (Hephaistos), হেস্‌টিয়া (Hestia) অগ্নি-দেবতা। প্রাচীন প্রুসীয় জাতি, রুষ ও লিথুয়ানিয়ান জাতি অগ্নির পূজা করিত। এখনও ইউরোপে অগ্নিপূজার ছিটে ফোঁটা আছে।

ভারতবাসী ও ইরাণীদের ধর্ম্মে অগ্নি-উপাসনা একটী প্রধান ব্যাপার। অগ্নিদেব ভারতবাসীদের যেমন ছিল, ইরাণীদেরও তেমনই ছিল। কিন্তু উভয় জাতির অগ্নিদেবের নাম এক নয়। ইরাণীদের অগ্নিদেবের নাম 'অতর', ভারতবাসীদের এই দেবতার নাম 'অগ্নি'। স্লাভদিগের মধ্যেও অগ্নিদেবের উপাসনা

প্রচলিত ছিল। তাহাদের অগ্নির নামের সঙ্গে ভারতবাসীদের অগ্নিদেবের নামের পার্থক্য প্রায় নাই। আমাদের এই দেবতার নাম অগ্নি, স্লাভদিগের অগ্নিদেবের নাম Ogiin, প্রাচীন স্লাভ রূপ Ogni। স্লাভ, ভারতবাসী এবং ইরাণী ইহারা সকলেই আর্য্য। একসময়ে ইহারা সকলেই অগ্নিদেবের উপাসক ছিল এবং ইহাদের সকলের অগ্নিদেবের নামও ছিল 'অগ্নি' —সংস্কৃতে যেমন অগ্নি, লাতিন ভাষায় ইহার রূপ ignis, লিথুয়ানিয়ানে ugnis। অগ্নি, ignis, ugnis, ogni যে এক সাধারণ শব্দ হইতে জাত তাহা বেশ বোঝা যায়। আর্য্যদের পরস্পর ছাড়াছাড়ির পূর্ব্বে সকলেরই অগ্নি-বাধক এক সাধারণ শব্দ ছিল। কিন্তু অগ্নিদেবের উপাসনা কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা এইভাবে স্থির করা বড়ই কঠিন। আমরা দেখিতে পাই, স্লাভদিগের অগ্নিদেববোধক একটী শব্দ আছে, এবং বেদের অগ্নির সঙ্গে সেই শব্দটীর আবার বেশ সাদৃশ্য আছে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যেমন অগ্নি-উপাসক ছিলেন, স্লাভেরাও তেমনই অগ্নি-উপাসক ছিলেন। ইরাণীদের অগ্নিদেবের নাম এতটা পরিবর্ত্তিত হইল কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে বুঝিতে না পারিলেও উহাদের মধ্যেও যে অগ্নি উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহা তাহাদের অগ্নিদেবের নামের অস্তিত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভারতীয় আর্য্য ও ইরাণীদের মধ্যে প্রধান একটী দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবতার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈদিক "অপাম্ নপাতে" বেশ একটু পরিচয় পাওয়া যায়। স্পীগেল (Spiegel) বলেন, 'অপাম্ নপাৎ' অতি প্রাচীন ও বিশেষভাবে সম্পূজিত দেবতা (১) 'অপাম্ নপাৎ' শব্দটী অতি প্রাচীন। ইহার অর্থ 'জলজাত'। (২) জলদ হইতে যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, অপাম্ নপাৎ বলিতে সেই বিদ্যুতের দেবতা বোঝায়। ইনি দেব ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী। অবেস্তায় এই দেবতাকে একবার মাত্র অপর একজন আগুন দেবতার সঙ্গে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম নইরো সঙ্ঘ (Nairosangha)—অর্থ দেবদূত। পরবর্ত্তী গ্রন্থে নইরোসঙ্ঘের আরাধনা খুব বেশী পাওয়া যায়। 'যস্ত' নামক গ্রন্থে (৩) ইহাকে মানবের নির্ম্মাতা ও রূপদেবতা বলা হইয়াছে। বেদেও একটী শব্দ আছে—'নরাশংস'। ইহাও দেবদূত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইরাণীদের 'নইরোসঙ্ঘ' ও বৈদিক 'নরাশংস' অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

ইরাণী অগ্নিদেবকে 'অতর' বলে। অগ্নিদেবের এই নামটী বহু প্রাচীন, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যেরা অগ্নি এই নামটী ভুলিয়া গিয়াছে। তবে এই নামটী হইতে অথ্রবন্ বলিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বেদে তাহা 'অথর্বন্'রূপে স্থান পাইয়াছে এবং তাহার অর্থ 'অগ্নি পুরোহিত'। ইরাণীরা কিন্তু 'অথ্রবন' শব্দ পুরোহিতই বুঝিয়া থাকেন। অথর্বন্ শব্দের 'অথরে'র সহিত 'অতরে'র সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। আমরা ভারতবাসী তাহাদের অগ্নিকে আমরা 'অতর' বলি না বটে, কিন্তু তাহাদের অগ্নির পুরোহিতকে 'অথর্বন্' বলি। 'অতর' শব্দটীর অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন, ইহার অর্থ 'ভক্ষক'; কারণ, অতর্ শব্দের মূলাংশ 'অদ্' ধাতু। এই 'অদ্' ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা। তদনুসারে 'অতর্' বলিতে 'ভক্ষক' বুঝিতে হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অগ্নিদেবের নামের সার্থকতা ইরাণীভাষায় ঠিক বজায় থাকে।

অগ্নিকে আমরা 'সর্ব্বভুক্' বলিয়া থাকি। অগ্নিকে যাহাই অর্পণ করা যায়, অগ্নি তাহাই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সুতরাং অগ্নিকে ভক্ষক বলা অন্যায় নয়। প্রাচ্য আর্য্যদের সময়ে অগ্নিদেব অতর্ নামেই অভিহিত হইতেন, এইরূপও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।

১। Die arische Periode, p. 313.

২। 'Fire that resides in water' (৩।০)

৩। ১৯. ২২

ইহাদের এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, বেদে অগ্নিপুরোহিতকে অথর্বন্ বলা হইয়াছে; আর অগ্নিপুরোহিতেরা স্বর্গ হইতে অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথাও বেদে উক্ত হইয়াছে।

ভারতবাসী ও ইরাণীদের পরস্পর নৈকট্যবশতঃ এক জাতি অপর জাতির নিকট হইতে অগ্নি উপাসনা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবাসী ও ইরাণীরা স্বাধীনভাবে স্ব স্ব পদ্ধতি অনুসারে অগ্নি-উপাসনা করিত।

ভারতবাসীদের ন্যায় ইহাদের অগ্নিযাগ ও সোমযাগ প্রচলিত ছিল। ভারতবাসীদের সোমযাগ যাহা, ইরাণীদের মধ্যে 'হওম' (Haoma) যাগ প্রায় তাহাই। ভারতবাসী সোমরসকে দেবভোগ্য অমৃত বলিত। অমৃত দেবভোগ্য উপাদেয় দিব্য পেয়। ইরাণীদেরও দেবভোগ্য দিব্য পেয় ছিল, তাহার নাম 'অমেরেতাৎ' (Ameretat)। অমৃত ও অমেরেতাতের শব্দগত সাদৃশ্য যথেষ্ট আছে। ইরাণীদের এ ছাড়া আর একটী দেবভোগ্য পবিত্র বস্তু ছিল, তাহাকে তাহারা 'হউরবতাৎ' (Hauravatat) বলিত। (৪) হউরবতাৎ খাদ্য—অমেরেতাৎ পেয়। শুধু খাদ্য ও পেয় নয়—ইহারা যমজ দেবতা; স্বর্গবাসীদের ইহারা পোষণ করে। ভারতীয় দেব—বিবস্বান্, যম, ত্রিত আপ্ত্য সোম-উপাসক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে বিবঙ্ঘৎ, যিমের পিতা, থ্রিত ও অথ্ব্য (Athvya) প্রাচীনতম হওম-উপাসক। সোমরস পান করিলে মনের যে অবস্থা হয় বেদে তাহাকে 'মদ' বলিত, অবেস্তার তাহার নাম—'মধ'। সুতরাং সোমযাগ যে অতি প্রাচীন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্ততঃ একথাও বলিতে হইবে যে, যখন ইরাণী ও ভারতবাসীরা একত্র থাকিত তখন তাহাদের মধ্যে অগ্নি উপাসনা ও সোমযাগ প্রচলিত ছিল। প্রাচ্য আর্য্য যুগেই যে অগ্নি-উপাসনা ও সোমযাগ আরম্ভ হয় তাহা বলা যাইতে পারে না। এই যুগের অনেক পূর্ব্বে যে উভয় যাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সোমযাগ ও অগ্নিযাগ

আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়া সোমযাগ করিতেন। সোমযাগ ভারতবর্ষে বিশেষ উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সোমযাগের আরম্ভ ভারতবর্ষে হয় নাই। এই যাগটী ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও আছে। একটী বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়। গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে সোমলতা উৎপন্ন হইত। আজকাল যেমন শুষ্ক করিয়া চরস সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, পূর্ব্বকালে কিঞ্চিৎ আয়াস সহকারে ঐ সকল অঞ্চল হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইত। কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্য্যগণ সোমলতা কিরূপ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; শেষে এমন কি সোমলতার পরিবর্ত্তে অন্য একপ্রকার লতা সোম নামে ব্যবহৃত হইত। সোমলতা যে পারস্য, গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের পার্ব্বত্য স্থানে জন্মিত, এখানে পাওয়া যাইত না, বেদমন্ত্রেই তাহা উল্লিখিত আছে। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান, প্রাচীনকালে পারস্যদেশে সোমযাগের প্রাদুর্ভাব হয়। সে যাহাই হউক, অতটা স্বীকার না করিলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সোমযাগ খাঁটি ভারতীয় যাগ নয়।

অতি প্রাচীনকালে সোমযাগের ন্যায় অগ্নিযাগেরও প্রাদুর্ভাব পারস্যদেশে ছিল। তবে ভারতের অগ্নিযাগে ও পারস্যের অগ্নিযাগে কিছু প্রভেদ আছে। পার্থক্য এই যে, ভারতীয় আর্য্যেরা নিবেদিত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু পারসিকেরা বলির পশুশরীরের

৪। এই দুইটী শব্দকে সর্ব্বদা একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা বর্ত্তমান ও অনাগত, সম্পূর্ণ মুক্তিদ্যোতক।

অংশবিশেষ অগ্নিকে দেখাইয়া অন্তদিকে ফেলিয়া দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, মাংস অগ্নিতে স্পর্শ করাইলে অগ্নি অপবিত্র হইবে।

অগ্নিসম্পর্কে আর্য্য ও দস্যু

নিরুক্তকারগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত বেদের প্রত্যেক ব্যাখ্যাতা আর্য্য বলিতে অগ্নিউপাসকগণকেই বুঝিয়াছেন। বেদের বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিরগ্নি বলা হইয়াছে। আর্য্যগণের বিশ্বাস ছিল—দেবগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যস্থ অগ্নি; তিনি দেব ও মানবের দূত। অগ্নি দেবগণের মুখস্বরূপ, অর্থাৎ দেবগণ অগ্নির মুখেই আহার করেন। আর্য্যগণের ন্যায় দস্যুরাও যজ্ঞ করিত, যজ্ঞে পশুবধ করিত, কিন্তু তাহারা অগ্নির সাহায্যে দেবগণকে তুষ্ট করিত না। এই অপরাধে তাহারা আর্য্যগণের নিতান্ত অপ্রিয় ছিল। আর্য্যগণ অগ্নির উপাসনা করিত বলিয়া দস্যুরাও তাহাদের ঘৃণা করিত—তাহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিত। নিরুক্তে ও ইহার সমর্থন আছে। আর্য্যেরা তাহাদের দেবতার নিকট যে পশুবলি দিতেন তাহা তাঁহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। এ ছাড়া ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য তাঁহারা আরও কিছু করিতেন। আর্য্যদের দেবতা ইন্দ্র বৃষভ ও ছাগমাংস ভালবাসিতেন, কিন্তু সোমরস তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল।

দ্রাবিড় ও মুণ্ডা অগ্নিপূজক নয়

বেদের ভাষা অগ্নি-সোম-উপাসকদিগের পবিত্র ভাষা। অগ্নিসোম-উপাসক আর্য্যগণ এদেশে আগমন করিবার পূর্ব্বে বৈদিক ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল না। তখন ভারতবর্ষে দুইটী বিভিন্ন জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের একটী দ্রাবিড়, আর একটী মুণ্ডা। এই দ্বিবিধ ভাষাভাষী জাতি অগ্নিউপাসক নহে। ইহাদের মধ্যে এখনও যাহারা আর্য্যরীতি অবলম্বন করে নাই, তাহাদের কোন ক্রিয়া—কলাপের সহিত অদ্যাপি অগ্নির সম্পর্কমাত্রই নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যে জাতি ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ চান্দ্রমাসে বর্ষগণনা প্রবর্ত্তিত করে, সেই জাতি পূর্ব্বে ইউফ্রেটস্ উপত্যকার অধিবাসী ছিল। ইহারা উত্তরাঞ্চলের অক্কডীয় উপাসক ছিল। ইহারা অক্কডীয় দেবের উপাসনা করিত, সেমাইট্‌রা (Semites) সেই দেবকে 'অদর্' বলিত। এই অদর্ দেবই প্রথম অগ্নিদেব। ইউফ্রেটিসের উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে অক্কডরা বাস করিত। উত্তরাঞ্চলের অক্কডরা অগ্নিপূজক ছিল। ইহারা ভারতবর্ষে কশ্যপপুত্র বলিয়া পরিচিত হইত। প্রসিদ্ধি আছে, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে কাবুলাঞ্চলে কশ্যপের রাজ্য ছিল।

অক্কডরা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে এখানে চন্দ্রোপাসকেরা বাস করিত। অক্কডরা দ্রাবিড়জাতির একটী শাখা। ইহাদিগকে 'সুমেরো-অক্কড'ও বলা হয়। এই অক্কডজাতি যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষালোচনার সূচনা করে।

আর্য্যদের আগমনের বহুপূর্ব্বে দ্রাবিড়েরা ভারতবর্ষে তাহাদের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দ্রাবিড়দিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভাব জড়াত্মক ছিল। আর্য্যেরা এদেশে আসিয়া তাহাদের জড়াত্মক ধর্ম্মভাবে আধ্যাত্মিকভাব সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে ভারতবর্ষে ধর্ম্মনীতির প্রবর্ত্তন আর্য্যজাতি করে। স্বার্থসিদ্ধি, বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ, সম্পদ্‌লাভ প্রভৃতি হিসাবে পূর্ব্বে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইত। ধর্ম্মই যে ধর্ম্মের পুরস্কার, এই নীতি আর্য্যগণই আসিয়া এই দেশে প্রবর্ত্তিত করেন।

দ্রাবিড়জাতীয় লোকদের দুইটী দল ভারতবর্ষে ছিল। একদল পৃথ্বীদেবী ও চন্দ্রের উপাসক ছিল। চন্দ্র তাহাদের নিকট দেবী বলিয়া পরিগণিত হইত।

আর একদল সর্পোপাসক ছিল। বহুকাল ধরিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের দ্রাবিড়জাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল। ইহারা একসময়ে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত শাসন করিত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাদের পরে ভারতবর্ষে অগ্নি-উপাসকেরা আসিয়াছিল।

বেদে অগ্নি

অগ্নি ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা। ইনি অমর, মানুষের অতিথিরূপে মানুষের সঙ্গে বাস করিতেছেন। বেদে অগ্নিকে হোতা, ঋত্বিক্ ও পুরোহিত বলা হইয়াছে। দেবতা ও মনুষ্যদ্বারা ইনি যজ্ঞে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অগ্নি জ্ঞানী, সকল প্রকার যজ্ঞের বিষয় তিনি অবগত আছেন। ইনি কর্ম্মকুশল ও সকল যজ্ঞের রক্ষক। অগ্নি অত্যন্ত আশুগতি। ইনি দেবপুরোহিত। দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইঁহাকে দূতরূপে নিযুক্ত করেন। মনুষ্যেরা দেবগণের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে সেই মন্ত্রের বার্ত্তা ইনি দেবগণের নিকট নিবেদন করেন এবং মনুষ্যেরা দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ আহুতি প্রদান করিলে, অগ্নি যজ্ঞহবি দেবগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। আকাশের সকল স্থানের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় আছে, সেই জন্য যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিবার পক্ষে ইনি বিশেষ উপযোগী। অগ্নি কখন কখন আহূত দেবগণের সহিত একরথেই আরোহণ করিয়া আসেন, আবার কখন কখন তাঁহাদের পূর্ব্বেই যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসেন।

অগ্নি বরুণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন, ইন্দ্রকে আকাশ হইতে এবং মরুদ্গণকে বায়ুমণ্ডল হইতে আনয়ন করেন। অগ্নিব্যতীত দেবতাদের তৃপ্তি হয় না। অগ্নিদেবও মনুষ্যগণের মুখ জিহ্বা স্বরূপ। অগ্নি না থাকিলে মনুষ্য ও দেবগণ যজ্ঞের আস্বাদ পাইতেন না।

এইরূপ নানাভঙ্গিতে অগ্নির গুণাবলীর বর্ণনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গুণবর্ণনাদ্বারাই একখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। ম্যাক্ডানেল (Macdonell) তাঁহার "Vedic Mythology" নামক গ্রন্থে ও Journal of the Royal Asiatic Society (N. S.) নামক পত্রের প্রথমখণ্ডে এবং মুয়ের (Muir) তাঁহার Oriental Sanskrit Texts এর পঞ্চম খণ্ডে অগ্নির গুণাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, আমরা আর পুনরুক্তি করিব না। কৌতূহলী পাঠক সে গুলি পাঠ করিবেন।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

বিধাতার নির্ব্বন্ধ

(গল্প)

আজ গুরুচরণ জমিদার বাড়ীর ফটক ছাড়াইয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর।

সেদিন অমাবস্যা। অন্ধকার আকাশে যেন অগণন নক্ষত্রের প্রবাহ কোন অনন্ত-গম্ভীর বিশাল জলধির উপর দিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটি জ্যোতিষ্ক অনিমেষ চক্ষুর মত স্থির তীব্র—সৃষ্টির কোন রহস্যই যেন তাহার কাছে অপ্রকাশ থাকিতে পারে না।

গুরুচরণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার

সংকীর্ণ গ্রাম্যপথে আসিয়া দেখিল কিছুদূরে তাহার পর্ণকুটীরের ক্ষীণ আলোক রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে।

গ্রামের জমীদার—অগাধ সম্পত্তি; পিতা তাহার কাছারীতে কায করিতেন। একদিন বাল্যকালে ভাল কাপড়চোপড় পরিয়া পিতার সঙ্গে কাছারীতে আসিয়া গুরুচরণ জমীদারপুত্র ক্ষিতীশের সঙ্গে এমন আলাপ পরিচয় করিয়া ফেলিল, যে পরদিন আবার সে পিতার অনুগমন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

ক্রমশঃ জমীদারের বাড়ীই সে আপনার করিয়া লইল। সর্ব্বত্র তাহার অবাধ প্রতিপত্তি। সর্ব্ববিষয়ে জমীদার পুত্রের মত তাহার আদর আপ্যায়ন। জমীদার ভবানী বাবু গুরুচরণকে পুত্রের মতই স্নেহ করিতেন।

দুইজনে এক সঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতার একই স্কুলে, একই কলেজে পাঠাভ্যাস করিয়া জীবনপথে সমভাবে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় ভবানীবাবু ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

দুইজনের একদিনে উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল, বিবাহও হইয়াছিল একদিনে।

যখন পত্রপুষ্পে আকাশ-বাতাসে প্রকৃতির শীত নিরুদ্ধ জীবনীশক্তি স্ফূর্ত্তির অসংখ্য মুক্ত তরঙ্গে সহসা হিল্লোলিত হইয়া উঠে, মানুষের প্রাণও একটা অভিনব আনন্দের সন্ধানে অধীরভাবে ছুটিয়া যায়, এমনি একদিন ক্ষিতীশ পিতার অতুল সম্পদের অধিকার লাভ করিল। সমুদ্ধত যুবক যৌবনের বিচিত্র পথে দৃপ্ত অশ্বের মত যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিল। সে যাত্রার শেষ কোথায় তাহা ভাবিয়া দেখিল না।

গুরুচরণ দেখিল, আর ক্ষিতীশের সঙ্গে সমানভাবে চলিয়া ওঠা সহজ নয়।

জমীদারবাড়ীর মাসিক বৃত্তি পঞ্চাশ টাকায় পিতৃ বিয়োগের পর তাহার সংসার কোন মতে চলিয়া যাইত। এখন সে দেখিল আরও অর্থের প্রয়োজন। বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার চালচলনও কতকটা বড় লোকের মতই হইয়াছিল। কিন্তু আর না বাড়িলে সব দিক মানাইয়া লওয়া অসম্ভব।

পিতা ছিলেন দশকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ। সেই জন্ম বাল্যকাল হইতে দেবদেবীকে ভক্তি করা অপেক্ষা শতগুণ ভয় করিতে সে বিশেষ ভাবেই শিখিয়াছিল; পুণ্যকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবার সাহস ও বল তাহার থাক আর নাই থাক, পাপকার্য্যকে সে বড়ই ভয় করিত, এত ভয় করিত যে অনেক সময়ে পাপ হইবে মনে করিয়া পুণ্য কার্য্য হইতেও বিরত হইতে দ্বিধা করিত না।

এই ভীরুস্বভাব বিনম্র ব্রাহ্মণসন্তান আজ ক্ষিতীশকে বলিল, "ভাই. লোকে বলে তুমি কড়াকড়ি আরম্ভ করেছে। তোমার পিতা যে চালে চলতেন তুমি তার পাশ দিয়েও যাও না, এসব কি ভাল?"

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর বলিল. "দেখ ভাই, তুমি যাকে কড়াকড়ি বলছ, আমি সেটাকে তুচ্ছ মনে করি।"

গুরুচরণ সেইদিন বুঝিল, সে ও ক্ষিতীশ পৃথক—ক্ষিতীশ ধনী, তাহার তুলনায় সে দরিদ্র ভিক্ষুকমাত্র।

ক্ষিতীশের সঙ্গে বেশী কথা না কহিয়া সে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সে পিতার অর্জ্জিত বাস্তুভিটার সংলগ্ন জমীটুকুর সীমানা দেখিয়া আসিল। সে দেখিল চারিদিকে জঙ্গল, আগাছা জন্মিয়াছে। জমীটির সংশোধনের অবসর তাহার এত দিন ঘটিয়া ওঠে নাই।

কিছুদিন সে বন্ধুর সঙ্গে মিশিল না। একদিন প্রভাতে সে আপনাকে বড়ই একা মনে করিল। ক্ষিতীশকে ছাড়িয়া একটা নূতন জীবন আরম্ভ করা যে বড়ই কঠিন, একথা গুরুচরণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। সে ক্ষিতীশকে ছাড়িতে চায় না, ক্ষিতীশ কিন্তু নূতন জীবনের উত্তেজনায় তাহাকে পিছনে ফেলিয়া ছুটিতে চায়। গুরুচরণ স্থির করিল, আবার সে ক্ষিতীশের বাড়ী গিয়া তাহাকে বুঝাইবে।

২

প্রভাতের রৌদ্র গৃহসংলগ্ন উদ্যান বিবিধ লতাপুষ্পে মর্ম্মরনির্ম্মিত সরোবর সোপানে স্বচ্ছ সলিলে ও বিবিধ কারুকার্য্যে আহত প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হইতেছে। এমন সময় গুরুচরণ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া জমীদার বাড়ীর ফটক পার হইয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া সে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ক্ষিতীশ সবেমাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে সে কলিকাতার এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া রাত্রি দুইটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছিল। সেই জন্য প্রজাগর-ক্লিষ্ট ঈষৎ আরক্ত নয়ন প্রভাত সূর্য্যের আলোকে বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

পুরাতন সরকার ঘোষাল মহাশয় নিকটে আসিয়া বলিলেন "আপনি ভিতরে যান্; বউমা জলযোগের ব্যবস্থা করে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

ক্ষিতীশ বলিল "অপেক্ষার প্রয়োজন কি? বাড়ীতে কি চাকর নেই?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ঝি চাকর থাকলেও তো তাঁর একটা কর্ত্তব্য আছে।"

ক্ষিতীশ বলিল, "শুধু সেবা করাই যদি স্ত্রীর কর্ত্তব্য হয়, তাহলে দাসদাসীর প্রয়োজন কি? বিবাহ করেছি সত্য, কিন্তু স্ত্রী এখনও আমার উপযুক্ত হল না।"

"আপনি উপযুক্ত করে নিন—সেটা ত আপনার কর্ত্তব্য।"

ক্ষিতীশ এই উপদেশ বাক্যটি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিল না।

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "দেখুন, আমি আপনার পিতৃবন্ধু, আমি অনেকদিন ধরে আপনাকে দেখে আসছি। আমার বিশ্বাস—আপনি বউমাকে অবজ্ঞা করেন। তিনি দরিদ্রের কন্যা সত্য, কিন্তু আপনি মনে করলে তাঁকে এই জমীদারবাড়ীর উপযুক্ত করে নিতে পারেন; আমরা ত তাঁর কোন দোষই দেখতে পাই না। শুধু আপনিই দেখেন। এইটুকু ছাড়া আপনার সবই গুণ—এমন কি অনেক বিষয়ে আপনি পিতার চেয়েও গুণী।"

ক্ষিতীশ বলিল, "ঘোষাল মশাই, আপনার আগে-কার কথাটা না হয় কতকটা মেনে নিতে পারি। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটা মিথ্যা। বলুন তো আমি পিতার চেয়ে গুণী কোন খানে?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "তা অনেক জায়গায়।"

ক্ষিতীশ পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্বরে বলিল, "একটা উদাহরণ দিন—যদি না দেন বুঝবো আপনি মিথ্যাবাদী চাটুকার মাত্র।"

ঘোষাল মহাশয় ক্ষিতীশের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন তাহার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গুরুচরণ এতক্ষণ কোন কথা কয় নাই, এইবার সে ক্ষিতীশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—পূর্ব্বরাত্রির উপভোগ ও আনন্দের মত্ততা এবং আধুনিক উত্তেজনা ক্রমশঃ অবসাদে পরিণত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং এ অবস্থায় কোন কথা বলা উচিত কি না তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না।

ক্ষিতীশ এইবার গুরুচরণকে বলিল, "কিহে ভায়া, কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দেবে নাকি?"

গুরুচরণ বলিল, "তাতে তো তোমার কোন ক্ষতি নেই দাদা।"

"লাভক্ষতির কথা নয় ভাই। তোমার মতে চলবার কথা আমার নয়।"

"যাক্, এখন জলযোগ সেরে এস।"

একজন ভৃত্য এই সময় জলখাবার বহন করিয়া আনিল।

ক্ষিতীশ বলিতে লাগিল, "দেখ গুরুচরণ, তোমার মত সাধুপুরুষের মত চলা ফেরা বিধাতা আমার কপালে লেখেন নি।"

গুরুচরণ বলিল, "আমি সাধুপুরুষ না হতে পারি।

তবে বিশেষ কোন পাপ করি নি, এ গর্ব্ব আমার থাকতে পারে।"

"পারে কেন? আছে। ধনগর্ব্ব ছাড়া আর সব গর্ব্বই তোমার আছে। তোমার সাধুতা আছে, শান্তি আছে, গৃহে মনোরমা ভার্য্যা, পুত্রকন্যা সবই তোমার গর্ব্বের জিনিষ, আমার কিন্তু ভাই, ধন ছাড়া গর্ব্বের কিছুই নাই। কাজেই অর্থ যা কিছু দান করতে পারে, আমি তা সবই পেতে চাই, তার একটিও ছাড়তে আমি প্রস্তুত নই।"

"দেখ ক্ষিতীশ, তুমি ধর্ম্ম ও নীতি কিছুই মানতে চাও না।"

"দেখ গুরুচরণ রেগো না। আমি ধনী—আমার সাহস আছে—বল আছে; তুমি দরিদ্র, ভীরু, দুর্ব্বল। তুমি শাস্ত্র পড়েছ, আমিও পড়েছি। তুমি সহজেই শাস্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করেছ—বিনা যুদ্ধে কারও বশ্যতা স্বীকার করা আমার ধর্ম্ম নয়।"

"আমি দেখছি তোমার সঙ্গে মেলা মেশা বড়ই কঠিন হয়ে পড়ছে।"

ক্ষিতীশ শয্যা হইতে উঠিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ গুরুচরণ, তোমার কথা মত চললুম না দেখে যদি দুঃখ কর, হয়ত সে দুঃখ যে কোন উপায়ে ঘুচাতে পারি, যদি রেগে আমাকে ছেড়ে যাও, রাগ পড়ে গেলে আবার আসবে; কিন্তু যদি আমাকে অবজ্ঞা কর, জেনে রেখো মানুষের স্বভাব তা সহ্য করতে পারবে না।"

"তুমি দাম্ভিক, পিতৃবন্ধু ঘোষাল মহাশয়কে যা তা বলে গালাগালি দিলে।"

"চাটুকারের সঙ্গে ঐ ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত।"

"কখনই নয়," গুরুচরণ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও কথা মত্তের কথা, গর্ব্বান্ধের কথা।"

ক্ষিতীশ গম্ভীর ভাবে বলিল, "গুরুচরণ, তুমি যাই বল না কেন, আমি আমি, তুমি নই। তোমার কথা তোমার কাছেই থাক। আমাকে বন্ধু না ভাবতে পার, ছেড়ে দাও?"

"তুমি তুমি হয়েই থাক, আমিও আমি হয়ে পড়ি।"

"তাই হও, নিজের সংসার দেখ—আয় বাড়াও—"

"আমি গরীব, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুতা থাকতে পার না।"

"থাকা বড়ই কঠিন।"

গুরুচরণ উঠিল। দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "এতদিন তোমার বাড়ী যাওয়া আসা করে ভুল করেছি।"

ক্ষিতীশ বলিল, "এখনও সে ভুল সংশোধন কর।"

গুরুচরণ জমিদার বাড়ীর দীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেই একটা বিপুলকায় কুক্কুর চীৎকার করিয়া উঠিল, ফটকের বন্দুকধারী দরওয়ান আজ যেন তাহার দিকে দু-একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

৩

গুরুচরণ প্রতিজ্ঞা করিল, আর সে ক্ষিতীশদের বাড়ী যাইবে না।

কিছুদিন নিতান্ত দুঃখীর মত কাটাইয়া সে হঠাৎ একদিন গৃহিণীকে বলিয়া ফেলিল, "দেখ, বয়স বাড়ছে। বৃদ্ধ বয়সে যাতে দুমুঠা খেতে পাই তারও কোন ব্যবস্থা করতে পারলুম না। তোমার বাবা বড় লোক, তাঁর কাছে কিছুদিন থাকলে হয় না।"

পত্নী করুণাময়ী একটু হাসিয়া বলিল "কেন, আর কি সংসার করবে না?"

গুরুচরণ একটু রুষ্ট হইয়া বলিল, "তোমার প্রতি কথায় তামাসা, দেখ বয়স বাড়ছে?"

করুণাময়ী ধনীর কন্যা। স্বামীর ধর্ম্মভাব দেখিয়া সে আনন্দিত হইত। সময়ে সময়ে আবার উপহাস করিতেও ছাড়িত না। গুরুচরণ সে উপহাসে কখনও রাগিবার অবকাশ পান নাই। আজ করুণাময়ী বুঝিল কথাটা সে অসময়ে বলিয়া ফেলিয়াছে।

গুরুচরণ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া একবার কাসিল। অন্তদিন হইলে সে পত্নীকে সংসার পরিত্যাগ করার উপকারিতা কি তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিত। আজ কিন্তু কেবলি তাহার মনে হইতেছিল সে দরিদ্র, ধনীর কাছে সে তুচ্ছ, অতএব সংসার ত্যাগ করিলে চলিবে না, অবস্থার পরিবর্ত্তন চাই।

এমন সময় জমীদারবাড়ীর দরওয়ান মাসিক বৃত্তি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। গুরুচরণ বলিল, "দেখ নন্দকিশোর, জমীদার বাবুকে বোলো আমি আর টাকা চাই না।"

করুণাময়ী দেখিল, নন্দকিশোর কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে। সে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "দেখ নন্দকিশোর, বাবুকে বোলো আমি টাকা নিয়েছি।"

নন্দকিশোর টাকা গণিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

গুরুচরণ বলিল, "টাকা নিলে কেন?"

করুণাময়ী বলিল, "না নিলে উপায় কি?

"আমার অপমান করলে ত?"

"তোমার অপমান করি নি, তুমিই বল না কাযটা ঠিক করেছি কিনা। টাকা না নিলে সংসার চলবে কেমন করে?"

"আমি খেতে চাই না।"

"ছেলেপুলেরা আছে ত? সংসারের জন্যেও ত তোমাকে খেতে হবে।"

"সংসার উচ্ছন্ন যাক্!"

"সংসার এখন উচ্ছন্ন যাবে না" বলিয়া করুণাময়ী অন্যত্র চলিয়া গেল।

গুরুচরণ ভাবিল স্ত্রী মুখরা, যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে এতটা অবাধ্য হইতে পারিত না। সে স্ত্রীর উপর রাগিল, কিন্তু তাহার কার্য্যে বাধা দিতে সাহস করিল না।

রাত্রে যখন সে আহার করিতে চাহিল না তখন করুণাময়ী স্বামীর পা দুটি জড়াইয়া ধরিল। অন্য দিন হইলে গুরুচরণের রাগ পড়িয়া যাইত, আজ তাহা পড়িল না।

করুণাময়ী বুঝিল ব্যাপার কিছু গুরুতর। সে বলিল, "তুমি না খেলে আমিও খাব না।"

সে রাত্রে কাহারও আহার হইল না। সকালে উঠিয়া করুণাময়ী পাশের বাড়ীতে নিস্তারিণী পিসিকে বুঝাইয়া বলিল, জামাই তাহার উপর রাগিয়া রাত্রে আহার করে নাই।

নিস্তারিণী পিসি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ থামিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'যা বউ, তুই বাড়ী যা।"

গুরুচরণ গম্ভীরভাবে উঠানে পায়চারি করিতেছে, এমন সময় দাঁত মাজিতে মাজিতে নিস্তারিণী পিসি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "দেখ্ গুরো, আমার বাড়ীতে আজ তুই খাবি।"

গুরুচরণ বলিল, "শরীর ভাল নয়, পিসিমা।"

পিসি বলিলেন, "না বাবা, আজ আমার একটা ব্রত আছে, একটি ব্রাহ্মণ চাই, বাইরের লোককে খাওয়াবার পয়সা আছে কি?"

গুরুচরণ চুপ করিয়া রহিল। পিসি বলিলেন, "কি রে মৌনং সম্মতিলক্ষণং ত?" পিসি ভট্টাচার্য্যের মেয়ে। নানা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারেন।

গুরুচরণ বলিল, "আচ্ছা পিসি মা, শরীর ভাল থাকে ত—"

বাধা দিয়া পিসিমা বলিলেন, "শরীর ঠিক ভাল থাকবে।"

পিসিমা চলিয়া গেলেন। গুরুচরণ বলিল, "আমি নিমন্ত্রণ খাব না, বাড়ীতেও জলগ্রহণ করব না।"

করুণাময়ী কোন কথাই কহিল না। পিসি মা যখন দেখিলেন গুরুচরণ বিলম্ব করিতেছে, তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গুরুচরণ খুব ধীরপদে যেন অন্যমনস্ক ভাবেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়া গেল।

৪

গত রাত্রের যে সব আহারাদি সঞ্চিত ছিল তাহাই করুণাময়ী পুত্র কন্যাকে খাওয়াইল।

ছেলেটি একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "মা, বামুন ঠাকুর ভাত খাবে ?"

বামুনঠাকুর গুরুচরণের পুরাতন সহাধ্যায়ী। মাঝে মাঝে বাড়ীতে খাইয়া যায়। অন্য দিন সকালে আসিয়া মধ্যাহ্নভোজনের কথা বলিয়া যায়, আজ বলিতে পারে নাই।

করুণাময়ী আপনার আহার্য্য বামুন ঠাকুরকে আনিয়া দিল, নিজের আর খাওয়া হইল না।

কিছুক্ষণ পরে গুরুচরণ গৃহে ফিরিল এবং উপবাস-শীর্ণা পত্নীকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "খাওয়া শেষ হয়েছে ?"

পত্নী উত্তর দিল, "হাঁ।"

গুরুচরণ বলিল, "দেখ, আমি বলছি, তুমি কিছুদিন বাপের বাড়ী যাও। আমায় কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে হবে, আমি আর পরের দান গ্রহণ করতে চাই না।"

পত্নী বলিল, "আমি যেতে চাই না, যদি তাড়িয়ে দাও, তবুও যাব না। খাওয়াতে না পার, ভিক্ষা করব।"

"তবে ঐ দুই জমিদারের ভিক্ষা গ্রহণ কোরো।"

"দেখ, দুই জমিদারের ভিক্ষায় আমি জীবনধারণ করতে চাই না, আমি টাকা নিয়েছি ছেলেমেয়ের জন্যে তোমার জন্যে। আমার ভার তোমার নিতে হবে, আমি বাপের ভার বাড়িয়ে তুলব কেন ?"

"ও: তবে আমার ভার বাড়াবে! এমন নইলে স্ত্রী ?"

করুণাময়ী কথা কহিল না।

গুরুচরণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি বড়ই পণ্ডিত, আমার প্রতি তোমার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা নেই।"

এইখানে কথাবার্ত্তা শেষ। পরদিন সকালে জামা কাপড় পরিয়া গুরুচরণ স্ত্রীকে বলিল, "তুমি যা খুসি হয় কর, আমি কলকাতায় চল্লুম।"

শরতের প্রফুল্ল আলোকে রঞ্জিত হইয়া করুণাময়ী দ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—চাহিয়া দেখিল শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর দিয়া গুরুচরণ ক্ষিপ্রপদে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

চারি পাঁচ দিন পরে খবর আসিল সে কলিকাতার কোন একটি বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়াছে—মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা।

দুই দিন পরে গুরুচরণ দেশে ফিরিল। পত্নীকে বলিল, "দেখ আমি অর্থ উপার্জ্জন করব, আর জমীদারের দান নিও না।"

করুণাময়ী বলিল, "সেই ত ভাল।"

"এখন শোনো, তুমি না হয় দিনকতক ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ীতেই বাস কর; আমি মাঝে মাঝে তোমায় টাকা পাঠাব।"

করুণাময়ী বলিল, "আমাকে যেতে বলছ কেন ?"

"অর্থসঞ্চয়ের জন্যে।"

"স্ত্রী-পুত্রকে না খাইয়ে অর্থ সঞ্চয় করবে ?"

গুরুচরণের মুখ খুব গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সে বলিল, "দেখ সঞ্চয়টা নিজের জন্যে নয়—তোমাদেরই জন্যে।"

করুণাময়ী বলিল, "আমরা সে সঞ্চয় চাই না। আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে তুমি যে অর্থ সঞ্চয় করবে, সে অর্থ তোমার নয় জেনো, সে অর্থ আমার বাপের।"

গুরুচরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর বলিল, "তবে তুমি এই খানেই থাক, আমি প্রতি সপ্তাহে আসব। অর্থের বড়ই প্রয়োজন।"

পরদিন গুরুচরণ কলিকাতায় চলিয়া গেল। সে দু একটা প্রাইভেট টিউসন জোগাড় করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিল তুলিয়া রাখিল, পত্নীর হাতে কিছুই দিল না।

পিতার সঞ্চিত পাঁচশত টাকা একটা লোহার সিন্দুকে থাকিত। সেই সিন্দুকটার চাবি করুণাময়ীর নিকটেই ছিল। একদিন ঘরে ফিরিয়া গুরুচরণ স্ত্রীকে

বলিল, "দেখ, সিন্দুকটার চাবী আমাকেই দাও, তুমি হারিয়ে ফেলতে পার।"

করুণাময়ী একটু হাসিয়া বলিল, "এতদিন ত হারাই নি।"

"হারাতে পার ত ?"

"তা পারি।"

"সেই জন্যই চাইছি।"

করুণাময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তার পর বলিল, "তুমিও কি হারাতে পার না ?"

গুরুচরণ একটু চুপ করিয়া বলিল, "দেখ, তোমাতে আমাতে ভিন্নতা আছে, তুমি স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ।"

করুণাময়ী বলিল, "এতদিন কি সেটা ছিল না ?"

গুরুচরণ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি বড়ই বাচাল।"

করুণাময়ী বুঝিল আর জবাব দিলে ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়িবে। সে চাবিটি স্বামীকে দিল।

৫

গুরুচরণ চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিল। দেখিল সব ঠিক আছে, কেবল টাকার পরিবর্ত্তে কতকগুলি অলঙ্কার। গুরুচরণ স্ত্রীকে বলিল "এ সব কি ?"

করুণাময়ী উত্তর দিল, "টাকাগুলা দিয়ে ঐ সব গহনা বন্ধক রেখেছি।"

গুরুচরণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখ, বামুন হয়ে ও সব সুদ নেওয়া চলবে না।" তোমার বাপের বাড়ীতে ও সব হয় বলে আমারও বাপের বাড়ীতে হবে, এ কথা স্বপ্নেও ভেবো না।"

করুণাময়ী বলিল, "তা আমি একদিনও ভাবি নি।"

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি কলিকাতায় যাইবে বলিয়া করুণাময়ী রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সেই জন্য আর কোন কথা না বলিয়া সে দ্রুতপদে রন্ধনশালায় চলিয়া গেল।

আহারান্তে কাপড় জামা পরিয়া ব্যাগহস্তে, গুরুচরণ যখন তাড়াতাড়ি তামাক টানিতেছে, তখন করুণাময়ী নিকটে আসিয়া বলিল, "চাবিটা কি আমাকে দিতে চাও না।"

গুরুচরণ বলিল, "না; তুমি কুলমর্য্যাদা নষ্ট করতে বসছ।"

করুণাময়ী বলিল, "যদি না দাও, পরের গহনাগুলি আমাকে দিয়ে যাও।"

"কেউ ধার শোধ করতে এলে আমাকে খবর দিও।"

এই কথা বলিয়া গুরুচরণ আপনার ক্যাসবাক্স খুলিয়া স্ত্রীর কাছে সংসার খরচের টাকা গণিয়া দিল। ছোট ছেলেটি "বাবা একটা পয়সা দাও" বলিয়া নিকটে দাঁড়াইল। পিতৃদেব হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। বালক বিষণ্ণ মুখে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

গুরুচরণ কলিকাতায় রওনা হইল। করুণাময়ী বুঝিল, স্বামী তাহাকে বিশ্বাস করে না, সিন্দুকের চাবি ও টাকা কড়ি সব সে তাহার নিকটে রাখিতে অনিচ্ছুক।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী জানিতেন ছেলের সংসারে বুঝিয়া চলিবার শক্তি নাই; মৃত্যুশয্যায় এই চাবি তিনি করুণাময়ীর হস্তেই দিয়া যান। আজ সাত বৎসর সে চাবি একদিনের জন্যও হস্তান্তরিত হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে নন্দকিশোর ব্যাগ হাতে করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা, টাকা যদি দরকার হয়, আমার কাছে আছে।"

করুণাময়ী ভাবিয়া দেখিল, তাহার হাতে যে টাকা আছে, তাহাতে সংসার খরচ চলিবে না। কয়েকটা বিশেষ খরচের জন্যই গুরুচরণ তাহাকে দশটি মাত্র টাকা দিয়াছে, সংসার খরচ যে জমীদার বাড়ীর বৃত্তি হইতেই চলিবে এ কথা সে মুখ ফুটিয়া না বলিলেও কার্য্যের দ্বারা তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু "যদি দরকার হয়" নন্দকিশোরের এই কথাটুকু তাহাকে অধীর করিয়া ফেলিল।

করুণাময়ীর মুখে কথা নাই ; নিশ্চলভাবে অধোমুখে সে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নন্দকিশোর বলিল "মা, বাবুকে কি বলব ?"

করুণাময়ী বলিল, "নন্দকিশোর, আমার টাকা আছে, আর দরকার নাই।"

নন্দকিশোর বহুকাল ধরিয়া টাকা আনিয়া দেয়। করুণাময়ী সে টাকাটা যে দান তাহা ভাবিবার অবকাশ কখনও পায় নাই। "টাকা যদি দরকার হয়" এই কথা যেন তীব্র কশাঘাত করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল এ টাকা গ্রহণ করিলে তাঁহার স্বামীর অবমাননা অনিবার্য্য।

নন্দকিশোর চলিয়া গেল। করুণাময়ী এবার ভাবিল, সংসার চলিবে কিরূপে ? তারপর স্থির করিল, সে স্বামীকে সব বলিয়া সংসার খরচের আরও টাকা চাহিয়া লইবে।

গুরুচরণ মেসে থাকিত। পত্নী, পুত্র ও কন্যার মুখ সপ্তাহে একবার মাত্র দেখিতে পাইবে এইরূপ একটা কঠোর নিয়ম পালন করিয়া সে অর্থদেবতার উপাসনায় মনোনিবেশ করিল। দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রাইভেট টিউসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সহরের জাঁকজমক বিলাসবৈভব, দিনের কর্ম্মকোলাহল ও রাত্রের আলোকমালা গুরুচরণের অন্তরে এক নূতন ভাবের সঞ্চার করিল। সে দেখিল জগতে সকলেই বাসনার চরিতার্থতার জন্য ছুটিয়াছে প্রশস্ত রাজপথে অসংখ্য গাড়ী যাওয়া আসা করিতেছে। বাজারে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী নানাবিধ পরিচ্ছদ, উপভোগের সামগ্রী অনন্ত। এত সম্ভোগ এত বিলাস, এত উৎসবের মধ্যে বৈরাগী সাজিয়া রুদ্ধ বাসনার বহ্নিতে দগ্ধ হওয়া উচিত কিনা এই চিন্তা একদিন তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

এক জ্যোৎস্নাফুল্ল রাত্রে ফুটপাথের উপর একটি বিপুল আম্রবৃক্ষের আপাদলম্বী মুকুলভারের মদির সৌরভ হঠাৎ তাহাকে জনাইয়া দিল, বাল্যকালেই সে পিতামাতাকে হারাইয়াছে, পত্নী কি তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। সারা যৌবন সে করুণাময়ীকে কেবল গৃহকর্ম্মরতা গৃহিণীর মতই দেখিয়া আসিয়াছে, রমণীর প্রণয়-সম্ভাষণ সে বড় একটা শুনিতে পায় নাই।

অন্তরে একটা দারুণ অভাবের বেদনা কেবলই গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক জিনিস তাহার উপভোগ্য হইতে পারিত, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ক্ষোভে দুঃখে সে বিধাতার নিন্দা করিল, বিদ্রোহীর মত সর্ব্বান্তঃকরণে সে তাঁহাকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করিয়া বসিল। বিধাতাপুরুষ হাসিলেন।

গভীর রাত্রে মেসে ফিরিয়া সে দেখিল রাঁধুনী বামুন তাহার ঘরের এককোণে এক থালা ভাত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, মেয়ের অসুখ বলিয়া ঝি কায করিতে আসে নাই।

নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মত আহার করিয়া যখন সে জানালার পাশে খাটের উপর শুইয়া পড়িল তখন মেসে জনপ্রাণী জাগিয়া নাই। পরেশবাবু অন্যদিন অনেক রাত্র পর্য্যন্ত গল্প করিতেন, আজ সঙ্গীর অভাবে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া সাড়ে দশটার পরই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

৬

গুরুচরণ ভাবিল তাহার সারাজীবনের কথা।

দারিদ্র্যই তাহার সুখের একমাত্র কণ্টক। বিধাতা দারিদ্র্যের পাষাণে সব বৃত্তিগুলিকে চাপিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু একটিকেও নষ্ট করেন নাই। সেইজন্য বড় লোকের সাহচর্য্য ও নিরন্তর কাব্যালোচনা তাহার অধ্যাপকবংশোচিত বিধিনিষেধপিষ্ট শীর্ণ প্রাণকে কখনও কখনও মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া তুলিত।

যৌবনের প্রমোদমত্ত দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল। নিত্য নূতন আনন্দ ; জমার দিকটা এতই বেশী যে খরচের দিক মোটেই দৃষ্টি পড়ে না। নূতন ভাব নূতন কল্পনা তাহাকে মাতাইয়া তুলিল।

করুণাময়ী তখন রন্ধনশালায় যজ্ঞাগ্নিসন্নিহিত অরুন্ধতীর মত। সে মাতৃরূপা,—সকলেই যেন তাহার পুত্র; সকলের সুবিধার জন্ত ও শান্তির জন্ত সে সদাই চিন্তাকুল। কখনো তাহার মুখশ্রী দুর্গার মত, কখনো সে সেবিকা, কখনও বা লক্ষ্মী। তাহার কাছে দাঁড়াইলে মাথা আপনি অবনত হয়। উদ্দাম বাসনা তাহার কাছে আপনা আপনি প্রশমিত হইয়া পড়ে।

বাড়ীর ঝি হইতে বৃদ্ধা দিদি শাশুড়ী পর্য্যন্ত তাহার মুখাপেক্ষী। যত্ন লোলুপের দল ক্রমশঃ দান পাইয়াই পরিতুষ্ট হইতে শিখিল, দাতার কথা বড় একটা ভাবিয়া দেখিল না। তারপর পাণ হইতে চুণ খসিলে কেহ কেহ করুণাময়ীকে দোষীও বলিত। করুণাময়ী তাহাতে দুঃখিত না হইয়া আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম করিতে চেষ্টা করিত, তৃপ্ত পরিবারবর্গের একজনও তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিত না। সত্যসত্যই তাহারা করুণাময়ীর কাছে নিতান্ত শিশুর মত্ই আব্দার করিত; তাহার মাতৃহৃদয়ে কখনও কোনরূপ বিরক্তির সঞ্চার হয় নাই।

গুরুচরণ গৃহকর্ম্মে উদাসীন বলিয়া পত্নী তাহাকে অনেক বুঝাইত। গুরুচরণ পত্নীর এই সাহস দেখিতে পারিত না। অন্তরে অন্তরে চটিত। তারপর সারা দিনের বিচ্ছেদের পর যুবক যখন তাহার কাব্যরস-প্রমত্ত সর্ব্ব প্রাণ দিয়া মিলনের আকাঙ্ক্ষা করিত, তখন পত্নীর মুখে আয়ব্যয়, বাজার, লৌকিকতার কথা শুনিয়া সে শুধু যে বিরক্ত হইত তাহা নয়, সে রাগিত, ভাবিত পত্নী হৃদয়হীন, সঙ্গে সঙ্গে পত্নীর প্রতি একটা ঘৃণাও প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত।

এই সব কারণে গুরুচরণ মাঝে মাঝে মনে করিত—তাহার যৌবন ও কাব্যচর্চ্চা সবই বিফল। কলিকাতায় আসিবার পর এই চিন্তাটা গভীর হইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে জানালা দিয়া একটা বাতাস যেন কোন্ পুরাতন প্রিয়স্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া দিল। পাশের বাড়ীতেই বিবাহ উৎসব। মানবের আনন্দ কলরব থামিয়া আসিয়াছে। নববধূর কোন রসিকা সখী হঠাৎ গান ধরিল "রজনী. পোহায়ে এল, শ্যাম আমার এল কই।"

গুরুচরণ উঠিল—জানালা দিয়া একবার আলোকিত বাসরঘরটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল—বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর পায়চারি করিতে করিতে সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল—বাসরঘরের গান থামিল, দু একটা পথের কুকুর মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছিল, তাহারাও চুপ করিল।

গুরুচরণ ভাবিল জীবন ক্ষণস্থায়ী, পৃথিবীতে সুখও অনেক। বৈরাগী সাজিয়া কি করিব। যাহা পাই ভোগ করিয়া লই।

৮

শনিবার বাড়ী যাইবার কথা। গুরুচরণ বাড়ী যাইবার কোন আয়োজন করিল না।

রবিবার একটি লোক ছাড়া অপর কাহাকেও সে মেসে দেখিতে পাইল না। এই লোকটি পরেশবাবু।

সকালে উঠিয়াই সে পরেশবাবুর নিকটে আসিয়া বসিল। পরেশবাবু বলিলেন, "কি পণ্ডিত মহাশয়, আজ যে মেসে? কাল বাড়ী যান্ নি?"

"না—ভাল লাগ্‌ল না, প্রতি শনিবারেই ত যাই। আপনিও ত বাড়ী যান্ নি দেখ্‌ছি।"

"আমার একটা নিমন্ত্রণ ছিল—আপনার ত সে সব কিছু ছিল না।"

"না।"

তবে এমন বৈরাগ্য কেন দাদা? বউদিদির সঙ্গে কি ঝগড়া হল?"

"না—তাও না।"

"মিথ্যা কথা ভাই, তা না হলে নিশ্চয়ই তুমি বাড়ী যেতে। কোন, বিশেষ কায ছিল কি?"

"কোন কায ছিল না।"

"নিশ্চয়ই বৌদিদির সঙ্গে তোমার মনের মিল নেই। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।"

"যে যেমন সকলকেই সে তেমনই ভেবে থাকে।"

"আমি মোটেই তা ভাবিনা।" "আমার মনে হয়—আমি একটা স্বতন্ত্র জীব, জগতে কারো সঙ্গে আমার মিল নেই।"

"সেই জন্যেই ত বলি বউদিদির সঙ্গে তোমার ঝগড়া—মিল না থাকলেই মনকসাকসি বুঝতে হবে।"

গুরুচরণ একটু গোলে পড়িল—একটা জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

পরেশবাবু হাসিলেন। বলিলেন "আচ্ছা পণ্ডিত, বউদিদি কি বড় ঝগড়া করেন? না ঝগড়া করাটা আপনারই স্বভাব?"

গুরুচরণ একবার হাসিয়া, একবার কাসিয়া বলিল, "আচ্ছা ওসব কথা ছেড়ে দিন্।"

পরেশবাবু বলিলেন, "আমি এ কথাটা মোটেই ছেড়ে দিতে চাই না। আমার ধারণা যেখানে স্ত্রী পুরুষের মনে মিল নাই সেই খানেই শ্মশান বৈরাগ্য। তোমার বাড়ী না যাবার কারণ বুঝে নিয়েছি, পণ্ডিত মশায়। এই যে বৈরাগ্য আপনার মধ্যে দেখছি এর পরিণাম বড় শুভ নয়। আমার একবার এই রকমের বৈরাগ্য এসেছিল।"

"তার ফল হল কি?"

"এক চাকরাণীর প্রেমে পড়ে গেলুম।"

"তারপর।"

"তারপর অনেক অর্থ নষ্ট করতে হল।"

"নষ্ট কেন! সত্যি বল—ভালবাসা কি অমূল্য বস্তু নয়?"

"নিশ্চয়ই, ভালবাসার জন্য দেনা করলুম, অবশেষে চুরি, তারপর জেল।"

"কি—কি—ব্যাপারটা সব খুলেই বলুন না।"

"খুলে ত আগাগোড়াই বলছি। আহারাদির পর গল্পটা সবই বলব, এখন চল স্নানের আয়োজন করা যাক্।"

দুইজনে উঠিল। গুরুচরণ বলিল, "ভাই গল্পটা আজ শোনা হবে না দেখ্‌ছি—আমার একটু বাইরে যেতে হবে।"

পরেশবাবু কেবল একবার গুরুচরণের মুখের দিকে চাহিয়া একটু রহস্যের সহিত বলিলেন, "এই বল্‌ছিলে আজ তোমার কোন কায নেই। এখানে কোথায় যেতে হবে?"

গুরুচরণ বলিল, "বলব।"

আহারাদির পর ছুটির দিনে পরেশবাবু কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া পড়েন। আজ নিদ্রার পর উঠিয়া তিনি গুরুচরণকে ডাকিলেন, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। অপরাহ্ণে রাঁধুনী বামুন বলিল, "বাবুর ফিরতে রাত্রি হবে।" রাত্রি দশটার সময় সে বাবুর আহার সামগ্রী যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল।

গুরুচরণ যখন ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় দুইটা। পরেশবাবু আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। লণ্ঠন জ্বালিয়া তিনি গুরুচরণের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

গুরুচরণ স্খলিতস্বরে উত্তর দিল। "থিয়েটার দেখতে। আজ আর কথা হবে না ভাই। রাত্রি হয়েছে—শুয়ে পড়ি।"

তারপর পরেশবাবু দেখিলেন গুরুচরণ আর তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্বের মত মিশিতে চায় না। তিনি পুলিশের লোক—বিনা কারণেও লোককে সন্দেহ করা তাঁহার নীতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়। তিনি স্থির করিলেন গুরুচরণকে একটু চোখে চোখে রাখিতে হইবে।

বুধবার সকালে গুরুচরণ পত্নীর পত্র পাইল। করুণাময়ী জানিতে চাহিয়াছে সে রবিবার বাড়ী যায় নাই কেন, আগামী রবিবার তাহার নিশ্চয়ই আসা চাই—কারণ তাহার কাছে যাহা কিছু ছিল সবই খরচ হইয়া গিয়াছে।

৯

গুরুচরণ ভাবিল—বাড়ী উচ্ছন্ন যাক্। বাড়ী কার? আমার নয় আমার স্ত্রীর; আমি প্রতিপাল্য

অধীন। বাড়ীতে অভাব হয়—সে অভাব স্ত্রী পিতার অর্থে মিটাইয়া চলুক। আমি অর্থসাহায্য করিতে পারিব না।

গুরুচরণ নানা ভাবনায় তন্ময় হইয়া আছে, এমন সময় পরেশ বাবু চিৎকার করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আজ আর কোথাও যাবে না কি ?"

গুরুচরণ চুপ করিয়া রহিল।

পরেশবাবু বলিলেন, "পণ্ডিত আমাদের ডুবে ডুবে জল খান্।"

অপর একজন বলিলেন, "বটে ?"

অনুচ্চস্বরে আর একজন বলিলেন, "ডুবে জল খাওয়া ত পণ্ডিতেরই কায।"

গুরুচরণ কাহারও সহিত কথা কহিল না। আহারাদি শেষ করিয়া সে কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া গেল। কি একটা কারণে স্কুল সকাল সকাল বন্ধ হইয়া গেল। গুরুচরণ মেসে আসিয়া গম্ভীরভাবে আপনার বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল—পরেশ বাবু তাহার বদনাম রটাইতেছেন। সে স্থির করিল—দু' এক দিনের মধ্যে বাসা বদল করিয়া ফেলিবে।

বহুদূরে কোথায় একটা কোকিল মুহুর্মুহু ডাকিয়া উঠিতেছিল। পথের ধারে সোঁদাল গাছটি আপাদমস্তক পীত পুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নীচে একটি ফুলের দোকান—বেল জুঁই ও গোলাপের গন্ধ ঘরের মধ্যও বাতাসকে সুরভিত করিয়া তুলিয়াছে।

মনে পড়িল—করুণাময়ীর কথা; তাহার রূপ, গুণ কিছুরই অভাব নাই। তবুও যেন সে পর। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কি যে একটা ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা দেখা যায় না, কিন্তু তাহা বড়ই দৃঢ়, বড়ই কঠিন। দুজনের জীবন-স্রোত দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়াছে—একটিকে আর একটির দিকে ফিরান অসম্ভব। স্বামী চায় পত্নী তাহার অনুবর্ত্তন করুক—পত্নী ভাবে সে স্বামীর অনুবর্ত্তন করিতেছে; তবে অনুবর্ত্তন করিতে গেলে সর্ব্বত্রই যে স্বামীর আদেশমত চলিতে হইবে—তাহা সে স্বীকার করিত না। স্বামী যাহাকে তিরস্কার করিত, সে তাহাকে সান্ত্বনা দান করিত; স্বামী যাহাকে দেখিতে পারিত না, সে তাহাকে যত্ন করিত। স্বামী যাহাকে তাড়াইয়া দিত, সে তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য ব্যাকুল হইত।

সে দেখিত করুণাময়ীর বড় বড় শান্ত ও নির্ম্মল চক্ষু দুটির মধ্যে এমন একটা মহিমা নিত্য-প্রদীপ্ত হইয়া আছে যাহা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি অহংকার ও স্বামিত্বকে লঘু করিয়া ফেলে।

এই পত্নীকে সে ভালবাসিতে পারিল না। কলিকাতায় এখানে সেখানে ঘুরিয়া, নানা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিশিয়া সে দেখিল—তাহার জীবনের আশা পূর্ণ হইতে পারে। তবে সাহস চাই। নীতিশাস্ত্রকে ভয় করিয়া চলিলে তাহার আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

বন্ধু জুটিল রসিক পরেশবাবু। তিনি দেখিলেন গুরুচরণ সাধুতার গর্ব্ব করে। তাহার কক্ষে গীতা উপনিষদ ধর্ম্মশাস্ত্র কিছুরই অভাব নাই। দিন রাত বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা লইয়া বন্ধু বান্ধবদের অধীর করিয়া ফেলে।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন আকাশে মেঘাচ্ছন্ন দারুণ গ্রীষ্মের পর পশ্চিম দিকে একখানা নিবিড় কৃষ্ণমেঘ আশু বর্ষণের সূচনা করিতে লাগিল। পরেশ বাবু বলিলেন, "চল পণ্ডিত একটু বেড়িয়ে আসি।"

গুরুচরণ পরেশ বাবুর ঠাট্টাতামাসায় রাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার এই অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না। দুই জনে গঙ্গার তীরে আসিয়া বসিল। পারে কত লোক যাতায়াত করিতেছে—সকলের মুখেই একটা প্রীতি ও আনন্দ বর্ত্তমান। মোটরে চড়িয়া স্ত্রীপুরুষ সান্ধ্য ভ্রমণে চলিয়াছে। গুরুচরণ ভাবিল ইহারাই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ফুটপাথের উপর এক বলিষ্ঠ যুবক আম বেচিতে বসিয়াছে; তাহার পার্শ্বেই রঙীন কাপড় পড়িয়া স্ত্রীও স্বামীর সহায়তা করিতেছে, দুজনের মধ্যে কি প্রীতি, কি সদ্ভাব। গুরুচরণ ভাবিল তাহার অদৃষ্টে সুখ নাই—এই আত্মবিক্রেতার মতও একটি মনোরমা

পত্নী লাভ করিলে সে সুখী হইত। সে স্থির করিল যেমন করিয়া হোক্ এ জীবনকে পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।

পরেশ বাবু বলিলেন, "এত ভাবনা কিসের?"

গুরুচরণ বলিল, "কই ভাবিনি ত।"

"দেখ পণ্ডিত আনন্দ চাই। চলনা একটু এগিয়ে পড়ি।"

গুরুচরণ হাসিল। বলিল, "তোমার কথাটা ভাল বুঝলুম না।"

"চল বুঝিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া পরেশ বাবু উঠিলেন, গুরুচরণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আকাশে একখানা মেঘ বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল। দুই পা অগ্রসর হইতে না হইতেই বৃষ্টি নামিল। দুই বন্ধু আশ্রয়ের জন্য সবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

রাস্তার এক পাশে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ফুটপাথের খানিকটা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেইখানে দুই বন্ধু কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখে একটা বড় বাড়ী। তাহার প্রতি ঘর বৈদ্যুতিক আলোকে ঝলমল করিতেছে। সারি সারি দোকানগুলির উপর দ্বিতলের বারান্দায় বসন-ভূষণে সুসজ্জিত কামিনীর দল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রূপের লাবণ্য আভা নির্গত হইতেছে। বিশ্বসংসারের সকল দুঃখ-গ্লানি জ্বালা-যন্ত্রণা মান-অপমান হাসির তরঙ্গে কোথায় ভাসাইয়া দিয়া মূর্ত্তিমতী বিজয়লক্ষ্মীর মত তাহারা কখনও বারান্দায় ঘুরিতেছে, কখনও বা কক্ষের উজ্জ্বল আলোকে দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া কেশবিন্যাস করিতেছে, কেহ বা ঘরের মধ্যে আলমারি খুলিয়া নানাবিধ পোষাক নাড়াচাড়া করিতেছে, কেহবা একবাড়ী হইতে প্রমত্ত কলহংসস্বরে অন্য বাড়ীর কোন রমণীকে সম্বোধন করিয়া হাস্যপরিহাসে নিরত।

পরেশ বাবু বলিলেন, "দেখ পণ্ডিত, চোখ থাকে ত দেখে নাও।"

গুরুচরণ হাসিল। বলিল, "আপনি দেখুন মশাই—আমার ও সবে প্রবৃত্তি নেই।"

পরেশ বাবু বলিলেন, "সত্য কথা বল পণ্ডিত, তুমি কি এতই সাধু?"

গুরুচরণ বলিল, "দেখুন পরেশ বাবু, ওসব পিশাচীর দল।"

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। তার পর বজ্রাঘাত, তার পর অবিরাম বর্ষণ। গাছতলায় দাঁড়াইয়া থাকা আর চলে না। গুরুচরণ বলিল, "পরেশ বাবু, এখন কি করা যায়?"

পরেশ বাবু বলিলেন, "চল না একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়ি।"

"রামচন্দ্র! ঐ পাপের জায়গায় যেতে বল? ওখানে গেলেই নরককুণ্ডে পতন অনিবার্য্য।"

পরেশ বাবু বলিলেন, "আচ্ছা দাদা, একটু দাঁড়াও, এইখানে আমার এক বন্ধুর বাড়ী—ঝাঁ করে একবার তার সঙ্গে দেখা কোরে আসি।"

এই বলিয়া পরেশ বাবু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অলকা

উত্তরের অভিমুখে পাষাণের পুরে
দক্ষিণ পবন স্রোতে ভেসে ভেসে দূরে
আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘ যেথা থেমে যায়
দিনের যাত্রার শেষে, বিরাজে সেথায়
ধনেশের স্বর্ণপুরী, প্রিয়ার সদন
বাসবের ধনু সম বিচিত্র বরণ
অলকা—আলোকস্বপ্ন কল্পনার তীরে,
হিমশুভ্র শশিকলা মহাকাল শিরে।
নিত্য সেথা মধুমাস ; সুন্দর সুস্বর
ফুটায় কুসুমপুঞ্জ সেথা অনিবার,
উন্মত্ত ভ্রমর গায়, রজনীতে চাঁদ
সুনীল আকাশে হাসে, মুরজ সংবাদ
মণিময় গৃহে গৃহে মদির মধুর
প্রণয়সঙ্গীত সহ। সেখানে বধূর
জীবন যৌবন ছাড়া না হ এক তিল,
স্বরগে মরতে সেথা হয়ে গেছে মিল।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

আমাদের ইতিহাস

সকল জাতিই আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি-কলাপ স্মরণ ও আলোচনা করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। আমরাও যে অন্তভূত এক অর্ব্বাচীন জাতি নই, আমাদেরও পূর্ব্ব ইতিহাস যে গৌরবমণ্ডিত তাহা আজ আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

আজ যে সব জাতি উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়া আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া আস্ফালন করিতেছে, তাহাদিগের অভ্যুদয়ের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা যখন অজ্ঞতার ঘননিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, যখন তাহাদিগের জাতীয় জীবন কেবল মাত্র স্পন্দিত হইতে-ছিল, তখন আমাদিগের এই অধুনা শতপ্রকারে লাঞ্ছিত জাতি সর্ব্ববিধ উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। আমাদের এই অশ্রুতপূর্ব্ব পূর্ব্বগরিমা ও আমাদিগের পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া, এখন কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা আবার সেই প্রাচীনগৌরব লাভ করিতে পারি সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

আমাদের দেশের জনৈক সাধকশ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন, "যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। ইহা দর্শন শাস্ত্রের একটি মৌলিক সার সত্য। আমিও এই মহা বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি,—

"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে।"

আমি যখন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস—প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনে হয়, বিশ্বশিল্পী ব্রহ্মাণ্ড-পতি বুঝি আগে ভারতকে আদর্শরূপে সৃষ্টি করিয়া পরে তাহারই অনুকরণে বিশ্ব সৃজনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

আপনারা ভারতের যে কোনও বিভাগের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন, ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনারা যদি উদ্ভিদ্বিদ্যা আলোচনা করিতে যান তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, হিমাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, কারাচী হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত যে প্রকাণ্ড ভূভাগ বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা এত প্রকার নানা শ্রেণীর লতা, গুল্ম, বনস্পতি, ওষধিতে পরিপূর্ণ যে শত শত হুকার (Hooker) যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহা-

দিগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া শেষ করিতে পারিবেন না। আমাকে জনৈক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ভারত ভিন্ন অন্য কোনও দেশে এত প্রকার নানা জাতীয় প্রস্তরের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মহাত্মা হেকেল ভারতের অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া এবং নদ নদী সিন্ধু সাগরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, ভারত প্রবাস তাঁহার নিকট "Realisation of the brightest dream of his life." যদি কেহ মানব-জাতি-বিভাগ-বিজ্ঞান (Ethnology) পাঠ করিতে যান, তাহা হইলে ভারত তাঁহার নিকট একটী জীবন্ত জাদুঘররূপে প্রতিভাত হইবে। যদি স্থপতি বিদ্যায় আপনার অনুরাগ থাকে তাহা হইলে গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের, কটকের ও ভুবনেশ্বর মন্দিরের ও অজন্তা গুহার গাত্রস্থিত খোদিত মূর্ত্তি সকল মনোনিবেশ সহ দর্শন করুন, তাহাদের কারুকার্য্য ও ভাস্কর্য্যে মোহিত হইয়া যাইবেন। আপনি যদি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হন তাহা হইলে আপনার জন্য শত শত স্তূপ, বিহার, চৈত্য ও স্তম্ভ রহিয়াছে যাহা এ জীবনে অধ্যয়ন করিয়া শেষ করিতে পারিবেন না। রসায়ন শাস্ত্রে ভারত কতটা উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার যদি সম্যক পরিচয় পাইতে চান তবে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করুন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের "History of Hindu Chemistry"তে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারেন।

কণাদের পরমাণুবাদকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পরমাণুবাদিগণ (Atomists) এখনও অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের যে নব নব আবিষ্কারে আজ প্রতীচ্য জগত স্তব্ধ, মুগ্ধ ও অভিভূত, সেই সব আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া জগদীশচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমার নগ্নদেহ পূর্ব্বপুরুষগণ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে ধ্যানমগ্ন হইয়া ইহাদের সার সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।"

ভারতের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্তের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া মহাত্মা আচার্য্য Max Muller বলিয়াছেন—"If I were to look over the whole world to find out the Country most richly endowed with all the wealth, power and beauty, which nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I would point out to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has deeply pondered on the greatest problems of life and found solution, I should point out to India; and if I were to ask myself from what literature we here in Europe ... ... may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life not for this life only but a transfigured and eternal life, again I should point out to India."

ভারতের কর্ম্ম বিভাগের ইতিহাস আলোচনা করুন, এমন সুশৃঙ্খল নিয়মাবলী আর কোনও দেশেই দেখিতে পাইবেন না। ভারত সমাজকে সুখ শান্তিতে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্ম মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, পরাশর সংহিতা প্রভৃতি যে মানব ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণীত হইয়াছে তাহার তুলনা কি আর কোথায় পাইবেন?

যদি ইতিহাস অর্থে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, আমেরিকার ইতিহাসের ন্যায় রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস চান, তাহা হইলে সরলভাবে অকপট চিত্তে স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। থাকিলেও তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মস্তিস্কেই আবদ্ধ আছে।

বাস্তবিকই যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, সমগ্র ভারতের কে প্রথম রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকাল কতদিন, তিনি কয়টী যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের তারিখ কি, সেই সব যুদ্ধে কত লোক নিহত হইয়াছে এবং তাঁহার রাজত্বকালে কতবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহা হইলে তাহার কোনও সংবাদই আমরা দিতে পারিব না। কারণ ভারতবাসী কোনও দিনই এরূপ ইতিহাস লেখেন নাই। ভারতবাসী চিরদিনই এই জরামরণশীল ক্ষণভঙ্গুর জীবন, যাহার উৎপত্তি আজ, কাল যাহার ক্ষয়, পরশ্ব যাহার একেবারে বিলয় তাহার প্রতি উদাসীন। এই ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী জীবনের ইতিহাস লিখিতে তাঁহারা কোন দিন চান নাই বা লিখিতে ভাল বাসেন নাই।

জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, এ জীবনের সত্যতা কোথায়? এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর মায়ার খেলা, এ জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া কি হইবে?

রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রম গমনে উদ্যত হইয়া কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী পত্নীদ্বয়কে আপন যাবতীয় ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে চাহিলে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী আমার হয় তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারিব?" রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ধনদ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।" এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিয়া উঠিলেন "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্" —যদ্দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাহা লইয়া আমি কি করিব?

এই একটী মাত্র আখ্যায়িকা হইতেই আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে ভারতবাসীর জীবনের গতি কোন দিকে। ভারতবাসী অমৃতত্ব লাভের জন্য চিরদিনই একান্ত ব্যাকুল। পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য তাহাকে কোন দিনই প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। ভারতবাসী কোনও দিনই কোহিনুর পরিত্যাগ করিয়া কাচে পরিতৃপ্ত হইতে চাহে নাই। সেই জন্য ভারতের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে রাজ্যের উত্থান ও পতনের আলোচনা করিতে গেলে চলিবে না। কারণ তাহা হইলে ভারতবাসীর প্রকৃত ইতিহাস জানা হইবে না। যাঁহারা ভারতবাসীকে এই বাহ্য ইতিহাস দ্বারা ধরাইতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারা ভারতবাসীর প্রকৃতিগত জীবনের সংবাদ না পাইয়া মহাভ্রমে পতিত হইবেন। ভারতের যদি কোন ইতিহাস থাকে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মপরায়ণতা ও ধর্ম্ম প্রাণতার ইতিহাসই তাহার প্রকৃত ইতিহাস।

যদি কেহ ভারতকে প্রকৃতভাবে ধরিতে বুঝিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে ভারতবাসীর স্বভাবের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। এই ইতিহাস ভারতবাসীর জীবনের প্রতি স্তরে দলে দলে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যদি ভারতের প্রকৃত ইতিহাস পড়িতে চান, যদি বেদের বহু দেববাদ, বেদান্তের ব্রহ্মবাদ, বুদ্ধের নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, রামমোহনের একেশ্বরবাদ- এই ধর্ম্মবিকাশের প্রতি স্তরের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিতে চান, তবে ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব্ববেদ পাঠ করুন, উপনিষদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক ষড়্দর্শন সকল মনোযোগ সহ অধ্যয়ন করুন। মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ, আধ্যাত্ম, অদ্ভুত রামায়ণ, পুরাণ, উপপুরাণ, ত্রিপিটক, জাতকমালা, ধম্মপদ, ললিতবিস্তর, শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী ও শঙ্কর ভাষ্য, রামানুজের শ্রীভাষ্য, রামমোহনের গ্রন্থাবলী মনোনিবেশ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আলোচনা করুন, আত্মহারা হইয়া স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া যাইবেন। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান পাঠ করিতে করিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সোপেনহয়ার (Schopenhauer) আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"In the whole world there is no study except that of the original (of the Upanishads), so beneficial and so elevating as that of the

Oupnekhat (Persian translation of the Upanishads) It has been solace of my life, it will be solace of my death,"

কত পাশ্চাত্য মনীষী ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন তাহার কে ইয়ত্তা করে?

কিন্তু হায়, আমরা আমাদিগের এই সব মুক্তিপ্রদ অমূল্য গ্রন্থাবলী পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যদেশের লঘু ফাঁপা ফোলা অন্তঃসারশূন্য সাহিত্য পাঠে মাতোয়ারা হইয়া লঘুচিত্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন হইয়া যাইতেছি।

এই পুণ্যভূমি ভারত ধর্ম্মের এক মহা সমন্বয় ক্ষেত্র। এই ভারত ভূমিতে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান, পারসিক, তান্ত্রিক, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, ব্রাহ্ম কত ধর্ম্ম সম্প্রদায় একত্র মিলিয়া মিশিয়া নির্ব্বিবাদে বসবাস করিতেছে। এখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষণ নাই। এখানে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানের উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশে Edicts of Nantes-এর ন্যায় কঠোর লোমহর্ষণ ধর্ম্মানুশাসন অনুষ্ঠিত হয় নাই।

আমি আপনাদিগের নিকট বাণের হর্ষচরিত হইতে এই ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের একটী উজ্জ্বল চিত্র উপস্থিত করিতেছি। রাজা শ্রীহর্ষ আপন বহুসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে তপোবন দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তপোবনের সন্নিকটে আসিয়া "মা ভূত আশ্রমপীড়া" এই কথা স্মরণ করিয়া অনুচরবর্গকে পশ্চাতে রাখিয়া, কয়েকজন মাত্র পার্শ্বচর সহ পদব্রজে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, নানা দেশাগত বহু সংখ্যক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, কেহ আসনোপরি, কেহ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডোপরি, কেহ লতাকুঞ্জে, কেহ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া আপন আপন সাধনে নিযুক্ত আছেন। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই দেখিতে পাইলেন শত শত শ্বেতাম্বর, দিগম্বর জৈন, পরিব্রাজক, ভিক্ষু, ভাগবত, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, সাংখ্য, বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, লোকায়িত, সেশ্বরবাদী, তান্ত্রিক, নিজ নিজ সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেহ বা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, কোথাও শাস্ত্র বিচার হইতেছে। কিন্তু কোথাও বিবাদ নাই, বিসম্বাদ সংঘর্ষণ বা উদ্ধত্য নাই। সকলেই শান্তচিত্তে, সানন্দে পরস্পরে মিলিয়া আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া শান্তিতে কালযাপন করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ যোগ বা প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ যোগে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাও এই ধর্ম্ম সমন্বয়ের কিছু আভাস পাইয়াছেন।

আজিও যদি এই ধর্ম্মপ্রবণতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় পাইতে চান তাহা হইলে পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত নগর ছাড়িয়া সুদূর পল্লীগ্রামে প্রবেশ করুন, দেখিতে পাইবেন কৃষকগণ সারাদিন মাঠে কঠিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যা সমাগমে একত্র সমবেত হইয়া একমনে ভাগবত শ্রবণ করিতেছে, না হয় ভক্তি সহকারে কথকতা শ্রবণ করিতেছে, না হয় সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে শান্ত স্নিগ্ধ পল্লীগ্রামকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে।

অতি দীন হীন অজ্ঞ ভারতবাসীও ঈশ্বরকে চিনে। আপনার দুরদৃষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া মঙ্গলময় বিধাতার উপর নির্ভর করে। শত প্রকার অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াও ভগবানের দোহাই দেয়। ভক্তিহীন হইয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করে না। কোন্ দেশের এই শ্রেণীর লোক এতটা ঈশ্বরবিশ্বাসী? শুনিয়াছি বিলাতে একবার জনৈক পাদ্রী ধর্ম্মপ্রচারার্থ একটী কয়লার খনিতে গিয়া খনির কোনও মজুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "Do you know Jesus Christ?" সে ব্যক্তি মনে করিল, পাদ্রি সাহেব বোধ হয় কোনও মজুরের সংবাদ জানিতে চান, তাই প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিল "What number please?" অর্থাৎ কোন নম্বরের লোককে চান? নম্বরটা জানিলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি।"

আপনারা কি কল্পনা করিতে পারেন, ভারতে এমন একটী লোক আছে যে ঈশ্বরের নাম জানে না?

তাই আবার বলি, ভারত ধর্ম্মের এক মহা সম্মিলন

ক্ষেত্র। এখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সংঘর্ষণ নাই, দ্বেষ নাই, দ্বেষ নাই, বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই। কারণ ভারতবাসী জানেন—

"স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়নাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাম্ নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে।" যেমন প্রবহমানা সমুদ্রগামী নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়, তাহাদের কোন বিশেষ নাম বা রূপ থাকে না, এক সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, তেমনি এই যে নানাধর্ম্ম ও নানা মত দেখা যাইতেছে, তাহারাও সকলে কেহ ঋজু গতিতে কেহ বক্র গতিতে গমন করিয়া সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণে গিয়া মিলিত হইতেছে, সেখানে তাহাদের কোনও ভেদাভেদ থাকে না, এক হইয়া যায়।

ইহাই ভারতের ধর্ম্ম সমন্বয়ের মূল মন্ত্র। ইহা হইতেই ভারতে এক অখণ্ড মানবত্ব প্রচারিত হইয়াছে। তুমি, আমি, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, রাজা প্রজা সকলেই এক। সকলেই সেই অখণ্ড মানবত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশ মাত্র। যেমন জলবুদ্বুদ সকল একই জল হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া পরে তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া এক হইয়া যায়, কোন বিভিন্নতা বা পার্থক্য থাকে না, তেমনি এই যে বিভিন্ন আকারের মানব সমূহ দেখিতেছি তাহারাও এক অখণ্ড মানবত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তে তাহাতেই মিলিয়া যাইতেছে, কোথাও কোনও ভেদ নাই, পার্থক্য নাই।

আজ আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যময় আপাত-মধুর আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছি। এই আদর্শ আমাদিগের আত্মম্ভরিতা উদ্দীপ্ত করিয়া, আমাদিগকে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রলুব্ধ করিয়া আমাদিগের মধ্যে শত প্রকার ভেদবুদ্ধি আনয়ন করিয়া দিতেছে।

এই স্থূল ধর্ম্মহীন দেহসর্ব্বস্ব আদর্শ হইতে আমাদের মুখ ফিরাইতে হইবে। আমাদিগকে আবার উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। আমাদিগকে জাগ্রত হইতে হইবে। আমাদিগকে আবার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একতা আনিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণতা ভিন্ন ঐক্যলাভের উপায় নাই। তাই আবার বিশেষ ভাবে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম সাধন দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণতা লাভ করিয়া একতা আনিতেই হইবে। এই ঐক্য ভিন্ন আমাদের এই প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সেই জন্য ভারতের ইতিহাস—প্রকৃত ইতিহাস—ভাল করিয়া পাঠ করিবার জন্য আপনাদিগকে বার বার অনুরোধ করিতেছি।

আপনাদিগের নিকট এই ঐক্যের এই একপ্রাণতার কথা বলিতে বলিতে বৈদিক ঋষি সংবননের আশীর্ব্বাদমন্ত্র আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার প্রাণকে আলোড়িত করিতেছে।

ঐক্যমন্ত্রের ঋষি ভারতে একতা আনিবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—

সমানী বঃ আকূতি
সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মন
যথা যুঃ সুসহাসতি।

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।

ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

* নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়ের সভাপতিত্বে দেরাদুন বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

হিন্দুর দুর্দ্দিনে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে সকল জাতিকে আপনারা নিম্নজাতি বলেন, তাহাদিগের মধ্যে কন্যাকর্ত্তারই পণ পাইবার নিয়ম আছে। কারণ ঐ সকল জাতির মধ্যে কন্যার সংখ্যা বরের সংখ্যা অপেক্ষা কম। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যেরূপ ত্যাগস্বীকার, মহাপ্রাণতা ও সত্যপ্রিয়তা দেখিয়াছি তাহা ইংরাজি-শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মধ্যে দুর্লভ। ইহাদিগের মধ্যে পুরুষগণ অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিবাহ করিতে পারিত না। ফলে নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছিল। আমার তলট গ্রামে জালিক এবং নমঃশূদ্রের সংখ্যা গত ৫০।৫৫ বৎসরের মধ্যে বার আনা কমিয়াছিল। আমি কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়া ইহাদিগের সমাজপতিগণের নিকট অঙ্গীকার লইয়াছিলাম যে, ইহারা ২০০৲ ২৫০৲ টাকা স্থলে ৫০ ও ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ পণ লইবে না। সে প্রতিজ্ঞা ইহারা পালন করিতেছে। আজি সাঁথিয়া ও সাহাজাদপুর থানার অন্তর্গত বহুগ্রামের জালিক ও নমঃশূদ্রগণ ৫০।৫০৲ টাকার উর্দ্ধ পণ লইতেছে না। তাহাতে অনেকের বিবাহ করা অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছে। আমি শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, এই প্রথা অন্যত্রও ক্রমে প্রচলিত হইতেছে। এইরূপে আপনারা দশ বৎসরের মধ্যে কতগুলি হিন্দুবালক পাইবেন তাহা বিবেচনা করুন। ইহাতে জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে কিনা? নিশ্চয়ই হইবে। যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবশতঃ রাজসাহী ও নদীয়া জেলার অন্তর্গত মরিচারদিয়াড় নামক স্থানের ইংরজী অনভিজ্ঞ মহাপ্রাণ স্বর্গগত আংম কবিরাজ ন্যূনাধিক ৭০ বৎসর পূর্ব্বে অসীম শক্তিশালী রাজবলে বলীয়ান্ নীলকরদিগের কুঠি এক বৎসর মধ্যে প্রায় সমস্ত বাঙ্গালাদেশ হইতে উঠাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে অটল প্রতিজ্ঞা ইংরাজীনবিসগণ কোথায় পাইবে? তাহারা দেহে ও মনে অধঃপতিত। তথাকথিত নিম্নজাতীয়গণের সমাজের যে ত্যাগ স্বীকার ও মহাপ্রাণতা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদিগের সহিত নানারূপ ব্যবহারে স্বয়ং বুঝিতে পারিয়াছি, তথাকথিত উচ্চবর্ণ মধ্যে তাহা বিরল, অন্ততঃ এইসকল বর্ণের ও জাতির "বিষয়ী" ইংরাজি নবিস গণের মধ্যে তাহা দুর্লভ। ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজে বরপণ গ্রহণ প্রথার অত্যাচার কমাইবার চেষ্টা করিয়া আমি অকৃতকার্য্য হইয়াছি। কেন হইয়াছি, তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন।

এক্ষণে, উপায় যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ করুন। বিবাহ বিষয়ক নিয়মাবলীর সংশোধন না করিতে পারিলে, জন্মের সংখ্যা বাড়াইতে পারিবেন না। হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মকেও রক্ষা করিতে পারিবেন না। এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করুন, বহু অপত্য বিশিষ্ট দীর্ঘায়ুঃ সুস্থ সবল চরিত্রবান, ধার্ম্মিক বংশের মধ্যে বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করুন। অন্যেরা হেয় হউক; উহারাই শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া গণ্য হউক।

দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন বিধবাদিগের বিবাহ সম্প্রদান। কেহ কি অস্বীকার করিতে পারেন যে ইহাদিগের বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে জন্মের সংখ্যা নিশ্চিত বৃদ্ধি হইবে। এতদ্দেশীয় ক্ষীয়মান হিন্দু সমাজের জনসংখ্যা ত বৃদ্ধি করিতেই হইবে। সন্তানধারণক্ষমা বিধবাগণের পুত্রহীনতার কথা একবার হৃদয়ঙ্গম করুন। ইঁহাদিগের বিবাহ দিলে দশ বৎসর মধ্যে কতগুলি হিন্দুশিশু পাইয়া আপনাদিগের হিন্দুসমাজ জনবলে বলীয়ান হইতে পারে তাহা একবার চিন্তা করুন। যদি করেন, তবে আপত্তি করিবার প্রবৃত্তি হইবে না। নির্ম্মূল যখন হইবই না, তখন এ সকল পন্থা অবলম্বন না করিয়া উপায় কি? প্রাচীন

স্মৃতিতে ইহার ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে সকলেই জানেন। এ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে যেমন হিন্দুজাতির মধ্যে জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই, তেমনই অশেষ দুরাচার, অধর্ম্মাচরণ, ব্যভিচার ও ভ্রূণ-হত্যা হইতেও সমাজকে রক্ষা করা যাইবে। কিন্তু তিনি কোথায়, সেই মহাপ্রাণ, পরদুঃখ কাতর, হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ শঙ্কায় অতিমাত্র ব্যাকুল, হিন্দুজাতির রক্ষাকল্পে সহস্র নিন্দা, সহস্র উৎপীড়ন মৃদু কুসুমবর্ষণের ন্যায় মাথা পাতিয়া সহাস্য বদনে গ্রহণক্ষম? সেই মহাপুরুষ কোথায়, যিনি ঈদৃশ কল্যাণকর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবেন, যাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক ব্যথা বজ্রনিনাদে মুখগহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া হিন্দু সমাজকে, মৃত পর্য্যসিত হিন্দু সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, পুনরায় জনবলে বলীয়ান ও ধর্ম্মবলে পবিত্র করিবেন? হায়! কে আমাদিগকে এই সঙ্কটের দিনে রক্ষা করিবে? কিন্তু এ কার্য্য ত হওয়াই চাই; ইহা করিতেই হইবে।

আমি জানি, বিধবা বিবাহ প্রথা সমাজের স্ত্রী পুরুষ সংখ্যা অনুসারে কল্যাণকর এবং অকল্যাণকর হইয়া থাকে। যে সমাজে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজে অনেক স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকিবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। তাহার উপর যদি ঐ সমাজে বিধবাগণ বিবাহ বাসরে অবতীর্ণ হইয়া কুমারীলভ্য বরকে আকর্ষণ করেন, তবে কুমারীগণের বিবাহ হওয়া আরও কঠিন হইবে, সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কা এবং বিগতযৌবনা অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা অবশ্যই আরও বর্দ্ধিত হইয়া ব্যভিচার ভ্রূণ-হত্যা বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি বৃদ্ধি করিবে ব্যতীত হ্রাস করিবে না। ইহা সমাজতত্ত্বের সামান্য বিধি। ইউরোপীয় সমাজের দিকে এবং এসিয়ারও পূর্ব্বাঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ ইউরোপীয় খৃষ্টান সমাজ হইতে এ বিষয়ে গুরুতর রূপে বিভিন্ন। প্রথমতঃ খৃষ্টান সমাজে বিধবা বিবাহের প্রতি পুরুষানুক্রমিক বিতৃষ্ণা নাই, কিন্তু হিন্দু সমাজে তাহা আছে। সুতরাং এতদ্দেশে বহু বিধবা স্বভাবতঃই বিবাহিতা হইতে অনিচ্ছুক হইবেন। তথাপি যাঁহারা সম্মত হইবেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গর্ভে ত্রিশ বৎসরে আমরা ছয়টী অপত্য লাভ করিলে ঐ কাল মধ্যে আমাদিগের সমাজে কত সহস্র সহস্র হিন্দু লাভ করিতে পারিব তাহা একবার বিবেচনা করুন। এ লাভ ক্ষীয়মান হিন্দুসমাজ উপেক্ষা করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশে গর্ভধারণক্ষমা বিধবার সংখ্যা ইউরোপীয় দেশ সমূহের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং এ স্থানে বিধবা বিবাহের কুফলও ঐ সকল দেশ অপেক্ষা অনেক কম হইবে। সে পরিমাণ হইবে তদপেক্ষা উপকারের মাত্রা অনেক বেশী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তৃতীয়তঃ এতদ্দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় হিন্দুসমাজ যেরূপ জনশূন্য হইতে বসিয়াছে, তদ্রূপ ইউরোপে দেখা যায় না; বরং ইউরোপীয়গণ ম্যালেরিয়া পীড়াকে স্বচেষ্টায় দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। আমাদিগের স্বচেষ্টায় তদ্রূপ করা অসম্ভব; রাজশক্তি ত কোনদিনই এ দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পায় নাই। চতুর্থতঃ আমাদিগের সমাজে পণপ্রথার অত্যাচারে অনেকের বিবাহ করাই অসাধ্য হইয়াছে; এবং অনেকে বিবাহ করিলেও এতদূর ঋণ জালে জড়িত হইতেছেন অথবা কুটুম্বকে জড়িত করিতেছেন যে তাহাতে সমাজ মধ্যে ক্রমে অন্ন বস্ত্রের অভাব উপস্থিত হইয়া লোক রুগ্ন, সন্তানজননে অপেক্ষাকৃত অক্ষম ও অল্পায়ু হইতেছে। ইহাতেও হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। পঞ্চমতঃ এতদ্দেশ হইতে সসাগরা পৃথিবীর বণিকগণ বর্ষে বর্ষে প্রচুর শস্য সম্ভার অন্যত্র লইয়া যাইতেছে; আমরা অন্নাভাবে মৃতকল্প হইলেও বহির্বাণিজ্যের অবাধতা ক্ষুণ্ন হইতেছে না; এতদ্দেশীয় ধনরত্ন বর্ষের পর বর্ষ এইরূপ দীর্ঘকাল অবাধে অন্যদেশে নীত হইতেছে —তাহার বিনিময়ে আমরা উল্লেখযোগ্য কল্যাণকর বস্তু প্রায় কিছুই পাইতেছি না। ইহাতে আমরা ক্রমে নির্ধন নিরন্ন ও বিবস্ত্র হইয়া শীতাতপে ক্রমে প্রায় জীবনীশক্তিহীন হইতেছি; অবশেষে পীড়া আসিয়া আমাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় দিতেছে। এক ম্যালেরিয়া জ্বরেই বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ১৩ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ঈদৃশ শোচনীয় বাণিজ্য-পীড়ন, অবাধ

বাণিজ্যের বিনিময়ে ঈদৃশ দৈন্য দারিদ্র্য ইউরোপে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল এবং আরও নানাবিধ হেতু বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা ত ইউরোপে নাই। ইউরোপীয় সমাজ হইতে আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজ অতিমাত্র বিভিন্ন। সুতরাং সে দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা কিছুই মীমাংসিত হইতে পারে না। আমাদিগের সমাজে এরূপ বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলন করিলে সমাজের কল্যাণই হইবে, ইহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীয়মান হইতে পারে।

দেশের এবং সমাজের অবস্থা বিবেচনাতেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত। প্রাচীনকালে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; উহা সমাজের মঙ্গলই সাধন করিয়াছে। তৎপরবর্ত্তীকালে বোধ হয় নানাবিধ কারণবশতঃ উহা সমাজের কল্যাণকর হইল না। চিরস্বাধীনপ্রকৃতি, দেশকাল; সমাজভক্ত হিন্দু তখন উহা নিষিদ্ধ করিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অবস্থানুসারে ঐ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করতঃ হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আর, তদ্রূপ করিবার ক্ষমতাও ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইয়াছে—

চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যদ্ ব্রূয়ুর্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্তু সহস্রশঃ॥

পরাশর সংহিতা ৮।১৫

আপনারা বেদাভ্যাস করিলেই এ অধিকার আপনাদিগেরই। এ সকল অধিকার পরিচালন না করিলে এই মরণোন্মুখ জাতিকে রক্ষা করা অসাধ্য বলিলেই হয়। যাঁহারা মনে করেন এ প্রথা শাস্ত্রবিধির অনুমোদিত হইলেও কার্য্যতঃ উহা প্রচলিত ছিল না, আমি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের ৯ম অধ্যায়ের ১৯১ সংখ্যক শ্লোকটী তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব :—

দ্বৌ তু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়াধনে।
তয়োর্যদ্‌যস্য পিত্র্যং স্যাত্তৎ সচ গৃহ্ণীত নেতরঃ॥

মনু ৯।১৯১

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, বিধবা নারীর তদবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব সময়ের অর্থাৎ প্রথম পতির ঔরসজাত পুত্রের সহিত পরবর্ত্তী পতি-জাত পুত্রের ধনাধিকার সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে এইরূপ বিধান করা হইয়াছিল যে, যে পুত্রের যে পিতা সেই পিতার ধনে সে পুত্র অধিকারী হইবে; একের পিতার ধনে অন্যের পুত্র অধিকারী হইবে না, যদিও উভয় পুত্রই এক মাতার গর্ভ হইতেই জাত হইয়াছে। ঈদৃশ ব্যবস্থা বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকার সুষ্ঠু প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যাহা হউক বিতণ্ডা করিবার সময় এবং অবসর হিন্দুজাতির আর নাই। যাঁহারা লোপ হইতে চলিল তাহাদিগের বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করা মহাপাপ। তথাপি কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিধবা বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া তর্ক উপস্থিত করেন; এবং বৃহন্নারদীয় বচন ও তদনুরূপ অন্য পুরাণের বচন দ্বারাও ঐ মত সমর্থন করেন। আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি, পণ্ডিতও নহি। তথাপি ঐ বৃহন্নারদীয় শ্লোক চতুষ্টয় আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিব। এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা, অনুরূপ অন্য বচন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধিনৌ॥
মহা প্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যান্ আহু র্মনীষিণঃ॥

বৃহন্নারদীয়ং ২২।১২—১৫

বোম্বাই হইতে সায়ন ও মাধবাচর্য্য কৃত টীকা সহিত যে পরাশরে সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ১৩৭ পৃষ্ঠায় "ইমান্ ধর্ম্মান্......এই পংক্তির পরিবর্ত্তে দুইটী পংক্তি দৃষ্ট হয়:—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

এ স্থলে মহামহোপধ্যায় পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য টীকা করিতেছেন যে "ইমান্যুপরিতনানি কুত্রত্যা নীতি সম্যক্ ন জ্ঞায়তে। হেমাদ্রৌ আদিত্য পুরাণাস্বর্গতানীতি মদন পারিজাতে সারসংগ্রহস্থানীতি ক্বচিৎ দেবলবচনানীতি চোক্তম্। মূলং তু ন কুত্রাপি দৃশ্যতে।"

অন্যান্য অনুরূপ বচন যাহা আছে তাহাতেও প্রায় এই প্রকার ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে।

"দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ" এই বাক্য দ্বারা কি সর্ব্বপ্রকার বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে? না, কখনই নহে। অক্ষতা বিধবার অর্থাৎ শিশু বিধবার অথবা বালিকা বিধবার বিবাহ ত নিষিদ্ধ হয় নাই। কন্যার বিবাহ মাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহাও হয় নাই। কন্যার দান মাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে দেশে শাস্ত্রোক্ত কন্যাদানই নাই, সে দেশস্থ সামাজিকগণের এ নিষেধ বাক্য লইয়া বাড়াবাড়ি করা ভাল দেখায় না। অন্য বিবাহ ত নাই-ই। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের কথা স্মরণ করিলে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্ম বিবাহও এক্ষণে আর নাই। "শ্রুতিশীলবান্" বর যে দিন এদেশ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে সেই দিন হইতেই ব্রাহ্ম বিবাহও শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বৃহন্নারদীয় বচন উদ্ধার করিবার কোন অর্থ নাই। তথাপি এক্ষণে দেখা যাউক, এই নিষেধ বাক্য প্রমাণ্য কিনা? ইহা উপপুরাণ বাক্য। সকল পুরাণের প্রমাণই স্মৃতির নিকট হেয়, যদি এতদুভয়ে দ্বেষ উপস্থিত হয়। স্মৃতিতে যে আচার সমর্থিত হইয়াছে পুরাণ তাহা নিষেধ করিলে ঐ নিষেধ অমান্য করিবার ব্যবস্থা স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসই দিয়াছেন। এস্থলে ব্যাসদেবের বাক্য স্মরণ করুন।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং হি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরাঃ॥

যদি বলেন দ্বৈধ হয় নাই, বৃহন্নারদীয় বচন একটী বিশেষ বিধি; সুতরাং এরূপস্থলে পুরাণ প্রমাণ হেয় নহে। তথাস্তু। বিশেষ বিধিই হউক। কিন্তু কাহার বিধি? গ্রন্থকার বলিতেছেন মনীষীদিগের। এ মনীষী কাহারা? তাঁহারা ঋষি অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রকার হইলে সে কথা স্পষ্ট বলা গেল না কেন? গ্রন্থকার স্বয়ং নিষেধ করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন, অপরে নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাতে ঐক্য কি •অনৈক্য• হইতেছেন, তাহা ত বলেন নাই। যদি স্বীকার করি, তিনি ঐক্য হইয়াছেন তাহাতেই বা কি? বাস্তবিক ত ঐ বচনোল্লিখিত আচরণ করিতে নিবৃত্ত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় দেশাচার ত ঐ বৃহন্নারদীয় নিষেধ বচন কখনও পালন করে নাই। কলিযুগেই অদ্য হইতে ৩৪ শত বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুসমাজের বিশাল বৈশ্যজাতি সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিয়া ভারতীয় পণ্যসহ ভারতীয় সভ্যতা রোম, গ্রীস্, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি সুদূর জনপদে বিস্তার করতঃ গৌরবান্বিত হইয়াছে। অদ্যাপি বহু হিন্দু সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করতঃ ব্রহ্মদেশে নানা প্রয়োজনে যাতায়াত করিতেছে। কতিপয় শতাব্দি পূর্ব্বেও যবদ্বীপ, মগধদেশে গমন করতঃ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দুর কীর্ত্তিধ্বজা সগর্ব্বে প্রোথিত করিয়াছে। তাহাদের জাতিচ্যুত হইবার কোন ইতিহাস অথবা কিম্বদন্তীও নাই। বর্ত্তমানেও ব্রহ্ম দেশবাসীদিগকে আপনারা জাতিচ্যুত করিতেছেন না। উড্রদেশে এখনও ব্রাহ্মণেতর সমস্ত হিন্দুসমাজে "দেবরেণ সুতোপত্তি" নিবৃত্ত হয় নাই। আমি অবগত হইয়াছি যে নেপালে এখনও অসবর্ণা বিবাহ হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈদ্যকায়স্থে বিবাহকে সবর্ণ বিবাহ বলিতে পারেন না। সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ বৃহন্নারদীয় নিষেধ হিন্দুর দেশাচার কখনও স্বীকার করিয়া লয় নাই। উদ্ধৃত নিষেধ সকল নানা ভাষায় নানারূপে একাধিক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মাধবাচার্য্য উঁহার মূল কোথাও খুঁজিয়া পান নাই। স্মৃত্যর্থসারে বিষ্ণুপুরাণে এবং বায়ুপুরাণে এই সকল এবং সুরাপানও কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে। সে সকলই কি আমরা মানিতেছি? মানা না মানা যদি ইচ্ছাধীন হইল তবে সে ক্ষেত্রে ঐ মূলহীন অজ্ঞাত "মনীষী"র অথবা "মহাত্মা"র নিষেধের দোহাই দিয়া বর্ত্তমানে

লুপ্তপ্রায় হিন্দুজাতিকে লোকবলে বলীয়ান্ করিবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করা সমীচীন হইতে পারে না।

তৃতীয় পরিবর্ত্তন বিজ্ঞানশাস্ত্রানুমোদিত এবং প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেরও ব্যবস্থা-সঙ্গত, উহা অসবর্ণা বিবাহ। জীবতত্ত্ব প্রমাণ করিতেছে—যে দীর্ঘকাল এক রক্ত বিবাহসূত্রে পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হইলে উত্তরবংশীয়গণ দুর্ব্বল ও জীবনীশক্তিতে ক্ষীণ হইয়া যায়। এ নিমিত্ত সময় সময় বি-সমে রক্তের সংমিশ্রণ হওয়া আবশ্যক। বাথানের পশুপালকগণ, ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এ নিয়ম সমস্ত জীব শ্রেণীতেই পরিব্যাপ্ত। প্রটোজোয়া হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেই ন্যূনাধিক এ নিয়মের অধীন। স্ব-গোষ্ঠীর কিংবা স্ব-গোত্রের কিংবা স্ব-শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ তুল্য ধর্ম্ম বিশিষ্ট। উহারা বহু পুরুষ পরম্পরায় মিশ্রিত হইলে জাতকের দেহযন্ত্রে একটা অবসাদ আসে। তাহা দুর্ব্বলতার, জননশক্তি হীনতার এবং অল্পায়ুত্বের একটী গুরুতর কারণ। পক্ষান্তরে, অতিশয় বি-সম শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইলেও জাতকের দেহযন্ত্রে নানাবিধ পীড়ার, অস্থায়িত্বের এবং অসামঞ্জস্যের লক্ষণ দেখা যায়। ইহাও অধঃপতন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতীয় ফিরিঙ্গি গণকে, আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশস্থ মুলেটোদিগকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উভয় পন্থাই সমাজের অকল্যাণকর। এক্ষণে দুর্ভাগা মানব জাতির আত্মরক্ষার উপায় কি? জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, উভয় নিয়মই প্রয়োজন বশতঃ পর্য্যায়ক্রমে অথবা যুগপৎ সমাজ মধ্যে প্রচলিত থাকিলে উভয়েরই অমঙ্গলজনক ফল হইতে সমাজকে রক্ষা করা যাইতে পারে। যখন দীর্ঘকাল অন্তর্জ্জাতীয় বিবাহ প্রচলিত থাকার ফলে সমাজে অবসাদের লক্ষণ সকল সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, তখন ঐ প্রথা পরিবর্ত্তন করতঃ সমাজে বহির্বিবাহ প্রচলন করা আবশ্যক। কিন্তু বহির্বিবাহ ক্ষেত্রে ইহাই দেখিতে হয় যে অত্যন্ত বিভিন্ন ও বিষম শুক্র শোণিত যেন মিশ্রিত করা না হয়। বর কন্যা নিতান্ত বিষম ধাতু না হইয়া অল্পমাত্র বিষম ধাতু হওয়া আবশ্যক। আবার যখন এইরূপ বহির্জ্জাতীয় বিবাহেরও কুফল সকল সমাজ মধ্যে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তখন পুনরায় অন্তর্জ্জাতীয় বিবাহ প্রচলিত করা উচিত। অধ্যাপক টম্‌সনের মতে ঈদৃশ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না করিলে সমাজ অবসাদ ও অধঃপতনের হস্ত হইতে রক্ষা করা যায় না। তিনি বলেন :—

The establishment of a successful race or stock requires the alternation of inbreeding (endogamy সবর্ণবিবাহ) in which characters are fixed and periods of out breeding (exogamy অসবর্ণবিবাহ) in which by the introduction of fresh blood new variations are produced.

Thomson's Heredity, p, 537.

প্রায় এক ধাতুতে গঠিত হইতে হইতে দেহযন্ত্র যখন এক ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, তখনই বিভিন্ন ধাতুর উপকরণ দ্বারা দেহগঠন করা আবশ্যক হয়। তাহাতে জাতকের দেহে নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়া জাতক নববলে বলীয়ান হয়। এইরূপে নূতন পরিবর্ত্তনের সূচনা না করিতে পারিলে কালক্রমে সমাজস্থ জনগণ জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহার ধ্বংস প্রাপ্তি কেবল কিছুদিন অগ্র পশ্চাতের কথা মাত্রে পরিণত হয়। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট জড়তার, উদ্যমহীনতার ও জীবনীশক্তির ক্ষীণতার অন্য যত কারণই থাকুক না কেন, অন্তর্জ্জাতীয় বিবাহ প্রথার দীর্ঘকাল প্রচলনও এ সকলের একটা গুরুতর কারণ কিনা তাহা আপনারা ধীরতার সহিত বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবেন। জীবন মরণ সমস্যার মধ্যে পতিত হইলে জেদ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত মত বহাল রাখিবই, ঈদৃশ ভাব কখনই হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে কোনরূপ গবেষণা না করিয়াই যে পূর্ব্বকালে সবর্ণা বিবাহের সহিত অসবর্ণা বিবাহও প্রচলনেরও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে ঐ দ্বিবিধ বিবাহ অনুষ্ঠানেরই ব্যবস্থা দেখা যায়।

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

মনু ৩।১২

এ স্থলে দেখিবেন যে মনু মহারাজ সবর্ণা বিবাহ এবং অসবর্ণা বিবাহ যুগপৎ অনুষ্ঠিত হওয়াই মত দিতেছেন। জীবতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক টমসনের যে মত আপনাদিগকে এই মাত্র বলিলাম, তাহাতে অধ্যাপকবর পর্য্যায়ক্রমে এতদুভয় প্রকার বিবাহ সমাজে প্রচলনের ব্যবস্থা দিতেছেন। ফলতঃ এক্ষণে ঐরূপ কোন প্রথা অবলম্বন করতঃ আমাদিগের এই অবসন্ন হিন্দু সমাজে নবরক্তের সহিত নূতন বল সঞ্চার করিতে না পারিলে ধরিত্রী যে আর দীর্ঘকাল আমাদিগের হিন্দুজাতির ভার বহন করিবেন, এ কথা কোন মতেই বলা যায় না। ইহা সত্ত্বেও হিন্দুজাতির ও হিন্দুসমাজের হিতৈষী সমাজপতিগণ এ বিষয়ে অন্ততঃ একটা মীমাংসা করিবার জন্যও কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিবেন কিনা তাহা আমার বলা সম্ভবপর নহে। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে সাহস করিব যে, উপরি উদ্ধৃত বৃহন্নারদীয় বচনের আপেক্ষিক প্রামাণ্য অতি কম; অন্ততঃ উহার প্রামাণ্য এত অধিক নহে যে ঐ বচনকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়া আমরা একটা যুগযুগান্তর গত গৌরবান্বিত হিন্দুজাতির ধ্বংস অথবা অত্যন্তাভাব অবিচলিত চিত্তে নীরবে দেখিতে পারি। এ মরণদৃশ্য, এ বিশাল জাতি বিলোপ যাহার মনশ্চক্ষুতে নিদারুণ শেলসম বিদ্ধ হয় না, যাহার হৃদয়কে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না, যাহার কর্ম্ম প্রবৃত্তি একটুও উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। আপনাদিগের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ দেশ হিতৈষী সমাজবন্ধু মহোদয়দিগকে আমি দাবি করিয়াই বলিতে পারি, আপনারা এ বিষয়টীর একবার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করুন। মীমাংসা যেরূপ সঙ্গত হয় তাহা করিবেন। আর যদি আপনারা আমার সহিত একমত হইতে পারেন, তবে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এই মৃত-কল্প জাতিকে এবং লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হউন। অসবর্ণ বিবাহের সঞ্জীবনী শক্তি যদি প্রত্যক্ষ করিতে চান তবে এতদ্দেশীয় মুসলমান সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহারা কে? পণ্ডিতবর রিজলী প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা হইতে জানা যায় যে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ মুসলমানদিগের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিল। ইহারা অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর জাতি ছিল; অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ কায়স্থও ছিল। ঐ সকল হিন্দু বঙ্গে পাঠান আধিপত্য সময়ে এবং মোগলাধিপত্য সময়ে এবং অদ্যাপি ইংরাজাধিপত্য সময়েও নানা কারণে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং করিতেছে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও তাহারা পুরুষানুক্রমিক আচার ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে নদীয়া ও যশোহর জেলার অনেক হিন্দু কৃষক খ্রীষ্টান হইয়াছে কিন্তু তথাপি পূর্ব্বপুরুষগত কালী পূজা ছাড়ে নাই। বঙ্গের পাঠান মোগলের আধিপত্যের দিনেও এই রূপই হইয়াছিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও সেকালের হিন্দুগণ কখনও সর্ব্ব বিষয়ে মুসলমান হয় নাই। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও হইয়াছিল না। উহাদিগের বংশধরগণ ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পল্লীগ্রামে প্রায় কেহই গোহত্যা কিংবা গোমাংস ভোজন করিত না; অধিকাংশই বস্ত্র পরিধান করিতে পৃষ্ঠ দিকের কাছা পরিত্যাগ করে নাই বা এখনও অনেকেই কাছা দিয়া থাকে। ইহাদিগের উত্তরাধিকার হিন্দুর ন্যায়ই চিরদিন ব্যবস্থিত হইত; কোরাণ সরিফের ফরজমত হইত না। অর্থাৎ হিন্দুর ন্যায় পুত্রই ওয়ারিশ হইত; কন্যা মাতা ভগিনী ইত্যাদি কোন অংশই পাইত না। ইহারা হিন্দুর পূজার পর্ব্বে মুক্তহৃদয়ে মহানন্দে যোগদান করিত। আমি চিরদিন এইরূপই দেখিয়াছি। সুতরাং ইহারা প্রায়ই হিন্দু ভাবাপন্নই ছিল। কিন্তু যখন ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তখন হিন্দুর (একজাতি নহে) বহু জাতীয় ব্যক্তিগণ ঐরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। আর গ্রহণ করিবার পর সকলেই এক জাতি হইয়া যায়। সকলেই মুসলমান জাতি হয়। সুতরাং উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইবার আর বাধা থাকে না। যাহারা বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু ছিল তাহারা

মুসলমান হইয়া পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে লাগিল। ইহাই ত অ-সবর্ণ-বিবাহ। প্রথমতঃ ইহার ফলেই এতদ্দেশীয় মুসলমানদিগের জনবল এত বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ইহাদিগের দেহ ও মন হিন্দুর ন্যায় অবসাদ ও জড়ত্বপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহাদিগের বল ও তেজস্বিতা অনেক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ঈদৃশ প্রভেদ অন্ততঃ অংশতঃ অসবর্ণ-বিবাহের ফল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, আমার প্রস্তাবিত বিষয় বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ প্রায় সম, অল্প বিষম শুক্রশোণিত মিশ্রণের অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহের ফলে বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দু সমাজের কল্যাণ হইবে বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। কারণ হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতি মধ্যে দীর্ঘকাল বিবাহ প্রচলিত না থাকায় ইহাদিগের ধাতু কিঞ্চিৎ বিষম হইয়াছে মাত্র।

আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি হিন্দু জাতি জন্মে কম, মরে বেশী। এই শোচনীয় অবস্থার কতিপয় কারণও নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং সে সকল কারণের হস্ত হইতে কি উপায়ে হিন্দু জাতিকে রক্ষা করা যায় তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু এ আখ্যানের সীমা নাই। আর আপনাদিগের অধিক সময় লইতে ইচ্ছা করি না। আমি অদ্যকার আলোচ্য বিষয় প্রথমে যে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তাহার প্রথম বিভাগ জন্ম ও মৃত্যু। সে সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভাগও সংক্ষেপতঃ আলোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ আয়ু ও পীড়া সম্বন্ধেও আর অধিক কিছু বলা আবশ্যক হইবে না। আয়ু প্রধানতঃ বংশানুগত, অর্থাৎ বংশানুক্রমে যে উপাদানে ব্যক্তির দেহ গঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার ধাতু যেরূপ হইয়াছে আয়ুও সেইরূপই হইবে। আকস্মিক কারণে অর্থাৎ বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত প্রভৃতি কারণে অর্থাৎ অপমৃত্যু না হইলে স্বাভাবিক মৃত্যু ব্যক্তির ধাতুর উপর নির্ভর করে। এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে সমাজে পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগণ নানা কারণে দেহে ও মনে অবসন্ন ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছে, সম্প্রতি ৩।৪ পুরুষ হইল ক্রমে দারিদ্র্য এবং অর্থাভাব বশতঃ দেহ পোষণে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে অসমর্থ হইতেছে, সে সমাজে জনগণ অল্পায়ু হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। এতদ্দেশে হিন্দু সমাজ সুদীর্ঘকাল হইতে দেহে ও মনে অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; তাহা আমরা সকলকেই জানি। আমরা উত্তরপুরুষগণ পূর্ব্বপুরুষের সেই অবসন্নতার ফলভোগ করিতেছি। আমাদিগের জীবনী শক্তি ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে। আমার এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলও আমি ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থাপিত করি। উহা সম্মিলনের বার্ষিক বিবরণীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। আমি দেখাইয়াছি যে তিন পুরুষ মধ্যেই হিন্দুর আয়ু অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে ও জাপানে গত ৫।৬ পুরুষের মধ্যে আয়ু বৃদ্ধি হইয়াছে। এই তুলনা হইতেই আমাদিগের অবস্থা বুঝিয়া লইবেন। ফলতঃ হিন্দু জাতির পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য অপরে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং যে লক্ষ্মী বাণিজ্যে বাস করেন, তিনিও এ দেশকে পরিত্যাগ করায় আমরা এখন অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল। অন্ন বস্ত্রাভাবে আমরা শীতাতপে ক্রমেই অধিকমাত্রায় জীবনীশক্তি হীন হইতেছি। সুতরাং পীড়া আমাদিগের নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছে। অল্পায়ু নিত্য পীড়িত ও হীনবীর্য্য হইবার ফল বংশহানি। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কোন কোন পীড়া স্বভাবতই জননশক্তি ক্ষীণ করে। তাহার উপরেও পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থা পুরুষানুক্রমে সমাগত হওয়ায় আমাদিগের অবস্থা বস্তুতঃই অতিমাত্র সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। সুচিকিৎস্য পীড়াও আমরা অর্থাভাবে চিকিৎসা করিতে পারি না। এ ভীষণ সঙ্কট সময়েও হিন্দু জাতির চৈতন্য নাই, সম্মিলিত চেষ্টা নাই, বরং সম্মিলনের বহু বাধা রহিয়াছে।

আমাদিগের উপরের নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় বিভাগ, অর্থাভাব ও দ্রব্যাভাব।" কৃষি বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়। মনু যাহাকে শ্ববৃত্তি অর্থাৎ কুক্কুরবৃত্তি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে চাকরী বলিতে পারি, তাহা কোন কালেই জন সাধারণকে পোষণ করিতে পারে না, তদ্দ্বারা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অর্থাগম হইতে পারে মাত্র। কিন্তু তাহাও আর সুলভ নহে;

সুতরাং অর্থাভাব সম্বন্ধে আর কিছু না বলিলেও চলে। দ্রব্যাভাব বুঝাও সহজ কথা, অবাধ বাণিজ্যের কল্যাণে এতদ্দেশীয় নিতান্ত আবশ্যক বস্তুসকলও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। যে সময় অন্ন পাইতেছি না, সে সময়ও অন্ন অন্য দেশে নীত হইতেছে। সুতরাং অর্থ থাকিলেও অত্যাবশক দ্রব্য সকল পর-প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে, আমাদিগের অভাব পূরণ করিতে পারিতেছে না। সুতরাং দৈন্য, দারিদ্র্য, দুরবস্থা ও দুঃসময় আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপরেও আমাদিগের উপরিলিখিত পঞ্চম বিভাগ স্মরণ করুন। ঐ বিভাগ, বিলাসিতা। আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অত্যন্ত অধিক বিলাসী হইয়াছি। বিলাসিতা এবং তাহার নিত্য সহচর অনাচার ও অপব্যয় আমাদিগের ভগ্নমন আরও ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; দারিদ্র্য আরও বাড়াইতেছে, পীড়া আরও অধিক পরিমাণে ডাকিয়া আনিতেছে। নিরুদ্যম মনকে আরও উৎসাহহীন ও নিরানন্দ করিতেছে।

কিন্তু নিরানন্দে ত কোন জীবই বাঁচিতে পারে না। সেই ছান্দোগ্য শ্রুতি স্মরণ করুন।

স এষ…মোদমানস্তিষ্ঠতি…
ছান্দোগ্য ৭।১১।১

মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, "স এষ বৃক্ষ-মোদমানো হর্ষং প্রাপ্নুবন্ তিষ্ঠতি।"

যাহার পেটে অন্ন নাই পরিধানে বস্ত্র নাই; যাহার দেহ মন রোগে শোকে ও নিত্য অভাবে অবসন্ন, সে হর্ষ কোথায় পাইবে? তাই আজ উচ্চহাস্য এ দেশ হইতে চিরবিদায় লইয়াছে। সেকালের রসিকতা আর শুনা যায় না। বিখ্যাত রসিকগণ বোধ হয় এখন অন্যদেশে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন—আমাদিগের এই ধূমায়িত মহাশ্মশান তাঁহাদিগের উপযোগী নহে। পাড়াগাঁয়ে বালকেরাও এখন সেই প্রাচীন কালের খেলাধুলা হাস্য কলরব আর করে না। দেশে আনন্দ স্ফূর্ত্তি আর নাই। সুতরাং এতদ্দেশীয়গণের বিশেষতঃ হিন্দুগণের বর্ত্তমান অবস্থায় ধরাপৃষ্ঠে অধিকদিন আর স্থান হইবে না, ইহা বুঝিতে আর বাকী থাকে না।

এ অবস্থায় আমরা কি নীরবে বসিয়া থাকিব? এ ভীষণ সঙ্কট সময়ে সমবেত চেষ্টা ব্যতীত আর ত উপায়ান্তর দেখি না। কিন্তু আমরা সমবেত চেষ্টা করিব কেমন করিয়া? আমরা যে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।" মানুষ যদি নিয়তকাল মানুষকে বলে "যা যা, আসিস না, ছুঁস না ছুঁস না," তবে কি সমবেত চেষ্টা সম্ভবপর হয়? কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও মহা পণ্ডিত ভবিষ্যদ্দর্শী ভাবুক "তৃণের মত সুনীচ" হইয়া অথচ হিমাচলের মত উচ্চ হৃদয়ে কর্ম্মবীরের সৎসাহসে উদ্দীপ্ত হইয়া আচণ্ডাল সকলকেই বক্ষে স্থান দিয়াছিলেন। নদীয়ার গৌর সকলকেই হরিনাম দিয়া একটা বিরাট হিন্দুজাতি গঠন করিয়াছিলেন। যিনি যবন হরিদাসকে ঠাকুর হরিদাসে পরিণত করিয়াছিলেন শাক্যসিংহের ন্যায় তিনিও জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি শাস্ত্রদর্শী ছিলেন। যিনি এই বিরাট হিন্দুজাতিকে একটা বিরাট মহাজাতিতে পরিণত করিয়া শক্তিশালী করিতে চাহেন, একতাই তাহার মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের জন্মগত জাতিভেদ একতার পরিপন্থী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" তখন কি তিনি জন্মগত জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন? গীতার প্রতি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের অগাধ ভক্তি। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা কি কপট ভক্তি নহে? এ অতিভক্তি কিসের লক্ষণ, তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। আমি জানি বৈদিক সময় হইতেই হিন্দুধর্ম্ম বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্মরণ রাখিবেন, শুধু বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বর্ণাশ্রমের উপর। আজিকার দিনে চতুরাশ্রম কি প্রতিপালিত হইতেছে? উত্তরে আপনারা অবশ্যই বলিবেন—"না, হইতেছে না।" আমরা হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ চতুরাশ্রমকে উপেক্ষা করিব, অথচ মুখে বলিব আমরা হিন্দু? এমন করিয়া আপনাকে আত্মবঞ্চিত করিলে কতদিন ধর্ম্মরক্ষা করা যায়? বর্ণাশ্রমই ত হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি। তাহা এমন করিয়া গলা টিপিয়া মারিলে

হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়া চলে না। বৈদিক সময়ে বর্ণভেদ কি জন্মগত ছিল? কখনই না। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তে তৃতীয় ঋকে দেখা যায় যে, ঋষি স্বয়ং স্তোতা, তাঁহার পুত্র ভিষক অর্থাৎ চিকিৎসক ও কন্যা ময়দা-প্রস্তুত-ব্যবসায়ী। ঐ বেদে ৫।২৩।২ এবং ৫।২৫।৫ ঋকে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন যে "হে অগ্নি তুমি এরূপ একটী পুত্র প্রদান কর যে পুত্র সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ হয়।" উক্ত ১১২ সূক্তের ঋষি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার কন্যা ময়দা প্রস্তুতকারিণী বৈশ্য নহে। পুত্র ভিষক্ হইলেও জাতিতে বর্ত্তমান কালের বৈদ্য নহে। পঞ্চম মণ্ডলের উক্ত ২৩ ও ২৫ সূক্তের ঋষি যে সৈন্য পরাজয়কারী পুত্র প্রার্থনা করিতেছেন সে ঋষিপুত্র ক্ষত্রিয় নহে।

আর যদি ঋষি ক্ষত্রিয়ই হয় তাহা হইলেও তাহা জন্মগত জাতিভেদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্য হইতে পারেনা। বেদে ব্রহ্মণ, ব্রহ্ম, বিপ্র, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। মহামহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য বর্ত্তমান সময়ের ব্যক্তি। তাঁহার বিখ্যাত বেদভাষ্যে সর্ব্বত্রই যাস্কের প্রাচীন ব্যাখ্যা সম্মানের সহিত উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই চিরস্মরণীয় পূজ্যপাদ যাস্কের নিরুক্তে ঐ সকল শব্দ বর্ত্তমান অর্থে ব্যাখ্যাত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে ঋগ্বেদ ৬।৭৫।১০ এবং ১৯ ঋক্; ৭।১০৩।৮,ঋক্ ৮। ১১।৬ ঋক্ ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহা হউক আমি বৈদিক সময়ের উল্লেখ আর করিব না। প্রাচীন-স্মৃতিতে কি দেখিতে পাই? প্রাচীন স্মৃতিতে বর্ণ কি জন্মগত? আর জন্মগত হইলেও বর্ত্তমান যুগের ন্যায় অসংখ্য জাতি বিভাগ কি স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত? এতদ্দেশে বৌদ্ধবিপ্লবের পর হিন্দুসমাজ যে ভাবে জাতি গঠন করিয়াছে সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু মানব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পারাশর ধর্ম্মশাস্ত্রে পর্য্যন্ত যুগে যুগে যে সকল স্মৃতির প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হইয়া আসিতেছে তাহাতে আমরা কি দেখিতে পাই? তাহাতে দেখিতে পাই যে বর্ণ জন্মগত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও পরিবর্তন-শীল বলিয়া ব্যবস্থিত। তৎকালে এক বর্ণ দুষ্কর্ম্মফলে অন্য বর্ণ প্রাপ্ত হইত; এবং সৎকর্ম্ম প্রভাবে ও তপো-বলেও পৃথগ্‌বর্ণে গৃহীত হইত। মনুস্মৃতির দশম অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক স্মরণ করুণ।

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষং চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

কুল্লুক ভট্ট এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে তপঃপ্রভাবে জাত্যন্তর প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত স্থলে বিশ্বামিত্রের এবং বীজ প্রভাবের দৃষ্টান্তস্থলে ঋষ্যশৃঙ্গের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, "কৃতত্রেতাদৌ মনুষ্যমধ্যে জাত্যুৎকর্ষ গচ্ছন্তি। অপকর্ষ চ বক্ষ্যমাণ হেতুনা যান্তি॥" এই বলিয়া তিনি ৪৩ হইতে ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ মনুস্মৃতি চারিযুগে সমান আদরণীয়; যদিও পরাশরের মতে মনুস্মৃতি সত্যযুগের সম্বন্ধেই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আপনারা জানেন যে "মন্বর্থ বিপরীতা যা স্মৃতি সা ন প্রশস্যতে।" স্মৃতি এবং পুরাণে অসংখ্য বর্ণ বিভাগ হিন্দুসমাজে ত দেখিতে পাই না। কর্ম্মদ্বারা প্রত্যেক বর্ণই বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইত। গীতা পুরাণ গ্রন্থ। কারণ উহা মহাভারতের অন্তর্গত। গীতা সর্ব্ব উপনিষদেরও সার সংগ্রহ। উপনিষদ শ্রুতি। সুতরাং গীতা একাধারে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের মিলিত সন্ধান পাইবার যোগ্য। আপনারা সর্ব্ব শাস্ত্রের নিদর্শন অগ্রাহ্য করিবেন না। লোকাচার-সকল শাস্ত্রের উপরে নহে বরং নিম্নে। ইহার প্রমাণিকতা শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণের অবিরোধ স্থলে স্বীকৃত হইয়াছে। আমি জানি কোন কোন গৃহ্য সূত্রে এবং কোন কোন স্মৃতিগ্রন্থে দেশাচারকে গ্রামাচারকে এবং কুলাচারকে প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে প্রধানতঃ বিবাহ সম্বন্ধেই এইরূপ বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নহে। মনু মহারাজ সদাচার কাহাকে বলিতেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে মনুস্মৃতির ২য় অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক স্মরণ করুন।

সরস্বতী দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥

তস্মিন্দেশে যঃ আচারঃ পারংপর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং শান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥

মনু ২।১৭—১৮

সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই দেব নদীর মধ্যগত ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক যে দেবনির্ম্মিত দেশ আছে সেই দেশের পারম্পর্য্যক্রমাগত অর্থাৎ ইদানীন্তন নহে কিন্তু বংশ পরম্পরাগত যে আচার তাহাকেই সদাচার বলা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাইবেন যে শ্রুতি-স্মৃতি ও পুরাণের পরে সদাচারকে স্থান দেওয়া হইয়াছে যদি ঐ সকলের অবিরোধী হয়। সেই হেতু অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে ঐ সদাচার ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের আচারকে লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং দেশাচার, গ্রামাচার, কুলাচারদ্বারা শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণকে অথবা সদাচারকে কুণ্ঠিত করা যায় না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশশধর রায়।

বেদান্ত দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়—২য় পাদ—তর্কপাদ

(২)

২। সাংখ্যাচার্য্যগণ জগতের উপাদানরূপে সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক যে তিনটী বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহারা পূর্ব্বপ্রলয়ে প্রত্যেকটী তুল্যবল থাকায় 'সাম্যাবস্থা'য় ছিল, কোন ক্রিয়া হইতে পারে নাই। একটী অপরটী হইতে হীন-বল না হইলে, ইহাদের সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়া, ইহাদের মধ্যে কোন ক্রিয়া বা চেষ্টা উপস্থিত হইতে পারে নাই। একটী প্রধান এবং অপর দুইটী তাহার অঙ্গীভূত—অপ্রধানভাবে অনুগত—থাকিয়া, ইহাদের ক্রিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ক্রিয়া হইলেই, ইহারা নানাবিধ কার্য্য বা বিকাররূপে পরিণত হইতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশেষ কোন কার্য্যের আকার ধারণ করিবার অভিমুখী এই যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, ইহা কোথা হইতে উপস্থিত হইল? প্রকৃতি ত জড় এবং উহা ত স্বাধীন, পরতন্ত্র নহে। জড় আপনা আপনি ক্রিয়া উৎপন্ন করিবে কি প্রকারে? আমরা মৃত্তিকা বা রথাদি জাতীয় বস্তুতে ত এ প্রকার কোন ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখি না। কেন না, আমরা নিত্যই ত ইহা দেখিতেছি যে, মৃত্তিকা দ্রব্য বা রথাদি দ্রব্য গুলি—ইহারা স্বভাবতই জড় বলিয়া—চেতন কুম্ভকারাদি বা অশ্ব ও সারথি প্রভৃতি চেতন দ্বারা প্রেরিত হইয়াই, কোন একটা বিশেষ কার্য্য করিবার অভিমুখে চেষ্টিত হইয়া থাকে। দৃষ্ট বস্তুর অবস্থা দেখিয়াই ত, অদৃষ্ট বস্তুর অবস্থাও অনুমান করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং, কোন অচেতন জড় দ্রব্যকে জগতের কারণ রূপে অনুমান করা যাইতে পারিতেছে না; কেন না, তাহা হইলে, জগৎ উৎপন্ন হইবার উপযোগী ক্রিয়া উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। স্বাধীন জড়ে আপনা আপনি ক্রিয়া উপস্থিত হইবে কিরূপে?

কিন্তু সাংখ্যকার এস্থলে বলিতে পারেন যে—'স্বাধীন জড়ে আপনা আপনি ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না তুমি বলিতেছ; তদ্রূপ আমরা বলিতে পারি কেবলমাত্র চেতনেও ত কোন ক্রিয়া কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না!' কেবল চেতনে ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না একথা সত্য। কিন্তু, অচেতন জড় রথাদি বস্তু, যখন কোন চেতন অশ্বাদির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই ত ঐ সকল জড়ীয় দ্রব্যকে ক্রিয়াশীল হইতে দেখা যায়। সাংখ্যকার যদি বলেন যে, সে অবস্থাতেও—যখন কোন চেতন জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনও—কেবল চেতনেও ত ক্রিয়া দেখা যায় না; তাহা হইলে আমরা সাংখ্যকারকে জিজ্ঞাসা করিব যে, যাহাতে ক্রিয়া হইতে দেখা যায় ক্রিয়া কি তাহারই?

না; যাহার সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রিয়া তাহারই? সাংখ্যকার বলিবেন, প্রত্যক্ষ যাহাতে ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, ক্রিয়া তাহাকেই আশ্রিত। রথাদি বস্তুকে যেমন ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তদ্রূপ কোন চেতনকে ত ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে কোথাও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল অনুমানের বলেই চেতনের অস্তিত্ব বুঝা যায় মাত্র। অনুমান-সিদ্ধ এই চেতনকে ক্রিয়ার আশ্রয় বলা যায় না। কেননা, ক্রিয়ার আশ্রয় দেহেই আমরা চেতনের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকি; জড় রথাদিতে ত আমরা চেতনের অস্তিত্ব অনুমান করি না। সুতরাং ক্রিয়া যে জড়েরই ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

এসম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি। যে বস্তুতে ক্রিয়া হইতে দেখা যায়, যাহার আশ্রয়ে ক্রিয়া হয়,—ক্রিয়া তাহারই। ইহা আমরা অস্বীকার করি না। ক্রিয়া, সেই বস্তুরই বটে, কিন্তু সেই ক্রিয়া চেতন হইতেই আসিয়াছে—আমরা এই কথা বলিতে চাই। এইজন্য একথা বলিতে চাই যে,—যতক্ষণ চৈতন্য থাকে ততক্ষণই জড়ে ক্রিয়া দেখা যায়; চৈতন্যটী চলিয়া গেলে আর জড় ক্রিয়া দেখা যায় না। একখানা কাষ্ঠ যখন প্রজ্জলিত হইতে থাকে, তখন,—কাষ্ঠের এই প্রজ্জলন ক্রিয়া অবশ্য কাষ্ঠেই দেখা যায়; কিন্তু উহা অগ্নি হইতেই আসিয়াছে। কেননা, অগ্নিসংযুক্ত না হইলে ত কাষ্ঠে প্রজ্জলন ক্রিয়া উপস্থিত হয় না। চেতন দেহই ত অচেতন রথাদির চালক—একথা জড়বাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং চেতনকেই, ক্রিয়ামাত্রেরই প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। যদি এই আপত্তি উপস্থিত কর, যে, দেহে সংযুক্ত হইলেও কেবল-চেতনকে প্রবর্ত্তক বলা যায় না; কেননা-চেতনে ত প্রবৃত্তি বা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে নিজের ক্রিয়া না থাকিলেও অপরের প্রবর্ত্তক বা প্রেরক হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। একটি চুম্বকের দৃষ্টান্তেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়। চুম্বক যখন লৌহকে আকর্ষণ করে, লৌহে ক্রিয়া উৎপাদন করে—তখন কি চুম্বকের নিজের কোন ক্ষত বৃদ্ধি দেখা যায়? চুম্বকের আপন স্বরূপটী তেমন তেমনই ত থাকে; উহাতে ত কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। এইরূপে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর স্বয়ং ক্রিয়ারহিত হইয়াও, জগতের প্রেরক হইবেন,—ইহাতে ত কোন আপত্তি হইতে পারে না। যদি বল, যে, ঈশ্বর ত এক, অদ্বিতীয়। সুতরাং তিনি প্রবর্ত্তক হইবেন কাহার? তিনি কাহাকে প্রেরণ করিবেন? একথার উত্তর আমরা অনেকবার দিয়াছি। তাঁহার আত্ম-ভূত—স্বরূপ ভূত—মায়াশক্তির তিনি প্রবর্ত্তক। এই মায়াই বিবিধ নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম, এই মায়াশক্তি যোগেই শক্তিমান্। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না অতএব, চেতন ব্রহ্মকে প্রেরক বলায় কোন আপত্তি হইতে পারে না। কেবল-জড়বস্তুকেই প্রেরক বলা যায় না।

৩—৬। সাংখ্যকার বলিয়া থাকেন,—অচেতন জড়কে আপনা আপনি ক্রিয়াশীল হইতে দেখা যায়। দুগ্ধের দৃষ্টান্ত লও। জড় অচেতন দুগ্ধ, অপর কাহারও দ্বারা প্রেরিত না হইয়া, আপনা আপনি, স্বভাবানুসারে, বৎসের পোষণার্থ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অচেতন জল আপন স্বভাব বশতঃ, লোকহিতার্থ প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ, জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, প্রকৃতি জড় অচেতন হইলেও, আপনা আপনি পরিণত হইবে,—ইহাতে আপত্তি কি?

আমরা বলি, তোমার এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না। জল ও দুগ্ধের ক্রিয়ার মূলে চেতনের প্রেরণা আমরা অনুমান করিব। কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রথাদি অচেতন বস্তুকে আপনা আপনি প্রেরিত হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ শ্রুতি আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—জগতে যেখানেই ক্রিয়া দেখিবে তাহারই মূলে চেতন ঈশ্বরের প্রেরণা আছে।* প্রদর্শিত দুগ্ধ ও জল, এ নিয়মের বাহিরে যাইতেছে না। চেতন গরুর ইচ্ছা বা স্নেহ দ্বারাই দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে দেখা যায়; চেতন বৎসের চোষণ দ্বারাও ত গো-দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া বৎসের মুখে পতিত হইতে থাকে।

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩,৭,৪ এবং ৩,৮,৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

জলের স্পন্দনও যে নিতান্ত আপনা আপনি হয়, তাহা নহে। এই স্পন্দন নিম্নভূমির ত অপেক্ষা রাখে। ইহারও মূলে যে চেতনের অপেক্ষা নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব? কেন না, ঈশ্বর ত সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ারই মূল প্রবর্ত্তক।

তুল্য-বল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটীর সাম্যাবস্থাকে সাংখ্যাচার্য্যগণ 'প্রকৃতি' বলিয়া থাকেন, একথা উপরে বলিয়াছি। সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়। সাংখ্যমতে কিন্তু, প্রকৃতির এই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তকই বা কে হইবে? নিবর্ত্তকই বা কে হইবে? কেন না, এই প্রকৃতির বাহিরে, এই প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র অপর কেহ ত নাই,—যাহা প্রকৃতির প্রেরক হইতে পারে। জীব বা পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে বটে কিন্তু সাংখ্য-মতে পুরুষ ত 'উদাসীন' (passive)। সুতরাং প্রকৃতির ক্রিয়া, কাহারই অপেক্ষা রাখিতেছে না। কাহারই অপেক্ষা না রাখায়, কেন যে প্রকৃতি কখনও বা 'মহত্তত্ত্বাদি' আকারে পরিণত হয়, কখনও বা হয় না,—ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকৃতি যে আপনা আপনি স্বভাবতই কার্য্যোন্মুখ হইবে ইহার কোন কারণ নাই।

আর এক কথা; অপর কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া প্রকৃতি, আপন স্বভাবানুসারেই ক্রিয়োন্মুখ হয়, একথা স্বীকার করিয়া এই দুইটী প্রয়োজন সাধন করিবে বলিয়া প্রকৃতি, ক্রিয়োন্মুখ হয়, তোমরা ত ইহাই বলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃতি ত অপর কাহারই অপেক্ষা রাখে না। তবে কেন সে, এই 'প্রয়োজনের'ই বা অপেক্ষা রাখিবে? সুতরাং এই প্রয়োজনের কথাটা নিরর্থক হইয়া উঠিতেছে। আরও দেখ। যদি সুখ-দুঃখের ভোগটাই 'প্রয়োজন' হয়, তবে আমরা এই আপত্তি করিতে পারি যে—সাংখ্যের পুরুষ ত নির্ব্বিকার, নিঃসঙ্গ; এ প্রকার পুরুষে সুখ-দুঃখরূপ বিকার কিরূপে উপস্থিত হইতে পারে? হইলেও, তাহা হইতে মুক্তিলাভই বা সম্ভব হইবে কিরূপে? জীবের মুক্তির উদ্দেশ্যে যদি প্রকৃতির ক্রিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও এই আপত্তি উঠিবে যে—সাংখ্যের পুরুষ যখন স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার, তখন উহা ত সর্ব্বপ্রকার অস্থায়ান্তর হইতে সর্ব্বদাই নির্ম্মুক্ত, এরূপ নির্ম্মুক্ত পুরুষের আবার মুক্তি কি? তজ্জন্য প্রকৃতির ক্রিয়াই বা কেন? আর স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও জীবের পক্ষে সুখদুঃখ শব্দস্পর্শাদির উপলব্ধি সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না। আর এক কথা এই, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ভোক্তব্য পদার্থের কি অন্ত আছে? এ অবস্থায়,—ভোক্তব্য বস্তু অনন্ত বলিয়া—সর্ব্বপ্রকার ভোগের অন্ত হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। পুরুষের বাসনার তৃপ্তি বা নাশের নিমিত্তই যদি, প্রকৃতির ক্রিয়া স্বীকার করা যায়; তাহাতেও এই কথা উপস্থিত হইবে যে—স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার পুরুষের আবার বাসনা কিরূপ? অচেতন জড় প্রকৃতিরই বা বাসনা থাকিবে কিরূপে? আর এককথা। সাংখ্যের পুরুষ, সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের নির্ব্বিকার দ্রষ্টা। আর সাংখ্যের প্রকৃতি, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াশক্তি বা বিকারের জননী। প্রকৃতির চেষ্টা স্বীকার না করিলে, এই উভয়েই ব্যর্থ হইয়া পড়ে—এই ভয়েই যদি প্রকৃতির চেষ্টা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও একটা দোষ উপস্থিত হইবে। প্রকৃতির বিকার ও পুরুষের বিকারানুভব—এ উভয়ই যখন নিত্য চিরকাল চলিতেছে; তখন উভয়ের ফলস্বরূপ এই সংসারের নিবৃত্তি হওয়া ত সম্ভব হইবে না; সুতরাং মুক্তিলাভই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে আবার জীবের প্রয়োজন সাধনার্থ প্রকৃতির ক্রিয়োন্মুখতা—একথাও ব্যর্থ হইয়া উঠিবে।

আবার দেখ, একটা বৃষভক্ষিত তৃণ ত কখন দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না; কিন্তু ঐ তৃণ ধেনুদ্বারা ভক্ষিত হইলে তাহা উহার দেহে দুগ্ধাকারে পরিণত হয়। সুতরাং অচেতন জড় তৃণাদি বস্তু, আপনা আপনি স্বভাবতঃ দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে না; কেন না ঐ পরিণতি, ধেনুপ্রভৃতি অপর কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা রাখে। আপনা আপনি হয় না।

অতএব, চেতনের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রকৃতি, আপনা আপনি, অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া কদাপি কার্য্যোন্মুখ হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

কালিদাসের শকুন্তলা

কালিদাসের শকুন্তলা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তপোবনে বল্কল পরিহিতা কুসুমাভরণা কুমারী—রাজান্তঃপুরে মণিরত্ন ভূষিতা রাজরাণী। আশ্রমের শান্তসুষমা,—নগরের রাজলক্ষ্মী। প্রেমের বিকচ কুসুম, আরাধনার পরিপক্ক ফল। প্রথমাবতীর্ণ-যৌবন-মদন-বিকারা সমধিক লজ্জাবতী, মানে মৃদু, মুগ্ধা নায়িকা। ঋষির ঔরসজাতা, অপ্সরা মেনকার গর্ভজাতা, তপস্বী কণ্বের পালিতা কন্যা—এমন রূপ, এমন প্রভাতরল জ্যোতি, এমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য মানুষীতে সম্ভব নহে বলিয়াই সে কি অপ্সরা সম্ভবা? পিতৃমাতৃত্যক্তা কন্যা, শকুন্ত পক্ষীর দ্বারা রক্ষিতা হইয়াছিল তাই কন্যার নাম শকুন্তলা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এবং অপ্সরা মেনকার কন্যা ক্ষত্রিয়ের বিবাহ্যা হইবে তাই কি ঋষি তাহাকে সেই মতই সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন? যাহাকে একদিন রাজার মহিষী, ভরতের মত পুত্রের জননী হইতে হইবে তাহাকে সেই মতই গঠিত করা আবশ্যক। তজ্জন্যই কি দূরদর্শী ঋষি তাহার উপর আশ্রমের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন? সহস্র প্রজার যে জননী হইবে তাহার স্নেহের প্রসার তাই কি তরুলতা পশু পক্ষী যাবৎ প্রাণীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল?

শকুন্তলা সখীদ্বয় সহ স্বপ্রমাণ সুরূপ সেচনঘট কক্ষে লইয়া ক্ষুদ্র তরুগুলিতে জল সেচন করিতেছেন। সে তরুগুলির উপর শকুন্তলার সহোদরের অধিক স্নেহ পড়িয়াছে। শকুন্তলার মধুর দর্শন রূপসৌন্দর্য্য সে উদ্যানটি আলো করিয়া আছে। রাজা দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত থাকিয়া যে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা তাহারা কেহই জানে না। আশ্রমবাসিনী রমণীদের রাজান্তঃপুর দুর্লভ রূপ দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। এমন প্রকৃতি-মনোরম দেহ কি কখনও তপস্যার ক্লেশ বহন করিতে পারে মনে করিয়া রাজা ঋষির উপর একটু অনুযোগ করিলেন। শকুন্তলার বক্ষোদেশ বল্কল দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, অনসূয়া সে বল্কল শিথিল করিয়া দিল। দুষ্মন্ত দেখিলেন—বল্কল মধ্যেও শকুন্তলা কি সুন্দর! তাহার পল্লব-রক্তিম অধর, কোমলশাখাসদৃশ বাহু, কুসুম লোভনীয় যৌবন কি মনোরম! যদিও ইহারা তপস্বিকন্যা কিন্তু তথাপি যৌবন লইয়া রঙ্গও করে, সহকারের সঙ্গে মাধবীলতার বিবাহও দেয়। আশার ক্ষীণজ্যোতি রাজার অন্তঃকরণকে মৃদু আলোকিত করিল।

শকুন্তলা তপস্বিকন্যা কিন্তু তপস্বিনী-ভাবাপন্না নহে। নতুবা যৌবন সম্বন্ধীয় রসালাপ তাহার এত মধুর লাগিবে কেন? সে প্রবৃত্তিরই সেবিকা, নহিলে লতাকে স্বয়ম্বর বধূ করিয়া সহকারের সঙ্গে বিবাহ দিবে কেন, আর সেই লতাকে নবকুসুম যৌবনা দেখিয়া এবং সহকারকে উপভোগক্ষম মনে করিয়া আনন্দলাভই বা করিবে কেন? শকুন্তলারও যে ফুল ফুটিয়াছে—তার প্রাণেও যে ভালবাসার সাধ জাগিয়াছে—তাই সে মুকুলিতা মাধবীলতার পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। তাই প্রিয়ম্বদা রঙ্গরসের ভিতর দিয়া তারই মনোগত ভাবটি বাহির করিয়া দিয়াছে।

বলিয়াছি শকুন্তলার ফুল ফুটিয়াছে; ভ্রমরও দেখা দিয়াছে। একারণ তার অন্তরও একটু ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত তপস্বিকন্যাদের রক্ষাচ্ছলে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে মদনের একটি ফুলশর অলক্ষ্যে শকুন্তলার কোমল বক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। অজ্ঞাত-যৌবন-মদনবিকারা কুমারী; এই লোকটিকে দেখিয়া তাহার তপোবন-বিরোধী বিকার জন্মিল কেন, তাহা অঘটন ঘটন পটীয়সী নিয়তিরই লীলা।

অনসূয়া রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। শকুন্তলার হৃদয়ও এ পরিচয় জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এক নূতন লজ্জা আসিয়া শকুন্তলাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

দর্শনমাত্র কাহারও উপর কাহারও রসময়ী প্রবৃত্তি জন্মিতে দেখা যায়—ইহাই চক্ষুরাগ অহেতুক প্রণয়, মদন শরজ ভাব।

দুষ্মন্তের উপর শকুন্তলার এই অহেতু পক্ষপাত তাহার আধারেই ধরা পড়িল। "প্রভাতরলজ্যোতি কখনও পৃথিবীতলে উদয় হয় না" দুষ্মন্তের এই কথাটি শুনিয়া সে লজ্জায় অবনতমুখী হইল; দেখা গেলে দেখা যাইত, সে স্বভাব-রক্তিম কপোল দু'খানি আরও রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কিশোরী হৃদয়ে প্রথম ভালবাসার সঞ্চার বড়ই মধুর। সখীকে অঙ্গুলিদ্বারা তর্জ্জন, "আমি চলিয়া যাই" বলিয়া কৃত্রিম রোষ, উত্তর না দিয়া প্রস্থানোদ্যোগ বড় সুন্দর। আবার দুষ্মন্তের সহিত কথা চলিতেছে না, কিন্তু তাহার কথা সে মন দিয়া শুনিতেছে, চক্ষু দুষ্মন্তকে দেখিতে চাহে, লজ্জায় জন্য তাকাইতে পারিতেছে না, আবার অন্য দিকে নিবিষ্ট থাকিতেও পারিতেছে না—তাহা আরও সুন্দর। নূতন কুশসূচিতে শকুন্তলার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে আর কুরুবক শাখায় তাহার বল্কল লাগিয়া গিয়াছে—এই ছলে বিলম্ব করা, চুপি চুপি দেখিয়া লওয়া ছবিটি বড় মনোরম।

শকুন্তলা নব-প্রণয়-সুলভ স্বাভাবিক ছলটুকুর ভিতর দিয়া আপনার ভালবাসাটি নিবেদন করিল। গোপন দৃষ্টির এবং চাপা হাসির মধ্য দিয়া আপনার প্রচ্ছন্ন মদন ভাবটি স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া দিল। কুমারীদের বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না সত্য, কিন্তু ছলা কলা ভাব ভঙ্গী বিলাস বিভ্রমের ভিতর দিয়াই সহজে আপনারা ধরা দেয়।

মালিনী তীরবর্ত্তী লতামণ্ডপে শিলাপট্টের উপর কুসুমাস্তরণে শকুন্তলা শায়িতা। জল নলিনী যেন শীতল সলিল-শয্যা ছাড়িয়া প্রস্তরের উপর নিপতিতা। প্রচণ্ড তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া লাবণ্যময়ী ছায়া আজ ম্রিয়মানা। বক্ষের উপর ঘন করিয়া উশীর অনুলেপন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সখীরা ধীরে ধীরে পদ্মপত্র দিয়া বাতাস দিতেছে। শকুন্তলা আজ মদনের তীক্ষ্ণশরে আহতা হরিণীর মত ছটফট করিতেছে। এমত জ্ঞানহারা বিভোরা, সখীরা যে বাতাস করিতেছে উহার উদ্বোধ নাই। যে সকাম ভালবাসায় মানুষ মুগ্ধ দগ্ধ ও উন্মত্ত পর্য্যন্ত হয়—শকুন্তলা আজ সেই ভালবাসা বাসিয়া এই দুঃখময়ী অবস্থায় উপনীতা। সে লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি—আজ পাণ্ডুবর্ণা ও শোচনীয় দর্শনা। যৌবনোৎফুল্ল মুখখানি বড় ক্ষীণ, বড় মলিন।

মদনের শক্তি অমোঘ। সেই নবদলস্নিগ্ধা মাধবী লতা দুই দিনের মধ্যেই বিশুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু উপায়? কোন্ ঔষধে এ হরিণী সুস্থা হইবে; কোন্ বারিসেকে এ মাধবীলতা বাঁচিবে? শকুন্তলা সখীদের কাছে নিজমুখে আপনার ভালবাসার কথা জানাইল, যাহাতে দুষ্মন্তের অনুকম্পার পাত্রী হয়, তজ্জন্য তাহাদের উপায় করিতে অনুরোধ করিল, নতুবা সে আর বাঁচিবে না। তারপর প্রিয়ম্বদা দেবসেবাচ্ছলে পুষ্পরাশির মধ্যে মদনলেখন পাঠাইবার যুক্তি দিল। শকুন্তলা পাছে অবজ্ঞাতা হয় সেই ভয়ে সে কাতরা। স্নেহ সর্ব্বদা অনিষ্টাশঙ্কী। প্রিয়ম্বদা যখন বলিল—"অয়ি আত্মগুণাবমানিনি, তাপভয়ে শারদীয়া জ্যোৎস্নাকে আতপত্র দিয়া কে নিবারণ করে?" শকুন্তলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে নিজেদের মধ্যেই একটী প্রেম গীতিকা রচনা করিল—

"নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় আমি জানি না; কিন্তু মদন কি দিবা কি রাত্রি তব হস্তাভিলাষী আমার অঙ্গগুলিকে নিদারুণ তাপ দিতেছে।"

পত্র প্রেরণ আর করিতে হইল না। দুষ্মন্ত সহসা প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"হে কৃশাঙ্গি! মদন তোমার মত আমাকেও দিবা রাত্রি উত্তপ্ত করিতেছে। দিবা কুমুদিনীকে যতখানি ম্লান করে, আমাকেও তদপেক্ষা অধিক ম্লান করিয়া থাকে।" রাজাকে দেখিয়া সখীরা স্বাগত সম্ভাষণ করিল। শকুন্তলাও উঠিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু তাহার উঠা আর হইল না। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা তৈলসেকে

হাসিয়া উঠিল। উপযুক্ত ঔষধ পাইয়া সে বিকার উপশম প্রাপ্ত হইল, সে তাপদাহ কোথায় মিলাইয়া গেল বরং তাহার স্থলে অরবিন্দ-সুরভি তরঙ্গ শীতল মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। শকুন্তলা জানিল দুষ্মন্ত তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাহার সহিত মিলনের জন্ম উৎসুক হইয়াছেন—শকুন্তলার আনন্দ আর ধরে না।

শকুন্তলার হৃদয়ের কথাটি অনসূয়া প্রকাশ করিয়া অনুরোধ জানাইল—"আপনারই জন্ম সখী আমার মদনের দ্বারা এই অবস্থায় উপনীতা; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ইহার প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাই করুন।" রাজা অনুগৃহীত হইলেন, এই ভাব প্রকাশ করিলেও, "পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ"—শকুন্তলা অনসূয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"সখি, অন্তঃপুর-বিরহ-পর্য্যুৎসুক রাজর্ষিকে অনুরোধ করার প্রয়োজন নাই।" শকুন্তলার ইচ্ছা—রাজা যাহা করিবেন, তাহা আপনা হইতে প্রণয় বশতঃই যেন করেন, এবং সেই কথাটীও শকুন্তলা প্রিয়তমের মুখ হইতে শুনিতে চায়। শুনিলও তাই। সমুদ্রবসনা পৃথিবীর সহিত তাহার তুলনা-মেঘবাতস্পর্শে নিদাঘার্ত্তা ময়ূরী প্রত্যাহতজীবিতা হইল।

দুইখানি মেঘই বিদ্যুতে ভরা—আর তাহাদের থাকা শোভন নহে বুঝিয়া প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে লইয়া প্রস্থান করিল। শকুন্তলা প্রথম প্রণয়ে ব্রতী—নূতন সাহসের কার্য্যে অগ্রসর, তাই একটু সঙ্কোচ বোধ করিল।

"পৃথিবীনাথ যাহার কাছে রহিলেন—সে ত অসহায়া নহে আর একাকিনীও নহে" এই বলিয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। "কি, সখীরা গেল?" প্রণয় ব্যাপারে অনভ্যস্তা শকুন্তলার কেবল একটু ভয় জন্মিল। অনাঘ্রাত সদ্যোবিকশিত কুসুমের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

দুষ্মন্তের মধুর প্রিয় ভালবাসার বচনে শকুন্তলা সুখে মোহিতা হইয়া উঠিল। রাজা দুষ্মন্ত রাজন্য-কন্যাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শকুন্তলাকে ক্রমেই সাহসিনী করিয়া তুলিলেন। এইরূপে প্রেমখেলা চলিতে লাগিল। অনসূয়া প্রিয়ম্বদার বিনা উপস্থিতিতে গান্ধর্ব্ব বিবাহের আয়োজন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের দাম্পত্য মিলনের পরিপূর্ণতা সাধন করা কবি ভাল বুঝিলেন না। দেশের পক্ষে সমাজের চক্ষুতে উহা বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়াই বোধ করিলেন, তাই ঐ সময়ে শান্তি উদক হস্তে গৌতমীকে প্রবেশ করাইয়া কবি এই হিতকর মনোদ্দেশ্যটি আপাতত রক্ষা করিলেন।

উপযুক্ত কার্য্য-ক্ষেত্রেই বুদ্ধি খোলে। শকুন্তলা তখন রাজাকে শাখান্তরিত থাকিবার পরামর্শ দিল। তারপর শকুন্তলা গৌতমীর সহিত সে লতামণ্ডপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, তাহা ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। শকুন্তলা তখন ভাবিল—"হৃদয় যেমন তুমি সুখোপনত মনোরথ পূরণে কালহরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তার ফল অনুভব কর।" শকুন্তলার আর আপনার উপর কোন প্রভুত্ব নাই; এক্ষণে সে দুষ্মন্তে সম্পূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তারপর যাইবার সময় লতামণ্ডপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"লতাকুঞ্জ (নিকুঞ্জ) সন্তাপহর; তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আবার আমি তোমাকে অভিনন্দিত করিব।" লতা-গৃহকে উদ্দেশ করা একটী ছল মাত্র। দুষ্মন্তকে আবার মিলিত হইবার আশা দেওয়া, সমাগমের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রণয়ই এই রহস্যো-ক্তিতের শিক্ষা দিয়া থাকে।

প্রণয়ই মানুষকে অনেকরূপে শিক্ষা দেয়, নূতন রকমে গড়িয়া তোলে। প্রণয় প্রসাদে হাব-ভাব বিহীনা সরলা নারীও কলাকুশলা ও চতুরা হইয়া থাকে।

শকুন্তলার উপর আশ্রমের অতিথিসৎকারের ভার। ক্রোধের অবতার দুর্ব্বাসা ঋষিও অতিথিরূপে পর্ণশালার দ্বারে উপস্থিত। শকুন্তলা তখন পতিচিন্তানিরতা; তাহার মন আর তখন তাহাতে নাই—সে মন তখন হস্তিনাপুরে দুষ্মন্ত-গৃহে আবদ্ধ। শকুন্তলার তখন এমনই তন্ময় ভাব; দুর্ব্বাসার সেই "অয়মহং ভো.. :চীৎকার

সে শুনিতে পারিল না। সে চীৎকারে বনভূমি অস্তুত ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মালিনী তীরে পুষ্পচয়নরতা অনসূয়া প্রিয়ম্বদার কর্ণে অতিথির অভিশাপ বজ্র-নির্ঘোষের মত বাজিল। * হায় পতি-চিন্তার তন্ময়তাসুখে আত্মহারা অভাগিনী তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

কণ্বঋষি উপযুক্তা ভাবিয়া যাহার হস্তে আশ্রমের গুরুভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন—সে আজ আপনার সুখ দুঃখ লইয়া ব্যস্ত। গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার যাহার মাথার উপর—এ আত্মাদর এ দুর্ব্বলতা তাহার সাজে না। এত বড় কর্ত্তব্যের চ্যুতি যাহারই হউক না কেন—তাহার তাহা দোষ। দোষ দোষই। বালক বালিকা না বুঝিয়া অগ্নিতে যদি হাত দেয় অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে ছাড়ে না। শকুন্তলা বালিকা, অসামান্য সুন্দরী, বিশেষতঃ পতিচিন্তায় আত্মহারা; তাহার দোষ সকলকারই নিকট মার্জ্জনীয়; তাহার উপর সহানুভূতি আসা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এ মার্জ্জনা এ সহানুভূতি দয়াবৃত্তি উদ্ভূত দুর্ব্বলতা মাত্র। দেবরাজ ইন্দ্রই হউন আর প্রণয়-বিবশা বালিকাই হউক—দোষ করিলে, দণ্ড লইতেই হইবে। দোষের বিচারক দণ্ডদানের কর্ত্তাকে দয়ালু এবং দুর্ব্বল হইলে চলে না। দেবরাজ বলিয়া ইন্দ্রের দোষ যিনি মার্জ্জনা করেন নাই, তিনিই আজ প্রণয়-বিবশা বালিকা বলিয়া শকুন্তলার ত্রুটি মার্জ্জনা করিলেন না। দুর্ব্বাসা ক্রোধের অবতার, ঋষি কর্ত্তব্য-চ্যুতির জন্য দণ্ড দিয়া গেলেন মাত্র। অনসূয়া প্রিয়ম্বদার করুণ ক্রন্দনে শকুন্তলার তাৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় ঋষিবর শাপমুক্তির ব্যবস্থাও করিয়া গেলেন।

অগ্নিগৃহ-প্রবিষ্ট মহর্ষি কণ্ব অশরীরিণী বাণী শুনিয়া শকুন্তলার বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। "ধূম" নিরুদ্ধ দৃষ্টি যজমানের আহুতি আজ যজ্ঞীয় অগ্নিতেই নিপতিতা হইয়াছে। দুষ্মন্ত-দত্ত তেজ ধারণ করতঃ শকুন্তলা অগ্নিগর্ভা শমীর মতই পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর ঋষি শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করার সঙ্কল্প করিলেন। গৌতমীকে আদেশ দিলেন—শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে সঙ্গে লইয়া শকুন্তলাকে পতি-গৃহে রাখিয়া আইস। এত দূরপথে গৌতমীর মত প্রবীণা স্ত্রীলোক অভিভাবিকা সঙ্গে দিয়া ঋষিবর অতিশয় সাংসারিক দূরদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গরব স্পষ্টবক্তা, তেজস্বী, অত্যাচারাসহিষ্ণু এবং ঋষিসুলভ কোপন স্বভাব; শারদ্বত প্রিয়ভাষী, বিনয়-নম্র, তেজস্বী, ধীর স্বভাব, তপস্বিসুলভ প্রশান্তচেতা।

শকুন্তলা আজ পতি-গৃহে যাইবে, তপস্বিনী রাজ-রাণীর আসনে বসিবে, কি আনন্দের কথা। কিন্তু সেই আবাল্য পরিচিত আশ্রম, সেই সমদুঃখসুখ এক-প্রাণা সখীগণ, সেই সন্তান-নির্ব্বিশেষে পালিত মৃগ তরুলতা ও পশু পক্ষী ছাড়িয়া যাইতে হইবে—এও কি কম কষ্টের কথা? সখীরা কতদিন শকুন্তলাকে সাজাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আজ সেই সখীদের হাতে শেষ সজ্জা; মনে হইবা মাত্র শকুন্তলার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। পতি সমাগম-ব্যাকুলা হইয়া শকুন্তলা যদি হাসিতে হাসিতে তপোবন ছাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহাকে হৃদয়হীনা ভোগ-পরায়ণা বিলাসিনী বলিয়া ভাবিতাম। বাপ মা ভাই ভগিনী, সখা সখীদের ছাড়িয়া যাইতে যার কষ্ট না হয়—সে কেমন রমণী? এমন স্বার্থপর আত্মভোগসর্ব্বস্ব রমণী শকুন্তলা নহে।

স্নানোত্তীর্ণ ঋষি উৎকণ্ঠিত হৃদয়, বাষ্পভারাবরুদ্ধ বচন, চিন্তাজড় নয়ন লইয়া শকুন্তলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শকুন্তলা লজ্জায় নত-নয়না হইয়া পিতাকে কেবল প্রণাম মাত্র করিল। মুখ দিয়া তাহার কোন কথাই বাহির হইল না। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের তরু-দিগের নিকট শকুন্তলার বিদায় প্রার্থনা করিলেন। যাহাদিগকে জল-সেচন-তৃপ্ত না করিয়া শকুন্তলা নিজে

---

* নাটকীয় অঙ্কে, অভিশাপ, যুদ্ধ, মৃত্যু, হত্যা প্রভৃতি দেখান নিষিদ্ধ। এ কারণে কবি নেপথ্যে অভিশাপের ব্যবস্থা করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষা করিলেন।

জল খাইত না, ভূষণ-প্রিয়া হইয়াও যাহাদিগের প্রীতি স্নেহবশে পল্লব গ্রহণ করিত না, যাহাদের নব-কুসুমোদ্গম হইলে সে উৎসব বলিয়া মনে করিত, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছে। সন্নিহিত দেবতা তপোবন তরু তোমরা অনুজ্ঞা দাও। তপোবনের তরুরাও কোকিল কলকণ্ঠের ধ্বনিতে সে অনুজ্ঞা প্রদান করিল। বাস্তবিক মনে হয় যেন তপোবন তরুগুলি এক একটী রক্ত মাংসে গড়া হৃদয় সমন্বিত সচেতন জীব। অচেতনে চেতনের প্রতিষ্ঠা করা; জড়কে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলাই প্রকৃত অলৌকিক প্রতিভার পরিচায়ক। এ ছবি হৃদয়ের শান্তি ও পবিত্রতা আনিয়া দেয় অভিনব কর্ম্মের সৃষ্টি করে। এ যেন একাধারে নন্দনবনের সুষমা, ভাগীরথীর পুণ্য প্রপাত, এ যেন স্বপ্নের ফুল, আরাধনার ফল।

শকুন্তলা জনান্তিকে, আর কেহ শুনিতে না পায়, এমন ভাবে প্রিয়ম্বদাকে কহিল, "সখি আমি আর্য্যপুত্রকে দর্শনের জন্য সমুৎসুক হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার চরণ যে তপোবন ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।" শকুন্তলা যেমন তপোবন-বিরহে কাতরা, শকুন্তলার আসন্নবিরহে তপোবনের অবস্থাও একই প্রকার। হরিণীরা তৃণকবল মুখে করিয়াই রাখিয়াছে, ময়ূরীরা নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছে, ও লতারা শুষ্ক পত্র গুলি ফেলিয়া যেন বাষ্প বর্ষণ করিতেছে। কাব্যের অলঙ্কারগুলি সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হৃদয়ের ভাবনিচয় মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

শকুন্তলা তখন ভগিনীরূপা মাধবীলতার নিকটে গেল। তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "লতা বহিন! তোমার শাখাময় বাহু দিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। আজ আমি অনেক দূরে চলিলাম।" পিতার দিকে ফিরিয়া স্নেহময়ী কন্যা অনুরোধ করিল, "বাবা, ইহাকে আমারই মত ভাবিয়া ভালবাসিও।" সখীদের নিকট গিয়া কহিল, "এই মাধবীলতাকে তোমাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলাম।"

শকুন্তলার সহোদরা ছিল না; সে সাধ মাধবীকে দিয়াই সে মিটাইয়া লইয়াছে। ভগিনীকে ভগিনীদের হাতে দিয়া সে এখন নিশ্চিন্ত হইল।

গর্ভভারমন্থরা মৃগবধূ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। তখন শকুন্তলা বাপকে অনুরোধ করিল, "বাবা, এই উটজচারিণী মৃগবধূর যখন সুখে প্রসব হইবে, তখন আমাকে সে সংবাদ দিতে ভুলিও না। প্রসবকালে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, আর তাহা বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ—রমণী মাত্রেই ইহা জানে, সে জন্য রমণীরা ব্যাকুল হইয়া থাকে, ইহা তাহাদের প্রকৃতি। তখনই পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া বসনাগ্র টানিতে লাগিল, শকুন্তলা ফিরিয়া দেখিল; যাহার কুশসূচিবিদ্ধ মুখে কত আদর করিয়া সে ব্রণনাশক ইঙ্গুদী তৈল সেচন করিয়াছে যে মাতৃহারা সন্তানটিকে হাতে করিয়া সে নীবার মুষ্টি খাওয়াইয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে—সেই মৃগশিশুটি ছল ছল নেত্রে সম্মুখে উপস্থিত। শকুন্তলার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে যে দুইদিন পরেই পুত্রের মাতা হইবে—কেমন করিয়া তাহাকে মানুষ করিবে, সে শিক্ষা তাহার কৃত্রিম পুত্রকে দিয়া আগেই হইয়া গেল।

তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শকুন্তলা সেই চিরপরিচিতা সরসীর তীরে বটতরুর ছায়ায় গিয়া বসিল। সেখানেও দেখিল—চক্রবাক তাহার প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ করিতেছে না। মৃণালখণ্ড মুখে রাখিয়া সে একদৃষ্টে তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। চক্রবাক সারারাত্রি বিরহ ভোগ করে, ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা সে ভালরূপই জানে, সেও আজ বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে।

এইবার তপোবনের সীমানা ছাড়াইয়া পথ ধরিতে হইবে। তখন শকুন্তলা পিতাকে শেষ আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "বাবা, তোমার কাছ ছাড়া হইয়া মলয় পর্ব্বতবিচ্যুত চন্দন লতার মত কেমন করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিব?"

সখীদের কাছেও শেষ বিদায় লইয়া বলিয়া গেল, "সখি, তোমরা দু'জনে একসঙ্গে আলিঙ্গন কর।"

আবার বাবার দিকে ফিরিয়া শেষ প্রার্থনা জানাইয়া

গেল, "বাবা, কবে আবার তপোবন দেখিতে পাইব ?"

এই শকুন্তলার যাওয়া দুই দশদিন দুই এক মাস, দুই এক বৎসরের জন্যও নহে। পুত্রকে সে রাজ্যে অভিষেক করার পর তবে পতির সহিত এই তপোবনে আসা ঘটিবে—সে কত কাল ?

রাজার সম্মুখে শকুন্তলা উপস্থিতা। অবগুণ্ঠনবতী নাতি পরিস্ফুট শরীর লাবণ্য পাণ্ডুপত্রমধ্যে কিসলয়ের মত রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তপোবনে প্রবেশের সময়ে দুষ্মন্তের বরস্ত্রীলাভসূচক দক্ষিণবাহু কম্পিত হয়, আর রাজসভায় প্রবেশ করিয়া শকুন্তলার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইল। আমাদের শাস্ত্রে বলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ নিষ্কলুষ তাঁহারা শুভাশুভ ঘটনার পূর্ব্বেই আভাস পাইয়া থাকেন।

প্রতিহারীর মুখে শকুন্তলার রমণীয় আকৃতির কথা শুনিয়া রাজা যখন পরস্ত্রীর মুখদর্শন অনুচিত বলিলেন, তখনই শকুন্তলার অন্তর এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। আর্য্যপুত্রের সেই গাঢ় ভালবাসা স্মরণ করিয়া সরলা বালা বুকের উপর হাত চাপিয়া দিয়া কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল।

শাপপ্রভাবে বিগতস্মৃতি রাজা যখন বিবাহ ব্যাপারটিকে "উপন্যস্তমিদং" বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তখন অভাগিনীর আশঙ্কাই সত্য হইয়া উঠিল। সযত্ন পোষিতা আশালতাটি চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া গেল। শারদ্বত যখন প্রমাণের ভার শকুন্তলার উপরই অর্পণ করিল; তখন শকুন্তলা কি করিবে ? সেই প্রাণঢালা ভালবাসার যখন এই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তখন স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় আর কায কি? মনস্বিনী আত্মসম্মান জ্ঞানযুক্তা নারী যাহা ভাবিতে পারে শকুন্তলা তাহাই ভাবিল; অথচ এ অবস্থায় আত্মশুদ্ধির জন্য, সতীর মর্য্যাদা বজায় রাখার জন্য, প্রমাণ দেওয়া ব্যতীত আর উপায়ই বা কি ? অভাগিনী ভূমিকামাত্র করিয়াছে এমন সময়ে রাজা তাহাকে কুলঙ্কষা নদী বলিয়া গালি দিলেন। আঘাতের উপর আঘাত। সতী নারী সব সহিতে পারে, কেবল সতীত্বের উপর আঘাত সহিতে পারে না। সহিষ্ণুতাময়ী শকুন্তলা তথাপি ধৈর্য্য ধরিয়া প্রমাণ দিতে বসিল। এ কি! প্রণয়চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত অঙ্গুরীয় যে অঙ্গুলিতে নাই! কি উপায়? আর রাজার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। শকুন্তলা তখন 'ঘর্ম্মি' হইয়া উঠিয়াছে।

রাজার সেই তীক্ষ্ণ উপহাস, মর্ম্মান্তিক অবজ্ঞার ভিতর দিয়াই অভাগিনী তাঁহার চিত্তে পূর্ব্বস্মৃতি উদ্দীপ্ত করিবার কতই চেষ্টা করিল; সকল উপায়ই তখন ব্যর্থ। সেই আত্মনিবেদিতা তপস্বিনী আজ সর্ব্ব সমক্ষে মিথ্যাবাদিনী ছলনাময়ী অসতীরূপে দণ্ডায়মানা। সতীর পুত্র আজ বেশ্যার পুত্ররূপে সমাজে ঘৃণিত হইবে। এ লজ্জা অসহ্য। সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি আজ অধীরা, কোপনা। বাক্য স্খলিত, দৃষ্টি বাষ্পকলুষ, বিম্বাধর কম্পমান্, ভ্রূদ্বয় কুটিল কুঞ্চিত।

রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন ঋষি-কুমারদ্বয় তাহাকে তথায় রাখিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। শকুন্তলা তখন অনন্য আশ্রয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ধূর্ত্ত কর্তৃক আমি প্রতারিত হইলাম —এক্ষণে তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ ?"

করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে অভাগিনী তখন তাহাদের অনুসরণ করিতেছে; গৌতমী রমণী—তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু গুরুসম গুরুশিষ্য শার্ঙ্গরব শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া বলিল—"আঃ অপরাধিনী এক্ষণে আবার স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেছ ?"

সেই তপস্বিনী তখন ভীতা কম্পিতা। তাহার কর্ণকুহর ভেদ করিয়া শার্ঙ্গরবের সেই পরুষাক্ষর বাক্যে সভাক্ষেত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"শোন তুমি শকুন্তলা, রাজা যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয় তবে তুমি ত কুলভ্রষ্টা;—তোমাকে লইয়া পিতা কি করিবেন? আর তুমি যদি আপনার কার্য্য পবিত্র বলিয়া মনে কর, তবে তোমার পক্ষে পতিকুলে দাসত্ব করাও ভাল।"

তপস্বীরা চলিয়া গেলেন। শকুন্তলা রাজপুরোহিতের

গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত থাকিবেন' ইহই স্থির রহিল। পুরোহিত শকুন্তলাকে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবার সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। কোথা হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়াই ক্রন্দনপরা শকুন্তলাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে শকুন্তলার অভাবনীয় অন্তর্দ্ধান ঘটিল।

কিম্পুরুষ বর্ষে হেমকূট পর্ব্বতে মহর্ষি মারীচের আশ্রমে পুত্রসঙ্গিতা শকুন্তলা অবস্থিতা। যাহার মনে সুখ নাই, স্বর্গে, তপোবনে কোথাও তাহার সুখ নাই। শান্তিময় আশ্রমে থাকিয়াও শকুন্তলা বিরহে দীনা, নিয়মে ক্ষীণা, একবেণী ধারিণী। পরিধানে একখানি মলিন বস্ত্র, সেই বর বপুকে বেষ্টন করিয়া আছে মাত্র। শকুন্তলা আজ প্রোষিতভর্ত্তৃকা। বেশভূষা নাই, শরীর সংস্কার নাই। মুখখানি কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ, বঙ্কিম অধর বিবর্ণ, পাটলবর্ণ। দৃষ্টি কখনও ভূমি পানে আনত কখনও বা শূন্যপথে বিক্ষিপ্ত। অন্তরে বাহিরে শকুন্তলা প্রকৃত আজ তপস্বিনী।

দেবকার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দুষ্মন্ত সেই বিরহকৃশা দীর্ঘব্রতধারিণী শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন। শকুন্তলা কিন্তু অনুতাপ-বিবর্ণ রাজাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারেন নাই। শকুন্তলা বিরহে যতই দুঃখিতা পরিম্লানা হউক—তথাপি তাহার যাতনা দুষ্মন্তের যাতনা অপেক্ষা অধিক। সেই আত্মনিবেদিতা সরলা তপস্বিনীকে সভামধ্যে ব্যভিচারিণীরূপে দূর করিয়া দেওয়ার যে যাতনা—তাহার তুলনা নাই। এ যে স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদের অপেক্ষাও ভয়ানক। এ অবমাননা এই নৃশংসতার সান্ত্বনা নাই। কাযেই দুষ্মন্ত দহ্যমান বনস্পতির মত অবস্থায় উপনীত। সে রাজকান্তি অনুতাপে মর্ম্ম বেদনায় এমত বিবর্ণ, পরিবর্ত্তন এমনই অসম্ভব রকমের যে শকুন্তলা দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল না।

পুত্র মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, ইনি আমাকে পুত্রের মত আলিঙ্গন করিতেছেন কেন?"

শকুন্তলার হৃদয় আশ্বস্ত হইল। রাজা শকুন্তলাকে মনে করিয়াছেন, দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছেন—শকুন্তলার শুষ্ক হৃদয় প্রেমার্দ্র হইয়া উঠিল। এত ক্লেশের পর দৈব আজ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। শকুন্তলা সবহুমানে পুনরাগত শুভাদৃষ্টকে বরণ করিয়া লইল। পূর্ব্বস্মৃতি রাজার মনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলা সহর্ষে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে "জয়তু জয়তু আর্য্যপুত্র" বলিয়া একেবারে প্রিয়তমকে অভিনন্দিত করিল। নিরভিমানিতাই আদর্শ প্রেমের লক্ষণ। এতবড় অপমান, এতবড় লজ্জা, এতবড় লাঞ্ছনার পর গদ্গদকণ্ঠে জয় ঘোষণা করা, আদর্শ নিরভিমানিতারই সূচক। আশ্রমে থাকিয়া শকুন্তলা স্থিরা, ধীরা এবং নিয়তা সংযতা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সে এক্ষণে পুত্রের জননী। পুত্রের উপস্থিতিতে সখীদ্বয়ের সমক্ষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বিনী।

"মা, ইনি কে?" সন্তান মাকে আবার প্রশ্ন করিল। জননী উত্তর দিল, "ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর—যে ভাগ্য আজ আমাকে এই অবস্থায় উপনীত করিয়াছে, আজ আবার যে ভাগ্য আর্য্যপুত্রকে অচিন্তনীয়ভাবে এই অপূর্ব্বস্থানে আনিয়া দিল, সেই ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।"

শকুন্তলার বড় ইচ্ছা জানিয়া লয়—কেমন করিয়া সে আর্য্যপুত্রের স্মরণে আসিল। রাজা তখন শকুন্তলার চক্ষুকোণলগ্ন অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শকুন্তলাকে সেই অভিজ্ঞান স্বরূপ অঙ্গুরীয়কটি প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন—"ঋতুসমাগমের চিহ্নস্বরূপ কুসুমটিকে লতা আবার ধারণ করুক।" কুসুমটি এখানে অঙ্গুরীয়, লতা শকুন্তলা। শকুন্তলা সে অঙ্গুরীয় লইল না। যে অঙ্গুরীয় তাহাকে এত কষ্ট দিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস নাই। প্রিয়তমের স্মৃতিচিহ্ন প্রিয়তমের নিকটই থাক। বাহ্য স্মৃতিচিহ্নে আর অবশ্যক নাই।

পতির সহিত মহর্ষি মারীচের আশ্রমে যাইতেও শকুন্তলার লজ্জা। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানব প্রকৃতির

পরিবর্ত্তন। মহর্ষি তখন শকুন্তলার কর্ত্তব্যচ্যুতির ফল স্বরূপে দুর্ব্বাসা শাপের কথা দুষ্মন্তকে জানাইলেন। শকুন্তলার চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হইল—ভাগ্যবশতঃ আর্য্যপুত্রকে অকারণ ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগী হইতে হইল না। এতবড় নিন্দা হইতে আর্য্যপুত্র যে নির্ম্মুক্ত হইলেন ইহাতেই শকুন্তলার আনন্দ। এত যে দুঃখ গেল তাহার জন্য আর্য্যপুত্র অনুযোগার্হ ন'ন ইহাতেই পতিব্রতার তৃপ্তি। পতিকে কেহ লজ্জা দিবে না, প্রেমহীন, নির্দ্দয় ভাবিবে না—ইহা সতী সাধ্বীর বড় রকমের সান্ত্বনা। কখন্ সে ঋষি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সে জানিতেই পারে নাই।

শকুন্তলার পুত্রটি মারীচের আশ্রমে প্রসূত। সেই স্থানে মহর্ষি কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয় সংস্কার প্রাপ্ত। পুত্রটির নামকরণ হইয়াছে ভরত। তারপর মহর্ষি মারীচের ও দাক্ষায়ণী অদিতির আশীর্ব্বাদটিকে রক্ষা-কবচের মত গ্রহণ করিয়া দুষ্মন্ত দেবরাজের আকাশ-বিহারী রথে আরূঢ় হইয়া স্ত্রী পুত্র সহ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ শকুন্তলাকে শ্রদ্ধার মত, পুত্রটিকে বিত্তের মত, রাজা দুষ্মন্তকে বিধির মত অভিনন্দিত করিল।

পতি-বিরহিণী সীতা বাল্মীকি আশ্রমে, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা শকুন্তলা মারীচ আশ্রমে। দুই জনেই বিরহে দীনা ক্ষীণা ও পরিম্লানা—আতপ-তাপতপ্তা বল্লীর মত শোচনীয় অবস্থায় উপনীতা। প্রিয়সমাগমে আবার উভয়েই বায়ুকম্পিতা লতাটির মত আন্দোলিতা।

কালিদাসের বিরহিণী শকুন্তলার ছবি, আর ভব-ভূতির বিরহিণী সীতার ছবি সকল বিষয়ে ঠিক একরূপ নহে। বাল্মীকির সীতার তুলনায় ভবভূতির সীতা ভিন্নরূপ। ভবভূতি নিজের চিত্রিতা সীতাটিকে বাল্মীকির সীতাপেক্ষা অধিকতর সুন্দর করিতে পারেন নাই। কিন্তু কালিদাস যে পুরাণ চিত্রিতা শকুন্তলাপেক্ষা আপনার শকুন্তলার চিত্রটি অধিকতর সুন্দর এবং হৃদয়-গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

নগবালা

(উপন্যাস)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের প্রস্তাব।

পরদিন বেলা তিনটার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময়ী মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আজ কি আমি বাড়ীতে থাকবো? সেটা কি ভাল দেখাবে? ভদ্রলোকের মেয়েরা কি নিজের বিয়ের কথা শোনবার জন্যে কাণ পেতে বাড়ীতে বসে থাকে? তোমরা ঐ সব কথা কইবে, আমার কিন্তু বড্ড লজ্জা করবে, বাপু।"

মাতা চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, বাড়ীতে বসে বসে সে সব কথা শোনা তোমার মোটেই ভাল দেখাবে না। আজ তুমি বাড়ীতে না থাকলেই ভাল হয়। জ্যোতিঃপ্রকাশ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তুমি তোমার কলেজের সখীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিও; সন্ধ্যার পরই কিন্তু বাড়ীতে ফিরে এস।"

জ্যোতির্ম্ময়ী এত সহজে চতুরা মাতাকে প্রতারিত করিতে পারায় অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া বলিল, "আমি সন্ধ্যার পর বাইরে থাকব না। এই বিভাময়ীর সঙ্গে একটু গল্প

ন্ন করেই চলে আসবো।" এই বলিয়া সে যথা সময়ে কৃষ্ণকমলের সহিত মিলনের জন্য চলিয়া গেল।

কিন্তু তোমরা প্রশ্ন করিতে পার, বিভাময়ী কে? আমরা এ জগতে বিভাময়ীর কোনও অস্তিত্ব দেখি নাই। বিভাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ীর কাল্পনিক সখী; তাহার নামে জ্যোতির্ম্ময়ী অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছে; তাহার বিবাহোপলক্ষে একদিন সে কৃষ্ণকমলের সহিত চন্দননগরের হোটেলে গিয়া প্রেমলীলা করিয়া আসিয়াছে; আজও তাহারই সহিত গল্প করিবার অছিলায় কৃষ্ণকমলের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী বাটী ত্যাগ করিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে, বেলা চারিটার সময়, জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহাদের বাটীতে আসিয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর জন্য সেই মনোরম এবং প্রেমস্মৃতি বিজড়িত কক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মাতা প্রায় পনের মিনিট পরে অতি শুভ্র ও নির্ম্মল বেশ ধারণ করিয়া, সস্মিত মুখ ঈষৎ গম্ভীর করিয়া, মন্থর গমনে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং আবার অবনত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পূজ্যা মাতা ঠাকুরাণীর সম্পূর্ণ ধূলি বিবর্জ্জিত সুন্দর পদের পদধূলি গ্রহণ করিল; এবং তিনি অগ্রে আসন গ্রহণ করিলে, সেও উপবেশন করিল।

মাতা প্রথমেই গম্ভীর মুখে জ্যোতিঃপ্রকাশের আশা, বা পূর্ব্বদিনের মত প্রণয়িনীর সস্মিত মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "আমার মেয়ে জ্যোতি তার এক কলেজের সখীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে; সন্ধ্যার পর ফিরবে; আজ আর তোমার সঙ্গে তার দেখা হ'বে না।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ আশাহত হইয়া কহিল, "কিন্তু—কিন্তু তার থাকলেই ভাল হ'ত। আজ তারই সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আপনাকে বলবার জন্যে আপনার কাছে এসেছি, কথাটা তার সাক্ষাতে বলবারই আমার ইচ্ছা ছিল।"

মাতা বুঝিলেন, জ্যোতিঃপ্রকাশের বিশেষ কথাটা কি। কিন্তু তাহা বলিলে ত ছলনার খেলা হয় না। তাই তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "এমন কি কথা?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, "সে কি কোন কথা আপনাকে বলে, যায় নি?"

মাতা পূর্ব্ববৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কই না, আমাকে ত কোন কথা বলে যায়নি। শুধু বল্লে মা, আমার একটুকু দরকার আছে, কলেজ বোর্ডিংএ একবার বিভাময়ীর সঙ্গে দেখা করতে যাব। ঐ টুকুই শুন, আমার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যায় না। নইলে আজ কালকার কলেজে পড়া মেয়ে…"

জ্যোতিঃপ্রকাশ হৃদয়ের কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "বিভাময়ী কে?"

মাতা বলিলে, "ঐ ত জ্যোতির একজন সমবয়সী;—এমন ভাব দেখবে না, ঠিক যেন মা দুর্গার দুই সখী জয়া আর বিজয়া। নামেরও কেমন খাসা মিল আছে—জ্যোতির্ম্ময়ী আর বিভাময়ী, জ্যোতি মানেও বিভা, আবার বিভা মানেও জ্যোতি। কিন্তু এখন ওসব কথা যেতে দাও। তুমি আমাকে কি কথা বলতে এসেছিলে, বাবা?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ মাতার এই স্নেহপূর্ণ 'বাবা' সম্বোধনে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। ভাবিল, ভদ্র মহিলাগণ, পুত্রের ন্যায়, স্নেহাধিক্যবশতঃ জামাতাকেও এইরূপ 'বাবা' সম্বোধন করিয়া থাকেন। তবে কি দেবীতুল্য পূজ্যা মাতাঠাকুরাণী তাহার বিশেষ কথা শুনিবার আগেই দেবতার মত অন্তর্যামিনী হইয়া, তাহাকে জামাতা ভাবিয়া লইয়াছেন? সে এই শুভ সুযোগ দেখিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি জ্যোতির্ম্ময়ীর বিয়ের কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম।"

মাতা মহা বিস্ময়ের ভাণ দেখাইয়া বলিলেন, "বিটে? কোথায়, কার সঙ্গে বিয়ে? তুমিও আগে থেকে জান বাবা, আমি ত তার মনোমত বর ছাড়া, আর কারও সঙ্গে তার বিয়ে দেব না। আবার সেই মনোমত বর মুচি মেথর হলেও চলবে না। সে খাঁটী কুলীন বামুন ও বেশ বিদ্বান্ হওয়া চাই। জাত খুইয়ে মুখ্যুর হাতে মেয়ে দেওয়া বড় জালা! তাতে, এর পরে মেয়েকেও পচ্‌তাতে হবে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ ভাবিল, সে কুলীন বামুন বটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারীও বটে, এবং তাহার উপর

প্রণয়িনী তাহাকে মনোমত বলিয়াও সার্টিফিকেট দিয়াছে। ভাবিয়া, সে মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ সৎসাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল, "আপনি যদি আমাকে তার অনুপযুক্ত মনে না করেন, তা'হলে আমার সঙ্গে তার বিয়ে হ'তে পারে। সে আমাকে যথার্থই ভালবাসে।"

মাতা বলিলেন, "আমরাও তাই কিছু কিছু সন্দেহ করতাম। তা না হ'লে, তোমার রূপ গুণের কথা বলতে তার মুখে অমন খই ফোটে কেন? কিন্তু সে কি এই অল্প দিনের পরিচয়ে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হ'য়েছে?"

আহা! প্রণয়িনী তাহার রূপ গুণের প্রশংসা করিতে ভালবাসে! সংবাদটা যেন সুধাবর্ষণের ন্যায় মাতার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল। শুনিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের হৃদয় মধ্যে প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মহানন্দে বলিল, "হ্যাঁ মা, সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে; আর সে কথা আজই আপনাকে বলতে বলেছে।"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ! তাকে যদি আমি কিছু জিজ্ঞেস্ করি, তাই বুঝে বিভাময়ীর কাছে পালিয়েছে; তাহলে তার দরকার টরকার সব মিছে। ওঃ, কি দুষ্ট!—আমি তোমার মুখে কথাটা শুনে, এখন সব বুঝতে পারছি;—এটা শুধু লজ্জা! মেয়েটার ঐ একটা দোষ,—ভারি লাজুক। বিয়ে করবি, বেশ ত; তাতে লজ্জা কিরে বাপু? এত লজ্জা, সে বাড়ীতেও থাকতে পারলে না; একবারে বিভার কাছে ছুট্‌লো। নাঃ, তুমি কিছু মনে ক'র না, বাবা। এর পর, একটু বয়স হলেই ওটা সেরে যাবে। আমারও ছেলেবেলায় অমনি লজ্জা ছিল; তিনি আস্‌তেন, আর আমি অমনই সাত হাত ঘোমটা টেনে কোণে গিয়ে লুকোতাম। সেও আজ ঐ লজ্জার জন্যেই পালিয়েছে। নইলে তোমার আসতে একটু দেরী হ'লে, ও অস্থির হ'য়ে, এদোর ওদোর করে বেড়ায়;—আজ তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা না করেই চলে গেল!"

লজ্জাশীলা গর্ভধারিণীর গর্ভজা, লজ্জাময়ী, তদ্গত প্রাণা প্রেয়সীর প্রিয় প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রেমপূর্ণ হৃদয় পরমানন্দে, প্রসারিতপুচ্ছ শিখীর ন্যায়, নৃত্য করিতে লাগিল। বোধ হইল, তাহার নৃত্যশীল হৃদয়ে প্রণয়িনী সম্বন্ধে মাতার কথাগুলি যেন নূতনতরই বাদ্য। সে উৎফুল্ল মুখে কহিল, "তা'হলে আপনি এ বিয়েতে অনুমতি দিয়ে, তাঁকে আর আমাকে চিরদিনের জন্যে সুখী করুন।"

মাতা ঠাকুরাণী বলিলেন, "তোমাদের চির সুখই আমারও আন্তরিক কামনা; তাই এ বিয়েতে আমি কখনই অমত করবো না। কিন্তু, আমার বোধ হচ্ছে, তোমার মা আর বাবা, এরকম ভালবাসার বিয়েতে সম্মত হ'বেন না। তার উপর, সে বিয়ে যদি বিনা পণে সম্পন্ন হয়, তাহলে কৃপণ মানুষ একেবারে বিমুখ হ'বেন। তাঁদের সম্বন্ধে কি করা উচিত, তুমি একটু ভেবে আমাকে বোলো।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ মাতার উপদেশ অনুযায়ী একটু ভাবিল; ভাবিয়া বলিল, "আমি ভেবে দেখলাম, বিয়েতে তাঁদের মত না নেওয়াই ভাল; বিয়ের কথাটা, বিয়ের আগে পর্য্যন্ত তাঁদের জানতে দেওয়া হবে না। কি জানি, বিয়ের দিনে, যদি কোনও বাধা দেলেন। তার পর, বিয়ে হয়ে গেলে, বাবা যদি জানতে পারেন, তিনি যা ইচ্ছে করতে পারেন; তখন আমি তাঁর মতামত গ্রাহ্য করবো না। জ্যোতির্ম্ময়ীকে লাভ করে, বাপ মাকে যদি জন্মের মত ত্যাগ করতে হয়, তাও আমি করবো। আপনি তাদের কথা ভেবে একটুও সময় নষ্ট করবেন না।"

মাতা একটা বিয়ের ভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। কহিলেন, "আচ্ছা তাদের ভাবনা আর আমি ভাববো না। এখন এস, তোমাদের বিয়ের একটা শুভদিন ঠিক করে ফেলা যাক।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তা' যে দিন আপনি ধার্য্য করবেন তাই আমরা শিরোধার্য্য করে নেবো। তবে আমার বিবেচনায় শুভদিনটা আমার চাকরীর গেজেট হয়ে যাওয়ার পর হলেই ভাল। আমি খবর নিয়েছি, আসছে শনিবার ইণ্ডিয়া গেজেটে খুব সম্ভব, আমার চাকরীর খবর বেরুবে।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু বিয়েটা তার আগে হ'লে ক্ষতি কি?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কহিল, "চাকরীর আগে, আমার নিজের কোন বাড়ী থাকবে না; কেন না, আমার তখন কোন আয় না থাকায়, বাড়ী রাখার জন্যে ব্যয় করতে পারবো না। কাযেই জ্যোতির্ম্ময়ীকে নিয়ে বাবার বাড়ীতে উঠতে হবে। কিন্তু বাবার অমতে বিয়ে করায়, একটা গোলমাল বাধতে পারে। আমার শিক্ষিতা ও সভ্যা স্ত্রী সে অসভ্যতা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না; আর সেটা সহ্য করা আমারও ইচ্ছা নয়। আমার স্ত্রীকে একেবারে আমার সুসজ্জিত বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, আমার স্ত্রীর মত রাখতে চাই।"

আপন পরিণীতার প্রতি ভাবী জামাতার সদ্বিবেচনা দেখিয়, মাতাঠাকুরাণী প্রীতা হইলেন। এবং কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "চাকরীর খবরটা পেলে, বিয়ের দিনটা করাই ভাল। তুমি শীগ্‌গির আমায় খবরটা এনে দিও বাবা।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, "ঠিক তিন দিনের মধ্যেই খবরটা পাব। আর তখনই তা আপনাকে জানাব।"

অতঃপর, মাতাঠাকুরাণী জ্যোতিঃপ্রকাশকে কিছু জলযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহা খাইতে সানন্দে সম্মত হইল।

পূর্ব্বেই মাতাঠাকুরাণী বাজার হইতে কিছু 'স্বহস্ত প্রস্তুত' খাদ্য সামগ্রী আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা তিনি পরিচারিকার দ্বারা আনাইয়া, ভাবী জামাতাকে পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইয়া, নিজের উৎকৃষ্ট রন্ধনের বিপুল সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ কিয়ৎ কালের জন্য রাজপথে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, দেশজয়ী বীরের মত, পাদচারণা করিতে লাগিল; এবং তদ্গতপ্রাণা প্রণয়িনীর সরম সঙ্কুচিত সরল মুখ খানির কথা ভাবিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়, নির্জ্জন ও পরিত্যক্ত বাগান বাটীতে, বহু মদ্যপানে বিহ্বল কৃষ্ণকমলের কণ্ঠলগ্ন হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিঃপ্রকাশের এবং মাতার সকল কথা সুখে ভুলিয়া গিয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ঋণ পরিশোধ।

মালতী আপন শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বুঝাইয়া বলিল, "মা, তুমি মনে কোর না, আমি ওকে বারণ করেছিলাম, তাই ও আমার লুচি খাবার ঘি ময়দা কিনে আনেনি। আমি সত্যি বলছি মা, এখন আমার লুচি খাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে; আর তোমার কথা অমান্য করবার ওর এতটুকু ইচ্ছে নেই।"

শ্বশ্রূ। তবে ঘি ময়দা কিনে আনলে না কেন?

মালতী। তাতো, মা, আগেই তোমাকে বলেছি। ওর ছেলেবেলাকার বন্ধুকে তুমি ত, মা, খুব জান। সে এই পাড়ারই ছেলে; তার নাম, জ্যোতিঃপ্রকাশ; সে অনেক পাশ করেছে। সে পনেরো ষোলদিন আগে, তার মার জন্যে, দশ টাকা ধার চায়। ওর পকেটে তখন দশ টাকা ছিল। তোমার ছেলের স্বভাব ত তুমি খুবই জান, মা। ও কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না; ও নিজের কাছে পয়সা থাকতে কখনও নেই বলতে পারে না। তার উপর, কেউ চাইলে, তাকে না দিয়ে থাকতে পারে না। জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু পাড়ার লোক, ছেলেবেলাকার বন্ধু, তার উপর, আর কারু জন্যে নয়, তার মার জন্যে, কেবল দু'তিন দিনের মত টাকাটা ধার চাচ্চে, সে কেমন করে ধার না দিয়ে থাকবে? সেটা কি ভাল হত?

শ্বশ্রূ। তা টাকাটা ধার দিয়েছিল, সে ত ভাল কাযই করেছিল। কিন্তু টাকাটা আবার চেয়ে নেইনি কেন?

মালতী। সেই পর্য্যন্ত সেই বন্ধুর সঙ্গে ওর আর দেখা হয়নি।

শ্বশ্রূ। রমেশ ত তাদের বাড়ী চেনে; তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করেনা কেন?

মালতী। তাদের বাড়ীতে চার পাঁচ দিন গেছে। কিন্তু সে চারটের পর থেকে কোন কোনও দিন রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত কোথায় থাকে তা তার বাড়ীর লোকও জানে না, তার বন্ধুরাও জানে না।

শ্বশ্রূ। তার অপেক্ষায় সেই এক প্রহরের পর পর্য্যন্ত বসে থাকে না কেন?

মালতী। বাঃ, অত রাত্রি করলে তুমি বুঝি ভাববে না মা?

শ্বশ্রূ। তা ভাববো। কিন্তু তার মাকে বলেনি কেন? তার মা-ই ত টাকা ধার দিয়েছে; মাই টাকা শোধ করে দিত।

মালতী। আমিও ঠিক ঐ কথাই ওকে বলেছিলাম। তাতে ও বল্লে যে, টাকাটা ত তার মাকে সে নিজে হাতে করে দেয়নি; ওর বন্ধুরই হাতে দিয়েছিল। আর, ওকে তাদের বাড়ীতে কতবার আনাগোনা করতে দেখেও তার মা যখন আপনা থেকে টাকাটা শোধ করে দেননি, তখন জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু বোধ হয়, টাকাটা ঠিক ওর কাছ থেকেই ধার নিয়েছে বলে, তার মার কাছে প্রকাশ করেনি। এই জন্যে, আর বন্ধুর মাকে সমীহা করে, আর কতকটা লজ্জায়, ও টাকাটা মার কাছ থেকে চাইতে পারেনি। আজ ত আবার তাদের বাড়ীতেই গেছে। আজ বলে গেছে, একটু বসে জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে দেখা করে একবারে টাকাটা নিয়ে আসবে। একটু দেরী হলে আমাদের ভাবতে বারণ করে গেছে।

মালতী যখন ঘৃত ময়দা ক্রয়ের অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইবার উপরিউক্ত বিবরণ শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে বিবৃত করিতেছিল, এবং মালতীর প্রাণেশ দরিদ্র রমেশ যখন বন্ধুবরের বাটীর অন্ধকারময় দরজায় নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল, তখন জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটী হইতে ভাবী শ্বশ্রূঠাকুরাণীর স্বহস্ত প্রস্তুত জলখাবার ভারে উদর, এবং অবিলম্বে জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিবার আশায় হৃদয়—পূর্ণ করিয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিল।

দ্বারের কাছে রমেশের বলিষ্ঠ মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিশেষ বিচলিত হইয়া বলিল, "রমেশ যে!"

রমেশ বলিল, "হ্যাঁ ভাই, সেই টাকাটার জন্যে এসেছিলাম।"

যে মেধাবী জ্যোতিঃপ্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ গণিত-তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিল, সে যে পক্ষকাল মাত্র ঋণ গ্রহণ ও নবার্জ্জিত সুহৃদের সহিত চা কাটলেট প্রভৃতির আনন্দজনক আহার, ও পকেটস্থ অবশিষ্ট অর্থের দুঃখ ও অপমানজনক অন্তর্দ্ধান প্রভৃতির চিরস্মরণীয় কাহিনী ভুলিয়া যাইবে, ইহা তোমরা সম্ভবপর মনে করিও না। তথাপি জ্যোতিঃপ্রকাশ ঋণদাতা বাল্য বন্ধুর নিকট বিস্মৃতের ন্যায় ব্যবহার করিল। মুখে বিস্ময়ভাব প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ টাকা ভাই?"

রমেশ বুদ্ধিমান বন্ধুর বিস্মৃতিতে কিছু চিন্তিত হইয়া কহিল, "সেই যে, পনের দিন আগে, সেই মতিলালের দোকানের সমুখে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে তোমার মার জন্যে দশ টাকা ধার নিয়েছিলে।"

রমেশের এই উক্তিতে জ্যোতিঃপ্রকাশ একটু চিন্তিত হইল;—চিন্তিত হইবারই কথ; পাপীর মন সর্ব্বদা সকল সরল বাক্যের কদর্থ্যই গ্রহণ করে। সে ভাবিল, রমেশ, মতিলালের দোকানের সমুখে টাকা দিয়াছে, এ কথার উল্লেখ করিল কেন? মতিলাল কি তবে রমেশের আলাপী দোকানদার? তাহাকে কি গোপনে সাক্ষী রাখিয়া সে ঐ দশ টাকা ধার দিয়াছে? বন্ধুকে এত অবিশ্বাস? কি ভয়ানক লোক! এই ভয়ানক লোকের কাছে সে আর মিথ্যা বলিতে সাহস করিল না। তথাপি সে যাহা বলিল তাহাকেও সত্য বলা যাইতে পারে না। সে আবার একটু বিস্ময় দেখাইয়া বলিল, "ওঃ! সেই টাকাটা মা এখনও দেন নি? তুমি অনায়াসেই চেয়ে নিতেই পারতে।"

রমেশ বলিল, 'তাঁর কাছে চাইতে আমায় লজ্জা করেছিল।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, "এতে আর লজ্জা কি? আচ্ছা তুমি আমাদের বাইরের ঘরে একটু বস, আমি চেয়ে এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ রমেশকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

মাতা পুত্রের বাটী প্রত্যাগমনের পদশব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘরের দিকে আসিতেছিলেন, তাঁহার হস্তের প্রদীপালোকে রমেশকে দেখিলেন। কিন্তু তিনি তখন আপন পুত্রকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন; তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে তখন আর কাহারও কথা স্থান পাইল না।

তিনি প্রথমে পুত্রকে স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "এস; আজ বাইরে যাবার সময় জলখাবার খেয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলে বাবা, জলখাবার গোছানই আছে; এনে দিই খাও।"

পাপী কখনও আপন কৃতকর্ম্মে সুখী থাকিতে পারে না। এজন্য জ্যোতিঃপ্রকাশ সর্ব্বদাই বিরক্ত হইয়া বাটী প্রবেশ করিত। আজ আবার দ্বারে পাওনাদার রমেশকে দেখিয়াছিল; কাযেই আজ তাহার বিরক্তি মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল। সে মাতার স্নেহপূর্ণ বাক্যের রূঢ় শব্দে উত্তর করিল, "না, আজ কিছু খাব না।"

মাতা শঙ্কিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? খাবে না কেন বাবা?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ পূর্ব্বের ন্যায়, রুক্ষস্বরে কহিল, "কেন খাব না, আবার কি? খাব না ব্যাস্।"

পুত্রের বিরক্তিজনক খাবার কথা আর উত্থাপন না করিয়া মা কহিলেন, "বাইরের ঘরে যে ছেলেটি বসে রয়েছে, ও তোমার বন্ধু রমেশ নয়? আরও চার পাঁচ দিন ও তোমার খোঁজে এসেছিল। তোমার কাছে ওর কি দরকার আছে বাবা?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান পুত্র; মাতার নিকট বন্ধুর দরকার উদ্ভাবন করিতে তাহার একটুও বিলম্ব ঘটিল না। সে একটু চিন্তা করিয়াই বলিল, "দরকার আমার কাছে নয়, ওর দরকার তোমার কাছে।"

মাতা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ সত্যবাদীর ন্যায় কিছু জোরের সহিত কহিল, "হাঁ, তোমার কাছে। ও তোমার কাছ থেকে কুড়িটা টাকা ধার চায়। বলে মাইনে পেলেই টাকাটা শোধ করে দেবে; আর দশ আনা পয়সা সুদও দিয়ে দেবে।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন হঠাৎ ওর টাকার দরকার হল কেন?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, "জানই ত ওদের চিরকালই দুঃখ, চিরকালই অভাব।—ঐ ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী, বাড়ীর ট্যাক্স দিয়ে এই কলকাতায় তিনটে লোকের খাওয়া পরা চলে?"

মাতা বলিলেন, "আহা, রমেশ বড় ভাল মানুষের ছেলে। আগে তুমি ওকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে আসতে; আমি তোমার সঙ্গে ওকে জলখাবার দিতাম। এখন ত আর আন না। আজ ওকে বাইরের ঘরেই তোমার জলখাবারটা ওকে খেতে দিয়ে এস। আর বলগে, আমি তাকে এখনই কুড়িটা টাকা ধার দেব।"

পেটে না খাইয়া ক্ষুদ কুঁড়া জড় করিয়া মাতা প্রায় দুইশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি তাহা দরিদ্র প্রতিবেশীদিগকে ঋণ প্রদান করিয়া সুদে মাসে মাসে দুই এক টাকা উপার্জ্জন করিতেন; এবং ঐ উপার্জ্জিত অর্থ স্বামী পুত্রকে কিছু সুখাদ্য খাওয়াইবার জন্য ব্যয় করিতেন। তিনি ঐ অর্থ হইতেই রমেশকে কুড়ি টাকা ধার দিবেন স্থির করিয়াছিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ মাতার নিকট হইতে জলখাবারের স্থালী পাইয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরের ঘরে রমেশকে খাইতে দিল; এবং বলিল, "তুমি বসে জলখাবার খাও। ততক্ষণ মার কাছ থেকে তোমার টাকা নিয়ে আসি।" এই বলিয়া সে সেই স্বল্পকাল মধ্যে আবার মাতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মাতা জ্যোতিঃপ্রকাশকে লইয়া উপরে উঠিলেন; জ্যোতিঃপ্রকাশের সম্মুখে বিছানার নিম্ন হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিলেন; এবং তাহারই সম্মুখে বাক্স খুলিয়া, তাহা হইতে বিংশ মুদ্রা লইয়া অবশিষ্ট টাকা গণিয়া দেখিলেন যে বাক্সে তখনও তাঁহার একশত কুড়ি টাকা রহিল। পরে বাক্স বন্ধ করিয়া, তিনি রমেশকে দিবার জন্য জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্তে কুড়ি টাকা দিলেন; এবং চাবি অঞ্চলে বাঁধিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ যেন কিছু আগ্রহপূর্ণ লোচনে মাতাকে বাক্সের অবশিষ্ট টাকা গণিতে দেখিল, এবং চাবির গুচ্ছ অঞ্চলে বাঁধিতে দেখিল। তাহার পর, কি ভাবিতে ভাবিতে, বাহিরের কক্ষে আসিয়া এই কুড়ি টাকা হইতে দশ টাকা দিয়া রমেশের ঋণ পরিশোধ করিল; এবং অবশিষ্ট দশ টাকা নিজ পকেটস্থ ব্যাগে সঞ্চয় করিল।

রমেশ টাকা পাইয়া রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বেই, একবারে দোকান হইতে ঘৃত ও ময়দা, এবং বিধবা মাতার জন্য কিছু কদলী আম ও সন্দেশ লইয়া হাসি মুখে মাতৃসন্নিধানে ফিরিয়া আসিল। দ্রব্য সকল মাতার কাছে রাখিয়া, রমেশ মালতীর সন্ধানে দিকে দিকে তাহার প্রেম ও আগ্রহময় দৃষ্টি পাঠাইয়া দিল।

মালতী রমেশের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল; সুতরাং স্বামীর আগ্রহময় দৃষ্টি তাহার নয়নগোচর হয় নাই। তথাপি সে তাহার প্রত্যেক ধমনীতে ধমনীতে স্বামীর সেই প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির মধুর ঝঙ্কার অনুভব করিয়াছিল। করিয়া সে হাতের কাচ নির্ম্মিত চুড়িগুলি বাজাইয়া টুন্ টুন্ শব্দ করিয়া স্বামীকে আপন সন্ধানের ও সন্নিধ্যের কথা বলিয়া দিল।

দরিদ্র রমেশের হৃদয় সেই মৃদু টুন্ টুন্ শব্দেই ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধাতার বাধা।

শ্রাবণ মাস গত হইতে আর সাত দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। রামপ্রাণবাবু বধূ নগবালাকে পাথরকোণা গ্রাম হইতে নিজালয়ে আনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ভাদ্রমাসটা হিন্দুর পক্ষে অশুভ মাস; সে মাসে ত শুভযাত্রা হইতে পারে না; এই শ্রাবণ মাসেই একটা শুভ দিন দেখিয়া বধূকে লইয়া আসিতে হইবে। তিনি গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, পঞ্জিকা দেখিয়া, ৩০শে শ্রাবণ সোমবার শুভদিন নির্ণয় করিলেন। এবং পাথর-কোণা গ্রামে ভবতারণ বাবুকে তৎসংবাদ প্রেরণ করিলেন। লিখিলেন যে, ঐদিন শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবাজী পাথরকোণায় যাইয়া শ্রীমতী বধূমাতাকে কলিকাতার বাটীতে লইয়া আসিবে।

আজ সন্ধ্যায় সময়, আফিস্ হইতে বাটীতে ফিরিয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে প্রত্যাগত জানিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, নিম্নতলের বারান্দায় বসিয়া জল খাবার খাইতে খাইতে পুত্রকে আহ্বান করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ তখন দ্বিতলে আপন কক্ষে শুইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর বিধুবদনের স্বপ্ন দেখিতেছিল; সেইদিন রমেশের ঋণ পরিশোধ হওয়ায়, এবং কিছু অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় তাহার স্বপ্নের গগনে একটুও দুশ্চিন্তার মেঘ ছিল না; কেবল প্রেয়সীর বিধুমুখের জ্যোতিতে সেই স্বপ্নলোক প্লাবিত ছিল। এমন সময় বিধাতা সেই সুখ স্বপ্নে বাধা উৎপাদন করিলেন; পিতার কর্কশ আহ্বানে তাহার সুখ স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সে সমস্ত মুখখানায় বিরক্তির কালিমা মাখিয়া নিম্নে নামিয়া আসিল; ও পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল।

রামপ্রাণবাবু পুত্রের বিরক্তি লক্ষ্য না করিয়া অবনত মুখে খাইতে খাইতে বলিলেন, "বৌমাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে ৩০শে শ্রাবণ সোমবার শুভদিন স্থির করে, ভবতারণ বাবুকে পত্র লিখেছি। তুমি ঐ দিন কিংবা তার পূর্ব্ব দিন পাথরকোণায় গিয়ে বৌমাকে সঙ্গে করে, নিয়ে আসবে; স্বামীর সঙ্গে যাত্রায় কোনই অমঙ্গল নেই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ ভাবিল, তাহার প্রেমময়ীকে বিবাহ করিবার আগে, বিবাহিতা পত্নী আসিয়া কি দুর্জ্জয় বাধা জন্মাইবে! সে গমনোন্মুখ হইয়া পিতাকে রুক্ষস্বরে কহিল, "তাকে এখন আনা কেন?"

পিতা বলিলেন, "সামনে ভাদ্র মাস; ভাদ্রমাসে ত আনতে নেই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ ভাবিল, কি কুসংস্কার! মুখে বলিল, "আচ্ছা! সে ত এখনও সাত দিন সময় আছে; এর পর ভেবে দেখা যাবে এখন, আনতে যেতে পারব কি পারব না।"

রামপ্রাণবাবু বুঝিলেন, পুত্র লজ্জাশীল; পিতার নিকট, বধূকে আনিবার জন্য সে আগ্রহ দেখাইতে চাহে না। বুঝিয়া তিনি তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহার অবসর দিল না। সে সত্বর সেস্থান পরিত্যাগ করিল; এবং দ্বিতলে আপন

কক্ষে যাইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে যে সুখ চিন্তার জন্য স্নেহময় পিতার পবিত্র সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিল, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, সে কি সেই সুখ চিন্তার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল? কেমন করিয়া পাইবে? যতই সুখময় হউক, ভগবান তাঁহার সৃষ্ট মানবকে কখনও পাপ চিন্তার অবসর দেন না। জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপ চিন্তায় তাহার ক্ষণে ক্ষণে বাধা পড়িতে লাগিল। পিতা নগবালাকে আনিবার কথা উত্থাপন করায়, ক্ষণে ক্ষণে নগবালার নন্দনে আনন্দময় আলেখ্যের ন্যায় নির্ম্মল ও সারল্য পূর্ণ মুখখানি তাহার হৃদয় মধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তাহাতে তাহার হৃদয় মধ্যস্থিত পাপ-চিন্তা, আকাশে তপনবিকাশে তমসার ন্যায়, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। মনে বল সঞ্চয় করিয়া আবার সে জ্যোতির্ম্ময়ীর পাপ চিন্তা করিতে লাগিল। আবার কখন নগবালার চিন্তা, মরুভূমিতে মহোৎপলের ন্যায় তাহারও শুষ্ক হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল; ভাবিল, সে কি তাহাকে সেই পল্লীগ্রামে আনিতে যাইবে?—নলিনী আহরণ করিতে হইলে পম্বল-বহুল স্নিগ্ধ পল্লীগ্রামেই যাইতে হয়। কিন্তু বিধাতা কি তাহার ভাগ্যে সে সুখের বিধান করিয়াছেন? মহাপাপী কি পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হইবার আগে পঙ্কজিনীর পবিত্র মধু একবার পান করিতে পাইবে না?

সলিল কম্পিত হইলে, সলিলের উপর পতিত সূর্য্যালোক যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, জ্যোতিঃপ্রকাশের হৃদয় মধ্যে নগবালার নির্ম্মল মূর্ত্তির আবির্ভাবে, তাহার পাপপূর্ণ হৃদয় তেমনই কম্পিত হইয়া উঠিল, সেই হৃদয়ে পতিত জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপ জ্যোতিঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তথাপি সে বিধাতার এই বাধা গ্রাহ্য করিল না; আপন আলোড়িত বক্ষকে যথাসম্ভব শান্ত করিয়া তাহাতে জ্যোতির্ম্ময়ীর ছবি আঁকিতে বার বার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে ত সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপমধ্যে দেবী প্রতিমার ন্যায়, জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপজ্যোতিঃপূর্ণ তাহার হৃদয়মধ্যে, নগবালার স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইতে লাগিল। সে মূর্ত্তি সে মন হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিল; পারিল না। তাহাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য শয্যাত্যাগ করিয়া একটু নড়িল না। রাত্রের আহার জন্য সে নিম্নতলে মাতার কাছে নামিয়া আসিল; নগবালার নির্ম্মল মূর্ত্তিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। আহার সমাধা করিয়া সে নিদ্রা যাইবার জন্য আবার উপরে উঠিল; সেই কম কোমল মূর্ত্তিও তাহার অনুসরণ করিল; শয্যায় শুইয়া নিদ্রার উপাসনা করিল; নয়নের দ্বারে নিদ্রার পরিবর্ত্তে নগবালার অনবদ্য ছবি প্রভাত-নলিনীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। কেন? সে কি কুসুম-মুকুল মধ্যে সঞ্চিত সৌরভের ন্যায় বালিকা নগবালার হৃদয়-সঞ্চিত প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিল? কিংবা ইহা সেই মহাপুরুষের বাধা মাত্র?—আমরা পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তিনি তাঁহার সৃজিত মানবকে পাপাচরণের অবসর দেন না। পাপের অবসর লাভ করিতে হইলে, মানুষের মনোমধ্যে অনেক দুর্লজ্ঘ্য বাধা উপস্থিত হয়। ইহাকেই আমরা বিবেকের কামড় অথবা pangs of conscience বলি। আমরা জ্যোতিঃপ্রকাশের পাপময় জীবনে এইরূপ বিবেকের কামড় বহুবার দেখিব।

সারারাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া পুণ্য বিবেকের সহিত লড়াই করিয়া, এবং শয্যাদি যুদ্ধ ক্ষেত্রেরই মত মথিত করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ অসুস্থ দেহে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিল।

মাতা প্রভাতে পুত্রের মুখ দেখিয়া ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! তোমার মুখ এমন শুকিয়ে গেল কেন?—কে যেন কালী ঢেলে দিয়েছে!" মাতা ত জানিতেন না যে, তাঁহার এই কুলধ্বজ আপন পাপের কালিমায় আপন মুখমণ্ডল অবলিপ্ত করিয়াছে।

জ্যোতিঃপ্রকাশ হৃদয়ের অপ্রসন্নভাব মুখে প্রকটিত করিয়া কহিল, "আমার অসুখ হ'য়েছে; আজ আর কিছু খাব না।"

গৃহিণী গিয়া রামপ্রাণবাবুকে সংবাদ দিলেন।

একমাত্র পুত্রের, পরন্তু সুশিক্ষিত ও আদরের পুত্রের পীড়ার সংবাদে রামপ্রাণবাবুর স্নেহময় প্রাণটা চিন্তা

ভাবে কাতর হইয়া উঠিল। তিনি দ্রুতপদে পুত্রের নিকট আসিলেন; স্নেহময় হস্তে তাহার ললাট স্পর্শ করিলেন; তাহার বক্ষের তাপ অনুভব করিলেন; তাহার হস্ত ধরিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন; এবং বলিলেন, "কপালটা একটু গরম হয়েছে বটে, কিন্তু কৈ নাড়ী ত তেমন চঞ্চল হয়নি। তা' আজ আর ভাত খেয়ে কায নেই; দু'খানা গরম রুটী খাবে এখন।"

পিতার স্নেহস্পর্শে জ্যোতিঃপ্রকাশের পাপ-বিকৃত চঞ্চল মস্তিষ্ক, বোধ হয় কিছু শান্ত হইয়াছিল; সে শান্তভাবে কহিল, "তাই খাব এখন।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ রুটী খাইল; পরে দীর্ঘ দিবানিদ্রা উপভোগ করিয়া অনেকটা সুস্থ হইল। কিন্তু সেদিন আর বাহিরে যাইয়া প্রেমময়ী প্রেয়সীর প্রেমসুধা' পান করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারিল না। পাছে বিরহিণী জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হইয়া আত্ম-হত্যা করে, এজন্য সে এক দীর্ঘ প্রেমপত্র লিখিয়া জানাইল যে, অসুস্থতাই অদ্য তাহার প্রেমপথের বিঘ্ন। যদি সে প্রেয়সীর দারুণ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তবে আগামী কল্য কিংবা পরশ্ব দিবা অবসান কালে প্রিয়তমার পবিত্র প্রেমপূর্ণ সুধাধরের সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া সুস্থ হইতে পারিবে, উপস্থিত প্রিয়তমার বিহনে সে জীবন্মৃত হইয়া রহিল।

তাহার পরদিনও জ্যোতিঃপ্রকাশ কোনও নিগূঢ় কার্য্যের জন্য বাটীর বাহির হইল না। তোমরা স্মরণ রাখিও, এই নিগূঢ় কার্য্যের বিবরণ আমরা পরে জানিতে পারিব।

তাহার পরদিন শনিবার ছিল; এইদিন ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্যোতিঃপ্রকাশের চাকুরীর সংবাদ বাহির হইবার কথা। সে তাহার মাতার নিকট হইতে গেজেটের দাম ও ট্রামভাড়া চাহিয়া লইয়া কলিকাতার অফিস অঞ্চলে গেল, এবং গেজেট কিনিয়া ট্রামগাড়ীতে বসিয়া তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে করিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

গেজেটে তাহার চাকুরীর সংবাদ এইরূপ ছিল।—আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে তাহাকে দিল্লীতে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। দিল্লীনগরীতে যাইবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণ গাড়ীভাড়া ও অন্যান্য পাথেয় পাইবে। দিল্লীতে পৌছিয়া কার্য্যে যোগদান করিলে, আবশ্যকমত একমাসের পর্য্যন্ত বেতন অগ্রিম লইতে পারিবে। শিক্ষানবিশী চারি মাস কালের জন্য মাসিক একশত টাকা বেতন পাইবে। যে পর্য্যন্ত না দিল্লীনগরীতে গভর্ণমেণ্টের নিজ বাটী প্রস্তুত হয় সে পর্য্যন্ত বাটীভাড়া স্বরূপ অতিরিক্ত মাসিক পঁচিশ টাকা পাইবে। শিক্ষানবিশী কালের মধ্যে কার্য্য শিক্ষা করিয়া ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, আগামী বর্ষের জানুয়ারী মাস হইতে মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন, ও একশত টাকা বাড়ীভাড়া স্বরূপ পাইবে। কিন্তু যদি ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারে তাহা হইলে আর তিনমাস কাল শিক্ষানবীশ স্বরূপ থাকিয়া আগামী বর্ষের মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, ঐ চাকুরী পাইবে। কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যোগ্যতানুযায়ী কোন নিম্নশ্রেণীর চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

রামপ্রাণবাবু চাকুরীর সংবাদ শুনিবার জন্য একটু আগেই উৎফুল্ল মুখে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু সংবাদ শুনিয়া তিনি আশানুরূপ সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রিয়-দর্শনপুত্র কলিকাতাতে কোনও চাকুরী পাইয়া তাঁহার দর্শনাতীত হইয়া যাইবে না। এজন্য সুদূর দিল্লীতে চাকুরীটা তাহার পছন্দ হইল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পুত্রের কর্ম্ম হইলেই, মাসে মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা তাঁহার হস্তগত হইবে, এবং তাহা হইতে মাসের পর মাস কিসে কত খরচ করিবেন তাহারও একটা দীর্ঘ তালিকা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন দেখিলেন যে, মাসিক যে একশত টাকা বেতন পাইবে তাহাতে অজানা বিদেশে চাকর বামুন রাখিয়া পুত্রেরই খরচ চলিবে না, তখন সে আর তাঁহাকে দিবে কি? তাহার পর পুনরায় এই পরীক্ষার কথাটায় তাহার মনে বেশ একটু 'খটকা'

লাগিল। কেনরে বাপু! এত পরীক্ষার'পর আবার পরীক্ষা কেন? যদি এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে ত 'চক্ষুস্থির'!

বলা বাহুল্য চাকুরীর সংবাদে জ্যোতিঃপ্রকাশের আশাভঙ্গ হইয়াছিল। সে আশা করিয়াছিল, প্রণয়িনীর উজ্জ্বল রূপের উপযুক্ত গৃহ লইয়া, তাহাকে সেই গৃহের সর্ব্বময়ী গৃহিণী করিয়া রাখিবে;—পঁচিশ টাকা ভাড়ার বাড়ীতে ত তাহা হইবার নয়। সে আশা করিয়াছিল উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে প্রণয়িনীর উজ্জ্বলরূপ আরও উজ্জ্বল করিবে;—হায়, হায়! আপাততঃ একশত টাকা বেতনে ত তাহা হইবার নহে। কিরূপে সে আজ সন্ধ্যাকালে জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটীতে গিয়া এই মহা দুঃসংবাদ তাহার শুভ্রবসনা মহা-মাতাকে শুনাইবে? ইহার চেয়ে যে তাহার মরণই ভাল ছিল। তাহার অগাধ প্রেমকে পরসাহীন করিয়া বিধাতা আবার এ কি বাধা ঘটাইলেন?

কিন্তু এই সংবাদে জ্যোতিঃপ্রকাশের দরিদ্রা মাতা অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "বল কি? জ্যোতি আমার ছেলেমানুষ! সে এই বয়সে, মাসে মাসে একশ' পচিশ টাকা আনবে, সেটা কি আমাদের পক্ষে কম হ'ল? তোমার আশী টাকাতেই আমাদের স্বচ্ছন্দ চলত; এখন আমাদের আয় হবে মাসে, তার দুগুণেরও ঢের বেশী, দু'শ' পাঁচ টাকা; আবার তিন চার মাস পরেই ছেলে আমার পাঁচ শ' টাকা আনবে। তখন ত আমরা রাজার হালে দিন কাটাতে পারবো। তখন তোমার আর চাকুরী করতে হবে না।"

হায়, জ্ঞানহীনা সরলা রমণী! হায়, কুহকিনী আশা!

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের বক্তব্য

২

ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কি প্রকার সম্বন্ধ ইহা বুঝিতে হইলে, বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা এস্থলে শঙ্কর কথিত সৃষ্টি প্রক্রিয়াটী দেখাইতে চেষ্টা করিব। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে একটী চমৎকার রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে,—

"সামান্ত-বিশেষবানর্থো নামব্যাকরণবাক্যে বিবক্ষিতঃ।"

বেদান্তে যে ব্রহ্ম হইতে নামরূপের অভিব্যক্তির কথা আছে, তদ্দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর (অর্থঃ) একটী 'সামান্ত' অংশ এবং একটী 'বিশেষ' অংশ—এই দুই অংশ লইয়াই নামরূপের অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে। চেতন এবং অচেতন বস্তুবর্গের সর্ব্বত্র অসংখ্য সামান্ত ও বিশেষ অভিব্যক্ত হইয়াছে। স্বস্ব বিশেষকে লইয়া, এই সকল 'সামান্ত' পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন। অতি নিম্ন বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বস্তু পর্য্যন্ত এই সকল 'সামান্ত' পর পর ক্রমে—এক পরম সামান্তে অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মই—সেই পরম সামান্ত। পাঠক মূল দেখুন্—

"অনেক হি বিলক্ষণা শ্চেতনাচেতনরূপাঃ সামান্ত-বিশেষঃ তেষাং পারম্পর্য্যগত্যা একস্মিন্ মহাসামান্তে অন্তর্ভাবঃ।"

বৃঃ ভাঃ ২।৪।৯

এই সামান্ত ও বিশেষের অর্থ বুঝিতে হইলে, শ্রুতি অন্যস্থানে কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। বেদান্তের নির্দ্দেশ এই যে, এক সামান্যই বিভক্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ বস্তুরূপে (indviduals) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এবং এই বিশেষ বিশেষ

ব্যক্তিগুলি উহাদের 'সামান্যের' মধ্যেই বীজাকারে অন্তর্ভুক্ত ছিল ; তাহাতেই কর্ম্মপ্রভাবে—ক্রিয়াব্যাপার দ্বারা ক্রমে ব্যক্ত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যে আমরা দেখিতে পাই "নাম-সামান্যে...শব্দবিশেষাঃ সর্ব্বঃ অন্তর্ভবন্তি। সামান্যে হি বিশেষঃ অন্তর্ভবতি" (ছান্দো, ৭।৪।১)। কার্য্যমাত্রই বিশেষ এবং উহার কারণকে তাহার সামান্য বলা যায়। কারণ উহার কার্য্য অপেক্ষা ব্যাপক বা অধিকদেশব্যাপী, এই জন্যই কার্য্য উহার কারণেরই অন্তর্বর্ত্তী থাকে :—

"যচ্চ যস্য অন্তর্বর্ত্তি তদল্পং, ভূয় ইতরৎ :...কারণং হি লোকে কার্য্যাদ্ ভূয়ো দৃষ্টং।" (৭।১২।১)।

এক নাম-সামান্য হইতে সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ যজ্ঞদত্ত দেবদত্ত প্রভৃতি নামগুলি প্রবিভক্ত হইয়া (Differentiated) উৎপন্ন হয়—

"নাম-সামান্যাৎ সর্ব্বাণি নামানি যজ্ঞদত্তো দেবদত্ত ইত্যেবমাদি প্রবিভাগানি উৎপদ্যন্তে প্রবিভজ্যন্তে।" (বৃঃ ভাঃ, ১।৬।১)।

এই সকল সিদ্ধান্ত মনে রাখিলে বেদান্তের কার্য্য কারণের তত্ত্বটীও পরিষ্কার হইবে। কারণের মধ্যেই, উহার পরবর্ত্তী বা পরে অভিব্যক্ত কার্য্যবর্গ বীজাকারে বর্ত্তমান থাকে। পরে, বাহ্য stimulus বা কারক ব্যাপার যোগে ঐ সকল কার্য্যই সুস্পষ্টরূপে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। শঙ্কর আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, জগতে অসংখ্য 'সামান্য' আছে এবং এই সকল সামান্য—নিম্ন হইতে উচ্চতম পর্য্যন্ত এক পরমসামান্য ব্রহ্মবস্তুর মধ্যেই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। এই সামান্যকেই শঙ্কর বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে (১।৩।২৮৩০) "আকৃতি" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুর এই আকৃতি গুলি আপেক্ষিক নিত্য। "নামমাত্রং তু ন লীয়তে, আকৃতি-সম্বন্ধাৎ ; নিত্যং হি নাম।" (বৃঃ ভাঃ, ৩।২।১২)।

এই সকল কথা একত্র করিয়া লইলে আমরা বেদান্তোক্ত নাম-রূপের অভিব্যক্তি বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার তাৎপর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারিব। জগতে যে অসংখ্য ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা নশ্বর, পুনঃ পুনঃ আসিতেছে, যাইতেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই উহাদের আকৃতি বা সামান্য। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর "সামান্য" হইতে তত্তজ্জাতীয় বিশেষ বা ব্যক্তিগুলি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বই পাওয়া যাইতেছে। এই সামান্যগুলি অপেক্ষাকৃত নিত্য। এই সামান্য বা কারণ গুলি যে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা শঙ্কর বেদান্তভাষ্যেও (২।১।১৮) প্রকারান্তরে বুঝাইয়াছেন। বলিয়াছেন যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অভিব্যক্তির জন্য, বিশেষ বিশেষ উপাদান-কারণ আবশ্যক। ঘট জন্মাইতে হইলে মৃত্তিকা চাই ; দুগ্ধ হইলে চলিবে না। ইত্যাদি। এই কথা বেদান্তভাষ্যের ২।২।২৬ সূত্রেও উক্ত হইয়াছে।

"বাচারম্ভণং বিকারো, নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" এই শ্রুতিবাক্যটী বড়ই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। লোকে মনে করে যে এই শ্রুতিদ্বারা জগতের বস্তুগুলিকে বেদান্তে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রুতিটীর এত সহজ অর্থ নহে। ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে এই রূপেই বেদান্তের কদর্থ হইয়া থাকে। আমরা উপরে যে সিদ্ধান্ত দেখাইয়া আসিলাম, তাহা ভাল করিয়া মনে রাখিলে এই প্রসিদ্ধ শ্রুতির সাধারণতঃ যে অর্থ করা হইয়া থাকে, সে অর্থ যে নিতান্ত একদেশদর্শী তাহা নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে। এস্থলে পাঠক দেখিবেন দুইটী বিশেষ শব্দ আছে। একটী 'নামধেয়' শব্দ ; অপরটী 'বাক্' শব্দ। স্বার্থে 'ধেয়' প্রত্যয় হওয়াতে, 'নামধেয়' শব্দটীর অর্থ—নাম মাত্র পাওয়া যাইতেছে। এই শব্দটিরই সহিত মৃত্তিকা শব্দের যোগ আছে, পাঠক তাহাও লক্ষ্য করিবেন। আমরা উপরে যে শঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এক নাম-সামান্য হইতেই বিশেষ বিশেষ দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদি শব্দগুলি ব্যক্ত হইয়া থাকে। এখন পাঠক দেখিবেন, "বাচারম্ভণং" এই বাক্যের বাক্ শব্দটীর অর্থ—বিশেষ শব্দ হইতেছে। তাহা হইলেই সমস্ত শ্রুতিটীর ইহাই অর্থ দাঁড়াইতেছে যে,—বিশেষ বিশেষ যত শব্দ আছে তৎসমস্তই বিকার

ব্যতীত অন্য কিছু নহে।—অর্থাৎ জগতের যাবতীয় নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল বিকার গুলির প্রতিই বিশেষ বিশেষ শব্দ—যেমন ঘট, কপাল, মৃচ্চূর্ণ প্রভৃতি—ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এগুলি মিথ্যা কিন্তু এই বিকার গুলির বা ঘট কপাল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শব্দগুলির মধ্যে, নাম সামান্যটী অর্থাৎ মৃত্তিকাটী সত্য। অর্থাৎ পদার্থ মাত্রেরই সামান্যাংশটী 'সত্য, এবং উহার বিশেষ অংশটী মিথ্যা। অর্থাৎ ব্যক্তি গুলিই—অনিত্য, অসার মিথ্যা। কিন্তু ব্যক্তিগুলিই যে আকৃতি বা সামান্য হইতে অভিব্যক্ত হইতেছে সেই সামান্যটী সত্য।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জগতে চেতন অচেতন বহু সামান্য আছে এবং তাবৎ সামান্যই মূলে এক ব্রহ্মের মধ্যেই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। ভগবদ্গীতায়, "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়…পৌরুষং নৃষু"—এইস্থলে মধুসূদন অর্থ করিয়াছেন "রসতন্মাত্ররূপে ময়ি সর্ব্বে অব্‌ বিশেষাঃ উপ্তাঃ, পুরুষ সামান্যে ময়ি পুংবিশেষাঃ উপ্তাঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, মনুষ্যত্বই (Humanity) হইতেছে সকল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির (individual men) সামান্যাংশ; উহা হইতেই সকলে অভিব্যক্ত হইতেছে; উহাই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। বৃক্ষত্ব জাতির মধ্যে অশ্বত্থাদি বিশেষ বৃক্ষগুলি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা হইতেই উহারা ব্যক্ত হইতেছে। উহাই ইহাদের সত্য অংশ। ব্যক্তিগুলি—জন্মিতেছে, মরিতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু উহাদের মধ্যস্থ সামান্যাংশটী (মনুষ্যত্ব, বৃক্ষত্ব প্রভৃতি), নিত্য অপরিবর্ত্তিত রহিয়া যাইতেছে। ঐ সামান্যাংশটীই, ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্য দিয়া আপনার স্বরূপকে প্রকাশিত করিতেছে। পাঠক পাঠিকা ভাবিয়া দেখুন বেদান্তের ইহাই তাৎপর্য্য কিনা? অমনি কি চট্ করিয়া বলিলেই হইল যে, বেদান্ত জগতের বস্তুগুলিকে 'ইন্দ্রজাল' * বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে!

এই যে আমরা 'সামান্যের' কথা বলিলাম, এগুলিকে বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মের সঙ্কল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্যে ইহাদিগকেই—"সত্যাঃ কামাঃ" বলা হইয়াছে। এইগুলি ব্রহ্মের জ্ঞানে নিত্য বিধৃত রহিয়াছে, তাই ইহাদিগকে সত্য বলা হইয়াছে। ইহারা Kant কথিত Ideas অথবা ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বলিতে গেলে ইহাদিগকে Unchangeable reasons of the things বলা যাইতে পারে। জগৎ সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্ম এই সামান্য গুলিরই "ঈক্ষণ" বা "সঙ্কল্প" করিলে ইহারা নানা প্রকার বিকার বা ব্যক্তির আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এইটী লক্ষ্য করিয়াই ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—

"সমকল্পেতাং বায়ুশ্চ আকাশঞ্চ। সমকল্পন্ত আপশ্চ তেজশ্চ"—ইত্যাদি (ছাঃ ভাঃ, ৭।৪।২)।

অর্থাৎ জগতের তাবৎবস্তু ব্রহ্মসংকল্প দ্বারা অভিব্যক্ত, সুতরাং ইহারা সকলেই যেন সেই সংকল্প বশে নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ছান্দোগ্য-ভাষ্যের অন্যত্র ভাষ্যকার প্রকারন্তরে এই মহাতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের এই সকল মানস-প্রত্যয় এবং বাহ্য বস্তুগুলির মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ এই সকল মানস-প্রত্যয় হইতেই জগতের সকল পরিবর্ত্তনশীল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। শঙ্কর এই কথাটা এইরূপে বলিয়াছেন—

"জাগ্রদ্বিষয়া অপি মানসপ্রত্যয়াভি নির্বৃত্তাএব,
সদীক্ষাভিনির্বৃত্ততেজোবন্নময়ত্বাজ্জাগ্রদ্বিষয়াণাং।
সংকল্পমূলা এব হি লোকাঃ।
……তস্মান্মানসানাং বাহ্যানাঞ্চ বিষয়াণাং
ইতরেতরকার্য্যকারণত্বমিষ্যত এব বীজাঙ্কুরবৎ।"

তৈত্তরীয়-ভাষ্যে, ব্রহ্মের এই সকল "কাম" (সত্যাঃ কামাঃ) কে, ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"আত্মনো হ্নন্যাঃ কামাঃ……সত্যজ্ঞানলক্ষণাঃ আত্মভূতত্বাৎ বিশুদ্ধাঃ।" (তৈ ভাঃ, ২।৬)।

---

* 'ইন্দ্রজাল' ও মায়ার যাহা প্রকৃত অর্থ তাহা অন্যরূপ। "ভূরিচ্যো মায়াবী অন্তঃ" (বেঃ ভাঃ, ১।১।১৭) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

"তেষাং তু তৎপ্রবর্ত্তকং ব্রহ্ম। ন তৈং ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে।"

ব্রহ্ম, এই কাম বা সামান্ত গুলিকে সংকল্প করেন এবং সৃষ্টির নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত করেন। এবং ইহারা তাঁহার স্বরূপ হইতে 'অন্ত' কিছু নহে।

এস্থলে একটী গুরুতর কথা আসিয়া পড়িতেছে। পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি এই বিষয়টীতে আকর্ষণ করিতেছি।

ব্রহ্ম এই কামগুলির সংকল্প করেন বা 'ঈক্ষণ' করেন—শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন। কিন্তু যে যাহাকে চিন্তা করে বা দেখে, তাহাকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে হয়। সুতরাং ব্রহ্ম, এই কামগুলি (Eternal grounds of changeable things) হইতে স্বতন্ত্র হইতেছে। কিন্তু শ্রুতি এই কামগুলিকে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বলিয়া যখন নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং বলিতেছেন, এগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে 'অনন্ত' অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ হইতে ইহাদের কোন স্বাধীন সত্তা নাই তখন ব্রহ্ম কেমন করিয়া আপনারই স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র হইবেন? ব্রহ্ম, আপন স্বরূপকেই চিন্তা করেন বা ঈক্ষণ করেন, ইহাই ত তবে আসিতেছে। এই বিরোধের তবে মীমাংসা কিরূপে হইবে? একবার শ্রুতি, জগদ্বিষয়ক সংকল্পকে ব্রহ্মের স্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন বলিতেছেন; আবার আপন স্বরূপকে জগদ্বিষয়ক কাম বা জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র করিতেছেন। প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে, জগতের দেশকালে ব্যক্ত যাবৎ বস্তু ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে একীভূত হইয়া যায় এবং কেবল ব্রহ্মই থাকেন। শেষ পক্ষ স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের অদ্বৈততা বা একত্বের হানি হয়; কেন না তাঁহাতে জগদ্বিষয়ক জ্ঞানও আছে। ইহার সমাধান তবে কি হইবে?

শঙ্কর ভাষ্যের অনেক স্থলে ব্রহ্মকে জগতের 'সত্তা-প্রদ' বলা হইয়াছে। সৃষ্টি-ক্রিয়ার অর্থই এই যে, জগতের আপেক্ষিক সত্তা ব্রহ্ম হইতে আইসে। নতুবা সৃষ্টি-ব্যাপার নিরর্থক হইয়া উঠে। ব্রহ্ম—পূর্ণস্বরূপ সুতরাং সদ্বস্তু। জগৎ—অপূর্ণ, সুতরাং ইহার পূর্ণসত্তা নাই; পরিচ্ছিন্ন সত্তামাত্র। জগৎ—ব্রহ্মসত্তা হইতে ন্যূন বলিয়াই, ইহাকে অসৎ বলা যায়। যাহা পূর্ণ, তাহা অচঞ্চল, অপরিবর্ত্তনীয়। যাহা অপূর্ণ, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিবার জন্য সতত সচেষ্ট, সুতরাং চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল। শ্রুতিতে ব্রহ্ম—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার জগৎকে তাঁহার কর্ম্ম বা জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জগৎকে যদি ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের নিরপেক্ষ সত্তা থাকে কোথায়? ব্রহ্মের জ্ঞান ত পূর্ণ ও নিরপেক্ষ, উহা ত অপর কোন জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না; সুতরাং জগদ্বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার বাহিরেই পড়িবে। অথচ, তাঁহার বাহিরে ত কোন বস্তু নাই। এ সমস্যার উত্তর কি? জগতের জ্ঞান ব্যতীত যদি ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ ও পূর্ণজ্ঞান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, জগৎ-সৃষ্টির কোন আবশ্যকতা থাকে না; শ্রুতি-কথিত সৃষ্টি-সংকল্প ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং বলিতেই হয় যে, জগতের আপেক্ষিক সত্তা অবশ্যই আছে। অবশ্য সকল সত্তাই এক ব্রহ্মসত্তারই অন্তর্ভূত; জগতের সত্তাও ব্রহ্মসত্তারই নিতান্ত অধীন কিন্তু তথাপি জগতের, আপেক্ষিক সত্তাও স্বীকার করিতেই হয়। জগৎকে কেবল অসৎ বলিলেই ঠিক হয় না, ইহাকে একরূপ সৎও বলিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম সত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে জগতের কোন সত্তা নাই। জগতের সত্তা ব্রহ্মসত্তারই অন্তর্ভূত। একথার প্রকৃত অর্থ এই যে, আপন স্বরূপের বিকাশ করাই ব্রহ্মের 'স্বভাব', ইহাই তাঁহার লীলা। জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপেরই অভিব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ তাহার নিষ্পত্তি হইয়া যায়। তখন অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের এ প্রতীতি সর্ব্বদাই আছে যে, আত্মা নানারূপে আপনাকে বিকশিত করিলেও, ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত করিলেও তদ্দ্বারা আত্মার একত্বের ত কোন ক্ষতি হয় না। আর আত্মার এই প্রকাশ বা অভিব্যক্তিগুলিও আত্মা হইতে

কোন 'অন্য' বা স্বতন্ত্র বস্তু নহে। Distinction যে separation নহে, এই কথা বুঝিতে না পারায়, ভেদ ও অভেদের গোল লোকে পাকাইয়া তোলে। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন করিয়া লইলেও জগৎ কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না; সুতরাং ব্রহ্মের একত্বের ক্ষতি হয় না।

কোন কালবিশেষে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া বা বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে শ্রুতির এরূপ অর্থ বুঝিলে ভুল হইবে। জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কালেরও উৎপত্তি হইয়াছে। স্রষ্টা বলার তাৎপর্য্য এই যে logically ব্রহ্ম পূর্ব্বসিদ্ধ বা জগতের অতীত। সৃষ্টি স্থিতি সংহার বিষয়ক জ্ঞানকে এই জন্যই শঙ্করভাষ্যে নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির পৌর্ব্বাপর্য্য কালগত নহে; এ পৌর্ব্বাপর্য্য logical মাত্র।

এই সকল আলোচনা হইতে আমরা এতদূরে কি বুঝিলাম, এখন পাঠক পাঠিকাকে তাহাই বলিব।

জগতের বস্তুবিষয়ক "নাম"গুলি ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে নিত্য বিধৃত রহিয়াছে। ইহারা ব্রহ্মস্বরূপেরই বিকাশ, শঙ্করাচার্য্য ইহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে 'অনন্য' বলিয়াছেন অর্থাৎ ইহারা তাঁহার স্বরূপ হইতে 'অন্য' বা 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে। ইহারা ব্রহ্মস্বরূপেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ বলিয়া আমরা ইহাদিগকে logically distinguish করিতে পারি। কিন্তু ইহাদিগকে আমরা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া পৃথক করিয়া (separation) লইতে পারি না, কেন না, স্বতন্ত্র করিয়া লইতে গেলেই ইহারা, স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র অপর কোন বস্তু হইয়া উঠিবে এবং তাহা হইলে স্বরূপের একত্বের হানি হইবে। এই জন্যই শঙ্কর বলিয়াছেন—

"যস্তু চ যস্মাদাত্মলাভঃ স তেন অপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ,
যথা ঘটাদীনাং মৃদা।"

"সামান্যং আত্মস্বরূপপ্রদানেন হি বিশেষান্ বিভর্ত্তি।"
(বৃঃ ভাষ্য)

সুতরাং দেখা যাইতেছে জগতের নামরূপ ব্রহ্মের মধ্যে নিত্য অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাঁহারই সংকল্প-বশতঃ, সামান্য হইতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগুলি অভিব্যক্ত হইতেছে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, নাম বা সামান্যাংশ যখন আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তখনই উহার বিশেষাংশ বা রূপাত্মক অংশও অভিব্যক্ত হয়। রূপের অংশটিকেই বিকার বলা যায়। ইহাই অসত্য। কিন্তু নামের অংশটী আপেক্ষিক নিত্য। শঙ্করের কথা শুনুন—

"নামপ্রকাশবশা হি রূপস্য বিক্রিয়াব্যবস্থা।" (বৃঃ ভাঃ)

এই তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারায় লোকে শঙ্করোক্ত অসৎ ও সৎ কথা দুইটির তাৎপর্য্য লইয়া গোল করে এবং এই জন্যই প্রতিবাদকারী পণ্ডিত মহাশয় ভেদ ও অভেদ লইয়া অসৎ তর্ক তুলিয়াছেন।

আর আমরা অধিক বলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। এই সকল কথা যদি তলাইয়া দেখেন, তাহা হইলে তর্কতীর্থ মহাশয় নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

আর একটী কথাও এস্থলে দেখিতে হইবে। এই যে তত্ত্বজাতীয় 'সামান্য' হইতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বিকারগুলি ব্যক্ত হইতে থাকে, ইহার কেহই, সেই অন্তরালবর্ত্তী সামান্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে পারে না। রাম, শ্যাম প্রভৃতি কোন একটা বিশেষ ব্যক্তিতে, আমরা ত 'মনুষ্যত্বের' পূর্ণ বিকাশ দেখি না। এই জন্য কোন বিকাশকেই ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ বিকাশ বলা যায় না। বেদান্তে ইহাকে 'উপাধি-পরিচ্ছিন্ন'রূপ (limited) বলা হয়। "ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী" প্রবন্ধে আমরা গীতার "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া তাহাই দেখাইয়াছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, তর্কতীর্থ মহাশয় সে কথা একেবারে গোপন করিয়া বলিয়াছেন যে, আমরা ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত তাহার বিকাশকে অভিন্ন বলিয়াছি! আর এক কথা এই যে, শঙ্করের 'অনন্য' শব্দের অর্থ অভিন্ন নহে। অথচ প্রতিবাদকারী সেই অর্থই বুঝিয়াছেন? কোন বিকাশই উহার মূলস্থ স্বরূপ হইতে 'অন্য' নহে;—ইহার প্রকৃত অর্থ আমরা

উপরে বলিয়াছি। অন্য নহে—ইহার অর্থ কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বয়ংসিদ্ধ অপর কোন বস্তু নহে। কোন বিকাশকেই উহার স্বরূপ বা 'সামান্যাংশ' হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া, উহাই একটা একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু—ইহা মনে করা যায় না। অজ্ঞ সাধারণ লোক সেই ভাবেই বিকারগুলিকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই অবিদ্যার কাণ্ড। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পরমার্থতঃ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে, বিকারগুলি সেই মূলস্থ স্বরূপেরই 'সংস্থান-ভেদ' বা 'অবস্থান্তর মাত্র' কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে।* এই জন্যই বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর গ্রহণ করিলেও স্বরূপটী ঠিকই থাকে; অন্য কিছু হইয়া উঠে না। বেদান্তভাষ্যে শঙ্করের সিদ্ধান্ত এইরূপ:—

"নহি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তুন্যত্বং ভবতি…স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"।

সুতরাং জগৎ-রূপে দেখা দিলেও, ব্রহ্ম আপন স্বরূপকে ত্যাগ করিতেছেন না, উহা 'অন্য' কোন বস্তু হইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং পরমার্থতঃ, ব্রহ্মের একত্বের কোনই হানি হইতেছে না। বিকারকে, স্বরূপেরই বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে, বিকার সত্ত্বেও ব্রহ্মের একত্বের ক্ষতি হয় না। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এতদ্দ্বারা বিকারগুলি মিথ্যা হইয়াও উড়িয়া যায় না। "ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী" প্রবন্ধে এই মৌলিক তত্ত্বটীই আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

* 'অবস্থান্তর' শব্দটীকে শঙ্কর নিজেই অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। অবস্থান্তর দ্বারা, মূল স্বরূপের প্রকৃতই কোন অবস্থান্তর হয় না।" যদ্ধর্ম্মকো যঃ পদার্থঃ প্রমাণেন অবগতঃ, স দেশকালাবস্থান্তরেষ্বপি তদ্ধর্ম্মকত্বং ন জহাতি।" (বৃহৎ ভাষ্য)।

আদ্রিয়াতিক কূলের বণিক নগর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভেনিসে অটোমোবিলের উৎপাত নাই। গাড়ীও চলিতে পারে না। এমন কি দ্বিচক্রযানেরও গতিবিধি একপ্রকার অসম্ভব। যান দেখিতেছি একমাত্র গোন্দোলা আর নরনারীর শ্রীচরণ।

ব্যবসায় কলেজের এক ছাত্র শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পাশ হইলে উপাধি পাইবে "দোত্তোরে" ("ডক্টর")। ইতালীতে পরীক্ষার রীতি বিচিত্র। মৌখিক পরীক্ষাই একমাত্র পরীক্ষা। তিন-অধ্যাপক এক সঙ্গে বসিয়া পনের বিশ মিনিট ধরিয়া এক একজন ছাত্রের বিদ্যার যাচাই করেন। ঐ পর্য্যন্তই শেষ অধিকন্তু কোনো এক বিষয়ে ত্রিশ চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটা রিসার্চ্চ জাতীয় অনুসন্ধান মূলক প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়। এইটাই একমাত্র লিখিত পরীক্ষা।

মৌখিক পরীক্ষা গুলা সব এক সঙ্গে লওয়া হয় না। এক একটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা সময় নির্দ্ধারিত থাকে। মোটের উপর তিন চার বৎসরের ভিতর বিশ বাইশটা শিক্ষণীয় বিষয় ভাগাভাগি হইয়া যায়। এই ধরণের পরীক্ষা প্রণালী কায়েম করিলে ভারতে বোধ হয় কোনো ছাত্রই কোনদিন ফেল হইবে না। পরীক্ষার প্রথাটা কঠিন করিয়া রাখা জগতে বিদ্যার পথ মারিয়া রাখিবার সমান।

"কা ফোস্কারি" বা ফোস্কারির প্রাসাদে ব্যবসায় কলেজ চলিতেছে। সৌধের সম্মুখ দিককার খিলান গুলায় "পথিকের" ছায়া পরিয়াছে। ফোস্কারি ছিলেন "দোজে" অর্থাৎ বণিকতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট।

"ক্রেদিতো ইতালিয়ানো," "বাঙ্কা কমার্চিয়ালে" ইত্যাদি বড় বড় ইতালিয়ান ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতেছি। "কানাল গ্রান্দের" ঘাটে ঘাটে যে সব 'কা' বিরাজ করিতেছে তাহার অনেক গুলায় হোটেল। দেশী বিদেশী পর্য্যটকের চলাফেরা ভেনিসে অনেক।

ফ্রান্সের মতন ইতালিতেও বিদেশী টুরিষ্টদের নিকট হইতে প্রচুর আমদানী হয়। যে বৎসর ইতালিতে বিদেশীরা কম আসে সে বৎসর হোটেলে ব্যাঙ্কে দোকানে, রেল আফিসে হাহাকার পড়িয়া যায়। ভারতে অনাবৃষ্টি যেমন রাজস্বের ঘাঁকতির অন্যতম কারণ, ইতালিতে বিদেশীদের "অনাগম" ঠিক সেইরূপ। ইতালিয়ানরা "তীর্থের কাকের মতন" বিদেশীদের টাকার তোড়ার দিকে তাকাইয়া থাকিতে অভ্যস্ত। সুইট্জার্ল্যাণ্ড এবং ঈজিপ্টও এইরূপ টুরিষ্ট প্লাবিত এবং টুরিষ্ট-পালিত দেশ।

ইতালিয়ানরা ব্যাঙ্ক পরিচালনায় নাকি বিশেষ পটু নয়। যুবা বলিতেছে—"চেকে কারবার ইতালির গৃহস্থ মহলে নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা অথবা কোম্পানী গড়িয়া ব্যবসায়ে টাকা লাগানো ইতালিয়ানদের দস্তুর নয়। আমরা বিদেশী ধনপতিদের শরণ লইতে বাধ্য। ইংরেজ ও মার্কিণ ধনীরা টাকা খাটাইলে ইতালিতে তেলের কুয়া গুলা খুঁড়িবার ব্যবস্থা হইতে পারিবে।"

তবুও প্রায় ১৭০০ ব্যাঙ্ক ইতালিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গুলার ভিতর জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৩৫৯ মাত্র। কৃষিকার্য্যের জন্ত ৩৭৫টা ব্যাঙ্ক ইতালির বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার সাক্ষ্য দিতেছে। "কো-অপারেটিভ" ব্যাঙ্ক গুণতিতে প্রায় ৫০০।

ইতালি ইয়াঙ্কিস্থান নয়, ইংল্যাণ্ড নয়, জার্ম্মাণিও ও নয়। ইতালির আবহাওয়ায় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয় না। অল্প কিছু খাটিতে পারিলেই বর্ত্তমান ভারতকে ইতালির ধাপে ঠেলিয়া তোলা সম্ভব মনে হইতেছে। ভারত-সন্তানেরা একবার চোখ খুলিয়া বর্ত্তমান জগতের সমান কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হউন।

চৈত্র বৈশাখ মাসে বাঙালী গাজন-গম্ভীরায় ঢাকে ঘা মারিতে অভ্যস্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় রকমারি মুখোস নাচ। সেই মোখার ধুমই দেখিতেছি কি ভেনিস, কি পাদোভা, কি জেনোভা, কি নাপোলি,—ইতালির সর্ব্বত্রই হাটে বাজারে পিয়াৎসোয় মোখা-পরা নর-নারীর রং-তামাসা চলিতেছে। কেবল ইতালিতেই কেন? —ফ্রান্সে, সুইটজর্ল্যাণ্ডে, জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রীয়ায়,—ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ মোখা নাচের সময়। এই উৎসবকে পশ্চিমারা বলে "কার্ণিভাল।" হাল্লা, ছুটাছুটি, মিছিল, "নগর-কীর্ত্তন" এই সবই কার্ণিভালের অঙ্গ। মুখোস আর ছদ্মবেশ এই উৎসবের প্রধানতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

ইষ্টার তিথির পূর্ব্ববর্ত্তী চল্লিশ দিনকে বলে "লেণ্ট"। ইহা চরম বিষাদের কাল। উপবাস, পালন করা রেওয়াজ। ঠিক যেদিন "লেণ্ট" সুরু হইবার কথা তাহার আগেকার সাত দিন "সাত খুন মাপ।" ইহা "নৈতিক ছুটী" ভোগ। এই সময়ে আমোদ প্রমোদ, যথেচ্ছাচার এবং সকল প্রকার সামাজিক "স্বাধীনতার" স্বাদ নরনারীরা চাখিবার সুযোগ পায়।

জগতের সনাতন আধ্যাত্মিক সাধনায় "নৈতিক ছুটি" গুলার মাহাত্ম্য সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাচ্য পাশ্চাত্য "আদর্শ" খুঁজিতে বসিলেই গোলে পড়িতে হইবে। এখানে "রক্ত মাংসের স্বধর্ম্ম" বিরাজ করিতেছে।

দান্তের যুগ সম্বন্ধে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন—"মহাকবি দান্তের সময় বলিলে আমরা এক সঙ্গে তিনজন সাহিত্যবীরের কথা বুঝিয়া থাকি। তাঁহারা ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। প্রথমতঃ দান্তে (১২৬৫—

তিৎসিয়ানের আঁকা ছবি (দোজে প্রাসাদে)

১৩২৯)। ইনিই অপর দুই জনের পথ প্রদর্শক। দান্তের মৃত্যুর সময় ইঁহারা শিশু বা বালক মাত্র। একজনের নাম পেত্রার্কা (১৩০৯—১৩৭৫)। ইনি কবি। অপর জন গদ্যসাহিত্যে প্রসিদ্ধ। নাম বোকাচিও। ইঁহার 'দেকামেরোণ' ইতালির কথামালা বিশেষ। পেত্রার্কা এবং বোকাচিও দুই জনেই সমসাময়িক।"

পেত্রার্কা এবং বোকাচিও দুই জনের রচনাই মধ্যযুগের বিলাতী সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বর্ত্তমান ইতালিয়ান ভাষার জন্মদাতা ছিলেন দান্তে। তখনকার দিনে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মতন ইতালিতেও লিখিয়ে পড়িয়ে লোকেরা একমাত্র ল্যাটিনের চর্চ্চা করিতে অভ্যস্ত ছিল। ইতালিয়ান নরনারীকে স্বদেশী অর্থাৎ মাতৃভাষায় হাতে খড়ি দেওয়ানো দান্তের অন্যতম কীর্ত্তি। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা,—দান্তের হাতে যে ভাষাটার জন্ম হইল তাহার রূপ আজ পর্য্যন্ত সাতশত বৎসরের ভিতর বিশেষভাবে বদলায় নাই।

ভেনিসের প্রধান শিল্প প্রথমতঃ কাচ। পুরাকাল হইতেই ভেনিসের কাচ জগদ্বিখ্যাত। ভেনিসের কাচ অত্যাচ্চ সুকুমার শিল্প সমন্বিত হইয়া এসিয়াবাসীর চিত্ত হরণ করিয়াছে। কাচের কারখানা গুলা দেখিতে হইলে মুরানো দ্বীপে যাইতে হয়। এই দ্বীপ, মাত্র হাজার পাঁচেক লোক। দ্বিতীয়তঃ, ফিতার কাম। ভেনিসের ফিতার জন্য ইউরোপীয় মেয়েরা পাগল হয়। পোষাকের জন্য, আসবাবের জন্য, বিছানার জন্য, পর্দার জন্য,—এক কথায় দৈনিক জীবনের সকল কাযেই ফিতার ব্যবহার খুব বেশী। এই ফিতা-শিল্পের কেন্দ্রস্থান দেখিতে হইলে বুরানো দ্বীপে যাইতে হয়।

ভেনিসে আসিলে মার্কো পোলোর বাস্তভিটা খুঁজিয়া বাহির করা পর্য্যটক মাত্রেরই বাতিক। বাস্তভিটার একটা খিলান মাত্র এখন খাড়া আছে। ১২৫৬ সালে পোলোর জন্ম। অনেক দিনের কথা। অত দিনের ঘরবাড়ী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধ্বংসস্তূপ মাত্র রূপে দেখা যায়।

ভেরোনেজের আঁকা ছবি (দোজে প্রাসাদে)

বিদেশী পর্য্যটকের ছড়াছড়ি এখানে খুব বেশী। এমন কি পুলের উপরেই দুই সারি দোকান। "গোন্দোলা" হইতে সাঁকোর খিলান বিপুল মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। শেক্‌সপীয়রের যুগেই এই পুল গড়া হইয়াছিল।

যদি কেহ ছবি দেখিবার সাধ মিটাইতে চায় তবে তাহাকে লোহার পুল পার হইয়া "আকাদেমিয়া দে বেল্লে আর্তি" বা সুকুমার শিল্প পরিষদের ভবনের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। একদিনে নমো নমো করিয়া সংক্ষেপে সারা অসম্ভব। এক সপ্তাহ ঘোরাঘুরি করিবার মত পায়ের জোর যার, কেবলমাত্র তাহারই পক্ষে আকাদেমিয়ার মর্য্যাদা রক্ষা করা চলে।

নেপোলিয়ন উত্তর ইটালি দখল করিয়াছিলেন। সেই যুগে নেপোলিয়নের হুকুমে (১৮০৭ সালে) এই আকাদেমিয়া স্থাপিত হয়। আজ এখানকার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে হাজার হাজার ছবির স্থায়ী মেলা। ইয়োরামেরিকার প্রায় প্রত্যেক নামজাদা চিত্রশিল্পীই বোধহয় যৌবনে,—ছাত্রাবস্থায়,—অথবা প্রৌঢ় বয়সে ভেনিসের এই আকাদেমিয়াতে আসিয়া রূপের লহর আর রঙের বাহার সৃষ্টি করিবার কৌশল শিখিয়া গিয়াছেন।

ভেনিসের শিল্পধারা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বজায় ছিল। এই যুগের এক বড় চিত্রকরের নাম তিয়েপোলো (১৬৯৩-'৭৭)। আকাদেমিয়ার সংগ্রহে তিয়েপোলোর অঙ্কন ক্ষমতা বেশ স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি স্বচ্ছ শুভ্র বর্ণ সমাবেশেও এই শিল্পী ওস্তাদ বটে।

ভেনিসের রেনেসাঁস বলিলে আমরা জানি প্রধানতঃ দুই ওস্তাদকে। প্রথমতঃ, তিৎসিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬) দ্বিতীয়তঃ ভেরোনেজে (১৫২৮-১৫৮৮)। ইঁহাদের কাযে আকাদেমিয়ার অনেক অংশ ভরা। কিন্তু ভেনিসের ঘরে বাহিরেই তিৎসিয়ান এবং ভেরোনেজে

পোলোর প্রাসাদের পূর্ব্বে "মারিয়া দেই মিরাকোলি" গির্জ্জা এবং পশ্চিমে "জোভানি ক্রিসোস্তোমো" গির্জ্জা পরবর্ত্তী কালে মাথা তুলিয়াছে। রেনেসাঁসের শিল্পবীর তিৎসিয়ান (১৪৭৭-১৫৭৬) এই অঞ্চলেই বসবাস করিতেন।

বড় খালের দুই ঘাটে এই সূত্রে দুইটা প্রাসাদ দ্রষ্টব্য। একটির নাম "ফোন্দাচো দেই তেদেস্কি" বা জর্ম্মাণ-ভবন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এটি নির্ম্মিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিৎসিয়ান এই ইমারতের দেওয়াল চিত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নোনা জলের হাওয়ায় শিল্পকর্ম্ম সবই মুছিয়া গিয়াছে।

এই ধরণেরই আর এক প্রাসাদ "ফোন্দাচো দেই তুর্কি" অর্থাৎ তুর্ক-ভবন নামে পরিচিত। তুর্কিরা ছিল বাণিজ্য মহলে এসিয়ার প্রতিনিধি।

শেক্‌সপীয়রের শাইলক "রিয়াল্‌তোর" বাজার পাড়া উল্লেখ করিয়াছে। প্রকাণ্ড পাথরের পুল "পোন্তে দ রিয়ালতো" নামে "কানাল গ্রান্দের" গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এইটাই বড় খালের উপরকার একমাত্র গুরু সেতু। খালের উপর আর ২টি মাত্র পুল আছে। দুইটাই লোহার।

রিয়াল্‌তো পাড়ার দোকান পাট আজও সুপ্রসিদ্ধ।

বেল্লিন বংশের সুকুমার শিল্পে ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা কিছু কিছু বজায় ছিল। ইঁহাদের অঙ্কনে এবং রঙ ও রেখার দাগে সেকেলে অনেকটা জ্যোত্তোপন্থী তুলির পোঁচ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সরলতা এবং সহজ গতিভঙ্গি তিৎসিয়ান ও ভেরোনেজের শিল্পে দেখা যায়। ইঁহারা আধুনিক নবজগতের স্রষ্টা।

রোমে এই সময়ে মিকেলা সেলো (১৪৭৫-১৫৬৩) এবং রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) পুরাতন ভাঙিয়া নতুন গড়িবার কাযে ব্যাপৃত। এই চতুষ্টয়েরই আর এক সতীর্থ সুহৃৎ দা'ভিঞ্চি ফ্রান্সপ্রদেশে রেণেসাঁস প্রবর্ত্তিত করিতেছিলেন।

মার্কোমন্দিরের সম্মুখেই "কাম্পানিলে" বা ঘড়ি স্তম্ভ নামে মিনারটা সটান ভাবে খাড়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান আকারে এটা চারিশত বৎসরেরও বেশী দণ্ডায়মান। মার্কো "বাজিলিকা" পাহারা দেওয়াই যেন ইহার কায।

"রক্ষা" মেরির মন্দিরের প্রধান বেদী

অমর। বিশেষতঃ শতবর্ষব্যাপী জীবনে তিৎসিয়ান যে সব ছবি আঁকিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই ভেনিসের বাহিরে বিরাজ করিতেছে।

ভেরোনেজের রঙে রূপে ভেনিসের সম্ভ্রান্ত জীবন অর্থাৎ বড় ঘরের কথাগুলা ফুটিয়া রহিয়াছে। বুড়া বয়সেও তিৎসিয়ান রঙের দরিয়ায় সাঁতার কাটিতে আনন্দ পাইতেন। ইঁহাদের সকলেরই গুরু অথবা গুরুর গুরু বেলিনি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বেলিন পরিবার ভেনিস-রীতির সূত্রপাত করে। দুইভাই এক ভ্রাতুষ্পুত্র এই বংশের উজ্জ্বল রত্ন। জেন্তিলে বেলিনি ছিলেন প্রবর্ত্তক।

"কাম্পানিলের" পাশেই রাজবাটী। পুরাতন পুস্তকাগার এই রাজবাড়ীর অন্যতম ঐশ্বর্য্য। গ্রন্থশালাটি কবিবর পেত্রার্কার গড়া। ১৩৬২ সালে ভেনিসের দরবার পেত্রার্কাকে এই ভবন উপহার দিয়াছিল। পেত্রার্কা কাব্য রচনায় যত বড়, পাণ্ডিত্যেও তত বড় ছিলেন। ইতালিয়ানরা পেত্রার্কাকে গ্রন্থকীট বলিয়া জানিত।

"বাজিলিকার" মুসলমানী গুম্বজগুলার পশ্চাতে, এক কোণে "দোজে"—প্রসাদের এক টুকরা "গাথিক" দেওয়াল ও জানালা দেখা যাইতেছে। মন্দির নির্ম্মাণের শেষ তারিখ শুনিলাম ১৪০০। ভিতরকার অলঙ্কার

ভেন্দ্রামিন প্রাসাদ—ভেনিস

"কা দরো" প্রাসাদ—ভেনিস
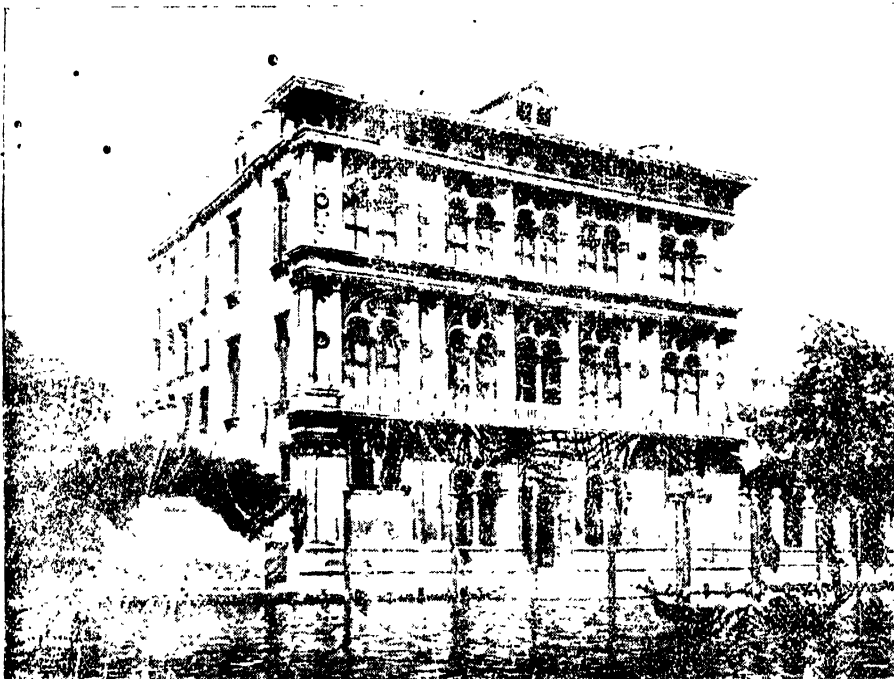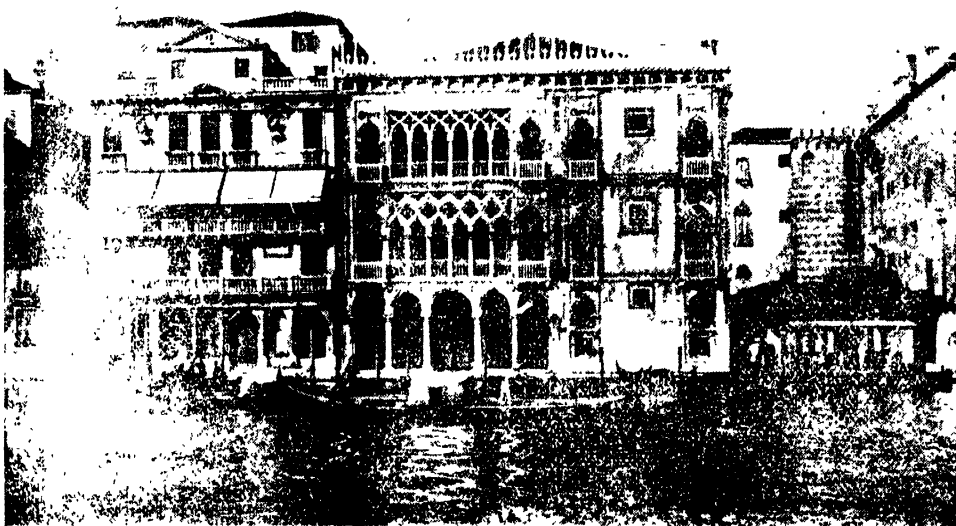
পূর্ণ করিতে ষোড়শ এবং এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কারিগরের কায লাগিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে "পালাৎসো দুকালে" অর্থাৎ দোজে-প্রাসাদও নির্ম্মিত হয়। মন্দির এবং প্রাসাদ দুইই বাস্তুশিল্পী বোন বা বোন-পরিবারের কীর্ত্তি।

একদিন কাচের কারখানা দেখিতে গেলাম। কয়েকটা আঁকাবাঁকা গলি ভাঙ্গিয়া এক পুরাণো বাড়ীর দোতলার সম্মুখের ঘরেই দেখি মেয়েরা কাচগুলিতে ছবি আঁকিতেছে। কাহারও কাহারও গায়ে শাল আলোয়ান।

"কা ফোস্কারি" প্রাসাদ—ভেনিস

এক মহিলা প্রদর্শকের কায করিলেন। এ ঘর ও ঘর করিতে করিতে ঘণ্টা খানেক কাটাইয়া দেওয়া গেল। মাইসেনের পোর্সিলেন বা চীনামাটির বাসন, আটপৌরে হাঁড়ীকুঁড়ী হইতে বাস্তু, স্থাপত্য ইত্যাদি সবই দেখিয়াছি। এখানেও মুরাণোর কাচশিল্পে পেয়ালা, থালা বাটি, বাতীদান হইতে সুরু করিয়া সকল প্রকার ঘর সাজাইবার সরঞ্জাম দেখিলাম।

প্রদর্শক বলিলেন,—"মুরাণোর কাচশিল্পই ভেনিসের চিত্রশিল্পের জন্ম দিয়াছে। ভেনিস-রীতির প্রবর্ত্তক বেলিনির গুরুরা মুরাণোর "মোজাইক" বা মীনা-শিল্পীদের নিকট সাগ্রেদি করিয়াছিলেন। গির্জ্জা সাজাইবার জন্য মুরাণোর লোকেরা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল হইতে মোজাইক শিল্প শিখিয়া আসে। সে প্রায় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। তাহার পর মুরাণোতেই মোজাইক শিল্পের কারবার চলিতে থাকে। মোজাইকের কাযে পাকিয়া উঠিতে উঠিতেই চিত্রশিল্পের দিকে রূপদক্ষদের নজর যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুরাণোর চিত্রশিল্পের একটা রীতি বা ধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারই জের বেলিনিতিৎসিয়ান তিয়েপোলো।"

"মোজাইকে"র সতরঞ্চ বা গালিচা চরম মাত্রায় দেখিতে পাই মার্কো-মন্দিরের ছাদে ও দেওয়ালে। একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনাগুলায় খৃষ্টজীবন এবং বাইবেলের কাহিনী প্রচারিত হইতেছে। গোঁফ দাড়ী হীন যীশুমূর্ত্তি বড় একটা দেখা যায় না; এখানে তাহাও দেখিলাম। শুনিতেছি—ইহা বিজাণ্টিন বা প্রাচ্য প্রভাবের নমুনা। মুসলমান বা প্রাচ্য প্রভাবান্বিত কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল অঞ্চলের খৃষ্টশিল্পীরা যীশুকে গোঁফদাড়ীহীন রূপে আঁকিত।
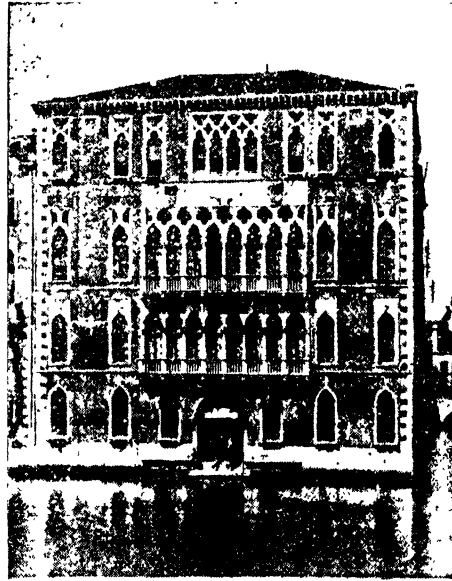
নানাপ্রকার মূর্ত্তি আঁকিবার জন্যই মোজাইক নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। মার্কো মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন যুগের অঙ্কন দেখিতেছি। তিৎসিয়ান, তিন্তোরেত্তো ইত্যাদি চিত্রশিল্পীরা যে সকল রূপ গড়িতেছিলেন, মোজাইক শিল্পের রূপদক্ষেরা সেই সব মূর্ত্তির কোন কোনটা এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

স্তম্ভে স্তম্ভে মার্ব্বেল পাথরের ব্যবহার দেখিতেছি। ধাতুরত্নের কাযে চোখ ঝলসিয়া যায়। বাহিরে,—মাথায় সোনার গুম্বজ। "গথিকে"র ছুঁচোল ত্রিকোণ শীর্ষ সম্মুখের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই রঙের ছটা, রূপের বৈচিত্র্য।

কিন্তু তথাপি মার্কো—"বাজিলিকা"টা দেখিয়া "নয়ন

রেৎ সা নিকো প্যালাস—ভেনিস

লাগে না ধাঁধা।" তাজ মহলের অনুপাত ও সামঞ্জস্য যাহাদের চোখে একবার পড়িয়াছে তাহারা বড় শীঘ্র কোনও বস্তু দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইবে না। মিনারের সঙ্গে গুম্বজের খেলা, গুম্বজগুলার পরস্পরের আদানপ্রদান, এবং চতুষ্কোণের সঙ্গে গোলাকারের মেলামেশা, এই সকল রূপ-সম্বন্ধ তাজে অপূর্ব্ব। তাহার দোসর খুঁজিয়া পাওয়া বড় কঠিন। মার্কো-গির্জ্জায় তাহার কাছাকাছিও কিছু পাইলাম না।

"পালাৎসো দুকালে" বা দোজে প্রাসাদটার গড়ন অতি বিচিত্র। জাঁকালো সন্দেহ নাই, তবে কিঞ্চিৎ কিম্ভূতকিমাকার বটে।

উপরের দিককার আধখানা যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। কতকগুলা "গথিক" জানালায় এই জমাট-বাঁধার প্রভাব ভগ্ন দেখিতে পাই। নীচের আধখানার "গথিক" খিলানের দোতলা বাগান। এই দুই তলের উপরে নীচে দুই স্বতন্ত্র ধরণের খিলান ও স্তম্ভের সারি দেখিতেছি। বারান্দাগুলি সম্পূর্ণ রেশমী বুননের কাযের মতন দেখাইতেছে। টালগুলা নানা রঙের। ভবনটা একবার দেখিলে আর ভুলিবার সম্ভাবনা নাই।

পঞ্চাদশ শতাব্দী ভরিয়া বাস্তুর শেষ নির্ম্মাণকার্য্য চলিয়াছিল। অনেক ওস্তাদের হাতে বাড়ীটা খাড়া হইয়াছে। ভিতরের সিঁড়িগুলা দেখিবার জিনিষ। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে নামজাদা চিত্রশিল্পীদের ছবিতে দেওয়াল ও ছাদ পরিপূর্ণ।

"মাজিয়োর কনসিলও" বা মহাসভার ঘরে তিন্তোরেত্তোর আঁকা ঐতিহাসিক ছবি দেখিতেছি। ভেনিসকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিলানের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে।

সেই যুগেই,—১৪৫৩ সালে তুর্কীরা গ্রীকসাম্রাজ্য ভাঙিয়া কনষ্টান্টিনোপল দখল করে। তখন হইতে ভেনিসকে আত্মরক্ষার জন্য তুর্কীর বিরুদ্ধে লড়িতে হয়। স্মার্ণায় (১৪৭১), স্কুটারিতে (১৪৭৪), এবং গালিপলিতে (১৪৮৪) যে সকল যুদ্ধ ঘটে তাহাতে এসিয়ান ফৌজেরাই বিজয়লাভ করে। শেষ পর্য্যন্ত ভেনিস তুর্কীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য
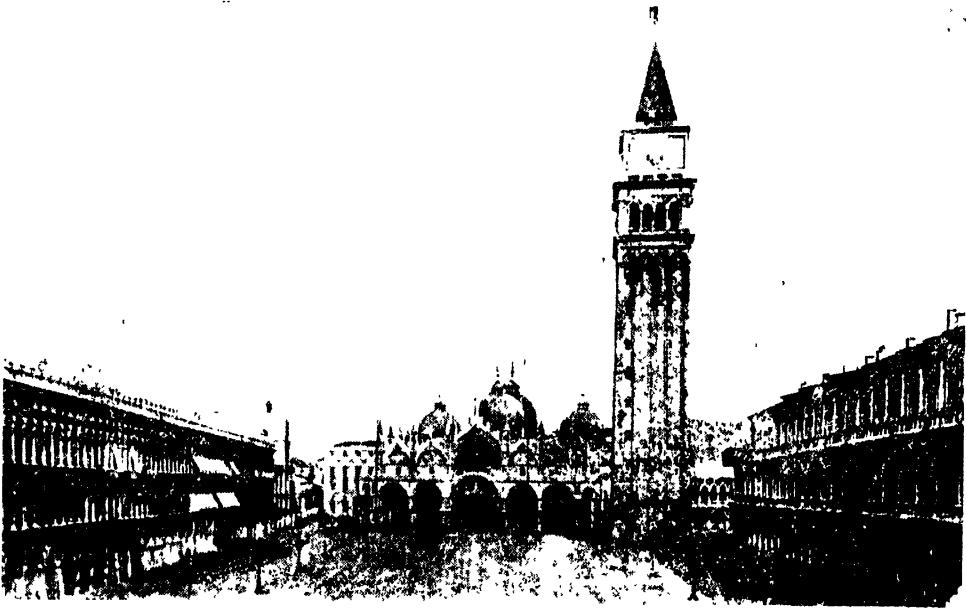
পিয়ৎসা সাং মার্কো
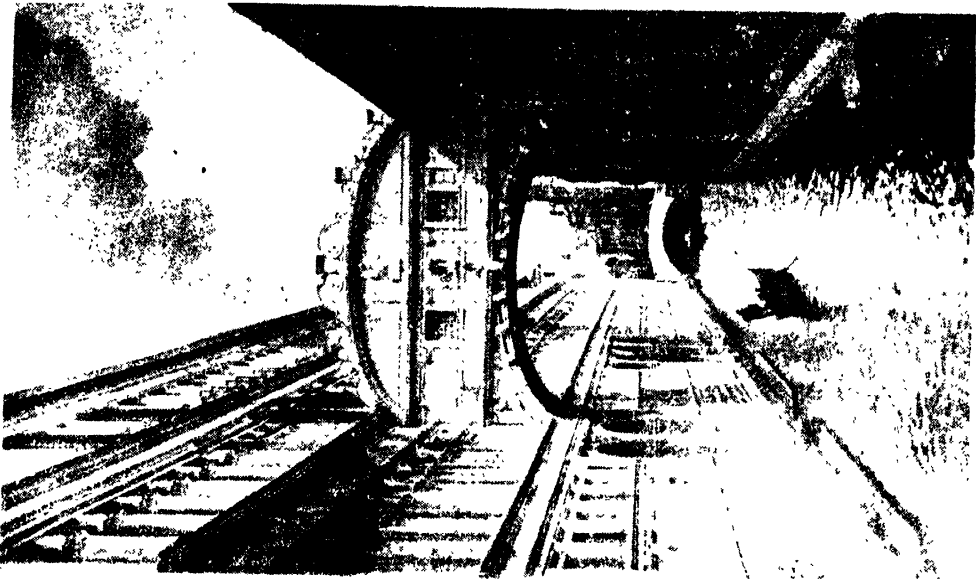
"দীর্ঘশ্বাসের" সেতু

হইয়াছিল। এই সকল জলযুদ্ধের ছবিও "মহলভা"র সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

তিৎসিয়ানের হাতের কাযও এই বিপুল সৌধের এখানে ওখানে দেখা যায়। তবে নামজাদাদের ভিতর তিন্তোরেত্তো এবং ভেরোণেজেই এখানে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন।

"কনসিলিও দেই দিয়েচি" অর্থাৎ "দশের সভা" যে ঘরে বসিত সেই ঘরে ভেনিসের বিভিন্ন প্রতাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। ভেনিসের বাণিজ্য-সম্পদ, ভেনিস রাষ্ট্রশক্তি, ভেনিসের সঙ্গে ধর্ম্মগুরু পোপের আদান প্রদান এই সকল চিত্রে দেখিতে পাই।

একটা প্রকোষ্ঠে সেকালের ভৌগোলিক মানচিত্র সংগৃহীত দেখিলাম। মার্কো পোলোর মূর্ত্তি দেখা গেল। ইনি কিন্তু চীন ভারতের বৃত্তান্ত লেখক সওদাগর নহেন। এই মার্কোপোলো অভ্যন্তর আফ্রিকার সঙ্গে ভেনিসের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তুনিসের হাজি মহম্মদ ১৫৫৯ সালে একটা পৃথিবীর মানচিত্র করিয়াছিলেন। সেইটাও এই ঘরে দেখিলাম।

ভেনিসে কোনও রাজা বা বাদশা ছিল না। ভেনেৎসিয়ার শাসন ছিল বণিক বা "শেঠ"দের হাতে। এখানকার ধনদৌলত, বাড়ীঘর, সম্পদ সৌষ্ঠব, সবই শেঠদিগের কীর্ত্তি।

শেঠরা সকলে মিলিয়া নিজেদের ভিতর হইতে একটা শাসন-সমিতি গঠন করিত। এই শাসন-সমিতির বা বণিক-পঞ্চায়তের "মুখ্য," "প্রধান" বা প্রেসিডেণ্টকে বলে "দোজে।" ভারতীয় পারিভাষিকে বলিতে পারি যে, দোজেরা ছিল শেঠ-স্বরাজের বা বণিক-গণতন্ত্রের মোড়ল।

চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া ভেনিসের সওদাগরেরা ইউরোপে বিপুল খ্যাতি লাভ করে। ধনাগমও হইয়াছিল প্রচুর। সেই ধনসম্পদের সাক্ষীস্বরূপই পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর "কা," "পালাৎসো" বা প্রাসাদগুলা খাড়া আছে। চিত্রশিল্পের "রেনেসাঁস"ও ভেনিসের অন্তিম যুগেই প্রকটিত হইয়াছিল। তখন ভেনিসের প্রতাপ বিশ্বব্যাপী নয় বটে। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের টাকার তোড়াগুলা তখনও শেঠজিদের ঘরে ঘরে মজুত ছিল।

পালাৎসো "কা দরো" বা স্বুবর্ণ প্রাসাদ নামক বাড়ীটা "কানাল গ্রান্দে"র অন্যতম গৌরব। সপ্তদশ
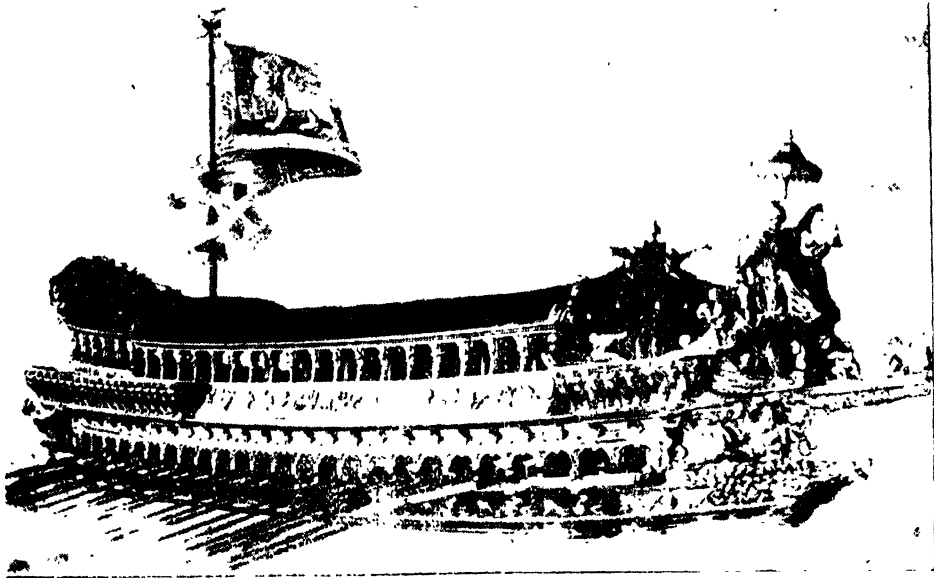
"বুচিন্তোরো" বজরা—ভেনিস

শতাব্দীর শেষাশেষি, তাজমহলের যুগে, একটা বাড়ী হইয়াছিল। রেণেসাঁসের গড়নে গথিক ও বিজান্টিন অলঙ্কার বিরাজ করিতেছে। ভেনিসের অন্যান্য ভবনের মত এখানেও বাসা সৌন্দর্য্য প্রচুরভাবে পরিস্ফুট। গাম্ভীর্য্য বা গরিমার পরিবর্ত্তে সুষমার আবহাওয়া। প্রাসাদের ভিতর বিলাসের চরম সীমা দেখা যায়। ভেনিসের সে যুগে, বাস্তবিকপক্ষে লোকেরা ভোগ বিলাসের জন্যই এখানে আসিত।

দোজে প্রাসাদের ভিতর বিচারালয় এবং হাজতও আছে। দেখিবামাত্র রক্তমাংসের মানুষ শিহরিয়া উঠিবে। চিত্রশিল্প আর প্রাসাদের মর্ম্মরকান্তির মোহে পড়িয়া ভেনিসচিত্তের অমানুষিক নির্দ্দয়তাগুলি ভুলিলে চলিবে না। অত্যাচার, নির্য্যাতন, পাশবিকতার পরাকাষ্ঠা, এই সবই ভেনিস-স্বরাজের গোড়ার কথা।

ইংরেজী কাব্যে "ব্রিজ্ অব্ সাইজ্" বা দীর্ঘ-শ্বাসের সেতু সুবিদিত। ভেনিসের শেঠ বাবুরাই এটা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নাম "পোন্তে দেই সোস্পিরি।" আসামীদিগকে প্রাসাদ হইতে জেলখানায় পাঠাইবার এই পথ। মামুলি অপরাধীরা এক পথে, রাজনৈতিক অপরাধীরা আর এক পথে চালান হইত। সেতু ডাইনে বাঁয়ে দুই ভাগে বিভক্ত।

হাজতের জন্য প্রাসাদেরই নীচের তলা বা ভূমিগর্ভের কুঠরিগুলা ব্যবহৃত হইত। কোনো কোনো দেওয়ালে লেখা আছে,—"ভগবান, যাহাদিগকে আমি বিশ্বাস করি তাহাদের হাত থেকে আমায় বাঁচাও।" আর একটা দীর্ঘশ্বাস নিম্নে লিখিত বচনে খোদিত রহিয়াছে,—"যাহাদিগকে আমি কোন দিনই বিশ্বাস করি নাই তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ।"

বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্রতা, মিথ্যাসাক্ষ্য, গায়ে তুলে মই কেড়ে নেওয়া,—ইত্যাদিই সেযুগের নিত্য কর্ম্ম।

কতকগুলা কুঠারী সীসায় তৈয়ারি। সীসার দেওয়াল, মেজে ও ছাদ শীতে যেমন কনকনে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মে তেমন আগুন গরম। এই সকল ঘরে কয়েদি-দিগকে বিচারের আগে ও পরে কালাতিপাত করিতে হইয়াছে।

প্রদর্শকের নিকট অশেষ প্রকার নির্য্যাতন, খুনা-খুনি ও নিষ্ঠুর যন্ত্রণা প্রদানের কাহিনী শুনা গেল। জার্ম্মাণের স্লির্ণব্যর্গ সহরের দুর্গস্থিত "ফোল্টার কাম্মারা" বা নির্য্যাতন-ভবনের সাজা দিবার যন্ত্রগুলা মনে পড়িল। সাজা দিবার কৌশলে প্রাচ্য বেশী নিষ্ঠুর কি পাশ্চাত্য বেশী নিষ্ঠুর তাহার আলোচনা হওয়া দরকার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একতরফা রায় শুনিয়া প্রাচ্যের লোকেরা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণকে গালি গালাজ করিতে শিখিয়াছে। পশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভুল ও কুসংস্কার গুলা দেখাইয়া দিবার জন্য এশিয়াবাসী গবেষকগণ প্রস্তুত হউন। এশিয়াকে কথায় কথায় নিন্দা করা বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ নয়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

পথহারা

(গল্প)

আজ দীর্ঘ সাত বৎসর ধ'রে আমার এই ক্ষুদ্র শরীরটার উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, তা একমাত্র অন্তর্য্যামী ছাড়া কেউ জানে না। মরণ!—মরণ হ'লে কুলু কুলু নাদিনী, ত্রিলোক পবিত্রকারিণী জাহ্নবীর স্নিগ্ধ শীতল জলে আমার হাড় ক'খানা জুড়াত! কতবার রোগশয্যায় পড়্লাম, কিন্তু পোড়াকপালে যম তা'র দু'টো চোখের মাথা খেয়ে এ হতভাগিনীকে দেখ্তে পেলে না! যারা চায়, তাদের কাছে মৃত্যু

দেবতার সেই সর্ব্ব সন্তাপহরণ মূর্ত্তি এত দুর্ল্লভ কেন?

জানিনা, জন্ম জন্মান্তরে কত পাপ ক'রেছিলাম—তাই এ পোড়া নারীজন্ম পে'য়েছি! জগতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে তিল তিল ক'রে দগ্ধ করবার জন্যেই কি পাষাণ বিধাতা নারীর সৃষ্টি ক'রেছিল? ঐ উন্মুক্ত উদার নীল আকাশে সূর্য্যদেব তার বিমল কিরণ ছড়িয়ে নিখিল সংসার উদ্ভাসিত করছে—চন্দ্রদেব সুধাবর্ষণ ক'রে তেমনি হাসি হাসছে—কুসুমগন্ধ দিক দিক ছুটে পুলক বিস্তার করছে, সব—সবই তেমনি চলছে! আর এই অবলা নারীর ভাগ্যেই সব উল্টো?—সব সৃষ্টিছাড়া? ধর্ম্ম! তুমি এমন একচক্ষু কেন? আমার জন্মের আড়াল ভেঙ্গে দিয়ে অতীতে বর্ত্তমানে একাকার ক'রে দাও প্রভু!—দেখি সেখানে আবার কত পাপ, কত জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। এ অভাগীর কাতর ক্রন্দনের এতটুকুও কি তোমার কাণে পৌঁছবে না?

আমি খুব রূপসী না হ'লেও দেখ্তে যে নেহাত মন্দ, তা না। আমার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর যে পীতাভ কমনীয়তা বিদ্যমান, তার কাছে নাকি ফিট গৌরবর্ণও হার মেনে যায়। কি জানি ছাই!—থান প'রে রুক্ষ নেয়েও তার একবিন্দু ম্লান হয়নি। পটোল-চেরা টানা চোখের স্নিগ্ধোজ্জ্বল চাহনির কাছে নাকি মতির ছটাও নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়;—অযত্ন বিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশরাশি এলিয়ে পড়লে দিগন্ত প্রসারী মেঘমালার মত এখনও আমার সারা পেছনটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। ছোট বেলায় যখন চাঁদের আলো শাড়ীখানা প'রে আমার ছোট্ট কলসীটা কাঁখে নিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়ী ফিরতাম, তখন জলদেবীর শোভায় পথটা আলো হ'য়ে উঠতো—পাতলা ঠোঁটের হাসিতে নাকি সুধা ঝরে পড়তো।

সঙ্কল্প করেছি আর কিছুই ভাব্‌বো না—মনে ওসব ছাই পাঁশ কিছুরই তোলাপাড়া করবো না; কিন্তু মনটা যে কি বস্তু তা সে-ই জানে, কোন মতেই সে বশে মানে না—একটা অনন্ত অতৃপ্তির দুঃখে হাহাকার করে ওঠে। কতটুকু তার দুঃখ? কি সে চায়? সব যেন ওলট পালট হয়ে গিয়েছে,—আমার দুঃস্বপ্ন ভরা এই চোখের সাম্‌নে, সব যেন বিষবহ্নির লেলিহান শিখা। শূন্য পৃথিবী—শূন্য আকাশ—শূন্য বাতাস—আমার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা মহা শূন্যে ভরা! ওগো! তোমরা কেউ বলতে পার, আমার এই অপূর্ণ জীবনের শান্তি কোথায়? সংসারে কোন কিছুতেই ত আমার আর দরকার নেই;—সব দরকারই যে আমার মিটে গিয়েছে সেই দিন, যে দিন আমার কর্ম্ম এবং বিশ্রাম, আরম্ভ এবং অবসান, বাসনা এবং বেদনা অতল জলে ভাসিয়ে দিয়েছি! জানিনা, ভগবান! তবু কেন এমন হয়।

আমি পিতামাতার একমাত্র কন্যা। আমার পিতার অবস্থা খুব ভাল ছিল না; নিকটবর্ত্তী গ্রামে কোন এক জমীদারের কাছারীতে তিনি চাকরী করে যা পেতেন, তাতেই আমার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের পড়ার খরচ চালিয়ে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করতেন। যদিও আমরা বড়-লোক ছিলাম না, তবুও দুঃখের করুণ মূর্ত্তি কখনও দেখিনি। পিতামাতার বড় স্নেহের—বড় আদরের সন্তান আমি, তাঁরা আমার সকল আব্দারই হাসিমুখে পূর্ণ করতেন। আর এখন আমার এই শুষ্ক উপেক্ষিত দেহটার পানে চাইলে তাঁদের স্বাভাবিক প্রসন্ন মুখ একেবারে আঁধার হয়ে আসে। হায়! তাঁদের সেই নির্ম্মল শুভ্র জীবনের কক্ষপথে কি কু-গ্রহের মতই উদয় হয়েছিলাম!

মা নাম রেখেছিলেন পুষ্পরাণী, বাবা আদর ক'রে মাঝে মাঝে ডাকতেন মাধবী বলে। একদিন এই নামের সম্বোধনে কাণে কি মধুবর্ষণই না করত! ও গো তোমরা এখন আমাকে পোড়ারমুখী ব'লেই ডেকো—ও সবে আমার আর প্রয়োজন কি? এ চিরবঞ্চিতার সব স্পৃহাই ত মিটে গেছে!

২

গ্রামের উপকণ্ঠে খৃষ্টান মিশনরীদের একটা বালিকা বিদ্যালয় ছিল। আমার বয়স যখন সাত বৎসর, বাবা

তখন আমাকে সেখানে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। আমার বুদ্ধি ও সরল সপ্রতিভ ব্যবহারে শিক্ষয়িত্রীগণ আমাকে বড়ই স্নেহ করতেন—তাতে নাকি অন্য মেয়েরা হিংসায় জ'লে মরত।

পড়া শেষ ক'রে বিদ্যালয় থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন আমি ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করেছি—যৌবনের রক্তরাগ সবে মাত্র আমার সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে;—এই বার বাবার মনে পড়ে গেল, আমার বিয়ে দিতে হবে। এই বিয়ের সঙ্গে - বিশেষতঃ হিন্দুর বিবাহে—মানুষের জীবনের কি যে গুপ্ত রহস্য লুকান আছে, তা এক মাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

প্রায় দু'বছর ধরে বাবা খুব চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমরা গরীব ব'লে ভাল লেখাপড়া-জানা বরের সন্ধান মিললো না। সকলেই চায় রূপ—আর সেই সঙ্গে প্রচুর দান পণ। রূপের গৌরব কিঞ্চিৎ থাকলেও, তা সে ধনের অপ্রতুলতায় মলিন হ'য়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাবার সমস্ত চেষ্টা জলের দাগের মত কোথায় মিলিয়ে গেল।

একদিন দুপুরে মামা এসে বললেন, "দেওপুকুর থেকে রাণীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে লোক আসছে আজকের এই সন্ধ্যের ভিতরেই। ছেলেটীর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি—কয়লার খনিতে কায করে।"

শুনে বাবা আমার সুখী হ'লেন কি না বলতে পারি না, তবে তিনি লোকজনের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে লেগে গেলেন।

প্রাতঃকাল। সদ্য প্রস্ফুটিত আম্র মুকুলের মন মাতান গন্ধ মধুপ গুঞ্জনের সঙ্গে ভেসে ভেসে আসতে লাগলো। আমি সেজে গুজে আমাদের পূর্ব্ব দুয়ারী ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় এসে নত দৃষ্টিতে দাঁড়ালাম—তরুণ সূর্য্যের রক্তিমচ্ছটা আমার চন্দন চর্চ্চিত মুখের উপর পড়ল। বরের ভগিনীপতি স্থির দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক ক্ষণকাল চেয়ে দেখে বললেন, "দেখি তোমার হাতখানা।"

তাঁর দিকে একটু খানি এগিয়ে গিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলাম—তিনি হাত খানা বেশ ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন—তারপর বাম হাতটার প্রত্যেক অংশ দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা যেন কেমন হ'য়ে গেল, সে তাঁর অপ্রসন্ন ভাব থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল। দুর্ভাগ্যের মলিন ছায়া আমাকে যে এত সত্বরই আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তা মুখের ভাষায় ব্যক্ত করতে না পারলেও অন্তরের অব্যক্ত ভাষায় তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। তখন যদি একটুও আভাস পেতাম! স্বপ্নেও ভাবিনি, মানবী হ'য়ে এমনি করে দানবীর অভিনয় করতে হবে!

বরের দাদা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার নাম কি খুকী?"

এত বড় হ'য়েছি তবুও নাকি আমি খুকী! হাসির বেগ কোন রকমে সংবরণ ক'রে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম — কথা কইতে পারলাম না।

বাবা আমার নিকটে এসে বললেন, "বল মা; তোমার নাম বল।"

নাম বলবার পর বরের দাদা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "চিঠি লিখতে জান?"

আমি গর্ব্বভরে ঘাড় কাৎ ক'রে উত্তর জানালাম।

লিখতে গিয়ে প্রথমে আমার হাতটা একটু কেঁপে গেল—তারপর বেশ কলম চলতে লাগল। ওঁরা আমার লেখা দেখে খুব তারিফ করতে লাগলেন।

বিয়ের রাত্রে সঙ্গিনীদের কলহাস্য-বিদ্রূপের তাড়নায় স্বামীর মুখখানা ভাল ক'রে দেখবার অবসর পাইনি। সকালে একটু নিরালা পে'য়ে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি আমার মাথার কাপড় খানিকটা সরিয়ে দিলেন—চারি চক্ষুর একটা সলজ্জ মিলন হ'য়ে গেল। বেশীক্ষণ আমি চাইতে পারলাম না—দৃষ্টি নত হ'য়ে এল। আগে যদি জানতাম এই হ'বে—আমার প্রত্যক্ষ দেবতার বরবেশে সজ্জিত সেই মোহন মূর্ত্তিখানা প্রাণভরে হৃদয়ে অঙ্কিত ক'রে নিতাম! কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার চিবুকের নিচে হাত দিয়ে বললেন, "রাণী! তোমাকে এখন কিছুদিন আমাদের ওখানে থাকতে হবে।—পারবে ত?"

আমি একটু মুচ্‌কে হেসে মুখখানা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলাম। তিনি আমার স্কন্ধদেশে দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ দিয়ে আবার বল্লেন, "বল্‌তে লজ্জা কি রাণী?"

রাজ্যের লজ্জা-সঙ্কোচ এসে আমার কণ্ঠ যেন রোধ ক'রে ধর্‌লে—মুখ দিয়ে একটা কথাও ফুট্‌ল না। বড় মন্দভাগিনী আমি—তাই তাঁর সেই প্রাণঢালা স্নেহের মর্য্যাদা এতটুকুও বুঝ্‌তে পারিনি! স্বামিন্! দেবতা আমার! এ দাসীর সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে—সব দৈন্ত ঘুচিয়ে দিয়ে তোমার চির শান্তিময় ক্রোড়ে তুলে নাও!

বিয়ের পর সবাই যেমন শ্বশুর বাড়ী যায়, আমিও তেমনি গেলাম। কিন্তু পতি-দেবতার চরণ দর্শন আর তেমন করে কোন দিনই ভাগ্যে ঘটেনি। দিন কয়েকের ভিতরেই আমি আমার পিতা মাতার সেই অটুট স্নেহময় ক্রোড়ে চলে এলাম। আর স্বামী আমার চ'লে গেলেন তাঁর কর্ম্মস্থানে সেই 'খনির তিমির গর্ভে।' সেই যে যাওয়া—আর দীর্ঘকালের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নাই। সেখানে তিনি যে কি কর্‌তেন, তা অন্তর্য্যামীই জানেন। কে আমার? আর কেই বা আমায় চায়? আমার জীবন যৌবন অনাঘ্রাত কুসুমের মতই বিজন প্রান্তরে পড়ে রইল।

প্রথম প্রথম তাঁর দুই এক খানা চিঠি পেয়েছিলাম বটে—তারপর সব চুপ চাপ। এক এক বার ইচ্ছে কর্‌ত একটু লিখে খোঁজ নিই; কিন্তু আমি বড় অভিমানিনী ছিলাম, দুর্জ্জয় অভিমানে আমার বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠ্‌ত—কাগজ কলম ছুড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তাম।

অভিমান ক'রে সেই যে মুখ ফেরালাম, সেই অভিমানই সার হলো—এ জন্মের মত আমার চিঠি লেখা শেষ হ'য়ে গেল। সীমাহীন এই বিশ্বের কোণে অনাদৃত অশুচি হয়ে আমি পড়ে' রইলাম। তাতে কিই বা ক্ষতি আমার?—তবে এ অবলা নারীর শরীর রক্তমাংস দিয়ে গঠিত হ'য়েছিল কেন? আর তার কোমল প্রাণে সুখ-দুঃখ, স্নেহ ভালবাসা বা কেন দিয়েছিলে ভগবান? প্রভু! ধন্য তুমি—আর ধন্য তোমার এই ব্যবস্থা!

৩

তিন বৎসর পরে অকস্মাৎ একদিন সংবাদ পেলাম, স্বামী আমার খুব অসুখ নিয়ে বাড়ী এসেছেন—জীবনের আশা অতি অল্প। বাবা বাড়ী ছিলেন না, মা আমার চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে আমাকে নিয়ে সেই মুহূর্ত্তেই রওনা হলেন। সন্ধ্যার পরে যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম, তখন সব শেষ হ'য়ে যে'তে আর বেশী বিলম্ব নাই—মৃত্যুর মলিন ছায়া তাঁর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই একদিন স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাতে তাঁর আনন্দ-হাস্য-বিমণ্ডিত মুখখান দেখেছিলাম—তার পর আবার সেই মানসী প্রতিমাকে চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে কতবার চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিনি! আজ এই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তাঁর মৃত্যু সমাচ্ছন্ন মূর্ত্তিখানা আর একবার দেখ্‌লাম।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সম্মুখের আলোটা যেন হঠাৎ নিবে গিয়ে একটা জমাট অন্ধকার আমাকে গ্রাস ক'রে ফেল্লে—আমি চক্ষু মুদে বসে পড়্‌লাম। কে একজন বল্লে, "অভাগী! ওখানে ব'সে কি ভাব্‌ছিস? পায়ের দিকে গিয়ে বোস—মুখখানা জন্মের শোধ ভাল ক'রে দেখে নে।"

আমার পতিদেবতার চরণ যুগল বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নত দৃষ্টিতে ব'সে রইলাম—দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু চক্ষুর কোণে দু'লে উঠ্‌ল। যতই সময় যেতে লাগ্‌ল, তাঁর অবস্থা ততই খারাপ হ'য়ে পড়্‌তে লাগল। শেষ রাত্রির দিকে আমার কপাল পুড়্‌ল—এ হতভাগিনীকে চিরকালের জন্যে কাঁদিয়ে তিনি চ'লে গেলেন! আমার সুখের উৎস এত শীঘ্রই সে শুকিয়ে যাবে, সে কি আগে জান্‌তাম! ব'লে যার অন্ত হয় না—কেঁদে যায় কূল পাওয়া যায় না—সে যে কি দুঃখ তা অংশভাগিনী ছাড়া কেউ বুঝ্‌তে পারবে না।

পূর্ব্বে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করবার সৌভাগ্য যে দু'বার পেয়েছিলাম, তাও অতি অল্প সময়ের জন্তে। আমার শাশুড়ী আমাকে বড়ই স্নেহ করতেন। কি ব'লে যে আদর করবেন, সে ভাষাই তিনি খুঁজে পেতেন না। আমিও তাঁর স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহারে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম। বিকাল বেলায় গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম শেষ ক'রে, চওড়া লাল পেড়ে সূক্ষ্ম শাড়ী খানা প'রে, পায়ে আলতা দিয়ে যখন তাঁর সম্মুখে এসে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে-ছিলাম, তিনি আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "বৌমা আমার লক্ষ্মী! সতী লক্ষ্মী হ'য়ে আমার ঘরে চিরকাল বিরাজ কর।"

আজ কোন্ অলক্ষ্মীর বাতাসে আমি তাঁর দু'চক্ষের বিষ হ'য়ে গিয়েছি! তিনি আমাকে দেখে বলেন, "ও পোড়ারমুখী আমার সমুখ থেকে চলে যাক্—ও রাক্ষসীই যত অনর্থের মূল।"

হাঁ, রাক্ষসীই বটে! নইলে একটা মানুষ—যার অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, সবল সুন্দর চেহারা—সে এ পাপিনীর পাপ দৃষ্টিপাতে এমনি ক'রে এত শীঘ্র উড়ে যাবে কেন? সত্যিই যে আমি রাক্ষসী।

নয়নের আলো, রসনার মধু, প্রাণের হাসি, সংসারের স্বাদ—এক কথায় বলতে গেলে—আমার সব চ'লে গেল।—কেবল রইলাম আমি—আর রইল আমার এই উপেক্ষিত শরীরটা তার দুকূল ছাপান বর্ষার নদীর মত ভরা রূপ যৌবন নিয়ে। বেশ-ভূষা ত্যাগ ক'রে মাটী দিয়ে মাথাটা ঘষে মোটা থান পরলাম।—হাতের সোণার চুরী ক'গাছা ছিল আমার প্রাণ স্বরূপ, হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে সে গুলিও খুলে ফেললাম। এখন আমি একাহারিণী—হবিষ্যান্নভোজিনী ব্রহ্মচারিণী। ঋষির বংশধর! ত্যাগীর সন্তান! এই বালবিধবার উপর পুরাণ বর্ণিত আশ্রম ধর্ম্মীর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের ভার দিয়ে নিজেদের যত কর্ত্তব্য তোমরা শেষ ক'রে দিয়েছ!—আর বেশ নিশ্চিন্ত মনে সুখ সম্পদ, ভোগ বিলাসে মগ্ন হয়ে পূর্ব্ব গৌরবের মহিমার গর্ব্বে ফেটে মরছ! মানুষ কি ক'রে যে মানুষকে তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে অকস্মাৎ বঞ্চিত ক'রে বৈরাগ্যের পথে ঠেলে দিতে পারে, ভেবেই পাই না। ঋষি জনোচিত ব্যবস্থাই বটে!

৪

আমাদের গ্রাম হতে একটু দূরে শস্য ভরা উন্মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে পবিত্রসলিলা ভাগীরথী সাগর সঙ্গমে যাত্রা করেছেন। আমাদের মুসলমান ঝি সরিফণকে সঙ্গে ক'রে রোজ গঙ্গা স্নানে যাই। ঢেউগুলি কেমন লুটোপুটি কোলাকুলী ক'রে পুলক ভরে ছুটে চলেছে—ওরা অস্ফুট কলতানে কত কথাই না জানিয়ে যায়। যেন ওদের সঙ্গে আমার কত কালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কলসীটা ডাঙ্গায় রেখে গঙ্গা জলে গিয়ে দাঁড়ালে—উচ্ছ্বসিত সফেন জল রাশি আমার মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুনতে পাই, জাহ্নবীর পবিত্র করুণ স্পর্শে সব তাপ—সব জ্বালা দূর হ'য়ে যায়; বড় পাপিষ্ঠা আমি, যে আমার এ বুক-ভরা জ্বালা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হ'ল না—জ্বালামুখীর আগুনের মত জ্বলতেই লাগল!

দিনটা আজ মেঘাচ্ছন্ন বাষ্পে ভরা;—মনে হ'চ্ছে যেন ঐ অসীম আর্দ্র আকাশটা অকস্মাৎ নেমে এসে পৃথিবীর শ্বাস রোধ ক'রে ধরবে। বেলা যে বেড়ে চলেছে, সে দিকে আমার খেয়াল নেই—আমার মনের অবস্থা ঐ আকাশের সঙ্গেই একাকার হ'য়ে গিয়েছে। বড়দার মেয়েকে নিয়ে বারান্দার এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে আছি। বৌদি আমার নিকটে এসে বললেন, "ঠাকুর ঝি! স্নান আহ্নিক সেরে নাও—মার ওদিকে রান্না শেষ হ'য়ে উঠল।"

গামছাটা কাঁধে ফেলে সরিফণের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে চললাম। উভয়েই নীরব—কারও মুখে কোন কথা নেই। বুকের ভিতরটায় আঁটু পাঁটু করছে—উদাস বিচ্ছিন্ন মনে চলেছি। দুই তীরের গাছপালা গুলি রৌদ্রহীন ঝাপসা আকাশের তলে উর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছে—একটা বিরাট নিরানন্দময় ম্লানিমায় যেন চারিদিক ছেয়ে গিয়েছে।

ও পারের দিকে চেয়ে জলের কিনারায় বসেছি।

সরিফণ আমার সম্মুখে এসে মমতাভরা কণ্ঠে বল্লে, "দিদিমণি! তোমাকে আজ বড্ড কেমন কেমন লাগ্‌ছে! ভাবনায় দিদির আমার শরীরটা দিন দিন কি যে হ'য়ে গেল! আহো! মুখ খানায় কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে! যখনই ঐ মুখ খানার দিকে চাই, বুকের ভিতরটায় কেমন যেন ক'রে ওঠে।"

একটা উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আমার অন্তর মথিত ক'রে বেরিয়ে গেল। একটু পরে বল্‌লাম, "আমার আছেই বা কি?—আর ভাবনাই বা কিসের? সব ভাবনাই ত আমার শেষ হ'য়েছে সরিফণ!"

তার পর সরিফন যা বল্লে, সেই কথাগুলি আমার কাণে অনন্ত অঙ্গারের মত প্রবেশ করল। কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম—বুকের ভিতরটা ভাগীরথীর উত্তাল তরঙ্গমালার মতই দুলতে লাগ্‌ল। মনে হ'ল, যেন এইমুহূর্ত্তেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পাপ এসে নরকের কোন অন্ধ তমোগহ্বরে আমায় নিক্ষেপ কর্‌বে! ওরে আমি যে হিন্দুর মেয়ে—হিন্দুঘরের বিধবা! ও সব কথা যে আমার কল্পনাতেও আন্‌তে নাই!

বুকের তোলাপাড়া যখন কমে এল, তখন বল্‌লাম, "ও কথা মুখে বলা ত দূরের কথা, কল্পনাতে আনাও মহাপাপ—অনন্ত নরক!"

সরিফণ দৃপ্ত কণ্ঠে বল্‌ল, "কে ব'লেছে নরক? মিছে কথা,—তাহ'লে সারা জগতের মুসলমান এতদিন নরকেই পচে মরত। এই ত সেদিনই আমার খাদেজার আবার বিয়ে দিলাম;—তোমার মত দশা হ'য়েছিল।"

আহ্নিক পূজোয় অনেক সময় কাটিয়ে দিতে লাগলাম; কিন্তু আজন্ম ধর্ম্মজ্ঞানহীনা কুশিক্ষিতা নারী আমি, কোথায় আমার সেই ব্যাকুলতাময় ভক্তিপূর্ণ আগ্রহ? আমার সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে মনের কোণে সরিফণের সেই উক্তি ভেসে ভেসে উঠতে লাগল; "কে বলেছে নরক? মিছে কথা।" হে আমার পাষাণ ঠাকুর! এ কি হ'ল? এ কি পরীক্ষায় ফেল্‌লে আমায় আমি যে অকূলে পড়ে গেলাম!

শাস্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্ঠার শৃঙ্খল নিজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে সংসারের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টাও কর্‌লাম; কিন্তু কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে যেতে লাগ্‌ল। বাইরের ব্যাকুলতা তৈলহীন প্রদীপের মত নিষ্প্রভ হয়ে যায়, যদি না ভেতর থেকে তার পোষক আসে! ঐকান্তিক ইচ্ছার সঙ্গে যে আসক্তি থাকার দরকার; সেটাকে কোন মতেই আনতে পারিনা, অথচ অনাসক্ত ভাবে কায কর্‌বার আনন্দও পাইনা। উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীনের মত কোথায় যে চলেছি তার ঠিকানা নেই। আমার আমিত্ব যেন হারিয়ে গিয়েছে।

পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও কথার চার পাশে শুধু উলটি পালটি খেয়ে ঘুরে মর্‌ছি—কোন কিছুতে মন বসাতে পার্‌ছিনা। এমন সময় আমাদের কুলগুরু বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। দীর্ঘশিখাটা বেশ গোছা করে বাঁধা—সর্ব্বাঙ্গে তাঁর গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ, মুখে ঘন ঘন ভগবানের নাম। তিনি আমাকে অনেক কথাই শোনালেন। কিন্তু কৈ? প্রাণের আগুন ত নির্ব্বাপিত হ'ল না! তাঁকে মিনতি জানিয়ে বল্‌লাম, "ঠাকুর! আমি যেন বেড়া আগুনের মধ্যে প'ড়েছি, আমায় পথ ব'লে দিন!"

তিনি শিখা দুলিয়ে বল্‌লেন, "আহ্নিক পূজোয় মন দিয়ে বিধবার আচার নিয়ম পালন কর।"

আমি বল্‌লাম, "আহ্নিক পূজোয় মন দিতে পার্‌লে আর দুঃখ কি ছিল ঠাকুর? তা' যে পারিনা!—যে আবাল্য ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হ'য়েছে, সে কি এত শীঘ্র সর্ব্বত্যাগী হ'তে পারে?"

দিনের পর রাত্রি আসে, আবার দিন হয়। কিন্তু আমি "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" রয়ে গিয়েছি—আমার এ ঘোর কাটবে কিনা, তা অন্তর্য্যামীই জানেন। খুঁটিনাটি তোলাপাড়া নিয়েই আছি;—তবুও ত সময় এক রকম যাচ্ছিল। অকস্মাৎ আর একটা দমকা এসে আমার চিদাকাশের অন্ধকার আরও গাঢ় করে দিয়ে গেল। একদিন বিকালে সবজী বাগানে ঘুরে ঘুরে

বেড়াচ্ছি। নৃত্যরতা জাহ্নবীর তীরে সবুজ বনানীর নিবিড় ছায়া আজ আমার চোখে কেমন যেন একটা মায়ার অঞ্জন মাখিয়ে দিলে। তার উপর অসীম নীল আকাশ,—সে কি সুন্দর, কি মহান্! দৃষ্টি ভ'রে প্রকৃতির সেই রূপসুধা পান করছি; এমন সময় আমার বাল্য সখী কমলা তার লাবণ্য ঢলঢল মূর্ত্তি নিয়ে হাস্যবিকশিত মুখে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সে খৃষ্টানের মেয়ে, স্কুল ছাড়বার পর তার সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা। কমলাকে পেয়ে আজ কেমন একটা আনন্দ হল; প্রাণ খুলে অনেক কথাই বল্লাম। বিদায়ের সময় করুণ দৃষ্টিতে আমার শুষ্ক মুখখানার দিকে চেয়ে কমলা বল্লে "এক যাত্রায় এমন পৃথক ফল কেন তোমাদের ভাই? মুক্তির পথ শুধু কি তোমাদের জন্যই খোলা? না, জগতে আর কারুর তাতে দাবী আছে?"

"ওরে কমলা! তুই তা কি বুঝবি বল? ওসব কথা আমাকে শোনাস্‌নে,—মহাপাপ!—সমস্ত নরক! না না।"

কমলা আমার কাঁধের উপর হাত রেখে দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে, "পাপ? নরক? কখনই তা নয়—তা হতেই পারে না।"

কমলা চলে গেল। আমি সেইখানে ব'সে রইলাম। গোধূলির আলো ধীরে ধীরে অন্ধকারে পরিণত হয়ে গেল। একটু পরে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়্‌লাম। "ওরে কমলা! ওরে খৃষ্টান! তুই কেন আমাকে ওকথা শোনালি?—মহাপাপ—নরক!"

পরক্ষণেই মনের ভিতর ভেসে উঠল, "নরক? কখনই তা নয়!"

সারা রাত্রিটা দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়েই কেটে গেল। তার পর, দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল, কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তাকে ডুবিয়ে দিয়ে কেবলই মনের কোণে জেগে ওঠে, "নরক? কখনই তা' নয়!"

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক।

স্তর আশুতোষ চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আশুতোষ বিলাত যাত্রা করেন। আশুতোষ যে জাহাজে বিলাতে যান, সেই জাহাজে রবীন্দ্রনাথও দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা করেন, এবং সমুদ্রপথে উভয়ের প্রথম আলাপ হয়। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন;—

"আশুর বিলাত যাত্রায় সমুদ্রপথে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়। ঐ একই জাহাজে তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও যাইতেছিলেন। একে স্বদেশীয় তাহাতে উভয়েই সাহিত্যানুরাগী, কাজে কাজেই আত্মীয়তাটা শীঘ্র গাঢ়তর হইয়া উঠে এবং সেই বন্ধুত্বের ভাবি ফল সুখজনক কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। ভ্রাতার প্রবাস পথের অধিকাংশ পত্রই রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ হইয়া আসিত।"

ইংলণ্ডে গিয়া আশুতোষ কেম্ব্রিজে সেণ্ট জনস্ কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গণিতে সম্মানের সহিত বি-এ উপাধি লাভ করেন এবং পর বৎসর ব্যবস্থাশাস্ত্রে ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সাহিত্যানুরাগের জন্য সহপাঠিগণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন এবং কলেজের মাসিকপত্র "ঈগল"

এর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। কয়েকবৎসর তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত এই পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণকে লইয়া তিনি 'মজলিস্' নামক একটি সভায়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং অবসর কালে তিনি ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। এই সময়ে রচিত আশুতোষের Savonarola নামক একটি ইংরাজি কবিতা অনেক সাহিত্যরসিক ব্যক্তির নিকট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। কেম্ব্রিজে তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

আশুতোষ যখন কেম্ব্রিজে পড়িতেন, তখন তাঁহার বাল্যবন্ধু 'আর্য্যগাথা'র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সিসিটারে কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। উভয়েই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া প্রায়ই দুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালেরও যৌবনকালে ইংরাজী কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। আশুতোষই "পরধন লোভে মত্ত" কবিকে "বিফল তপ" পরিহার পূর্ব্বক মাতৃভাষার সেবায় উদ্বোধিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও চরিতকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে এই প্রসঙ্গে আশুতোষ লিখিয়াছিলেন ;—

"বিলাতে সে (দ্বিজেন্দ্রলাল) প্রথম সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করে। তখনও তাহার প্রতিভার তেমন কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। বরং তাহার লেখা লইয়া কত হাসি-ঠাট্টা করিয়াছি। তাহাতে সে কিন্তু কখনও রাগ বা দুঃখ করিত না। যেটা যথার্থ ভাল হয় নাই, মানিয়া লইত। তাহার দরুণ সে ভাল লিখিবে সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করিত। তখন আমিও সাহিত্য চর্চ্চা করিতে ভাল বাসিতাম। দ্বিজুকে শেলী ভক্ত আমিই করি। ফরাসী সাহিত্য তাহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। ক্রমে সে কিছু ফরাসীও শিখিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে এই সময়েই তাহার অত্যন্ত অনুরাগের উদয় হয়। একদিন হঠাৎ ইংরাজী কবিতা লিখিয়া লইয়া আমার কাছে উপস্থিত। আমি বলিলাম—'বাঙ্গালীর ছেলে ইংরাজী কবিতা লিখিবে কি ?' তাহার কবিতা আমার ভাল লাগিল না। তাহা কেন ভাল হয় নাই, বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিছুদিন ধরিয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল; শেষে আর ইংরাজী কবিতা লিখিব না বলিয়া চলিয়া গেল কিন্তু তার পরেও সে লুকাইয়া লুকাইয়া লিখিত। বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া 'Lyrics of Ind' বলিয়া একখানি কবিতা পুস্তক ছাপায়। দ্বিজু কেমন অসঙ্কোচে পুস্তকখানি আমার আনিয়া দিয়াছিল, তাহা এখনও মনে পড়ে। সে জানিত যে, আমি তাহাকে পুনরায় কবিতা লিখিতে বারণ করিব। বইখানি দিয়া, আমি কোন কথা বলার আগেই বলিল—'পড়ে দেখে গালাগালি দিও।' আমি বলিলাম—'না পড়িয়াই দিব।' যদিও 'Lyrics of Ind'এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে, তবু আমি সর্ব্বদাই তাহার দোষ দেখাইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতাম। সে কখনও কিন্তু এক মুহূর্ত্তের তরেও সেজন্য কোন মুখ-ভার করে নাই।"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, ৺হেমেন্দ্রনাথের সরস্বতী-প্রতিম দুহিতা প্রতিভা দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম আইন অপেক্ষা সাহিত্যের দিকেই আশুতোষের বেশী ঝোঁক ছিল। 'ভারতীতে' আশুতোষ পাশ্চাত্য কবিগণের এবং দেশের রাজনীতিক প্রশ্নাদির যে আলোচনা করেন তাঁহাতে তাহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' আশুতোষই যথোচিত পর্য্যায়ে সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য ;—

স্যর আশুতোষ ও লেডি চৌধুরী

"দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার জন্য যখন যাত্রা করি তখন আশুর সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পাশ করিয়া কেম্ব্রিজে ডিগ্রি লইয়া ব্যারিষ্টার হইতে চলিতেছেন। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত কেবল কয়টা দিন মাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল পরিচয়ের গভীরতা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহৃদয়তার দ্বারা অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিত্ত অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিল না সেই ফাঁকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

"আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তখনো ব্যারিষ্টরী

ব্যবসায়ের ব্যূহের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া দ-ন্দ্বের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মঙ্গলের কুঞ্চিত থলিগুলি পূর্ণ বিকশিত হইয়া তখনও স্বর্ণকোষ উন্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্য বনের মধুসঞ্চয়েই তিনি তখন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তখন দেখিতাম সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনের ভিতরে যে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার মধ্যে লাইব্রেরী শেল্ফের মরক্কো চামড়ার গন্ধ একেবারেই ছিল না। সেই হাওয়ায় সমুদ্র পারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিঃশ্বাস একত্র হইয়া মিলিত, তাঁহার সঙ্গে আলাপের যোগে আমরা যেন কোন একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে যাইতাম।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'ফরাসী কাব্য সাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানব জীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূল কথা।

"আশু বলিলেন, তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্য্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব। তাঁহারই উপরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্মকথাটি আছে।"

অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে আশুতোষ শীঘ্রই ব্যারিষ্টরীতে অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট সাংসারিক উন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কারণ অপূর্ব্ব সাহিত্যানুরাগ সত্বেও আশুতোষের অনন্যসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন লইয়া বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইল না। আশুতোষ তাঁহার বিরলপ্রাপ্ত অবসরকাল মৌলিক রচনায় নিযুক্ত না করিয়া প্রধানতঃ গ্রন্থপাঠেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে তাঁহার কৃতিত্ব কিরূপ ছিল বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিবার স্থান

নাই। প্রথম শ্রেণীর ব্যারিষ্টারের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যের উপর, তিনি স্বেচ্ছায় দেশহিতকর নানাবিধ অনুষ্ঠানের সহিত আপনাকে ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন। আশুতোষ 'বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডস' এসোসিয়েশন' নামক সভার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন এবং সভা হইতে দেশের কল্যাণকর নানাবিধ সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় তিনি এই সভা হইতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করিয়া যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা পাঠ করিয়া লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন যে, বিপক্ষ হইতে এরূপ সুলিখিত অথচ তীব্র প্রতিবাদ পত্র তিনি আর প্রাপ্ত হন নাই।

আশুতোষ কংগ্রেসের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং অনেকবার উহার অধিবেশনে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী (শিকারী বেশে)

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে আহূত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে আশুতোষ সভাপতি পদে বৃত হন। সভাপতির আসন হইতে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহার প্রারম্ভেই বলেন,—"পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" এই বাক্যটি এখন এদেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়াছে। একবৎসর ধরিয়া য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সংবাদ-পত্রসম্পাদকগণ এই বক্তৃতার আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। আশুতোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সে সময়ে রাজনীতিকগণের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইয়াছে, নরম ও গরম দলের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। দেশের সেই সঙ্কটকালে স্থিরপ্রজ্ঞ আশুতোষ একতার উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আশুতোষ 'স্বদেশী'র পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনীতিক লাভ হউক আর না হউক, সকলের স্বদেশীয় বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হওয়া উচিত ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। স্বদেশীয় শিল্প বিস্তার উন্নতি এবং জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য আশুতোষ আজীবন চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা বিধায়িনী সভার কোষাধ্যক্ষ, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অন্যতম অধ্যক্ষ এবং জাতীয় শিক্ষা পরি-

যদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কিছুকাল উহার সভাপতি ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে তিনি বহুদিন ২৫০ টাকা মাসিক সাহায্য দিয়াছিলেন। আশুতোষ রিপণ কলেজের অন্যতম ন্যাসরক্ষক ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ২০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি পাবনা কলেজের উন্নতিকল্পে এক সহস্র টাকা, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটকে ৫০০ টাকা, ফেডারেশন হল নির্ম্মাণার্থ ২৫০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রগণকে তিনি মাসে অন্যূন ২০০ টাকা দান করিতেন। তাঁহার নিকট কোনও প্রার্থী বিফলমনোরথ হইত না।

আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স মহোদয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আশুতোষ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। ব্যারিষ্টাররূপে আশুতোষ এই সময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন; বিচারপতির পদ গ্রহণ করায় তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হয়। তাঁহার স্বদেশীয়গণের জন্য একটি অধিকার লাভ করাই তাঁহার এই পদ গ্রহণ করিবার কারণ। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় ব্যারিষ্টারকে বিচারপতি নিযুক্ত করা হয় নাই কিংবা অরিজিন্যাল সাইডে (আদিম বিভাগে) বিচার করিতে দেওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য ৮ বৎসরকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে সর্ব্ব বিষয়ে দেশীয়দিগের বিচার করিবার যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া তিনি দেশবাসীর গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি বিচারপতির আসন হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য নির্ব্বাচিত হন। যখন বাসন্তী দেবী প্রভৃতি মহিলাবৃন্দকে অবরুদ্ধ করা হয় তখন আশুতোষ গবর্ণমেণ্ট-অনুসৃত নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসন্তীদেবীকে মুক্ত করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আশুতোষ মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। একবার মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-সভায় সভাপতিরূপে তাঁহাকে আধুনিক গুরুচণ্ডালী ভাষার নিন্দা ও সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছিলাম।

আশুতোষ বহুবিধ রচনা দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার সুযোগ না পাইলেও, তিনি যে মাতৃভাষার উন্নতিকামী ছিলেন এবং উহার চর্চ্চা করিতেন, তিনি যে বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এই জন্য ১৩২০ সালে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীতে আশুতোষ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভাপতিরূপে আশুতোষ একটী সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারযোগ্য—

"নিজের দেশের কথাকেও বিলাতী চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচাকেনা করে, তাহাদের পক্ষে তাঁড়ামই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্যজগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাও, বিলাতী সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর। বুঝি, কথার অভাব পড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। France এর Academy যেমন নূতন কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না আধ আধ ভাষা—সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজকাল কবিতাকে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই—মুখানি, আলা,

দিঠি ইত্যাদি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব, তরুলতা জাতিযুথী, সোণার থালা, সাঁজের বেলা, জোছনা রাতি, সবই অতি সুন্দর; কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগে ক্লান্তি কি কখনও হয় না? স্বীকার করি বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্য জগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গালা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্যজগতে নাই। বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে জোছনা দেখিতে দেখিতে মনে হয়—বলি, আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে? রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্রকে গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গাস্নান করিয়া লই—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় নাকি—কি কারণে 'মহাকাব্য' লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না? তোড়জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙ্গালী তলওয়ার লইয়া বেহোত হইয়া পড়েন। মাতৃদুগ্ধ পিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল দুধে আলতা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাইরাজা। আমাদের কবি শৈশব যৌবনের মিলনের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহমুগ্ধ হইয়া কতদিন যাপন করিবে? তোমাকে মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না, এই বেশে তুমি অতি সুন্দর, স্বীকার করি; আমার বিশ্বাস যে, তুমি অন্য বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল; তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে; তুমি সরস্বতীর বরপুত্র। তবে রতি-মন্দিরে দিনযাপন করিও না। সহস্র নির্ঝর প্রসূত মন্দাকিনী-বারি-বিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে। * * *

'সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্য, যে সাধনার কথা আমি বলিলাম তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর। প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উদ্ভবের জন্য রৌদ্রতেজের প্রয়োজন।"

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ("বীরবল")

আশুতোষ কিছুকাল সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই স্থানে একটি ব্যক্তিগত কথার উল্লেখ করিব। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে) 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে আমি রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবন-চরিতের আলোচনা করিতেছিলাম। একদিন আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখে শুনিলাম যে আশুতোষ আমার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। কিছুদিন পরে সেই বন্ধু আমাকে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হই। পরে একদিন শুনিলাম ঐদিন আশুতোষ আমার সহিত আলাপ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে স্যর আশুতোষের সহিত কয়েকবার আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার শিষ্টাচার ও অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ হই।

আমার অপর একজন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবন-চরিতের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে, আশুতোষ সানন্দে ঐ অনুরোধ পালন করিতে স্বীকৃত হন এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যথাসময়ে প্রতিশ্রুত ভূমিকাটি প্রেরণ করেন।

তিনি যে কিরূপ মাতৃভাষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এই ঘটনায় তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম।

প্রায় দুই বৎসর হইল আশুতোষ তাঁহার প্রিয়তমা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে হারান। এই দুর্ব্বিষহ শোক তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যে সহ্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি কয়েক মাস হইল চিকিৎসকগণের পরামর্শে ওয়াল্‌টেয়ারে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ গমন করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার পরম স্নেহময়ী জননীকে হারাইয়া আশুতোষ আরও কাতর হইয়া পড়েন। দ্রুতগতিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। কলিকাতায় বালীগঞ্জের বাটীতে তিনি পুনরানীত হন। এই স্থানেই চিকিৎসকগণের সকল চেষ্টা এবং আত্মীয় স্বজনদিগের প্রাণপণ সেবা বিফল করিয়া ৯ই জ্যৈষ্ঠ ২৩শে মে (১৯২৪ খৃষ্টাব্দে) শুক্রবার প্রাতে চিরানন্দময় আশুতোষ আনন্দলোকে চলিয়া গেলেন। দেশের সমস্ত গণ্য মান্য ব্যক্তি, এমন কি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত, শ্মশানে আশুতোষের মৃতদেহের অনুগমন করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আশুতোষ কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান, প্রেমময় স্বামী এবং স্নেহশীল পিতা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহও অতুলনীয় ছিল। দেশের অলঙ্কার-স্বরূপ ভ্রাতৃগণ আশুতোষের অভিভাবকত্বেই কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন; ইহাঁদিগকে আশুতোষের সজীব কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। আশুতোষের দ্বিতীয় ভ্রাতা বিখ্যাত রাজনীতিক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম বাঙ্গলা দেশে কাহার অপরিচিত? তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী কেবল খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার নহেন তিনি প্রসিদ্ধ শিকারী। তাঁহার "ঝিলে জঙ্গলে শিকার" নামক গ্রন্থ বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ গ্রন্থ। চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর নাম আধুনিক পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদৃত। তাঁহার মৌলিকতা, সূক্ষ্মসমালোচনাশক্তি এবং অননুকরণীয় সরল 'বীরবলী' ভাষা তাঁহাকে আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। আশুতোষের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ লেফটেনাণ্ট কর্ণেল মন্মথনাথ, ডাক্তার সুহৃদনাথ এবং ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। আশুতোষ চারিজন সুযোগ্য পুত্র—শিল্পী আর্য্যকুমার, ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার, ক্রীড়াজগতে সুপ্রসিদ্ধ শিবকুমার, ও বার্লিনে শিক্ষার্থী দেবকুমার এবং একটী মাত্র কন্যা শ্রীমতী অশোকা দেবীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী লীলা দেবী বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

আশুতোষ অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুকাল আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ছিলেন এবং উক্ত সমাজের উন্নতিবিধানে আজীবন যত্নশীল ছিলেন। শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতির জন্যও আশুতোষের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইত এবং এই বিষয়ে তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণীর সহিত বহু প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। আশুতোষ তাঁহার চরম পত্রে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহার সযত্ন সংগৃহীত মূল্যবান পুস্তকগুলি, সঙ্গীতসজ্ঘকে পাঁচহাজার টাকা ও বাদ্য যন্ত্রাদি এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গ্রন্থাগারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে বোধ হয় আশুতোষই সর্ব্বপ্রথমে দেশীয় ধুতি ও চাদর পরিধান পূর্ব্বক প্রকাশ্য সভাদিতে যোগদান করিয়া, দেশীয় পরিচ্ছদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আশুতোষ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর দেশানুরাগ, মধুর

চরিত্র ও উদার হৃদয়ের কথা বহুদিন বঙ্গবাসীর স্মৃতি-পটে অঙ্কিত থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি জীবন-প্রভাতে আশুতোষের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, তাহারই প্রথম পংক্তিদ্বয় আজ স্মরণ হইতেছে :—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই!"

আশুতোষ জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মৃত্যু আজি তাঁহাকে অমরতা দান করিয়াছে। তাঁহার গৌরবময় জীবনের স্মৃতি চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে জীবিত থাকিবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

১। বংশপরিচয়।

বিগত ৭ই ভাদ্র শনিবারে, বারাণসী-ক্ষেত্রে, সুপ্রসিদ্ধ মণিকর্ণিকার শ্মশান-চিতায় বঙ্গদেশের সংস্কৃত ভাষার আর একটী শিরোমণি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরকে হারাইয়া, বাঙ্গালার পণ্ডিত-সমাজ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যাঁহাদিগকে লইয়া বাঙ্গালীর গৌরব, যাঁহাদিগের কথা বঙ্গভূমি সগর্ব্বে নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বলিতে পারে, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। ইঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অনন্যসুলভ পাণ্ডিত্য, অপরাজেয় তর্ককুশলতা, সুললিত কবিত্বসম্পদ্, সর্ব্বোপরি পবিত্র আচার-নিষ্ঠতা —পণ্ডিত-সমাজ কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইবে? ইঁহার অতর্কিত অন্তর্দ্ধানে যে শূন্য স্থান পড়িয়া রহিল, তাহা কি আর শীঘ্র পূরণ হইবে?

এই মহাপুরুষের জীবন-কথা বলিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জীবনে "ধরাকম্পনকারী" ঘটনা-বাহুল্য থাকে না। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের পবিত্র জীবন, মৃদুবাহিনী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর মত, সুখে দুঃখে বহিয়া যায়। সে চরিত্রের কমনীয় মাধুর্য্য ও পবিত্রতা, বুঝিবার ও উপভোগ করিবার যোগ্য; তাহা পটহসংযোগে প্রচার করিবার যোগ্য নহে। ইঁহার সঙ্গে আমার যেরূপ ঘনিষ্ঠ শোণিত-সম্বন্ধ, তাহাতে এই কার্য্য আমার পক্ষে বড় বিষাদ-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তবে আমি কেন এ দুঃখজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম?

কিন্তু সে কথা বলিবার অগ্রে, ইনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশের কথাও আমাকে কিছু বলিতে হইবে।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ইটাকুমারী গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। এই গ্রামের শস্য-শ্যামল প্রান্তভূমি-নিচয়, বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ নয়ন-তৃপ্তিকর বীথিকা সকল, বেতস-সমাচ্ছাদিত রম্য নিকুঞ্জ এবং বিবিধ মৃগ-পক্ষি-সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবনগুলি, একদিন মনোমোহন শোভা ও সমৃদ্ধি সূচিত করিত। বিমল-বারিপূর্ণ সরসী সকল, হংস-চক্রবাকদিগের রবে নিয়ত পূর্ণ রহিত। ভুজঙ্গবৎ বক্র অথচ দীর্ঘ গ্রাম্য পথগুলি, পল্লীবালক-বালিকাদিগের ক্রীড়া-চাঞ্চল্যে ও কৃষকবধূগণের মন্থর-গতিতে সর্ব্বদাই হাস্যময় হইয়া থাকিত। এমন একদিন ছিল, যেদিন এই ইটাকুমারী পণ্ডিতবর্গের শাস্ত্রকথায় দিবারাত্র শব্দায়মান হইত। শিষ্যদিগের অধ্যয়নধ্বনি এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও তর্ক গ্রন্থের ব্যাখ্যান-নিনাদ, এ গ্রামটীকে সর্ব্বদাই মুখরিত করিয়া রাখিত। সন্ধ্যা-বন্দন, বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ-বধূগণের আচরিত ব্রত-পূজাদি, এ গ্রামে নিত্য সম্পাদিত হইত। এ গ্রামের সর্ব্বত্র দলে দলে অধ্যাপক ও শিষ্যমণ্ডলী সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেন। পণ্ডিত যাদবেশ্বর, এই গ্রামের সেই সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুলে, সন ১২৫৫ সালে, কার্ত্তিকের পঞ্চবিংশ দিনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই
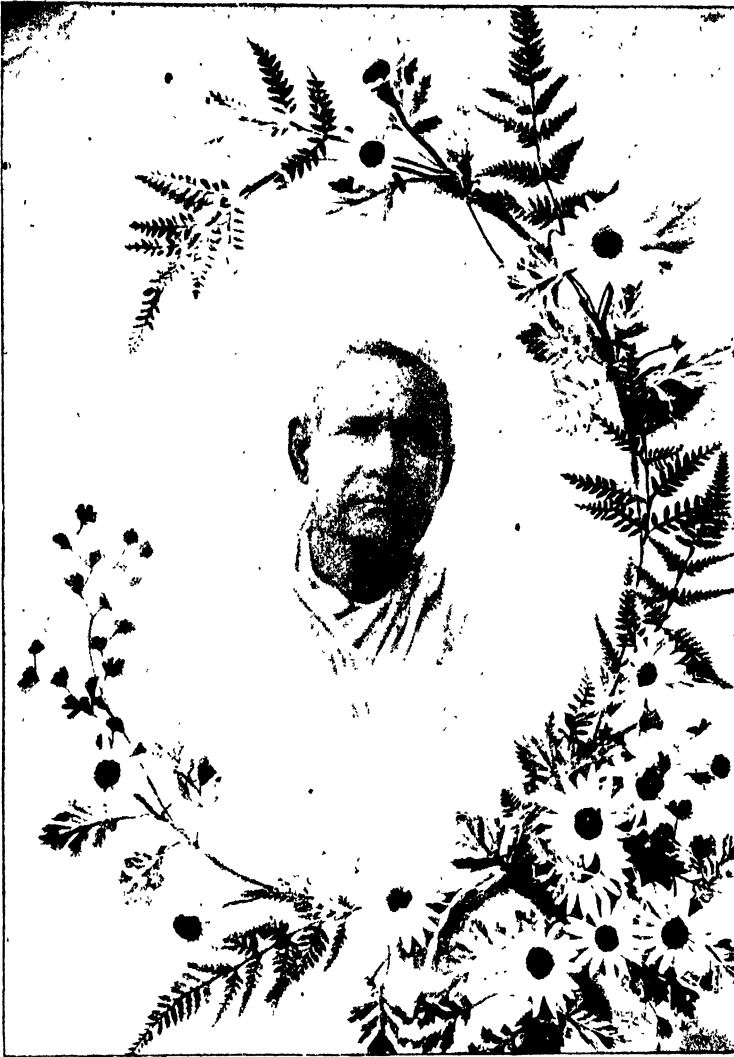
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ ৺যাদবেশ্বর তর্করত্ন

বংশ প্রাচীন কাল হইতেই পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, তপশ্চর্য্যা ও পবিত্র-চরিত্রতার জন্য উত্তর-বঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এ বংশের পূর্ব্ব সূরিগণ কেবল শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্ম্মচর্য্যাকেই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি সকল, কি জানি যদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যের বাধা জন্মায় এই ভয়ে, অনেকে অবলীলাক্রমে তৃণরাশির ন্যায় প্রত্যাখ্যাত করিয়াছিলেন। এই বংশেই সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার, বঙ্গের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে সমুদিত হইয়া, ন্যায়শাস্ত্রে আপনার অসাধারণ প্রতিভা বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে তৎপ্রণীত ন্যায়গ্রন্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারিকা মালা অধীত হইয়া থাকে।

আমি যে বংশের কথা উল্লেখ করিলাম, এই বংশের বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব সম্বন্ধে একটী প্রাচীন কিংবদন্তী বহুকাল হইতে লোকমুখে কীর্ত্তিত হইয়া

আসিতেছে। "অধিকরণ কৌমুদী"র গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ এই বংশের আদি পুরুষ। উত্তর-কালে একদিকে যেমন এই রামকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের সৌরভ বিকীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ আবার ইনি যোগাভ্যস্ত মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বরেন্দ্রভূমি রাজসাহী ইঁহার জন্মস্থান। ইনি যখন যুবাপুরুষ সেই সময় এক দন অতি প্রত্যূষে রাজপথ অবলম্বন করিয়া নদী-তীরে যাইতেছিলেন। তখনও রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই; উষার বিরলান্ধকার তখনও পৃথিবীর বুক হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এমন সময়ে আকাশ-গাত্রে একটী উজ্জ্বল ধবলবর্ণ মনোরম রমণী-মূর্ত্তি সহসা আবির্ভূত হইলেন। রামকৃষ্ণ বিস্মিত-মনে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী নীলাকাশে সেই রমণী-মূর্ত্তির দেহ-নিঃসৃত শ্বেত-প্রভায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে; অঙ্গ-গন্ধে দিগ্বলয় আচ্ছন্ন ও সুরভিত হইয়া উঠিয়াছে। রামকৃষ্ণ বিস্ময়ে, ভয়ে ও আহ্লাদে চমকিয়া উঠিলেন। তিনি স্তিমিত-নেত্রে এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিতেছেন, এমন সময়ে সেই রমণী-মুখোচ্চারিত, শ্রুতি-সুখকর, শ্রৌত সংস্কৃত তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, আকাশের গাত্রে দেবী সরস্বতীর অভ্যুদয় হইয়াছে। রামকৃষ্ণ যোড়করে ভারতীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। সেই স্তুতিটী আর্য্যাছন্দে উচ্চারিত হইয়াছিল। বংশপরম্পরা ক্রমে অদ্যাপি সে কবিতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সেই স্তুতি-গাথার একটী কবিতা এই:—

"ভুবনাপদি কিল যস্যা ন কিঞ্চিদবসিতমপি কল্পস্যান্তে।
অধুনাহধিকসংস্কৃতরূপাব্যক্তিরিতামহং প্রপদ্যেতাম্॥"

রামকৃষ্ণ নাকি এরূপ পাঁচটী কবিতায় ভারতীর স্তুতি গাহিয়াছিলেন। কাল প্রভাবে অন্য চারিটী শ্লোকই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার অনেকগুলি পুরশ্চরণ করিয়াছিলে, সেই পুণ্য-প্রভাবে অদ্য তুমি আমার দর্শন-লাভে সমর্থ হইলে; তুমি আমার যতটী পুরশ্চরণ করিয়াছিলে, তোমার বংশে তত পুরুষ পর্য্যন্ত কবিত্বের প্রস্ফুরণ ও সংস্কৃত চর্চ্চা থাকিবে।" —বাগ্‌দেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

রামকৃষ্ণ আপনাকে মোহাভিভূতের ন্যায়, ভূতগ্রস্তের ন্যায়, ঐন্দ্রজালিক-মায়াচ্ছন্নের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। উষান্ধকার ছাড়িয়া গেল, পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—রামকৃষ্ণের অন্তঃকরণে চিন্তার উদয় হইল। "একি দেখিলাম? ইহা কি স্বপ্ন? না, না, ইহা ত আমার জাগ্রদবস্থায় সংঘটিত হইল। জাগ্রৎ-স্বপ্নই হউক, বাস্তবিক স্বপ্নই হউক,—আমি নিশ্চয়ই এই ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।" মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রামকৃষ্ণ, "ভারতী তাঁহার নিজের বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না"—এই জন্য চিত্তে বিষণ্ণ হইলেন। রামকৃষ্ণের মুখ হইতে ভারতীর স্তুতি-সূচক যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত কবিতা উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বাগ্দেবীর সন্নিধানের প্রভাবেই ঘটিয়াছিল। তিনি তখনও ভাল করিয়া সংস্কৃত চর্চ্চা বা কবিতা-দেবীর অর্চ্চনা করেন নাই। রামকৃষ্ণ, 'এজীবনে আর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারী হইব না'.—মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, গৈরিক বসন পরিধান করতঃ, ব্রহ্মচারীর বেশে দেশ পরিত্যাগ করিলেন। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, নীলাচলে কামাখ্যার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশেষে, রঙ্গপুরান্তর্গত ব্রাহ্মণীকুণ্ডা নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পথশ্রান্ত হইয়া সেই গ্রামে যে অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি লোকে সেই বৃক্ষ দেখাইয়া দেয়।

ফতেপুরাধিপের রূপরাম ধর নামে একটী প্রধান অমাত্য, সেই সময়ে রাজকীয় কর সংগ্রহার্থ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট, প্রভা-মণ্ডিতদেহ, শুভ্রোপবীতধারী যুবক রামকৃষ্ণ হঠাৎ তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইলেন। নন্দিবংশোদ্ভব, বৈদ্যকুলাবতংস, ফতেপুরাধিপতি প্রসিদ্ধ শিবরাম চৌধুরী, সেই সময়ে প্রাণান্তকর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ছিলেন। শিবরাম চৌধুরী যে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের কোন আশাই ছিল না। নবাবেরা এই 'চৌধুরী' উপাধি দিয়াছিলেন। প্রখ্যাত 'অম্বষ্ঠকুলার্ণব'—গ্রন্থে

এই শিবরামের পুত্র রাজারামের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

'এই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে তেজঃসম্পন্ন দেখা যাইতেছে। যদি তপঃপ্রভাবে ইনি ভূম্যধিকারীর প্রাণ বাঁচাইতে পারেন;—আর তাহা না পারিলেও, আর একটী কার্য্য ইঁহার দ্বারা হইতে পারিবে। ফতেপুর-পতি অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছেন, এই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণও করিতে পারেন'—অমাত্য প্রবর মনে মনে এই কথা গুলির আন্দোলন করিয়া, ধীরে রামকৃষ্ণের সমুখীন হইয়া, আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। রামকৃষ্ণের সংসারে বিরাগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তথাপি, সরস্বতীর প্রসাদ অলঙ্ঘ্য বলিয়াই হউক, অথবা ভবিতব্যতার প্রভাব বশতঃই হউক,—রামকৃষ্ণ স্বীকৃত হইলেন। অমাত্য তাঁহাকে শিবরাম চৌধুরীর নিকট উপস্থিত করিলেন।

চরিত্রের পবিত্রতায় ও চিত্তের দৃঢ়তায়, রামকৃষ্ণ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু দৈব-প্রভাব কে প্রতিরোধ করিতে পারে? বাগ্‌দেবীর বর-প্রভাবে রামকৃষ্ণের মোহ উপস্থিত হইল। তিনি শিবরামকে দীক্ষা দিলেন। শিবরাম রোগশয্যা হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ফতেপুর-পতি দীক্ষা-গ্রহণের পর হইতেই, ক্রমে রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধ ও অনুনয় বিনয় করিয়া, রামকৃষ্ণকে গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করাইলেন। রাজসাহী হইতে স্ত্রীরত্ন আনাইয়া বিবাহ দেওয়াইলেন, এবং ভূসম্পত্তি দিয়া ও বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া, রামকৃষ্ণকে ইটাকুমারী নামক গ্রামে সংস্থাপিত করিলেন। ইটাকুমারীতে বাৎস্যবংশের বীজ-তরু প্রোথিত হইল।

কালে রামকৃষ্ণের চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। নিম্নে আদি পুরুষ হইতে একটী বংশ-চিত্র প্রদত্ত হইল।
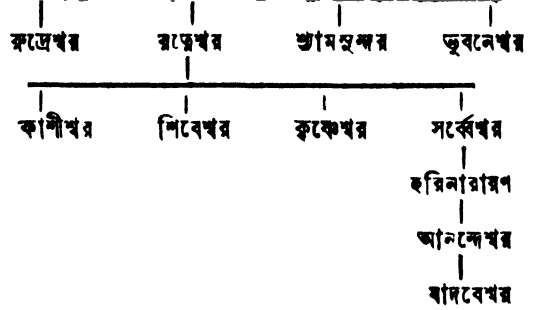
উপরের লিখিত বংশাবলীতে, রুদ্রেশ্বরের শাখায়, "বিজয়িনী" মহাকাব্য ও "দিল্লীমহোৎসব" কাব্য-প্রণেতা মহাকবি শ্রীশ্বর ইউরোপ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিবেশ্বরের বংশে সুপ্রসিদ্ধ হরিনাথও মহাকবি ছিলেন। হরিনাথের অনেক কবিতা পিতার মুখে শুনিয়াছি। ইনি লিখিয়া কবিতা রচনা করিতেন না। অনর্গল দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দে কবিতা মুখে মুখে অবিলম্বে রচনা করিতে পারিতেন। কাশীশ্বরের পৌত্রী মানিনী দেবীর গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রুদ্রমঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাগ্দেবীর প্রদত্ত বর বোধ করি এ বংশে ফলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমানে এ বংশে সংস্কৃত চর্চ্চা নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত শাখাই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এ প্রবন্ধে আমরা যাদবেশ্বরের বংশ পরিচয় বিবৃত করিলাম, আগামী সংখ্যায় তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় প্রদান করিব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

"ত্রিবেণী" প্রবন্ধের প্রতিবাদ

কার্ত্তিক মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে ত্রিবেণী শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক মহাশয় নেতা ধোবানীর সহিত যে জনপ্রবাদটী যুক্ত করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় ঠিক হয় নাই। কারণ প্রচলিত প্রবাদটী হইতেছে "যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।" প্রবন্ধ লেখক মহাশয় "নেপোয়" শব্দের পরিবর্ত্তে "নেতা" শব্দটি ব্যবহার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উক্ত প্রবাদটী হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও বর্দ্ধমান জেলায় অধিকাংশ স্থলেই প্রচলিত আছে। অন্যান্য স্থানেও থাকিতে পারে। কিন্তু অদ্যাবধি নেতায় মারে দই প্রয়োগ ঐ সব স্থানের কাহারও মুখে শুনি নাই। লেখক মহাশয় তাঁহার গল্পের ভিত্তি কোথায় পাইলেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু নৃত্যকালী রজকিনী অথবা নেতা ধোবানী সম্বন্ধে আর একটী গল্প প্রচলিত আছে, তাহা অলৌকিক হইলেও ত্রিবেণী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবার যোগ্য। গল্পটী এইরূপ :—

বেহুলা তাঁহার মৃতপতি লখিন্দরের শবদেহ লইয়া যখন ভাগীরথী স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া যাত্রা করেন, তখন ত্রিবেণীর সন্নিহিত হইয়া তিনি দেখিতে পান যে নেতা ধোবানী কাপড় কাচিতেছে। তাহার শিশু পুত্রটী সেই সময় দুষ্টামি করিতে থাকায় নেতা তাহাকে পাটের উপর আছাড় মারিয়া, মারিয়া ফেলিল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া বেহুলা ঘাটে ভেলা লাগাইয়া নৃত্যকালীকে তাহার বীভৎস আচরণের জন্য তিরস্কার ও অনুযোগ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত পুত্রকে বাঁচাইয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া বেহুলা নৃত্যকালীর গৃহে স্বামীর শবদেহ লইয়া অতিথি হইলেন ও তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া, তাহার নিকট হইতে মৃত সঞ্জীবন মন্ত্রটী শিক্ষা করতঃ লখিন্দরের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। নৃত্যকালী স্বর্গে অপ্সরাগণের বস্ত্রাদি ধৌত করিত, ও তাহাদের নিকট হইতেই মৃতসঞ্জীবন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। গল্পটী কোথাও কোথাও কিছু রূপান্তরিত ভাবে বর্ণিত হইতেও শুনিয়াছি।

"নেপো" কে ছিল ও কাহার দই খাইয়া উক্ত প্রবাদটীর প্রচলন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা জানি না।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

"খানাকুল কৃষ্ণনগর" প্রবন্ধের প্রতিবাদ

রাধানগরের পঞ্চদশ সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ যাহা "খানাকুল কৃষ্ণনগর" নামক প্রবন্ধের আকারে কার্ত্তিক সংখ্যা মানসী ও মর্ম্মবাণীতে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা অতীব মনোরম ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধের একস্থানে বংশাবলী সম্বন্ধীয় একটী ভ্রম পরিলক্ষিত হইল। শাস্ত্রিমহাশয়ের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত ব্যক্তি অস্মদ্দেশে বিরল। উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে "যাদবেন্দ্রচৌধুরী ও তাঁহার পুত্র বংশীধর চৌধুরী এই সমাজ স্থাপন করেন।" কিন্তু বংশীধর যাদবেন্দ্রের পৌত্র, পুত্র নহেন। যাদবেন্দ্র সিংহের দুই পুত্র, কৃষ্ণরাম সিংহ ও

গোবিন্দরাম সিংহ। কৃষ্ণরামের পুত্র বংশীধর। এই বংশীধর চৌধুরীই খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের স্থাপয়িতা। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় লিখিয়াছেন যাদবেন্দ্রের পুত্র বংশীধর।

প্রাচীন চৌধুরীদিগের দলিলে "বংশীধর সিংহরায় চৌধুরী সিংহ মজুমদার" এইরূপ লিখিত আছে। নিম্নে চৌধুরীদিগের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।
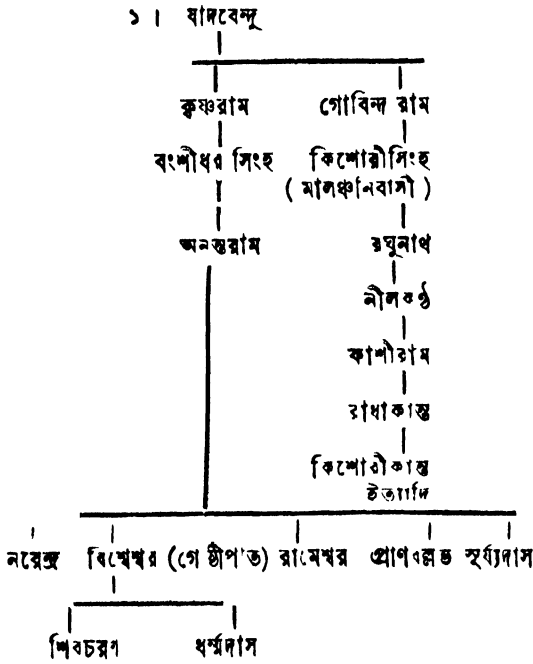
(৺মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধির "পুরোহিত" দ্রষ্টব্য)

"ন্যূনাধিক ৮০০ সালে (১৩১৫ শকে ১০৯৩ খৃঃ) খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের সূত্রপাত হয়। খানাকুল কৃষ্ণনগর রাঢ়ভূমির মধ্যে অতি-প্রাচীন গ্রাম।"—(সন্দর্ভ সংগ্রহ—৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।)

যাদবেন্দুর প্রপৌত্র, অনন্তরাম সিংহের পুত্র, বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক পয়ারে রচিত "সত্যনারায়ণের-কথা"য় তাঁহাদিগের কুল পরিচয় আছে। এই বিশ্বেশ্বরই গোষ্ঠীপতি হন।

> পীরের কৃপায় সাধু সুখেতে নিবসে।
> ধন ধান্য বৃদ্ধ হয় দিবসে দিবসে॥
> হরিধ্বনি কর সবে জয় কোলাহল।
> সমাপ্ত হইল সত্য পীরের মঙ্গল॥
> গাড় মান্দারণ দেশ অধিপতি মহাশয়।
> পুণ্যবান শ্রীযুক্ত যাদবেন্দু রায়॥
> তাঁহার তনয় কৃষ্ণরাম আর গোবিন্দ।
> ভক্তি ভরে পূজে যাঁর চরণারবিন্দ॥
> কৃষ্ণরাম পুত্র হন বংশীধর।
> তৎ পুত্র অনন্তরাম গুণের সাগর॥
> তাঁহার তনয় বিশ্বেশ্বর সিংহ কহে।
> শ্রীনাথ শ্রীগুরুদেব পদোসরোরুহে॥
> গোবিন্দ পদারবিন্দ কাশী করি আশ।
> অনুবাদ করি গ্রন্থ করিলা প্রকাশ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বংশীধর যাদবেন্দুর পুত্র নহেন। "যাদবেন্দুর পূর্ব্বপুরুষ বীরেন্দ্র সিংহ গড়-মান্দারণে বসতি করিতেন। দুর্গেশ-নন্দিনী উপন্যাসে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক নহে ইহা চৌধুরী গোষ্ঠীর অনেকেই নির্দ্দেশ করেন।" (খানাকুল কৃষ্ণনগরের ইতিহাস, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।)

উপরিউক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় "ধামান" শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পাঠ করিয়া আমার একটী লুপ্ত স্মৃতি স্মরণ হইল। বর্ত্তমান ধামনা গ্রামে কৈবর্ত্ত জাতিই বসবাস করে। স্থানীয় জনৈক কৈবর্ত্ত ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে একটী পুষ্করিণী খনন সময়ে মৃত্তিকা গর্ভে একটী অল্প পরিসর গৃহ আবিষ্কার করে। দ্বার উন্মোচন করিলে দেখা যায় দুইটী নর কঙ্কাল আরাধনায় নিযুক্ত, হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট। সম্মুখে ভীমা করালবদনা কালীমূর্ত্তি। আমি বহুস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ মূর্ত্তি কদাপি আমার নয়নগোচর হয় নাই।

ধামনা পূর্ব্বে কিরূপ সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগরী ছিল, তাহা শ্রীযুক্ত প্যারীলাল দাসের "মাহাত্ম্য" পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং এবিষয়ে প্রত্নতত্ত্ব,অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণেরও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে।

বৈষ্ণবাগ্রণ্য অভিরাম গোপালের অনুরোধে যাদবেন্দু ধামনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরে বাস করেন, পশ্চাৎ

গৌড়ের নবাব গয়াস্ শেরুদ্দিনের সময়ে উক্ত নবাব কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। এবিষয়ে যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা বিদ্যানাথ মহাশয়প্রণীত "খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের ইতিহাস" পাঠ করুন।

শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়।

মুসলমান যুগের মথুরা

ভারতে যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল তখন আরবের মরুভূমে মক্কা নগরে (কোরেশ বংশে) ৫৭০ খৃঃ মোহাম্মদ নামে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে পিতৃহীন হইয়া উষ্ট্রচালকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে খাদিজা নাম্নী একজন ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করেন। ইনি বাল্যাবধি বুদ্ধের ন্যায় সতত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে আরব নিবাসীরা মদ্যপান করিত, বহু বিবাহ করিত ও অতি অল্প কারণে পরস্পর বিবাদ করিয়া রক্তপাত করিত। সে সময়ে তাহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কতকটা বর্ব্বর প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারা বোৎ অর্থাৎ দেব মূর্ত্তির পূজা করিত। এই বোৎ শব্দটা বুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ কিনা তাহা ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারিবেন।

মোহম্মদ দেশবাসীর এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে একেশ্বর তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া সভ্যতা ও সুনীতির পথে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটী বিজন গুহায় বসিয়া নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। পরে তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া নিজের উন্নততর মতবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচলিত পৌত্তলিক মতের বিরোধী বলিয়া প্রথমে তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, বরং কেহ কেহ তাঁহার প্রাণ বধের নিমিত্তও উদ্যত হইয়াছিল। তিনি বিরক্ত হইয়া মক্কা হইতে মদিনায় চলিয়া গেলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইস্লাম বা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। মুসলমান শব্দের প্রকৃত অর্থ ভক্ত।

মোহম্মদের মক্কা ত্যাগের বৎসর ৬১২ খৃঃ হইতে মুসলমানদিগের হিজরা নামক অব্দ গণনা করা হইয়া থাকে। পরে আরবেরা যখন বুঝিতে পারিল যে তাঁহার ধর্ম্মে যথার্থ সত্য নিহিত আছে এবং উহা মানবজাতির হিত ও উন্নতির সাধক, তখন তাহারা দলে দলে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল।

তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম কোরাণ। তিনি দৈবভাবাবেশে বিভোর হইয়া যাহা বলিয়া যাইতেন, শিষ্যেরা খেজুর পাতায় তাহা লিখিয়া লইতেন। এইরূপে কোরাণ রচিত হয়। মোহম্মদের ভক্তেরা তাঁহাকে 'রসুল' বা ঈশ্বরের দূত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ৬৩ বৎসর বয়েসে তাঁহার মৃত্যু হয়। আরবেরা এই সময়ে অনেক ছোট ছোট জাতি ও দলে বিভক্ত ছিল। নূতন ধর্ম্মের প্রভাবে তাহারা একতাবদ্ধ হইল। এই সময় হইতে তাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ঈশ্বর, এক রাজা। তাহারা যখন একতাবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইল, তখন সে অপূর্ব্ব নবীন তেজের প্রভাবে সমুদয় বাধাবিঘ্ন ভাসিয়া গেল। ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ইস্লাম ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিল। কোরাণ লিখিত ধর্ম্মে নিরাকার ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন কৃত্রিম মূর্ত্তি পূজা করা একান্ত অবৈধ। এই জন্য তাঁহারা দেব মূর্ত্তি ভঙ্গ করাকে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধি আছে যে মুসলমান সাম্রাজ্যে প্রকৃত সম্রাট্ ঈশ্বর। পার্থিব

শাসকেরা তাঁহার প্রতিনিধি (agent)। শাসকেরা সকলকেই ঈশ্বরের আদেশ বলপূর্ব্বক পালন করাইবেন। মুসলমান রাজ্যে অবিশ্বাসী (কাফের) লোকেরা রাজদ্রোহের তুল্য অপরাধী ও পাপী। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে বা তাহাদিগকে হত্যা করিলে পাপ না হইয়া বরং পুণ্য হয়। পরাজিতেরা যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করে তবে তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে। তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণকেও দাস করিবে। নূতন মন্দির করিতে দিবে না। পুরাতন মন্দির সংস্কার অভাবে যদি আপনি ভাঙ্গিয়া না পড়ে তবে তাহা চূর্ণ করিয়া দিবে। তাহাদিগকে অশ্বগজাদি আরোহণ বা ভদ্র পরিচ্ছদধারণ বা অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিতে দিবে না। কাফেরদিগের নিকট হইতে জিজিয়া নামে কর আদায় করিবে। মুসলমানেরা মুখে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিলে কাফের দাসদিগকে মুখব্যাদান করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলমানেরা রূপা চাহিলে দাসগণ সোণা দিবে। (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বিরচিত আওরাঙ্গজেব নামক পুস্তকে ৩য় ভাগ, ২৮৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুসলমানেরা যখন উপরিউক্ত রূপ ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন ভারতের বড় শোচনীয় দশা। এখানকার প্রায় সর্ব্বত্রই অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলতা। জাতি বিরোধে এবং ধর্ম্ম বিদ্বেষে পরস্পর বৈরভাবাপন্ন। তদুপরি যাঁহারা দেশের মধ্যে সবল ও ক্ষমতাশালী, যাঁহাদের কৃপাণ হস্তে স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে অহিংসাব্রতধারী ও হীনবীর্য্য। এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় এরূপ কোন পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন না, যিনি দেশের লোক সকলকে সমবেত করিয়া বিপক্ষকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন। কেবল ধর্ম্ম-প্রচার নহে, ধনরত্ন লোভও মুসলমানদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

আমরা এখানে কেবল মথুরার কথাই বলিব। গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত লুণ্ঠন করেন। তিনি যেখানেই ধনজন পূর্ণ নগর, অথবা মণি মাণিক্য সমন্বিত দেবমন্দির ও তীর্থক্ষেত্র আছে শুনিতেন, সেই থানেই সৈন্য-সামন্ত লইয়া লুণ্ঠন করিতে যাইতেন। রাজপুতেরা তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য সমুচিত চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহারা একে একে রাজ্য, ধন দেবালয় এমন কি আপন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন। মামুদ গিজনী নবম অভিযানে কনোজ লুণ্ঠন করিয়া মথুরার দিকে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

তিনি নিজে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে আল্‌ধাস্ উট্‌বী নামক মামুদ সুলতানের একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ (Secretary) তারিখ-ই-যামানি গ্রন্থে মথুরালুণ্ঠনের বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে লিখিয়া যান। তিনি নিজে অভিযান কালে মামুদের সঙ্গে ছিলেন না, তাঁহার গ্রন্থে মথুরা বা মহাবনের নাম নাই। ফেরিস্তা প্রভৃতি পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আল্ উটবী লিখিত গ্রন্থ হইতে যুদ্ধস্থানের বর্ণনা প্রভৃতি দেখিয়া মথুরা লুণ্ঠনের নিম্নলিখিত রূপ বিবরণ দিয়াছেন।

১০১৭ খৃঃ সুলতান মামুদ যমুনা পার হইয়া কয়েকটী শৈল দুর্গ অধিকার করিলেন ও তথায় প্রভূত ধনরত্ন লাভ করিলেন। ব্রজ মণ্ডলের অন্তর্গত বারণের (বুলন্দ সহর) রাজা হরদত্ত বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রথমে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু আপনাকে দুর্ব্বল দেখিয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে রাজ্য মধ্যস্থ সমস্ত দেববিগ্রহ গুলিকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া, এক কোটী টাকা ও ত্রিশটী হাতী, সুলতান মামুদকে উপহার পাঠাইয়া দিলেন। এবং সুলতানের অভিপ্রায় মত দশ সহস্র অনুচর সহ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কোনরূপে অব্যাহতি পাইলেন।

ইহার পর সুলতান মামুদ মহাবনের দুর্গ ও রাজ কুলচন্দ্রের রাজ্য লুণ্ঠন করিতে গেলেন। কুলচন্দ্র সেই

সময়ে প্রভূত ক্ষমতাশালী এবং অসংখ্য হিন্দু সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল গজ বাহিনী ও সুদৃঢ় দুর্গ শ্রেণী ছিল বলিয়া, কোন শত্রুই রণক্ষেত্রে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। কুলচন্দ্র যখন বুঝিলেন সুলতান তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তখন তিনি একটী গভীর অরণ্য মধ্যে সেনাব্যূহ রচনা করিলেন। মুসলমান সৈন্যগণের সহিত হিন্দু সেনাগণের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অর্দ্ধ লক্ষ হিন্দুসেনা স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। কতকগুলি সেনা জলমগ্ন, আর কতকগুলি সেনা আহত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। কুলচন্দ্র নিজ মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মনঃক্ষোভে উন্মত্তবৎ হইয়া নিজ মহিষীর কণ্ঠ দ্বিখণ্ডিত করিয়া, নিজ বক্ষে সেই শাণিত কৃপাণ বসাইয়া দিলেন। সব ফুরাইল। সুলতান এস্থান হইতে ১৮৫টী হস্তী ও বিপুল রত্ন সম্ভার আত্মসাৎ করিলেন। তখন হিন্দুগণ গৃহবিবাদে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুলচন্দ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া আর কেহ বাধা দিতে সাহসী হইলেন না।

সুলতান মামুদ অবাধে মথুরা লুণ্ঠন করিলেন। নগরের চারিদিকে দুর্গের আকারে সুদৃঢ় প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল। যমুনা অবগাহনের জন্য পাষাণ রচিত দুইটী দ্বার দিয়া সোপান শ্রেণী জল পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছিল। ইহাদের পাষাণ ভিত্তি গুলি এত সুদৃঢ় ছিল যে, ঝড় বাদলে বা নদী প্লাবনে কিছু মাত্র ক্ষত করিতে পারিত না। ইহার পার্শ্ব দিয়া নগর মধ্যে জল প্রবেশ ও বির্নিগত করিবার নহর কৌশলে রচিত হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে ও যমুনা তটে সহস্র সহস্র সুচারু কারুকার্য্য বিভূষিত পাষাণময় মন্দির ও হর্ম্ম্যরাজি বিরাজিত ছিল। মন্দিরের অলিন্দ সুদৃঢ় লৌহ শলাকা দিয়া সুরক্ষিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিরের অভ্যন্তরে বহুমূল্য মণিমাণিক্য বিরচিত স্বর্ণ রজতময় দেব মূর্ত্তি সকল সংস্থাপিত। ইহার অপর দিকে দারুময় স্তম্ভের উপর অপর কতকগুলি আবাস ভবনও বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের মধ্যস্থলে একটী সুরম্য গগনস্পর্শী মর্ম্মর প্রস্তর রচিত দেব মন্দির ছিল। তারিখ ই-য়ামিনি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সুলতান সেই অপূর্ব্ব মন্দিরের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে বলিয়াছিলেন যে, "পৃথিবীর সুনিপুণ স্থপতিদিগকে দুই শত বৎসর অবিশ্রান্ত খাটাইলেও এবং অজস্র স্বর্ণ দিনার (মুদ্রা) ঢালিয়া দিলেও এরকম সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় কি না সন্দেহ।" সেই অদ্বিতীয় মন্দিরের প্রকৃত পরিচয়, বাক্য বা তুলিকা চিত্রে প্রকাশ করা যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা আরও বলেন যে সেই প্রধান মন্দিরের ভিতর প্রায় ১০ হাত উচ্চ বিশুদ্ধ সুবর্ণের পাঁচটী দেব মূর্ত্তি ঐন্দ্রজালিক কৌশলে শূন্যে লম্বমান ছিল। দেবমূর্ত্তি গুলির নয়নদ্বয় বহু মূল্য হীরক খণ্ডে বিরচিত। আর একটী ২ ফিট উচ্চ মণিমণ্ডিত স্বর্ণ প্রতিমা ছিল, তাহার ওজন ৪৪০০ মিস্কাল। এখানকার অধিকাংশ প্রতিমা সুবর্ণ বা রজত নির্ম্মিত। রজত মূর্ত্তি গুলি সংখ্যায় দুই শতেরও অধিক। কেবল সুবর্ণ প্রতিমা গুলি ওজনে ৯৮০০০ মিস্কাল হইয়াছিল। ২০০ শত রৌপ্য মূর্ত্তি গুলিকে না ভাঙ্গিলে ওজন করিবার সুবিধা নাই বলিয়া তাহার ওজন কত জানা যায় নাই। সুলতান মামুদ প্রথমে সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত দেব মূর্ত্তি গুলি ও মণি রত্ন যাহা পাইলেন, বিশ দিন ধরিয়া লুণ্ঠন করিলেন। ইহার পর তিনি স্বয়ং লৌহ মুদ্গর লইয়া পাষাণ বিরচিত অপর যে সকল দেবমূর্ত্তি ছিল তাহা নিজ হস্তে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহস্র সহস্র অনুচরবৃন্দ মূর্ত্তি, হর্ম্ম্য ও মন্দিরাদি মথুরার যে কিছু শোভা সম্পদ ছিল, তাহাও ধ্বংস করিতে লাগিল। পরিশেষে নগরে অগ্নি দিয়া সমস্ত স্থানকে ধূলি ও ভস্মে পরিণত করিল। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, পূজারী সংঘ, ও আবাল বৃদ্ধ বনিতা অধিবাসী বৃন্দ আপন আপন ঠাকুর ফেলিয়া যে যেখানে পারিল পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। যাহারা তাহা না পারিল মুসলমান সৈনিকের শাণিত কৃপাণ তলে প্রাণ হারাইল।

যমুনার শ্যাম সলিল নর শোণিতে লোহিত বর্ণ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র সুনিপুণ শিল্পকরেরা শত শত বৎসর ধরিয়া মথুরাকে যে সকল অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছিলেন, সমস্তই শ্মশানে পরিণত হইল। মামুদ এখান হইতে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত স্তম্ভ ব্রাকেট খিলান প্রভৃতি সুরম্য কারুকার্য্য সমন্বিত দ্রব্য সম্ভার শতাধিক উষ্ট্র পৃষ্ঠে গজনী নগরে লইয়া গেলেন। ভারত হইতে অপহৃত উপকরণ দিয়া তথায় 'সুরবধূ' (Celestial Bride) নামে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি এক মাত্র মথুরা হইতেই পাঁচ সহস্র বন্দী ও তিন কোটী টাকা লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। পাঠকগণ মনে করিবেন না সেই সকল স্বর্ণ ও রজত প্রতিমা গুলি কেবল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তি। তন্মধ্যে যে বহুসংখ্যক জৈন ও বৌদ্ধ দেব মূর্ত্তি ছিল তাহা সুনিশ্চিত। "শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে" যখন মামুদ গিজনীর নয়ন সমক্ষ হইতে জগতের আলোক স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন যে, তখন তিনি সপ্তদশ বার ভারত লুণ্ঠন করিয়া যে অগণিত সংখ্যক মণি রত্নরাজি অপহরণ করিয়াছিলেন সে গুলিকে তাঁহার মুদিতপ্রায় নয়ন সমক্ষে আনিতে আদেশ দিয়াছিলেন। চিরদিনের জন্ত সেই অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহার গণ্ড বহিয়া দর দর অশ্রুধারা বহিয়াছিল। এবং তৎসঙ্গে যে কত নিরীহ মানবের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া সে গুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণে অনুশোচনা আসিয়াছিল কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে?

নিয়তির অলঙ্ঘ্য কঠোর শাসন মিশর, গ্রীস, রোম, নেপাল, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি প্রাচীন সকল দেশকেই অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হইয়াছে, ভারতেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? উত্থান ও পতন যদি জগতের নিয়ম হয় তাহা হইলে তাহা লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

উদ্‌ভ্রান্ত

অতল মানব-চিত্ত-পারাবার তলে
কল্পনা-অতীত শিব কল্পতরু রাজে;
কুবের বৈভব তথা ম্লান মহালাজে;
থাকিতে এ ধন নর জ্বলে দুঃখানলে!
চায় অর্থ, চায় মান, প্রতিষ্ঠা, জগতে
সুখের লাগিয়া বৃথা করে অন্বেষণ,
স্পর্শমণি ফেলি' লোষ্ট্রে করয়ে যতন।
কস্তুরী মৃগের মত ভ্রমে বনপথে।
যাও ডুবে হৃদি তলে, নাহি কর ভয়,
উপরে তরঙ্গ গর্জ্জে—অন্তরে কেবল,
হে আত্মবিস্মৃত, ঝরে সুখ সুবিমল,
পাইবে, পাইবে সেথা নিজ পরিচয়।
নহ তুমি তৃণমাত্র নিখিলের স্রোতে,
অনন্ত শকতি—ভিন্ন নহ বিভু হতে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দেব।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১

ভারতগৌরব-রবি আশুতোষ অস্তমিত আজ!
বঙ্গভারতীর সে যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরোহিত।
করে গেল জ্ঞানে কর্ম্মে স্বদেশের নানাবিধ হিত!
স্বজাতির শিরে আজি বিনা মেঘে পড়িয়াছে বাজ!
তার জোড়া মিলিবে কি? কে করিবে অসমাপ্ত কায?

তাই তার অবসানে দেশ যেন নিস্তব্ধ নিশীথ!
চতুর্দ্দিক অন্ধকার, মর্ম্মে বাজে বিষাদ-সঙ্গীত!
আশুতোষ বিনা আশু কে ঘুচাবে অপমান লাজ?

তাহার পৌরুষ হেরি' রাজশক্তি হত অবনত!
জীবনের বিনিময়ে সে রাখিত জাতীয় সম্মান!
তাই তার কাছে গিয়া স্ফীতবক্ষ কাঁপিত সতত!
মনঃপ্রাণে গেছে মানি' সুনির্ভীক ন্যায়ের বিধান!
তার শূন্য স্থানে বসি' বাঙালী কি হবে তার মত?
গেল সে পুরুষসিংহ! কাঁদো, কাঁদো, বাঙালী সন্তান!

২

যে গেল সে চলে গেল! তার স্থান পুরিবে না আর!
ভারতের ভাগ্যাকাশে সে যে ছিল দীপ্ত বৃহস্পতি!
তাহার মনীষালোকে ভূভারত আলোকিত অতি!
বাঙালী লভিল ক্রমে বিশ্বমাঝে প্রতিষ্ঠা তাহার।
জ্ঞানে কর্ম্মে বঙ্গবাসী দেশে দেশে ধাইল আবার!
তাহার প্রচেষ্টা-বলে মাতৃভাষা লভিল প্রগতি!
উদ্বোধিল স্বজাতিরে বারম্বার হয়ে দৃঢ়মতি!
বাঙালী লভিয়া প্রজ্ঞা চমকালো জগৎ সংসার!

বাল বিধবার দুঃখে রাত্রিন্দিব সহিয়া আঘাত,
নির্ভয়ে বিবাহ দিল পতিহীনা নিজ আত্মজারে!
সমাজ সজ্ঞাত পেয়ে শির তুলি' জেগে অকস্মাৎ,
পাশ ফিরে ঘুমাইল ধাবমান বিশ্বের মাঝারে।
বিদ্যার বিদ্যুতালোকে অন্ধকার করিতে নিপাত,
গেল জ্ঞান প্রচারিয়া ধনী দীন সবার আগারে!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন বাবিলনে নারীর অধিকার।

প্রাচীন জগতের মধ্যে বাবিলনে নারীকে যেরূপ উচ্চ সম্মান ও অধিকার দেওয়া হইয়াছিল সেরূপ অধিকার আজ এ নারী-আন্দোলনের যুগেও অনেক ইউরোপীয় দেশে দেওয়া হয় নাই। অধিকার কেহ দেয় না, অধিকার নিজের জোরে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হয়। বাবিলনের নারী দেশ ও সমাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা সে যুগে এত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কেবল গৃহকোণে নিবদ্ধ হয় নাই। বাবিলন খৃষ্টের জন্মিবার আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধীরে ধীরে বাণিজ্য যাত্রায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছিল। বাবিলনের নারী এই প্রচেষ্টায় তাহার শক্তি নিয়োজিত করিয়া এক দিকে দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল, অন্যদিকে পুরুষের সহিত তাহার সমান অধিকারের ন্যায্য দাবী স্থাপন করিল। দেশ যদি কেবল কৃষিকর্ম্ম ও যুদ্ধ লইয়া মাতিয়া থাকে, তাহা হইলে নারীকে বাধ্য হইয়া তাহার শক্তি গৃহকোণে ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ে নারী অনায়াসে যোগ দিতে

পারে। বাবিলনের প্রাচীন দলিলের মধ্যে ব্যবসা ক্ষেত্রে নারীর কৃতিত্বের বহুল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টের জন্মের একুশ শত বৎসর পূর্ব্বে বাবিলনে হামুরাবি নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা রাজত্ব করিতেন। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার আইন কানুন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি তাহাতে প্রথমেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রবলের হস্তে যাহাতে দুর্ব্বল নির্য্যাতিত না হয়, তাহাই তাঁহার আইন প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল যুগেই নারী পুরুষের দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে নির্য্যাতিত হইয়াছে। হামুরাবির পূর্ব্বে বাবিলনেও নারী কোন কোন বিষয়ে পুরুষের পদানত ছিল। হামুরাবি সেই সকল অত্যাচার হইতে নারীকে রক্ষা করিয়া ও দেশের প্রচলিত আইন সমূহ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আইন প্রচার করেন। এই আইন হইতে আমরা প্রাচীন বাবিলনের নারীর অধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

সকল নারীকেই যে বিবাহ করিতে হইবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা বাবিলনে ছিল না। বিবাহ না করিলে অবিবাহিতাকে কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত না। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে দেশে ধর্ম্মের সেবা করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিতেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিত; রাষ্ট্রও তাহাদিগের সকল প্রকার অধিকার রক্ষা করিত। ইউরোপে মধ্য যুগে যে সকল কুমারী ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকে একেবারে জীবনের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইত—তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের করতলগত হইত। কিন্তু প্রাচীন বাবিলনে তাহা ছিল না। সেখানে কুমারীরা পুত্রের ন্যায় পিতার সম্পত্তির সমান অংশ পাইতেন। কোনও সম্পত্তি ধর্ম্ম সম্প্রদায় দাবী করিতে পারিত না। কুমারী উহা যাহাকে ইচ্ছা করিতেন, তাহাকে দান করিতে পারিতেন। ঐ সকল কুমারীদিগকে সম্পত্তির উপর কোন প্রকার কর দিতে হইত না। কুমারী যখন ইচ্ছা করিতেন, তখনই চির দিনের জন্য ধর্ম্ম মন্দির পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্ম মন্দির ত্যাগ করিলেও তাঁহার ধর্ম্মব্রত ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

নারী জীবনে এমন এক সময় আসে যখন তাহার সমস্ত চিত্ত একজনকে অন্তরতমরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বাবিলনে নারী-চিত্তের এই নিগূঢ় রহস্যটী রাষ্ট্র সম্মান করিয়া চলিতেন। তাই যদি ধর্ম্মব্রত-গ্রহণকারিণী কোনও কুমারী ধর্ম্মমন্দির পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেন, তবে রাষ্ট্র বা সমাজ কেহ তাহাকে বাধা দিত না। বাবিলনে ধর্ম্মভাব খুবই প্রবল ছিল, কিন্তু সে ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের রসকে শুষিয়া ফেলিয়া পুষ্ট হইত না, তাই তাহার মধ্যে এত উদারতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে কুমারী একবার ব্রত ধারণ করিয়াছেন, তিনি অন্তরের প্রেমক্ষুধা মিটাইবার জন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিলেও, নিজের দেহ স্বামীর সেবায় নিয়োগ করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ দেব-সেবা-কারিণীদের দেহ দেবচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া তাহা আর কোন মানুষের উপভোগ্য হইতে পারিত না। সেই জন্যই ব্রতধারিণীদের সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিলেও, তাঁহারা যদি মদের দোকানে প্রবেশ করিতেন, তবে তাঁহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। বাবিলনে মদের দোকান বেশ্যা স্ত্রীলোকেরা রাখিত এবং সেখানে তাহারা ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিত। সেই জন্যই ব্রতধারিণীদের প্রতি ঐরূপ কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

যদি বিবাহিতা ব্রতধারিণী সন্তানের জননী হইবার জন্য লালায়িতা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বামীর জন্য একটা দাসী নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। সেই দাসীর গর্ভে সন্তান হইত। কিন্তু দাসী সন্তানের জননী হইয়াও গৃহের গৃহিণী হইতে পারিত না, সে সম্মান ব্রতধারিণীরই থাকিত।

ব্রতধারিণী যদি কোন দিনই বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলেও সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁহাকে বিবাহিতা রমণীর প্রাপ্য সম্মানই প্রদান করিত। কেহ যদি তাঁহার কুৎসা রটনা করিত তাহা হইলে তাঁহাকে

কপালে গরম লোহা দিয়া দাগ করিয়া দেওয়া হইত। ব্রতধারিণীদের এতাদৃশ সম্মান ছিল বলিয়াই অনেকে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা চিরজীবন কুমারী থাকিতেন।

বাবিলনে বিবাহিতা রমণীর সম্মান অধিকার কম ছিল না। বাবিলনে চুক্তি করিয়া রীতিমত রেজেষ্ট্রী দলিল দ্বারা বিবাহ হইত। এই জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, নারী তখনও তথায় তৈজস সামগ্রী রূপে গণিত হইত। কিন্তু নারীর যেরূপ অধিকার আমরা দেখিতে পাই তাহা হইতে এরূপ কল্পনা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীকে বিনা কারণে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন তাহা হইলে স্ত্রী পুনরায় অন্য লোককে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বামী যদি যুদ্ধে যাইতেন বা বন্দী হইতেন, তাঁহা হইলে স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিতেন না। অনুপস্থিত স্বামীর আর্থিক অবস্থা অনুসারে স্ত্রী কায করিতেন। যদি স্বামী কোন টাকা কড়ি রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিলে সে বিবাহ অসিদ্ধ হইত। কিন্তু যদি স্ত্রীর ভরণ পোষণের উপযুক্ত অর্থ স্বামী না রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলে স্ত্রী যেরূপে হউক জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেন, তাহাতে কোন দোষ হইত না। এমন কি তিনি অন্য স্বামী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। যদি স্বামী দেশে ফিরিয়া আসিতেন তখন তিনি ঐ স্ত্রী দাবী করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় স্বামীর ঔরস জাত সন্তানাদি দ্বিতীয় স্বামীই প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইতেন।

বাবিলনে ডাইভোর্স বা তালাক প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহাতেও নারীর অধিকারের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখা হইত।

মনুসংহিতায় যেরূপ আছে যে, স্ত্রী দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকিলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন, বাবিলনে সেরূপ নিয়ম ছিল না। কোন স্বামীই স্ত্রী দীর্ঘকাল শয্যাশায়িনী বলিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীর যদি সন্তান না হইত, তাহা হইলে স্বামী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রথম বিবাহে তিনি যে সমস্ত দান ও যৌতুক পাইয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিতে হইত। যদি স্ত্রী কোন দান পিত্রালয় হইতে না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও স্বামীকে তাহার জন্য কিছু অর্থ দিতে হইত। স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা না করিতেন, তাহা হইলেও স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিতেন। হামুরাবি এই নিয়ম করেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেকার একটী সুমেরিয়ান আইন হইতে জানা যায় যে, যে স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, তাঁহাকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হইবে। হামুরাবি ঐরূপ শাস্তি কেবল মাত্র দুশ্চরিত্রা ব্যভিচারিণীর জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল মাত্র চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে এরূপ শাস্তি দেওয়া হইত না। একটী বিষয়ে বাবিলনের নারী, আধুনিক ইউরোপীয় নারী অপেক্ষা কম অধিকার পাইতেন। স্বামী যেমন কারণ ঘটিলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, স্ত্রী তাহা পারিতেন না। স্ত্রীর অংশ্য বলিবার অধিকার ছিল যে "আমি আর তোমাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করি না।" কিন্তু এরূপ বলিলে তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া মারা হইত।

বাবিলনে নারী সময়ে সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যে যোগ দিলেও গৃহকর্ম্মে তাহার অবহেলা ছিল না। রাষ্ট্র হইতে এ বিষয়ে নারীর প্রতি কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। গৃহস্থালীই নারীর প্রকৃত ও মুখ্য কার্য্যক্ষেত্র, যে নারী গৃহস্থালীর কার্য্যে মন দিত না বা অযথা অপব্যয় করিত, স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেন। এইরূপ কারণ ব্যতীত অন্য যে কোন কারণেই স্ত্রীকে স্বামী ত্যাগ করুন বা না কেন, স্বামীকে স্ত্রীর দান যৌতুক প্রত্যর্পণ করিতে হইত। সন্তানাদি মায়ের নিকট থাকিত, কেন না নারীর নিকট হইতে সন্তানাদি কাড়িয়া লওয়ার ন্যায় নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই। কিন্তু স্বামীকে ঐ সন্তানদের শিক্ষা ও প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী দান ও যৌতুক ফিরাইয়া লইতেন। যত দিন বাঁচিয়া থাকিতেন ততদিন স্বামীর

গৃহেই থাকিতে পারিতেন, তবে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিতেন না। কেন না উহা তাঁহাদের সন্তানদের। যদি স্ত্রীর কোন পিতৃদত্ত ধন না থাকিত, তাহা হইলে পুত্রগণের সহিত সমান অংশে স্বামীর সম্পত্তি পাইতেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিধবা রমণীকে বাবিলনে পুত্রের বা আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইত না। স্বামীর সম্পত্তি বা নিজের অর্থের দ্বারা তিনি স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। পুত্রেরা ইচ্ছা করিলেই যে বিধবা মাতাকে তাড়াইয়া দিতে পারিত তাহা নহে। কিন্তু যদি মাতা ইচ্ছাক্রমে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি দাস পাইতেন না বটে কিন্তু যৌতুকের টাকা ফেরত পাইতেন। গৃহ ছাড়িয়া যাইয়া তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যৌতুকের টাকা তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহজাত সন্তানদের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হইত। বিধবার পুত্রেরা নাবালক থাকলে তিনি কোর্টের বিনানুমতিতে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না।

বাবিলনে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের সহিত কন্যারাও সম্পত্তির অংশীদার হইতেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে সেখানে আইনের চক্ষে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল।

হামুরাবি নারীর সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য নানারূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে যুগে ধারণা ছিল যে বিবাহের পূর্ব্বে নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ সতর্ক হইবার প্রয়োজন নাই।

বাবিলনে নারীরা স্বাধীন ভাবে মোকদ্দমা করিতে পারিতেন। প্রয়োজন হইলে রাজদ্বারে স্বামীর নামেও অভিযোগ আনয়ন করিতেন ও সে অভিযোগ গ্রাহ্য হইত। তাঁহারা মহাজনী কারবার ও দাসদাসী নিজ নামে ক্রয় করিতে পারিতেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ঘরণীদের যেন একটু আব্রু ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বাহির হইতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে এত ঝি চাকর থাকত যে বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিতে পাইতেন না।

বাবিলনে নারীরা ঘরে ঘরে চরকা কাটিতেন, তাই পরবর্ত্তী যুগে বাইবেলে পর্য্যন্ত বাবিলনের কাপড়ের অনেক প্রশংসা রহিয়াছে।

বাবিলনে যে সমস্ত দলিল-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেক স্থানেই নারীর নাম সহি রহিয়াছে ও নারী ব্যবসা করিতেছেন, মোকদ্দামা চালাইতেছেন তাহার পরিচয় আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সেই সুপ্রাচীন অতীত যুগের বাবিলনে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা না থাকিলে নারীর এতটা অধিকারে সেখানে দেখা যাইত না।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

অন্ধকার ও নক্ষত্র

ক্ষুব্ধ অন্ধকার কহে হে নক্ষত্ররাজি!
আমারে তাড়াবে বলি আসিয়াছ সাজি?
হাসিয়া নক্ষত্ররাজি করিল উত্তর,
পরস্পর মিলি মোরা হয়েছি সুন্দর।
সুখ কভু নাহি পারে দুঃখ নাশিবারে
তাই পরস্পর মিলি শোভিছে সংসারে।

শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

পদ্মা

(বড় গল্প)

৭

"বাবা, পদ্মাকে কি আর সেখানে পাঠাবেন না।" —বলিয়া মোহিত পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল। মুকুন্দলাল গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "পাঠাবার উপায় থাকলে কি পাঠাই না মোহিত?" মোহিত কহিল, "কেন? উপায় নেই কেন?" পিতা উত্তর দিলেন, "হাঁ পদ্মার কাছে সে বাড়ীর দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ। আর এটা আমার ভ্রমের ফল।" রুষ্ট কণ্ঠে মোহিত কহিল, "রুদ্ধ দ্বার কি রকম? জগতে কি সবাই পরী? কালো মেয়ে কি কেবল আমাদেরই ঘরে? জামাই প্রকশ—সে কি সাহেব নাকি? তার রঙ ত পদ্মার চেয়েও কালো।" মুকুন্দলাল কহিলেন, "নিজের খুঁত কি কেউ দেখে বাবা।" মোহিত কহিল, "কালো বলে কি বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ করবে নাকি?" মুকুন্দলাল কহিলেন, "উমানাথবাবু অতি মহাশয় লোক। তিনি আমার অতবড় অপরাধও ক্ষমা করেছেন। পদ্মাকে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাবে বোধ হল, ছেলে তাঁর বাধ্য নয়। এ বিষয়ে তাঁর হাত নেই। সেইটেই সব চেয়ে ভয়ের কথা মোহিত!" মোহিত কহিল, "প্রকাশ এখন এই খানেই আছে। এগ্‌জামিন দিয়ে বাড়ী যাবে। আপনি এই সময় পদ্মাকে পাঠিয়ে দিন। বলেন ত তাকে আমি হষ্টেলে ধরতে পারি।" মুকুন্দলাল একটু ভাবিয়া কহিলেন, "না, তাতে কোন ফল হবে না। বাপমায়ের চেয়ে কেউ আপনার নয়। তাঁরা যদি তার মত করাতে না পারেন, আমরা পারব না। আমাদের উপর সে অমনিই চটে আছে। আমি মনে করছি আবার উমানাথবাবুকে পত্র লিখি।" মোহিত কহিল, "তবে তাই লিখুন। হাঁ আপনার বুকের ব্যথাটা আজ কেমন আছে?" মুকুন্দলাল কহিলেন, "একটু ভাল বোধ হয়। এ সারবার নয়। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। হায়, মেয়েটার সর্ব্বনাশ আমিই করলুম।"

এমন সময় পদ্মা ঔষধের শিশি লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বাবা ওষুধ খেয়ে ফেলুন।" মুকুন্দলাল কহিলেন, "আর ওষুধ কেন মা? যেতে দাও আমাকে। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। তোর মায়ের অকাল মৃত্যুতে আগে ঈশ্বরের দোষ দিতুম। কিন্তু এখন কি মনে হয় জানিস মা? সে গেছে ভালই হয়েছে। এ সব যন্ত্রণা আর তাকে সইতে হল না।" মোহিত কহিল, "বাবা ওষুধ খান।" পদ্মা ঔষধ ঢালিয়া দিল। মুকুন্দলাল আর প্রতিবাদ না করিয়া তাহা পান করিলেন।

পদ্মার বিবাহের পর প্রায় আটমাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে উমানাথ বধূর কোনও তত্ত্ব লন নাই। যাহা হউক, মুকুন্দলাল অনেক অনুনয় করিয়া, কৃত অপরাধের ক্ষমা চাহিয়া পত্র লিখিলেন। উত্তরে উমানাথ লিখিলেন যে তিনি চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই কিন্তু পুত্রের মত ফিরাইতে পারেন নাই। যাহা হউক প্রকাশ শীঘ্রই বাড়ী আসিতেছে তাঁহারা যেন পদ্মাকে পাঠাইয়া দেন। তিনি আবার চেষ্টা করিবেন।

পত্র পাইয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া পদ্মাকে রাখিয়া আসাই স্থির হইল। কিন্তু বাঁকিয়া বসিল পদ্মা। গৌরী দেবী কহিলেন, "সে কিরে। তোর শ্বশুর যে পাঠিয়ে দিতে লিখেচেন।" পদ্মা কহিল, "লিখুন শ্বশুর। কিসের জন্তে তোমরা আমাকে সেখানে পাঠাচ্ছ? ছিঃ আমার কি আত্মসম্মান বলে কিছুই নেই? যে সম্বন্ধ স্বীকার করবে না তার

কাছে যেচে যাওয়া?" গৌরী কহিলেন, "ওরে এতে মেয়েমানুষের কোন লজ্জা নেই। স্বামীর চেয়ে মেয়েমানুষের কিছুই আপন নয়। সেখানে যেচে যেতে কোন অপমানই নেই। আর ধরতে গেলে দোষ ত আমাদেরই মা।"

কিন্তু পদ্মাকে যাইতে হইল। পিতা আসিয়া যখন বলিলেন "পদ্মা,অনেক সহ্য করেচ। আমার মুখ চেয়ে আর একবার কর মা।" তখন সে না বলিতে পারিল না।

মুকুন্দলালের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তিনি নিজেই কন্যাকে রাখিয়া আসিলেন। শ্বশুর উমানাথ বাবু বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ও বাতে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন। পদ্মার সেবার গুণে তিনি পীড়ার যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে বসিলেন। গৃহিণী ত বধূর সেবা যত্ন ও মধুর আচরণে তাহার বর্ণের অভাব ভুলিয়া গেলেন। মিনতি পদ্মার উপর আপন পুত্রকন্যাদের ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ক্রমে বিকাশও পদ্মার পক্ষপাতী হইল। দেবরাণী তখন স্বামীর নিকট এলাহাবাদে ছিল। পদ্মার আগমন সংবাদে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সে মাকে লিখিল—"মা, ছোট বৌদিকে এনেচ শুনে আমি বড় সুখী হয়েচি। ক'দিনের পরিচয়েই আমি ওকে চিনেচি। ও খাঁটি সোণা। ছোড়দাকে বুঝিয়ে বোল যেন ওকে কষ্ট না দেয়। মা, জগতে রূপই সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত নয়। রূপের মোহ দুদিনের। পরে ছোড়দা বুঝবেন আমার কথা সত্যি কিনা?"

পত্র পড়িয়া গৃহিণী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, "আমি ত বোঝাতে ক্রটী করিনি। করবও না। এখন অভাগীর অদৃষ্ট।"

এইরূপে প্রায় ছইমাস পদ্মা সুখে দুঃখে কাল কাটাইল। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়া প্রকাশ তাহার সুখস্বপ্ন চিরতরে ভাঙ্গিয়া দিল। প্রথমে পদ্মার আগমন সংবাদ তাহাকে কেহ দেয় নাই; পরে সুবিধা বুঝিয়া গৃহিণী একদিন কথাটা তুলিলেন। প্রতারকের কন্যাকে আনা হইয়াছে শুনিয়া বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলে যেরূপ তাহা জলিয়া উঠে, প্রকাশ ত সেইরূপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। মাতাকে কহিল তাহার কথার নড়চড় নাই। সে জীবনে কখনও পদ্মার মুখ দেখিবে না—মাতা বৃথা উহাকে আনিয়াছেন। উহাকে যেন অবিলম্বে উহার জুয়াচোর পিতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয় ইত্যাদি।

মা মাতা মিনতিপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "প্রকাশ, তোর শ্বশুর একটা ভুল করেছেন বলে' কি একটা নির্দ্দোষীকে এমন করে শাস্তি দিতে হয় হয় বাবা? আর, বৌমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এ ক'দিনেই আমাদের সকলকে আপনার করেচে। আমার কথা শোন্। বৌমাকে নিয়ে তুই অসুখী হবিনে। রূপ—ও একটা চোখের মোহ।"

প্রকাশ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "মা, কেন বারবার বিরক্ত কর? আমার এক কথা। আমি ওকে কখনও স্ত্রী বলে স্বীকার করব না। ওরকম প্রতারকের মেয়ে কখনও ভাল হতে পারে না। তোমাদের ভালবাসার জন্যে ভালমানুষ সেজে থাকে।" মা কহিলেন, "তুই কি এমন ভাবে থাকবি? আমার কি বৌ নিয়ে ঘর করতে সাধ হয় না?" পুত্র কহিল, "তার জন্যে ভাবনা কি মা? আমি এবার নিজে পছন্দ করে' তোমাকে মনের মতন বৌ এনে দেবো।"

গৃহিণী আর কিছু বলিলেন না। ইহার কয়েক দিন পরে প্রকাশ সন্ধ্যার পর কয়েকজন বন্ধুর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। মিনতি তাহার ঘরে শয্যা পতিতে আসিয়া তাহার বালিশের তলা হইতে একখানি পত্র পাইল। খামের উপর স্ত্রীলোকের হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরের লেখা দেখিয়া কৌতুহল বশতঃ সে পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া পড়িল। পত্র পড়িয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া সে শাশুড়ীর উদ্দেশে ছুটিল। গৃহিণী তখন রাত্রির রন্ধনের যোগাড় করিতেছিলেন। নিকটে বসিয়া পদ্মা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। মিনতি পত্রখানা তাঁহার হস্তে দিয়া কহিল, "মা পড়ে দেখ।" গৃহিণী কহিলেন "কার চিঠি বৌমা?"

মিনতি কহিল, "দেখনা পড়ে। আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।" বিস্মিত হইয়া গৃহিণী কহিলেন—"এ আবার কি কথা? ছোট বৌমা আবার কোটা ধর ত বাছা।" বলিয়া তিনি পত্রখানি পড়িলেন।—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

শ্রীচরণেষু

তোমার পত্র পেয়েছি। উত্তর লিখিতে দেরী হয় বলে দুঃখ করেছ। আমি কি ছাই ভাল লেখাপড়া জানি। একখানা চিঠি লিখিতেই চা'র পাঁচ খানা কাগজ নষ্ট হয়। তুমি বিয়ের সময় দিদিকে বলেছিলে আমাকে শীগ্‌গিরই তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজ আটমাস হল এখনও নিয়ে গেলে না। আমাকে যত শীগ্‌গির পার নিয়ে যাও এখানে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। প্রণাম নিও। ইতি

তোমার—তৃপ্তি।

পত্র পড়িয়া গৃহিণী বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন "একি কাণ্ড! এ ছুঁড়ী কে বৌমা?"

মিনতি একবার কর্ম্মনিরতা পদ্মার প্রতি চাহিল, তার পর কহিল, "কি জানি মা। হয়ত এই জন্যেই আমাদের কথা শোনে না।" মহামায়া একবার পদ্মার দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। তিনি কহিলেন; "তাই ত এ ছুঁড়ী কোন দুষ্ট মাগী নয় ত?" মিনতি কহিল, "না মা তা নয়। চিঠিতে ত বিয়ের কথা স্পষ্ট লেখা রয়েছে।" মহামায়া কহিলেন, "বিয়ে করেচে, অথচ আমরা কিছুই জানি না! কোনও ব্রেহ্ম খিষ্টান নয় ত?" মিনতি কহিল, "না মা, তা নয়। এর হাতের লেখা আর বানান ভুল দেখে বোধ হয় না এ দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্তও পড়েচে। ব্রাহ্ম খৃষ্টানের মেয়ে এত মূর্খ হয় না।" গৃহিণী কহিলেন, "যাই ওঁর কাছে। ওঁর ছেলের কাণ্ডটা বলে আসি।"

পত্নীর নিকট সমস্ত শুনিয়া উমানাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "আচ্ছা, ঢাকায় ওর বন্ধু ভূপতি থাকে না, যার শালীর সঙ্গে প্রকাশের বিয়ে দিতে চেয়েছিল? কিন্তু ওর মা ক্ষয় রোগে মারা যায় বলে, আমি তখন মত করিনি।"

মহামায়া এতক্ষণ পরে অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইলেন। কহিলেন, "তাই ত একথা ত আমার মনেই ছিল না। এখন বুঝেছি, এখান থেকে গিয়ে রাগের মাথায় সেই মেয়ে বিয়ে করেচে। বোন ভগ্নীপোতের ত সে একটা বোঝা বই আর কিছুই ছিল না। কাযেই সতীনে দিতেও আপত্তি তারা করে নি।"

উমানাথ কহিলেন, "হাঁ তাই। কিন্তু প্রকাশ আমাকে না জানিয়ে বিয়ে করেচে!"

গৃহিণী কহিলেন, "সে খামখেয়ালী। আর এতে ত তোমাদেরই দোষ।"

উমানাথ কহিলেন, "না তাকে দোষ দিচ্চি নে। কিন্তু এখন করি কি? বিয়ে করেচে, সেও বৌ তাকেও আনতে হবে। যাক তবে, এ বউই আবার বাপের বাড়ী ফিরে যাক্। কি বল?"

পদ্মাকে হারাইবার প্রস্তাবে ব্যথিত হইয়া মহামায়া কহিলেন, "কেন পদ্মা যাবে? সে আমার কাছে যেমন আছে তেমনই থাক।"

কর্ত্তা কহিলেন, "দেখ প্রকাশকে বুঝিয়ে তার কি মত।"

রাত্রে প্রকাশ আহারে বসিলে গৃহিণী কহিলেন, "প্রকাশ তুমি আবার বিয়ে করেছ তা আমি জানতে পেরেচি। উনিও জানতে পেরেচেন।"

প্রকাশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কে বলেচে?" তার পরই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে তৃপ্তির পত্রখানা গত রাত্রিতে সে বিছানাতে রাখিয়াছিল, বোধ হয় কেহ তাহা দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু সে তাহাতে দমিল না। সে কহিল, "শুনেচ ভালই হয়েছে। বোধ হয় বৌদি আমার চিঠি চুরি করে পড়েছে। মেয়ে

মানুষের ঐ বড় দোষ। তাদের যদি একটুও নীতি জ্ঞান আছে!"

গৃহিণী কহিলেন, "বিয়েই যখন করেচ, তখন আর বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছ কেন? নিয়ে এস তাকে।"

প্রকাশ কহিল, "ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ও থাকতে আমি তাকে এ বাড়ীতে আনবো না।"

মহামায়া কহিলেন, "সেটাই কি উচিত প্রকাশ? একেও ত দেবতা সাক্ষী করে বিয়ে করেচ। তা ছাড়া, ওর কি দোষ? ও আমার কাছে থাক। তুমি যাকে পছন্দ করে বিয়ে করেচ তাকে নিয়ে এস। দুজনেই থাক, এতে দোষ কি? আগে ত এমন ঘরে ঘরে হত; এখন হয় না তাই।"

প্রকাশ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "না মা তা হয় না। এ থাকতে তাকে আমি আনতে পারব না। তবে তোমরা যদি একে ছাড়তে না চাও, বেশ, আমি জোর করব না। কোথাও একটা কায পেলেই চলে যাব। আমাকে তুমি পাবে না, এটা ঠিক জেন।" বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

গৃহিণী হতাশ হইয়া পার্শ্বের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পদ্মা নীরবে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই পদ্মা কহিল, "মা আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমার কথা নিয়ে আর কারো কাছে কিছু বলবেন না। আর, আমাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন।"

পদ্মার মুখে এত কথা শুনিয়া গৃহিণী একটু আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ সে বড় ধীর, বড় শান্ত। কখনও তাঁহার সহিত এ ভাবে কথা কহে নাই। তিনি বুঝিলেন সে বড় মনঃকষ্ট পাইয়াই এত কথা বলিয়াছে। দুঃখিত হইয়া মহামায়া কহিলেন, "কেন তুমি যাবে? তুমি আমার কাছে থাক। ওর যাকে খুসী তাকে আনুক না কেন?"

পদ্মা কহিল, "না মা, তাতে বাড়ীতে অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমার জন্যে বাড়ীশুদ্ধ লোক কেন অশান্তি ভোগ করবে? আপনারা আমাকে এনেছেন, পায়ে স্থান দিয়েছেন, এতেই আমি সুখী। আমায় এবার পাঠিয়ে দিন।"

মহামায়া কহিলেন, "আচ্ছা, তবে দেখি কি হয়। এখন শুতে চল, রাত্রি হয়েচে।"

পদ্মা চলিয়া গেল। সারা রাত্রির মধ্যে গৃহিণী একবারও ঘুমাইতে পারিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন যে প্রকাশের মত বদলাইবার কোনও ভরসা নাই। তিনি যদি পদ্মাকে রাখেন, তাহা হইলে সে গৃহত্যাগ করিবে। মা হইয়া কোন প্রাণে পুত্র ত্যাগ করিবেন? পদ্মাকে ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নাই। আহা, অভাগী এত চেষ্টা করিয়াও তোর অদৃষ্ট ফিরাইতে পারিলাম না! আর পদ্মা, সেও জাগিয়া রাত্রি কাটাইল। সে ভাবিতেছিল—না, এবার সে শক্ত হইবে। আর অপমান সহ্য করিবে না।

৮

মুকুন্দলালের শরীর অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিল। ক্রমে তিনি শয্যা লইলেন। ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা একপ্রকার ত্যাগ করিলেন। এই সময় উমানাথের পত্রে প্রকাশের বিবাহ সংবাদ তিনি জানিতে পারিলেন। কিন্তু অধিক কাতরভাব প্রকাশ করিলেন না। যেন ইহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতই ছিলেন। গৌরী যখন কাঁদিয়া বলিলেন, "দাদা, মেয়েটা যে চিরকালের জন্যে গেল।" তখন তিনি ভগিনীকে বাধা দিয়া কহিলেন, "চুপ কর গৌরী। এর জন্যে দুঃখ কেন? এ ত জানা কথা।" তিনি মোহিতকে পাঠাইলেন পদ্মাকে লইয়া আসিবার জন্য। আর বলিয়া দিলেন যে, সে যেন আর এবিষয় লইয়া কাহারও সহিত বিবাদ না করে।

সন্ধ্যার পর পদ্মা চলিয়া যাইবে। মধ্যাহ্নে সে তাহার ঘরে বসিয়া বাক্স গুছাইতেছিল, এমন সময় প্রকাশ কি একটা কাযে জননীর নিকট নিকট যাইতেছিল। পদ্মা যে ঘরে থাকিত সেই ঘর

অতিক্রম করিলে, তবে মহামায়ার ঘরে যাওয়া যায়। মায়ের ঘরে যাইতে গিয়া পদ্মার ঘরের খোলা জানালা দিয়া প্রকাশ যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে চমকাইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল ঘরের মেঝের উপর বসিয়া একটী তরুণী নতনেত্রে একটী বাক্স গুছাইতেছে। তাহার সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। মস্তকের বসন খুলিয়া গিয়াছিল। প্রকাশ অনুমানে বুঝিল সে পদ্মা। সে পূর্ব্বে কখনও পদ্মাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। আজ সে দেখিল, পদ্মাকে সে যত কুশ্রী ভাবিয়াছিল সে তত কুশ্রী নহে। তাহার দীর্ঘ সুগঠিত দেহে লাবণ্যের অভাব নাই। তাহার বর্ণ সুগৌর না হইলেও কালো নহে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহার বিশাল কৃষ্ণ নয়ন দুইটী। প্রকাশ দেখিল, জীবনে সে অনেক সুন্দরী দেখিয়াছে, কিন্তু পদ্মার ন্যায় সুন্দর চক্ষু কাহারও দেখে নাই। পদ্মার মুখ নিখুঁত সুন্দর। সে দেখিল, উজ্জ্বল বর্ণের অভাব ছাড়া পদ্মার আর কিছুরই অভাব নাই। তাহার উপর পদ্মার মুখে এমন একটা শান্ত কোমল ভাব ছিল যাহার দ্বারা দর্শকের চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

কয়েক মুহূর্ত্ত প্রকাশ পদ্মাকে দেখিল। তাহার পর একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরপদে সেস্থান ত্যাগ করিল। আজ তাহার মনে হইল, যদি সে রাগের বশে তাড়াতাড়ি আবার বিবাহ করিয়া না বসিত, তাহা হইলে হয়ত ইহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিত! তৃপ্তি কোথায় তুমি? দেখিয়া যাও, তোমার সুখের পথে কণ্টক বৃক্ষের বীজ রোপিত হইল!

উমানাথের চরণে প্রণাম করিয়া পদ্মা বিদায় চাহিল। বৃদ্ধ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন, "তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করব, আশীর্ব্বাদ করি সকল অবস্থা সহ্য করবার শক্তি ঈশ্বর যেন তোমাকে দেন।" মহামায়া পদ্মাকে বক্ষে জড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইলেন। প্রকাশ অন্তরালে থাকিয়া এদৃশ্য দেখিল। সে ভাবিল পদ্মা তাহার পিতামাতার বক্ষ জুড়িয়া আছে। তৃপ্তি কি সে স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে?

পদ্মা চলিয়া যাইবার চারিদিন পরে তৃপ্তি আসিল। মহামায়া আগ্রহ করিয়া নিজেই উদ্যোগ করিয়া প্রকাশকে বধূ আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। তৃপ্তিকে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যে হাঁ, সুন্দরী বটে, প্রকাশের সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে। কিন্তু বৃদ্ধ উমানাথ বধূ দেখিয়া প্রকাশ যে ইহাকে লইয়া সুখী হইবে তাহা ভাবিতে পারিলেন না। অনিন্দ্য রূপসী তৃপ্তির মুখে ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণতার যে ভাব ছিল, তাহা এই বৃদ্ধের চক্ষু এড়াইল না। তিনি পদ্মার মুখের সহিত ইহার মুখের তুলনা করিয়া ভাবিলেন মুকুন্দলালের কন্যা ইহার তুলনায় সহস্র গুণে সুন্দরী। প্রকাশ এ কি করিল! শুভ্রবর্ণের মোহে ভুলিয়া এ কি বধূ আনিল! যাহা হউক, তিনি বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তৃপ্তি আসিয়াই মিনতির নিকট পদ্মার কথা খুঁটাইয়া খুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার প্রতি দুই একটী শ্লেষবাক্যও বর্ষণ করিতে ছাড়িল না। একে পদ্মার জন্য মিনতির মন ভাল ছিল না, তাহার উপর তাহার প্রতি এইরূপ বিদ্রূপবাক্য তাহার সহ্য হইল না। সে বেশ একটু রাগত ভাবে কহিল, "পদ্মা কেমন, তা নিয়ে তোমার আলোচনা করে কি হবে ছোট বৌ? সে কখনও আসবে না। তবে এইটুকু জেনে রাখ, অপরে তাকে যাই ভাবুক আমি জানি পদ্মা রমণীরত্ন।" বলিয়া সে আর সে স্থানে দাঁড়াইল না। তৃপ্তি মুখ ভার করিয়া রহিল।

একদিন গৃহিণী মিনতিকে কহিলেন, "বৌমা, আমার বিছানাটা পেতে রাখ। আহা, পদ্মাই এসব করত। বাছা আমার কি করে যে আমাদের সেবা করবে তা ভেবে পেতনা।"

কথাটা তৃপ্তি শুনিল। সে ভাবিল সে কোনও কায কর্ম্ম করে না বলিয়া বুঝি শাশুরী তাহাকে খোঁটা

দিলেন। সে রাগিয়া কহিল, "তা বল্লেই আমি করি। পদ্মার নাম করে' অত খোঁটা দেওয়া কেন?"

মন্নামাতার বংস হইয়াছিল। বধূ লইয়া অনেক কাল ঘর করিতেছিলেন। কিন্তু এমনি মুখের উপর উত্তর করিতে কেহ সাহস করে নাই। অতটুকু মেয়ের মুখে উত্তর তাঁহার সহ্য হইল না। তাহা ছাড়া তিনি তৃপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলেনও নাই। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "তোমাকে কে কি বলেছে ছোট বৌমা? আমি ত তোমাকে কিছু বলিনি, শুধু শুধু চোপা কর কেন?"

তৃপ্তি কহিল, "বলেননি ত পদ্মা পদ্মা করেন কেন? পদ্মার নাম আমি সইতে পারি না।"

গৃহিণী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "এ কথা প্রকাশকে বল্‌তে পার বৌমা, যে তোমাকে এনেচে। পদ্মা আমার মেয়ে। তাকে আমি ত তোমার কথায় ভুলতে পারি না। ছেলেমানুষ তুমি, অত হিংসা কেন?"

আর কোথায় যাইবে। তৃপ্তি কাঁদিয়া ভাসাইল। সে রাত্রিতে আহার করিল না। প্রকাশের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে ছাড়িল না। সে রাত্রিতে প্রকাশও ঘুমাইতে পারিল না। প্রকাশ ভাবিল, তৃপ্তিকে একটু লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। পরদিন সে জননীকে কহিল, "মা তৃপ্তিকে একটু লেখাপড়া শেখাতে হবে। দেবুকে পড়াতেন মিস হার্লি তাঁকে ডাকলে হয় না মা?"

বধূর পূর্ব্ব দিনের ব্যবহারের জন্ম বধূর প্রতি মার মন তেমন প্রসন্ন ছিল না। তিনি মুখ ভার করিয়া কহিলেন, "যা তোমার ইচ্ছা হয় কর বাবা। আমি ও বৌয়ের কোন কথাতেই নেই।"

প্রকাশ বুঝিল, তৃপ্তির আচরণে মা অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছেন। সে কহিল, "নেই বল্লে ত চলবে না মা। তোমার সংসার তোমাকে ত দেখতেই হবে।"

মা কহিলেন, "তোমরা যখন ছোট ছিলে তখন সে কথা খাটত বাবা। এখন তোমরা বড় হয়েছ, তোমাদের স্বাধীন মত হয়েছে। এখন নিজে যা ভাল বোঝ কর।"

প্রকাশ আর কিছু বলিল না। সে একদিন মিনতির নিকট আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। মিনতি কহিল "বেশ ত, শেখাও লেখাপড়া। তবে ও শিখতে চাইবে কি না সন্দেহ।"

যাহা হউক প্রকাশ স্থির করিল, তৃপ্তির শিক্ষার জন্ম সে একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবে। কিন্তু মুস্কিল হইল তৃপ্তিকে লইয়া। সে কিছুতেই খৃষ্টান শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়িতে রাজী হইল না। অগত্যা প্রকাশ তাহার শিক্ষার ভার স্বহস্তে লইল। কিন্তু তাহাও সহজ হইল না। পড়িতে বসিলেই তাহার ঘুম পাইত। মেয়েমানুষের আবার লেখাপড়া শেখা কি! মেয়েমানুষ কি চাকরী করিতে যাইবে নাকি? এইরূপ মন্তব্য তাহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত। প্রকাশ দেখিল, তৃপ্তিকে লেখাপড়া শেখান অসম্ভব। সে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। ইহাতেও সে তত দুঃখিত হইল না। কিন্তু তৃপ্তি যখন কথায় কথায় পদ্মার নাম তুলিয়া তাহাকে কথা শুনাইত ও তাহার পত্রাদি আসিলে খুলিয়া ফেলিত। তখন প্রকাশ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইল। কিন্তু তখন আর ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিল কোথায়?

৯

"বাবা—বাবা—কোথায় যাচ্ছ? একবার কথা কও বাবা।"

মুমূর্ষু পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পদ্মা ডাকিল। প্রাণাধিকা কন্তার কাতর আহ্বানে মৃত্যু মোহাচ্ছন্ন মুকুন্দলালেরও বুঝি ক্ষণকালের জন্ম মোহ ভাঙ্গিল। ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "মোহিত!" মোহিত নিকটেই ছিল। "বাবা" বলিয়া সে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অতি কষ্টে প্রাণপণে শেষ নিঃশ্বাস টানিতে টানিতে মুকুন্দলাল কহিলেন, "মোহিত, পদ্মা বড় দুঃখী।"

পিতা কি বলিতে চাহেন বুঝিয়া মোহিত কহিল,

"পদ্মার জন্তে আপনি কিছু ভাববেন না বাবা। আমি থাকতে ওর কোন কষ্ট হতে দেব না।"

মুকুন্দলাল যেন একটু শান্তি পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "গৌরী, দিদি! মা মরা মেয়ে বাঁচিয়েছিলে, এখন পিতৃহারাকেও দেখো।"

"দাদা এ কি ভার দিচ্ছ, আমায়? না না, আমি এ ভার নিতে পারব না। তোমরা সবাই চলে যাবে, আর আমি যত বাপ-মা খেকোদের আগলাব? না না, আমি তা পারব না।" বলিয়া গৌরী কাঁদিয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাঁহার কথা ভ্রাতার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি ততক্ষণ চিরশান্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। মোহিত চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৌরী সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। আর পদ্ম নিশ্চল প্রতিমার মত পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিল।

প্রকাশের বিবাহের পর পদ্মা যখন আবার পিতৃগৃহে ফিরিল, তাহার পর হইতেই মুকুন্দলালের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্রমে তিনি উত্থানশক্তি রহিত হইলেন। প্রায় এক বৎসর রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোকের দেনাপাওনা মিটাইয়া পরলোকগত পত্নীর অনুসন্ধানে চলিলেন। মুকুন্দলালের মৃতদেহ যখন পদ্মার নিকট হইতে এক প্রকার জোর করিয়া ছিনাইয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল, তখন পদ্মা প্রায় জ্ঞানহারা। তাহার জ্ঞান ফিরিল তিন দিন পরে। জ্ঞান হইলে পদ্মা দেখিল, গৌরী দেবী তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন। প্রথমে সে কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না। তবে সে কি যেন হারাইয়াছে যাহার জন্ত তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া হাহাকার বাহির হইতেছিল। ঠিক এই সময় মোহিত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "পিসিমা, পদ্মা কেমন আছে?"

ভ্রাতার সেই শুষ্কাস পরিহিত বিষাদমূর্ত্তি দেখিয়াই তাহার স্মরণ হইল যে সে তাহার জগতের আশ্রয়তরু হারাইয়াছে। বুকভরা হাহাকারে কাঁদিয়া পদ্মা কহিল,—"পিসিমা আমার বাবা?"

গৌরী কাঁদিয়া কহিলেন "পদ্মা তোর বাবা এজগতে আর নেই।" মোহিত নীরবে ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

যথাসময়ে মুকুন্দলালের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শ্রাদ্ধে আড়ম্বরাদি কিছুই হইল না। মুকুন্দলাল কিছুই রাখিয়া যান নাই। রাখিয়া গিয়াছিলেন কেবল দুই হাজার টাকা দেনা। মোহিত যথা নিয়মে পিতার শ্রাদ্ধ করিল। উমানাথবাবুকেও নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু মুকুন্দলালের মৃত্যুসংবাদ উমানাথ পাইলেন না। মুকুন্দলালের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে এক সপ্তাহের মধ্যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। বিকাশের পত্রে মোহিত ইহা জানিতে পারিল।

শ্রাদ্ধের সময় মুকুন্দলালের কন্যারা নীতা ছাড়া সকলেই আসিল। নীতা আসিতে পারিল না, কারণ তাহার স্বামী ছুটী পাইল না। মোহিতের শ্বশুরগৃহ হইতেও কুটুম্ব কুটুম্বিনী আসিলেন। শ্রাদ্ধান্তে সকলেই বিদায় লইলেন। গেলেন না কেবল রণকালী। মোহিতের স্ত্রী অম্বাকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন। শৈশবে অম্বা মাতৃহীনা হইলে তাহার বিধবা মাসীমা রণকালী ভগিনীপতির গৃহে আসিয়া অম্বার পালনভার লইলেন। রণকালী সন্তানহীনা সুতরাং অম্বাকে তিনি সন্তানের স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বার দাদা হরিদাস ছিলেন রণকালীর উপর খড়্গহস্ত। দুষ্টলোকে অম্বার পিতা ও রণকালীর নাম একত্র করিয়া অনেক কথা রটাইত। কিন্তু রণকালী সে সব গ্রাহ্য করিতেন না। কয়েক বৎসর হইল অম্বার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। রণকালী বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। কারণ হরিদাস পিতা বর্ত্তমানেই রণকালীর সহিত ভাল ব্যবহার করিত না। অম্বাকে মানুষ করিয়াছিলেন তাই বোধ হয় অম্বার প্রতি অতিশয় মায়াবশতঃ হীনতা স্বীকার করিয়াও জামাতার অন্নধ্বংস করিবার চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিয়া লইলেন। ক্রমে গৌরী ও পদ্মা বুঝিলেন যে মাসীমা লোকটী বড় সহজ নহেন। মোহিত যে না বুঝিল

তাহা নহে। কিন্তু সে অতিশয় দুর্ব্বল প্রকৃতির। কোনও বিষয় জোর করিয়া না বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

রাঁধিবার জন্য পাচক রাখিয়া টাকা খরচ করিবার কি আবশ্যক? তাহারা এত লোক রহিয়াছে। দুমুঠা রাঁধিবার জন্য টাকা দিয়া লোক রাখিতে হইবে? বলিয়া তিনি পাচককে বিদায় করিলেন। কিন্তু সেদিন রাঁধিয়াই মাথার যন্ত্রণায় শয্যা লইলেন। সুখী মানুষ তিনি, হাঁড়ী ঠেলা তাঁহার সহিবে কেন? অম্বা কহিল, "মা তুমি যদি রান্না ঘরে দোরেও যাও তা হলে আমার দিব্যি রইল।"

মেয়ের মাথা খাইয়া ত তিনি রাঁধিতে পারেন না! গৌরী রন্ধনের ভার লইলেন। গৌরী বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। তাহার উপর জীবনের সন্ধ্যায় আজীবনের সঙ্গী ভাইকে হারাইয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি নীরবে কার্য্য করিয়া যাইতেন। কোনও কথায় বড় কাণ দিতেন না। পদ্মা পিসীমাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে যাইত। মোহিত পিসীমার কষ্ট বুঝিতে পারিল। সে একদিন কহিল, "পিসীমা তুমি এ বয়সে দুবেলা হাঁড়ি ঠেল কেন? আর কি কেউ নেই?"

গৌরী কহিল, "তোমাদের দুটো রেঁধে দেওয়া এ আর কষ্ট কিসের? আর পদ্মা, সে ত এ সব কায কখনও করেনি। তবু আমার সঙ্গে দুবেলা ঝগড়া করে রাঁধবার জন্যে। আমি বলি আমি যে কদিন আছি তোকে এসব করতে হবে না; তার পর যা আছে কপালে হবে।"

মোহিত কহিল, "পদ্মা কেন? যাঁরা বচন ঝেড়ে লোক তাড়ালেন, তাঁরা কেউ বুঝি ওদিকে ঘেঁসেন না। আচ্ছা পিসীমা, বলতে পার উনি কবে যাবেন?"

গৌরী কহিলেন, "ছিঃ বাবা, অমন কথা বলো না। বৌমাকে উনি মানুষ করেছেন। মনে কর উনি যদি বৌমার মা হতেন।"

মোহিত বিরক্তভাবে কহিল, "কিন্তু পিসীমা আমি যে ওঁর সুবির খরচ আর যোগাতে পাচ্ছি না। বাবা নেই, সংসারের আয় কমে গেছে। দেনা রয়েছে; আর মাসের মধ্যে পনের দিনই ত ওঁর অমাবস্যা আর পূর্ণিমা লেগেই আছে।"

গৌরী কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সত্যই রণকালী ঠাকুরাণীর ব্রতের দাপটে মোহিত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। মাসের মধ্যে ১৫ দিন তাঁহার কোন না কোনও ব্রত থাকত। আর তাহার খরচ যোগাইতে হইত মোহিতকে। পিসীমার নিকট কোনও সাহায্য না পাইয়া মোহিত একদিন অম্বাকে কথাটা বলিয়া ফেলিল। কিন্তু বলিয়াই তাহার মনে বিষম অনুতাপ হইল। কারণ মায়ের মতন মাসীমাকে, মোহিত বোঝা ভাবিতেছে শুনিয়া অম্বা এমন প্রবল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিল যে মোহিত শপথ করিল, আর মাসীমার বিষয়ে আর কখনও কথা কহিবে না।

১০

সেদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই রণকালী দুর্গা নাম জপিতে জপিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গৌরী স্নান করিয়া আলনাতে কাপড় শুকাইতে দিতেছেন। রণকালী কহিলেন, "বেন্, কাল একাদশী গেছল, আজ আর ভাতে পিরবিত্তি নেই। খানকতক লুচিই ভেজে দিও। বেশ করে ময়ান দিও বুঝলে—যেন বেশ মচমচে হয়। আর কালকের সেই যে পটল-ক'টা আছে তাই ভেজে দাও।"

গৌরী উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বদিন একাদশীর উপবাসে তাঁহার শরীর অবসন্ন ছিল। রণকালীর ফরমাস তাঁহার ভাল লাগিল না। কিন্তু উত্তর দিলে কথা বাড়িয়া যাইবে তাই উত্তর দিলেন না। রান্নাঘরে পদ্মা চা প্রস্তুত করিতেছিল, গৌরী আসিয়া কহিলেন, "ফরমাসটা শুনলি পদ্মা?"

পদ্মা কহিল, "শুনেছি। তুমি আগে মুখে একটু জল দাও পিসীমা। দাদাকে আমি চা দিচ্ছি। আর পটোল ত ভাজা হবে না। খোকার কাল পেট ভাল ছিলনা। ওকে একটু ঝোল করে দিতে হবে। তাই

খেয়ে ও স্কুলে যাবে। আমি ত ঝোলের জন্তে কুটোচ্ছ।"

—বলিয়া সে আপন কর্ম্মে মন দিল। গৌরীর জলযোগের সব ঠিক করিয়া রান্নাঘরেই এক কোণে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। গৌরী জলযোগ করিলেন। পদ্মা ভাত চাপাইয়াছিল। গৌরী জল খাইয়া ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া মাছ ভাজিতে বসিলেন।

পদ্মা কহিল, "মাছ ভেজে ঝোলটা চাপিয়ে দিও পিসীমা, খোকা ঝোল দিয়ে ভাত খাবে।"

এমন সময় মোহিত আসিয়া কহিল "চা হয়েছে রে?" পদ্মা কহিল, "হাঁ হয়েচে চল নিয়ে যাচ্ছি।"

"দরকার কি নিয়ে যাবার। এই খানেই দে" —বলিয়া মোহিত ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা পিঁড়ি টানিয়া বসিয়া পড়িল। চা খাইতে খাইতে মোহিত কহিল, "পিসীমা জল খেয়েছ?"

গৌরী কহিলেন, "খেয়েছি।"

মোহিত কহিল "কি রাঁধচ পিসীমা?"

গৌরী কহিলেন "এই মাছ কখানা ভেজে ঝোল চাপাব খোকার জন্তে। তারপর ডাল চাপাব। আর লাউটা চিংড়ি দিয়ে করব, আর এই ডাঁটাকটা দিয়ে চচ্চড়ী"—মোহিত বাধা দিয়া কহিল "আমাকেও ঝোল দিয়ে ভাত দিও পিসীমা। আমার শরীরটাও ভাল নেই।"

গৌরী কহিলেন, "বেশ ত তুমি ও ঝোল খেও।"

পদ্মা কহিল, "দাদা, প্রায়ই তোমার শরীর খারাপ থাকে। অথচ তুমি ডাক্তারও দেখাও না, ওষুধও খাও না। তোমার মতলব খানা কি?"

"পাগল। ওষুধ খাবার মত কি হয়েছে।" বলিয়া মোহিত হাসিয়া চলিয়া গেল।

গৌরী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "ওর রোগের ওষুধ নেই। সংসারের ভাবনা ভেবে ওর শরীরে আর কিছু নেই।"

স্নান করিয়া পূজা করিয়া রণকালী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বেনু, লুচি ক'খানা ভাজা হয়েচে কি?"

পদ্মা কহিল, "না মাসীমা এখনও হয় নি। বৌদির ঘরে আপনার খাবার রেখে এসেছি। খান গিয়ে।"

রণকালী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "হয়নি কেন? কাল থেকে পেটে অন্ন নেই। হায়! আমারও যেমন কপাল। নইলে জামাইর বাড়ীতে আবার থাকে কেউ। কি করি অমু ছেলেমানুষ। ঘরে কেউ নেই যে যত্ন করে। যারা আছেন তাঁরা ত নিজের নিয়েই ব্যস্ত। কি করি, মা মরা মেয়েমানুষ করেচি, মায়া কাটাতে পারি নে তাই আমার এই দশা।" রণকালীর এত কথা পদ্মার সহ্য হইল না। সে কহিল "কেন আপনি অত বলচেন? দাদার আফিসের ভাত না হলে কি করে আপনার খাবার হবে? আগে হেঁসেল পরিষ্কার হবে তবে ত নিরামিষ রান্না।"

রণকালী পদ্মার উত্তর শুনিয়া দেশলাইতে অগ্নি সংযোগ করিলে যেরূপ জ্বলিয়া উঠে সেইরূপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা তো বুঝলাম। কে বলেছে যে তোমার দাইকে না খাইয়ে আমার খাবার করে দাও। তবে কাল গেছে একাদশী, তাই না তোমাদের পায়ে তেল দিয়েছিলাম।"

পদ্মা কহিল "একাদশী কি কেবল আপনারই ছিল? পিসীমার বুঝি ছিল না?"

রণকালী চিৎকার করিয়া কহিলেন, "কি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! বড় দরদ যে পিসীমার উপর! নিজে করতে পার না? কেবল ত গতর নিয়ে বসে আছ। যেমন স্বভাব তেমনই কপাল। নইলে সোয়ামী নেয় না!"

গৌরী এতক্ষণ কথা কহেন নাই। কিন্তু তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "ওর কপালের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না বেন্। ওর ভাবনা ভাববার অন্ত লোক আছে।"

রণকালী কহিলেন, "তুমিই ত আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেলে। সোমত্ত মাগী, কেবল গতর নিয়ে বসে থাকবে।"

মাসীমার চীৎকারে অম্বা সেংস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রণকালী কাঁদিয়া কহিলেন, "অমু, অ ভই আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দে মা। আমার কি বাড়ীতে ভাত নেই যে এত অপমান সয়ে জামাইয়ের ভাত খাব?"

অম্বা কহিল, "কার সাধ্য তোমাকে অপমান করে মা! কি হয়েছে?"

রণকালী কহিলেন, "বেনের কাল একাদশী ছিল। তাই বলছিলুম, পদ্ম তুমি ত মা পারতে দুখানা লুচি ভেজে দিতে! তাতেই বেনের রাগ কত।"

অম্বা কহিল, "তা পিসিমা তুমি রাগ কচ্চ কেন? মা ত কিছু অন্যায় বলেন নি। তুমি কেন এত খেটে মর? ঠাকুরঝিকে কি কেবল গতর নিয়ে বসে থাকবে।"

রণকালী অম্বার কথায় সায় দিয়া কহিলেন, "তা নই কি বেন! আমিও ত তাই বলছিলাম; কায করতে দাও। বসে থাকলে মনে যত কুচিন্তের উদয় হবে। সোমত্ত মেয়ে, কপাল মন্দ। সর্ব্বদাই নজর রাখতে হয়।"

গৌরী অম্বার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কেন করতে দিইনে এত কায তা তুমি কি বুঝবে বৌমা? ছ' দিনের মা মরা মেয়ে মানুষ করে, সেই মেয়ের কষ্ট যে কেমন করে বাজে তা সেই ঝোঝে।" তারপর রণকালীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "পদ্মার জন্যে তুমি কিছু ভেবনা বোন। ওর বাপ ওকে এমন শিক্ষা দেয়নি যে ওর মনে কুচিন্তে আসতে পারে। তাছাড়া সতী সাধ্বীর মায়ের মেয়ে। আমার হাতে মানুষ। জীবনে পাপ কাকে বলে জানেও না।"

রণকালী গৌরীর এই কথায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন গৌরী বুঝি তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই কথাগুলি বলিলেন। তিনি ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "আমি কি তাই বলচি নাকি যে তুমি আমাকে যা তা বলচ? অমু তুই যদি আজ আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে না দিস ত আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব।"

বলিয়া রণকালী কাঁদিয়া উঠিলেন। অম্বা তাঁহাকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। মোহিত অফিসে যাইবার জন্য কাপড় পরিতেছিল। অম্বা আসিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "শুনচ, মা এখানে আর থাক-বেন না। বাড়ী যাবেন।"

মোহিত রণকালীর সহিত পদ্মার ও গৌরীর বিবাদের কথা শুনিয়াছিল। সে নিশ্চিন্তভাবে কহিল, বেশ ত, কবে যাবেন?"

অম্বা আশা করিয়াছিল যে মোহিত তাহাকে রণকালীর যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু মোহিত তাহা না করাতে সে বড় দমিয়া গেল। কহিল, "আজই যাবেন। কি করে আর থাকেন বল। তোমার পিসী আর বোন যে করে ওঁর পিছনে লেগেছেন!"

মোহিত কোনও উত্তর দিল না। নীরবে জামার বোতাম আঁটিতে লাগিল। অম্বা উত্তর না পাইয়া কাঁদিয়া কহিল, "মা ছিল না, তা মাসীমার যত্নে কখনও জানতে পারিনি। তা আমার এমন কপাল যে মাসীমাকে দুদিন কাছে রাখতেও পারলাম না! নেহাৎ আমার মায়াতেই না এত অপমান সহ্য করে' এখানে ছিলেন! নইলে দাদা কি আর এক মুঠো খেতে দিতে পারেন না? মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। উনি কিছুতেই আর থাকবেন না, আজই যাবেন।"

ছাতা লইয়া বাহির হইতে হইতে মোহিত কহিল, "ওঁকে প্রস্তুত থাকতে বল। অফিস থেকে এসে বিকেলে রেখে আসব।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বৈকালে অফিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া মোহিত কহিল, "পিসিমা, উনি প্রস্তুত আছেন ত? গাড়ী আনবো?"

গৌরী কহিলেন, "কি জানি বাবা! আমি ওঁর কোন কথায় নেই।"

পদ্মা সেইখানে বসিয়া ছেলের জন্য কাঁথা সেলাই করিতেছিল। গৌরীর কথা শুনিয়া কহিল, "ভাদ্র-মাসে লোকে বাড়ীর কুকুর বেড়ালটাকে বিদায় করে না। আর আমি মাকে যেতে দেব?"

সে দিন রাত্রিতে গৌরী ডাকিলেন—"পদ্মা জেগে আছিস?"

পদ্ম জাগিয়া ছিল। উত্তর দিল, "আছি।"

গৌরী কহিলেন, "দেখ পদ্ম, তুই যদি রাগ না করিস ত একটা কথা বলি।"

পদ্মা কহিল, "কি কথা?"

গৌরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দেখ পদ্মা আমার দিন ত ফুরিয়ে এসেছে। আমি বেশ বুঝচি আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। কিন্তু তোর কি হবে? তুই এক কায কর, শ্বশুর বাড়ীতে যা। হাজার হোক সে তোর স্বামীর ঘর। তোর জোর আছে।"

পদ্মা কহিল, "না, তা হয় না পিসীমা! যে সম্পর্ক স্বীকার কল্লে না, কোন দাবীতে তার বাড়ী যাব? আমার কপালে যাই থাক, আমি এখানেই থাকব।"

গৌরী কহিলেন, "কিন্তু প্রকাশ ত ওখানে থাকে না। সে ত তার বৌ নিয়ে থাকে পাটনাতে।"

পদ্মা কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি পিসীমা। তুমি আমার কাছে তার নাম কোর না। শ্বশুর শ্বাশুড়ী যাঁরা ভালবাসতেন তাঁরা নেই। যে বিনা অপরাধে এতবড় অপমানের বোঝা আমার মাথায় তুলে দিয়েছে, মরে' গেলেও তার কাছে ভিক্ষে চাইতে পারব না।"

গৌরী আর কিছু বলিলেন না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

গৌরী ঠিক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারের গোণা দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ভ্রাতার মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পরে, চারি দিনের জ্বরে গৌরী সংসারের দেনা পাওনা মিটাইয়া দিয়া পরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারনলিনী দত্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র

জীবনীগ্রন্থ। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত। কলিকাতা "বুধোদয়" প্রেসে মুদ্রিত ও ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "বরেন্দ্র লাইব্রেরী" হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২৫৯ পৃষ্ঠা কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ২৲

নানা বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন চরিত প্রণয়ন করিয়া মন্মথ বাবু বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত জীবনীগুলি সকল দিক হইতে কিরূপ পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে; কিরূপ বিপুল অধ্যবসায় ও অক্লান্ত অনুসন্ধানে তিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং সেই তথ্যগুলি তিনি কিরূপ সুন্দর ভাবে সজ্জিত করেন,—যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সংবাদ রাখেন তাঁহাদের নিকট অবিদিত নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানিও মন্মথ বাবুর সেই যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ৺ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজি শিক্ষা সবে মাত্র এদেশে প্রচলিত হইতেছে। ভোলানাথ হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। "Travels of a Hindoo" গ্রন্থ লিখিয়া তিনি দেশ বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁহার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী ত আছেই, তা ছাড়া, তাঁহার সহিত সংসৃষ্ট তৎসমসাময়িক বহু মনীষী জনেরও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। মোটের উপর গ্রন্থখানি অত্যন্ত সুপাঠ্য হইয়াছে। বই খানিতে ৫৫ জন বিখ্যাত

ব্যক্তির ছবি দেওয়া হইয়াছে—তন্মধ্যে কতকগুলি মন্মথ বাবুর অধ্যবসায়েই আবিষ্কৃত এবং এই সর্ব্ব প্রথম সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল।

উৎপলা

উপন্যাস। শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ৩০২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৷০

অশোকের রাজত্বকাল অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাস খানি রচিত। ইহাতে যে একটি নৈরাশ্যপূর্ণ প্রণয় কাহিনী সু-ঔপন্যাসিকের কৌশলে বিবৃত হইয়াছে, তাহা অবশ্য যে কোনও কালে ঘটিতে পারিত; কিন্তু ইহার ঘটনাকাল ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়া লেখক মহাশয় তৎকালোপযোগী নানা বিষয়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। মহারাজ অশোক-বর্দ্ধনের মৃগয়া শোভাযাত্রার চিত্র, তাঁহার জন্মোৎসব ও বসন্ত উৎসবের বর্ণনা, কলিঙ্গ বিজয়ের পর মহারাজের রাজধানী প্রবেশ, শৃঙ্খলাবদ্ধ কলিঙ্গ রাজের বিচার প্রভৃতির বর্ণনা আমরা মুগ্ধচিত্তে পাঠ করিয়াছি। এবং আমাদের মনে হয়, এই গুলিই এই উপন্যাস খানিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

সোণালি

উপন্যাস। শ্রীব্যোমকেশ বন্দোপধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত, প্রকাশক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন, ১০১। বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজি ১৭৬ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৷৷০

ব্যোমকেশ বাবু অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন—এই খানিই বোধ হয় তাঁহার নূতনতম উপন্যাস। প্রণয় কাহিনী না হইলে উপন্যাস হয় না—ইহাও একটি প্রণয়-কাহিনী। পল্লীগ্রামের লোক-চরিত্র লেখক বেশ নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ধনীপুত্র অনাথবন্ধুর চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। সর্ব্বশেষে, অল্প শিক্ষিত পল্লীবালা সোণালির হৃদয়ের মহত্ত্ব ও তাহার আত্মত্যাগের চিত্রটি আমাদের অভিভূত করিয়া ফেলে। অনাথবন্ধুর পিতার চরিত্রটি দেখিয়া মনে হইল, আমাদের দেশে এখনও এরূপ বড় একটা হয় না; তবে হওয়াই উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বহিখানি পাঠে বেশ কৌতূহল জাগে।

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "স্বপ্নময়ী"র মুদ্রণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল; বড় দিনের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

———

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের সম্পাদনে স্বর্ণময়ী সিরিজ নামে নূতন এক পর্য্যায়ভুক্ত গ্রন্থাবলী বাহির হইতেছে। প্রথম খণ্ড "দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ" যন্ত্রস্থ হইয়াছে। এবং সরস্বতীপূজার দিবস প্রকাশিত হইবে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইহার একমাত্র এজেণ্ট।

———

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশী যোগাশ্রম হইতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদ্যানুবাদ নামক পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। পুস্তক খানি অতি প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং আশা করা যায়, ইহা পাঠে সমগ্র গীতার উপদেশ সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ম্যানেজার, কাশী যোগাশ্রম, হাউজকাটোরা, বেনারস সিটি এই ঠিকানায় ডাকব্যয় জন্য এক আনার টিকট পাঠাইলে আগামী পৌষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই পুস্তকখানি সাধারণের উপকারার্থ বিনামূল্যে প্রেরিত হইবে।

কলিকাতা।

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কামারলজমান ও বেদোরার পুনর্মিলন

(চিত্রকর—এডমণ্ড ডিউলাক।)

Bengal Art Press,—Shikdar Bagan St.

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩১

২য় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিদেহ

বেদের ব্রাহ্মণ অংশে বিদেহরা বিশেষ সভ্য জাতি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে সংহিতার সময়েও বিদেহদের নাম অপরিচিত ছিল না; এমন কি ভারতবর্ষের যে অংশে তাহারা বাস করিত তাহা সম্ভবতঃ তখনও বিদেহ নামেই পরিচিত ছিল। যজুর্ব্বেদের সংহিতাতে বিদেহের গাভীগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের বৈদিকযুগে বিদেহের গাভী বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ১

জুলিয়াস এজেলিংএর মতে, ব্রাহ্মণ সমূহ সম্পাদনের সময় মধ্যদেশের পূর্ব্ব প্রান্তে কোশল-বিদেহ নামে একটি রাষ্ট্র ছিল এবং প্রতিষ্ঠা-গৌরবে এই রাষ্ট্রটি কুরু-পাঞ্চাল প্রভৃতি অপেক্ষা হীন ছিল না। তিনি ইহাদের জন্মের পৌরাণিক উপাখ্যানটিও প্রদান করিয়াছেন। সে উপাখ্যান অনুসারে একই পিতা বিদেঘ মাধব হইতে ইহাদের জন্ম হয়। পরে সদানীরা নদীর দ্বারা ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রাপ্তি অথবা গণ্ডক নদীই তখনকার দিনে সম্ভবতঃ সদানীরা নামে অভিহিত হইত। এই বিদেহ দেশই ছিল আর্যভূমির পূর্ব্ব সীমার শেষ প্রান্ত। ২ ডাঃ ওয়েবার বলেন, আর্য্যেরা বিদেঘ বিদেঘ-মাধব এবং তাঁহার পুরোহিতের কর্ত্তৃত্বাধীনে সরস্বতী নদীর তীর পর্য্যন্ত জয় করেন।

(১) তৈত্তিরিয় সংহিতায় টীকাকার বৈদেহী শব্দটির অর্থ করিয়াছেন, 'বিশিষ্ট-দেহ-সম্বন্ধিনী' অর্থাৎ যাহার সুন্দর দেহ আছে।

(See Vedic Index, Vol. II, p. 298 and Keith's Veda of the Black Yajus school, Vol. I, p 138)

(২) Satapatha, S. B. E. -Intro. xlii-xliii.

পূর্ব্বদিকে তাঁহাদের জয়ের সীমা ছিল সদানীরা নদী। এই সদানীরা নদীই বিদেহ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত। সদানীরা নদীরই আর একটি নাম ছিল সম্ভবতঃ গণ্ডক। গণ্ডক নদীই কোশল এবং বিদেহ এই দুই প্রদেশকে দুই ভাগ করিয়া দিয়াছিল। ৩

রাজা বিদেঘ মাথব বা বিদেহ মাধব হইতেই রাজ্যের নাম হয় বিদেহ। বিদেহ মাধব রাজ্যের ভিতর যজ্ঞাগ্নির প্রবর্ত্তন করেন। কাহারও কাহারও মতে যজ্ঞাগ্নির প্রবর্ত্তনের কাযটা একটা রূপক মাত্র। উহার অর্থ রাজ্যের ভিতর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। বিদেহ রাজ্যে আর্য্যদের উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে এই উপাখ্যানটিকে উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে উহা আমরা এখানে ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম:—

"বিদেহের রাজা মাধব মুখের ভিতর অগ্নি বৈশ্বানরকে বহন করিতেন। ঋষি গোতমরাহুগণ তাঁহার কুল পুরোহিত ছিলেন। সম্ভাষিত হইয়াও (পুরোহিতের দ্বারা) পাছে তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হয় এই ভয়ে তিনি তাঁহার আহ্বানে উত্তর দিতে পারিলেন না।

তিনি (পুরোহিত) ঋগ্বেদের শ্লোকের দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, 'হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি, আমরা তোমাকে যজ্ঞের সময় প্রজ্বলিত করি তুমি জ্যোতির্ম্ময় তুমি যজ্ঞের ভোজের নিয়ামক। (ঋগ্বেদ, ৫ম, ২৬, ৩)। হে বিদেঘ!' তিনি (রাজা) উত্তর দিলেন না। (পুরোহিত বলিতে লাগিলেন) "হে অগ্নি তোমার জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি, তোমার শিখা, তোমার আলো ঊর্দ্ধ দিকে উৎক্ষিপ্ত কর, (ঋগ্বেদ ৮ম, ৪৪, ১৬) হে বিদেঘ—অ—অ!'

তথাপি তিনি কোনো উত্তর প্রদান করিলেন না। (পুরোহিত বলিতে লাগিলেন) হে ঘৃতভুগ্ অগ্নি, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' (ঋগ্বেদ, ৫ম, ২৬, ২); তিনি এইমাত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, অমনি ঘৃতের উল্লেখ মাত্রেই (রাজার) মুখের ভিতর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর তাঁহাকে মুখের ভিতর ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মুখ হইতে নির্গত হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন।

বিদেঘরাজ মাধব তখন সরস্বতীর (নদীর) উপরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি (অগ্নি) সেখান হইতে জ্বলিতে জ্বলিতে এই ভূখণ্ডের উপর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন। এবং গোতম রাহুগণ এবং বিদেঘ মাথব তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই সমস্ত নদী তাঁহার তেজে শুষ্ক হইয়া গেল। কেবলমাত্র হিমালয় হইতে বিনির্গত সদানীরা নামক নদীটি তিনি অশুষ্ক অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। অগ্নি বৈশ্বানর স্পর্শ করেন নাই বলিয়াই প্রাচীনকালে এই নদীটিই ব্রাহ্মণেরা অতিক্রম করেন নাই। এখন অবশ্য ইহার পূর্ব্বতীরে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। কিন্তু যে সময় সদানীরার পূর্ব্ব তীর অকর্ষিত এবং জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল। কারণ অগ্নি বৈশ্বানর উহা স্পর্শ করেন নাই।

এখন অবশ্য উহা অত্যন্ত উর্ব্বর। কারণ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিকে সেখানে আহ্বান করিয়াছিলেন। এমন কি গ্রীষ্মের শেষ ভাগেও এই নদীটি উপকূলের উপর উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিত। অগ্নি বৈশ্বানর ইহাকে স্পর্শ না করায় জল তুষার-শীতল ছিল।

বিদেহ-রাজ মাধব অতঃপর অগ্নিকে বলিলেন, "আমি কোথায় বাস করিব?" তিনি বলিলেন, "এই নদীর পূর্ব্বতীর তোমার বাসভূমি হইবে।" এখন পর্য্যন্তও এই নদীটি কোশলদের এবং বিদেহের দেশের রাজ্যের সীমান্তরূপে বিরাজিত। কারণ ইহারাই মাধবের বংশধর। ৪

অধ্যাপক ওয়েবারের সময় হইতে এই অংশটির উপর ঐতিহাসিকেরা বিশেষ জোর দিয়া আসিতেছেন। কারণ বৈদিক আর্য্য সভ্যতা উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে যে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল পণ্ডিতেরা এই অংশটাকে তাহারই প্রমাণ বলিয়া মনে করেন।

(৩) S, B, E, Vol. XII, p 104t.

(৪) Satapatha Brahmana, S. B. E. X11 pp. 104—106.

এ মত যদিও আমাদের কাছে নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না, তথাপি এই অংশটি হইতে একথা বেশ নিঃসন্দেহরূপেই বুঝা যায় যে, শতপথ ব্রাহ্মণেও যে সময়টাকে প্রাচীন বলিয়া মনে করে সে সময়েও বিদেহ দেশে বৈদিক সভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং সেই প্রাচীন কালেও অগ্নির কাছে বলিদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রচলিত মতানুসারে শতপথ ব্রাহ্মণ বিদেহ দেশেই যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট্ জনকের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ প্রমাণও আছে যে, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগুলির ন্যায় শতপথ ব্রাহ্মণেরও কতক অংশ আরও পশ্চিমে অন্যদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী মন্ত্রযুগে বিদেহ এতটা অগ্রসর হইয়াছিল যে, বৈদিক সভ্যতায় উহা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াই বসিয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে এ আভাস বেশ স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া আছে যে, ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের জগতে সম্রাট্ জনক এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নেতৃত্ব সমগ্র উত্তর ভারতকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কুরুপাঞ্চাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ঋষিরা জনকের সভায় সমবেত হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হইত তাহাতে যোগদান করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানের গভীরতা তাঁহাদের সকলেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের মতে ব্রাহ্মণ সমূহের সঙ্কলনের বহুপূর্ব্বেই বিদেহ দেশে বৈদিক সভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ব্রাহ্মণ সমূহেরই একটি অংশ। তাহাতেও আছে বিদেহরাজ সম্রাট্ জনক বৈদিক সভ্যতার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার সভায় সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ঋষিরা সমবেত হইতেন। উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ আমরা এখানে ভাষান্তরিত করিয়া দিতেছি,—

"বিদেহরাজ জনক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। এই যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণকে নানা রকমের উপহার দেওয়া হইয়াছিল। কুরু এবং পাঞ্চালের ব্রাহ্মণেরা যেখানে আসিয়াছিলেন এবং এই সব সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ভিতর কে যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শাস্ত্রজ্ঞ বিদেহ-রাজ জনক তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সহস্র গাভী একটি স্থানে রাখিয়া তাহাদের প্রত্যেকের শৃঙ্গ দশখানি করিয়া সুবর্ণ পাদ বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন, "হে শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ মণ্ডলী, আপনাদের ভিতর যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী তিনি এই গাভীগুলি গ্রহণ করুন।"

কোনও ব্রাহ্মণ যখন অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যকে কহিলেন, "বৎস, গাভীগুলি লইয়া যাও।"

শিষ্য গাভীগুলি লইয়া প্রস্থান করিল।

তখন ব্রাহ্মণেরা রুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, "আমাদের ভিতর সে কোন সাহসে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া মনে করে?"

বিদেহরাজ জনকের হোত্রী অশ্বল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি আমাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান?"

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, "যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। কিন্তু এই গাভীগুলিকে গ্রহণ করিতে আমি সত্যই অভিলাষ করিয়াছি।"

তখন হোত্রী অশ্বল তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অশ্বল যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যাজ্ঞবল্ক্য সে সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ায় অশ্বল শান্ত হইলেন। উপনিষদের সহজ সরল ভাষায় এই আখ্যায়িকাটি বিবৃত হইয়াছে।

তাহার পর জারৎকারব আর্ত্তভাগ প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। তিনিও কিছুক্ষণ পরেই অশ্বলের ন্যায় শান্ত হইতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর যথাক্রমে ভুজ্যুলাহ্যায়নি, উপস্ত চক্রায়ণ, কহোল কৌষীতকেয়, গার্গী বাচকনাভী, উদ্দালক আরুণী প্রশ্ন করিয়া শান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর গার্গী বাচকনাভী পুনরায় তাঁহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ধরণ একটু স্বতন্ত্র রকমের। "অতঃপর বাচকণাভী বলিলেন, 'শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যদি সে দুইটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারেন তবে আমার বিশ্বাস আপনাদের আর কেহই ব্রাহ্মণ সম্পর্কিত তর্কে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।"

"যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, গার্গী আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।"

তিনি বলিলেন; "হে যাজ্ঞবল্ক্য যেমন কাশী বা বিদেহের বীর ধনুকে জ্যা আরোপ করিয়া শত্রু ভেদী দুধারি তীক্ষ্ণ তীর লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ায় আমি তেমনি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।" কিন্তু এ প্রশ্নের ফলও পূর্ব্বের অনুরূপ হইল। এবং গার্গী অবশেষে ঋষিদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে পরাভব স্বীকার করিলে তাহা অন্যায় হইবে না। কারণ আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মণ সম্পর্কিত প্রশ্নে আর কেহই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।" তিনি অতঃপর শান্ত হইলেন।

তাহার পর কুরু-পাঞ্চাল প্রদেশের বিদেঘ শাকল্য প্রশ্ন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের প্রথম যুগে জ্ঞানের গর্ব্বে মাথা উচু করিয়া চলিতেন। অতঃপর যে আলোচনা উপস্থিত হইল তাহাতে তিনি বলিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য তুমি কুরু-পাঞ্চালের ব্রাহ্মণদিগকে অবহেলা করিয়াছ—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে?"

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে যেমন ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন তাঁহাকে তেমনি ভাবে পরাজিত করিয়া অবশেষে সকলকেই তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া কহিলেন "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের ভিতর একজন —অথবা আপনারা সকলে একত্রে যদি আমাকে প্রশ্ন করিতে চান তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যে কেহ আমাকে প্রশ্ন করিবেন আমি তাঁহাকেই উত্তর প্রদান করিব।" উপনিষদ বলিতেছেন, "কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আর প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ—তৃতীয় অধ্যায় ১-৯)

উপনিষদের এই ঘটনাটি হইতে বোঝা যায় যে শতপথ ব্রাহ্মণের সময় বিদেহের ব্রাহ্মণেরা কুরু-পাঞ্চালের ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা বৈদিক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

ব্রাহ্মণ যুগের এবং তাহার পরবর্ত্তী সূত্র যুগের অনেক গ্রন্থে বিদেহের, অন্যান্য বিখ্যাত রাজাদেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণযুগে বৈদিক সমাজে বিদেহের স্থান যে খুব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহাদের জ্ঞানের দিকে তাকাইয়া বিচার করিলে তাহাদের ভিতর ব্রাহ্মণ যুগের বহু পূর্ব্বে যে বৈদিক আর্য্য সভ্যতা প্রসারতা লাভ করিয়াছিল তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের সংহিতা যুগেই বিদেহে বৈদিক সভ্যতা প্রসারতা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

জনকের বহু দক্ষিণা যজ্ঞের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যজ্ঞে কুরু-পাঞ্চালের বহু ব্রাহ্মণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ ছাড়াও জাতকে বিদেহ রাজাদের যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের নামে এই সব যজ্ঞে ছাগ বলিদানের প্রথা ছিল।৫ পুরাণে ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিদেহ-রাজ নির্ম্মিত সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে বশিষ্ঠ প্রধান ঋত্বিকের কার্য করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বশিষ্ঠ ইন্দ্রের দীর্ঘদিনব্যাপী এক ব্রতে পৌরোহিত্য করেন। সেই যজ্ঞ শেষ করিয়াই তিনি মিথিলাতে রাজা নিমির যজ্ঞের পৌরহিত্য গ্রহণের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ৬

---

(৫) Jataka, Vol. IV, p 220

(৬) Vishnupurana, p. 246 (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

অধ্যাত্ম রামায়ণেও বিদেহ রাজপরিবারের যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের কথা লিখিত আছে। বিশ্বামিত্র রাম এবং লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, "বৎস আমরা জনক রাজার রাজধানী মিথিলাতে গমন করিতেছি। জনকের মহা যজ্ঞে যোগদান করিয়া আমরা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" (অধ্যাত্ম রামায়ণ, বালখণ্ড, ৭ম অধ্যায়, পৃঃ ৬৮, কালীশঙ্কর বিদ্যারত্নের সংস্করণ)।

রামায়ণের যুগে আসিলে দেখা যায়, রামচন্দ্র মিথিলা-রাজ জনকের পালিতা কন্যা বৈদেহীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।৭ এ জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্যের পৃষ্ঠপোষক জনক সম্ভবতঃ এক ব্যক্তি ছিলেন না। বৈদিক যুগের জনক নামে কোনও রাজা জ্ঞানে এবং রাজনৈতিক শক্তিতে অসাধারণ গৌরব এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই রাজার নামের অনুকরণ করিয়া সেই বংশের আরও কয়েকজন রাজা জনক নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামায়ণে বিদেহের রাজধানী এবং জনক রাজার সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত যজ্ঞশালার চমৎকার বিবরণ আছে।

মিথিলা এবং অযোধ্যার দূরত্বের একটা আভাস এই রামায়ণ হইতেই পাওয়া যায়। বিদেহ-রাজ জনকের রাজত্বকালে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে চারি দিনে মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। রাস্তায় তাঁহারা একরাত্রি মাত্র বিশালাতে বিশ্রাম করেন।৮

জনকের দূত দ্রুতগতিতে চলিয়া তিন দিনে দশরথের রাজধানীতে পৌঁছিয়াছিল এবং দশরথ রথারোহণে চারি দিনে মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। বিদেহের রাজধানী মিথিলা এবং বর্ত্তমান জনকপুর অনেকেই এক বলিয়া মনে করেন। জনকপুর নেপাল রাজ্যের পাহাড় অঞ্চলের ভিতর অবস্থিত। বহু যাত্রী প্রতি বৎসর এই স্থানটাতে তীর্থযাত্রা করে।

মহাভারতেও বিদেহ, বিদেহের রাজধানী মিথিলা এবং রাজা জনকের নামের উল্লেখ বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভের পর এবং রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে ভীম, যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি বিদেহের, রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। (সভাপর্ব্ব—অধ্যায় ৩০)। কর্ণও তাঁহার দিগ্বিজয়ের সময় বিদেহ রাজধানী মিথিলাকে জয় করেন। (বনপর্ব্ব—২৫৪)। জনকের সুবিখ্যাত যজ্ঞের উল্লেখ একাধিক স্থানে পাওয়া যায় (বনপর্ব্ব—অধ্যায় ১৩২, ১৩৪ ইত্যাদি)। শান্তিপর্ব্বে জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্যের একটি আলোচনার উল্লেখ আছে (অধ্যায় ৩১১)। জনকের আধ্যাত্মিক উন্নতি, পঞ্চশিখ, সুলভা প্রভৃতির সহিত তাহার আলোচনা এবং তরুণ শুককে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার কথা—এ সমস্তই মহাভারতের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে রাজগৃহে গমনের সময় কৃষ্ণ ভীমসেন এবং অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া বিদেহ রাজধানী মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন।

ভীষ্মপর্ব্বে দুইবার বিদেহের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—একবার মগধের নামের সহিত এবং আর একবার তাম্রলিপ্তের নামের সহিত।

বিষ্ণুপুরাণেও বিদেহ নামের উল্লেখ আছে। তাহাতে ইহার প্রাচীন কাল হইতে সমস্ত রাজার নামের তালিকাও পাওয়া যায়। বিদেহ নাম এবং মিথিলা নাম যে কেন হইল তাহার বিবরণও বিষ্ণুপুরাণে আছে। বিবরণটি এই—বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া নিমির যজ্ঞ আরম্ভ করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন—রাজা যজ্ঞ নির্ব্বাহের জন্য গৌতমকে নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজা তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি রাজাকে অভিশাপ দিলেন, যেহেতু তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৌতমকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছেন, রাজা নিমি সেই হেতু বিদেহ অর্থাৎ বিগত দেহ হইবেন। রাজা জাগিয়া বশিষ্ঠকেও অভিশাপ দিলেন, যেহেতু বশিষ্ঠ ঘুমন্ত রাজাকে অভিশাপ দিয়াছেন সেই

(৭) রামায়ণ—বালকাণ্ডম্ ৭০ অধ্যায় (বোম্বাই সংস্করণ)
(৮) রামায়ণ (বঙ্গবাসী সংস্করণ) ১—৩

কেতু তিনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন।"[৯] অতঃপর ঋষিরা নিমির মৃতদেহ ভীমবলে আলোড়ন করিতে লাগিলেন। সেই আলোড়নের ফলে তাঁহার দেহ হইতে একটি পুত্রের জন্ম হইল। আলোড়নের ফলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া পরে সেই পুত্রের নাম হইয়াছিল মিথি। বিদেহ রাজাদের ভিতর জনকই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে অন্যান্য রাজার নামও পাওয়া যায়, যেমন—সাগরদেব, ভরত, অঙ্গীরস, রুচি, সুরুচি, প্রতাপ, মহাপ্রতাপ, সুদর্শন, নেরু, মহাসম্মত, মুচল, মহামুচল, দুইজন কল্যাণ, (৯) মহাযশা শতধনু, (১০) মহাদেব, সাধিন, সুরুচি, নিমি প্রভৃতি।

রাজা মিথি মিথিলার প্রতিষ্ঠাতা। এই মিথি জনক নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। ভবিষ্যপুরাণের মতে নিমির পুত্র মিথি তিরহুতের নিকট একটী সুন্দর নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নিজের নাম অনুসারে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন, মিথিলা। এবং এই নগর প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হইতেই তাঁহার নাম হইয়াছিল জনক। দীর্ঘ নিকায়ের মহাগোবিন্দ সুত্তন্তে কিন্তু স্বতন্ত্র বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে মিথিলার প্রতিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। ১১

বিদেহের রাজারা সাধারণতঃ প্রতিবেশী রাজাদের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াই চলিতেন। কোশলরাজ দশরথ তনয় রামচন্দ্রের সহিত বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার পরিণয়ের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রামায়ণের পরবর্ত্তী সাহিত্যেও বিদেহ-রাজাদের প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। ডাক্তার ডি-আর ভাণ্ডারকর দেখাইয়া দিয়াছেন যে কবি ভাসের নাট্যাবলীতে উদয়নকে বৈদেহী পুত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উদয়নের মাতা বিদেহ-রাজকুমারী ছিলেন। ১২ বৌদ্ধ সাহিত্যেও আরও একজন বিদেহ রাজকুমারীর উল্লেখ পাওয়া যায়; তিনি অজাতশত্রুর মাতা এবং বিম্বিশারের মহিষী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বাসবী। ১৩

জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্দ্ধমান মহাবীর বিদেহের অধিবাসী বিদেহ দত্তার পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যুর পর তিনি ৩০ বৎসর বিদেহে বাস করিয়াছিলেন। ১৪ মিথিলা তাহার বিশ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান ছিল। পরবর্ত্তী জীবনে এখানে তিনি ছয়টি বর্ষা যাপন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তখন প্রাচীন বিদেহ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত জাতি এই দেশটা জুড়িয়া বসিয়াছিল, লিচ্ছবির প্রতিপত্তিই তখন তাহাদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজ্জিসংযুক্তরাষ্ট্রে আটটি জাতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই আটটি জাতির ভিতর প্রধান ছিল লিচ্ছবি ও বিদেহ। কৌটিল্যের মতে এই যুক্ত রাষ্ট্রটির নাম ছিল—রাজশব্দোপজিবিনী সঙ্ঘ। ১৫ বিদেহ দৈর্ঘ্যে ছিল ২৪ যোজন—কৌশিকী নদী হইতে গণ্ডক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রস্থে ছিল ১৬ যোজন—গঙ্গা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিদেহের রাজধানীর নাম ছিল মিথিলা—বেশালী হইতে প্রায় ৩৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে এই সহরটার অবস্থিতি ছিল। ১৬

জাতকে বিদেহের রাজধানী মিথিলার পরিধি সাত লিগ এবং বিদেহ রাজ্যের পরিধি তিন শত লিগ বলিয়া

(৯) Mahavamsa. Geiger's translation, p. 10.

(১০) Visnupurana, Pt. III. chap. XVIII, p. 217 (Vangauasi edn.)

(১১) P. T. S. Vol, II, p 235.

(১২) Carmichael Lectures, 1918, pp. 58-59,

(১৩) Rockhill, Life of the Buddha . pp, 63 64.

(১৪) Jaina Sutras, 523, S, B, E, pp, 9 p 256

(১৫) Arthasastra, translated by Samasastri, p. 455

(১৬) Rhys Davids, Buddhist India, p. 26.

বর্ণিত হইয়াছে।১৭ মিথিলা, রাজা জনক এবং মখাদেবের রাজধানী ছিল। উহা বর্ত্তমান তিরহুত জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।১৮ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত মিথিলা নগর প্রচুর হস্তী অশ্ব, রথ, বৃষ, মেষ এবং তৎসঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিষে পূর্ণ ছিল।১৯ জাতকের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিদেহ-রাজ্যের গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৬০০০ এবং নর্ত্তকীর সংখ্যা ছিল ১৬,০০০।২০ চারিটি অশ্ব রাজকীয় সুসজ্জিত গাড়ী আকর্ষণ করিত। গাড়ীতে বসিয়া রাজা জাঁক জমকের সহিত রাজধানী প্রদক্ষিণ করিতেন।২১

সি-য়ু-কি প্রতীচ্য জগতের বৌদ্ধ বিবরণ গ্রন্থ। তাহাতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ফো লি-সি (ব্রিজি) রাজ্যের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই রাজ্যের রাজধানীর নাম চেন-সু-না। এই গ্রন্থের অনুবাদক ৭৭ পৃষ্ঠায় একটি মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন, ব্রিজি—আটটি জাতির দ্বারা গঠিত একটি যুক্ত রাষ্ট্রের ব্রিজি নামক লোকদের দেশ। ভি-ডি, সেন্ট মার্টিনের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে চেন-সু-ন মিথিলার রাজধানী জনক বা জনকপুরের নাম।২২ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেহের সহিত বণিকদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়, শ্রাবস্তী হইতে বহু লোক বিদেহে পণ্যদ্রব্য লইয়া গমন করিত। বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে ছিলেন তখন শ্রাবস্তীর অধিবাসী তাঁহার একজন শিষ্য গো-শকটে পরিপূর্ণ পণ্যদ্রব্য লইয়া ব্যবসায় করিবার জন্য বিদেহে গমন করেন। পথে বনের ভিতর দিয়া গমন করিবার সময় তাঁহার গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া যায়। এমন সময় আর একজন লোক স্বগ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া কাঠ কাটিবার উদ্দেশ্যে কুঠার হস্তে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বুদ্ধের সেই শিষ্যটিকে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মনে অনুকম্পার উদয় হইল। সে তৎক্ষণাৎ একটি বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা একখানি দৃঢ় চাকা তৈরী করিয়া তাহা তাঁহার গাড়ীতে জুড়িয়া দিয়া তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিল। অতঃপর শিষ্যটি শ্রাবস্তীতে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।২৩

বিদেহবাসীরা দানশীল জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল। দানের বহু প্রতিষ্ঠানও সেখানে ছিল। ভিক্ষায় তাহারা প্রত্যহ ৬,০০,০০০ পয়সা দান করিত।২৪ মখাদেব জাতকে একজন বিদেহ রাজের একটি আখ্যায়িকা আছে। তিনি যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন প্রচুর আয়ের একখানি গ্রাম তাঁহার ভ্রাতাকে দান করিয়াছিলেন।

জাতকের গল্পে বুদ্ধের সময় মানুষের সাধারণ জীবিত কালের পরিমাণ ৩০ হাজার বৎসর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ আজগুবি ব্যাপার জাতকের গল্পগুলিতে বিশেষ নূতন জিনিষ নহে। মিথিলার রাজা মখাদেব সাধারণ মানুষের অপেক্ষা ভাগ্যবান পুরুষ। সুতরাং তাঁহার জীবনের মেয়াদ জাতকে ৮৪ হাজার বৎসর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ জীবনের প্রথম ভাগ তিনি যুবরাজরূপে আমোদ আহ্লাদে কর্ত্তন করিয়াছেন, মধ্যভাগে তিনি রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, শেষ ভাগে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য পরমায়ুর উল্লেখও জাতকে পাওয়া যায়। ব্রহ্মায়ু নামে একজন ব্রাহ্মণ মিথিলায় বাস করিতেন। তিনি ১২০ বৎসর বাঁচিয়া

(১৭) Jataka (Cowell's edition) Vol, III, 222.

(১৮) Buddhist India p. 30.

(১৯) Beal's Romantic Legends of Sakya Buddha, p. 30.

(২০) Jataka, Vol, III, p 222.

(২১) Ibid. Vol. II, pp, 27-28.

(২২) Beal's Records of the Western World, Vol. II p. 71.

(২৩) Dharmapala's Paramatthadipani on the Therigatha, Pt, III, pp, 277-278.

(২৪) Jataka, (Cowell) Vol. IV, p 224

ছিলেন। বেদ, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি তাঁহার নখদর্পণে ছিল। এবং মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণেই তিনি ভূষিত ছিলেন।২৫

বিদেহের রাজাদের ভিতর বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সুমেধা নামে এক কন্যা ছিল। বিদেহের যুবরাজ তাহার পাণিপ্রার্থী হইলে, তাঁহার বহু পত্নী থাকায় পাছে সপত্নীদের দ্বারা কন্যার জীবন বিষময় হইয়া উঠে এই আশঙ্কা করিয়া কাশীরাজ বিদেহ যুবরাজের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কন্যাকে এমন একটি পাত্রে সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন যিনি তাঁহার কন্যাকে ছাড়া অন্য পত্নী গ্রহণ করিবেন না।২৬

বিদেহ রাজকুমারীদের পাতিব্রত্যের কথা অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সীতার পতিভক্তির কথা সকলেরই সুপরিচিত। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অমিতায়ুধ্যান সূত্রে আছে দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু যখন তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে ধৃত করিয়া সপ্ত প্রাচীর বেষ্টিত গৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহার সহিত কেহই সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না, তখন পতিব্রতা রাজমাতা বৈদেহী স্নানান্তে শুচিশুদ্ধ হইয়া স্বামীর নিকট গমন করিবার সময় স্বীয় দেহ ভুট্টাচূর্ণ মিশ্রিত মধু এবং ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া এবং যে মাল্য তিনি ধারণ করিতেন তাহার ভিতর গোপনে দ্রাক্ষারস বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দ্বাররক্ষী প্রহরীর নিকট হইতে যখন বৈদেহীর কার্য্যকলাপ জানিতে পারিলেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদের আপত্তিতে অবশেষে সে অভিলাষ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বৈদেহীকে নির্জ্জনে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বৈদেহীর বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধদেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শান্তি ও মনের সন্তোষ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।২৭

বিদেহের প্রজারা পুত্রহীনতার জন্য রাজাকে তিরস্কার করিতেছে বা তাঁহাকে নানা রকমের উপদেশ প্রদান করিতেছে, এরূপ ঘটনার উল্লেখও জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা সে সব উপদেশ ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতেন বা পরিহার করিতেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রজাদের পরামর্শ রাজাকেও গ্রহণ করিতে দেখা যায়।২৮

মিথিলার রাজারা অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন। জনকের নামের উল্লেখ আমরা ইতঃপূর্ব্বেই করিয়াছি। ব্রাহ্মণ যুগের এই রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার বিখ্যাত রচয়িতা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করিয়াছিলেন।২৯ বৌদ্ধযুগে মিথিলার রাজা সুমিত্র প্রকৃত নীতি-শাস্ত্র অধ্যয়নে অবহিত হইয়াছিলেন।৩০ মিথিলার রাজা বিদেহকে চারিজন ঋষি নীতি-শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন।৩১

পুরাকালে যখন বিদেহ মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন তখন তাঁহার রাণী যে পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন সে পুত্র বর্দ্ধিত হইয়া তক্ষশিলায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।৩২ তক্ষশিলা তখনকার দিনে বিদেহ এবং অন্যান্য দেশের রাজপুত্রদের অধ্যয়নের স্থান ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে বিদেহ রাজ পরিবারের ধর্ম্মানুরাগের

(২৫) Majjhima Nikaya, Vol. II, Pt. I, pp 133-134

(২৬) Jataka, Vol, IV, pp. 198-205.

(২৭) S. B. E. Vol XLIX, pp, 161-201

(২৮) Jataka, Vol V, pp 141-142

(২৯) Anargha Raghava (Nirnayasagara Edition) p. 117

(৩০) Beal's Romantic Legend of Sakya Buddha p 30

(৩১) Jataka (Cowell) Vol. VI, p, 159

(৩২) Jataka, Vol II, p. 77.

গল্পের অভাব নাই। কয়েকটি গল্প এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। বিদেহ রাজ নিমি একদা তাঁহার প্রাসাদের জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। ঠিক সেই সময় একটি বাজ পাখী মাংসের বাজার হইতে একখণ্ড মাংস লইয়া উড়িয়া যাইতেছিল। রাজা দেখিলেন, অন্য কতকগুলি পক্ষী আসিয়া সেই বাজ পক্ষীটিকে আক্রমণ করিল। অবশেষে তাহাদের চঞ্চুর আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সে মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিতেই সেই পরিত্যক্ত মাংসখণ্ড যেমন অন্য একটি পক্ষী গ্রহণ করিয়াছে অমনি আবার তাহার উপর আক্রমণ সুরু হইল, সে আঘাতে কাতর হইয়া যেমন মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে, তৃতীয় পক্ষীটি তাহা চঞ্চুতে গ্রহণ করিল। তখন সমস্ত বিহগের সম্মিলিত আক্রমণ গিয়া পড়িল আবার এই নূতন পক্ষীটির উপর। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া রাজার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল নিম্নে তাহা ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া গেল:—"কোন জিনিষ অধিকারে থাকাই দুর্ভাগ্যের, ত্যাগই প্রকৃত সুখ। দুঃখ তাহারই ভাগ্যে পতিত হয় যে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লালায়িত হয়, সুখ তাহাকেই বরণ করে যে ইন্দ্রিয় সুখকে পরিহার করিয়া চলে। তাঁহার ১৬ হাজার রমণী আছে, সুতরাং তাঁহার সুখী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাজ পাখীটি যেমন করিয়া মাংস খণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে তেমনি করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করা সঙ্গত।" তিনি জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং এই ভাবে বিষয়টি আলোচনা করিতেই সুখের তিনটি সম্পদ তাঁহার জ্ঞানাধিগম্য হইল। এবং তিনি আধ্যাত্মিক আলোকের দ্বারা পচ্চেক বুদ্ধের জ্ঞান লাভ করিলেন।৩৩

জাতকে আরও একটি গল্প আছে। বিদেহ রাজ বিদেহ এবং গান্ধার-রাজ বোধিসত্ত্ব পরস্পরের বন্ধু ছিলেন, যদিও পরস্পরকে দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের কাহারও কখন ঘটে নাই। পূর্ণিমার এক উপবাসের দিনে গান্ধার-রাজ পাঁচটি নৈতিক অনুশাসন পালনের শপথ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার জন্য নির্ম্মিত সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া তিনি মন্ত্রীদের সহিত এই অনুশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হওয়ায় চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িল। মন্ত্রীরা রাজাকে কহিলেন যে, চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছে। রাজা এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মনে করিলেন, সমস্ত উপদ্রবই বাহির হইতে আসে। তাঁহার রাজকীয় পারিষদবর্গও উপদ্রবের উপগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় নিজের আলো নষ্ট হইতে দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়। অতঃপর তিনি মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্ম-জীবন গ্রহণ করিলেন এবং অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া ধ্যানের আনন্দে বর্ষাঋতু যাপন করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন।

বিদেহের রাজা যখন গান্ধার রাজের ধর্ম্মজীবনের কথা শ্রবণ করিলেন, তিনিও রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তথায় এই দুইজন নৃপতি পরস্পরের পরিচয় না জানিয়া শান্তিতে এবং বন্ধুভাবে বাস করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বিদেহ সন্ন্যাসী গান্ধারের সেবা করিতেন। একদিন চাঁদের আলো ম্লান হইতে দেখিয়া বিদেহ তাঁহার গুরু গান্ধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—চাঁদের আলো হঠাৎ এরূপে ম্লান হইয়া গেল কেন? গান্ধার বলিলেন—রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে তেমনি সমস্ত উপদ্রবই বাহির হইতে আগমন করে এবং চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত হইতে দেখিয়াই তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বিদেহরাজ গান্ধার রাজাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন—তিনি এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন এবং গান্ধার রাজকেই আদর্শ করিয়া তিনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।৩৪

(৩৩) Jataka, Vol, III, p, 230.

(৩৪) Jataka (Cowell's Edition) Vol III, pp, 222-223

মিথিলার রাজা মখাদেবের দীর্ঘ জীবনের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার রাজ্য ত্যাগের গল্পটা অল্প কথায় বর্ণনা করা যাইতে পারে। মখাদেব তাঁহার ক্ষৌরকারকে আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তকে কোনও শুভ্র কেশ দেখা দিলে সে কথা ক্ষৌরকার যেন তাঁহাকে জ্ঞাপন করে। এক দিন ক্ষৌরকার তাঁহার মাথায় একটি শুভ্র কেশ দেখিয়া তাহা উৎপাটন করিয়া রাজার করে প্রদান করিল। রাজা সেই শুভ্র কেশ অবলোকন করিয়া মর্ম্মাহত হইয়া চিন্তা করিলেন—তাঁহার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। অতঃপর তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। এবং তাঁহার হাতে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া তিনি বানপ্রস্থ গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা বানপ্রস্থ গ্রহণ করিয়া একটি আম্র কাননে বাস করিতেন। এই আম্র কাননের নাম হইয়াছিল মখাদেব আম্রকুঞ্জ। তিনি অধ্যাত্ম জীবনে প্রচুর উন্নতি করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি মিথিলার রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং আবার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।[৩৫]

মিথিলার ধর্ম্মপ্রাণ রাজা সাধিন পাঁচ রকমের ধর্ম্মই প্রতিপালন করিতেন। উপবাসের দিনগুলিও রীতি-মত রক্ষা করিয়া চলা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। স্বর্গের দেবতারা যাঁহারা শক্রের বিচার গৃহে উপবেশন করিতেন, তাঁহারা সকলেই এই রাজার ধর্ম্মজ্ঞান ও সদাশয়তাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। এই কারণে শক্র তাঁহার নিজের রথে করিয়া সাধিনকে স্বর্গে আনয়ন করিবার জন্য মাতলিকে আদেশ প্রদান করিলেন। সেদিন পূর্ণিমা। মাতলি পূর্ণচন্দ্রের পাশে পাশে দেব রথ পরিচালিত করিলেন জনসাধারণ সে রথ দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল "দেখ, আকাশে দুইটী চন্দ্র উদিত হইয়াছে।" কিন্তু রথ যখন তাহাদের নিকট-বর্ত্তী হইল তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কহিল "ওতো চাঁদ নয়, রথ। উহার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন তাঁহাকে দেব পুত্র বলিয়া মনে হইতেছে। এ রথ নিশ্চয়ই আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ রাজার জন্য আসিয়াছে।" মাতলি রাজার দরজার সম্মুখে রথ থামাইয়া রাজাকে আরোহণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। রাজা দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাতলির সহিত প্রস্থান করিলেন। দেবতাদের রাজার অর্দ্ধেক, ২,৫০,০০০০০ অপ্সরা এবং বৈজয়ন্ত রাজ প্রাসাদের অর্দ্ধেক শক্র সাধিনকে দান করিয়াছিলেন। রাজা সেখানে সাত শত বৎসর স্ফূর্ত্ত আনন্দে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন তাঁহার পুণ্য ফুরাইয়া গেল, তাঁহার মনে অসন্তোষ দেখা দিল। স্বর্গ রাজ্যে বাস করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না। ইহার পর রাজা পুনরায় মিথিলায় নীত হইয়াছিলেন। সেখানে সাত দিন ধরিয়া তিনি ভিক্ষা দান করেন এবং সপ্তম দিবসে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন।[৩৬]

মিথিলার রাজা সুরুচির পত্নীর নাম ছিল সুমেধা। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন। সুমেধা পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাসের পঞ্চদশ দিবস তিনি প্রাণি বধ চুরী, পাপ, শয়ন, মদ্যপান, অনিয়মিত সময়ে আহার, পার্থিব আমোদ প্রমোদ, গন্ধদ্রব্য এবং অলঙ্কার পরিধান—এ সব কিছুই করিবেন না বলিয়া আট প্রকারের ধর্ম্ম শপথ গ্রহণ করিলেন এবং একটি গৃহে প্রধান আসনে উপবেশন করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে শক্র একজন ঋষির ছদ্ম-

(৩৫) Jataka (Cowell) Vol I, pp 31-32.

মজ্‌ঝিমনিকায়েতেও মখাদেব সম্বন্ধে যে গল্পটি আছে তাহাও প্রায় এইরূপই। উভয় গল্পের ভিতর সামান্য একটু আধটু প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় বলিয়া সে গল্প আর এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

(৩৬) Jataka (Cowell) Vol. IV. pp 224 227.

কালিদাস বাঙ্গালী কি না ?

কালিদাস বাঙ্গালী কি অবাঙ্গালী তাহা নির্দ্ধারণ এই অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যে সমস্ত প্রমাণ কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের সাধক বলিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার কয়েকটী প্রমাণ সম্বন্ধে সংপ্রতি কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং তাহাই কালিদাস সম্বন্ধে লেখকদের নিকট উপস্থিত করিলাম।

সম্প্রতি পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় কবি-সম্রাট্ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী প্রমাণ কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের সাধক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—

(১) "মুখ চন্দ্রিকা এক বঙ্গদেশেই আছে, অন্য দেশে নাই। মুখ চন্দ্রিকা বলিলে অন্যদেশের লোকে কিছুই বুঝিবে না।"

(২) রঘুবংশের ৭ম সর্গে ১৩ শ্লোকে শ্যালক অর্থে "সম্বন্ধী" শব্দ ব্যবহার।

(৩) "বাসর ঘরে বরকন্যাকে লইয়া নানাবিধ ঠাট্টাতামাসা কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। এ আচারও অন্য দেশে নাই।"

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন, ১৩৩০, ১৫০-৫৩ পৃঃ)

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মিঃ আপ্তের কন্যাদান উপলক্ষে "আপ্ মেরা ঘর পধারকর মুঝে কৃতার্থ কিজিয়েগা। আপকে আনেসে বিবাহ মণ্ডপকা বিশেষ শোভা বঢ়েগী।" ইত্যাদি সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া, মিঃ আপ্তেকে "কৃতার্থ" ও "বিবাহ মণ্ডপের "বিশেষ শোভা বর্দ্ধন" জন্য বিবাহ সভায় গিয়াছিলাম।

গোধূলি লগ্নে বিবাহ। জ্যৈষ্ঠ মাস, দিনমান ও গোধূলির পার্থক্য অতি সামান্য। বিশেষতঃ গোধূলি সময়ে সম্প্রদান বাক্য পাঠ করিতে হইবে, কাযেই গোধূলির পূর্ব্বেই বরকে সভাস্থ করা হইয়াছে। মনে হইল যেন দিবাভাগেই বিবাহ হইতেছে।

বিবাহের শাস্ত্রীয় অঙ্গ বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের উচ্চ বর্ণের বিবাহ প্রথার প্রায় অনুরূপ।

বর সভাস্থ হইলে সম্প্রদানকর্ত্তা মিঃ আপ্তে বরকে বরণ করিলেন। (বরণ যোড় দিবার প্রথা নাই)। কিছুক্ষণ পরে পাত্রীকে (বয়স দ্বাদশ বৎসর) সভাস্থ করা হইল। পাত্রী অবগুণ্ঠিতা অথবা "মাথায় কাপড়" দেওয়া নহে। মাথায় শোলার "কপালী" (কন্যার মুকুট) পর্য্যন্ত নাই। অবিবাহিতা বাঙ্গালী বালিকারা যেমন অনাবৃত মস্তকে থাকে তদ্রূপ অনাবৃত মস্তক।

পাত্রীকে বরের সম্মুখস্থ আসনে বসান হইল। মিঃ আপ্তে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বর যে পরিচ্ছদে বিবাহ মণ্ডপে আসিয়াছিলেন সেই পরিচ্ছদেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ; বাঙ্গালী বরের ন্যায় "বরণ যোড়" অথবা কোন রূপ বসনান্তর পরিধান করিলেন না।

(১) মুখচন্দ্রিকা। সম্প্রদানের পর বর এবং কন্যা নিজ নিজ আসনে দণ্ডায়মান হইলেন। পরস্পরের দৃষ্টি ব্যাহত করিয়া এক খণ্ড স্থূল নূতন বস্ত্র প্রসারিত করিয়া ধরা হইল। তৎপরে এক অবোধ্য ভাষায় (সম্ভবতঃ বেদমন্ত্র) গানের সুরে অনেকক্ষণ মন্ত্র পাঠ চলিল। অবশেষে বস্ত্র অপসারিত করা হইল। বরকন্যার পরস্পরের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া বস্ত্র সংপ্রসারণ ও তাহার পুনঃ অপনয়ন প্রথাটী বঙ্গদেশের মুখচন্দ্রিকার সম্পূর্ণ অনুরূপ, তবে নাম মুখচন্দ্রিকা নহে। মহারাষ্ট্রীয় আখ্যা অন্তঃপটম্। বাঙ্গালার বাহিরে অন্ততঃ একটী প্রদেশেও যে মুখচন্দ্রিকার ন্যায় একটী কৃত্য আছে তাহার আর সংশয় নাই।

(২) "সম্বন্ধী"। সম্প্রদান এবং অন্তঃপটম্এর পরে হোম ও সপ্তপদী গমন। বঙ্গদেশের অনেক পরিবারে বিবাহের রাত্রে হোম সম্পন্ন না করিয়া পর দিবস করা হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের পক্ষে হোম বিবাহ

রাত্রেই অবশ্যকৃত্য। হোম দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলাম। মিঃ আয়াঙ্গার (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ এবং মিঃ আপ্তের বিশেষ বন্ধু), পাত্রের পিতা বঙ্গদেশে "বৈবাহিক" অবঙ্গদেশে "সম্বন্ধী" মিঃ কালের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। মিঃ কালে বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ঋগ্‌বেদ, অশ্বালয়ন শাখা। মিঃ কালেকে বলিলাম তাঁহাদের দণ্ডকারণ্যে (বম্বে প্রেসিডেন্সি) অথবা তাঁহার "নিজবাসভূমি" কিষ্কিন্ধ্যার সম্বন্ধী শব্দের যে অর্থই ব্যবহৃত হউক না কেন, বঙ্গদেশে সম্বন্ধী শব্দের অর্থ স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; স্বয়ং কালিদাস এই অর্থে সম্বন্ধী শব্দ রঘুবংশে ব্যবহার করিয়াছেন।

মিঃ কালে স্কুলমাষ্টার, কিন্তু পাকা উকীলের ন্যায় কালিদাসের নজীরের ভিন্ন অর্থ করিয়া বলিলেন, কালিদাস "স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা" অর্থে সম্বন্ধী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। ইন্দুমতীর জ্যেষ্ঠভ্রাতার অভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মাতুল কিংবা পিতামহ যে কেহ ইন্দুমতীকে সম্প্রদান করিতেন, তিনিই সম্বন্ধী পদবাচ্য হইতেন। "আমার অভাবে (মিঃ কালের উক্তি) আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিংবা আমার পিতা যদি এই বিবাহ ব্যাপারের কর্তারূপে উপস্থিত থাকিতেন, তিনিই আপনাদের সম্বন্ধী পদবাচ্য হইতেন। তবে আমার সহিত যেরূপ পরিহাস রসিকতা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত তদ্রূপ করা সম্পর্ক বিরুদ্ধ।। ("সম্বন্ধ" শব্দটী কি অবঙ্গদেশে বিবাহ ব্যাপারের "কর্তা" শব্দের সমপর্য্যায় ?)

(৩) বাসর ঘর। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বিবাহে ও বিবাহের পর বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যাওয়ার প্রথা আছে। হোম অন্তে বরকন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে বর ভিন্ন অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং সেখানকার "স্ত্রী-আচার" (মারাঠী উচ্চারণ 'স্ত্রি-য়াচার) কি অত্যাচার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার জ্ঞানলাভ করিতে পারি নাই। শুনিলাম বাসর ঘরে নবদম্পতীকে লইয়া হাস্যকৌতুক করা হইয়া থাকে।

মিঃ আয়াঙ্গার বলিলেন তাঁহাদের দেশেও বিবাহের পর বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে বরকে মধুর সম্পর্কে সম্পর্কিতা স্ত্রীলোকদের হাতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। মিঃ আয়াঙ্গার প্রথমা পত্নীর অভাবে অল্পদিন হইল দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার ভুল হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

ভ্রষ্ট

হে সংসার, খোল তব সহস্রবন্ধন,
ভাবিতে ক্ষণেক মোরে দেহ অবসর;
দিনে দিনে আবিলতা ছাইল ভীষণ
বুঝিব কি ছিল, এবে কি হ'ল অন্তর।
লুপ্ত হৃদয়ের স্বতঃ হরষ-উচ্ছ্বাস,
কি যে কায করি নিত্য নিজেই জানিনা;
মানুষে নাহিক পূর্ব্ব পীরিতি বিশ্বাস
প্রকৃতির সুরে নাহি বাজে হৃদিবীণা।
রবিশশী তারা মেঘ নভোনীলিমায়
অপূর্ব্ব স্বপন আর করেনা সৃজন,
তটিনীর কলতানে, কুসুমশোভায়,
বিহগের গানে নাহি ভুলায় ভুবন।
প্রফুল্ল-পেলব-পূত ফুলটীর মত,
ছিল যাহা, যেন অন্ধযন্ত্রে পরিণত।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেব।

ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কেননা, প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুতি ঘটাই ত মুক্তি; সে বিচ্যুতি ত তাহা হইলে সম্ভবই হইবে না! পুরুষ এবং প্রকৃতি—উভয়ই পরস্পর নিরপেক্ষ, স্বাধীন বস্তু। সাংখ্যকারের এই সিদ্ধান্তে, পুরুষের ভোগ ও মুক্তি এই দুই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ করিতে পারা যায় না;—একথা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি। এখন আবার সাংখ্যকার যে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ হইয়াছে, প্রকৃতিতে ক্রিয়া উপস্থিত হয়;—এই সিদ্ধান্তেও, পুরুষের ভোগ ও মুক্তি সিদ্ধ করিতে পারা যাইবে না। কেননা, এ সিদ্ধান্তেও সেই পূর্ব্বকার প্রশ্নই উপস্থিত হইবে যে—প্রকৃতির এই যে ক্রিয়া ইহা কি পুরুষের ভোগের জন্য, না মুক্তির জন্য? এখানেও, এই প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়া যাইবে না। আমাদের কিন্তু বৈদান্তিক মতে, এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ। কেননা, পরমাত্মার নিজের যে স্বরূপ আছে, সেই স্বরূপটী সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া বা বিকার রহিত। এই নির্ব্বিকার স্বরূপ হইতেই জগতের নামরূপ বিকাশিত হইয়া থাকে, এবং তদ্বারা তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হয় না। আপন মহাশক্তি বিবিধ বিকারে পরিণত হইলেও, পরমাত্মার স্বরূপটীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

আর এক কথা। সাংখ্য মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটী বস্তু যখন তুল্য-বল হইয়া সাম্যাবস্থায় উপনীত হয়; এ সময়ে কোনটীই অপরটী অপেক্ষা অধিক বা ন্যূন থাকে না। ইহাই প্রকৃতির নিজের স্বরূপাবস্থা। এ অবস্থায় কোনটী প্রধান কোনটী অপ্রধান—কোনটী কাহারও অঙ্গীভূত—এরূপ হয় না! কেননা, তাহা হইলে, প্রকৃতির নিজের স্বরূপ নাশের আশঙ্কা হইয়া উঠে। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি না ঘটিলে, প্রকৃতিতে কোন ক্রিয়া বা বিকার উপস্থিত হইতে পারে না। বিচ্যুতি হওয়ার অর্থই এই যে, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব ধারণ করা বা কোনটী অধিক বলশালী, অপরটী হীনবলশালী হইয়া উঠা। কিন্তু কথা এই যে ইহাদের এই স্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটাইবে কে? ইহাদের মধ্যে বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত করাইবার মত বাহিক কোন কারণ ত উপস্থিত নাই! কে ইহাদিগের বলের বৈষম্য জন্মাইল? ইহাদের সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া দিল কে? বিক্ষোভ না উপস্থিত হইলে, 'মহত্তত্ত্বাদি' কার্য্য উৎপন্ন হইবে কিরূপে? সাংখ্য-মতে এ প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যকার একটী কথা বলিতে পারেন। সে কথাটী এইরূপ—কার্য (effect) দেখিয়াই ত কারণের (cause) স্বভাব বা স্বরূপটী কি প্রকার তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ—এই তিনটী বস্তু যখন তুল্য-বল হইয়া—কোনটী কোনটী হইতে ন্যূন বা অধিক নহে এইরূপে—অবস্থান করে—ইহাই সাম্যাবস্থা; ইহাই ত প্রকৃতির স্বরূপ। কিন্তু এই স্বরূপকে নিত্য বলা যায় না। কেননা, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়াই ত পরে প্রকৃতি হইতে মহদাদি বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী বস্তু যে কেহই কাহারও অপেক্ষা রাখে না—এ কথা ত বলা যায় না। ইহারা যে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে—স্ব স্ব প্রধান রূপেই স্থির হইয়া অবস্থান করে,—ইহাও স্বীকার করা চলে না। সত্ত্ব প্রভৃতি বস্তুগুলি যে চঞ্চল স্বভাব—ইহা স্বীকার করিতেই হয়। চঞ্চল বলিয়াই ত উহাদের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হইতে পারে; নতুবা বৈষম্য না জন্মিলে কার্য্য বা বিকার উপস্থিত হইবে কি প্রকারে? সুতরাং, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার মধ্যেই, বৈষম্য-প্রাপ্তির যোগ্যতা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, প্রকৃতির এই চাঞ্চল্য বা বৈষম্যাবস্থা স্বীকার করিলেও, আমরা পূর্ব্বে যে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহা হইতে সাংখ্যকার কিরূপে নিস্তার পাইবেন? আমরা বলিয়াছিলাম, প্রকৃতি যখন অন্ধ জড় শক্তি; উহাতে যখন কোন চেতন জ্ঞানবান পদার্থের উপস্থিতি নাই, তখন কিরূপে অন্ধ জড় শক্তি এই বিচিত্র জগৎ

রচনা (Orderly arrangement of the World) করিতে সমর্থ হইবে? আর যদি জগতের এই বৈচিত্র্য (orderly arrangement) দৃষ্টে সাংখ্যকার জগতের মূলে কোন সজ্ঞান পুরুষের অস্তিত্ব অনুমান করেন; তবে ত সাংখ্যকার আমাদের দলেই আসিয়া পড়িবেন! কেন না, আমরা ত এই বহু বিচিত্র জগতের উপাদানরূপে চেতন ব্রহ্মকেই স্রষ্টা বলিয়া থাকি। আর এক কথা এই যে, যদি প্রকৃতির সাম্যাবস্থার মধ্যেই, সত্ত্ব রজঃ তমঃ—দ্রব্যগুলি ন্যূনাধিক-ভাবে পরস্পরের সম্বন্ধে আসাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, এই প্রকারে কোন্ হেতু বশতঃ উহারা ন্যূনাধিক হইয়া পরস্পরের সম্বন্ধে আসিবে, তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর, যদিই বা ন্যূনাধিক হইয়া পরস্পর সম্বন্ধে আইসে, তাহা হইলেও, চিরকালই উহারা ঐ প্রকার সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকুক্—এ আপত্তিও উপস্থিত হইবে। কেন না, সাংখ্য মতে, বৈষম্য প্রাপ্তির কোন একটা স্বতন্ত্র কারণ ত নির্দ্দেশিত হয় নাই।

আমরা এই সকল কারণে, সাংখ্যমতের নানা প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং সাংখ্যাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত অন্তঃসারশূন্য। আবার সাংখ্যাচার্য্যগণের মধ্যে, বিরোধী সিদ্ধান্তেরও অভাব নাই। উঁহাদের এক একজনের এক এক রকমের সিদ্ধান্ত। কাহারও মতে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সাতটী; কখনও বা একাদশটী। কেহ বা চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে এক ত্বগিন্দ্রিয়েরই পরিণতি বলিয়া মনে করেন। কাহারও মতে, মহত্তত্ত্ব হইতেই পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে; কেহ বা অহঙ্কার-তত্ত্বকেই উহাদের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বা বলেন, অন্তরিন্দ্রিয় তিনটী মাত্র; কাহারও মতে অন্তরিন্দ্রিয় মাত্র একটী। শেষোক্ত সিদ্ধান্তে অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধিকে—বুদ্ধিশব্দ দ্বারাই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সাংখ্য সিদ্ধান্তটী যে শ্রুতির একান্ত বিরোধী সিদ্ধান্ত, একথা বোধহয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। কেন না, চেতন পরমেশ্বরই এই জগতের মূল কারণ—ইহাই ত শ্রুতির একমাত্র সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাংখ্যকার অচেতন জড় প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এই সিদ্ধান্ত কেবল যে শ্রুতিরই বিরুদ্ধে যাইতেছে তাহা নহে। ইহা স্মৃতিশাস্ত্রেরও বিরোধী সিদ্ধান্ত। কেন না, স্মৃতিমাত্রেই শ্রুতিরই একান্ত অনুগত।

এই সকল কারণে আমরা সাংখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষপাতী হইতে পারিতেছি না।

সাংখ্যকার, বেদান্তের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। এখন আমরা সেই আপত্তিটী কি প্রকার এবং তৎ সম্বন্ধে বেদান্তেরই বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত কিরূপ, সেইটী দেখিতে অগ্রসর হইব।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

দাবী

(গল্প)

"মিনু!"

"বাবা!"

"কৈ মা? কাছে এস।"

"আমি কাছেই ত রয়েছি আপনার।"

"মেনকা, মা আমার!"

"কেন বাবা আপনি অমন করছেন? বড় কষ্ট হচ্ছে কি?"

"বড় যাতনা, মা,—বড় যাতনা। কে জানে এ যাতনার সমাপ্তি কোথায়! জান কি মেনকা, আজ আমার বুকের মাঝে এ আগুন জ্বাল্‌লে কে? সেই অকৃতজ্ঞ, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর—সেই শুধু তা'রি জন্যে যে, তা'রি জন্যে আজ আমার বুকের মধ্যে এ হাহাকার!"

মেনকা বলিল, "কেন আপনি ওসব কথা ভাবছেন বাবা? একটু ঘুমান না।"

"ঘুম? হাঁ মা, ঘুমাব—বেশ ঘুমাব—বড় গভীর নিদ্রায়—নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে ঘুমাব।"

শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ জ্যোৎস্না তখন ডুবিয়া গিয়াছে। যে মেঘখানা আকাশের একপ্রান্তে এতক্ষণ পড়িয়াছিল, সে এবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া প্রায় অর্দ্ধ আকাশ জুড়িয়া বসিল। ঘরে বাহিরে তখন এক বিশ্বব্যাপী বিরাট অন্ধকার অবস্থান করিতেছিল। ঘন বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী সেই সুনিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারের মত সুদূর বিস্তৃত। দুই একটা নারিকেল গাছ সেই বৃক্ষ প্রাকারের মধ্য হইতে তাহাদের অন্ধকারময় সুদীর্ঘ মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সহসা তাহাদের দিকে চাহিলে মনে হয়, বুঝি তাহারা কোন প্রেতলোকের অধিবাসী; এ অন্ধকার রাজ্যের অন্ধ তমসাবৃত দুর্গের অজেয় প্রহরী। রাত্রি গভীরা নিস্পন্দা। পৃথিবী বিভীষিকাময়ী।

অন্ধকারময় গৃহটির এক কোণে ক্ষুদ্র একটি আলোক, সে আঁধারে, ক্ষুদ্র তারকার মত মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারই মাঝে মুমূর্ষু সতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে—তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা।

২

সতীশচন্দ্র যখন পিতৃমাতৃহীন শিশু অমরনাথকে বুকে তুলিয়া লইয়া গৃহে আসিয়া পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "এই নাও, এটি আজ থেকে তোমারি হ'ল। এতদিন বড় দুঃখ করছিলে, তাই ভগবান এটিকে তোমার কোলে তুলে দিলেন।"—তখন অভাগা পিতৃমাতৃহারার প্রতি করুণা ও সমবেদনায় মহামায়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি দুই হাতে শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন।

শিশুটিও এতদিন মায়ের স্নেহের আঁচল খানির নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল; একটা দমকা ঝড়ে তাহাকে কঠিন ভূমির উপর শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই যখন মহামায়া তাহাকে ধূলা ঝাড়িয়া বক্ষে তুলিয়া লইলেন, সেও যেন পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরস্থল বোধে প্রাণপণে তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া ডাকিল, "মা!"

মহামায়ার নারী বক্ষ তখন এমনি একটি শিশুর সুকোমল স্পর্শের জন্য তৃষাতুর হইয়াছিল; একটি শিশু-মুখের মা বুলি শুনিবার জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিতেছিল। শিশু যখন সমস্ত হৃদয় দিয়া মা বলিয়া ডাকিল তখন তাঁহার ক্ষুধিত মাতৃহৃদয় এক অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল।

তাহার পর এই নিঃসন্তান দম্পতীর অতুল স্নেহের

বালক অমরনাথ যখন আট বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন মহামায়ার একটি কন্যা জন্মিল।

কন্যাটি জন্মিবার পূর্ব্বে মহামায়া বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন, "ভগবান! এ অসময়ে নূতন করিয়া আবার এ কেন? তোমার করুণার দান অমুই যে অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে! এ যে আমার অমুর প্রতি অন্যায় করা হয়, দয়াময়!"

কিন্তু যেদিন ফুল্লকুসুম তুল্য একটি কন্যা আসিয়া ক্রোড়ে আশ্রয় লইল. সে দিন পতিপত্নীর মনে আর এক নূতন আশা জন্মিল। নিঃসঙ্গ অমরনাথও এই ক্ষুদ্র সঙ্গীটিকে পাইয়া প্রফুল্ল হইল।

এমনি পরিপূর্ণ আনন্দে তাঁহাদের সংসারটি চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে মহামায়ার আর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল।

যে দিন সংবাদ আসিল অমরনাথ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে দিন আনন্দে সতীশচন্দ্রে ও মহামায়ার চক্ষে জল আসিল। তাঁহাদের কত স্নেহের অমু আজ নিজেকে দশের নিকট পরিচিত করিতে কত কষ্ট, কত শ্রমই না স্বীকার করিয়াছে!

তাহার পর অমরনাথ কলিকাতায় পড়িতে গেল। যাইবার সময় মাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার চোখের জল আর কিছুতেই বাধা মানিল না। মহামায়াও মুহুর্মুহুঃ চোখ মুছিতেছিলেন, এইবার উহা বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার ন্যায় বহিয়া গেল।

কন্যা মেনকা যখন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল, তখন মহামায়া স্বামীকে বলিলেন, "আর কেন? এইবার ওদের দুটিকে এক কোরে দাও। আর আমাদেরও ত সময় হয়ে এল, এইবার সংসারের ভার ওদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। তার'পর মণ্টুর ভার, সে ভার অমুই নেবে; তার জন্যে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আর কিছু দিন যেতে দাও, মহামায়া। অমরের আগে পড়াটা শেষ হয়ে যাক, তার পর হবে। অমরের ইচ্ছা আইন পরীক্ষাটা পাশ করে। আমারও ইচ্ছা তার পরেই বিবাহ দিই। আর এ মিলন ত হয়েই আছে। তুমি এ বিষয়ে আর কিছু ভেব না।"

এমনি করিয়া তাঁহারা দুই জনে যে সুখের আকাশ-কুসুমে মালা গাঁথিতেছিলেন, অকস্মাৎ একদিন তাহা প্রবল ঝঞ্ঝা বাত্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া গেল। অমরনাথের শিক্ষা সমাপ্তির পর যখন সতীশচন্দ্র ও মহামায়া দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় অমরনাথ তাহার এক বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী গিয়া তাহার বন্ধুর জন্য নির্ব্বাচিত কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া ফেলিল।

বর যখন সভাস্থ হইল তখন বরের বাপ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে, কোন্ মান্ধাতার আমলে নাকি কন্যার পিতৃকুলে কি দোষ হইয়াছিল। তিনি এ কথা জানিতেন না, এখন এই কথা জানিতে পারিলেন সুতরাং এ স্থলে পুত্রের বিবাহ দিতে একেবারেই অপারগ।

কন্যার পিতা ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কন্যাপক্ষের অনেক সাধ্য সাধনায় বরের পিতা রায় প্রকাশ করিলেন যে, কন্যার পিতা আরও হাজার টাকা যদি তাঁহার উচ্চ কুল-মর্য্যাদা স্বরূপ দিতে পারেন, তবেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিবেন, নচেৎ নহে।

তখন সে বিবাহ প্রাঙ্গণে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কন্যা পক্ষের পুনর্ব্বার বহু সাধ্য সাধনা, অনুনয় বিনয়ের ফলে বরকর্ত্তা বলিলেন, "আচ্ছা, হাজার টাকা না দাও, ত—পাঁচ শো।"

কন্যার পিতা যোড় হস্তে বরকর্ত্তার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন যে, এই বিবাহের তিন হাজার টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে অনেক খানি বেগ পাইতে হইয়াছে। অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সকলই গিয়াছে। আছে কেবল স্থাবর সম্পত্তি, এই ক্ষুদ্র বাস্তুটুকু; এ টুকুও যাইলে স্ত্রী পুত্র সহ তাঁহাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে।

তাঁহার এ কাতর অনুনয়ে বরের বাপের মন একটুও টলিল না। অটলভাবে তিনি বলিলেন, ইহা ছাড়া কিছুতেই তিনি ছেলের বিবাহ দিতে পারেন না।

এ দিকে পুরোহিত উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, "আর দেরি করা নয়, লগ্নভ্রষ্ট হয়, বর নিয়ে আসুন।"

তখন কন্যার পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আরও পাঁচ শো টাকাই দিব, তবে এখন ত আর কিছুই নাই, কয়েক দিন সময় দেওয়া হোক।"

বরকর্ত্তা বলিলেন, "না, সে আর হয় না।" তাঁহাদের জুয়াচুরি তিনি সকলি বুঝিতে পারিয়াছেন, আর তিনি শুধু মুখের কথায় ভুলিবেন না। পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উঠে পড়হে মোহিত, চল, আমরা যাই।"

ভিতরে নারী মণ্ডলী পুত্তলিকার ন্যায় এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের হাতের শঙ্খ হাতে, মুখের উলুধ্বনি মুখে নিরুদ্ধ ছিল, এইবার সেখান হইতে করুণ ক্রন্দন উত্থিত হইল।

অমরনাথ এতক্ষন নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। এই বার বর যখন পিতার আহ্বানে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন বজ্রাঘাতে বৃক্ষসঙ্কুল বনস্থলী যেমন নিঃশব্দে জ্বলিয়া উঠে, ঠিক তেমনি করিয়াই তাহার সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আপনাদের যদি অনভিপ্রেত না হয় তাহা হইলে আজিকার এ বিবাহের বর—আমি।"

অমরনাথের অপর কয়েকজন বন্ধু আসিয়া বলিল, "যে পাত্র আপনারা নির্ব্বাচন করেছিলেন তার চেয়ে এ পাত্র অনেক অংশেই শ্রেষ্ঠ, আর কুলে শীলেও আপনাদের স্বঘর।"

অমরনাথ নীরবে গিয়া বরের জোড় তুলিয়া লইয়া পরিয়া বরাসনে উপবিষ্ট হইল। তুমুল রবে হুলু ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া নারীগণ আসিয়া বরকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

বিবাহের পর দিন অমর যখন তাহার কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে ধ্বনিত হইতেছিল, সে করিল কি—এ? কাহার আসনে কাহাকে আনিয়া বসাইল? এ বিবাহ কি তাহার নিকট একটুও লোভনীয় ছিল? মন তার সজোরে বলিয়া উঠিল, না না না। এ হৃদয় যে বহুদিন আগেই মেনকার কাছে বিক্রীত! সে যে বড় আশায় তা'র হৃদয়-ফলকে বড় সাবধানে, বড় যত্নে মেনকার উজ্জ্বল ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া তাহারই দিকে লোলুপ দৃষ্টি সন্ন্যস্ত রাখিয়াছিল! কিন্তু আজ এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় এই যে লৌহশৃঙ্খলে নিজের কণ্ঠকে কঠোর বেষ্টনে আঁটিয়া ধরিল, জীবনে কি সে কখনও এ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে? কিন্তু না মুক্তি পাইলেও তাহার আর কোন লাভ নাই। জীবনের সমস্ত সুখ শান্তিকে কাল সে নিজের নির্ম্মম হস্তে বিদায় দিয়া আসিয়াছে। যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। তাহাকে দেখিয়া মেনকার ওষ্ঠপ্রান্ত কি গভীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া সে যেন লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া গেল। মেনকা যে তার নির্ম্মল বালিকা-হৃদয়খানি অনেকদিনই তাহাকে দান করিয়া বসিয়া আছে! এই অকৃতজ্ঞের উপরেই তাহার মনে কি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতাই না ছিল! আজ সে তাহার পরিবর্ত্তে কেবল হতাশা ও বেদনা মাত্র প্রতিদান দিল।

আর সতীশচন্দ্র ও মহামায়া?—যখন সে পিতা মাতা হারাইয়া একান্ত অসহায় ভাবে ভূমিতে লুটাইতেছিল, তখন পরম স্নেহে কে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল? এই স্নেহশীল দম্পতীই না? এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্নেহ দয়া না পাইলে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইত কে জানে। আর আজ তাঁহাদের সে প্রগাঢ় স্নেহ কি ভীষণ ঘৃণায় পবরির্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইবে! তাহার সমস্ত শরীর এক দারুণ অবসাদের ভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন লুপ্ত হইয়া আসিল।

৩

দিন কখনও কাহারও, সুখ দুঃখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর মেনকাদের হাহাকার ও আর্ত্ত রোদনের মধ্য দিয়াও দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

সতীশচন্দ্র যে দিন শুনিলেন অমরনাথ বিবাহ করিয়াছে, সেইদিন সেই যে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন, আর তাহা ত্যাগ করিতে হইল না। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। এই আকস্মিক আঘাত তাঁহার সে জীর্ণ দেহ আর বহন করিতে সমর্থ হইল না; তাহা একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে গ্রামখানি নিস্তব্ধ। আষাঢ়ের প্রায় অর্দ্ধেক হইলেও আকাশ একেবারে নির্ম্মেঘ। ধরণীবক্ষে বায়ু সঞ্চরণের আভাসও নাই। গ্রামখানিময় এক বিরাট নীরবতা বিরাজ করিতেছে। ঝোপ ঝাপের পতঙ্গকুলও একেবারে মূক হইয়া গিয়াছে; কেবল কোন্ দূর দিগন্ত হইতে একটা তীক্ষ্ণ স্বর মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিয়া যেন প্রকৃতির ঠিক মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—"ফটিক জল।"

মেনকাদের ক্ষুদ্র কক্ষটির মধ্য হইতে একটা গুঞ্জন শব্দ অঙ্গনের রৌদ্রস্তম্ভিত নিস্তব্ধভাব ভঙ্গ করিতেছিল। ঘরের মেঝের এক পার্শ্বে আঁচল বিছাইয়া মহামায়া শুইয়া আছেন, মেনকা অনিল ওরফে মন্টুর একটা ছেঁড়া জামা লইয়া সেলাই করিতে বসিয়াছে, ও কিছু দূরে অনিল একখানা রামায়ণ লইয়া পড়িতেছে।

মেনকা এতক্ষণ এক মনে সেলাই করিতেছিল, ভ্রাতার কণ্ঠস্বর যে কখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা জানিতেও পারে নাই। হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, অনিলের কোলের উপর খোলা বইখানা পড়িয়া আছে, আর তাহার ডান হাতের একটা আঙ্গুল মুখের মধ্যে পুরিয়া, খোলা জানালা পথে রৌদ্র ঝলসিত সুদূর নীলিমা প্রান্তে বড় চোখ দুটি মেলিয়া একদৃষ্টে সে চাহিয়া আছে।

মেনকা ডাকিল, "অনিল!"

চমকিয়া উঠিয়া অনিল উত্তর দিল, "কি দিদি?"

"চুপ করে রয়েছিস যে, পড়ছিস না?"

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনিল বলিল, "এই যে পড়ছি"—বলিয়া আবার সে পুস্তকে মন দিল; কিন্তু কি একটা অজানিত বেদনায় তাহার দীর্ঘ নেত্রপল্লব গুলি জলে ভরিয়া উঠিল। বাঁ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ দু'টাকে বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল—

"শূন্য রাজ্য আছে, তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে॥
কাটিলে কদলী যেমন ভূমেতে লোটায়।
ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়॥"—

সহসা পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া হতাশাক্লিষ্ট স্বরে অনিল বলিল, "আজ আর পড়তে পারছিনা, দিদি,—আজ থাক।"

সেলাইটা ফেলিয়া রাখিয়া, মেনকা উঠিয়া আসিয়া স্নেহের ভাইটিকে কোলে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, এবং নীরবে তাহার কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময়ে অনিল তাহার সাগ্রহ দৃষ্টি দিদির মুখের উপর স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা দিদি, মানুষ মরে গেলে কোথায় যায়?"

মেনকা গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিল, "স্বর্গে।"

"আচ্ছা দিদি, স্বর্গ কোথায়? সে কি ঐ আকাশের ওপরে?"

"কি জানি ভাই; হবেও বা—আমি ত জানিনা ঠিক।"

"দেখ দিদি, অজিত সেদিন বলছিল, মানুষ মরে নাকি ঐ আকাশে গিয়ে নক্ষত্র হয়ে থাকে। হ্যাঁ দিদি, সত্যিই কি তাই? কিন্তু অমর দাদা বলেন, নক্ষত্রগুলো না কি এক একটা পৃথিবী। আচ্ছা দিদি, অমর দাদা

কতদিন হয়ে গেল আর আসেন না কেন? অমর দাদা বলেছিলেন, আমি বড় হলে আমায় কলকাতায় পড়তে নিয়ে যাবেন। এই ত দিদি আমি বড় হয়েছি।" —দিদির তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে চমকিয়া অনিল থামিয়া গেল।

দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে মেনকা কহিল; "তোমায় কতবার বলব, অনিল? তিনি আর আসবেন না: তাঁর কথা তায় বোল না।"

বালক অনিল একবার তাহার ছল ছল নেত্র দিদির সেই জ্বালাপূর্ণ চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সভয়ে তাহা নামাইয়া লইল।

মেনকা নিজের রূঢ়তায় নিজেই ব্যথিত হইল। আর কেন সে সব ভাবনা? মনের সঙ্গে তার ত রফা হইয়াই গিয়াছে। তবে এ দুর্জ্জয় অভিমান কাহার উপরে? সেই হীনচিত্ত বিশ্বাসঘাতকের উপরে? প্রবল আত্মধিক্কারে মন তাহার পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে এতবড় নিষ্ঠুর আঘাত দিতে পারিল, যাহার জন্য স্নেহময় জনককেই হারাইতে হইল, সেই তাহারই ভাবনা ভাবিয়া কিনা সে তাহার স্নেহের ভাইটির প্রাণে আঘাত দিতেছে! অনুতাপের অঙ্কুশাঘাতে শিহরিয়া, মেনকা তাড়াতাড়ি সম্মুখবর্ত্তী বিবর্ণ মুখখানা বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার শুভ্র ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকখানি স্নেহ ঢালিয়া চুম্বন করিল।

বালক তাহার এই অপরাধের পরই এতখানি আদরের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। দিদির সেই সজল গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কেমন আপনা আপনি তাহার মনে দিদির প্রতি একটা প্রবল সহানুভূতি আসিয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া একটি যুবক সেই বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মা!"

অনিল ছুটিয়া গিয়া, তাহার দুইটি ক্ষুদ্রহস্তে যুবককে বেষ্টন করিয়া, আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "দাদা!"

যুবককে দেখিয়াই মেনকার সেই গম্ভীর মুখ ঘৃণা মিশ্রিত বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণপরেই তাড়াতাড়ি আপনাকে সংযত করিয়া প্রায় ছুটিয়াই, পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতরে আসিয়া অমর ডাকিল, "মা!"

"কে রে, অমর? এতদিনে বুঝি মা বলে মনে পড়ল তোর? দুঃখিনী মা যে তোর, এখন একমাত্র তোকেই আশ্রয় করতে চায় রে! সেই মার কথা তুই এমনি করেই ভুলে যাচ্ছিস, বাবা?"—বলিতে বলিতে মহামায়া উঠিয়া বসিলেন।

পরম স্নেহে অমরনাথের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া আপনা আপনি তাঁহার বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ভাল আছিস ত, অমু? তোকে এমন দেখাচ্ছে, কেন?"

অমরনাথ তখন মহামায়ার পদপ্রান্তে গিয়া বসিয়া পড়িল। মহামায়া তাহার মস্তক ও মুখের উপর স্নেহ-কম্পিত হস্ত বুলাইতে বুলাইতে প্রশ্ন করিলেন, "এত রোগা হয়ে গেছিস কেন, অমু? তোর কি সেখানে কোন অসুখ করেছিল?"

"অসুখ? না,—অসুখ ত করেনি, মা! তবে ভালও ছিলাম না। তুমি যে আর আমায় তোমার পায়ে জায়গা দিচ্ছনা, কেবলি দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, এযে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আমায় দূরে তাড়িও না, মা।"

"ওরে তোকে আমি দূরে সরিয়ে দেব? তুই আমার সেই অমু, যাকে আমি নিজের পেটের সন্তান বলেই পরিচয় দিয়েছি লোকের কাছে!"—বলিতে বলিতে মহামায়ার রুদ্ধ ক্রন্দন সবেগে মুক্ত হইয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিল।

"মা! মা! মাপ কর আমায়।"—বলিয়া অমরনাথ বালকের ন্যায় তাঁহার কোলের উপর মুখ রাখিয়া শুইয়া পড়িল। "মা, বড় দুঃখ হচ্ছে, তোমাদের কোন কাযেই লাগলাম না! আমার দ্বারা কিছুই হ'ল না তোমাদের, এমন অভাগা আমি! কেন এমন

অকৃতজ্ঞকে পুষেছিলে, মা? তখন কেন মেরে ফেল নি?"

"কেন কাযে লাগবে না, বাবা? এখন তুমিই যে আমার সব। অনিলকে মানুষ করবার ভার যে এখন তোরই হাতে। যা হ'ল না, হবে না, সে চিন্তা আর আমি করব না। এখন আমি যে তোকে নিয়েই সুখী হতে চাই।"

"আচ্ছা মা, সত্যই কি তুমি আমার এতবড় অপরাধ ক্ষমা করতে পেরেছ?"

"ওরে অবোধ ছেলে,—তোকে ক্ষমা করব? কি করেছিস তুই যে তোকে ক্ষমা করতে হবে? আর যে রাগ করে করুক অমু, এ তুই বেশ জানিস যে আমার তোর 'পরে কোন রাগ নেই। যে দিন শুনলাম তুই সেই অসহায়দের মান রক্ষা করেছিস সে দিন আমার মাথাটা কি গর্ব্বেই উঁচু হয়ে উঠেছিল! আর কেউ তোকে না চিনুক, কিন্তু আমার কাছে কি তোর কিছু লুকান থাকতে পারে? আমি যে তোর মা। তোর মধ্যে যে কতবড় মহত্ত্ব বাস করছে তা কি আমার অজানা আছে রে! আর ক্ষমা—তিনিও ত তা তোকে করে গেছেন। যাবার দিনে তোর সামনে সর্ব্বান্তঃকরণেই তোকে ক্ষমা করে গেছেন। তবে তুই দুঃখ করছিস কেন, অমু?"

"মা!" মেনকার তীব্র আহ্বানে উভয়ে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। অমর দেখিল, মুক্তদ্বারপথে শিল্পীর নিখুঁত হস্তনির্ম্মিত দেবী প্রতিমার ন্যায় অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, মেনকা।

মেনকা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "মা, এই যে তোমরা বাবার অবর্ত্তমানে তাঁর অমতে কায করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছ, একি তাঁর স্মৃতিকে অপমান করা হচ্ছে না?"

মা বলিয়া উঠিলেন, "তুই আর জ্বালাস নে, মেনকা! তিনি শেষ দিনে কি বলে গিয়েছিলেন তা কি তুইও নিজে শুনিস নি।"

"শুনেছি বই কি মা, খুব শুনেছি। তবে তোমরা তাকে অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিয়েছ, কিন্তু আসলে সেটা তা নয়। সেটা হচ্ছে, তাঁর শেষ সময়ের বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র।"—বলিয়া দৃঢ়পদে মেনকা চলিয়া গেল।

অমরনাথ স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া, সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল, এবং একটু ত্রস্তস্বরে—"মা, আমি এখন যাই, আবার আসছি একটু পরে।"—বলিয়া চলিয়া গেল।

অমরনাথ যে মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছিল, সেই ক্ষীণাঙ্গ বালিকাটি বিবাহ রাত্রের সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে বিবাহ মণ্ডপেই সেই যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সে লুপ্তজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আর ফিরিয়া আসে নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই মেয়েটি অমরনাথকে মুক্তি দিয়া, জগতের সমুদয় অত্যাচার অবহেলা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

তারপর অপরাধী অমরনাথ নিজের কলঙ্ককাহিনী প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে বাড়িতে আসিয়া যাহা দেখিয়াছিল, তাহাতে নিজেকে আর কোন মতেই সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহার জীবনদাতা, অন্নদাতা, স্নেহময় পালক পিতা সেদিন তাহারই নির্ম্মম আঘাতে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাই কথাটা প্রকাশও করে নাই।

৪

চাঁদের আলোয় সমস্ত চরাচর ডুবিয়া গিয়াছে। সেই উজ্জ্বল আলোকে আকাশ ভরা নক্ষত্র দীপ্তিহীন দেখাইতেছে। ফুরফুরে হাল্কা বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে। সেই মেঘমুক্ত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ছাদে বসিয়া মেনকা অনিলকে গল্প বলিতেছিল। গল্পের রাজপুত্র তখন জরির পোষাক পরিয়া, মতির মালায় সজ্জিত হইয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার উপর চড়িয়া, পৃথিবীর কোন্ সেই শেষপ্রান্তে, সাত শো রাক্ষসের দেশে ঘুমন্ত পুরীর রাজ কন্যার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।—

অনিল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছিল। এক অজানিত আশঙ্কায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া

উঠিতেছিল—না জানি, কেমন করিয়াই সেই অসম সাহসী রাজপুত্র তালপাতার খাঁড়ায় সাত শো রাক্ষসের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, সোনার কাটির স্পর্শে নিদ্রিত রাজকন্তার ঘুম ভাঙ্গাইবে।

এমন সময় অমরনাথ আসিয়া অনুচস্বরে ডাকিল, "মেনকা!"

সচকিতে ফিরিয়া মেনকা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন?"

এ কেনর উত্তর আর অমরনাথ সহজে দিতে পারিল না। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মেনকা বলিল, "তোমার বলবার কিছু থাকে—বল।"

বলিবার তাহার অনেক আছে; কিন্তু এরূপ আদেশ জ্ঞাপকের কাছে, এমন স্পষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে ত তাহা বলিয়া উঠা যায় না। অমরনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সত্যই কি মেনকা আমার কোন সাহায্য নেবে না?"

"না।"

চমকিয়া উঠিয়া আশাহত ভাবে অমরনাথ বলিল, "জিজ্ঞাসা করতে পারি কি,—কেন?"

"তা'ও কি আবার তোমার মতন লোককে বুঝিয়ে বলতে হবে? তুমি আমাদের কে? তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি যে তোমার সাহায্য নেব? আর আমাদের এখন অভাবও ত কিছু হয় নি। যখন সে দরকার হবে, তখন তোমার দোরেও ভিক্ষা চাইব বই কি।"

অমর বলিল, "রক্ত সম্বন্ধটাই কি সব চেয়ে বড় হ'ল, মেনকা? ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, এ সব কি কিছুই নয়? যে অন্ন শরীরে গিয়ে রক্তে পরিণত হয়, এ যে তা'রই সম্বন্ধ, মেনকা!"

"সে তুমি যাদের কাছ থেকে উপকার পেয়েছ, তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে পার, আমার নয়।"

"বেশ, তবে তাই হো'ক, মেনকা! অনিলকে মানুষ করবার ভার আমার হাতে দাও।"

মেনকা অমর নাথের প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া রোষে তীব্র কণ্ঠে কহিল, "না, তা' হ'তে পারে না। অনিলের সব ভার বাবা আমার উপরেই দিয়ে গেছেন। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তোমার কাছ থেকে কোন সাহায্য নেব না। তোমার কি আর কিছু বলবার আছে?"

"বুঝেছি মেনকা,—আমার উপস্থিতিও আর তুমি সহ্য করতে পারছ না। ক্ষমা কর, মেনকা। একটা কথা বলি—যার জন্মে আমার উপর তোমার এই বিরাগের সৃষ্টি, একবার তুমি ভাবলে না যে, আমি কত—"

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি মেনকা বলিল, "তুমি কেন মিছে সে সব ভাবনা ভাবছ? আমার মনে সে জন্যে কোন ক্ষোভ নেই।"

"সত্যই কি, মেনকা,—তাই?

"হ্যাঁ।"

"তবে কেন তুমি আমার এ কঠোর শাস্তি বিধান করছ? বল মেনকা, সত্যই কি আমার উপরে তোমার কোন রাগ নেই?"

অস্থির কণ্ঠে মেনকা কহিল, "তবে শোন। একথা তুমিও বোধ হয় জান যে, তোমাকে আমি দেবতার মত বোধ করে চিরদিনই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এসেছি। তোমার মহত্বে নিজেকে তোমার পদতলে বিকিয়ে দিতেও কোন দিন দ্বিধা বোধ করি নি। সে শ্রদ্ধা আমার চিরদিন অটুট থাকত; এবং বোধ হয় আরো অনেকখানি উচ্চে উঠত, যদি না তোমার এই সদাশয়তার জন্যে আমার স্নেহময় পিতাকে অকালে হারাতে হত।"—রুদ্ধ ক্রন্দনে মেনকার কণ্ঠ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

অমরনাথ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "মেনকা, তুমি জান না, আমি দিন রাত কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। জানি, আমি তোমাদের কাছে অনেক অপরাধী; সে অপরাধের বোঝা এত বেশী যে, আর আমি বইতে পারছি না। তাই, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা—সে ভার আমার একটু লাঘব

করতে দাও। তোমাদের প্রতিপালন করবার ভার আমায় দাও।"

"না, সে আমি পারব না।"

"কেন পারবে না, মেনকা? এ যে তোমায় পারতেই হবে। তুমি ত জান, তোমার বাবা যাবার সময় আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে গেছেন, এবং তোমাকেও আমার হাতে দিয়ে গেছেন। আমি সে দাবীও ত করতে পারি?"

মেনকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় মুহূর্ত্তে ফিরিয়া, অমরনাথের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, সগর্জ্জনে বলিল, "না, আমাদের উপর তোমার কোন দাবী নেই। যাও তুমি—তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—তুমি আর এসনা; পূর্ব্বের কথা ভুলে যাও। তুমি এই মনে করো, তুমি আমাদের কেউ নও, আমরাও তোমার কেউ নই।

দ্রুত পদক্ষেপে মেনকা নীচে নামিয়া গেল।

৫

সূর্য্যাস্তের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত আকাশকে আজ অকস্মাৎ মেঘে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঊর্দ্ধপথে উড়ন্ত পাখীর দল ভীত ত্রস্ত পক্ষে নিম্নাভিমুখে আপন আপন নীড়ে ফিরিয়া যাইতেছে। বৃষ্টি আসন্ন। গাছ পালা সর্ সর্ শব্দে বৃষ্টিকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। ঝুপ ঝুপ শব্দে বৃষ্টিও আহ্বানকারীদের স্বাগত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। উভয়ের আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। কথায় কথায় তর্কের কোলাহলও আসিয়া পড়িল। পরিতুষ্ট দর্শক সমূহের মুখ নিঃসৃত জয়ধ্বনিবৎ মুহুর্মুহুঃ মেঘগর্জ্জনে আসর জমকাইয়া উঠিল।

এই ঝড় বৃষ্টির সন্ধ্যায় অমরনাথ তাহার ঘরে জানালার নিকটে বসিয়া ছিল। আজ এই মেঘ ফাটা জলের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। অমরনাথ ভাবিতেছিল, তাহার সব ফুরাইয়াছে। কি ছিল, গেলই বা কি? তাহার অনেক ছিল—অনন্ত স্নেহ, অতুল ভালবাসা, সংসারে মানুষ যাহা পাইলে জীবন সার্থক মনে করে তাহার তাহা সকলি ছিল। কিন্তু আজ তাহার সকলি ফুরাইয়া গেল! কাহার দোষে ফুরাইল? সে নিজের খেয়ালে মত্ত হইয়া যে সুখের নীড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে. এখন আর সে নষ্ট নীড়ে ফিরিবার উপায় নাই। এই যে, তাহার ক্ষুধিত, সন্তপ্ত চিত্ত স্নেহ তৃষ্ণায় হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে এ তৃষ্ণা নিবারণ করিবার আর কোন উপায় নাই। সে ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের সে স্নেহ কাটাইয়া আসিয়াছে। এত দিন সে বড় সন্তর্পণে বড় আপনার বোধে বুকের ভিতর সেই মুখখানা আঁকিয়া রাখিয়াছিল। অবসর পাইলেই সেই মুখখানা সম্মুখে আনিয়া কতই না সুখের কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু হায়, এখন আর সে চিন্তাটুকু পর্য্যন্ত করিবার তাহার কোন অধিকার নাই! ভালই হইয়াছে, মেনকা তুমি এই এত বড় অযোগ্যের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি সুখী হও।

পর দিন যখন অমরনাথের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রাত্রের সে ঝড় বৃষ্টি কাটিয়া গিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের স্তর ভেদ করিয়া প্রভাতের সূর্য্য সম্মুখের বাড়ীর দোতলার মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে। সূর্য্যের নবীন রশ্মি শুভ্রতনু শিশুর অকুণ্ঠিত নেত্রপাতের মত জানালা পথে উঁকি মারিতেছে। মহিম আসিয়া সবেগে দরজায় ধাক্কা মারিল—"অমর! অমর! এখনো উঠিসনি নাকি?

অমর দ্বার খুলিয়া দিতেই মহিম ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "আমাদের এই গলিটার মধ্যে ৪৩ নম্বরের বাড়ী খানায় কোথাকার এক জমিদার বাস করছেন, জান ত তাঁকে!"

"হাঁ, তুমিও যেমন জান, আমিও প্রায় সেই রকমই জানি,—তার বেশী বোধ হয় না।"

"তাঁর সেই ছেলেটির খবর কিছু রাখ?"

"না ভাই,—সে ইচ্ছাও নাই, সময়ও নাই। কেন, বল দেখি, সকাল বেলা উঠেই তার খবরের জন্যে এত ব্যস্ত?"

"শুনেছি, বোধ হয় দেখেছিও দুই একদিন,—সেটা যেন একটা মাতাল বলেই মনে হয়। নাঃ, এমন কিছু না; তবে শুনেছি নাকি সম্প্রতি সেই জমিদার নন্দনটির শুভ বিবাহ। তাই বলছিলাম, বরযাত্রী যাবে? যদি তারও কনেটি হাতাতে পার দেখনা একবার চেষ্টা করে।"

অত্যন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া অমরনাথ বলিল, "ক্ষমা দাও ভাই, আর ও সব কথা তুলো না। তা শুনেছিলাম তার স্ত্রী আছে, তবে আবার বিয়ে? তার স্ত্রীটি বুঝি মারা গেছে?"

"না হে, না,—স্ত্রীটি তার বর্ত্তমান।"

বিস্মিতকণ্ঠে অমর কহিল, "তবে?"

"বড়মানুষি সখ।"

"কে মেয়ে দেবে তাকে?

মহিম কহিল, "অমর, সাংসারিক বিষয়ে তুই এখনো একেবারেই অনভিজ্ঞ। বাংলা দেশে কি মেয়ের অভাব? আর সে পাত্রীটি কে তাও আমি জেনে নিয়েছি।"

"তাই নাকি? তা হলে সে বোধ হয় তোমার কোন নিকট আত্মীয়া হবে?"

"নিশ্চয়, তা না হ'লে আর এত সকালে তোমায় খবর দিতে আসি। সে মেয়েটি হচ্ছে আমার বন্ধুবর শ্রীমান অমরনাথের বড় স্নেহের—মেনকা।"

অমরনাথ বিকৃতমুখে সবেগে বিছানার উপরে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মহিম চাহিয়া দেখিল,—দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অমর একটা দারুণ যন্ত্রণাকে সবলে হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। মহিম দুইহাতে অমরনাথকে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিল, "ছিঃ অমর, এখন কি হাত পা ছড়িয়ে কাঁদবার সময়?"

অমরনাথ মুখ তুলিয়া ক্লান্ত ভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমাকে কি করতে বল, তুমি?"

"তুমি কি ভুলে যাচ্ছ, অমর, যে মেনকাকে সেই পাষণ্ডের কবল হ'তে রক্ষা করতে হবে।"

"তুমি ত জান সব মহিম। আমি কি করতে পারি, আমার ক্ষমতাই বা কতটুকু?"

"জানি সব, অমর। তাই বলছি এখন আর মান অভিমান নয়। মেনকাও মনে প্রাণে তোমাকেই চাইছে, কেবল একটা তুচ্ছ অভিমানের বশে নিজেকে এমনি করে বলি দিচ্ছে। আর তুমিও সেই অভিমান নিয়ে বসে থাকবে? একবার ভেবে দেখছ না, পাষণ্ডের অত্যাচারে সেই স্বর্ণলতা কেমন করে শুকিয়ে যাবে!"

আর্ত্তস্বরে অমরনাথ কহিয়া উঠিল, "চুপ কর, মহিম, আমি আর পারছি না। যেমন করে পার মেনকাকে তুমি রক্ষা কর। মেনকা একটা কুচরিত্র মাতালের হাতে পড়বে? তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।"

৬

জীবনের প্রথম প্রভাতে অম্লান হৃদয়মুকুল যখন বিকাশোন্মুখ, তখন সেই অচপল মনের ভিতর যে ছায়া একবার ফুটিয়া উঠে তাহা সহজে বিলীন হইবার নহে। মেনকার অর্দ্ধস্ফুট হৃদয় পদ্মদলে যে প্রভাত রবির তরুণ কিরণ আসিয়া লাগিয়াছিল, সে কিরণ চিরদিনের মতই মেঘে ঢাকা হইয়া গেলেও, সে স্পর্শ কি মেনকা—এত শীঘ্র ভুলিতে পারে? কিন্তু না, ভুলিতেই হইবে। সেই ভণ্ড প্রবঞ্চককে আর এতটুকুও শ্রদ্ধা দেওয়া যাইতে পারে না। একদিন যে তাহাকে ভক্তি অর্ঘ দান করা হইয়াছিল, সেই লজ্জাজনক স্মৃতিটাকে মন হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এজন্য যাহা করিতে হয় সে তাহাতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু হায়, মুখে বলা যায় বটে, কাযে হয় কৈ? কতবার অপমানিত চিত্ত নিজেকে কঠোর তিরস্কার করিয়াছে, আবার বুঝাইয়াছে, কিন্তু মন বোঝে কৈ? মা তাহার বিবাহের জন্য যতই অস্থির হইয়া উঠেন, ততই তাহার মন বলিয়া উঠে,—

"সে যেমন করিল তুইও কি ঠিক তেমনি করবি? তা হলে কি শাস্তি দেওয়া হ'ল তাকে?"

মহামায়া মেয়েকে যখন অমরের সহিত বিবাহে কিছুতেই রাজি করাইতে পারিলেন না, তখনি আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে মেয়ের বিবাহের চেষ্টা দেখিতে হইল। অবশ্য মেয়ে তাহাতে রাজি নয়। তাহার ইচ্ছা, সে চির ব্রহ্মচারিণী অবস্থায় জীবন কাটাইয়া দেয়; কিন্তু তিনি ত তাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না। আবার পাড়ার পাঁচজনের তাগিদে সময়ে সময়ে সে চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু বিবাহ বলিলেই ত আর বিবাহ হয় না। বাংলাদেশে বরনামধারী অমূল্য-রত্ন অনেকই আছে, কিন্তু সে সব দিকে তাকাইবার ত মহামায়ার সাধ্য নাই। মেয়ে সুন্দরী,—হলই বা সুন্দরী,—সৌন্দর্য্য লইয়া কি ধুইয়া খাইবে? আর লোকে ছেলের বিবাহ দিয়া ত বৌকে আলমারিতে সাজাইয়া রাখিবে না। কাযেই বধূর রূপের পরিবর্ত্তে যদি পাঁচ দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেটা কেই বা ছাড়িতে পারে? কিন্তু মহামায়ার যখন দিবার মত কিছুই নাই, তখন শুধু মেয়ের রূপের বাহার দিয়া কেমন করিয়া একটি পাঁচ হাজারী জামাই খরিদ করিবেন? সম্বন্ধ অনেকই জুটিল, তবে সেই সকলের মুখে একই বুলি,—"মেয়েটি একটু বড় হয়ে পড়েছে, আর একেবারে ডোমের চুপড়ী ধোয়া; মেয়েটিকে নিতে ছেলের মা কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না।"

পুত্র, পুত্রবধূ, বিধবা কন্যা থাকা সত্ত্বেও গৃহহীন হওয়াতে পুনরায় গৃহলক্ষ্মীর সন্ধানে ফিরিতেছে এমন একটি পাত্র জুটিয়াছিল। তাহারা শুধু মেয়ের রূপ দেখিয়াই লইয়া যাইবে। কিন্তু মহামায়া যখন মেয়ের মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া কঠিন স্বরে কহিলেন—"তুমি যাও, ঘটক ঠাকুর! আমার মেয়ের বিয়ে আমি দেবনা। ও চিরদিন এমনি করে আমার বুকের মধ্যেই থাকবে, আর কোথাও যেতে দেব না ওকে।"—তখন কাযেই ঘটকঠাকুরকে সেখান হইতে সরিয়া পড়িতে হইল।

ক্রমে যখন মেয়ের বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া মহামায়া শয্যা লইলেন, মেনকা যখন বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিল যে মা আর বেশী দিন বাঁচিবেন না, তখন যন্ত্রণা নিপীড়িত বক্ষে মোচড় দিয়া ব্যাকুল প্রাণটা কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে অভাগী, তুচ্ছ অভিমানের বশে তুইও কি নিজের মাকে মারিয়া ফেলিবি? মায়ের প্রতি এই একমাত্র শেষ কর্ত্তব্য, তাও সমাধা করিতে পারিলি না? নিজে সুখী হইয়া মাকে একটু সুখী করা—এও তোর দ্বারা হইল না?"

তাই আজ তাহার সেই বিবাহ-বিতৃষ্ণ চিত্তকে বিবাহের জন্য এখনি উন্মুখ করিয়া তুলিল যে, কাণা হউক, খোঁড়া হউক, কিছুতেই অরাজি নয়। তখন এমন ইচ্ছা হইতেছিল যে সে নিজকে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও বেচিয়া আসে। তাই যখন ঘটকঠাকুর আবার সে দিন মেনকার বরের সন্ধান লইয়া আসিল, তখন মেনকা মাকে কথা কহিবার অবসর মাত্র না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি যাও, ঘটকঠাকুর, তাঁদের বলগে বিয়ের ঠিকঠাক করতে। আমি বলছি, ঐ খানেই বিয়ে হবে।"

মহামায়া আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "একি করলি, মেনু? এমনি করে তুই আমায় মেরে ফেলবি?"

মেনকা তখন কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কেন মা তুমি এমন করছ? আমার মনে কোন দুঃখ নেই। আর তুমি ত জান যে, এর চাইতে আমাদের ভাগ্যে বেশী ভাল জুটবে না।"

"ওরে দরকার নেই তোর বিয়েতে। আমি বলছি, এমনিই থাক্।"

"কি যে তুমি বল, মা! তুমি আর কটা দিন? তারপর কেমন করে আমি নিজের কুলধর্ম্ম বজায় রেখে যেতে পারব? কে আমাকে রক্ষা করবে?"

মেনকার ভাবী বরটি কোথাকার এক জমিদারের

পুত্র। সে সেদিন মেনকাদের এই ক্ষুদ্র গ্রাম খানিতে বেড়াইতে আসিয়া ঘাটের পথে মেনকার অসামান্য রূপরাশি দর্শন করিয়া মুগ্ধচিত্তে গৃহে ফিরিয়াছিল। তাহার পরই ঘটক আসিয়া উপস্থিত।

ঘটক বলিল, "সতীন হবে, তা হলই বা সতীন। সেটা একটা কাল পেঁচা। তাকে নিয়ে কি ঘর করেন, না তার দিকে চেয়ে দেখেন? আর এই রূপের ডালি মেয়ের কাছে সে আমল পাবে মনে করেছ? তুমি কিছু ভেব না, মা—মেয়ে তোমার রাজার রাণী হবে।"

মেনকার বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল, আর মেনকার মুখে আশাহীন বেদনার নিদারুণ চিহ্ন সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহের দিন যতই নিকটে হইতে লাগিল, মন ততই কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "হে ভগবান, রক্ষা কর আমায়! আমার জীবন এমন করে অভিশপ্ত করে দিও না!" আবার মনকে চোখ রাঙাইয়া বলে, "মা যে তোর এতে অনেক খানি সুখী হয়েছেন। তুই কি তাঁর এ সুখেই বাদ সাধবি?"

সত্যই কি মা সুখী হইয়াছেন? হাঁ, হইয়াছেন বৈ কি। সেই তো সে দিন অমরনাথের বন্ধু মহিম আসিয়া মায়ের কাণে কি নিশ্চিন্ততার মন্ত্র পাঠ করিয়া গিয়াছে, সেই হইতে তাঁহার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার বহুদিনের অধিকৃত রোগশয্যা ছাড়িয়া সেই দিনই উঠিয়া বসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া মেনকা জানিয়াছিল, মহিম আসিয়াছে মেনকার ভাবী বরের বাড়ীর কি একটা সংবাদ লইয়া।

বিবাহের দিন তুমুল শঙ্খধ্বনির মাঝে যখন বরের গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল, তখন মেনকা নিজের ঘরের ভিতর অমরনাথের ফটোর সামনে দাঁড়াইয়া রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছিল, "তুমি চলে গেলে? কেমন করে জানলে আমার উপর তোমার কোন দাবী নেই? খালি আমার মুখের কথাটা শুনলে, একবার মনের ভিতরটা দেখলে না? এ দেহ যে অনেক দিনই তোমার পায়ে উৎসর্গ করা আছে। তবে কেমন করে বুঝলে আমার উপর কোন দাবী নেই তোমার? কোথায় তুমি? এস, তোমার মেনকাকে রক্ষা কর!"

শুভ দৃষ্টির সময় মেনকা প্রাণপণে চোখ দুইটাকে বন্ধ করিয়া রাখিল। সকলের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সে চোখ খুলিতে পারিল না।

বিবাহের পর মহামায়ার আদেশে বাসরঘর যখন একেবারে নির্জ্জন হইয়া গেলে, তখন বর মেনকার নিকট সরিয়া আসিয়া তাহার হাত খানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্নেহ কোমল কণ্ঠে ডাকিল, —"মেনকা!"

মেনকার আপাদ মস্তক বায়ু তাড়িত কাশ কুসুমের মত কম্পিত হইয়া উঠিল। "ওগো, কে তুমি? কতদিন! উঃ, কতদিন পরে—"

মেনকা কি স্বপ্ন দেখিতেছে? তাই হোক। অভাগী মেনকাকে এই স্বপ্নময় জীবনই যাপন করতে দাও।

"এখনো কি বলবে, মেনকা, তোমার উপর আমার দাবী নেই!"

এই বার মেনকা চকিতে একবার তাহার অশ্রুবারি-সিক্ত মুখ উর্দ্ধে তুলিয়া, অমরনাথের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া অমরনাথের কোলের উপর মুখ লুকাইয়া বলিল, "ওগো আছে। আগেও ছিল, এখনো চিরদিন অটুট থাকবে—তোমার দাবী।"

বলা বাহুল্য, মহিমের পরামর্শে, মেনকার মা পূর্ব্বেই, জমিদার পুত্রের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ঘটককে সংবাদ দিয়াছিলেন।

শ্রীসূর্য্যমুখী দেবী।

একটী প্রাচীন গান

কত বাজি দেখ্‌বি গো মা,
আর কি বাজির বাকি আছে?
(আমি) আশীলক্ষ সং সেজেছি,
ব্রহ্মময়ি, তোমার কাছে॥
দেখাতে তোমারে বাজি, হয়েছি,, মা গজ-বাজী
কপি, ঋক্ষ, ব্যাঘ্র সাজি, শিখী সেজে বেড়াই নেচে॥
বড় মানুষের তরে বাজিকরে বাজি করে,
কিঞ্চিদর্থ দেয় তাহারে লোকে নিন্দা করে পাছে।
রামপ্রসাদের বাজি করা,
ভাল যদি না হয়, মা তারা,
দূর করে দে, ভবদারা
(আমার) বাজি করা যাক মা, ঘুচে॥

[প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এক গায়ক ভদ্রলোকের মুখে এই গানটী ভৈরবী রাগিণীতে গীত হইতে শুনিয়াছিলাম। গানটীতে রামপ্রসাদের ভনিতা আছে এবং রচনাও রামপ্রসাদের অযোগ্য নয়। রামপ্রসাদের গীত সংগ্রহে "প্রসাদী" সুর ছাড়া অন্যান্য সুরের অনেক গান সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে এই গানটী দেখিতে পাই নাই। অন্যান্য সঙ্গীত গ্রন্থেও না। তাই আমি এতদিন পরে এই গানটী এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, কোন সঙ্গীত সংগ্রহকারের দৃষ্টিতে পড়িয়া, গানটী সঙ্গীত সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিবে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।]

হিন্দুর দুর্দ্দিনে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাহা হইলে কি বুঝিলাম? বুঝিলাম যে জন্মগত বর্ণভেদ স্থূলতঃ শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণের অভিমত নহে এবং তাহার অনুকূল এতদ্দেশীয় আচার প্রবল হইতে পারে না। আমি এমন বলিতেছি না যে, ইহার অনুকূলে কুত্রাপি কোন বচন দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু স্থূলতঃ ভগবদ্গীতা ১৮।৪২ হইতে ৪৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বৈশ্য ধর্ম্ম এবং শূদ্র ধর্ম্মকে যে "স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ" প্রবিভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই স্বীকার করা আপনাদিগের সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই সংজ্ঞা চতুষ্টয় দ্বারা কেবল মনুষ্য জাতিকে বিভক্ত করা হয় নাই; কিন্তু বৃক্ষাদি এবং মণি-প্রবালাদিকেও বিভক্ত করা হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ অনুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মণি-প্রবালাদির ন্যায় মনুষ্য বৃক্ষাদিরও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিভাগ গুণাত্মক। ঈদৃশ বিভাগ বর্ত্তমান যুগের জীব বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের দ্বারাও সম্পূর্ণ সমর্থিত হইতেছে। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে বর্ণবিভাগ উৎকৃষ্ট পন্থা। সমাজ যেমন মানুষের আছে তেমনি মানবেতর কতিপয় শ্রেণীর জীবেরও আছে। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাশ্রেণী বোধ হয় সমাজ গঠনের কোন কোন বিষয়ে মানবকেও পরাস্ত করিয়াছে। লাল পিপীলিকা, কাল পিপীলিকা, বড় পিপীলিকা, ছোট পিপীলিকা—ইহারাও সমাজবদ্ধ। ইহারা সমাজ রক্ষা করে কেমন করিয়া? ইহাদের সমাজ মধ্যে

বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী অথবা গোত্র আছে। মানুষের মধ্যেও তাহাই। পিপীলিকার কথাই বিবেচনা করুন। কারণ পিপীলিকার সমাজ আলোচনা করিতে গিয়া সার জন লাবক্‌ এবং ডারুইন্‌ স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। পিপীলিকার সমাজে ব্রাহ্মণ জাতি আছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র যে আছে তাহা সর্ব্বজন বিদিত। ক্ষত্রিয়দিগকে আপনারা soldier ants বলেন। ইহারা সমাজ রক্ষার্থে যুদ্ধ বিগ্রহ করে, আর কিছু করে না। বৈশ্যদিগকে আপনারা harvest ants বলেন। ইহারা শস্য বপন করে, ছেদন করে এবং ভাঁড়ারে আনিয়া মজুত করে। এ বৈশ্যেরা বাণিজ্য করে কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না; সম্ভবতঃ করে না। কিন্তু কৃষি-কার্য্য করেই। আর শূদ্র পিপীলিকাদিগকে আপনারা ঘৃণার বশে নাম দিয়াছেন slave ants। ইহারা পিপীলিকা সমাজের পরিচর্য্যা করে। একে অন্যের কায করে না। কিন্তু সকলের মিলিত কর্ম্ম দ্বারা সমাজ রক্ষা হয়। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তদ্রূপ একে অন্যের কর্ম্ম করে না। কিন্তু তাহাদিগের সমবেত কর্ম্ম দ্বারা দেহ রক্ষা হয়। বিখ্যাত পুরুষ সূক্তের বিরাট পুরুষের দেহের চারিস্থান হইতে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইবার কথা আপনারা সকলেই জানেন। ঐ সূক্ত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশ সংখ্যক সূক্ত। তাহা হইতেও বংশ দ্বারা চিরদিনের জন্য জাতি নির্দ্দিষ্ট হইবে এমন কথা বুঝা যায় না। যাহা হউক মানবেতর সমাজ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে উহাদিগের মধ্যে যে সকল জীব সমাজ গঠনের দ্বারা দেহের বলে, মনের বলে, জনবলে এবং কর্ম্ম বাহুল্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা স্ব স্ব সমাজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া লইয়াছে। আমি স্বীকার করি তাহাদিগের কর্ম্ম-বিভাগ জন্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং বর্ত্তমান কালের জন্মগত জাতি-ভেদের সহিত তুলনীয়। ইহা হইবারই কথা। আপনারা দেখিতেছেন ম্লেচ্ছ-সমাজেও অনেক স্থলে পিতার ব্যবসায়ই পুত্রে অবলম্বন করে। সুতরাং জন্মগত জাতিভেদ অবশ্যই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু মানুষ ত মণি-প্রবাল বৃক্ষ পিপীলিকাদির ন্যায় নহে। মানব জীবশ্রেষ্ঠ। সে জাতি-ভেদের জন্মগত মৌলিকতা স্থির রাখিয়াও গুণ কর্ম্মানুসারে এক বর্ণের অন্য বর্ণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা স্মৃতি-শাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এই জন্মগত কর্ম্ম-বিভাগ কখনই অলঙ্ঘ্য হইতে পারে না। কর্ম্ম-বিভাগ চাই-ই; সুতরাং জাতিভেদ চাই-ই। কিন্তু উহা অলঙ্ঘ্য হওয়াই সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক। মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই তাহাতে বিফল হইবার আশঙ্কা হয়। কোন একটা বৃহৎ কার্য্যের কথা কল্পনা করুন। কল্পনা করুন, আমি ৫০০০০ টাকা ব্যয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করিব। তখন কর্ম্মীদিগের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিতে হইবে কি না? সকলের উপরেই সকল কার্য্যের ভার থাকিলে ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। তবে যাহার উপর যে কার্য্যের ভার দেওয়া গেলে সে যদি সে কার্য্য ভাল মতে করিতে না পারে অন্য কর্ম্মী যদি সে কর্ম্ম ভালরূপ করিতে সমর্থ হয়, তবে উভয়ের মধ্যে কর্ম্ম-বিনিময় হইতে পারে। এই কথাই জাতি-ভেদের প্রসঙ্গে বলিতে গেলে বর্ণান্তর প্রাপ্তি বলিতে হয়। ব্রাহ্মণের পাতিত্য এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি এই নিমিত্তই সমাজের অশেষ কল্যাণকর। যে দেশে গুণের আদর নাই, দোষেরও অনাদর নাই, সে দেশে গুণীর সংখ্যা অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। বর্ত্তমান সময়ে হইয়াছেও তাহাই। প্রকৃত পক্ষে "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং" ইহাই কল্যাণকর বিধান।

তারপর আর এক কথা। উচ্চ-জাতি নীচ জাতির কথা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজে কেমন করিয়া আসিল? উচ্চ নীচ অর্থ কি? হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, যকৃৎ, প্লীহা ও মল-প্রণালী, এ সকলই দেহ রক্ষার নিমিত্ত অত্যা-বশ্যক এবং সকলই তুল্যভাবে আবশ্যক। একটী বাদ দিলেও ত দেহ-রক্ষা হয় না। ইহাদিগের মধ্যে

কি উচ্চ অঙ্গ, নীচ অঙ্গ বলা চলে? যজ্ঞ করিতে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা অত্যাবশ্যক। কাহাকেও বাদ দিলে যজ্ঞ হয় না। ইহাদিগের মধ্যে কাহাকে উচ্চ, কাহাকে নীচ বলিবেন? পূজা করিতে ফুল, বিল্বপত্র, চন্দন, ধূপাদি সকলই আবশ্যক। একটীও বাদ দিলে চলে না। ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী উচ্চ, কোনটী নীচ তাহা বলিতে পারেন? তেমনই সমাজ-রক্ষা করিতে হইলেও কেহ বা নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানের চর্চ্চা করা; কেহ বা যুদ্ধাদির দ্বারা সমাজের স্বাধীনতা রক্ষা করা; কেহ বা কৃষি-বাণিজ্যাদির দ্বারা সমাজকে ধনশালী করা, কেহ বা সেবা দ্বারা সমাজের দৈনন্দিন কর্ম্ম নিষ্পাদন করা অত্যাবশ্যক। ইহাদিগেরই ক্রমিক নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহাদিগের কাহাকেও বাদ দিলে সমাজ রক্ষা হয় না। এমত স্থলে কাহাকে উচ্চ, কাহাকে নীচ বলিবেন? এরূপ উচ্চ-নীচ সংজ্ঞা দেওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। ঘৃণার কথা ত এ স্থলে উঠিতেই পারে না। সকলেই সমান ভাবে সমাজের কল্যাণের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, নিজকে সমাজ দেহের একটী আবশ্যক যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সমাজের কর্ম্ম-সাধন করিয়া গেলেই হইল। কিন্তু যদি বুঝা যায় যিনি ধনাগমে নিযুক্ত আছেন অর্থাৎ যিনি বৈশ্য, তিনি জ্ঞান-চর্চ্চা করিলে সমাজের অধিক মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিতেই হইবে। পূর্ব্বে এইরূপ বিধানই ছিল। আমরা কুক্ষণে এই অলঙ্ঘ্য জন্মগত জাতি-ভেদের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ রোগের অব্যর্থ ঔষধ এখন আবিষ্কার করা সহজ নহে। তাই বলিয়া কি যতটুকু পারি তাহাও করিব না? বলিয়াছি ত শাক্যসিংহ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ হিন্দু-সমাজের মঙ্গল উদ্দেশ্যে একটা বিরাট জাতি গঠন করিতে গিয়াছিলেন। বঙ্গ-দেশীয় হিন্দুগণ যখন দলে দলে মুসলমান হইতেছিল তখন মহাপ্রভু চীন ব্রহ্ম দেশের মঙ্গোলিয় ব্যক্তিগণকেও কেমন করিয়া হিন্দু-সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা একবার কামরূপ প্রদেশে গেলেই অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আমি গৌহাটীতে ঠিক চীনা আকৃতির লোককে মোটা মালা গলায় দিয়া, কপালে ফোঁটা কাটিয়া বাজারে জিনিষ কিনিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সে ব্যক্তির জাতি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমি "কলিতা।" ব্রাহ্মণাদি তাহার হস্তে জল খায়। আর আমরা? এইখানেই মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতেছে। এই খানেই বর্ত্তমান জাতি-বিচার অত্যাবশ্যক হইতেছে। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই। ব্রাহ্মণ আছে, আর কায়স্থ অর্থে যাহাই হউক তাহা আছে। আর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি ব্যবসাগত কতিপয় জাতিও আছে। এতদ্বারা ত চতুর্ব্বর্ণের সন্ধান পাইতেছি না। হিন্দু-সমাজের চাতুর্ব্বর্ণ্য এ দেশে কোথায়, কেহ আমাকে বলিয়া দিতে পারেন? বঙ্গদেশীয় জাতি বিভাগ প্রধানতঃ—ব্যবসাগত। কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থের তদ্রূপ নহে। এমন কেন হইল? এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চতরূপে দেওয়া কঠিন।

স্মৃতিতে মুল বর্ণচতুষ্টয় এবং কতিপয় সঙ্কর জাতি পাওয়া যায়। অমরকোষের শূদ্রবর্গেও স্মৃতি-উল্লেখিত বর্ণসঙ্কর দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহাদিগের ব্যবসায়ের সহিত বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেতর জাতিগণের ব্যবসায়ের ঐক্য দেখা যায় না, অনেক স্থলে ও সকল সঙ্কর জাতির নামও এতদ্দেশে শ্রবণগোচর হয় না। যাহা হউক সমস্ত কথা বিবেচনা করতঃ ইহা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে বঙ্গীয় ব্যবসাগত জাতি বৌদ্ধ বিপ্লবের পরবর্ত্তী বিভাগ।

বৌদ্ধগণ জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু বৌদ্ধ বিপ্লবের পর হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন সময়ে জাতিভেদের উপরই সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল বঙ্গীয় বহু হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাচরণ করায় জাতিগত কর্ম্মবৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই সুরক্ষিত হইতে পারে নাই। তখন সমাজপতিগণ কি করিতে পারেন? কোন পথ তাঁহাদিগের নিকট উন্মুক্ত ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। তৎকালীন সমাজেও ব্যক্তিগণ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল ব্যবসাগত জাতিভেদ স্বীকার করাই তখন একমাত্র প্রশস্ত পন্থা ছিল। প্রকৃত পক্ষেও আজি আমরা তাহাই দেখিতেছি। এ মত স্বীকৃত হইতে পারে কিন্তু ইহার একটী প্রবল বাধা দেখা যায়। তৎকালে যাহারা কৃষিকর্ম্ম করিত তাহাদিগকে বৈশ্য বলা হইল কেন? আমার মনে হয় যে কৃষিকর্ম্ম কোন নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ে করিত না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ বোধ হয় অবসর মত কৃষিকার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মণগণও বোধ হয় করিতেন। সুতরাং কৃষক মাত্রকেই বৈশ্য সংখ্যায় আখ্যাত করা সম্ভব হয় নাই। যদি এ মীমাংসা সত্য হয় তবে এতৎসহ সংকরবর্ণ উৎপত্তির যে ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়--তাহা সমঞ্জস হয় কি অসমঞ্জস হয় তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। মনুস্মৃতির দশম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—

ব্যাভিচারেণ বর্ণানামবেত্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসংকরাঃ॥

মনু ১০৷২৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণদিগের পরস্পরের স্ত্রী গমন, সগোত্রাদি বিবাহ এবং উপনয়ন রূপ স্বকর্ম্মত্যাগ, এই তিন প্রকারে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়। হিন্দু সমাজে যত প্রকার বর্ণসংকর উৎপন্ন হওয়া মনুস্মৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, তন্মধ্যে কৈবর্ত্ত, মল্ল, চণ্ডাল ও চর্ম্মকার এই কয়েকটী জাতি বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালী চর্ম্মকার প্রায় দেখা যায় না। যাহা হউক এই তিন চারিটী নাম ব্যতীত মনুস্মৃতিতে অন্যান্য যে সকল বর্ণসংকরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এতদ্দেশে অপরিজ্ঞাত। যদিও কর্ম্মনির্দ্দেশ দ্বারা আরও দুই একটী সংকরবর্ণ বঙ্গদেশে থাকা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ প্রণালী অবলম্বনে জাতির পরিচয় করা আমার নিকট সন্তোষজনক বোধ হয় না। যাহা হউক এতদ্দেশে যে বহু সংখ্যক ব্যবসায়গত জাতি দেখা যায় তাহাদিগকে মনু বর্ণিত সংকর উৎপত্তির ইতিহাসের সহিত সমঞ্জস করা সুকঠিন। তথাপি ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সকলেই আর্য্য সভ্যতার অন্তর্গত বেদপন্থী জাতি। শূদ্র বর্ণ অনার্য্য একথা আমি স্বীকার করি না, কারণ যে বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ হইল, তাঁহারই পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ অজায়তঃ। মনু বলিতেছেন,

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থঃ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

মনু ১০৷৪

কুল্লূক ভট্ট টীকা করিতেছেন যে,

শূদ্রঃ পুনশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ উপনয়নাভাবাৎ

"উপনয়নাভাবাৎ" এই কথাটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন। আমি বুঝিলাম যে, দ্বিজবর্ণ ব্যতীত আর সকলেই একবর্ণ এবং তাহাদিগকে শূদ্র বলা যায়। বর্ণসংকরগণ কুল্লুকের মতে বোধ হয় বর্ণপদবাচ্য নহে, কিন্তু একথা আর্য্যাবর্ত্তে যদিও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দাক্ষিণাত্যে আজিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ব্যতীত "পঞ্চম" নামেই একটী জাতি দেখা যায়। ইহারা অস্পৃশ্য এবং অদৃশ্য। বঙ্গদেশে এরূপ জাতিই নাই যাহারা কোন সময়েই দৃশ্য নহে এবং সর্ব্বদাই অস্পৃশ্য। নৃতত্ত্ববিদ্গণ দাক্ষিণাত্যের "পঞ্চম" জাতিকে দ্রাবিড় জাতি বলিয়া অভিহিত করেন। যাহা হউক ইহারা অনার্য্য হইলেও এবং মূলতঃ বেদপন্থী না হইলেও, শূদ্রবর্ণ মূলতঃ বেদপন্থী।

"শূদ্রং তু কারয়েদ্দাস্যং" ইত্যাকার বিধান অনুসারে শূদ্রের কর্ম্ম দাস্য। দাস্য শব্দে আমি যাহা বুঝি বর্ত্তমানকালে তাহার নাম চাকরী। ইহারা বহুবিধ চাকরী করিয়া সমাজ সেবা করিবে; এইরূপই কর্ম্ম বিভাগ সুতরাং বর্ণ বিভাগ করা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে আরও কয়েকপ্রকার ব্যক্তিকে এই শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত করা হইয়াছিল। তাহাদিগের উল্লেখ

মনুস্মৃতির অষ্টম অধ্যায় ৪১৫ সংখ্যক শ্লোকে দেখা যায়। (১) ধ্বজাহৃত অর্থাৎ সংগ্রামে স্বামিসকাশার্জ্জিতঃ (২) ভক্তদাস অর্থাৎ ভক্তলোভাদ্যুপগত দাসঃ। (৩) গৃহজঃ অর্থাৎ দাসীপুত্রঃ। (৪) ক্রীত (৫) দত্ত (৬) পৈতৃক অর্থাৎ পিত্রাদি ক্রমাগতঃ (৭) দণ্ডদাস অর্থাৎ দণ্ডাদি ধনশুদ্ধ্যর্থং স্বীকৃতদাস্যভাবঃ। এই সাত প্রকার ব্যক্তি স্বভাবতঃই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত। সুতরাং কালক্রমে, প্রকৃত শূদ্র বর্ণের সহিত কর্ম্মসাম্য হেতু তাহারা শূদ্রবর্ণের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—এরূপ অনুমান করিলে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ দেখা যায় না; এবং স্মৃতিতে যে সৎ শূদ্র এবং অসৎ শূদ্র এই দুই প্রকার শূদ্রবিভাগ দেখা যায় তাহার কারণও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণবর্ণ এবং শূদ্রবর্ণ অথবা শূদ্রজাতি এই দুই ভিন্ন আর কোন বর্ণ থাকা দেখা যায় না, সৎশূদ্রগণ ত অস্পৃশ্য বা অদৃশ্য হইতেই পারে না; অসৎ শূদ্রগণও তাঁহাদিগের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় বঙ্গদেশে কোন জাতিই অস্পৃশ্য বা অদৃশ্য নহে। কিন্তু ইহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন জল ব্রাহ্মণাদির ভক্ষ্য কি না? এ কথা বিচার করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যতই দুরূহ হউক, যথ সাধ্য ইহার একটা মীমাংসা না করিলে হিন্দুজাতির এই দুর্দ্দিনে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের অপলাপ করা হয়। এ মীমাংসাও যথাসম্ভব শাস্ত্রানুসারিণী হওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশীয় শূদ্রজাতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ানুসারে প্রবিভক্ত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্দেশ বৌদ্ধ প্রভাবাচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল শূদ্রজাতীয় সৎশূদ্রগণ মৌলিক চতুর্থ বর্ণ ভুক্ত এবং অসৎশূদ্রগণ সংকর জাতীয় ছিল এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। হিন্দু সমাজে কখনও বা বীজের প্রাধান্য; কখনও বা ক্ষেত্রের প্রাধান্য, কখনও বা উভয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে।

বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ।
বীজক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ং তু ব্যবস্থিতিঃ॥

মনু ১০.৭০

ইহা হইতে এবং অন্য প্রমাণ মূলে বুঝা যাইতেছে যে, দুই বিভিন্ন বর্ণের যৌন সম্পর্কজাত সংকর কখন পিতৃবর্ণ, কখন মাতৃবর্ণ, কখন বা পৃথক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এরূপ না হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ হইয়া থাকিবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইহাদিগের স্পৃষ্ট এবং পক্ক অথবা ইহাদিগের স্বামিক অন্নজল ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভোজ্য কি অভোজ্য, ইহাই এক্ষণে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

মোটের উপর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে শূদ্রান্ন ভোজ্য কিনা এবং অন্ত্যজান্ন ভক্ষ্য কি না এবং তাহাদের স্পৃষ্ট জল পানীয় কিনা ইহাই বিচার করিতে হয়।

শূদ্রস্বামিক অন্ন অথবা শূদ্র পক্কান্ন কোথাও বা ব্রাহ্মণদিগের, কোথাও বা বিপ্রদিগের অভোজ্য বলা হইয়াছে। বহু স্মৃতিতে দেখা যায় যে শূদ্রগণের অন্নজল অপেয় এবং অভোজ্য। পরাশর সংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডের একাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি শ্লোকে শূদ্রান্ন গ্রহণে বিপ্রগণের কৃচ্ছ্রব্রত পালনের ব্যবস্থা আছে। আঙ্গিরস স্মৃতির ৩।১ হইতে ১৭ শ্লোকে, ব্যাস স্মৃতির ৪।৬৩ হইতে ৬৬ শ্লোকে, আপস্তম্ব স্মৃতির ৮.৭ হইতে ৯ শ্লোক, ফলতঃ স্মৃতি পুরাণের বহুস্থলে বিপ্র অথবা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শূদ্রান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়া দেখা যায়। শূদ্রস্পৃষ্ট জলও নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থিত। শাস্ত্রীয় বিচারে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বিপ্রগণের এবং ব্রাহ্মণগণের পক্ষে শূদ্রস্বামিক অথবা শূদ্রপক্ক অন্ন—সে অন্ন পক্কই হউক অথবা আম অন্নই হউক—তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ সম্বন্ধে আমার বহু কথা বলিবার আছে। মনুস্মৃতিতে দেখিতে পাই ৪.২২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে

নাদ্যাৎ শূদ্রস্য পক্কান্নম্ বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ॥
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকং॥

ইহার টীকা করিতে পূজ্যপাদ কুল্লুক ভট্ট বলিতেছেন যে—

অশ্রাদ্ধিনঃ শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞ শূন্যস্য শূদ্রস্য শাস্ত্র বিদ্ দ্বিজঃপক্কান্নং ন ভুঞ্জীত। কিন্তন্নান্তর ভাবে সদ্যোকরাত্র

নির্ব্বাহোচিতমাম মেবান্নং অস্মাদ্ গৃহ্লীয়াত্তু পক্কান্নং॥

কুল্লূক আরও বলিয়াছেন যে সাধারণতঃ শূদ্রান্ন মাত্রই প্রতিষিদ্ধ, তথাপি মনু এ স্থলে বিশিষ্টভাবে উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু কি উল্লেখ করিতেছেন? উদ্ধৃত টীকায় তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শূদ্র শ্রাদ্ধাদি পঞ্চ যজ্ঞ করে না, তাহার অন্ন শাস্ত্রবিৎ দ্বিজ ভোজন করিবেন না; কিন্তু অন্যের অন্ন না পাওয়া গেলে এক রাত্রি নির্ব্বাহযোগ্য আম অন্ন অর্থাৎ অপক্ক অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু পক্কান্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা শূদ্রের নিকট হইতে একরাত্রি নির্ব্বাহযোগ্যের অধিক অপক্ক অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং উদ্ধৃত মনু বচনের শেষাংশ মান্য করি না।

কিন্তু প্রথমাংশ "নাদ্যাৎ শূদ্রস্য পক্কান্নং" মান্য করি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা কোন্ অংশ মান্য করিব কোন্ অংশ মান্য করিব না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়াছি। একাংশে স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া অন্য অংশ সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিবার আমি বিশেষ কারণ দেখি না। যাহা হউক, ঐ নিষেধ বাক্য কাহার প্রতি প্রযোজ্য? নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি নহে। কারণ আমরা শাস্ত্রবিদ্দ্বিজ নহি। যে দ্বিজ শাস্ত্রবিৎ নহে তাহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ মান্য অমান্যের কথাই উঠিতে পারে না। তাহার পর আমরা স্মৃত্যুক্ত বিপ্র ও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য কিনা তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন; যে সকল শূদ্রান্ন নিষেধ বাক্য স্মৃতিতে দেখা যায় তাহা বিপ্র অথবা দ্বিজ অথবা ব্রাহ্মণের প্রতিই প্রযোজ্য। 'আমরা ব্রহ্মকে জানিনা', সুতরাং ব্রহ্মং জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ এই সংজ্ঞার মধ্যে পড়ি না। আমরা বেদাভ্যাস করি নাই সুতরাং বেদাভ্যাসান্তবেদ্ বিপ্রঃ এ সংজ্ঞার মধ্যেও পড়ি না। সুতরাং আমাদিগের সম্বন্ধে কোন নিষেধ বাক্য দেখি না। কলির ধর্ম্মশাস্ত্রকার পরাশর। তৎকৃত সংহিতায় চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, রজক এবং অন্ত্যজের অন্ন ও জল ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যদি ব্রাহ্মণ হই, দ্বিজ হই অথবা বিপ্র হই, তবে সে নিষেধ আমাদিগের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু অপরাপর জল-অপেয় জাতির সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কৈবর্ত্ত রজক ও চণ্ডাল ব্যতীত আরও অনেক জল-অনাচরণীয় জাতি আছে। তাহাদিগের জল অনাচরণীয় হইবে কেন? যদি তাহারা অন্ত্যজ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে তবেই তাহাদিগের জল অপেয় হইতে পারে নচেৎ নহে। কিন্তু অন্ত্যজের সংজ্ঞা মধ্যে তাহারা ত পড়ে না।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥

সুতরাং অন্যান্য বহু জাতির জল পান করিবার পক্ষে শাস্ত্রীয় কোন বাধা দেখা যায় না। এক শ্রেণীর কৈবর্ত্তের জল এতদ্দেশে আমরা সকলেই পান করিয়া আসিতেছি। সুতরাং এখন বাকী থাকিতেছে রজক ও চণ্ডাল। ইহাদিগের স্পৃষ্ট জল পেয় কি না? ধর্ম্মশাস্ত্রে অপেয় বলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি কারণে ঐরূপ বলিয়াছে? যখন অসবর্ণ বিবাহ চলিত তখন অনুলোম বিবাহ প্রশংসার্হ এবং প্রতিলোম বিবাহ নিন্দার্হ ছিল। চণ্ডাল প্রতিলোম বিবাহ জাত; অতি গর্হিত প্রতিলোম বিবাহ জাত। মনু বলিতেছেন,

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাং।
বৈশ্য রাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসংকরাঃ॥১০।১২

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল জাত হইয়াছিল। এরূপ স্ত্রী পুং সংসর্গ চিরকালই অত্যন্ত দূষণীয় গণ্য হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে বিলাতী মেম "কালা আদ্মী"কে বিবাহ করে সে সাদা সমাজে মুখ পায় না, প্রায় একঘ'রে হইয়া থাকে। এরূপ প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ করিবার নিমিত্তই চণ্ডালকে এতদূর নীচ করা হইয়াছে, এই আমার বিশ্বাস। ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের ঔরসে সন্তান জাত হইলে সেও নিন্দনীয় হয়; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় নহে। যাহা হউক, চণ্ডাল ব্রাহ্মণীর সন্তান। যে সময় ক্ষেত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত তখন জাত হইলে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইয়া

যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বোধ হয় সে সময়ে সে জাত হইয়াছিল না। আমার এই বিশ্বাস মনুস্মৃতির ১০।১৬ সংখ্যক শ্লোকের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। কারণ ঐ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে,

আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাং।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥

সুতরাং অতি গর্হিত প্রতিলোম যৌন সম্বন্ধ জাত হওয়াতেই চণ্ডাল যে এতদূর হেয় হইয়াছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

তথাপি দেখিতে হইবে যে এক্ষণে আমরা যাহাদিগকে নমঃশূদ্র বলি তাহারাই শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল কি না? আমি আপনাদিগকে স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি যে এ বিষয়ে আমার মত অনিশ্চিত। ইহারা স্বয়ং কিন্তু এক্ষণে নিজদিগকে আর চণ্ডাল বলিয়া পরিচয় দেয় না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে বরিশাল এবং ফরিদপুর জেলার কোন কোন চণ্ডাল-সংজ্ঞিত ব্যক্তির বাড়ীতে দশকর্ম্মের হস্তলিখিত পুরাতন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়া কর্ম্ম করিত না অথবা করাইত না। যাহা হউক প্রতিলোম বিবাহকে অত্যন্ত নির্জ্জিত করিবার উদ্দেশ্যেই যদি চণ্ডালদিগকে এত হেয় করা হইয়া থাকে তবে বর্ত্তমান সময়ে তদ্রূপ ভাব রাখিবার কোন অর্থই হয় না। এখন ত সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই; সুতরাং প্রতিলোম বিবাহকে নিন্দা করিবার আবশ্যকতাও নাই, সুতরাং চণ্ডালকে অস্পৃশ্য করিবার কিংবা তাহার জল অপেয় করিবার আর কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

রজক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি। এক্ষণে আর একদিক হইতে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মশাস্ত্রেই চারি বর্ণের কতিপয় সাধারণ ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মও উল্লিখিত হইয়াছে। সে সকল আপনারা অবগত আছেন। কেহ কি বলিতে পারেন যে ঐ দ্বিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে এক প্রকারও আমরা প্রতিপালন করি? নিশ্চয়ই করি না। তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নিষেধ লইয়া চুলচেরা বিচার করিবার আবশ্যকতা কি? মোটের উপর সমাজ রক্ষা হইলেই হইল। আমরা পরাধীন জাতি। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র স্বাধীন জাতির শাস্ত্র। কেমন করিয়া আমরা সে ধর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিব? মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের একষষ্টিতম শ্লোকের নিষেধ বাক্য কি আমরা প্রতিপালন করিতে পারি? ঐ শ্লোকের আরম্ভেই মনু বলিতেছেন,

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ।

ইহার অর্থ, ভাবার্থ এবং নির্গলিতার্থ আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিবার মত সাহস আমার নাই। আপনারা বুঝিয়া লইবেন। এ সকল কি বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতিপাল্য? বর্ত্তমান অবস্থায় বিভিন্ন হিন্দুজাতির একতাবন্ধন অত্যাবশ্যক হইয়াছে। নচেৎ হিন্দু জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে মনুস্মৃতির ঐ চতুর্থ অধ্যায়ের ১৬০ সংখ্যক শ্লোক স্মরণ করুন—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্
এতৎ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

টীকাকার বলিতেছেন যে সর্ব্বং পর-প্রার্থনাদি সাধ্যং দুঃখহেতুঃ। এখন বিবেচনা করুন, আমরা এই বিধি নিষেধ মান্য করিয়া কেমন করিয়া চলিব? পরবশ জাতি কি তাহা পারে? কখনই না। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, জীবতত্ত্ববিৎ, সমাজ তত্ত্ববিৎ, নৃতত্ত্ববিৎ নানা পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, পরবশতা সর্ব্বপ্রকার জীবের পক্ষেই অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইহা দেহ ও মনকে তুল্যরূপেই অবসাদ-গ্রস্ত করে। ইহাতে বশীকৃত সমাজের বন্ধন ছিন্ন হইবার বহু কারণ উপস্থিত হয়। তাহাতেই ঐ সমাজ ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন সমাজে সর্ব্বজন মধ্যে একতা-বন্ধন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তন্নিমিত্ত ঐ সমাজে সকলের সহিত সকলের অন্ন পানীয়াদি চলিত হওয়া উচিত; কিন্তু যদি কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত

থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতই ব্রাহ্মণ, বিপ্র অথবা দ্বিজ নামের অধিকারী থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে এ পরামর্শ আমি দিই না। আমি ইহাও বিশ্বাস করিনা যে, ঐরূপ বহু ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের সমাজে অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের সূপকার হইলেও আমি অসঙ্গত বোধ করি না; ঐ সকল জাতির স্পৃষ্ট জল পেয় বলিয়া স্বীকার করিতে ত আপত্তির কারণই দেখি না। দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পরাশর সংহিতার আচার কাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকের টীকা করিতে পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলিতেছেন,—

দেশকালাবস্থাদিভেদেন ধর্ম্মাণাং বহুবিধত্বমাচষ্টে।

এই মতের পোষক প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। যে সকল ত্রিকালজ্ঞ লোকহিতব্রত ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা যুগভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করতঃ মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাস্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরা স্মৃতাঃ॥

সেই সকল কল্যাণ-ব্রতধারী ঋষিগণ বহুবার ধর্ম্মশাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা আজি জীবিত থাকিলে আমাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া গলিত হৃদয়ে পুনরায় সময়োপযোগী স্মৃতিশাস্ত্র যে অবিলম্বে প্রণয়ন করিতেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগের বংশধর হইয়া হিন্দুজাতির সহিত হিন্দুধর্ম্মেরও ধ্বংস নীরবে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া দেখিব ইহা কখনই হইতে পারে না। আজি যদি সমস্ত বর্ণকে সৌভ্রাত্রে এক করা যায় তাহা হইলে তদনুকূল আচরণ আপনারা নিন্দা করিবেন না। ঈদৃশ আচরণরে নিন্দাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কলির ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিতেছেন—

যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ॥
পরাশর সংহিতা আঃ কাঃ ১,৩৩

পরাশর ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বজাতির অন্নজল (আমিকই হউক অথবা পক্কই হউক) সর্ব্বজাতির অভোজ্য বা অপেয় বলেন নাই। প্রবাসে নদীতীরে প্রভৃতি স্থলে অগ্রে দেহরক্ষা কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা আছে।

দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু ব্যসনেষ্বপি।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
পরাশর সংহিতা ৭.৪১

ঘৃতং তৈলং তথা ক্ষীরং গুড়ং তৈলেন পাচিতং।
গত্বা নদীতটে বিপ্রা ভুঞ্জীয়াচ্ছূদ্রভোজনং॥
পরাশর সংহিতা ১১ ১৪

যাহা এক স্থানে ভক্ষ্য অথবা পেয় তাহা অন্যত্র অভক্ষ্য কিংবা অপেয় বলিলে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের, পেয় অপেয়ের প্রভেদ নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া যায়। প্রবাসে অথবা নদীতীরে ভক্ষ্য হইতে হইতেই বাড়ীতেও ভক্ষ্য হইয়া উঠে। তারপর দাস, নাপিত, গোপালক, কুলমিত্রের অন্নজল জাতিবিচার না করিয়াই ভক্ষ্য এবং পেয়; ইহাই ত কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারের মত।

দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্নং যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥
পরাশর সংহিতা ১১।২০

এক রাত্রির উপযুক্ত আম অন্ন অর্থাৎ অপক্ক অন্নও সকল শূদ্র হইতেই লওয়া যায়। এ শ্লোকের অন্ন কি পক্কান্ন? তাহা হইলে দাস নাপিত ইত্যাদি চারি পাঁচ শ্রেণীর অন্ন ত নিষিদ্ধ হইল না। কেহ কেহ বলেন এ বিধানও মনীষী অথবা মহাত্মাদিগের দ্বারা কলিযুগে নিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু পরাশর ত কলিরই ধর্ম্মশাস্ত্রকর। যাহা হউক, আবার সেই বৃহন্নারদীয় এবং তত্তুল্য বচন, সেই নিবর্ত্তিতানি এতানি কলেরাদৌ মনীষিভিঃ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমি দেখিয়াছি যে ঐরূপ নিষেধ বাক্যের প্রামাণিকতা নাই। আমি পরাশরের বিধান বর্ত্তমান অবস্থায় কল্যাণকর বলিয়া মনে করি। এ যুগের—আমরাই

যুগলরূপা হি তে দ্বিজা। যিনি যাহাই বলুন, যে সকল পথে চলিয়া কিঞ্চিদূর্দ্ধ এক সহস্র বৎসর মধ্যে. হিন্দুজাতি আদম সুমারীতে এত কমিয়া যাওয়া দেখা যাইতেছে, সে পথ নিশ্চয়ই জীবনের পথ নহে, উহা মরণের পথ কিন্তু সে পথ আমরা বন্ধ করিব কেমন করিয়া?

অথচ বন্ধ করিতেই হইবে। তাই বন্ধ করিবার কতিপয় উপায় অদ্য নির্দ্দেশ করিলাম। তন্মধ্যে একটীও যদি আমরা অবিলম্বে অবলম্বন করিতে পারি তাহা হইলেও আশার সঞ্চার হইতে পারে। ইহাতে দ্বিধা করা সঙ্গত নহে। আমরা জল অ'চরণীয় জাতি-দিগের জল ব্যবহার না করায় তাহারা অসন্তুষ্ট হইতেছে। কেহ বা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিবে এরূপও শুনা যাইতেছে। এমত অবস্থায় তাহাদিগের জল ব্যবহার করা ব্যতীত তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিবার অন্য উপায় দেখা যায় না। অথচ তাহাদিগকে তুষ্ট না রাখিলেও হিন্দু সমাজে অনৈক্যহেতু বলক্ষয় হয়। ঐক্য স্থাপনের নিমিত্ত তাহাদিগের জল চলতি করিতেই হইতেছে। ইহাতে আর আপত্তি করা চলে না।

আর এক কথা। আমরা জানি হিন্দু সমাজে পূর্ব্বকালে অসবর্ণ বিবাহ চলতি ছিল। যে সমাজে ঐরূপ বিবাহ চলিত, সে সমাজে কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, তাঁহার রক্তে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অথবা শূদ্র রক্ত মিশ্রিত নাই? আমি কেমন করিয়া বলিব যে আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ শূদ্রাণী বিবাহ করেন নাই? ঈদৃশস্থলে শূদ্রগণের, সৎশূদ্রই হউক, অসৎ শূদ্রই হউক, তাহাদিগের জল অপেয় বলিয়া কিরূপে ত্যাগ করা চলে, তাহা বুঝা কঠিন। বিশেষতঃ যাঁহারা মানবতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা আমাদিগকে সাহস করিয়াই বলিতেছেন যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাদি কোন জাতিই অমিশ্র নহে। বঙ্গীয় জনগণ সকলেই ন্যূনাধিক ত্রিবিধ জাতির সংমিশ্রণ জাত। ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় সংমিশ্রণে আমরা সকলেই উৎপন্ন হইয়াছি। "শতপথ ব্রাহ্মণে" ব্রাহ্মণ জাতির আকৃতি বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের—২২০।৭ ঋক্; ৩।৩১।২১ঋক্; ৪।১৬।৩ঋক্ ইত্যাদি পাঠেও দ্বিজগণের বর্ণ, নাসিকার উচ্চতা, দেহের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের সেই ব্রাহ্মণোচিত গৌরবর্ণ নাই; ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি। সে উচ্চ নাসিকা নাই; যাহাদিগকে,—যে "দস্যু" দিগকে আমরা "অনাসা" বলিয়া বৈদিকযুগে ঘৃণা করিয়াছি, তদপেক্ষাও অনাসা এখন আমরাই অনেকে হইয়াছি। সেই সুদীর্ঘ বপুঃ আর আমাদিগের নাই; এখন আমরা অনেকেই খর্ব্বাকৃতি অথবা 'গাঁড়া' হইয়া গিয়াছি। এ সকল পরিবর্ত্তন জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে লক্ষ লক্ষ বৎসরে হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দুই চারি দশ হাজার বৎসরে হইতেই পারে না। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে আমরা বঙ্গদেশে আসিয়াছি বলিলেও এ সকল পরিবর্ত্তন তদ্ধেতু জাত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। বর্ণবিজ্ঞান, অস্থি-বিজ্ঞান ইত্যাদির মীমাংসা ঐরূপ বিশ্বাসকে ভ্রমাত্মক বলিয়া দেখাইয়া দেয়। মানবদেহের স্থায়ী বর্ণ সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমি কিছুদিন হইল "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আপনারা তাহা দেখিয়া থাকিবেন। অস্থির আকৃতি সম্বন্ধেও হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দুগণের এবং উত্তর পশ্চিম ও বিহারের হিন্দুর কপোলাস্থি প্রভৃতির পরিমাপ করিয়া তুলনায় সমালোচনা করতঃ আমি ও শ্রীমান্ রমাপ্রসাদ চন্দ যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা শ্রীমান্ প্রণীত Indo Aryan Race নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব পাঠিগণের পাঠ্য গ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে। জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে এক হাজার কি বারশত বৎসরে দেহের বর্ণ স্থায়ীরূপে অর্থাৎ বংশানুক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; অস্থির আকৃতিও এত অল্প সময়ে নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। বঙ্গীয়গণ প্রধানতঃ

হ্রস্ব করোটী (Dolicocyphalus) কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণ প্রধানতঃ দীর্ঘ করোটী (Brachy-cephalus)। অস্থির এ সকল পরিবর্ত্তন শুক্র-শোণিতের পরিবর্ত্তন না হইলে এত অল্পদিনে হইতে পারে না ইহা নৃতত্ত্ববিৎ, বর্ণতত্ত্ববিৎ ও অস্থিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এরূপে প্রমাণ করিয়াছেন, বলিয়াই বিশ্বাস করি। সুতরাং বঙ্গীয় হিন্দুগণের সহিত ভারতীয় অন্যান্য হিন্দুগণের এবং বৈদিকযুগের দ্বিজগণের যে আকৃতির ও বর্ণের পার্থক্য দেখা যায় তাহা শুক্র-শোণিত গত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই নিমিত্তই বলিয়াছি, যে দেশে অসবর্ণ বিবাহ চলতি ছিল সে দেশে কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন না যে তিনি খাঁটি ষোল আনা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কি শূদ্র। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে, ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত ব্রাহ্মণ "একঘরে" করিয়াছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। আমরা পশ্চিমা অথবা উড়িয়া ব্রাহ্মণের পক্কান্ন ভোজন করি। কিন্তু কলিঙ্গ, সিন্ধুদেশ, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ আমাদিগের পক্কান্ন কখনই ভোজন করেন না। এ সকলের কারণ কি? মনু মহারাজ কেনই বা বলিয়াছেন

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্ত বিদুর্বুধাঃ।

মনু ২।২২

এবং ইহার পর শ্লোকেই কেনই বা বলিয়াছেন,

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরং॥ ২।২৩

অবশ্যই এ সকলের বিশিষ্ট হেতু আছে। শাস্ত্রে কেন এরূপ দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে "তীর্থযাত্রাধিনাগচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হ ত?" আমাদিগের এ দেশ ম্লেচ্ছ দেশ না কি? আমাদিগের দেশে আসিলে যজ্ঞোপবীত পচিয়া যায়, কেন? পুনরায় উপনয়ন সংস্কারই বা অবশ্যক হইয়া পড়ে কেন? এই সকল বিধান কি মানববিজ্ঞানের মীমাংসাকে সমর্থন করিতেছে? আমরা কি আর্য্য-মঙ্গোলীয় দ্রাবিড়বংশসম্ভূত? আমরা কি বস্তুতঃই বেদপন্থী খাঁটী আর্য্যসভ্যতার প্রতিনিধি নহি? তাহা হইলে হিন্দুজাতির, বেদপন্থী হিন্দুজাতির সেই অনাদি অপৌরষেয় সর্ব্বপ্রধান শ্রুতিবাক্য, সেই স্মৃতিপুরাণ-শাস্ত্রের একমাত্র আশ্রয়স্থল বেদ, 'বঙ্গদেশে' অনাদৃত কেন? বঙ্গদেশে কখনও বেদের পঠন পাঠন ছিল না ও নাই কেন? বেদের ব্যাকরণ পাণিনি এতদ্দেশে প্রচলিত নাই কেন? বেদের বিধিনিষেধ, তন্ত্রের বিধি নিষেধের নিকট হেটমুণ্ড হইয়া রহে কেন? যে তন্ত্রশাস্ত্র ভৈরবীচক্রের সময় সকল বর্ণকে এক করিয়া, কার্য্যতঃ বর্ণভেদ অস্বীকার করে; রজকিনী, চণ্ডালিনী প্রভৃতির সহিত একত্রে মদ্যপান ও মাংস ভোজনের ব্যবস্থা যে তন্ত্রশাস্ত্রে দৃষ্টিগোচর হয়, এবং সেই ব্যবস্থা বঙ্গদেশে প্রতিপালিতও হয়, সে তন্ত্রশাস্ত্রের নিকট বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল উৎস বেদ এবং বেদানুসারী স্মৃতি পুরাণ বঙ্গদেশে পরাজিত। বঙ্গের ব্রাহ্মণ উপনয়ন সময়ে বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাহার "পশুজন্ম" যায় না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন করেন যে, গায়ত্রী দীক্ষা দীক্ষাই নহে; তান্ত্রিক দীক্ষা না হইলে আমাদিগের মুক্তির আশা বিন্দুমাত্র নাই। এ সকল কি নিরর্থক? কখনই নহে। বঙ্গদেশের প্রচলিত দেশজ ভাষা; বঙ্গদেশের প্রচলিত আহার, পরিচ্ছদ এবং আহার্য্য প্রস্তুতের যন্ত্রাদি, এ দেশের সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান আলোচনা করিয়া অনতিক্লেশে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে ও সকল সংস্কৃত সভ্যতার এবং খাঁটী বেদপন্থী বংশানুক্রমের পরিচায়ক নহে। কিন্তু আর এক্ষেত্রে সে সকল বিবাদ করিবার সময় নাই। যাহা হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে বঙ্গদেশে কোনও দিনই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের প্রাচুর্য্য ছিল না। আমরাও ষোলআনা বেদপন্থীজাতি নহি। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হলায়ুধ, তৎপরে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রাজা রামমোহন রায়, অবশেষে পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদিগকে বেদপন্থী করিয়াছেন। এদেশে

কৃষ্ণসারমৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিংবা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না; সুতরাং এদেশ. যজ্ঞীয় দেশ নহে। যাজ্ঞ্যবল্কসংহিতা, ব্যাসসংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা প্রভৃতি অনেক স্মৃতিগ্রন্থের আরম্ভেই স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে, তন্তৎ স্মৃত্যুল্লেখিত বিধিনিষেধ কৃষ্ণসারমৃগবিশিষ্ট দেশের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে। সুতরাং আমার মনে হয় যে ঐ সকল স্মৃতি বুঝি বঙ্গদেশের জন্য নহে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার ছিল। এক্ষণে কেবল এইমাত্রই বলিব যে "আসিস্ না, আসিস্ না, ছুঁইস্ না, ছুইস্ না, তফাৎ তফাৎ" বলিয়া সাধারণের সহিত আপনাদের ঐক্য বন্ধনের বিঘ্ন উত্থাপন করিয়া আর আত্মহত্যা, জাতিহত্যা করিবেন না। আমাদিগের ঠাঁই ঠাঁই করিবার নিমিত্ত স্বার্থান্ধেরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছে, সে চেষ্টা ব্যর্থ করুন। শাস্ত্রের অবস্থা আমার ন্যায় অপণ্ডিত ক্ষুদ্র, আকণ্ঠ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত ব্যক্তি, এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদুর প্রকাশ করিতে পারে তাহা বলিয়াছি। আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাহা শ্রবণ করায় আমি আপনাদিগকে শত সাধুবাদ দিতেছি। সর্ব্বশেষে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে কোন মানুষকেই আর তুচ্ছ করিবেন না। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের মন্ত্রে দীক্ষিত একটী বাউল বৈরাগী আমার বাড়ীতে গান ক'রতে করিতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছে যে,

মানুষকে কেউ ঘেন্না ক'রোনা।
ও ভাই মানুষকে কেউ ঘেন্না ক'রোনা।
কত দুর্গাপুজা ক'রে দেখলেম,
কত কালীপুজা ক'রে দেখলেম,
কত নৈবিদ্দি সাজায়ে দিলাম
মানুষ বৈ আর কেউ খে'ল না।

সত্য সত্যই আজিকার দুর্দ্দিনে আপনারা হিন্দুজাতিকে সর্ব্বপ্রযত্ন একত্র করুন। তাহা হইলেই আপনাদিগের সেবিত হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুজাতি পূর্ব্বগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। আমি জানি, হিন্দুরাই জগতের শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং আবারও হইবেন, যদি আপনারা পশ্চাৎপদ না হন। আপনাদিগের প্রযত্নে হিন্দুর দেশ মধুময় হউক, সূর্য্য এখানে মধু-বর্ষণ করুন, বায়ু এখানে মধুবহন করিয়া প্রবাহিত হউক; এখানকার জল সকল মধুময় হইয়া যাউক—আমার যৌবনকাল হইতে বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনব্যাপী আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হউক।

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু,

শ্রীশশধর রায়।

কৈলাস পর্ব্বত ও মানসরোবর দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮। আস্‌কোট (Askot)

আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যেন আজ আস্‌কোট সহরে দীপ মালিকা হইতেছে বুঝাইতে লাগিল। আস্‌কোটের সন্নিকটে যে সমস্ত ছোট ছোট বসতি আছে, রাত্রে পর্ব্বতের গায়ে দীপের দ্বারা শোভিত হইয়া যেন বৃন্দাবনের দীপ মালিকার সময় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের রূপ ধারণ করিয়াছে। কি সুন্দর শোভা! শোভা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। কিন্তু যদিও বেশি দূর নয়, ক্লান্ত ছিলাম বলিয়া অনেকটা দূর বোধ হইতেছে। অদূরে সামান্য আলোকে দুটি বড় বড় বাড়ী দেখা যাইতেছে। আস্‌কোটে রাজা থাকেন—এত বড় বাড়ী রাজপ্রাসাদই হইতে পারে। একটু খামখেয়ালি বুদ্ধিতে স্থির করিলাম

এইবার প্রথমেই যে বাড়ী পাইব, তাহা রাজপ্রাসাদই হোক বা দরিদ্রের কুটীরই হোক সেইখানেই বাসা লইব। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই রাস্তার উত্তরে একটি বেশ উচ্চ বাড়ী দেখিতে পাইলাম। রাস্তা হইতেই সিঁড়ি পথ গিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দেখিলাম বাড়ীটি বেশ বড়, কিন্তু এদিক সেদিক ঘুরিয়া কোথাও জন-প্রাণীর সন্ধান পাইলাম না। দ্বিতল বাটী—দ্বিতলে উঠিলাম সেখানেও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সামান্য চন্দ্রালোক, কিন্তু অন্ধকার আছে। পকেটে একটা মোমবাতি ছিল, বাতিটি জ্বালাইয়া স্থানটি দেখিলাম। বোধ হইল বাড়ীর দ্বিতল ভাগ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার নামিয়া আসিয়া জিনিসগুলি খুলিয়া একস্থলে রাখিলাম। দ্রুতপদে আসিবার কারণ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলাম, বড়ই গ্রীষ্ম বোধ হইয়াছিল। বাহিরে একটি সুন্দর প্রস্তরের বেদী ছিল, তাহারই উপর আসিয়া বসিলাম। পূর্ব্বেই উপরে উঠিবার সময় পায়ের যথেষ্ট শব্দ করিয়াছিলাম, এবার বাহিরে বসিয়া দুইচারিবার "কৈ হ্যয়" বলিয়া ডাকডাকি করিলাম, কিন্তু কাহারও সাড়া শব্দ পাইলাম না। নির্জ্জন স্থানে বেশ আরামে বসিয়া আছি, সামান্য ঠাণ্ডা হইয়া বেশ শান্তি বোধ করিতেছি, এইবার একটা গান ধরিলাম। গাহিতে জানি না—এমন স্থানে কাঁদিলেও ভয় নাই। রামায়ণের স্তবই জোরে জোরে পাঠ করিতেছিলাম। খানিকক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুম্ কোন্ হ্যয়?" আমি বলিলাম "হাম হ্যয়।" আবার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম "হাম হ্যয় রাত্‌কো আঁহি রহেগা।" তখন স্ত্রীলোকটি বলিল এখানে থাকিতে পাইবে না। আমার একটু রোষের সঞ্চার হইল। এতক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া কাহারও শব্দ পাইলাম না, কাহারও কিছু অন্যায় করিতেছি না একটু স্থির হইয়া ভগবানের গুণগান করিতেছি, এমন সময় বিরক্ত করিলে কাহারও কথা শুনিব না। বলিলাম আমি এই স্থানেই থাকিব, কোন মতে অন্যত্র কোথাও যাইব না। তখন স্ত্রীলোকটি আলো জ্বালিয়া আমার কাছে আসিল ও আমাকে দেখিয়া কোন প্রত্যুক্তি না করিয়া, আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "মহারাজ আপনি এখানে থাকিলে কষ্ট পাইবেন, সেই কারণ আপনাকে অন্যত্র যাইতে বলিতেছিলাম। আমি একাকী, পুরুষেরা আজ বাড়ীতে নাই, অতএব আপনার থাকিবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিব না। আপনাকে ভোজনের জন্য কিছু আটা দিতে পারি, কিন্তু জলাভাবে কষ্ট পাইতে পারেন।" তখন আমি তাহার ভাবগতিক বুঝিতে পারিলাম। ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুরমণী রাত্রে অতিথির সৎকার করিতে পারিবে না বলিয়াই ভীত হইয়াছে। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম রাত্রে আমি কিছু ভোজন করি না, অতএব তাহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; বড়ই ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি একটু স্থান পাইলেই যথেষ্ট কৃতার্থ হইব। এইবার তিনিও বুঝিতে পারিলেন। আমাকে একটি স্থান দেখাইয়া দিলেন। নিশ্চিন্ত চিত্তে এইবার বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। নিদ্রা দেবী সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন, রাত্রে বেশ নিদ্রা হইল। এই স্থানটি ঠিক আস্‌কোটের ডাক বাঙ্গলার কাছে।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ইং ১৪ই জুন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পোষ্ট আফিসে গেলাম। বাড়ীতে পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল আস্‌কোটের পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্র লিখিবে। বাড়ী হইতে এবং বন্ধু বান্ধবদের কয়েক খানি পত্র পাইলাম। এই সুদূর হিমালয় বক্ষে আত্মীয়-বর্গের পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আস্‌কোটে একজন রাজা থাকেন, তাঁহাকে রাজবার বলা হয়। রাজবারের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার খরক সিং পাল। ইনি পূর্ব্বে ভারত সরকারের তরফ হইতে তিব্বৎ রাজ্যের সহিত রাজ ব্যবহারের জন্য পোলিটিকেল পেস্কার (Political Peshkar) ছিলেন, সেই সময়ে তিনি সরকারি কার্য্য উপলক্ষে কয়েকবার তিব্বৎ গিয়াছিলেন ও মানসরোবর কৈলাস ভাল করিয়া দেখিয়াছেন। এখন তিনি একজন ডেপুটি কালেক্টার, সম্প্রতি ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন। তিনি বেশ বিদ্বান্ লোক ও

তাঁহার সুখ্যাতি পূর্ব্বে শুনিয়াছি। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহার প্রমুখাৎ বিশদরূপে জানা যাইবে ইহারই জন্য আস্কোটে বিশেষ করিয়া দিন দুয়েক থাকিবার সঙ্কল্প ছিল।

পোষ্ট আফিসে জিনিসপত্রগুলি রাখিয়া কুমার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার বাটী রাজপ্রাসাদেরই সংলগ্ন। তিনি আমার সহিত অতি সাদরে আলাপ করিলেন ও অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। বলিলেন, "আজ আপনি বিশ্রাম করুন, বৈকাল বেলা আপনাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিব।" পোষ্ট আফিসেই আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পোষ্ট আফিসে আসিয়া পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে পাহাড়ের একটু নিম্নদেশে যাইয়া একটি ঝরণাতে স্নান করিয়া আসিলাম। এই সকল পার্ব্বতীয় স্থানে যেখানে সেখানে জল পাইবার উপায় নাই। একটু নীচে যাইতে যদিও কষ্ট হইল, কিন্তু স্থানটি বড় সুরম্য। সেখানে একটি ছোট খাট বাগানের মত হইয়াছে। এই স্থানে দুই চারিজন শিক্ষিত লোক আছেন—পোষ্ট মাষ্টার, স্কুল মাষ্টার ইত্যাদি। তাঁহাদের চেষ্টাতেই এই বাগানটি হইয়াছে। আজ আর স্বয়ং পাক করিতে হইল না, পাচক ব্রাহ্মণের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। আহারাদির পর বিশ্রাম করিলাম। আজ মাছির জন্য কষ্ট পাইতে হইল না। মাছি আছে কিন্তু খুবই কম। ইহার পর এখান হইতে আরও উচ্চ স্থান তিজা (Teeja) পর্য্যন্ত মাছির কষ্ট ছিল, কিন্তু এই আস্কোটে নাই। তাহার কারণ আস্কোটটি বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা এবং পোষ্ট আফিস রাজপ্রাসাদের নিচে ও তাঁহাদেরই একটি বাড়ী, সেই কারণে পরিষ্কার।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি স্থান দেখিয়াছি সর্ব্বাপেক্ষা আস্কোটই ভাল লাগিল। আস্কোট একটি পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে সমতল ভূমিতে অবস্থিত, সেই কারণ এখানকার দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। অন্যান্য স্থানগুলি যদিও উচ্চে অবস্থিত কিন্তু চতুর্দ্দিক পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত থাকাতে পর্ব্বত গহ্বর মধ্যস্থ বলিয়া বোধ হয়। আস্কোটের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব একবারে খোলা, অনেকদূর পর্য্যন্ত যে সকল পর্ব্বত আমি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি সেগুলি দেখা যাইতেছে। সুদূরে গঙ্গার বক্ষ—তাহাও দৃষ্ট হইতেছে; উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত, তাহার দৃশ্যগুলি অতি মনোরম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিগত কল্যকার শ্রান্তি ক্লান্তির পর আজ এই মনোরম স্থানে বিশ্রাম করিয়া বড়ই শান্তিলাভ করিলাম।

অপরাহ্ণে কুমার খরক সিং পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি সমস্ত কথা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন ও পাটোয়ারী দিগকে আমার বন্দোবস্ত করিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। পার্ব্বতীয় দেশের অনেক ইতিবৃত্তও শুনিতে পাইলাম। আস্কোটের রাজ পরিবার এই কুমায়ু দেশের কাত্তিউরি (Katyuri) রাজ বংশের এক শাখা। কুমায়ুন ইতিহাসে কাত্তিউরি রাজবংশ খুব বিখ্যাত। এখন তাঁহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের সুনাম সকলেরই বিদিত।

আস্কোটের কাছেই পর্ব্বতের নিম্নদেশে এক জাতি মনুষ্যের বাস, তাহাদিগকে বন মানুষ বলা হয়। বন মানুষের নাম শুনিলে বোধ হয় বড় বড় লোম ওয়ালা একজাতীয় বানরের মূর্ত্তিই মনে পড়ে, কিন্তু তাহা নয়। ইহারা আমাদের মতই মনুষ্য, তবে জঙ্গলে থাকে বলিয়া এবং গ্রামের মনুষ্যদিগের সহিত সচরাচর দেখা সাক্ষাৎ করিতে ভালবাসে না, অন্য লোক দেখিলে লুক্কায়িত হয় সেই কারণ ইহাদিগকে বন মানুষ বলা হয়। ইহারা নিজদিগকে রাজি (Raji) বলে। বলে, আমরা রাজার বড় ভাই, আমরা ছোট ভাইকে রাজ্য ভার দিয়া নিজে বনে আসিয়া তপস্যা করিয়াছি, সেই কারণ আমরা বনেই থাকিতে ভালবাসি। ইহারা যখন রাজবারের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে তখন রাজবার ইহাদিগকে ছোট ভাইয়ের মত বিবেচনা করেন।

কুমার সাহেবের সহিত বসিয়া কথা কহিতেছি,

এমন সময় রাজকুমারের লোক আসিয়া বলিলেন, রাজকুমার আমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক। আমি বলিয়া পাঠাইলাম কাল সকালে সাক্ষাৎ করিব। আস্‌কোটে একটি রাসলীলার যাত্রা আসিয়াছে। সুদূর মথুরা হইতে পয়সা উপার্জ্জনের ইচ্ছায় এতদূর লোকে গীত বাদ্য শুনাইতে আসিয়াছে। আমি যখন পিথোরা-গড়ে ছিলাম তখনই ইহাদিগকে সেখানে দেখিয়াছিলাম, সেখান হইতে তাহারা এখানে আসিয়াছে। রাত্রে কুমার খরকসিং পালের বাটীতে রাসলীলা হইবে আমার নিমন্ত্রণ হইল। কিন্তু রাত্রি জাগিবার ভয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ ইং ১৫ই জুন প্রত্যুষে উঠিয়া স্নানাদি করিবার পর, আস্‌কোটের রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কুমার ভুপেন্দ্র সিং পাল আস্‌কোটের ভাবী রাজবার (heir-apparent) বৃদ্ধ রাজবার মহাশয় নিজের জমিদারি দেখিতে গিয়াছেন বাড়ীতে নাই। রাজবারের ৬।৭টি পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ ভুপেন্দ্র সিংহ শিক্ষিত যুবা, আমার সহিত ইংরাজিতেই কথাবার্ত্তা কহিলেন। বড়ই মিষ্টভাষী ও রাজকুমারের উপযোগী বিশিষ্ট ভদ্র আচার। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার একটি যৎসামান্য ইংরাজি পুস্তকালয় আছে, তাহা দেখাইলেন এবং তাঁহার কাছেই আসিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, আর মাত্র আজিকার দিন থাকিতে হইবে সেইজন্য তাঁহার অতিথি হতে পারিলাম না। কিন্তু তিনি বড় জেদ করিতে লাগিলেন ও সেই কারণ তাঁহার আলয়ে আহার করিতে স্বীকার করিলাম। আজ ভগবৎ ইচ্ছায় রাজপ্রাসাদে ভোগ পাওয়া গেল। আহারান্তে পোষ্ট অফিসে ফিরিয়া আসিলাম ও কাল সকালে রওয়ানা হইব স্থির করিলাম। ধারচুলা পর্য্যন্ত আমার জিনিস গুলি পৌঁছাইবার জন্য পোষ্ট মাষ্টার হরিবল্লভ অবস্থি একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ধারচুলা হইতেও যে বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে তাহার উপায় বলিয়া দিলেন। আশা হইল আর কিছু দূর ভার বহিতে হইবে না, তাই মনে একটু আনন্দ হইল। এইবার আরামে রাস্তা হাঁটিতে পারিব।

১লা আষাঢ় ১৬ই জুন প্রত্যুষে উঠিয়া, যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত জিনিসগুলি পূর্ব্বেই রওয়ানা হইয়া গিয়াছে, বলিতে গেলে মাত্র যাহা পরিয়া আছি তাহাই আমার ভার। কাল সন্ধ্যার সময় কিছু পুরি তৈয়ার করাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাই আজ পথের ভোজন হইবে। সেইগুলি কমণ্ডলুতে রাখিলাম। এক হাতে কমণ্ডলু অপর হাতে মাত্র ছাতা, এই সামগ্রী লইয়া দুর্গাশ্রীহরি বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম।

গ্রামটির বাহির হইতেই খুব উতরাই চলিয়াছে। প্রায় ৩ মাইল উতরাই নামিয়া গর্জ্জিয়ার পুলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৌরী-গঙ্গা উত্তর পশ্চিম হইতে পট্টি জোহার হইয়া আসিয়া এই স্থানে কালী-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই গৌরী ও কালীর সঙ্গম স্থান আমাদের শাস্ত্রের কৈলাস যাত্রার বর্ণনে কথিত হইয়াছে। এই স্থানে গৌরী গঙ্গার উপর একটি কাঠের পুল আছে, পুল দিয়া গৌরীর বাম তীরে পৌঁছিলাম, এবং পূর্ব্বাভিমুখ হইলাম। যদি পট্টি জোহার দিয়া এবং উটাধুরা হইয়া কৈলাস যাওয়া হয়, তাহা হইলে এই স্থান হইতে উত্তর পশ্চিমে গৌরী গঙ্গার ধারে ধারে যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই ধরিয়া যাইতে হয়।

গৌরী গঙ্গার দৃশ্য অতি সুন্দর। দুই ধারে পর্ব্বতাবলী খুব গভীররূপে কাটিয়া খর স্রোতে চলিয়াছে. তর্জ্জন গর্জ্জনও আছে, কিন্তু অদূরে জ্যেষ্ঠা ভগিনী কালী যেমন ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন তাঁহার মত নন। অদূরে জিউল জীবি একটি ছোট গ্রাম, কালী ও গৌরীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। সঙ্গমের মুখে একটি দ্বীপের মত স্থানে একটি শিব মন্দির আছে, শীতকালে যখন নদীর জল ও বেগ

কম হয় তখন কালীর উপর পুল বাঁধিয়া ঐ স্থানে যাওয়া যাইতে পারে। প্রতি বৎসর শীতকালে এই স্থানে একটি মেলা হয়। পার্ব্বতীয় দেশের অনেক লোক সেই সময়ে মহেশ্বর দর্শনে আসিয়া থাকেন। এই স্থানে স্নানাদি করিয়া কালী গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়া বরাবর রাস্তা গিয়াছে তাহাই ধরিয়া ধারচুলা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কালীর দুই পাশেই অতি উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কালী ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছেন। এমন কোন স্থান নাই যেখানে তাঁর জলের ভিতর দিয়া মনুষ্য পারাপার হইতে পারে। পুল ব্যতিরেকে কোন মতে কালী পার হইবার উপায় নাই, কিন্তু কালীর উপর পুল মাত্র দুই যায়গা ভিন্ন আর কোথাও নাই। একটিকে পুল বলা যাইতে পারে, পূর্ব্ব ঝুলঘাট যাহার উল্লেখ করিয়াছি। অপরটি একটি রশি মাত্র, তাহা ধারচুলায়, তাহাদ্বারা পার হওয়া ভয়াবহ। নেপালের পশ্চিমে ও ভারতের মধ্যে কালী গঙ্গায় জলধারা। নেপাল ভারত রাজ্যের সীমানা, দুই রাজ্যই, নিজের সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোথাও কালীতে পুল বাঁধিবার জন্য উৎসুক নহেন। আর পুল বাঁধিবার ইচ্ছা করিলেও যে সহজে কেহ কালীর উপর পুল বাঁধিতে পারিবেন তাহা ভাবিবেন না। কারণ কালী, গঙ্গার মত সহজ নহেন, তাঁহার স্রোতে বড় বড় হস্তী প্রমাণ পাথর ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রস্থে খুব বড় নন কিন্তু বক্ষ বড়ই গভীর। তীরের উপর দিয়া চলিয়াছি কিন্তু জল বোধ হয় তিন চার তাল গাছ প্রমাণ নীচে। জিউল জিবার পর বলুয়া কোটে না পৌঁছিলে কালীর জল রাস্তার কাছে পাইবার উপায় নাই। কালীর ভয়ঙ্কর নাদ শুনিতে শুনিতে চলিয়াছি। রৌদ্রও খুব প্রখর লাগিতেছে, একবারে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া যাইতেছি, আদৌ বাতাস নাই। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম আস্‌কোট হইতে ধারচুলা পর্য্যন্ত যে রাস্তা তাহা গ্রীষ্মের কারণ ভয়ানক কষ্টকর। আজ রাস্তায় বিশেষ ওঠা নাবা নাই, কিন্তু গ্রীষ্মের জন্য ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। আজ আমার শরীরে কোন বোঝাই নাই, পরিধানে মাত্র একখানি ধুতি, একটি সাদা কামিজ ও কোট। কিন্তু এত ঘাম হইতেছে যে কাপড়গুলি একবারেই ভিজিয়া যাইতেছে। এস্থান হইতে বঙ্গদেশের বৈশাখ মাস অপেক্ষা গরম, আগরা ও লক্ষ্ণৌয়ে যে রকম গরম হয় প্রায় সেই রকম। বেলা ৯টার সময় রৌদ্রের জন্য জীব জন্তুর শব্দ একবারেই নাই—সব নিস্তব্ধ—কেবল কালীর ভীষণ নাদ।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বলুয়া কোটের কাছে পৌঁছিলাম। এই স্থলে নদীর তীর খুব নিম্ন, জলের কাছে যাইবার সুবিধা আছে। একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া সঙ্গে যাহা খাদ্যদ্রব্য ছিল আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম এবং ভাল করিয়া কালীকে দর্শন করিলাম। মা কালী সর্ব্বদাই ভয়ানক, মা গঙ্গা হইয়াও নিজের প্রকৃতি ছাড়েন নাই। বড় বড় পাথর—এক একটি শিব বলিলেও চলে, —নিজের বক্ষে ডুবাইয়া পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। তীরে পাঁচ হাত তফাতে কথা কহিলে তাহা শুনিবার উপায় নাই এমন ভীষণ শব্দ।

রৌদ্রের উত্তাপ কমিলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এখন সূর্য্যদেব খুব প্রখর আছেন বলিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আবার বসিয়া পড়িলাম। রৌদ্র একবারে পড়িয়া গেলে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। আজই ধারচুলা পৌঁছিব মনস্থ করিয়াছিলাম, দেখিতেছি তা পারিব না।

বলুয়া কোট পার হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বলুয়া কোটে শীতকালে অনেক লোকের বসবাস হয়, অনেকগুলি বাড়ী আছে, কিন্তু এ সময়ে জনমানবশূন্য। উচ্চ পর্ব্বতে ভুটিয়াদের গ্রামে যখন শীত আরম্ভ হয়, বরফ পড়িবার পূর্ব্বেই নামিয়া আসিয়া গ্রীষ্মের আরম্ভ পর্য্যন্ত তাহারা এই এই নিম্নস্থল ধারচুলা ও বলুয়া কোটে বসবাস করে।

বলুয়া কোট পার হইয়া প্রায় সমতল রাস্তা দিয়া যাইয়া সন্ধ্যার সময় কালিকা নামক স্থানে

পৌঁছিলাম। কালিকা একটি প্রসিদ্ধ স্থান, কালিকা হইতে ধারচুলা এখনও ৪।৫ মাইল হইবে। কালিকার নীচেই একটি ছোট নদী। বশি মঠ বলিয়া একটি বসতি আছে, বশি মঠের প্রধানের (গ্রামের মণ্ডলের) নাম জানা ছিল, তাহার বাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। আজ এই স্থানেই রাত্রিবাস করা হইল। লোকটি বড় ভদ্র, রাত্রে থাকিবার জন্য যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিয়া দিল।

২রা আষাঢ় ১৭ই জুন সূর্য্যোদয় না হইতে ধারচুলা পৌঁছিলাম। ধারচুলা খুব বড় বাজার, শীতকালে উপরকার সমস্ত ভুটিয়ারা সপরিবারে এখানে নামিয়া আসে। বেশ বড় বড় বাড়ী আছে ও অনেক দোকান আছে। কিন্তু শীতকালে যেমন জনসমাগম হইয়া একটি পরিপূর্ণ নগরী হয়, এখন দেখিলে তাহার বিপরীত বোধ হয়। কালীগঙ্গার দক্ষিণ তীরে ধারচুলা নদীর পরপারে একটি ছোট গ্রাম আছে তথায় নেপাল সরকারের কাছারী। পরপারে নেপাল সরকারের আমিনি আদালত ও একজন রাজপ্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট ও সুবা থাকেন। কিন্তু পরপারে যাইবার ভয়ানক কষ্ট, মাত্র একটি রশির সাহায্যে নদী পার হইতে হয়। কোমরে একটি রশি সুতার রূপে বাঁধিয়া, নদী বক্ষে এ পার হইতে ওপার পর্য্যন্ত যে একটি রশি ঝুলিতেছে তাহাতেই একটি কাঠের আঁকসি দ্বারা কোমরের রশির সহিত নিজেকে ঝুলাইতে হয় ও পরে হস্ত পদের দ্বারা বাঁদরের অনুকরণে ঝুলিতে ঝুলিতে নদীবক্ষে শূন্যমার্গে পার হইতে হয়। কি ভয়ানক! কিন্তু পড়িয়া মরিবারও কোন ভয় নাই, কারণ আজ পর্য্যন্ত রশি ছিঁড়িয়া কাহাকেও পড়িতে শোনা যায় নাই। যাহারা বিদেশীয়, নিজের হস্ত পদের সাহায্যে পার হইতে পারে না, তাহাদিগকে পূর্ব্বরূপে ঝুলাইয়া আর একটি রশির দ্বারা পরপার হইতে টানিয়া একজন পার করে। এইটি ধারচুলার একটা বিশেষ জিনিস। ধারচুলায় আমাকে দুই একদিন থাকিতে হইবে। এখানে একজন সন্ন্যাসিনী রুমা দেবী থাকেন। তিনি কয়েক বার কৈলাস গিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

ধারচুলার বিখ্যাত দোকানদার হরিবল্লভ খরক ওয়ালাকে আমার বিষয় পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। তাঁহার গৃহেই আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। স্থানটি যদিও খুব গরম, কিন্তু অন্যান্যরূপে বড়ই উত্তম। দৃশ্য অতি সুন্দর, মাছির কষ্টও কিছু কম। খাওয়ার পর বিশ্রাম করিয়া রুমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলাম।

রুমাদেবী পটিব্যাস গারবিয়াং নিবাসী ভুটিয়া রমণী। তাঁহার পিতা একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ভুটিয়া সওদাগর ছিলেন। ভুটিয়া দেশের বিবাহ প্রথা বিচিত্র রকমের তাহা ভুটিয়া দেশে পৌঁছিলে বিশেষরূপে বলিতে পারিব। ভুটিয়া দেশে যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্র যে ভাল থাকিতে পারে তা বলা যাইতে পারে না। বালিকা বয়স হইতে রুমা দেবী এই প্রথার বিরোধী ছিলেন ও ঘৃণা করিতেন। তাঁহার পিতা নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহের একটা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রুমা দেবীর ভাই ছিল না। ইঁহারা মাত্র তিন ভগিনী। পিতার মৃত্যুর পর রুমা দেবী বিষয় সংসার একেবারে ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ আশ্রমে ও মায়াবতীর আশ্রমেও কিছুদিন ছিলেন। তিনি বাঙলা বলিতে পারেন না, কিন্তু লিখিতে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। বেশবিন্যাসও অনেকটা বাঙালীর মত। রুমাদেবী গ্রামের প্রায় সর্ব্বশেষে থাকেন। বাড়ীটি অতি সুন্দর ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; দেবীজী বাড়ীর ফটক হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময় আমি পৌঁছিলাম। সাক্ষাৎ হইল, বড়ই আদর ও আগ্রহের সহিত বাগানে বসাইলেন, অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ভোট দেশের রমণী, সে দেশে স্ত্রীশিক্ষার

কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু ইঁহার ভাব বড়ই সাত্বিক। তিনি ৫ বার কৈলাস গিয়াছেন। বিগত বৎসরও কৈলাস গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে কয়েকবার বলিলেন, কৈলাসের যাত্রা অতি কঠিন। কথাটা বড়ই কঠিন বোধ হইল কিন্তু যখন কৈলাসের যাত্রা করিতে আসিয়াছি তখন কৈলাসপতি নিজেই কঠিনকে কোমল করিয়া দিবেন। কয়েক দিন ধারচুলায় থাকিবার জন্য দেবীজী আমাকে জেদ করিতে লাগিলেন ও বলিলেন এখনও হিমালয়ের উচ্চ শিখরগুলির বরফ গলিয়া তিব্বতে যাইবার রাস্তা পরিষ্কার হয় নাই। তাঁহার আগ্রহ আমার জন্য কিছু মিষ্ট ও খাদ্য তৈয়ার করিয়া দিবেন, যে হেতু পথে অন্য কোন দ্রব্য পাওয়া যাইবে না। আমি মাত্র আর একটি দিন থাকিব বলিলাম। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না। কাল সকালে আবার সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া, আজ্ঞা লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানাদির পর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যাহাতে লোকে কৈলাস যাত্রার জন্য আরও বেশি আসে ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। কৈলাসের পথের বিষয় ভারতবাসীকে বিদিত করার জন্য তিনি চেষ্টায় আছেন। কৈলাস যাইবার জন্য কোন যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাদের সুব্যবস্থার জন্য বড়ই যত্ন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি ধারচুলার ৩ মাইল উত্তরে রাস্তার ধারে একটি ধর্ম্মশালা ও বাগান স্থাপিত করিতেছেন, এই জায়গাটির নাম তপোবন। অনেক কথাবার্তার পর, তিনি কাল সকালে তপোবন পর্য্যন্ত যাইবেন ইহাই স্থির হইল, তপোবন আমার রাস্তায় পড়িবে।

১০। তপোবন

তৎপর দিন ৪ঠা আষাঢ় ১ শে জুন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার জিনিসগুলি পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ প্রেমবল্লভের পুত্র প্রথম হইতেই পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন যে আমি যে যে স্থানে যাইব সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আমার জিনিসগুলি পূর্ব্বেই পৌছিয়া যাইবে। সুবিধা অনুসারে জিনিসগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে অতএব ভারতের সীমান্ত গারবিয়াং পর্য্যন্ত ভার বহন করা হইতে একরকম নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। সঙ্গে মাত্র জল পাত্রের জন্য একটি কমণ্ডলু ও একটি পাতলা চাদর লইয়া রুমা দেবীর বাটির দিকে রওয়ানা হইলাম। তাঁহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম আমরা অতি প্রত্যূষে যাইব এখন মাত্র প্রভাত হইয়াছে তাঁহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখি দেবী জি একেবারে প্রস্তুত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি যাইতেই অতি সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিলেন। আহা কি দয়ালু স্ত্রীলোক! নিয়ম অনুসারে কেমন সময়ের ব্যবহার করেন! আমাদের ভারতবাসীর মধ্যে যদি কেহ ৬ টার সময় আসিতে বলেন তাহা হইলে যাঁহারা খুব "পাংচুএল" বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ করেন, তাঁহারা ৬টার পরেই পৌছবেন, সচরাচর ৭টার পরেও হইবে। আমার জীবনে তিনি আজ আমাকে হার মানাইয়াছেন, কারণ আমি তাঁহাকে ভারত রমণী মনে করিয়া স্থির করিয়াছিলাম নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পরে গেলেই ঠিক হইবে। কিন্তু তিনি সামান্য রমণী নহেন দেবী।

আমারা আর কালবিলম্ব না করিয়া রাম কৃষ্ণ হরি বলিয়া পথে বাহির হইলাম। তাঁহার হাতে দুই একটি পুটলি। জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি? অনুমান ৫ সের সামগ্রী হইবে। তিনি কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে বুঝিতে পারিলাম ইহা কি, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম, বলা ফলদায়ক হইবে না। আমরা বরাবর কালীগঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া চলিয়াছি। নদী দূর বলিয়া সকালে তাঁহার ভীষণ নাদ স্পষ্টরূপে বোঝা যাইতেছে না। প্রত্যূষের নির্জ্জনতায় বোধ হইতেছে যেন কোন দেবকন্যা অপ্সরাদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া প্রাতঃস্নান করিয়া শিবগুণ গান করিতে করিতে চলিয়াছেন।

আরও এক মাইল অগ্রসর হইয়া দেবকন্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি স্বয়ং শঙ্কর পত্নী কি কালীগঙ্গা বলিয়া এত গর্জ্জন করিতেছেন। কালী নাম ধারণ করিলেই কি এত ভীষণ হইতে হয়। মা বলিলেন, "না বাবা, রাস্তায় এই পাহাড় পর্ব্বতগুলি পড়িতেছে, বাপের বাড়ী যাইতেছি, শীঘ্র যাইতে হইবে অতএব পর্ব্বতগুলিকে একটু জোরে সরাইয়া দিতে হইতেছে, সেই সামান্য শব্দ হইতেছে। তুমি কি আমাকে টনকপুরে দেখ নাই? সেখানে বাড়ীর কাছাকাছি পৌছিয়াছি। তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইব তাই আনন্দে শান্ত হইয়াছি।" কালীগঙ্গার দুইধারে অতি উচ্চ পাহাড়, জলস্রোত সেগুলিকে সোজা কাটিয়া প্রায় ১০০ ফিট গর্ত্ত করিয়া খুব স্রোতে চলিতেছে। নদীগর্ভে পর্ব্বত হইতে বড় বড় পাথর আসিয়া পড়িয়াছে, এক একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর মত। সেই কারণে জল তাহার সহিত টক্কর খাইয়াও কোন কোন স্থানে বাঁধের মত আটক পড়িয়াছে বলিয়া জলপ্রপাতের ন্যায় ভীষণ নাদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আমাদের পথও এবারে খুব চড়াইয়ে চলিয়াছে। তপোবন মাত্র ৩ মাইল, কিন্তু আমাদের পৌছিতে প্রায় ২ ঘণ্টা সময় লাগিল। তপোবনে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম। স্থানটি অতি সুন্দর। ধারচুলা হইতে তপোবন পর্য্যন্ত কালীগঙ্গার দুই তীর ভীষণ পর্ব্বত মালার ভিতর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া জলের সন্নিকটে যাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তপোবনে জলের সন্নিকটে যাইবার সুবিধা আছে বলিয়া এই স্থানটি থাকিবার বড়ই সুখকর হইবে। তপোবনের পর আর কোথাও গারবিয়ং পর্য্যন্ত জলের সন্নিকটে যাওয়া সুবিধাজনক হইবে না. সেই কারণে একবার গঙ্গার পবিত্র জলে যাইয়া মুখ হাত ধুইয়া লইলাম ও একটু মস্তকে দিলাম। জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, বোধ হইল এখনি হাত জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। কালীগঙ্গার জল হিমালয়ের বরফ গলিয়া জল রূপে আসিতেছে। স্নান করা বড়ই দুরূহ, জলের প্রবাহ বড় খরতর ও শীতলতার এই অবস্থা, অতএব আজ এই পর্য্যন্ত স্নান হইল। স্নানের পর দেবীজি কিছু খাওয়াইলেন ও বাকি ৫ সেরের মোটটি আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। তাঁহার তপোবনের চাকরটিকে মোট লইয়া আমার সঙ্গে খেলা পর্য্যন্ত যাইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু আমি কোন মতে লইতে রাজি হইলাম না, কারণ তাঁহার এত সৌজন্যের পর আজ তিনি বাগান দেখিতে আসিয়াছেন, বাগানের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা করা উচিত নয়। অনেক জেদাজেদির পর তিনি নিরস্ত হইলেন। আমাকে আবার অনেক কথা বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন রাস্তায় কষ্ট হইবে, কিন্তু দেব দর্শনে যাইতেছেন, কষ্ট স্বীকার করিতে ভীত হইবেন না, ভগবৎ কৃপায় সকলই ঠিক হইয়া যাইবে। ফিরিবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই রাস্তায় ফিরিলে অবশ্যই দেখা করিব প্রতিশ্রুত হইলাম, শেষে দেবীজীর আজ্ঞা লইয়া পথে অগ্রসর হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

মুসলমান যুগের মথুরা

যদুবংশ।

হরদত্ত ও কুলচন্দ্রের নাম, মুসলমান লিখিত ইতিহাস হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু তাঁহারা কোন্ বংশ জাত, অথবা তাঁহাদের সম্বন্ধে অপর কোন বিবরণ কোথাও পাই নাই।

যাদন বা যাদব নামে শৌরসেনী ক্ষত্রিয়দিগের একটী শাখা মথুরা মণ্ডলে আজিও বাস করেন। তাঁহারা

আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

স্যার-আলেক্‌জেণ্ডার ক্যানিংহাম সাহেব তাঁহার আর্কিওলজিকেল সার্ভে গ্রন্থে ২০শ খণ্ডের, ৫ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন, বজ্রনাভের পর হইতে গজনী মামুদের সময় পর্য্যন্ত মথুরার ইতিহাস অনেকটা তিমিরাবৃত। যাদবগণের বংশধরদিগের মধ্যে অধুনা কেবল চম্বল নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র করৌলী রাজ্যে এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত, উক্ত নদীর পূর্ব্বতীর অবস্থিত সবলগড় বা যাদনবতী নামক স্থানে উঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনার পূর্ব্বদিকে সোহানা ও আলোয়ার হইতে পশ্চিমে চম্বল নদী পর্য্যন্ত এবং যমুনা নদীর তীর হইতে দক্ষিণে সবলগড় ও করৌলী রাজ্যের অনেক গ্রামে যদুবংশীয় বহু সংখ্যক লোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী যাদবগণকে তথাকার লোকেরা খাঁজাদা বা মিঞা বলিয়া থাকে।

যাদব বলিলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশোদ্ভব বলিয়া বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের পর করৌলী রাজবংশের বংশ তালিকায় মধ্যে ৭৬ জন রাজার নাম পৌরাণিক বা কাল্পনিক বলিয়া অনুমান হয়। ৭৭ সংখ্যক রাজার নাম ধর্ম্মপাল। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্মপালের পর একাদশ নরপতির নাম বিজয় পাল। তিনি বিজয় মন্দর গড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আগ্রা হইতে জয়পুর যাইবার পথে বায়ানা বা বয়াদ নামে একটী সহর আছে, তাহার সংস্কৃত নাম শ্রীগাথা। সেই সহরে বাহরি-ভিতরি মহল্লায় একটী মস্‌জিদ্ আছে, সেই মস্‌জিদের স্তম্ভগুলি কোনও হিন্দু বিনির্ম্মিত মন্দির হইতে আনিয়া এই মস্‌জিদে লাগান হইয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব ঐ স্তম্ভগুলির একটীর গাত্রে একটী প্রাচীন লিপি দেখিতে পাইয়াছেন তাহাতে বিজয় পালের নামের সহিত ১১০০ সংবৎ (১০৪৩ খৃঃ) খোদিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই মসজীদের অপর একটী স্তম্ভগাত্রে যে লিপি পাইয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, যদুবংশীয় কক্কের বংশধর রাজইক নামক রাজার কন্যা চিত্রলেখা ১০১২ সংবতে শ্রীগাথা নগরে নারায়ণের (বিষ্ণুর) একটী মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন। এবং দেব সেবার জন্য চারি খানি গ্রাম দান করেন। সুতরাং ৯৫৫ খৃঃ চিত্রলেখা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা এইরূপ দুই একটা ভগ্ন শিলালেখ হইতেই তাৎকালীন যদুবংশীয়গণের যৎসামান্য পরিচয় পাই।

সে যাহা হউক, বিজয় পালের পুত্র তহন পাল বয়ানা হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে বেলে পাথরের পর্ব্বতোপরি তহন গড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তহন পালকে আমরা সংবৎ ১১৩০ বা ১০৭৩ খৃঃ লোক বলিয়া অনুমান করিতে পারি। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী খাঁজাদা নামক যাদবেরা এই তহন পালকেই তাঁহাদের আদিম পুরুষ বলিয়া থাকে। মোহম্মদ ঘোরি ও তাঁহার সেনাপতি কুতবুদ্দিন্ আইবাক্ প্রথমে বয়ানা জয় করিয়া কুমার পাল নামক বিজয় পালের তাৎকালীন বংশধরকে তহন গড় পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া, মুসলমান দিগের ইতিহাসে লিখিত আছে। মুসলমানেরা তহন গড় আক্রমণ করিলে পর, কুমার পাল করৌলী চলিয়া যান। এখানেও মুসলমানদিগের উপদ্রব দেখিয়া তিনি চম্বল নদী পার হইয়া সবল গড় বা যাদনবতীর নিকটস্থ জঙ্গলে পলাইয়া যাইয়া সপরিবারে বাস করেন। কুমার পালের বংশধরেরাই পরবর্ত্তী কালে করৌলীতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। এবং যাদনবতী বা সবল গড় নামক প্রদেশকে আপনাদিগের অধিকার ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ১৬৭০ খৃঃ আওরঙ্গজেবের ভয়ে বৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি দেবমূর্ত্তি জয়পুরে প্রেরিত হইয়াছিল। করৌলির রাজা গোপাল সিংহ সেই সব দেবমূর্ত্তি গুলির মধ্য হইতে সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদন মোহন দেবের মূর্ত্তিটীকে নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া সেবার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন ও তৎসঙ্গে গৌড়ীয় (বাঙ্গালী) পুজারীগণকে আপন রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই

সকল পূজারীদিগের ভাষা ও পরিচ্ছেদ দেখিলে তাহাদিগকে কোনক্রমে বাঙ্গালী বলিয়া এখন চিনিতে পারা যায় না।

এবার আমরা যদুবংশীয় তহন পালের সন্তানগণ মধ্যে যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই কিছু কিছু পরিচয় দিব। তহন পালের পুত্র বন্দোপাল, তাঁহার পুত্র আস্তুপাল, তাঁহার পুত্র অধম পাল, তৎপুত্র লক্ষ্মণ পাল। শেষোক্ত ইনি বোধ হয় ফিরোজশা তোগলকের প্রলোভন বা প্রপীড়নে পড়িয়া প্রথমে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার দুই পুত্র সম্বর পাল ও সপর পাল। সম্বর পালের মুসলমানী নাম বাহাদুর খাঁ। ইনি একাকী একটা বাঘ মারিয়া ফিরোজ শা তোগলকের নিকট হইতে নাহার (বাঘ) উপাধি ও সেনানী মধ্যে উচ্চ পদ লাভ করেন। ইঁহার ভ্রাতা সপর পাল, ছেজ্জা খাঁ নামে ফিরোজ শা তোগলকের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন।

ফিরোজ শা তোগলক (১৩৫১ – ১৩৮৮ খৃঃ) আত্মজীবনীতে দম্ভ ভরে লিখিয়াছেন, "আমি আমার রাজ্যান্তর্গত কাফেরগণকে লোভ দেখাইয়া জিজিয়া ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিয়া, মুসলমান ধর্ম্মে আনিবার জন্ত উৎসাহিত করিয়াছি। মুসলমান হইলে জিজিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে না এই সংবাদ হিন্দু প্রজাগণের কর্ণগোচর হইবা মাত্র নানা দেশ হইতে হিন্দুরা দলে দলে আসিয়া আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। আমিও তাহাদিগকে জিজিয়া ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দিয়া এবং সম্মান দেখাইয়া পুরস্কার দিয়াছি।" ইঁহার জীবনীর অন্যত্র আছে, "যে সকল কাফের নগরে বা ইহার উপকণ্ঠে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদের প্রধানগণের প্রাণদণ্ড করিয়াছি। অধীনস্থ জনগণকে কশাঘাত করিয়াছি। মলু নামক এক গ্রামে একটী বিশাল সরোবর বা কুণ্ড তীরে দেব স্থাপন হইয়াছে জানিয়া মেলার জন্য সহস্র সহস্র লোক জমা হইয়াছিল, আমি সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া স্বয়ং যাইয়া দলপতির প্রাণদণ্ড ও অধস্তনদিগের সাজা দিয়াছি, মন্দিরটা ভাঙ্গিয়া মসজিদ্ করিয়াছি।" কেবল মলু গ্রাম নহে, তিনি আরও পাঁচ সাত খানা গ্রামে দেবতা ভঙ্গ, প্রাণদণ্ড ও হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ পূজার উপকরণ প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছিলেন। (Elliot সাহেব লিখিত History of India তৃতীয় ভাগের ৩৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন।) তারিখই ফিরোজশাহী গ্রন্থে লিখিত আছে, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দিল্লীর উপকণ্ঠে কাষ্ঠফলকে কি একটা দেবমূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিতেন। তথায় সময় সময় হিন্দুরা সমবেত হইত ও পূজা দিত। ফিরোজশা তাহা জানিতে পারিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া নিজ প্রাসাদের সম্মুখে সেই কাষ্ঠফলকে বাঁধিয়া জীবন্তে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে আগ্রায় যাইবার মধ্য পথে ব্রাহ্মণপ্রধান মথুরানগরে হিন্দুদিগের প্রতি কিরূপ উৎপীড়ন হইয়াছিল, তাহা কোন পুস্তকে লিখিত না থাকিলেও সহজেই অনুমান করা যায়। মলু নামক যে গ্রামের নাম করিয়াছি সেটা মথুরা কিনা বলিতে পারিলাম না। এই আগ্রা সহর পূর্ব্বকালে অগ্রবন নামে হিন্দুদিগের তীর্থস্থান ছিল। এখানে পরশুরামের মাতা রেণুকার নামে একটী গ্রাম ছিল। মুসলমানদিগের সময় হইতে পরশুরামের জন্মভূমি তাঁহাদিগের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে।

আইন আকবরিতে আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে, যদুরা (যাদব?) রাজপুতেরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খাঁজাদা উপাধি পাইয়াছে। হুমায়ুন ভারতে ফিরিয়া আসিয়া জামাল খাঁ নামক একজন খাঁজাদার কন্যাকে নিজে বিবাহ করেন, তাঁহার সচিব বায়রাম খাঁ তাঁহার অপর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। বায়রাম খাঁর পুত্রের নাম আবদাল রহিম, আকবরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি, অপর নাম খান্ খানান্। খাঁজাদা ও মিওা দিগের মধ্যে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে দুই একটা হিন্দু প্রথা আজও প্রচলিত আছে। এই খাঁজাদাদিগের মহিলারা উল্কি পরেন। খাটি মুসলমানেরা তাহা করেন না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেশ সঙ্গতিপন্ন ভূম্যধিকারী, অন্যেরা কৃষিজীবী।

এবার আমরা মথুরা নগরের বহির্দ্দেশের দুইটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে, মন্দির ভগ্ন করিয়া মস্‌জিদ্ করিবার বিবরণ দিব। মথুরা হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে যমুনার পূর্ব্ব-তীরে যে মহাবনে কুলচন্দ্রের দুর্গের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তথায় প্রাচীন কালে, একটী সুন্দর পাষাণ নির্ম্মিত মন্দির ছিল। গ্রাউজ্‌ সাহেব বলেন, আলাউদ্দিন (১২৯০-১৩২০ খৃঃ) সেইটাকে ভগ্ন করিয়া আশীটী স্তম্ভ বিশিষ্ট একটী মস্‌জিদ করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য এই বাটীর নাম 'আশী খাম্বা' হইয়াছে। ঐ স্তম্ভগুলির মধ্যে আঠারটী স্তম্ভ পূর্ব্ব হিন্দু মন্দিরের যথাস্থানে স্থাপিত রহিয়াছে। নয় থাক ছাদের মধ্যে পাঁচ থাক ছাদ আজিও পূর্ব্বগঠনে রক্ষিত। প্রতি শ্রেণীতে ১৬টী করিয়া পাঁচ শ্রেণীতে আশীটী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ ও প্রাচীন ছাদের কারুকার্য্য দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে সেগুলি ভারতীয় ভাস্করের হস্তে নির্ম্মিত। তবে বৌদ্ধ বা হিন্দু কাহাদের মন্দির ছিল তাহা চিনিতে পারা যায় না।

আধুনিক হিন্দুদিগের মতে এটি নন্দ ভবন। ইহার অপর নাম "ছটি পালনা" বা যশোদার সূতিকাগার। বসুদেব মথুরার কারাগার হইতে এই গৃহে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া সদ্য প্রসূতা যোগমায়া দেবীকে লইয়া গিয়াছিলেন।

ইহার নিকটেই কুলচন্দ্রের প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ টিলার আকারে পড়িয়া আছে। তাহার নিকটে একটী নিম গাছের তলায় সৈয়দ্ ইয়াহিয়া নামক একজন মুসলমান সাধুর কবর আছে। ক্যানিংহাম সাহেব এই মহাবনে যদুবংশীয় অজয় পালের নামাঙ্কিত একখানা শিলালিপি পাইয়াছেন। তাহাতে সম্বৎ ১২০৭ (১১৫০ খৃঃ) লিখিত আছে। পূর্ব্বোক্ত বেয়ানা গ্রামে মস্‌জিদের স্তম্ভ গাত্রে যদুবংশীয় রাজগণের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অজয় পাল, বিজয় পাল দেব হইতে চতুর্থ স্থানে লিখিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে শূরসেন পুরী বা মথুরা মণ্ডল তখন যদুবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

অজয় পালের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে কুলচন্দ্রের সময় গজনীর মামুদ এই স্থান লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সম্রাট সাহাজানের সময়ে এ স্থান গুলা বন জঙ্গলে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। তিনি এখানে, অন্য বন্য জন্তুর সহিত চারিটা বাঘ শীকার করিয়াছিলেন। আজকাল এখানে ইংরাজ রাজের তেসিল আফিস বসিয়াছে। এখন মহাবনের চারিদিকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার স্থান বলিয়া অনেকগুলি মন্দিরাদি পরবর্ত্তী কালে স্থাপিত হইয়াছে। এখান হইতে এক মাইল দক্ষিণে গোকুল নগরে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়দিগের অনেক মন্দিরাদি রহিয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধে কেবল মুসলমানদিগের আমলের কথাই বলিব, অবশিষ্ট বিবরণ যাত্রা প্রসঙ্গে দিবার ইচ্ছা রহিল।

মুসলমান কর্ত্তৃক ভগ্ন আর একটী প্রসিদ্ধ মন্দিরের কথা বলিব। সে স্থানের নাম কাম্যবন। আধুনিক চলিত নাম কামান। দিল্লী হইতে বেয়ানা যাইবার পথে দুইটী অনুচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে কাম্যবনের পুরাতন ভগ্ন দুর্গ পড়িয়া রহিয়াছে। এ স্থান মথুরা হইতে উত্তর পশ্চিমে ৩৯ মাইল। দেশ ভবন হইতে ১৪ মাইল উত্তরে। এখন ভরতপুর রাজের এলাকার অধীন। এখানকার প্রধান দেবতা গোবিন্দজী ও বৃন্দাদেবী। এখানে একটী প্রাচীন স্তূপ বা টিলা আছে, সেটি পূর্ব্বদিকে ৩০ ফুট, পশ্চিমদিকে ৫০ ফুট উচ্চ। এখানকার অধিকাংশ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি রাধাকৃষ্ণের লীলার সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবেরা কাম্যবনকে যশোদার পিতৃ-ভবন বা শ্রীকৃষ্ণের মাতুলালয় বলিয়া মনে করেন। একটী পাহাড়ের উপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন রহিয়াছে ও একটী পর্ব্বতগাত্রে বোমাসুরের গুহা নামে একটী প্রাচীন গুহা আছে। এখানে চৌষট্ট খাম্বা নামে যে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন গৃহ আছে সেইটীর মাপ ৫২ ফু ৮ইং × ৪৯ ফু ৮ইং।

ইহাতে যে ৬৪টী স্তম্ভ আছে তাহার কয়েকটী থাম দুইটী করিয়া ছোট থাম যোড়া দিয়া একটী করা হইয়াছে। কতকগুলা থাম লাল পাথরে, কতকগুলা

ধূসর পাথরের। বাটীটা উচ্চ ১৪ ফুট। অনেকগুলা স্তম্ভের গাত্রে নানা দেবমূর্ত্তি খোদিত ছিল। এখন তাহা চাঁচিয়া তুলিয়া দিলেও কালী, গণেশ, বিষ্ণু, নরসিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তি ছিল বলিয়া বেশ চেনা যায়। স্তম্ভের গাত্রে দুই একটা গোলাকার বা অর্দ্ধ গোলাকার ফ্রেমের ভিতর ময়ূর কুম্ভীর প্রভৃতি জীব জন্তুও অঙ্কিত আছে। কোথাও বা নাগ নাগিনীরা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। দুই একটা বিকট-মুণ্ড অসুর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আছে। এইটীতে বৌদ্ধগণের কোন চিহ্ন মাত্র নাই। খাঁটি হিন্দু মন্দিরের উপাদান হইতে একটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনভিজ্ঞ ব্রজবাসীরা এইটীকে পাণ্ডব গণের অজ্ঞাত বাস কালে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলিবার গৃহ বলিয়া থাকে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার গাত্র সংলগ্ন একটী শিলালিপি দেখিয়া বলিয়াছেন যে, যদুবংশীয় কক্ক নামক একজন রাজা এখানে যে বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, পাঠান সম্রাট আলতামাস্ সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া সেইটীকে মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছিলেন। পরে ভরতপুরের জাঠ রাজাদিগের আমলে, মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এখন হিন্দুদিগের অধিকারে আসিয়াছে। এই কাম্যবনের চারিদিক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন কালে এ স্থান পূর্ব্ব কথিত যদুবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত কোন নগর ছিল। তাঁহারাই দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন চারিদিকে সেই ভগ্নাবশেষ গুলিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান রূপে যাত্রিগণকে দেখান হইয়া থাকে।

অশী খাম্বা। মহাবনে নন্দভবন, 'ছটি পালান' বা যশোদার সূতিকাগার

১৬৭০ খৃঃ আওরঙ্গজেবের উপদ্রব ভয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা, বৃন্দাবন হইতে রূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীপাদের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি গুলিকে লইয়া আসিয়া এই কাম্যবনে, ভরতপুর রাজার এলেকায়, কিছুদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে সুযোগ বুঝিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জয়পুরের রাজার নিকট লইয়া যান। সেই সকল দেবমূর্ত্তির মধ্যে কেবল বৃন্দাদেবীর মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বলিয়া এখানে রহিয়া গিয়াছে। এখানে ও ব্রজমণ্ডলের অপর সকল স্থানে, যে সকল দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির অধিকাংশই আওরঙ্গজেবের পরে নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত।

মথুরা নগরের বাহিরে ব্রজমণ্ডলের অপরাপর স্থানে ক্যানিংহাম সাহেব যে সকল বৌদ্ধযুগের ভগ্নাবশেষ পাইয়াছেন, এখন তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। সেই গুলি কোন সময়ে বা কাহা কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

(১) পালিখেড়া গ্রাম মথুরা হইতে ২॥০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। (খেড়া শব্দের অর্থ mound স্তূপ বা টিলা)। গ্রাউজ সাহেব ১৮৭৩ খৃঃ এখানে একটী গ্রীকদিগের সুরাদেবের মূর্ত্তি (Bacchanalian group) পাইয়াছিলেন। ইহাতে ছয়টী মানবমূর্ত্তি। ইহার প্রধান মূর্ত্তি স্থূলোদর ও দিগম্বর অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণ পদ ও মুখটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বুকের উপর অল্প দাড়ির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বাম হস্তটা ক্রোড় দেশে স্থাপিত,

দক্ষিণ হস্তে একটী সুরাপানের পাত্র (cup) ধরিয়া আছেন। দক্ষিণ জানুর নিকট একটী ভগ্ন মূর্ত্তি বালক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে একটী গ্রীকদেশীয় ঘাগরা পরা নারী দাঁড়াইয়া আছে। নারীর মাথায় টুপিটা গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পকলাত্মক। টুপির নীচে হইতে তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধে পর্য্যন্ত ঝুলিয়াছে। কর্ণে কুণ্ডল ও কণ্ঠে রত্নহার। দক্ষিণ হস্তে তিনিও একটী বড় পানপাত্র ধরিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে অপর একটী নারী মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহারও পরিচ্ছদটা পূর্ব্ববর্ণিত নারী গ্রীক পরিচ্ছদের অনুরূপ। সর্ব্ব পশ্চাতে অপর একটী ভগ্ন পুরুষ মূর্ত্তি আছে। প্রধান মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে একটী বালক যেন কতকগুলি আঙ্গুরের গুচ্ছ হাতে করিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের পরিচ্ছদ গুলি কতকটা কুশান রাজগণের সময়ের মত। উপরি ভাগে যেন একটী অশোক বৃক্ষের শাখা ও পল্লব দেখা যাইতেছে। এই মূর্ত্তিগুলির পশ্চাৎ ও পৃষ্ঠ দিকে স্থূলোদর মূর্ত্তিটী যেন সুরাবিহ্বল ভাবে দুই হস্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ ও বাম দিকে গ্রীক পরিচ্ছদ ধারী একটী পুরুষ ও একটী নারী মূর্ত্তি প্রসারিত হস্তদ্বয় ধরিয়া আছে। তাহাদের পায়ের নিকট দুইটী বালকও দাঁড়াইয়া আছে। সকল মূর্ত্তিরই মুখ ভাঙ্গা। সাহেবদের মধ্যে কেহ এই মূর্ত্তি গুলিকে (Sileneus) গ্রীকদিগের সুরাদেবের মূর্ত্তি বলেন। ভোগল সাহেব কিন্তু এই দুইটীকে জম্ভলা বা বৌদ্ধদিগের কুবেরের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। ১৭৩৬ খৃঃ কর্ণেল ষ্ট্রেসী সাহেব মথুরার প্রান্তভাগের কোন স্থান হইতে এইরূপ আর একটী দুইহস্ত ছড়ান সুরাবিহ্বল মূর্ত্তি পাইয়া কলিকাতার যাদুঘরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কাম্যবন। চৌষট্ খাম্বা

এখানে আমরা আরও দুই একটি কথা বলিব। মথুরা সহরেই দুইটা ভাঙ্গা গ্রীকবীর হার্কুলিশের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। হার্কুলিশ একটা ভীষণ সিংহকে নিহত করিয়া একজন সুন্দরী রাজকুমারীর পাণিলাভ করেন। মথুরায় প্রাপ্ত মূর্ত্তি দুইটায় সিংহ, হার্কুলিশের মুণ্ড ও হস্তাদি ভাঙ্গা। তাহাদের একটা মূর্ত্তি কলিকাতার যাদুঘরে আসিয়াছে। অপরটা মথুরায় আছে। এখানে একটি প্যালাস (Pallas) বা মিনর্ভা (আমাদের যেমন সরস্বতী) নামে বিদ্যাদেবীর মূর্ত্তি মিলিয়াছে। সেটির সম্মুখ দিকটা একেবারে ভাঙ্গা ও অস্পষ্ট, পশ্চাৎ দিকের বেণী ও বসনাদি অবিকৃত। এই সকল গ্রীক মূর্ত্তি সম্ভবত গ্রীকরাজ মিনিন্দ (Minandu) বা কুশান রাজদিগের সময়ে মথুরায় আসিয়া থাকিবে।
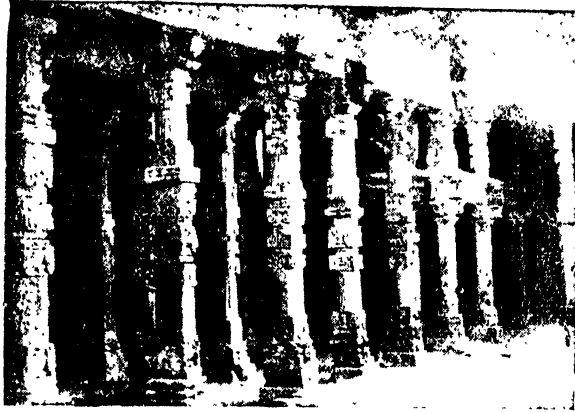
(২) মোরা বা মোরমেই গ্রাম।—মথুরা হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে মোরাগ্রামে একটী কূপের উপরিস্থিত ছাদের আলিসার গায়ে ১১ ফুঃ × ৩ফুঃ একখানা শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে শকরাজ মহাসত্রপ রাজুবলের ও তাঁহার ভাগবতপুত্র বৃষসেনের নামাঙ্কিত আছে। ইহার অর্দ্ধেকটা লিপি পাওয়া গিয়াছে। বাকী অর্দ্ধেকটা ছাদ নির্ম্মাণকালে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। এই ভাগবত শব্দ হইতে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে এখানে কোন বিষ্ণুমন্দিরের গাত্রে সংলগ্ন ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি। *

(৩) আনোর বা অন্নকূট গ্রাম।—মথুরা হইতে

শক্তিক্রোড়ে শঙ্কর

শক্তিক্রোড়ে গণপতি

৯।১০ মাইল দূরে গিরিগোবর্দ্ধনের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে এই অন্নকূট গ্রাম। এখানে একটী ৭ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার পাদপীঠে লিখিত আছে; 'মাতা পিতা ও সর্ব্বপ্রাণিগণের হিতজন্য হারুশাবাসী শুষা এই বুদ্ধমূর্ত্তিকে হারুশাবিহারে দান করিলেন।'

(৪) কোটা বা কটক বন।—মথুরার ৩ মাইল উত্তরে দিল্লী রোডের পশ্চিম দিকে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটী পুরাতন বৃহৎ কুণ্ডতীরে ১৬।১৭টা বৌদ্ধ-দেবালয়ের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভগুলির গাত্রে কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তি অঙ্কিত। একটী বৃক্ষতলে দুইটী দণ্ডায়মান নারীমূর্ত্তি ও একটি পাগড়ী বাঁধা পুরুষের ভগ্নমুণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি দেখিয়া বোধ হয় যেন এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ দেবালয় ছিল।

(৫) চৌ মোহা।—মথুরা হইতে দিল্লী যাইবার পথে ১০ মাইল দূরে সেকালের একটী বাদশাহী সরাই ছিল। তথায় একটী চতুষ্কোণ স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে।

বেণুবাদিনী

তাহার চারিকোণে চারিটা সিংহ আঁকা। মধ্যে মধ্যে নগ্ন নারীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। সে সরাইটা সেরশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া খ্যাত।

(৬) তুহমৌনা।—মথুরা হইতে ২১ মাইল দূরে এই গ্রামে ৭ ফুট উচ্চ একটী ভগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

(৭) মাহওয়ান্।—এ স্থানটা মথুরা হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে আগ্রা যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে একটা ভগ্ন সোপান তলে উপবিষ্ট পুণ্ডরীকবর্ণা নাম্নী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মাঠগ্রামে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলার কথা কণিস্ক প্রবন্ধে বলিয়াছি। আমাদের এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল মথুরা সহরে নহে, মথুরার চতুষ্পার্শ্বে দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহেও এক সময়ে বৌদ্ধগণের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়।

গ্রীকদিগের সুরাদেব (পানারম্ভে)

নির্ম্মমভাবে দেবপ্রতিমাভগ্নকারী একজন পাঠান সম্রাটের বিষয় এবার আমরা বলিব, তাঁহার নাম সেকন্দর লোদী। তিনি ১৪৮৯—১৫১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সময়ের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখিতেছেন যে, সেকন্দর লোদী কাফের ও বিধর্ম্মিগণের আকর Mine of Heathenism) মথুরা নগরকে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান হিন্দু দেবালয়গুলিকে ভাঙ্গিয়া সরাই বা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া পাথরের দেবমূর্ত্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কসাইগণকে মাংস ওজনের বাটখারা জন্য দিয়াছিলেন. কাফেরদিগকে মস্তক বা দাড়ী কামাইতে নিষেধ হইয়াছিল। পুণ্যযোগে কোনও তীর্থস্থানে স্নান করা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল। তিনি এইরূপে কাফেরগণের পৌত্তলিক পূজার্চ্চনা সমস্তই লোপ করিয়া দিয়াছিলেন। কোন হিন্দুই মস্তক বা দাড়ী কামাইতে চাহিলে নাপিত পাইত না। (H. M. Elliot's History of India, Vol IV, p. 447) কেবল ইহাই নহে, আমরা বৃন্দাবনে প্রাচীন ব্রজবাসিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, সেকন্দর লোদীর আদেশে মথুরার চৌবেগণকে মুসলমানগণের জন্য কবর খনন করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ অমাত্য বীরবলের অনুরোধে উদারহৃদয় সম্রাট আকবর সেই জঘন্য লজ্জাকর প্রথা প্রত্যাহার করেন।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

---

*। শকমত্রপগণের মধ্যে সোদাস ও রাজুবলের পুত্র বৃষসেন ভাগবত (বিষ্ণু উপাসক) বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহারা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক। অপর শক সত্রপেরা কেহ শৈব কেহ বৌদ্ধ ছিলেন। এই সোডাস ও বৃষসেনের ভাগবত নাম হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে মথুরা প্রদেশে ভাগবতধর্ম্ম (বিষ্ণু উপাসক বা বৈষ্ণবধর্ম্ম) প্রচলিত ছিল। গুপ্ত সম্রাটেরা বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই ভাগবত ধর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

গ্রীকদিগের সুরাদেব (পানান্তে)

লেপ্‌চা জাতির কথা

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থোল্লিখিত কিন্নর জাতিই বর্ত্তমানে লেপ্‌চা জাতির পূর্ব্বপুরুষ। লেপ্‌চাগণ যেরূপ সুকণ্ঠ, নৃত্যনিপুণ ও ধনুর্ব্বিদ্যাকুশল তাহাতে পণ্ডিতগণের এ অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না।

কিন্নরোপম সুন্দর বাহ্যিক আকৃতির অনুরূপ ইহাদিগের অন্তরখানিও অতি কোমল। কিন্তু ইহারা একদিকে যেমন সরল ও অমায়িক, অন্যদিকে আবার তেমন উগ্র ও ভীষণ। লেপ্‌চা স্ত্রী পুরুষ প্রয়োজন বোধে কঠিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করে এবং নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত হইলেও কখনও চৌর্য্য বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না।

ইহারা বাঁশ হইতে অতি উৎকৃষ্ট গৃহসজ্জা, আসন ও ভোজনপাত্র, এবং অব্যবহার্য্য ছিন্ন পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা "লেপ্‌চা-চাদর" নামক অতি সুন্দর চাদর প্রস্তুত

করিয়া থাকে,—লেপ্‌চা রমণীগণের গৃহশিল্প একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

লেপ্‌চা পুরুষেরা "দম" ও "কু" * নামক দুই প্রস্থ পোষাক পরিধান করে, এবং কোথাও গমনাগমন করিতে হইলে কটিদেশে "বাণ" নামক একহস্ত পরিমিত দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি প্রস্থ তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা বহন করে। পোষাকগুলি সাধারণতঃ রেশম বা মখমল নির্ম্মিত এবং দেখিতে অনেকটা ঢিলা চাপকানের মত। স্ত্রীলোকেরা হাতাহীন দম্ নামক পোষাক মাত্র ব্যবহার করে এবং কেশ সংস্কারকালে কেশগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বেণীর আকারে পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেয়, কখনও বা লম্বিত বেণী দুটীকে ঊর্দ্ধদিকে মস্তকের পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া সীমন্ত দেশে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না। লেপ্‌চাদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ না থাকিলেও সাধারণ লেপ্‌চাগণ, বানর ও সর্পভুক্ লেপ্‌চা এবং "তামসাংবু" লেপ্‌চাগণের সহিত কোনরূপ সামাজিক সংশ্রব রাখে না।

যে সময়ে সিকিম ভুটান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল ঐ সময়ে তিস্তা নদীর পূর্ব্ব তীরবাসিগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিনা যুদ্ধে ভোট সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সিকিমী লেপ্‌চাগণ ইহাদিকে ঘৃণিত "তামসাংবু" অথবা "দাস" আখ্যা প্রদান করিয়াছে।

লেপ্‌চাদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, জগতে যতদিন বানরজাতি জীবিত থাকিবে, ততদিন লেপ্‌চাজাতিও অস্তিত্ব রহিবে—বানরের সহিত লেপ্‌চার জাতিগত বিশেষ কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা শুধু পণ্ডিতগণই বলিতে পারেন।

লেপ্‌চা মহিলা

লেপ্‌চা সমাজে পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়ঃক্রম অধিক হওয়া বিশেষ আপত্তিজনক বা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। গোপনে কোন যুবকের সহিত কোন যুবতীর প্রণয় সংঘটিত হইলে তাহা কৌশলে অভিভাবকগণের গোচরে আনীত হয়, এবং গ্রামের প্রধানগণের সম্মতিক্রমে উভয়ে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

বিবাহে কন্যার পিতা বরপক্ষের নিকট হইতে পাত্রীর মূল্যস্বরূপ পণ গ্রহণ করিয়া থাকেন; পণের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রেই বরের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বিবাহের সম্বন্ধ "পিবু" বা ঘটকের দ্বারাই সংস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং বরপক্ষকে বিবাহের প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই পিবুর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। দেশের সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁহারা কোন বিষয়েই তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন না।

এদেশের কোথাও "মেয়ে দেখা" প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং বরপক্ষকে পূর্ব্বেই কোন কৌশলে পাত্রী দেখিয়া লইতে হয়। তবে, অবরোধ প্রথার প্রচলন না থাকা বশতঃ এ বিষয়ে কাহাকেও কোন বেগ পাইতে হয়না।

* দম্—নীচের পোষাক, কু=উপরের পোষাক।

নির্দ্ধারিত দিনে বর সদলবলে পাত্রীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, লামা, সমবেত আত্মীয় কুটুম্বগণের সমক্ষে বরকন্তাকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং বর, বিবাহের নিদর্শন সূচক "ককেভ" বা অঙ্গুরীয়, "বাদো" নামক একখণ্ড রেশমী রুমাল এবং কিছু অলঙ্কার কনেকে উপহার দিয়া থাকেন। "ইয়েনকু" অর্থাৎ যিনি কন্তাকে শৈশবাবস্থা হইতে পালন করিয়াছেন, কন্তার পিতার নিকট হইতে পণলব্ধ অর্থ ও উপঢৌকনাদির কিয়দংশ প্রাপ্ত হ'ন।

বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি সমাধা হইলে উভয়পক্ষের আত্মীয় কুটুম্বগণকে ছার মদ্য, মাংস, ও পিষ্টকাদি সংযোগে ভোজন করান হয়। ভোজনকালে সাধারণ নিমন্ত্রিতগণকে ছার অর্থাৎ তরল মদ্য ও বিশিষ্টগণকে "চোঙা" * নামক মদ্য পান করিতে দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন উভয় পক্ষের পূজনীয় ও সম্মাননীয়গণকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন মানসে, পৃথক পাত্রে করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঁচা মাংস পরিবেষণ করা হইয়া থাকে।

পাত্রীর বাটীতে বিবাহ রাত্রির এ ভোজের সমুদায় ব্যয়ভার বরকেই বহন করিতে হয়। ফল কথা কন্তার বিবাহের নিমিত্ত পিতাকে আদৌ কোনরূপ কষ্ট বা ব্যয়

স্বীকার করিতে হয় না; ব্যাপারটী যেন বরপক্ষের দায় এমনিভাবে সম্পন্ন হইয়া যায়। নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বর আত্মীয় কুটুম্বগণকে আর একটি বিবাহভোজ প্রদান করিয়া থাকেন।

স্বামীস্ত্রী উভয়ের জীবদ্দশায় কেহই অন্য পত্নী বা পতি গ্রহণ করিতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কাহারও অন্যাসক্তি বা দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে দুজনের একেচ্ছা ইচ্ছানুসারে দাম্পত্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে এবং অপরাধী স্বামী বা অপরাধিনী স্ত্রী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

লেপ্‌চা সমাজে বিধবা বিবাহের প্রভূত প্রচলন থাকিলেও স্বামী-পরিত্যক্তা ভ্রষ্টা নারীকে কেহই পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। কুলত্যাগিনী দুশ্চরিত্রাগণকে চীনীয়গণ কখন কখন উপপত্নীরূপে লইয়া যায়।

স্বামী বিয়োগ ঘটিলে লেপ্‌চা রমণী দেবরগণের মধ্যে কাহাকেও, অথবা তদভাবে স্বামীর কোন আত্মীয়কে পতিত্বে বরণ করে। সামাজিক নিয়মানুসারে শ্বশুর বা তৎস্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি স্বামীবিয়োগ বিধুরা যুবতীকে পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ে সর্ব্বথা সাহায্য করিতে বাধ্য থাকেন। পিতৃনির্দ্দেশানুসারে পুত্র কন্তাগণ সকলেই পৈতৃক সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইতে পারে; পিতা ইচ্ছা করিলে কাহাকেও সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোনরূপ ওজর আপত্তি করিবার থাকে না।

বিবাহাদি সকল প্রকার সামাজিক ব্যাপারেই বৌদ্ধ

লেপ্‌চা বালক বালিকা (মুটিয়া)

* চোঙা—চাউল অথবা সর্ষপের ন্যায় একপ্রকার দ্রব্য "কোদ্রু" দ্বারা মসলাসংযোগে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। যখন চাউল বা কোদ্রুগুলি যাতিয়া উঠে তখন উহার কিয়দংশ বাঁশের চোঙার মধ্যে লইয়া তন্মধ্যে গরম জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক একটি সরু কঞ্চির নল সাহায্যে নির্গত সুরাসার পান করাকে "চোঙা" পান করা কহে।

লামাগণ লেপ্‌চাদিগের পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকেন। লেপ্‌চাগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে তাহাদিগের সে প্রাচীন বিশ্বাস এখনও দূরীভূত হয় নাই। ভূত প্রেতাদি দুষ্টযোনি গুলিকে গৃহ হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত ইহারা অঙ্গনে তীক্ষ্ণ ফলকাগ্র বিশিষ্ট সুদীর্ঘ বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাতে মন্ত্রাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া দেয়।

ভূতপ্রেতের উপাসক "বিজুয়া" দিগকে লেপ্‌চাগণ বিশেষ ভাবে ভয় করিয়া চলে। বিজুয়াগণ লোকের বাড়ী বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং কাহারও পীড়া হইলে, ভূত তাড়াইয়া মূর্খ পল্লীবাসীর নিকট হইতে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করে। হিন্দুদিগের ন্যায় লেপ্‌চা দিগের বিশ্বাস, যে গৃহ হইতে বিজুয়া অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়, সে পরিবারের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

জন্মান্তর সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশ্বাস তিব্বতীয়দিগের ন্যায়। পূর্ব্বে নাকি "পেমেলুস" নামক ধর্ম্মমঠে মৃতব্যক্তিগণের সম্পত্তি রক্ষিত হইত, এবং লামাগণ কাহাকেও "পূর্ব্বজন্মে অমুক ছিল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে মঠে আনয়ন করিয়া তাহার স্বরূপত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। দ্রব্যগুলি সনাক্ত করিতে পারিলে সে সমুদায় সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইত। সিকিম আক্রমণকালে ভোটকর্ত্তৃক এই ধর্ম্মমঠটি ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

শবসৎকার বিষয়েও লেপ্‌চাগণ তিব্বতীয়দিগের ন্যায়। মৃতব্যক্তিকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত গৃহকোণে রক্ষিত করিয়া লামার নির্দ্দেশানুসারে অগ্নিতে দাহ বা ভূমিতে প্রোথিত অথবা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে তিব্বতীয়গণের মৃতদেহ শববাহী ডোমকর্ত্তৃক শ্মশানে নীত হয় এবং মৃতের আত্মীয় কুটুম্বগণের মধ্যে কেহই শবানুগমন করে না, কিন্তু লেপ্‌চাদিগের মধ্যে মৃতের আত্মীয় কুটুম্বগণ নিজেরাই তাহার সৎকারাদি করিয়া থাকে এবং "গৃধ্রভোজন প্রথা" ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

অশৌচ পালনের বিষয়ে বিশেষ কোন রীতি নাই; "সোংলিয়ন" অর্থাৎ শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত মৃতের ভ্রাতা পুত্র প্রভৃতি নিকটাত্মীয়গণ বৈষয়িক কার্য্য হইতে বিরত থাকে মাত্র। "সোংলিয়নের" দিন লামার নির্দ্দেশানুসারে ধার্য্য হইয়া থাকে; মৃত্যুর দিন হইতে তিন মাসের পরেও "সোংলিয়ন" নিষ্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

বৎসরের মধ্যে বড়দিনই লেপ্‌চাদিগের প্রধান উৎসব। ফেব্রুয়ারীমাসের প্রথম সপ্তাহে—ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া একের পর অন্যস্থানে মিলিত হইয়া, লেপ্‌চা স্ত্রী পুরুষ পান, ভোজন ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা বড়দিন উৎসব সম্পন্ন করে। পুরুষেরা তীরধনুর সাহায্যে কৃত্রিম যুদ্ধ ও মৃগ শিকার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। উৎসবস্থলে ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবার নিজগৃহ হইতে আবশ্যকমত খাদ্যসামগ্রী ও মদ্য সঙ্গে লইয়া আসে, এবং ভোজনকালে সকলেই নিজ নিজ গৃহানীত সামগ্রী পৃথক বসিয়া ভোজন করে। পূর্ব্বকালে লেপ্‌চাদিগের মধ্যে গোপনে বিষদান প্রথার বহুল প্রচলন ছিল, এই নিমিত্তই বোধ হয় এখনও উৎসবাদি ব্যাপারে আহার বিষয়ে এরূপ প্রথার প্রচলন হইয়াছে।

জলস্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া অল্পব্যাপ্ত জলরাশি লতাপাতা সাহায্যে বিষাক্ত করিয়া মৎস্য শীকার লেপ্‌চাদিগের একটী মহানন্দজনক ক্রীড়া। *

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার।

---

* চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বিধাতার নির্ব্বন্ধ

(বড় গল্প)

১০

গুরুচরণ একা দাড়াইয়া রহিল। জলে মস্তক ও কাপড় জামার কিয়দংশ ভিজিয়া গিয়াছে। এক একটা বাতাসে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সে একমনে রমণীদের হাবভাব রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিল লাগিল।

অন্যমনস্ক ভাবে সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ একজন নারীকণ্ঠে তাহাকে পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে দাঁড়িয়ে ভিজেন কেন?"

গুরুচরণ পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল এক রমণী। বড় গাছটির পাশ দিয়া যে একটি সরু গলি চলিয়া গিয়াছে, তাহারই উপর দিয়া সে রমণীর অনুসরণ করিল। পথের দুই পাশে চাঁদের হাট বসিয়া গিয়াছে। গুরুচরণ মন্ত্রমুগ্ধের মত চলিতে লাগিল। অগ্রগামিনী রমণী একটি গৃহের দ্বারে দাঁড়াইল, গুরুচরণ তাহার নিকটবর্ত্তী হইল রমণী বলিল, "ভিতরে আসুন।"

ভিতরে আসিলেই চারি পাঁচজন যুবতী গুরুচরণকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের হাবভাব, হাস্যপরিহাস বিলাসবিভ্রমও সেই মেঘাচ্ছন্ন নিবিড় নীল আকাশের নীচে অবিরাম বিদ্যুৎস্ফুরণ ও বন্ধনহীন প্রমত্ত বজ্রের নির্ঘোষ তাহাকে কেমন বিমুগ্ধ অবশ করিয়া ফেলিল। আজ সে বুঝিল এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আত্মবিস্মৃত হইয়া যন্ত্রের মত চলিতে হয়।

সুসজ্জিত কক্ষে সুন্দর সুরভিত বেশে রূপের তরঙ্গে গুরুচরণকে বিহ্বল করিয়া স্বাধীন রমণীর দল কলরব তুলিয়া হাসিয়া মাতিয়া এক একখানি আনন্দ-প্রতিমার মত বিচরণ করিতে লাগিল।

গুরুচরণ নীরব। কথা কহিবার সামর্থ্য তাহার মোটেই ছিল না। বৃষ্টির কণ বহন করিয়া এক একটা ঠাণ্ডা বাতাস কক্ষের আলোকটিকে যত নিষ্প্রভ করিতে লাগিল, ততই সুন্দরীদের লাবণ্য অলঙ্কারপ্রভায় বিসর্পিত হইয়া কক্ষের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মোহিনী মায়ার সৃষ্টি করিয়া গুরুচরণকে ক্রমশঃ এক অদম্য মদির আবেশে ক্রমশঃ বিমূঢ় ও চেতনাবিহীন করিতে লাগিল।

গুরুচরণের মনে হইল যেন কোন কারাগার মধ্যে সে বন্দী; কিন্তু এ কারাগার হইতে সে মুক্ত হইতেও চাহিল না।

ঝম্ ঝম্ করিয়া দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গুরুচরণ ভাবিল—পরেশ বাবু তাহার সন্ধান পাইবে না। এত বৃষ্টিতে ভিজিয়া কে তাহার সন্ধান করিবে?

বেশীক্ষণ একথা ভাবিতে হইল না; দরজার দিকে চাহিয়া সে দেখিল পরেশ বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। গুরুচরণের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া পড়িল।

পরেশ বাবু বলিলেন "পণ্ডিত মশাই, এ কি ব্যাপার আপনার? এখানে কেন?"

গুরুচরণ বলিল, "পরেশবাবু এঁরা আমাকে টেনে আনলেন—আমি স্বেচ্ছায় আসিনি।"

"ও মাগো—একি মিথ্যে মা!" বলিয়া এক ষোড়শী গালে হাত দিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। পরেশ বাবু বলিলেন, "পণ্ডিত, মিথ্যেও বলতে শিখেছ নাকি?"

গুরুচরণ মস্তক অবনত করিল। পরেশ বাবু বলিলেন "এরা স্ত্রীলোক, মনে করলে তুমি চলে যেতে পারতে, তুমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ বলেই বোধ হয়। যাক্, এখন এখানে থাকবে না যাবে?"

গুরুচরণ নতমুখে উত্তর দিল, "যাব।"

একজন বিলাসিনী বলিল, "তাকি হয় পরেশ বাবু? আপনি বসুন কিছুক্ষণ; আমি এদের হাত হতে বাবুটিকে টেনে বার করি, বৃষ্টিটাও থেমে যাক।"

বৃষ্টি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। পরেশ বাবু বলিলেন "পণ্ডিত মশাই; এ সব সম্বন্ধ পাতালেন কবে?"

গুরুচরণ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। বলিল, "নিশ্চয়ই এ সব তোমার বদমায়েসী; তুমি ওদের বলেছ, তাই ওরা রাস্তা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

পরেশ বাবু বলিলেন, "পণ্ডিত মশাই দেখেছি বুড়ো খোকা। কিছু জানেন না।"

গুরুচরণ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাস্তার ধারে দোকানগুলির সম্মুখে কেরোসিন ল্যাম্পগুলির ধুম ও আলো, বিক্রয়ের জন্ম স্তূপীকৃত কুসুমরাশির স্পর্শ মলিন ছিন্নাবশেষ, আকাশে পুঞ্জীভূত মন্থর গতি মেঘরাশির রন্ধ্র নির্গত নক্ষত্র রশ্মি তাহার চক্ষের সম্মুখে এক অভিনব সৌন্দর্য্যের চিত্র জীবন্ত করিয়া তুলিল।

মেসে ফিরিতে রাত্রি হইল। গুরুচরণ পরেশ বাবুর সঙ্গে কোন কথা না কহিয়াই শয়ন করিল।

১১

এবার যখন গুরুচরণবাড়ী আসিল তখন তাহার চেহারার যে আর পূর্ব্বের লাবণ্য নাই তাহা সকলেই লক্ষ করিল।

করুণাময়ী বলিল, "আমি জমিদার বাড়ীর টাকা নিতে চাই না। এখন তুমি টাকা দাও, সংসার তো চালাতে হবে।"

গুরুচরণ বলিল, "আমি মাসিক কুড়ি টাকা ছাড়া এক কড়িও দিব না।"

"আমি টাকা কোথা পাব?"

"তোমার টাকা আছে—অত গহনা বন্ধক রেখেছ, তেজারতি কারবার চলছে। ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে না কেন?"

"মা আমাকে পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন; সেই টাকা কোথাও নাম মাত্র সুদে কোথাও বা বিনা সুদে ধার দিই। এখন পাঁচশ টাকা জমছে, কিন্তু সব পরের হাতে।"

"যেমন করে পার টাকা আন, আমার অবস্থা ভাল নয়।"

পরদিন গুরুচরণ কলিকাতায় যাইবার সময় লোহার সিন্দুকের চাবীটা করুণাময়ীর হাতে দিয়া বলিল, "চাবিটা রেখে দাও, হয়ত আমি এই শনিবার না আসতে পারি।"

করুণাময়ী নীরবে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, "কবে আসবে?"

গুরুচরণ দেখিল স্ত্রীর মুখে কাতরতার কোন চিহ্নই নাই, বরং ক্রোধ ও অভিমানের চিহ্ন আছে। সে উত্তর দিল, "আমার ঠিক নাই।"

করুণাময়ী চুপ করিয়া অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "চাবিটা দিলে কেন?"

গুরুচরণ বলিল, "যদি আজ কাল কোন লোক এসে গহনা চায়—"

করুণাময়ী কথা কহিল না। গুরুচরণ কলিকাতায় চলিয়া গেল।

বিষণ্ণ মনে গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া সে গহনার বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল দেখিল—সব গহনাগুলিই রহিয়াছে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান একটি হার পাওয়া যাইতেছে না।

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেদিন গহনার বাক্সের চাবী গুরুচরণ চাহিয়া লয়, সেদিন সকালে হারটি সে দেখিয়াছে।

করুণাময়ী জানিত স্বামী চিরকালই অন্যমনস্ক, কোন জিনিসটির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না। হয়ত কোন দিন চাবীটি তিনি হারাইয়া ছিলেন, কেহ হয়ত সেই চাবী দিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া হারটি অপহরণ করিয়াছে।

কিন্তু উপায় কি, আজই যদি অধমর্ণ টাকা দিয়া হারটি লইতে চায়, তাহাকে কি উত্তর দেওয়া যাইবে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে অধীর হইয়া উঠিল।

বেলা দ্বিপ্রহর; যৎসামান্য আহার করিয়া চিন্তাকুলিত হৃদয়ে করুণাময়ী গুরুচরণকে পত্র লিখিতে বসিল।

পল্লী নিস্তব্ধ। মাঠের ও পারে একটা জীর্ণ তালগাছের উপর বসিয়া এক শকুনি চীৎকার করিতেছিল।

পত্রে করুণাময়ী সব কথাই গুছাইয়া লিখিল। নিস্তারিণী পিসী গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া করুণাময়ীর কক্ষে একখানা মাদুর বিছাইলেন ও একখানি জীর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। করুণাময়ী পাণ ছেঁচিয়া দোক্তা তামাকের সহিত পিসীমাকে খাইতে দিল। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ করুণাময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বউ, তোর মুখ চোক এমন কালো দেখাচ্ছে কেন?"

করুণাময়ী বলিল "কাল পিসীমা ঘুমোতে পারি নি।"

"কেন গো?"

করুণাময়ী একবার ভাবিল—সব কথা পিসীমাকে খুলিয়া বলিবে কি না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে পিসীমাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পিসীমা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে করুণাময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তাইত বউ; আমার সন্দেহ হয় গুরুচরণকে, ইদানীং তার চালচলন দেখ্‌লে মনে হয় সে যেন পর হয়ে গেছে।"

করুণাময়ী মুখ অবনত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর বলিল, "কখনই নয় পিসীমা, তা কি হ'তে পারে?।"

পিসীমা বলিলেন, "আচ্ছা দেখিস্।"

করুণাময়ী বলিল, "যদি নিয়ে থাকেন নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে ফেরত দেবেন। দেখি তাঁকে যে চিঠি লিখেছি তার উত্তর তিনি কি দেন।"

"তবে দেখ্, চিঠির জবাব কি আসে।"

এই বলিয়া পিসীমা আবার রামায়ণ পাঠে তন্ময় হইলেন।

বেলা পড়িয়া আসিল। উঠানে শূন্য মরাইটির উপর একটি বিড়াল নিদ্রার পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া দেহের জড়তা দূর করিতে লাগিল। করুণাময়ী বিষণ্ণ মুখে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

শনিবার গুরুচরণ বাড়ী ফিরিল না। রবিবার সকালে একখানা পত্র আসিল, তাহাতে লেখা আছে "হারের জন্য তুমি দায়ী—আমি কিছুই জানি না।"

এক চিঠিতে সব আশা ভরসা কোথায় উড়িয়া গেল। করুণাময়ী তখন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রন্ধন ও আহারাদি শেষ করিয়া পিসীমা যখন পাণ খাইবার ও রামায়ণ পড়িবার জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন, তখনও করুণাময়ী অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া বসিয়া ছিল।

পিসীমা করুণাময়ীকে পাণ ছেঁচিয়া আনিতে বলিয়া দাওয়ায় একখানা মাদুরের উপর বসিয়া পড়িলেন। করুণাময়ী পাণ লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেই পিসীমা বলিলেন, "বউ তুই কাঁদছিস্?"

করুণাময়ী চুপ করিয়া রহিল।

পিসীমা বলিলেন, "তুই একবার বাপের বাড়ী যা। হারটা দক্ষিণ পাড়ার রসিক কুণ্ডুদের মেয়ের হার—তারা ভাল লোক নয়। হঠাৎ টাকার দরকার হয়েছিল বলে আমিই তোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের দিয়েছিলাম। হার না পেলেই তারা নালিশ করবে—কেলেঙ্কারি কিছুতেই বন্ধ হবে না। তুই বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আয়, শ পাঁচেক হলেই হবে। তাকে সব কথা বলিস্।"

কথা কয়টা কাণে অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল। পিসীমা রামায়ণ পড়িয়া যখন উঠিলেন, তখনও করুণাময়ী মাথায় হাত দিয়া নিতান্ত অবসন্নের মত বসিয়া আছে।

সন্ধ্যাকাল; একটা বক আহারের জন্য পুষ্করিণীর তীরে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিরাশ মনে আকাশে উড়িয়া গেল। ছেলেমেয়েরা খেলা সারিয়া মাকে জানাইল যে তাহাদের ক্ষুধার জ্বালা আরম্ভ হইয়াছে। মা চক্ষের জল আঁচলে মুছিতে মুছিতে যৎসামান্য মুড়ি আনিয়া তিনজনকে বাঁটিয়া দিলেন। ছেলেমেয়েরা অন্য দিন হইলে আহার অতি কম বলিয়া অধীর হইত,

আজ কিন্তু জননীর দুই চক্ষে মুক্তার মত উজ্জ্বল দুইটি অশ্রুবিন্দু তাহাদের সব অভিযোগ স্তব্ধ করিয়া রাখিল।

করুণাময়ী বড় ছেলেটির মুখপানে চাহিয়া দেখিল তাহার স্বামীর গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তা সেখানে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই ছেলেমেয়েগুলি স্বামীর; তাহাদের ভরণপোষণের জন্য স্বামীই দায়ী। স্বামী যে তাহা করিতে অক্ষম তাহাও নয়। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেন না; আর সে বাপের বাড়ী হইতে অর্থ আনিয়া ইহাদের পালন করিবে অথবা সকলকে লইয়া পিতার গলগ্রহ হইবে এ প্রস্তাব কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পারিল না।

করুণাময়ীর স্বর্ণাভ দেহযষ্টি ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়িল, ছেলেমেয়েদেরও পূর্ব্বশ্রী আর রহিল না।

১২

ক্রমশঃ করুণাময়ী অধীর হইয়া পড়িল। প্রতিদিন পাওনাদার দ্বারে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তার পর সেই চীৎকার ক্রমশঃ গালাগালিতে পরিণত হইল।

ছেলেমেয়েরা যখন দেখিল মায়ের মুখে আর সে হাসি নাই—মা সদাই বিষণ্ণ—তখন তাহারা খেলা ছাড়িয়া মায়ের আশে পাশে নিতান্ত শান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের চালচলন দেখিলেই মনে হয় যেন একটা সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে।

পরদিন সকালে দুইজন দোকানদার, দুইজন ফিরিওয়ালা ও রসিক বাবুর সরকার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাদের টাকাগুলা দেওয়া হোক, না হলে আমরা নালিশ করবো।"

নিস্তারিণী পিসী সকলকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু রসিক কুণ্ডুর সরকার বলিল, "আমি টাকা এনেছি, আমার গহনা ফেরত দেওয়া হোক্; বাবুর হুকুম গহনা না নিয়ে আমি যাব না।"

দুইজন পাইক লইয়া সে অনেকক্ষণ গোলযোগ করিল। বাড়ীর সকলকেই গালাগালি দিল। নিস্তারিণী পিসী ও পাড়ার অনেকে তাহাদের বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিল। যাইবার সময় সরকার বলিয়া গেল আগামী রবিবার সে আবার আসিবে।

করুণাময়ী ঘরের মধ্যে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা অর্দ্ধভুক্ত আহার কোলে করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। পিসীমা দেখিলেন করুণাময়ীর মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন শরীর উত্তপ্ত। ছেলে মেয়েদের নিজের বাড়ীতে খাওয়াইয়া দ্বিপ্রহরের সময় যখন তিনি গুরুচরণের বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যেন গৃহে জনপ্রাণী নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে একটা কক্ষে আসিয়া দেখিলেন করুণাময়ী মেঝের উপর অজ্ঞানের মত স্তব্ধভাবে পড়িয়া আছে। গায়ে হাত দিয়া বুঝিলেন জ্বর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অনেকক্ষণ রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া তিনি বুঝিলেন জ্বর সাধারণ নয়। ছেলে মেয়েদের নিজের ঘর হইতে মুড়ি আনিয়া দিয়া তাহাদের অবসন্না জননীর নিকট বসাইয়া তিনি আপনার ঘরে রন্ধনাদির জন্য চলিয়া গেলেন। গৃহে কয়েকটি বালক বালিকা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আজ দুই বৎসর হইল একটি বিপুল একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া নানামতে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে একবেলা ত্রিশজনের অন্ন সংস্থান একা করুণাময়ীকেই করিতে হইত, এখন সেখানে পাঁচ ছয়জনের আয়োজন করিলেই চলিয়া যায়।

রাত্রে পিসীমা রোগিণীর নিকটেই শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে তিনি সদানন্দ কামারকে ডাকিয়া বলিলেন; "দেখ সদানন্দ, তুই ত আজ কলকাতায় যাবি—একবার গুরুচরণকে আজই আস্‌তে বলিস্—বলিস বউমার বড় অসুখ, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের ব্যবস্থা না করলে সে বাঁচবে না।"

সদানন্দ "তাই হবে" বলিয়া চলিয়া গেল।

বেলা নয়টার সময় করুণাময়ীর জ্বর আসিল। পিসীমা দেখিলেন একদিনের জ্বরে তাহার সর্ব্বশরীর যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

বৈকালে আবার জ্বর বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সদানন্দ আসিয়া সংবাদ দিল—গুরুচরণ শনিবারের পূর্ব্বে কোন মতেই আসিতে পারিবে না।"

পিসীমা বলিলেন, "আহা রে, হতভাগা যে এতটা অধঃপাতে গেছে তা আগে জানতে পারিনি।"

সন্ধ্যার সময় নন্দকিশোর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবু টাকা পাঠিয়েছেন, বলে দিয়েছেন এ টাকা মাকে নিতেই হবে।"

পিসীমা নন্দকিশোরের কথা শুনিয়া একবার রোগিণীর নিকট আসিলেন। পাঁচ সাতবার ডাকিয়া তাহাকে বলিলেন, "বউমা, নন্দকিশোর টাকা এনেছে—নিই।"

করুণাময়ী শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "এ টাকা আমি নিতে চাই না। যদি টাকার অভাব পড়ে, আমার হাতের রুলি বন্ধক দিয়া টাকা আনতে পার।"

পিসীমা বলিলেন, "সে কি বউমা, আমি থাকতে তোমার টাকার অভাব হবে না মা, নন্দকিশোরকে যেতে বলি।" তপ্ত হস্তযুগল পিসীমার পদস্পর্শ করিল। করুণাময়ী আবার কাঁদিল, পিসীমার কুঞ্চিত গণ্ডদেশ অশ্রুজলে প্লাবিত হইল।

শনিবার বৈকালে গুরুচরণ বাড়ী ফিরিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—মেঝের উপর একখানি জীর্ণ কন্থা পাতিয়া করুণাময়ী জ্বরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার দেহ ক্ষীণ, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ভস্মাচ্ছন্ন যজ্ঞবহ্নির মত মলিন। গুরুচরণ অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে অন্য কক্ষে আসিয়া বসিল।

পরদিন সকালে সে ডাক্তার আনিতে চলিল।

ডাক্তার সঙ্গে করিয়া যখন সে ঘরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন রসিক কুণ্ডুর সরকার পথ আগুলিয়া বলিল, "টাকা এনেছ আমার হার ফেরত দিন।"

গুরুচরণ বলিল "এখন যাও, ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি, বাড়ীতে রোগ।"

সরকার বলিল, "বামুনের ছেলে চুরিবিদ্যে ধরেছ? যাও, এখনই হার এনে দাও।"

গুরুচরণ সরকারকে সজোরে এক ধাক্কা মারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সরকার আজ একা আসিয়াছিল। সেই জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া গুরুচরণকে শিক্ষা দিবার আর সাহস তাহার রহিল না। উঠিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ও অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে সে ত্রস্তপদে আপনার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

১৩

ডাক্তার বলিল "জ্বরের লক্ষণ ভাল নয়, আপনারা বড় ডাক্তার আনুন।"

"রোগ কি?"

"শিবের অসাধ্য রোগ, চিকিৎসায় কোন ফল নেই।"

ডাক্তার চলিয়া গেল। পিসীমা বলিলেন, "দেখ, গুরো, তুই এখনই বিশ্বনাথ কবিরাজকে ডাক।"

গুরুচরণ বলিল, "ডেকে কোন ফল নেই পিসীমা, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ।"

পিসীমা রাগিয়া বলিলেন, "তবে কি তুই কোন চিকিৎসাই করবি না? লাভই দেখছিস? জানিস যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

"ভগবান যা করেন করুন, অর্থ নষ্ট করে ধনে প্রাণে মরে লাভ কি?

"ভগবান নিজের কায করবেন। তুই তোর কায কর। টাকা তুই না দিস আমি দেব।"

গুরুচরণ অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ পায়চারি করিল, তারপর কবিরাজের সন্ধানে চলিয়া গেল।

কবিরাজ ঔষধ দিল। ঔষধ সেবনের পর গুরুচরণ যখন নিকটে আসিয়া বসিল, তখন সন্ধ্যালোকে করুণাময়ীর বিশীর্ণ মুখ এক স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গুরুচরণ তাহার দিকে আর চাহিতে পারিল না।

সোমবার সকালে সে কলিকাতা রওনা হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল "আমি একদিন অন্তর বাড়ী আসব।"

গ্রাম্যপথ দিয়া সে দ্রুতপদে ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ষণসিক্ত ধান্যক্ষেত্রের সীমায় জল জমিয়াছে। সেই জলের উপর দীর্ঘ ঘাসগুলি বায়ুভরে দুলিয়া উঠিতেছিল। জলের উপর প্রভাত রৌদ্রে অসংখ্য কীট পতঙ্গ তাহাদের নূতন জীবনের আনন্দস্পন্দনে অধীর। আজ পথের ধারে অসংখ্য বনফুল মৃদু সৌরভে চারিদিক ভারাক্রান্ত করিয়া তাহার অন্তরে কোন্ বিস্মৃত বিরহ বেদনা নিবিড় করিয়া তুলিল।

মেসে আহারাদি করিয়া সে স্কুলে পড়াইতে গেল। অপরাহ্নে মেসে ফিরিয়া কিছু জলযোগের পর সে বহির্গত হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নিবিড় হইয়া আসিল তখন সে একখানি দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিল। এই বাড়ীতে রাত্রে একটি বালককে পড়াইয়া সে মাসে কুড়ি টাকা উপার্জ্জন করে।

রাত্রি দশটা বাজিল। ছেলে পড়াশোনা শেষ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মাষ্টার মহাশয়ের কার্য্য কিন্তু সমাপ্ত হইল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

গৃহের বাহিরে আসিয়াই গুরুচরণ চমকিত হইয়া দেখিল পরেশ বাবু দাঁড়াইয়া আছেন। পরেশ বাবু বলিলেন, "কি পণ্ডিত মশাই যে, এত দেরী দেখে আপনাকে খুঁজতে এসেছি।"

গুরুচরণ স্তম্ভিত হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরেশ বাবু বলিলেন, "লজ্জা কিসের পণ্ডিত মশাই?"

গুরুচরণ বলিল, "লজ্জা কেন? ছেলের পরীক্ষা—তাকে পড়াতে একটু দেরী হয়ে গেছে।"

পরেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলে পড়াতে কি রাত বারোটা হয়?"

গুরুচরণ বলিল, "তবে তুমি কি মনে কর?"

পরেশ বাবু বলিলেন, "যে পল্লীতে ছেলে পড়াতে এসেছেন, সে পল্লীটা আপনার মত লোকের উপযুক্ত কি?"

"কেন? কেন?"

"দেখ পণ্ডিত, ন্যাকা সেজো না, আমার এ সব জায়গা ভাল রকম জানা আছে। আমি পুলিশের লোক। মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে কিসের?"

"সিরাপ—সিরাপ।"

পরেশ বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতমশাই খুব রসিক লোক দেখ্‌ছি। এত তত্ত্বকথা, এত বৈরাগ্য অবশেষে কিনা এক নর্ত্তকীর পায়ে ঢেলে দিয়েছ ঠাকুর।"

গুরুচরণ বলিল, "যান্ আপনি, আপনার কথা নিতান্ত অভদ্রের মত।"

"বেশ—বেশ—অভদ্র কে শীঘ্রই জানা যাবে, জেনে রেখো পণ্ডিত আমি পুলিশের লোক।"

১৪

দুইজনে ধীরে ধীরে মেসে প্রবেশ করিল। যে চাকর দরজা খুলিয়া দিল, সে অনুচ্চস্বরে নিদ্রার ব্যাঘাতের জন্য দু একটা গালাগালি দিতে ছাড়িল না।

নীরবে দুইজনে শয়ন করিল। পরেশ বাবুর সুনিদ্রা হইল। গুরুচরণ কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। তাহার কেমন একটা আতঙ্ক হইল্। সে ভাবিল পরেশ বাবু পুলিশের লোক; তাহার সঙ্গে এত মেলা মেশা ভাল হয় নাই।

সকালে উঠিয়া গুরুচরণ ছাদের উপর পায়চারি করিতে লাগিল, করুণাময়ীর মুখ আজ তাহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল।

বেশীক্ষণ এক ভাবনা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে আটটা বাজিল, গুরুচরণের চিন্তাস্রোত আর একদিকে ধাবিত হইল।

বিগত রজনীর প্রমোদমত্ততায় তাহার শরীর অবসন্ন। সে ভাবিল—একদিন যে দোষের জন্য সে

ক্ষিতীশকে ঘৃণা করিয়াছিল, আজ সে দোষ তাহাতেও আসিয়াছে।

সে আপনার অবস্থা বিচার করিয়া নানা যুক্তির দ্বারা স্বীয় দোষকে লঘু করিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময় হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল।

দ্বারের সম্মুখে আসিয়াই সে দেখিতে পাইল দুইজন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পাশ দিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় পরেশ বাবু পুলিশের সাজে একখানা ঠিকা গাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাহার পথ অবরোধ করিলেন, এবং গুরুচরণের হাতে একখানি কাগজ দিয়া বলিলেন, "ভাই, মাফ কর, তোমাকে হাজতে নিয়ে যাব, এই দেখ আজ্ঞাপত্র।"

গুরুচরণ পরেশ বাবুর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার সুখস্বপ্নপ্রমত্ত মনকে পরেশ বাবুর কথাটা এতই চমকিত করিয়া দিল যে, সে বর্ত্তমান ঘটনাটিকে কোনমতেই ধারণা করিতে পারিল না। বাতুলের মত সে শূন্যদৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কনষ্টেবলরা কখন যে তাহাকে গাড়ীতে তুলিল, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না।

রাজপথ দিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। এইবার গুরুচরণ দেখিল—তাহার হস্তদ্বয় আবদ্ধ। কনষ্টেবল একজন তাহার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া ধরিয়া আছে। গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তোমরা কেন নিয়ে যাচ্ছ?"

কনষ্টেবল তাহার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় বুঝাইয়া দিল, সে চোর।

গুরুচরণ দ্বিতীয় কথার উত্থাপন করিল না। গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ গঙ্গার তীরে একটি দ্বিতল গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

গুরুচরণ বুঝিল বাড়ীটি তাহার পরিচিত। প্রতিদিন এই বাড়ীতেই সে একটি ছেলেকে পড়াইতে আসে।

পরেশ বাবু একজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং অবিলম্বে একটি রমণীর সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

গুরুচরণ রমণীকে চিনিল। তাহার নাম যূথিকা। সে তাহার ছাত্রের ভগিনী।

তাহার জীবনের অভাব এই সুন্দরী স্বাধীনা বিলাসিনীর রূপদর্পণে ভাবরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

পরেশ বাবু বলিলেন, "পণ্ডিতমশাই, এই স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পারছেন?"

গুরুচরণ উত্তর দিল না। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

দুই আসামীকে যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া পরেশ বাবু বাসায় চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে গুরুচরণের সহিত দেখা করিয়া পরেশ বাবু কহিলেন, "দেখ পণ্ডিত, তুমি তোমার স্ত্রীর বাক্স হতে একটা হার নিয়ে যূথিকাকে দিয়েছিলে?"

গুরুচরণ বলিল, "হাঁ।"

পরেশ বাবু বলিলেন, "হার ফেরত দাও।"

"সে হার ফেরত দিতে চায় না; আমি তাকে অনেক অনুরোধ করেছি।"

"তাকে বলেছ, হার না দিলে জেলে যেতে হবে?"

"না—মনে করেছিলুম পুলিশে আমার সন্ধান পাবে না।"

"জানো তুমি আমি রসিক কুণ্ডুর জামাই। হারটা আমার স্ত্রীর। শ্বশুরমশাই এই হার বন্দক দিয়ে তিন শ টাকা তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে ধার করেন।"

এই বলিয়া পরেশ বাবু একটা হার বাহির করিলেন।

গুরুচরণ চুপ করিয়া রহিল।

পরেশ বাবু বলিলেন, "এই হার ত তুমি চুরি করেছ?

গুরুচরণ বলিল, "হাঁ।"

পরেশ বাবু রসিক কুণ্ডুকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন, হার পাওয়া গিয়াছে।

আসামীরা হাজতে রহিল। পরেশ বাবু বাসায় চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে রসিক কুণ্ডু কলিকাতায় আসিয়া জামাতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

করুণাময়ীর বাক্সে হার নাই, এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি জামাতাকে অনুসন্ধানের ভার দেন। পরেশ বাবু সকল সংবাদ জানিয়া স্থির করিয়াছিলেন আসামী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। আসামীকে কয়দিন চোখে চোখে রাখিয়া তিনি যূথিকার সন্ধান পান। যূথিকার কণ্ঠে এই হার দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন গুরুচরণ এই হারটি উপহারস্বরূপ তাহাকে দান করিয়াছে। পতিতা রমনী যে এত সহজে সত্যকথা বলিতে পারে, তাহা পরেশ বাবু ধারণা করিতে পারেন নাই।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রসিক কুণ্ডু বলিল, "আসামীদের রীতিমত সাজার বন্দোবস্ত করবে বাবাজী।"

রসিক কুণ্ডু চলিয়া গেলেন। পরেশ বাবু ভাবিতে লাগিলেন—আসামীদের কি করা উচিত। গুরুচরণ তাঁহার বন্ধু—সে জ্ঞানী, নম্র, ধীর ও পরদুঃখকাতর। তবুও সে চোর। এ দোষ আর কখনও সে করে নাই। চিরদিন সে তাহার সুখ্যাতিই শুনিয়া আসিয়াছে। প্রথম দোষেই তাহাকে নির্ম্মম আইনের নিদারুণ কবলে নিক্ষেপ করা কখনই উচিত নয়।

আর যূথিকা—সে বাররমণী একথা সত্য, কিন্তু তাহার সরলতা ও সত্যবাদিতা প্রশংসার যোগ্য। গুরুচরণ ও যূথিকাকে কি জেল হইতে রক্ষা করা যায় না?

কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় নীচে একখানা মোটর আসিয়া দ্বারের নিকট ভোঁ ভোঁ শব্দে সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

গাড়ী হইতে নামিল এক সুন্দর সুপুরুষ—দেখিলেই ধনাঢ্য বলিয়া মনে হয়। তিনি "পরেশ বাবু কোথায়?" "পরেশ বাবু কোথায়?" বলিতে বলিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। পরেশ বাবু তাঁহাকে সাদরে আপনার শয্যায় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কেন?"

আগন্তুক বলিল, "আপনার কাছে আমার একটু প্রয়োজন আছে।"

"কি প্রয়োজন?"

"গুরুচরণকে জেলে দেবেন না। আপনার যতটাকা প্রয়োজন হয় আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

পরেশ বাবু বলিলেন, "সে চোর তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখন তাকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন।"

আগন্তুক বলিলেন, "পরেশবাবু, আমি দুই হাজার টাকা আপনার হাতে দিলাম, আপনি গুরুচরণকে রক্ষা করুন।"

আগন্তুক দুই হাজার টাকা পরেশ বাবুকে দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সকালে পরেশ বাবু গুরুচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিত, তুমি চলে' যাও—তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হল।"

১৫

নির্ব্বাক বিচারমূঢ় গুরুচরণ টলিতে টলিতে হাজত হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল দুই দিনে যেন বিশ্বজগত ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। রাজপথ, সৌধশ্রেণী, গাড়ীঘোড়া, নরনারী ও জীবজন্তু এমন একটা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছে যেখানে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। সুনাম হারাইয়া সে যেন সকলের সঙ্গে সব সম্বন্ধই নষ্ট করিয়াছে। কোথায় যাইবে সে স্থির করিতে পারিল না।

মেসের দিকে সে অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ অগ্রসর হইয়া ফিরিল। সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইল না। অন্তপথ ধরিয়া সে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার তীরে উপস্থিত

হইল। মনে হইল যেন সে তাহার বাসস্থান হইতে বহুদূরে এক অপরিচিত দেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

আষাঢ়সন্ধ্যায় গঙ্গার বর্ষণস্নিগ্ধ অন্ধকারে তটভূমির উপর বসিয়া রক্তোভ পশ্চিম গগনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যেন সে কোন্ সুদূর চিরবাঞ্ছিতের মহাপ্রস্থান পথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লাক্ষারসরঞ্জিত চরণচিহ্নের অনুসন্ধানে তন্ময় হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভা অন্তর্হিত হইল। মেঘ জমাট বাঁধিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। জনশূন্য তটের একান্তে বসিয়া সে দেখিল দূরে দু'একখানি নৌকা ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়াছে। আর তাহার বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না।

সে উঠিল। গঙ্গার তীর ছাড়িয়া একটু অগ্রসর হইতেই একটি পরিচিত পথ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই পথের প্রান্তে যূথিকার বাড়ী। মনে হইল একবার সে তাহার নিকট গিয়া দেখিবে সে কেমন আছে, পুলিশ তাহাকে ছাড়িয়াছে কি না। তাড়াতাড়ি যন্ত্রচালিতের মত অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচিত গৃহের বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখিল নির্লজ্জা যূথিকা নানাবিধ অলঙ্কারে সাজিয়া হাস্যমুখে আত্মবিক্রয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। পুলিশের অপমান তাহার তরল অন্তঃকরণে একটিও রেখাপাত করে নাই। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল সেখানে বিলাসের রঙ্গরস, হাবভাব সবই আছে কিন্তু ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য নাই।

মনে পড়িল করুণাময়ীর প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি, তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিচার যুক্তি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও আত্মত্যাগ; গুরুচরণের নিকট তাহার মানসী প্রতিমাটিকে আজ অপূর্ব্ব মহিমায় উজ্জল হইয়া উঠিল। গুরুচরণ ললাটে করাঘাত করিল।

গভীর রাত্রে সে মেসে ফিরিল। সকালে কাহারও সঙ্গে সে কথা কহিল না। সেদিন শনিবার। আহারাদির পর পরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ পণ্ডিত, কি ক'র, শ্বশুর মশাইয়ের আদেশ আমার পালন করা উচিত। তোমাকে ধরা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তুমি জেলে গেলে আমার বড়ই কষ্ট হ'ত।"

গুরুচরণ বলিল, "দেখুন পরেশ বাবু আপনাকে এই দোষ দিই যে, পাপীর সাজাটার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আপনি করেন নি।"

এই কথা বলিয়া গুরুচরণ স্কুলে চলিয়া গেল। অন্যদিন সে ছাত্রদের দোষ দেখিলে বড়ই রাগিয়া যাইত, আজ আর সে রাগিল না।

বেলা দু'টার সময় যখন স্কুলের ছুটি হইয়া গেল তখন মেসে ফিরিয়া সে গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

মনে পড়িল করুণাময়ীর রোগ—একদিন অন্তর তাহাকে দেখিতে যাইবার কথা—আজ কয়দিন হইল তাহার সংবাদ লওয়া হয় নাই! গুরুচরণ পত্নীর জন্য আকুল হইয়া পড়িল। এ আকুলতা পূর্ব্বে কখনও সে অনুভব করে নাই।

যে লজ্জা, ঘৃণা ও সঙ্কোচ তাহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছিল, এখন তাহার লেশমাত্র ছিল না। সহরে তাহার পাপ ও সাজার কথা সকলে উৎসুক হইয়া না শুনুক, গ্রামে কাহারও কাছে সে সব কথা অজানা নাই ইহা বুঝিয়াও গুরুচরণ গ্রামের দিকেই চলিল।

হঠাৎ মনে পড়িল বিবাহের দিন। নববধূ করুণাময়ী যেদিন তাহার হৃদয়-প্রাঙ্গন উষার অরুণালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার যৌবনমত্ত প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত আবির্ভূত হইয়াছিল—যেদিন হইতে গৃহের কোন মঙ্গল কর্ম্ম তাহাকে অবলম্বন না করিয়া সম্পন্ন হয় নাই। সেই নূতন বর্ণ গন্ধে, অপূর্ব্ব হর্ষবেদনায় আভসিক্ত দিনগুলি—সেদিনের আলো, সেদিনের উৎসব-আনন্দ, আকাশের নীলিমা, বায়ুর মর্ম্মরধ্বনি, বালকের কলরব, বালিকার হর্ষকাকলী আজ তাহার মানসে পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িল। মনে পড়িল বাল্যের আনন্দ, তার পর যৌবনের স্ফূর্ত্তি, নূতন ভাব ও নূতন রসে সুস্নিগ্ধ উৎসবময় দিনগুলি; জ্যোৎস্নালোকে দুই পাশের বৃক্ষলতা, ঘাট মাঠ, শস্যক্ষেত্র তাহার নয়ন সম্মুখে কোন সুদূর অতীতের আলোকে

রঞ্জিত হইয়া তাহার তাপদগ্ধ প্রাণ এক নিবিড় বেদনাময় অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিল।

ষ্টেশনে আসিয়া সে দেখিল গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। মত্তের মত টলিতে টলিতে সে একখানা কামরায় উঠিয়া বসিল। করুণাময়ীর রোগক্লিষ্ট মুখখানি আজ তাহার অন্তরের করুণরস উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যাকাল। সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথের দুইধারে সমুন্নত তরুরাজি যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সিক্ত লতাগুল্মের মধ্যে জলপূর্ণ গর্ত্তের ভিতর গলা ফুলাইয়া ভেকের দল কলরব তুলিয়াছে। চিন্তাক্লিষ্ট গুরুচরণ দ্রুতপদে ক্রমশঃ একটা প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। রাস্তার দুই ধারে বাবলা গাছের স্নিগ্ধ গন্ধ বাতাসকে মন্থর করিয়া তুলিয়াছে। প্রান্তরের শেষে গ্রাম্য কুটীরগুলি দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষের ছায়ায় ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল। বিস্তৃত প্রাঙ্গনের উপর প্রদীপ হস্তে গৃহলক্ষ্মীরা সন্ধ্যার আবাহন করিয়া মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গুরুচরণ আপনার গ্রামে প্রবেশ করিল।

দূরে জমিদারের বাড়ী দীপালোকে ঝলমল করিতেছিল। আজ তাহার তৃষিত চক্ষুদুটি হঠাৎ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

আজ মনে হইল ছেলেবেলার প্রিয় ভবনটি আজ তাহাকে নীরব ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে। এতদিন যাহা ঘৃণ্য পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হইত, আজ তাহাতে সে কোন দোষ দেখিতে পাইল না। যে সাধুতার গর্ব্বে অন্ধ হইয়া সে এই গৃহটিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, বন্ধুকেও দলিত করিতে দ্বিধা করে নাই, আজ সেই গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া গুরুচরণ জমিদার গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিল, এবং বন্ধুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্ত যাইতে ইচ্ছা হইল।

দুই চারি পা সেদিকে অগ্রসর হইয়া সে আবার ফিরিল। করুণাময়ীর জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সে প্রথমে আপনার গৃহাভিমুখেই যাত্রা করিল।

১৬

রাত্রি যখন প্রায় নয়টা তখন গুরুচরণ গৃহদ্বারে আঘাত করিল। বড় ছেলেটি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। গুরুচরণ বহুদিনের প্রবাসীর মত ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রাঙ্গনের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

অন্তদিন তাহার আগমনে ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া আসিত, করুণাময়ী ক্ষিপ্রপদে পা ধুইবার জল ও গামছা লইয়া আসিতেন। আজ মনে হইল বাড়ীটি যেন জনহীন।

প্রাঙ্গন পার হইয়া সে দেখিল একটি কক্ষে টিম্ টিম্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর একটি শয্যায় বিশীর্ণ স্বর্ণপ্রতিমা শায়িত আছে। ছেলেমেয়েরা স্থির ভাবে মায়ের পাশে বসিয়া আছে।

গুরুচরণ আজ পত্নীর ঘর্ম্মাক্ত ললাটে হাত দিয়া দেখিল দেহ-ইন্ধনের মধ্যে জ্বরাগ্নি প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রোগিণীর সাড়াশব্দ ছিল না। গুরুচরণের করস্পর্শে সে চক্ষু উন্মীলন করিল, কিছুক্ষণ উদাসদৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া সে হস্ত প্রসারণ করিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরুচরণ অন্তরে অন্তরে সেই দেবীপ্রতিমার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারিল না। হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া দিল।

প্রভাতে করুণাময়ীর জ্বর কমিল। অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া সে গুরুচরণকে ডাকিল। বলিল, "দেখ আমার রোগ বোধ হয় সারবে না।"

গুরুচরণ পত্নীকে অনেক সাহস দিল। বলিল, তাহার রোগ সামান্ত, কিছুদিন চিকিৎসা হইলেই সারিয়া যাইবে।

করুণাময়ী হাসিল। বলিল, "দেখ, জমিদার ক্ষিতীশ বাবু ৫ হাজার টাকা খরচ করে তোমায় জেল থেকে উদ্ধার করেছেন—তুমি এখনি তাঁর কাছে যাও। তিনি মাসিক টাকা যা দিতেন তা আমি অনেক দিন হল ত্যাগ করেছি। হয়ত তিনি রেগে আছেন। তাঁর রাগ

যাতে পড়ে তা কর। তিনি তোমার বিপদের বন্ধু। যাবে বল ?"

"যাব।"

"তা হলে আর দেরী কোরো না।" বলিয়া করুণাময়ী ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় আনিতে বলিল। গুরুচরণ পূর্ব্বে আনন্দের দিনে যে ভাবে কাপড় জামা পরিয়া যে সাজে সাজিয়া ক্ষিতীশদের বাড়ী বেড়াইতে যাইত, আজ করুণাময়ীর অনুরোধ মত তাহাকে সেই ভাবে কাপড় জামা পরিতে ও সেই সাজে সাজিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইতে হইল।

পাঁচবৎসর পূর্ব্বে যে আনন্দে সে ক্ষিতীশদের বাড়ী বেড়াইতে যাইত, আজ সে আনন্দ বেদনায় পরিণত হইল। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই গাছ-পালা সবই আছে, কিন্তু তখনকার হৃদয় আর নাই। সে পূর্ব্বের মতই চলিল, কিন্তু অন্তরের শূন্যতা—থাকিয়া থাকিয়া একটা বিরাট হাহাকারে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

ফটক পার হইয়া দ্রুতপদে সে ক্ষিতীশের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। ক্ষিতীশ নীরবে ইজি চেয়ারে বসিয়া একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, গুরুচরণ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষিতীশ বলিল, "তা ভালই হয়েছে। এখন কতকগুলা কথা তোমাকে বলতে চাই—"

"কি কথা ?"

"তোমাকে খালাস করতে আমার কিছু টাকা খরচ হয়েছে। দিদি ঠাকরুণ সে খবর পেয়ে, আমাকে সে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। একবার টাকা ফেরত দিলুম। আবার সেই টাকা হাতে এসে পড়ল। তুমি টাকাটা ফেরত নেবে ?"

"ভাই, আমার স্ত্রী যদি তোমাকে দিয়ে থাকেন, আমি তা ফেরত নিতে পারি না।"

"তবে থাক," বলিয়া ক্ষিতীশ চুপ করিল।

গুরুচরণ আসিয়াছিল কাতরতা জানাইতে, কিন্তু ক্ষিতীশ অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। গুরুচরণ এইবার অবকাশ পাইয়া বলিল, "ভাই, এক সময়ে মনে করতুম আমি নিষ্পাপ। মনে হত কোন কুকার্য আমার দ্বারা হতে পারে না। এখন আমি চোর, আমার চরিত্রও কলঙ্কিত।"

ক্ষিতীশ বলিল, "কাকে ওকথা বলছ ? তোমার অনেক আগে আমি যে কুচরিত্র বলে বিখ্যাত হয়েছি।"

"তুমি যাই হও, তুমি মহাপ্রাণ।"

"কিসে জানলে ?"

"এই এত খরচ করে আমায় জেল থেকে রক্ষা করলে।"

"আমি ত আমার পয়সা খরচ করি নি। তারপর, যা খরচ করেছিলুম, তাও ত ফেরত পেয়েছি।"

গুরুচরণ কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, "তোমার টাকা নয় কেন ?"

ক্ষিতীশ উত্তর দিল, "এ টাকা তোমার—বাবা মৃত্যুর সময় এ টাকা তোমায় দান করেন। আমি তোমাকে কর্ম্মে বিমুখ দেখে সে টাকা এতদিন দিই নি।"

গুরুচরণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষিতীশ বলিল, "বাড়ীতে অসুখ – তবুও এখানে বসে থাকবে ?"

গুরুচরণ উঠিল, তারপর ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

১৭

অপরাহ্নে গুরুচরণ গৃহদ্বারে বসিয়া আছে এমন সময়ে ক্ষিতীশ পদব্রজে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গুরুচরণ ভিতর হইতে একখানা ভাঙা চেয়ার বাহির করিয়া ক্ষিতীশকে বসিতে বলিল।

ক্ষিতীশ বলিল, "দেখ গুরুচরণ, আমি কি বড় অহঙ্কারী ?"

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারিল না।

ক্ষিতীশ বলিল "আমি সত্য সত্যই অহঙ্কারী। এই

অহঙ্কারে মত্ত হয়েই আমি তোমায় স্ত্রীকে অর্থের কাঙাল মনে করেছিলুম। এখন দেখছি আমি ভুল করেছি।"

গুরুচরণ বলিল, "কেন?"

ক্ষিতীশ বলিল, "সে কথাটা পরে বলব—আমি একবার বৌদির সঙ্গে দেখা করতে চাই। যাব? অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করি নি।"

গুরুচরণ বলিল, "চল।"

বন্ধুর হাত ধরিয়া সসম্মানে সে ক্ষিতীশকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে।

নির্ব্বাক ক্ষিতীশ প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে পড়িল এখানে সে বাল্যাবস্থায় কতদিন খেলা করিয়াছে। এ বাড়ীর সকলেই এককালে তাহার পরিচিত ছিল। গুরুচরণের বিবাহের পরও সে এখানে অনেকবার আসিয়াছে, করুণাময়ীর কাছেও সে অপরিচিত ছিল না।

গুরুচরণকে অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ সে করুণাময়ীর কক্ষদ্বারে উপনীত হইল।

ঘরের কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ক্ষিতীশ কক্ষে প্রবেশ করিল।

আজ সে বলিবার কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। গুরুচরণ পত্নীকে জানাইল—ক্ষিতীশ তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে।

করুণাময়ী ক্ষিতীশের দিকে চাহিল। বলিল, "বস, ভাই।"

মুখের দিকে চাহিয়া পূর্ব্বে সে এমন স্পষ্টভাবে ক্ষিতীশের সঙ্গে কখনও কথা কয় নাই। বিবাহের পর গুরুচরণ অনেকবার ক্ষিতীশকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। করুণাময়ী কিন্তু কখনও অনবগুণ্ঠিতমুখে তাহার সহিত কথা কয় নাই। আজ ক্ষিতীশ দেখিল সেই মুখে লজ্জাসঙ্কোচ কিছুই নাই, আছে কেবল জ্যেষ্ঠা সোদরায় স্নেহ বা জননীর গরিমা।

ক্ষিতীশ বড়লোক, গুরুচরণ তাহার তুলনায় ভিক্ষুক মাত্র। কিন্তু করুণাময়ীর দুটি বড় বড় চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে এই বিষণ্ণ গোধূলি আলোকে আজ দুজনের মধ্যে একটা নূতন সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবেই স্থাপিত হইয়া গেল।

অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। ঘরের জানালা দিয়া সে বাহিরের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিল। করুণাময়ীর জ্বর আজ অধিক। একটি কথা বলিয়াই সে চুপ করিয়া চোখ বুজিল।

বাহিরে প্রকাণ্ড প্রান্তর, তাহার সীমায় নারিকেল গাছে ঘেরা একটি ছোট গ্রাম। জানালার দিকে চাহিয়া এই গ্রামখানির সন্ধ্যাকালীন শঙ্খরোল অতি অস্পষ্টভাবে সে শুনিতে পাইল। সে দেখিল একটা কালো ছায়া বহুদূর হইতে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী আম্রকাননে ঘনাইয়া উঠিতেছে।

শ্রাবণ সন্ধ্যায় সিক্ত পৃথিবীর উপর ম্লান মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ক্ষিতীশ অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই বিরাট শূন্য কত অকথিত কথা, কত অগীত গান, কত আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ ও পাপ পুণ্যের ভস্মে রঞ্জিত হইয়াছে। প্রাণ উদাস হইয়া যায়, মন মোহিত হয়। অবিরাম শান্ত রসে মুগ্ধ ক্ষিতীশ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শুনিতে পাইল, কে যেন পুরবীর তানে তাহার হৃদয় মন ও বিশ্বজগৎ ভরিয়া দিয়াছে—চারিদিক যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল। সারাদিনের জাগরিত প্রাণ নানা কোলাহলের মধ্য দিয়া রাত্রির নীরবতায় ক্রমশঃ আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

শ্যামায়মান ধরণী ক্রমশঃ অনন্ত অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। ক্ষিতীশ একবার এদিকে সেদিকে চাহিয়া দেখিল। চারিদিক প্রশান্ত গম্ভীর—কাহারও সাড়াশব্দ নাই—কেবল দূর হইতে কতকগুলি দুরন্ত ছেলের চীৎকার স্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী তালগাছের উপর একটা চিল পাখা নাড়িল—বাড়ীর ছেলে মেয়েরা বাহিরে অন্য ছেলেদের খেলা কিছুক্ষণ দেখিয়া শুষ্কভাবে ঘরের এক পাশে আসিয়া বসিল। ঘরে মিটমিট করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, গুরুচরণ

নীরবে এক কোণে বসিয়া আছে। ঘরের মাঝখানে শয্যার উপর শায়িত কনকপ্রতিমা চক্ষুদুটী অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যার দৃশ্যটিকে পরিপূর্ণ ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ করুণাময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

বাহিরে আসিয়া সে ধীরে ধীরে কখন যে চলিয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ বাহিরে পায়চারি করিয়া গুরুচরণ স্ত্রীর পাশে আসিয়া বসিল।

চিকিৎসক আসিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ অনেকটা ভাল দেখছি।"

"জীবনের আশা আছে কি?"

"এখনও বলা যায় না।"

চিকিৎসক চলিয়া গেলেন। গুরুচরণ তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল রোগী বিছানার উপর বসিয়া আছে। গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিল "আজ কেমন?"

"ভাল।"

গুরুচরণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে করুণাময়ী বলিল, "দেখ আমার দুটি অনুরোধ আছে, যদি রাখ, তাহলে বলি।"

"বল।"

"আগে ঠিক করে বল রাখবে।"

"রাখব।"

"ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বল।"

করুণাময়ী মাথার বালিসটা একটু নাড়াইয়া, রুমালে বাঁধা কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল, "দেখ, এই টাকা ক্ষিতীশের—এগুলি ফেরত দেবার জন্যেই সে আজ আমাকে দেখতে এসেছিল। বড়লোক, বেশী অনুরোধ করিতে না পেরে টাকা গুলো চুপ চুপ রেখে চলে গেছে। আমার প্রথম অনুরোধ এই যে, তুমি এই টাকা যেমন করে হোক ক্ষিতীশকে ফেরত দাও।"

গুরুচরণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। করুণাময়ী বলিল, "দেখ দেরী করলে হবে না।"

"এত ব্যস্ত হয়েছ কেন?"

করুণাময়ী বলিল, "আমার ত এই রোগ, যদি ভুল হয়ে যায়—"

গুরুচরণ বলিল, "কখনই নয়—আজ কবিরাজ বলে গেছেন তোমার রোগ অনেক সেরে গেছে।"

করুণাময়ী আর কথা কহিল না।

কিছুক্ষণ পরে গুরুচরণ বলিল, "তবে যাই।"

করুণাময়ী বলিল, "তবে একটা কথা—তুমি যদি ঐ টাকা নিতে চাও, তাহলে ফেরত দিও না।"

গুরুচরণ বলিল, "না—কখনই নয়—ও টাকা তোমার, তুমি যা খুশী তাই করবে।"

করুণাময়ী বলিল, "স্ত্রীর ধনে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, টাকা তোমাকে দিলাম, তুমি যা খুশী করতে পার।"

গুরুচরণ টাকা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে কি ভাবিল।

তারপর ধীরে ধীরে গৃহদ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

১৮

তখন রাত্রি নয়টা। ক্ষিতীশ বাহিরের ঘরে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতেছে, এমন সময় গুরুচরণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষিতীশ যেন নিদ্রার ঘোরে বলিল, "তুমি যে আবার আসবে তা জানি। টাকা ফেরত এনেছ ত?"

গুরুচরণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষিতীশ বলিল, "বস, তোমার হাতে টাকা রয়েছে দেখছি।"

গুরুচরণ বলিল, "হাঁ ভাই, টাকা ফেরত এনেছি।"

ক্ষিতীশ বলিল, "দেখ গুরুচরণ, জগতের মধ্যে পেয়েছি শুধু অর্থ; ভগবান আর কিছু দেন নি—আমার। স্ত্রী দরিদ্রের কন্যা—বাবা আমার দরিদ্র শ্বশুরকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করতে গিয়ে পুত্রের বিলাস

প্রমত্ত অশ্বরের ঘাতে তৃপ্ত হতে পারে তাহা ভাবেন নি। বিবাহের পর স্ত্রী যেন পর-হয়ে রইল—আমি সে স্ত্রীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারলাম না। ভগবান দারিদ্র্যকে স্ত্রীরূপে এনে দিলেন তাঁহার দানে অগ্রাহ্য করলাম—অর্থের গর্ব্বে তোমারও বন্ধুত্বকে অগ্রাহ্য করেছি।"

গুরুচরণ কহিল, "তুমি আমাকে রক্ষা করেছ। আমাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখিয়েছ।"

ক্ষিতীশ বলিল, "তারপর শোনো। মাসিক বৃত্তি—বাবা যা বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন—তুমি তা নিলে না—দিদি ঠাকুরণ নিলেন। তখন তোমার উপর রেগেছিলুম। অর্থই আমার বল—নন্দকিশোরকে ডেকে বল্লুম,—যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় ত টাকা দেবে, নচেৎ নয়। দিদিঠাকুরুণ তাই শুনে টাকা নেওয়া বন্ধ করলেন। দেখ টাকা তোমার, দাতা আমি নয়, আমার পিতা। আমি সে টাকা দিতে বাধ্য, তবুও সে টাকা যে আমিই দিচ্ছি এ অহঙ্কার ছাড়তে পারিনি। তুমি যে টাকা ফেরত নিয়ে এসেছ, তাও আমার পাপেরই প্রতিফল। আমার বড় আক্ষেপ যে, ঐশ্বর্য্যমত্ত হয়ে আমি দেবতার অবমাননা করেছি।"

গুরুচরণ বলিল, "ভাই, আমি তোমার কোন দোষ দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

ক্ষিতীশ বলিল, "টাকা যখন ফেরত নিয়ে এসেছ, দাও—আমি দান করব কি? দাতার উপযুক্ত হ'লে এ দান ফেরত আসত না।"

গুরুচরণ বলিল, "তুমি ত বলেছ—এ টাকা তোমার পিতার দান—তুমি ত দাতা নও।"

ক্ষিতীশ বলিল, "পিতার দান হলেও আমি তাঁর বস্তুকে নিজের মতই দেখেছি। আমি সে টাকা তুমি নষ্ট করবে ভেবে এতদিন দিই নি, সে টাকার যেন আমিই অধিকারী। এই অহঙ্কারের ফল আমি খুবই ভুগেছি। এখন আমার অনুরোধ—টাকাটা তুমি নাও।"

"এখন টাকার প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন ত পরে হতে পারে।"

"তখন চেয়ে নেব।"

"তবে দাও।" বলিয়া ক্ষিতীশ হাত পাতিল।

যখন গুরুচরণ ফিরিল, তখন রাত্রি এগারোটা। করুণাময়ীর নিকটে আসিয়া দেখিল রোগী বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই অবসন্ন।

করুণাময়ী চক্ষু চাহিল। গুরুচরণ বলিল, "টাকা ফেরত দিয়ে এলুম।"

"এই বার আমার দ্বিতীয় অনুরোধ—বল রাখ্‌বে।"

গুরুচরণ দেখিল, করুণাময়ীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখমণ্ডল স্বর্গীয় আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিল, "রাখবো।"

করুণাময়ী আঁচল হইতে বাক্সের চাবী খুলিয়া গুরুচরণের হাতে দিল। বলিল, "সিন্দুকের চাবীটা বার কর।"

গুরুচরণ তাহাই করিল।

করুণাময়ী বলিল, "দেখ সিন্দুকের ভিতর ছোট একটি টিনের বাক্স আছে; সেটা নিয়ে এস।"

গুরুচরণ বাক্সটি বাহির করিয়া আনিল।

করুণাময়ী বলিল, "বাক্সটি খুলে ফেল।"

গুরুচরণ বাক্স খুলিয়া দেখিল—তাহার মধ্যে সেই হারটি রহিয়াছে।

গুরুচরণ শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "এ হার এখানে কেন?"

"আমি কিনে নিয়েছি।"

গুরুচরণ অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। করুণাময়ী বলিল, "আমার অনুরোধ রাখ্‌বে বল।"

"রাখ্‌বো।"

"যাকে তুমি এ হার দিয়েছিলে—এ হার তাকেই দাও।"

গুরুচরণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রহরান্তে শিবার দল চীৎকার করিয়া উঠিল।

সকালে কবিরাজ বলিলেন "রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ।"

আট দশ দিন পরে একদিন গুরুচরণকে নিভৃতে ডাকিয়া করুণাময়ী বলিল, "হারটা দিয়ে এসেছ ?"

গুরুচরণ বলিল, "হাঁ।"

করুণাময়ী সারাদিন চিন্তাকুল হইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় গুরুচরণ বলিল, "আজ তুমি কি এত ভাবছ বলতে পার ?"

করুণাময়ী বলিল, "আমার একটা কথার জবাব দেবে ?"

"কি, বল।"

"দেখ, আমি ধনীর কন্যা—তুমি দরিদ্রের সন্তান সেই জন্যই আমার মনে মনে একটা অহঙ্কার ছিল, অভিমান করে অনেক সময়ে আমি আপনার মতেই চলেছি, আমাকে ক্ষমা করবে ?"

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। গুরুচরণ বলিল, "তোমাকে ক্ষমা করব আমি ?"

করুণাময়ী বলিল, "এতদিন বুঝতে পারি নি, আমি সংসারে যতটা মন দিয়েছিলাম—ততটা তোমাতে দিই নি। তুমি ক্ষমা না করলে আমি শান্তি পাব না।"

দুজনেরই চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া আজ ছেলে মেয়েরা অবাক হইয়া ঘরের এক কোণে গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

সমাপ্ত

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাচা শিকার

সর্ব্বপ্রকার শিকারের মধ্যে, 'মাচা'য় বসিয়া শিকারই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া আমার বিশ্বাস। কোন স্থানে 'মরির' (kill)' খবর পাইলে, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক গাছে 'মাচা' বাঁধিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। 'মরির' নিকট গাছ না থাকিলে মরিটাকে এক আধটুকু সরাইয়া, সুবিধাজনক স্থানে আনিলেও বিশেষ কোন হানি হয় না। কোন কোন স্থানে বাঘের চলাফেরা আছে অথচ 'মরি' করিতেছে না, এরূপ অবস্থা হইলে 'মাচা' করিয়া 'বেট' বাঁধিয়া বসিতে হয়। নহবত খানার মত প্রকাণ্ড ও মজবুত করিয়া অস্বাভাবিক রকমের মাচা করিলে, তাহার কাছ দিয়াও কোন জানোয়ার ঘেঁসে না। ছোট করিয়া যতদূর সম্ভব, স্বাভাবিক রকমের 'মাচা' করা উচিত। অনেকে আত্মগোপনের জন্য 'মাচার' সম্মুখে, কতকগুলি ডাল পালা দিয়া বেড়ার মত করিয়া আবরণ দেন; তাহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সম্মুখে অতি সাধারণ রকমের ২।১ টা ডাল দিয়া আবরণ দিলেই চলিতে পারে।

জানোয়ারগুলি চলিবার সময় প্রায়ই উপরের দিকে তাকায় না; সম্মুখে ও ডাইনে বাঁয়ে দেখিতে দেখিতে চলে। পিছনে তাড়া পাইলে খানিক আসিয়া আবার পিছনের দিকে তাকায়, আবার চলিতে থাকে।

'বেট' বাঁধিয়া 'মাচা' করিতে হইলে ভাল স্থান দেখিয়া, ৫।৭ কি ১০ দিন পূর্ব্বেই 'মাচা' করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে পূর্ব্ব হইতেই জানোয়ারেরা উহা দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়া যায়। আনাড়ি দ্বারা 'মাচা' বাঁধাইলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়।

কুলি দিয়া পাহাড় বা জঙ্গল 'বীট' করাইয়াও

'মাচায়' বসা যায়। খুব শান্ত হইয়া বসিয়া না থাকিতে পারিলে, মাচা শিকারের আশা বৃথা। আমাদের সঙ্গী কোন শিকারী, আমার সঙ্গে দুই একবার ভিন্ন মাচাতে বসিয়া কিছু পরেই অধীর হইয়া, হয় ছুরী দিয়া গাছের ডাল কাটিতেন, কি মাথার পাগড়ী খুলিয়া তাহাতে কতকগুলি cartridge বাঁধিয়া মাচার উচ্চতা পরিমাপ করিতেন! ইহার ফল সহজেই অনুমেয়। কেহ বা মাচায় বসিয়া, অন্য কোন সঙ্গী থাকিলে, তাঁহার সঙ্গে যত দুনিয়ার গল্প ফাঁদিয়া বসিতেন। যাঁহাদের ২।৪ ঘণ্টা ধীরভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস নাই, তাঁহাদের মাচায় না বসাই ভাল।

অনেকের বিশ্বাস 'মাচা' খুব উচ্চ না হইলে, বিপদের আশঙ্কা অধিক; বাস্তবিক তাহা ভুল। সাধারণতঃ মাচা ১০ হইতে ১২ ফিট উচ্চ হইলেই যথেষ্ট। কোন কোন সময় মাচা হইতে, কোন শিকারকে এক গুলিতে রাখিতে না পারিলে, সে জখম হইয়া চলিয়া যায়; তখন শিকারীকে মাচা হইতে নামিয়া রক্তের দাগ ধরিয়া অনুসরণ করিতে হয়। ব্যাঘ্রাদি একে ভীষণ প্রকৃতির, তাহাতে আবার জখম হইলে ভীষণতর হইয়া উঠে; এই অবস্থায় খুব বিবেচনার সহিত উহাদের পশ্চাদ্ধাবন না করিলে বিপদ অনিবার্য্য। যাহারা পাহাড়ে জঙ্গলে হাঁটিতে অনভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে এই ভাবে রক্তের দাগ ধরিয়া অনুসরণ করা অসম্ভব। জানোয়ারের পিছনে পিছনে হুড়মুড় করিয়া গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অতি সন্তর্পণে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়। শিকারের 'ধ্যান' করিয়া যাইবার সময় পায়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে অনেক সময় পায়ের নীচে আলগা পাথরের টুকরা পড়িয়া, গড়াইয়া অথবা হুচোট খাইয়া, বন্দুক সমেত পড়িয়া যাইতে হয়।

যে সব জঙ্গলে হাতীতে শিকার করা একেবারেই সম্ভব নয়, অথচ মাটিতে বসিয়া শিকার করিবারও সুবিধা-জনক স্থান পাওয়া যায় না, সেই সব স্থানে মাচা শিকার করিতে হয়। সাধারণতঃ পাহাড়েই ইহা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ বাঘ শিকার মাচাতেই করা উচিত।

আমি হাজারিবাগ অঞ্চলে বহুবার মাচা শিকার করিলেও অধিকাংশ সময়ই ইহা আমার বিশিষ্ট বন্ধু, কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার, সুদক্ষ শিকারী মিঃ কে. এন, চৌধুরীর সহিত উড়িষ্যার করদ রাজ্য বামরা ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানে করিয়াছি। ইঁহার সহিত ২০।২৫ বৎসর হইতে পরিচিত হইয়া শিকার উপলক্ষে নানা স্থানে ও কলিকাতায় বহু সময় একত্র থাকায় আত্মীয়তা ও ভালবাসার বন্ধনে এতদূর জড়িত হইয়া পড়িয়াছি যে, উহার গ্রন্থি আর শিথিল হইবার নহে।

এ ক্ষেত্রে একটী কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সখব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক সময় ব্যবসাগত ঈর্ষ্যা (Professional jealousy) যেরূপ দেখা যায়, এই সখের ব্যাধ বৃত্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। আমাদের কোনও কোনও বন্ধুদের মধ্যেও ইহার প্রভাব দেখিতে পাইয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় নিজেকে এ পর্য্যন্ত উহা হইতে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছি। আর যে কয়দিন আছি, এই সব বন্ধু বান্ধবের স্নেহ ভালবাসা সমভাবে বজায় রাখিয়া যাইতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করিব।

মিঃ চৌধুরীর সহিত এই মাচা শিকারের পূর্ব্বেও ২।৩ বার আমাদের দেশে ও সিলেট অঞ্চলে একত্রে হাওদা শিকার করিয়াছি।

পাহাড় অঞ্চলে কোন কোন সময় দুই একটা বড় পাথরের আড়ালে মাটিতে বসিয়াও শিকার করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাহা সুবিধা হয় না; কাযেই মাচাতেই বসিতে হয়।

অনেক গাছের ডাল কাটিয়া টংএর মত করিয়া মাচা বাঁধিয়া বসেন। উহা দেখিতে অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয় বলিয়া দূর হইতেই জানোয়ারগণ টের পায়। যদি এই জাতীয় মাচাতেই কাহারও বসিতে হয়, তবে তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁধিয়া রাখাই উচিত, যেন জানোয়ারগণ দেখিয়া দেখিয়া অভ্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু যে শিকারী-

দল বর্গীর মত হঠাৎ এক এক পাহাড় বীট করিয়া তোলপাড় করিয়া তুলেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা সম্ভবপর হয় না। এক একখানা 'চারপায়া', (খাটলি) পা ছয় ডালে বাঁধিয়া বসিয়া থাওয়াই সুবিধা; আবশ্যক হইলে ২।১টা সরু ডাল কাটিয়া 'ঠেকা' দিয়াও লওয়া যায়। ইহাতে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই এক একটী মাচা তৈয়ার হইয়া যায়; গাছও বেশী কাটা পড়ে না। কাযেই দূর হইতে জানোয়ারগণ কোনরূপ সন্দেহ করে না। আমরা এই প্রণালীতেই মাচা বাঁধিয়া শিকার করিয়াছি। গ্রাম হইতে 'চারপায়া' সংগ্রহ করাও কঠিন নয়।

এই প্রকারের মাচায় বসিয়া শিকার করিতে করিতে এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, জানোয়ার একটু বেশী ডান বা বাঁ দিয়া সরিয়া গেলে, ইহা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া মারা অত্যন্ত অসুবিধা; বিশেষতঃ আমার মত লোকের পক্ষে। এই সব অসুবিধা দূরীকরণ জন্য আমি ঠিক্ হাওদার প্রণালীতে, অথচ খুলিয়া নিয়া ১০ মিনিটের মধ্যেই যায়গা মত বসানো যায়, মাত্র একমণ ওজনের, দুইটী বন্দুক সহ দুইজন লোক বসিবার উপযোগী করিয়া, চারপায় অপেক্ষা ছোট এক রকম মাচা আবিষ্কার করিয়াছি। ইহাতে বসিয়া, দাঁড়াইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, যে কোন রকমেই শিকার করার অসুবিধা হয় না।

একবার অত্যন্ত জব্দ হইয়া, তবে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আমরা বামরা রাজ্যের কোন পাহাড়ে এক পাল বাইসন এর সংবাদ পাইয়া (ঐ প্রদেশে Bisonকে 'গয়েল' বলে) শিকার করিতে যাইয়া মাচা করিয়া বসি। দুই, আড়াই শত কুলি প্রায় এক, দেড় মাইল দূর হইতে ইহাদের drive করিয়া আনায়, আমার সম্মুখেই ইহারা পাল ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের সংখ্যাও সাত আটটীর কম ছিল না। যদি আমি ইতস্ততঃ না করিয়া, প্রথমে আমার সম্মুখে যে দুটী ছিল তাহাদিগকে মারিতাম, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস,

আহত নীলগাই

দুই গুলিতেই দুইটীকে মারিতে পারিতাম, কিন্তু ইহাদের বিশালকায় দলপতিকে পশ্চাতে দেখিয়া, সম্মুখস্থ ২টীকে গুলি না করিয়া উহাকেই মারিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে যাও একটু সুযোগ মিলিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যে সেটিন খুঁটিনীর মধ্যে আমি যেন একটী গর্ত্তে বসিয়াছিলাম, কাযেই উহাকে মারার আর সুবিধা হইল না। একটু নড়া চড়া করিলেই উহা পলাইয়া যাইবে মনে করিয়া, নড়িতেও পারিতেছিলাম না। তখন উহাদের পিছন হইতে হঠাৎ beater কুলীদের চীৎকারে সমস্ত গুলি নক্ষত্রবেগে দৌড় দিল। তথাপি যতদূর সম্ভব তৎপরতার সহিত, আমার উদ্দিষ্ট বাইসন্‌কে একগুলি করিলাম; গুলিও ঠিক স্কন্ধে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে দূরত্ব নিবন্ধন এক গুলিতে উহাকে মারিতে পারিলাম না; অত্যন্ত জখম হইয়া অন্য এক দূর পাহাড়ে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আমার বন্ধু শিকারী মিঃ চৌধুরী, তাঁহার মাচা হইতে নামিয়া, পশ্চাদ্ ধাবন করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। পরে উহাকে অন্য এক পাহাড়ে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। যদি আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া গুলি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রথম সুযোগ নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই উহাকে হারাইতাম না। ইহার পরই আমি, এই প্রণালীর 'হাওদা মাচা' তৈয়ারী করিয়াছিলাম।

বামরা রাজ্যের কোন এক পাহাড়ে 'হাঁকোয়া' করিয়া একবার আমি এত জব্দ হইয়াছিলাম যে, তাহা লিখিতে লজ্জাবোধ হয়। আমি এক মাচায় ছিলাম, সেদিন বাঘের কোন খবর ছিল না; হরিণের জন্য পাহাড় হাঁকানো হইতেছিল। খানিকক্ষণের মধ্যেই এক শুকনা নালা দিয়া, সস্ত্রীক একটী বাঘ আমার দিকে আসিয়া পড়িল। নালা দিয়া আসিবার সময়ই গুলি করিলে, অন্ততঃ একটীকে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু আরও কাছে আসিলে গুলি করার সুবিধা হইবে মনে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বাঘিনীটী ঠিক আমার মাচার নীচে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। একবার হঠাৎ উপরে আমার দিকে দৃষ্টি পড়ায়, সমস্ত গুলি দাঁত বাহির করিয়া যেন মুখ ভ্যাংচাইল। ইচ্ছা করিলে তখন অনায়াসেই এক গুলিতে শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দুইই হারাইতে হইল। বড় বাঘটী একটু দূরে ঠিক আমার সম্মুখে সমসূত্রে দাঁড়াইয়া ছিল বলিয়া, পাশ ফিরিলে উহাকেই মারিব, এই সুযোগ খুঁজিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাইসনের মত দুইটীকেই হারাইতে হইল।

মাচায় যদি খুব শান্ত হইয়া বসিয়া থাকা যায়, তবে হরিণ, বাইসন প্রভৃতি যে কোন জানোয়ার মাচার এত নিকটে আইসে যে, তখন উহাদিগকে ঢিল ছুড়িলেও লাগান যায়। উহাদের তখনকার ঘন ঘন পশ্চাদ্দৃষ্টি ও ভীত চকিত ভাব একটি উপভোগের বিষয়। আমি কোন কোন সময় আমার মাচার নীচে দুই একটী হরিণকে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ছুড়িয়াও মারিয়াছি। উহা অপেক্ষা বৃহৎ শিকারের প্রত্যাশায়ই এইরূপ করিয়াছি। এই সব পাহাড় অঞ্চলে শিকার করিবার পূর্ব্বে আমি কখনও বাইসন মারি নাই। মহিষের মত যদিও ইহারা তত বড় না হউক, তথাপি এই সব বিশালকায় জানোয়ার যেরূপ উঁচু নীচু পাহাড়ের ভীষণ জঙ্গলে, খাল নালার মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া যায়, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।

একবার আমরা বামরায় জমনক্রিয়ার পাহাড়ে এক পাল বাইসনের সন্ধান পাইয়া কয়েকদিনের উপর্য্যুপরি চেষ্টা সত্ত্বেও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। একদিন সৌভাগ্যক্রমে, পাহাড় drive করাইতে করাইতে দল শুদ্ধই আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখেই ঢালু পাহাড় ক্রমে যাইয়া সমতল ভূমির সহিত মিশিয়াছে, কাযেই ইহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিল না। পিছনের beater কুলিগণ তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই; সেই জন্যই ইহারা কতকটা শান্তভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। আমি আর তখন সময় ক্ষেপণ না করিয়া যেটীকে সুবিধা পাইলাম তাহার উপরেই আমার রাইফেলের দক্ষিণ নল প্রয়োগ করিলাম। উহাতে steel cored গুলি ছিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ঢালু পাহাড়ে গড়াইয়া নীচে উত্থান

আহত বাইসন্‌

শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলিও ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমি অপর একটীকে ফায়ার করিলাম, এইটীও সঙ্গে সঙ্গে নীচে গড়াইয়া পড়িল। যদি তখন আমার নিকট আর একটি বন্দুক থাকিত, তবে নিশ্চয়ই অন্ততঃ আর একটীকে মারিতে পারিতাম। আমার কার্ত্তুজ যদি ধূমশূন্য (smokeless) বারুদের না হইত তবে এ ভাবে নিমেষের মধ্যে দক্ষিণে ও বামে এরূপ প্রকাণ্ড দুইটী জানোয়ারকে মারিতে পারিতাম না। অনেক শিকারীরই এরূপ সৌভাগ্য হয় না।

সেবার আমি কলিকাতা হইতে হঠাৎ বামরা শিকারে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া বাড়ী হইতে বন্দুক আনাইবার সুবিধা হয় নাই। Manton Co. হইতে একটী 577 hired express rifle ও মাত্র ৫০টী গুলি লইয়া যাই। কিন্তু শিকার হইতে কলিকাতা আসিয়া ২৩টী গুলি সহ বন্দুকটী দোকানে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। সেবার কার শিকারে আমি ২৭টী আওয়াজ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২৩টী শিকার করিয়াছিলাম। ইহার তিনটী গুলি আবার পূর্ব্বোক্ত বাইসন দুইটীর অন্তিম যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল; মাত্র একটী গুলিই 'মিস্‌' হইয়াছিল! আমার জীবনে আর কখনও এরূপ সফলতা লাভ করি নাই। এই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জাতীয় শিকারে সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে বিফলতার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। নচেৎ আমি এইরূপ অনভ্যস্ত বন্দুক দিয়া এতটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না।

ডালা শিকার।

আমাদের ওতদঞ্চলের মধুপুর ও ভাওয়ালের জঙ্গলে,

নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য শিকারীগণ আর এক অভিনব প্রণালীতে শিকার করে; তাহাকে ডালা শিকার বলে।

একজন লোক প্রকাণ্ড একটী ডালা বা ডালি মাথায় উপুড় করিয়া দিয়া, তাহার উপর মাটির সরাতে মোটা শলিতায় একটী প্রদীপ জ্বালিয়া আগে আগে এবং ঠিক তাহার পিছনে বন্দুক সহ শিকারী যাইতে থাকে। আলোটী মাথায় থাকার দরুণ নীচে চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারের একটী বৃত্ত হয়। ইহারা আস্তে আস্তে বনে বনে ঘুরিতে থাকে। অনেক সময় হরিণ কিংবা যে কোন জন্তু উজ্জ্বল আলোটির দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকে; কাযেই ছায়ায় ঢাকা লোক দুটীকে দেখিতে পায় না। ইহাকে আমরা Torch light shooting বলিলেও বলিতে পারি। এইভাবে নিকটস্থ হইয়াই শিকারী পিছন হইতে গুলি করে, কিন্তু যদি দৈবাৎ কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয়, তখনই ঐ আলোটি পট করিয়া মাথা হইতে নামাইয়া ডালা চাপা দিয়া আস্তে আস্তে পিছন দিকে সরিয়া পড়ে। শুনিয়াছি সুন্দরবন অঞ্চলেও স্থানীয় লোকেরা অনেক সময় এইরূপ শিকার করে।

ছোটনাগপুরে ও সাঁওতালীদের মধ্যে এই প্রণালীর শিকারের প্রচলন আছে। তাহাদের মধ্যে নাকি আলো লইয়া আগে আগে যাইবার সময় সানাই বা বাঁশী বাজাইবার প্রথাও আছে। ইহাতে নাকি আরও সুবিধা এই হয় যে দূর হইতে হরিণ বা যে কোন জানোয়ারই স্বর লহরীতে মুগ্ধ ও তীব্র আলোকে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সময় আলোর দিকে তাকাইয়া যেন hypnotised হওয়া মত, আস্তে আস্তে নিকটে চলিয়া আসিতে থাকে। তখন শিকারীদের অতি সাবধানে থাকিতে হয়। যদি কোন কারণে ইহাদের এই ভাবের আবেশ ভাঙ্গিয়া যায়, তবে হিংস্র জন্তু হইলে বিপদ অনিবার্য্য।

এই প্রণালীতে শিকার করিতে আমি কখনও দেখি নাই। তবে আমি হাজারীবাগ থাকা কালে, পরীক্ষা করিবার জন্য দুই তিন দিন রাত্রে সাওতাল কুলিদিগকে এইরূপে শিকার করিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা বিশেষ কিছু ফল করিয়া আসিতে পারে নাই। কেবল একদিন গোটা দুই খরগোস মারিয়া আনিয়াছিল মাত্র।

আমাদের দেশে জগা পলোয়ান নামক একজন মান্দাই শিকারী ছিল। (এই মান্দাই দিগকে আমাদের দেশে মন্দাই, কোঁচ, হদী, হাজং প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে)। সে চিরজীবন এই প্রণালীতেই শিকার করিত। এক রাত্রে সে তাহার সহকারীকে সঙ্গে লইয়া ভাওয়ালের জঙ্গলে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে যায়। হঠাৎ সম্মুখে এক ভালুক পড়ায় তাহার সঙ্গী অত্যন্ত ভয় পাইয়া আলো লইয়াই প্রস্থানের উদ্যোগ করে। জগাও নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ ভালুককে গুলি করে, কিন্তু নিয়তি প্রেরিত ভালুক তাহার গুলি উপেক্ষা করিয়া আসিয়া জগার ডান হাত কামড়াইয়া ধরে ও সমস্ত হাতটীর অস্থিমাংস চূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। পরদিন উহাকে ডুলি করিয়া ময়মনসিংহ হাসপাতালে লইয়া আসা হয়। সেখানে স্কন্ধদেশের নিকট হাতখানা amputation করার কয়দিন পরেই হাসপাতালেই তাহার মৃত্যু হয়। উল্লিখিত গল্পটী হাসপাতালে তাহার নিজ উক্তি অবলম্বনে লিখিত হইল।

ইহা দ্বারাও বুঝা যায়, এই জাতীয় শিকারের চেষ্টা কোন সৌখীন ভদ্র শিকারীর করা উচিত নয়।

(সমাপ্ত)

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

২। ব্যক্তিগত পরিচয়।

বালক যাদবেশ্বর অতি অল্প বয়সেই পিতৃ মাতৃ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিদ্যাশিক্ষার কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। অন্যান্য অভিভাবকগণই যত্নপূর্ব্বক ইঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইটাকুমারীতে হরনাথ বিদ্যাবাগীশের টোলে ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের কতিপয় গ্রন্থ পাঠান্তে, তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তৎকালে ইঁহার অগ্রজ মহাকবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার কাকিনাধিপের রাজসভা-পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়মুকুল প্রভৃতি প্রণেতা রাজেন্দ্র-নারায়ণ শাস্ত্রত্ন এবং যাদবেশ্বর—উভয়েই কিছুকাল কাকিনায়, কবি শ্রীশ্বরের নিকটে, কাব্য ও অলঙ্কার শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই, যাদবেশ্বর বারাণসীধামে জগদ্বিখ্যাত বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকটে উপস্থিত হন। তৎকালে এবং উত্তরকালেও, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এবং কৈলাসচন্দ্র শিরোমণির খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে বিকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বেদান্ত ও ন্যায়—এই দুই দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে, এই দুই দুর্দ্ধর্ষ অধ্যাপকের নিকটে অধ্যয়ন না করিলে, কাহারই পাণ্ডিত্যখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা ছিল না। বৎসরের পর বৎসর, বহুদূরদেশ হইতে ছাত্রমণ্ডলী বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইত এবং ইঁহাদিগের পদপ্রান্তে বসিয়া দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জ্জন করিত। ফলতঃ ইঁহাদিগের নিকট অধ্যয়ন করেন নাই, এ প্রকার পণ্ডিত বঙ্গদেশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবক যাদবেশ্বর অল্পকালের মধ্যেই ইঁহাদিগের অনুগ্রহে, ন্যায় ও বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ দর্শনে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ গ্রিফিথ্ সাহেব সেই সময়ে বারাণসীস্থ কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি

যাদবেশ্বর (বার্দ্ধক্য)

গ্রন্থের অনুবাদক ডাক্তার ভিনস্ তখন এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইঁহাদিগের সহিতও পণ্ডিত যাদবেশ্বরের বিশেষ পরিচয় ছিল।

ইঁহারই পাঠদশায়, স্বামী দয়ানন্দ কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ইনি বেদ ব্যতীত হিন্দুর পুরাণাদি গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না। ইনি নিজে ঋগ্বেদের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরও ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। পাণিনির মহাভাষ্য গ্রন্থেও ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট কোন বিষয়ে বিশেষ তুষ্ট হইয়া ইঁহার উপকার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, দয়ানন্দ ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধিকারে যতগুলি ভাগবত গ্রন্থ পাওয়া যাইবে, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি সেগু

|হ করিয়া যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া , তবেই তাঁহার প্রকৃত উপকার করা হইবে। এই বেদজ্ঞ কাশীতে উপস্থিত হইলে, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তারাচরণ তর্করত্নের সহিত যে তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল, ার ইতিহাস পণ্ডিত মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। যাদবেশ্বর তর্কসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে র মুখে সেই তর্কসভার বিবরণ কতবার শুনা ছে।

নানাশাস্ত্রে জ্ঞানার্জ্জন য়া, উপাধিভূষণে ভূষিত া, পণ্ডিত যাদবেশ্বর ত্ত্বে রংপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ন। রংপুর টাউনের রে টোলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পাঠী স্থাপন করিয়া, দিগকে অধীত বিদ্যার ফল রণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিল্লভের প্রসিদ্ধ ভূম্যধি- রী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন তৎকালে ইঁহার বিশেষ পোষক হইয়া উঠেন। তদিন প্রাতঃকালে আপন পুষ্পচয়ন করিয়া লইয়া, ভূম্যধিকারীর গৃহে নিজের পূজা আহ্নিক াপন করিতেন এবং স্বহস্তে অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া া প্রায় একটার সময়ে ভোজন ক্রিয়া সমাপন রয়া, আপন গৃহে ফিরিতেন। ইহা আমি দিন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাকিনার া মহিমারঞ্জন, ডিমলার রাজা জানকীবল্লভ ইঁহার শব সম্মান করিতেন এবং এই সকল রাজ সরকার তে ইঁহার টোলে মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হইত। কিছুকাল র, ইঁহার রংপুরস্থ বাস ভবনে পত্নী জগদীশ্বরী আগমন করেন। এই প্রকারে ইটাকুমারী হইতে ইঁহারা রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হন।

রংপুর বাসকালে পণ্ডিত যাদবেশ্বর, কেবল যে অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় অধ্যয়ন অধ্যাপনামাত্র লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন তাহা নহে। অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিতরূপে, নানা দিগ্‌দেশীয় ছাত্রবর্গ বিবিধ শাস্ত্রে ইঁহার উপদেশ লইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে তাঁহার বাসগৃহ রংপুরস্থ পদস্থ ও বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিত। বিচার বিভাগস্থ গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ—ডেপুটী, মুনসেফ্ প্রভৃতি; গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা—প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার গৃহে আসিতেন এবং নানা বিষয়ের আলোচনা সর্ব্বদাই হইত। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতার ইহাই বীজ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। রংপুর ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড এবং মুনসিপালিটীর মেম্বররূপে এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপেও বহুকাল ইনি দেশের কার্য্য করিবারও সুবিধা পাইয়াছিলেন। ফলতঃ রংপুরের বিদ্বৎ সমাজে অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি উপস্থিত হইল এবং ইনি সকলেরই বিশেষ সম্মান ভাজন হইয়া উঠিলেন। রংপুরের জনহিতকর তাৎকালিক বহুকার্য্যে পণ্ডিত যাদবেশ্বরের নাম ও কার্য্যতৎপরতার স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পিতা ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, এল, দত্ত, মুনসেফ ভি,

অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পুত্রবধূ সহ যাদবেশ্বরের পত্নী শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী

রায়, পোষ্টাফিস সমূহের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ "গ্রীক ও হিন্দু" প্রণেতা, ৺প্রফুল্ল বন্দোপাধ্যায়, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রখ্যাত "আর্য্যদর্শন" সম্পাদক সুপণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রসিদ্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট সার জর্জ গ্রীয়ার্সন ও স্মাইন্‌—এই সকল মহামনা ব্যক্তির সহিত পণ্ডিত যাদবেশ্বরের কেবল যে একস্থানে বাস নিবন্ধন পরিচয় ছিল, তাহা নহে; ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা ও সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই পণ্ডিত যাদবেশ্বরকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহারা পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে আসিতেন এবং নানাবিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের সময়ে ১২৮৫ সালে মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী মহিলা, পণ্ডিতা রমাবাই রংপুরে

নন করেন। এই মহিলা ক্ষিপ্রভাবে সংস্কৃত কবিতা
। করিতে পারিতেন। কেহ কোন সমস্যার একটী
বলিয়া দিলে, ইনি তৎক্ষণাৎ অপর তিন পাদ
। করিয়া দিতে পারিতেন। ডাক্তার ঘোষের বিশেষ
রংপুর টাউনে, কাকিনার রাজ-গৃহে কুড়িগোপাল
,—সমস্যা সভা আহূত হইয়াছিল। কাকিনারাজ্য
পণ্ডিত, বিরহিনী ও দিল্লীকাব্য প্রণেতা মহাকবি
র বিদ্যালঙ্কারও এই সকল সভায় আহূত হইয়া-
লন। পণ্ডিত যাদবেশ্বর এই সকল সভায় প্রদত্ত
স্যার পূরণে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিদুষী
বাই অবশ্যই মুখের কথা মুখে থাকিতেই সমস্যার
র পূরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু কবি শ্রীশ্বর এবং
গুত যাদবেশ্বরকে তিনি ক্ষিপ্রকারিতায় পরাজয় করিতে
র্থ হন নাই। তিনি নিজেই ইঁহাদের মুক্তকণ্ঠে
শংসা করিয়াছিলেন। একটী সমস্যা পূরণের কবিতা
মার মনে আছে। পাঠকদিগের প্রীতিপদ হইবে
বেচনায় এস্থলে সেই কবিতাটীর কথা বলিতেছি।
সকল কথা অনেকেই এখন ভুলিয়া যাইতে বসিয়া-
ন।

কাকিনারাজের সভায় এই সমস্যাটি দেওয়া
হইয়াছিল—

"ন তেন তমতাড়য়ৎ কিমপি যাহি যাহীতি সা।"

মহাকবি শ্রীশ্বর কৃত পূরণটী আমার মনে আছে। সেই
পূরণটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কৃতাগসি ধবে সতি স্তনপযুক্তদণ্ডোষ্ঠতঃ
করস্থিত মহোৎপলং সপদি ঘূর্ণয়ন্তী বধূঃ।
স্মরানল মহৌষধং তমিতি মন্যমানা পরং
"ন তেন তমতাড়য়ৎ কিমপি যাহি যাহীতি সা"॥

এই সমস্যাটী আদিরসে পূর্ণ করা হইয়াছিল বলিয়া,
কাকিনারাজের তাৎকালিক সচিব, "মৃণ্ময়ী" ও "অষ্টাদশ
বর্ষা" প্রণেতা, গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি
একটু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কবি শ্রীশ্বর তাহা দেখিয়া,
মুখের কথা মুখে থাকিতেই, ভক্তিরসে উহা পূরণ করিয়া
দেন। তাহা এইরূপ :—

শিশুং স্তনপিপাসয়া সপদি মাতুরুৎসঙ্গকং
বিধায়মুখং বাঃহরাণি চ নন্দপত্নী পুরা।
করেণ দধিমন্থন প্রণিহিতেন গোপালকং
"ন তেন তমতাড়য়ৎ কিমপি যাহি যাহীতি সা॥"

ঈদৃশ শক্তি দর্শনে সভাস্থলেই রমাবাই, কবি শ্রীশ্বরের
অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। রমাবাই, পণ্ডিত যাদবেশ্বর
উভয়েই এই সমস্যাটীর পূরণ অন্যপ্রকারে করিয়াছিলেন।
কিন্তু সে পূরণের কবিতা আমি সংগ্রহ করিতে পারিলাম
না। আজকাল সমস্যাপূরণের এই পদ্ধতি দেশ হইতে
উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই পদ্ধতি দ্বারা কবিতা রচনার
শক্তি স্ফুরিত হইবার সুবিধা পাইত এবং শক্তির ক্ষিপ্র-
কারিতা বৃদ্ধি পাইত। প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তিও বিকসিত
হইত।

এই সময় হইতেই একদিকে যাদবেশ্বরের কবিত্ব খ্যাতি,
অন্যদিকে অসাধারণ তর্ককুশলতার কথা নানাদিকে বিকীর্ণ
হইতে আরম্ভ করে। ইঁহাকে সর্ব্বদাই নানাদেশ বিদেশ
নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে আহূত হইয়া যাইতে হইত। সেই
সকল দেশের পণ্ডিতবর্গ সম্মিলিত সভায় নানাবিষয়ক শাস্ত্র
বিচারে ইঁহার নৈয়ায়িক-সুলভ তীক্ষ্ণধী এবং বিচার-পটুতা
প্রকটিত হইত। কি ব্যাকরণের জটিলতায়, কি স্মৃতি-
শাস্ত্রের ব্যবস্থা ঘটিত মীমাংসায়, কি নব্যন্যায়ের 'অবচ্ছেদা-
বচ্ছিন্নতায়'—সর্ব্বত্রই ইঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার
পরিচয় পাওয়া যাইত। অপর দিকে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও
ইঁহার কম প্রভাব পরিলক্ষিত হইত না। জনহিতকর
কত কার্য্যে পণ্ডিত যাদবেশ্বরের উদ্যোগ ও যত্ন কত প্রকারে
সার্থকতা লাভ করিত সে কথা রংপুর বাসীমাত্রেই অবগত
আছেন।

সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ পরলোকগত মহা-
মহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি-আই-ই মহোদয় বঙ্গ
বিহার উড়িষ্যার সংস্কৃত টোল সমূহের পরিদর্শক রূপে
রঙ্গপুরে পণ্ডিত যাদবেশ্বরের চতুষ্পাঠীতে আগমন করিয়া-
ছিলেন। তাঁহারই পরিদর্শনের ফলে এই চতুষ্পাঠীতে
বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হয়। গভর্ণমেণ্ট হইতে
নিয়মিত বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। রংপুর ডিস্ট্রিক্ট

বোর্ড হইতেও মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া সাহায্য প্রদত্ত হইতে থাকে। তাঁহাকে কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষকতার পদও প্রদত্ত হয়। তৎপ্রণীত "প্রশান্ত কুসুম" এবং "চন্দ্রদূত" ক্ষুদ্র-কলেবর হইলেও, বিস্ময়কর শব্দ গ্রন্থন শক্তি ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে আজও পাঠকের চিত্ত অভিভূত করিয়া তোলে। সংস্কৃত গদ্য লিখিবার শক্তিও তাঁহার কম ছিল না। সংস্কৃত গদ্য লেখা বড় কঠিন। কাদম্বরীর ন্যায় সুমধুর গদ্য-কাব্য, সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারেও, আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহার লিখিত গদ্য কিপ্রকার মিষ্ট ও সুললিত হইত, উঁহার রচনায় শব্দ সম্পদের কি প্রকার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিত, তাহার একটা নিদর্শন, "হেমোদ্বাহ" কাব্যের ভূমিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি সংস্কৃতের পণ্ডিত হইয়াও, বঙ্গভাষার প্রতি ঔদাসীন্য দেখান নাই। প্রচলিত সমস্ত মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা গুলিতে প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার লিখিত মৌলিক তত্ত্বপূর্ণ কত প্রবন্ধই না প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিলে, একখানি সুন্দর বিবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যসমন্বিত গ্রন্থ হইতে পারে। মেঘদূতের অনুবাদক সুকবি বরদাচরণ মিত্রের জীবিত কালে, বহুদিন ব্যাপিয়া বিদ্যাপতির ছন্দ সম্বন্ধে কত পত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। বাঙ্গলাতেও তাঁহার রচিত কবিতা সুমধুর হইত।

একবার বগুড়ায় এবং আর একবার কলিকাতায় তাঁহাকে সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির পদ প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রদত্ত 'অভিভাষণ' দুইটি সরসতায়, মৌলিকতায় এবং চিন্তার গৌরবে ও প্রদর্শিত পন্থার বিনির্দ্দেশ মহিমায়, অদ্যাপি বঙ্গ সাহিত্যের একটা উৎকৃষ্ট সম্পৎ হইয়া রহিয়াছে। "সংশয় নিরশন" ১ম ও ২য় ভাগ, "করোনেশন বক্তৃতা", "আশাকাব্য ও মৃণালিনীর সমালোচনা", "ত্রিসন্ধ্যা", "একাদশী তত্ত্ব"—প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলি পণ্ডিত যাদবেশ্বরের বাঙ্গলা ভাষার উপরে প্রভাব ও আধিপত্যের বিশেষ পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে, কত সভায় ও সম্মিলনে, তিনি বাঙ্গলাভাষায় যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সেই সকল বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন ছিল এবং অসংখ্য জন সমবেত বড় বড় সভায়, অতিদূরে উপবিষ্ট শ্রোতাও তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রত্যেকটী শব্দ অনায়াসে শুনিতে পাইতেন। জলদ-গম্ভীর, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট, বিশুদ্ধ শব্দ পরম্পরা, একটীর পর একটী দ্রুত ধ্বনিত হইয়া, শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণকুহরকে পরিপূরিত করিত এবং বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি চিত্তে তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত হইয়া যাইত। তাঁহার বক্তৃতার এই প্রকার একটা বিশেষত্ব ছিল। হায়! আজ সেই কণ্ঠধ্বনি চির তরে নীরব হইয়া গিয়াছে!

যে সময়ে সর্ উড্‌বরণ বাঙ্গলার ছোটলাট, সেই সময়ে তিনি রংপুরে আগমন করেন। ভারতের প্রাচীন প্রণালীতে সংস্কৃতের অধ্যাপনা কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, ইহা দেখিবার নিমিত্ত তিনি কৌতুহলী হইয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে উপস্থিত হন। অতি সূক্ষ্ম ও মসৃণ, লোহিতাভ ভূর্জ্জত্বকের উপরে লাল কালিতে কবিতা লিখিয়া পণ্ডিত মহাশয় ছোটলাটের অভ্যর্থনা করেন এবং পঠন পাঠনের প্রাচীন পদ্ধতিটী তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হয়। ছোটলাট বড়ই প্রীতিলাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। অল্পদিন পরেই, গভর্ণমেণ্ট হইতে "সার্টিফিকেট অব্ অনর্" প্রদান করা হয়। "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দিয়াও পণ্ডিত যাদবেশ্বরকে সম্মানিত করা হয়। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সম্মানার্থ "পণ্ডিতরাজ" নামক উপাধি দেন, এবং কাশীধামস্থ হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী বিদ্বর্গ মিলিত হইয়া, তাঁহার উপরে "কবি সম্রাট্" নামক একটী উপাধি বর্ষণ করেন। পণ্ডিত সমাজের মধ্যে তাঁহার কি প্রকার সমাদর ও প্রতিপত্তি ছিল, এই উপাধি দুইটী তাহার বিশেষ নিদর্শন।

পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই জানেন যে, রংপুর, দিনাজপুর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে "রাজবংশীয়" নামে বহু সংখ্যক লোকের বাস আছে। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, এই রাজবংশী জাতি তিব্বতের অপর প্রান্তস্থ "কাম্বোজ" নামক জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। দিনাজপুরের রাজ-ভবনে স্থিত একটী শিলালিপিতে একটী

শ্লোক ক্ষোদিত আছে। পালরাজা দিগের রাজত্বকালে যে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহারই কিছু পূর্ব্বে কাম্বোজীয় একজন নরপতি সদলবলে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করিয়া গৌড় বিজয় করেন। দেশীয় অধিবাসিগণের প্রীতি সম্পাদনার্থ ইনি একটী বৃহৎ শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদগাত্রে, "কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়-পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং, প্রাসাদো নিরমায়ি"—এই কবিতা চরণটি তাঁহারই দ্বারা ক্ষোদিত। এই নৃপতির সমভিব্যাহারে যে সকল সৈন্য-সামন্ত গৌড়ে প্রবেশ করিয়াছিল, এই রাজবংশীগণ তাহাদিগেরই অধস্তন পুরুষ অনেকে এরূপও অনুমান করেন। এই অনুমান সত্য কি না তাহা বলা যায় না। কিন্তু লোক গণনার সময়ে শ্রীযুক্ত রিজলি সাহেব এই জাতিটাকে অনার্য্য জাতি বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। এই ঘটনায় সমগ্র রাজ-বংশী জাতি নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠে। ইহার প্রতী-কারার্থ ইহারা সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া, ইহাদিগের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন এবং পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া তিনি আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তদবধি এই জাতি ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়াই পরিগণিত হইতে আরম্ভ করে। এখন ত ইহারা "ব্রাত্য ক্ষত্রিয়" নামেই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরেরই যত্নে ও চেষ্টায় এই জাতিটি হিন্দু সমাজভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইহা কম উপকার নহে। রঙ্গপুরে অদ্যাপি যে ধর্ম্ম-সভা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহারও তিনি জন্মদাতা। ইনি এই সভার আজীবন সভাপতি ছিলেন।

ইনি শেষ বয়সে কাশীবাসের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া, রংপুরের বাসস্থান পরিত্যাগ করতঃ, কাশীক্ষেত্রে বাস-স্থানের সংস্থান কার্য্যে পরিণত করেন। জীবনান্তের কতিপয় বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই ইনি কাশীবাস আরম্ভ করেন। কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে আদৌ তাঁহার মন সরিত না। তাঁহার একমাত্র পুত্র, শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

কাশীবাস কালে, সর্ব্বদাই ইহাঁর গৃহ বিদ্বজ্জন সমাগমে আনন্দমুখর হইয়া থাকিত। সর্ব্বদা তত্ত্ব কথার আলোচনা শাস্ত্র গ্রন্থানুশীলন, সভাদিতে সংস্কৃতে ও বাঙ্গলা ভাষায়, বক্তৃতা এই সকল কার্য্যেই তিনি নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। এই বারাণসী ক্ষেত্রেই, জীবনের শেষ সময়ে, ইনি কবিতা দেবীর সেবাও করিয়াছিলেন। ইহাঁর রচিত কবিতায় শব্দাড়ম্বরের যে প্রকার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত, তাহা বর্ত্তমান কালের অপর কবিতে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই শব্দাড়ম্বরের মধ্যে ভাবের মাধুর্য্য ও গম্ভীরতা কখনই বিনষ্ট হইত না। ইহা তাঁহার রচনার কম প্রশংসার কথা নহে। ইহাঁর রচিত "অন্নপূর্ণা স্তোত্র" এবং সুবৃহৎ মহাকাব্য "সুভদ্রা হরণ" ইহাঁর সেই শক্তির অসাধারণ পরিচয়রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অন্নপূর্ণা স্তোত্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সুভদ্রা হরণ মহাকাব্য মুদ্রিত হইবার সুবিধা পায় নাই। এই কাব্যখানি মুদ্রিত হইলে তাঁহার অসামান্য রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিত। আমি এই কাব্যের অনেক কবিতা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, এ প্রকার শব্দবিন্যাস কৌশল, ভাবের নূতনত্ব ও গাম্ভীর্য্য, কবিতার ঝঙ্কার, প্রাচীন কবিদিগেরই সমকক্ষ।

পরিশেষে, ইহাঁর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষত্বের কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। ইনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। কথোপকথনের শক্তি এ প্রকার বড় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার সহিত কথা কহিতে বসিলে সহসা কেহ উঠিয়া যাইতে পারিত না। বিবিধ তথ্য পরিপূর্ণ বাক্পটুতা লোককে মোহিত করিয়া তুলিত। হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত আচার-নিষ্ঠা, তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য চিরদিন রক্ষা করিয়াছে। জীবনে কোন দিন ইনি মাছ মাংস গ্রহণ করেন নাই। আতপান্ন ব্যতীত সিদ্ধান্ন কোন দিনই ইহাকে গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। সহধর্ম্মিণীর হস্তে বা অপর কয়েকটী মাত্র নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয়ার হস্তে ভিন্ন, অপরের হস্তে পক্ক অন্ন গ্রহণ করিতেন না। এই বিশেষত্ব আমরা আজীবন লক্ষ্য করিয়াছি।

সুপ্রসিদ্ধ "শকুন্তলা-তত্ত্ব" প্রণেতা, পরলোক গত চন্দ্রনাথ

বসু মহাশয় তৎপ্রণীত "সংযম শিক্ষা" গ্রন্থে, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংযম-বিষয়িণী একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? তাঁহার গৃহে একদিন একটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত রেলে বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া, একদিন দ্বিপ্রহরে, অনাহারে নিতান্ত ক্লান্তদেহে উপস্থিত হন। যে পর্য্যন্ত তিনি স্নানসমাপনান্তে আপন জাতি-সমুচিত সন্ধ্যাবন্দনা, জপ-পূজাদি যথাবিধি সম্পন্ন না করিলেন, পরিজনবর্গ কেহই তাঁহাকে জলগ্রহণ করাইতেও পারিলেন না। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রায় অপরাহ্ণ উপস্থিত হইল। তথাপি ব্রাহ্মণ, অত ক্লান্ত হইলেও, তৎপূর্ব্বে জলগ্রহণ টুকুও করিলেন না। চন্দ্রনাথ বাবু এই ঘটনা দৃষ্টে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাচীন কালের এই প্রকার সংযমের প্রশংসা করিয়া, বর্ত্তমানে ঈদৃশ সংযম ও নিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে দেখিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত যাদবেশ্বরের চরিত্রে এই প্রকারের সংযম যে কতবার আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। তিন দিন তিন রাত্রি না খাইয়া, না স্নান করিয়া, রেল-ভ্রমণ করিয়া, ইনি আমাদেরই এই কলিকাতাস্থ গৃহে কতবার উপস্থিত হইয়াছেন। উপস্থিত হইয়াই লোক দিয়া কলিকাতার অপরপ্রান্তবর্ত্তিনী গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া, সেই জলে স্নান সমাপন করিতেন এবং সেই গঙ্গাজলে তাঁহার খাদ্য দ্রব্যের রন্ধন-ক্রিয়া করিতে হইত, তবে তিনি সেই খাদ্য গ্রহণ করিতেন। এই সকল কার্য্যে প্রায় সমস্ত দিনটাই কাটিয়া যাইত। ইংরাজী শিক্ষিত লোকে, এই প্রকার ব্যবহার নিষ্প্রয়োজনীয় আড়ম্বর বলিয়া উপহাস করিতে পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে যে চিরাভ্যস্ত উচ্ছৃঙ্খলা-রাহিত্য ও ধীর সংযতভাব প্রকটিত হইত, সে শিক্ষার মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমরা বর্ত্তমানে ক্রমেই সকল বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছি; নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহা জাতির পক্ষে কদাপি মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

নারীজাতির প্রতি একটা স্বাভাবিক বিনয় ও সম্ভ্রমের ভাব ইহার আর একটি বিশেষত্ব। কাকিনায় আমাদের বাড়ীতে দেখিয়াছি, যে কয়েক দিন ইনি তথায় কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেন, প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া, অন্য কাহারও মুখাবলোকন করিবার পূর্ব্বেই ইনি অগ্রজজায়াকে ডাকিয়া লইয়া, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মুখ ও চরণ দেখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণধূলি মস্তকে লইতেন। কোন দিনই তাঁহার ব্যত্যয় হইতে দেখা যায় নাই। ইনি যে ভাবে মাতৃদেবীকে প্রণাম করিতেন, আজকাল আর সে প্রকার প্রণাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র দেহটাকে সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিয়া, তিনি তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়েও একবার এই প্রকার প্রণাম এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াও পুনরপি একবার ঐ প্রকার প্রণাম,—ইহা তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল। গুরুতর সম্পর্কীয়া নারীর প্রতি এই প্রকার সম্মান প্রদর্শন,—ইহা ত ছিলই; অপরাপর নারীমাত্রেরই প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ সম্মান চিরদিন প্রদর্শন করিতেন। কোন নারী অনুপবিষ্টা থাকিলে, তাঁহাকে কখনই উপবিষ্ট ভাবে তাঁহার তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে দেখা যায় নাই। নারীজাতি শুধু মাতৃজাতি নহেন; ইহারা ঐশ্বরী শক্তির অংশভূতা। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু (চণ্ডী)।* পণ্ডিতরাজ এই প্রকার বিশ্বাসই পোষণ করিতেন; তাঁহার ব্যবহারও এই বিশ্বাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। আপন সহধর্ম্মিণীকে ইনি কোন দিন একটী কটু কথা বলিয়াছেন, এরূপ কেহ কোনদিন শোনে নাই। চিত্তের ঔদার্য্য, বিনয় ও সৌজন্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। পণ্ডিতসমাজ, তাঁহার এই সকল গুণে নিতান্ত মুগ্ধ ছিলেন এবং সর্ব্বত্র সকলের ইনি বিশেষ সম্মানভাজন হইতে পারিয়াছিলেন।

আমি আর অধিক কিছু বলিব না। বাৎস্য বংশের প্রদীপ্ত সূর্য্য খসিয়া পড়িয়াছে! বঙ্গদেশের প্রাচীন পণ্ডিত সমাজ আজ একটী মহার্ঘ রত্ন হারা হইয়াছে!

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

পদ্মা

(বড় গল্প)

১১

বড় সাধের পত্নী তৃপ্তিকে ও কন্যা অমরলতাকে লইয়া প্রকাশ পাটনাতে সংসার সাজাইয়া ওকালতী করিতেছিল। তাহার বাসগৃহ ইংরাজী কায়দায় প্রস্তুত। সুন্দর একখানি বাঙ্গলো, চতুর্দ্দিক উদ্যান দ্বারা বেষ্টিত। বাড়ীখানির দিকে চাহিলেই গৃহস্বামীর ঐশ্বর্য্য ও সুরুচি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকে না। গ্রীষ্মকাল। এক সুসজ্জিত কক্ষে তৃপ্তি শয়ন করিয়া ছিল। এক বৃদ্ধা রমণী বাহিরে বসিয়া পাখা টানিতেছিল। তৃপ্তির আর পূর্ব্বেকার মত সৌন্দর্য্য নাই। তাহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ। মুখ বিষাদ মাখা। তাহাকে দেখিলেই বোঝা যায় যে, সে শরীর ও মন উভয়ের যন্ত্রণাতে ভুগিতেছে। তাহার হাতে একখানা শিশুপাঠ্য গল্পের বই। সে মাঝে মাঝে পুস্তকখানি খুলিয়া পড়িতেছিল। আবার কখনও অলসভাবে চক্ষু মুদিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে বিরক্তভাবে হস্তস্থিত পুস্তকখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"দূর হোক্ কিছুই ভাল লাগে না। কেন যে সতীনে মেয়ে দেয়!"

তাহার পর পাখাটানা বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা দাই, তোর সতীনের উপর হিংসে হত না?"

হিন্দুস্থানী দাই হিন্দীমিশ্রিত আধ বাঙ্গলাতে কহিল, "হত না আবার, যতদিন মাগী বেঁচে ছিল ভাল করে খেতে পারতাম না।"

তৃপ্তি কহিল, "আচ্ছা দাই, তুই কি করে তাকে তাড়িয়েছিলি বল্ না।"

দাই কহিল, "সে অনেক কথা মা, মিন্সে প্রথমে তাকে বিয়ে করেছিল। সে তত সুন্দর ছিল না। পরে আমাকে বিয়ে করে। আমি বেশ সুন্দরী ছিলাম। এখানে এসে দেখি সে-ই বাড়ীর গিন্নী। শ্বশুর শাশুড়ীর ত গলার হার। সংসারের সবই তার হাতে—কেবল স্বামী তার নয়। শ্বশুর শাশুড়ী আমাকে দেখতে পারত না। তখন আমি রোজ রোজ খুব ঝগড়া করতাম। স্বামীকে সর্ব্বদাই চোখে চোখে রাখতাম। সাধ্য কি যে স্বামী তার সঙ্গে কথাটি বলে! শেষে যখন তাতেও সে গেল না, তখন একদিন আমার মা একটা ওষুধ দিয়েছিল, তা খেলে মানুষ অজ্ঞান হয় কিন্তু মরে না। তাই খেলাম। শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী ভেবে সারা। তারা বদ্যি আনলে, ওষুধ খেয়ে বমি করে যখন ভাল হলাম তখন বল্লাম যে দিদি আমার খাবারের সঙ্গে কি মিশিয়ে দিয়েছিল। তাই শুনে শ্বশুর শাশুড়ী তাকে গাল দিতে লাগল, আর স্বামী খুব মারলে। তারপর দিন তাকে বাড়ীতে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে একটা পুকুরে তার মরা দেহ পাওয়া গেল।"

শুনিয়া তৃপ্তি শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "তাকে বিনা দোষে হত্যা করে তোর মনে একটুও দুঃখ হল না?"

দাই কহিল, "দুঃখ কি বল মা? শত্রুকে যেমন করে পারবে নাশ করবে। সতীনের বাড়া শত্রু ত মেয়েমানুষের আর নেই।"

শুনিয়া তৃপ্তি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। দ্বার ঠেলিয়া দাসী কুন্দ সেই ঘরে প্রবেশ করিল। কুন্দ বাঙ্গালী। ইহাকে প্রকাশ বাঙ্গালা দেশ হইতে আনিয়াছিল।

কুন্দ কহিল, "মা, দিদিমণি উঠেছে, খাবার জন্যে কাঁদছে। তোমার কাছে আনব?"

তৃপ্তি কহিল, "নিয়ে আয়।"

কুন্দ চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে একটী ছয় সাত বছরের বালিকাকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

বালিকার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। মুখশ্রী চমৎকার। এই বালিকা প্রকাশের কন্যা অমরলতা। অমরলতা ঘরে ঢুকিয়াই মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মা আমার বড় ক্ষিদে পেয়েচে।"

মা কহিলেন, "দুধ খাও। দে ত কুন্দ অমরের দুধ এনে।"

অমর বায়না ধরিয়া কহিল, "না মা, দুধ খাব না।"

তৃপ্তি কহিল, "কি খাবি তবে?"

অমর কহিল, "লুচি আর সন্দেশ।"

তৃপ্তি কহিল, "কাল সবে জ্বর ছেড়েচে। আজ কি লুচি খায়। নে দুধ খা।"

অমর জেদ ধরিয়া কহিল, "না আমি কখনও দুধ খাব না।"

তৃপ্তি কহিল, "হ্যাঁ তুই জোর করে খা, তার পর উনি এসে আমার শ্রাদ্ধ করুন। নে দুধ খা। বিস্কুট দেব'খন তারপর।"

কুন্দ একবাটী গরম দুগ্ধ আনিয়া কহিল, "এস গো দিদিমণি, খেয়ে ফেল।"

অমরলতা কিছুতেই দুগ্ধ পান করিতে চাহিল না। সে কাঁদিতে লাগিল। কুন্দ কহিল, "এখন দুধ খাও। তারপর রাত্রিতে বাবুর সঙ্গে লুচি খেও।"

কিন্তু অমর প্রকাশের কন্যা। সে পিতার বিষম জিদ্ পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিল। সে কিছুতেই দুগ্ধ খাইল না। কন্যার জিদের নিকট পরাস্ত হইয়া তৃপ্তি কহিল, "দে কুন্দ দুখানা লুচি আলুভাজা এনে, খাক্।"

লুচি আসিলে অমর কহিল, "মা, সন্দেশ?"

তৃপ্তি উঠিয়া কন্যাকে সন্দেশ আনিয়া দিল। অমরের আহার শেষ হইলে তৃপ্তি কহিল, "দেখিস্ উনি এলে বলিস না যে লুচি খেয়েছিস্।"

কুন্দ কহিল, "হাঁগো দিদিমণি, তুমি জোর করে খেলে। আর বাবু শুনলে বকবেন মাকে।"

অমর রাগিয়া কহিল, "যা তোকে সর্দ্দারী করতে হবেনা।"

কুন্দ চলিয়া গেল। অমর মায়ের নিকট বসিয়া খেলা করিতে লাগিল। তৃপ্তি কহিল, "আমি যদি মরে যাই তাহলে তুই কার কাছে থাকবি?"

অমর কহিল, "কেন, বাবার কাছে।"

শুনিয়া তৃপ্তির বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে আপন মনে কহিল, 'হ্যাঁ, এমনি আদর তখন থাকবে কিনা। তিনি এসে সংসারের গিন্নী হবেন। দুর্দ্দশা হতে মেয়েটারই হবে।"

অমর কহিল, "সে কে মা?"

তৃপ্তি কন্যার সম্মুখে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "সে কেউ নয়। তোর সেই ছবির বইটা কোথায় রে?"

অমর কহিল, "বাবার লাইব্রেরী ঘরে, আনি মা"—

ঠিক এই সময় মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল পাখাটানা দাই কহিল, "বাবু।"

"বাবা" বলিয়া অমর একলম্ফে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তৃপ্তি উঠিল না। দিবসের শেষে কর্ম্মক্লান্ত স্বামী গৃহে ফিরিলে, সাধ্বী প্রেমময়ী পত্নী যে আগ্রহ লইয়া স্বামীর ক্লান্তি অপনোদন করিবার জন্য ছুটিয়া যায়, তৃপ্তিতে সে আনন্দের লেশমাত্র ছিল না। বরং স্বামীর আগমন সংবাদে সে বিরক্ত হইয়া মুখ গম্ভীর করিল। কিছুক্ষণ পরে কুন্দ আসিয়া কহিল "মা, বাবু আপনাকে ডাকচেন।"

তৃপ্তি কহিল, "বলগে যে আমি এখন যেতে পারি না।"

দাসী চলিয়া গেল। কিন্তু পুনরায় আসিয়া কহিল "যাও মা। বাবু বড় রেগেছেন। খুকি বোধ হয় লুচি খাওয়ার কথা বলে দিয়েছে।"

তৃপ্তি বিরক্ত হইয়া উঠিতে উঠিতে কহিল, "মরণ হয়না যে বাঁচি।"

প্রকাশের গৃহ আধুনিক প্রথায় সজ্জিত। কাপড় ছাড়িবার কক্ষে কোটের পোষাক ছাড়িয়া প্রকাশ একটা কোচে বসিয়া ছিল। অমরলতা পিতার বক্ষের উপর পড়িয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। ঘরে ঢুকিয়া তৃপ্তি কহিল, "এত ডাকাডাকি কেন? আমি কি তোমা

কনা বাঁদি যে হুকুম কল্লেই হাজির হব?" প্রকাশ কহিল ামীর ডাকে স্ত্রী এলে সে বাঁদী হয় না তৃপ্তি। সেটা ামীর সৌভাগ্যেরই পরিচয়। যাক, তোমার মতন স্ত্রীর াছে থেকে এর বেশী আশা করাই আমার ভুল। ন্তু জিজ্ঞেস্ করি, আমিই যেন তোমার শত্রু, মরি বাঁচি ্তি নেই—কিন্তু মেয়েটাও কি তাই?"

তৃপ্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "মরণ আর কি! কথার হুরি দেখ না! কেন আমি তোমাদের কি পিণ্ডি টকেছি?"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া প্রকাশ কহিল, "দেখ তৃপ্তি, তোমার াদির কাছে শেখা ইতর ভাষা এখন রেখে দাও। যা জ্ঞেস্ করি সোজা কথায় তার উত্তর দাও। দু'দিন রে কাল সবে অমরের জ্বর ছেড়েছে, আজ তুমি ওকে ুচি সন্দেশ খাওয়ালে কোন আক্কেলে? তুমি মা না াক্ষুসী?"

তৃপ্তি রাগিয়া কহিল, "দেখ, শুধু শুধু গাল দিওনা। তভাগা মেয়ে, কখন তোকে লুচি দিলাম?" বলিয়া সে ন্থার গণ্ডে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল।

অমর চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "বাবা, তুমি ামাকে মিথ্যে কথা বলতে বারণ করেছ তাই সত্যি লেছি। মা মারবে কেন?" রুগ্না কন্যার প্রতি তৃপ্তির ই প্রকার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রকাশ ক্রোধে জ্ঞান ারাইল। সে তীব্র কণ্ঠে কহিল, "ছি-তৃপ্তি, এত নীচ তুমি? ামীর কাছে সন্তানের কাছে মিথ্যে বলতে তোমার কটুও বাধলো না?" তৃপ্তি কাঁদিয়া কহিল, "আমি কি রবো, হতভাগা মেয়ে কিছুতেই দুধ খেলেনা।"

প্রকাশ কহিল, "ও ছেলে মানুষ—ভাল মন্দ জ্ঞান কি র আছে? ও যদি বিষ খেতে চায়, তুমি ওকে বিষ াবে? অশিক্ষিতা হলে এমনই কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হয়। ।, তোমার কাছে আর ওকে রাখা হবে না। তাহলে ওর স্বভাবও তোমার মত নীচ হবে।"

তৃপ্তি কাঁদিয়া কহিল, "ওগো আমি মুখ্যু অসভ্য াঙাল। আমাকে এখন তোমার আর ভাল লাগে না। ামাকে দিদির কাছে রেখে এস। আমি তাঁর সংসারে খেটে খাব। এমন করে দুবেলা ঝাঁটা লাথি খেয়ে বড় মানষী করার চেয়ে সে আমার ভাল। তুমি তোমার সেই বিদ্বেবতী কাগজে নাম বের করা বউকে এনে ঘর কর।"

প্রকাশ কহিল "তাকে আনবার পথ নিজেই বন্ধ করেছি, নইলে কি তোমার ভয়ে আনি না? তা ভেবো না।"

"ওগো তা জানি। তা স্পষ্ট করে বলে তোমার আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে হবে না। কিন্তু একদিন তুমিই আমার জন্যে দিদি আর জামাইবাবুর পায়ে ধরে-ছিলে মনে আছে?"

প্রকাশ কহিল, "আছে বই কি মনে। কুক্ষণে তোমার ঐ সাদা চামড়াতে ভুলেছিলাম। তখন বুঝিনি যে হীরা যখন খনি থেকে বেরয়, মলিন থাকে; আর কাঁচের বাইরে উজ্জল হয়।"

বলিয়া প্রকাশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তৃপ্তি সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেক রাত্রিতে প্রকাশ বাড়ী ফিরিল। তৃপ্তি তখন শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। প্রকাশের রাগ তখন কমিয়া গিয়াছিল। তৃপ্তির প্রতি তাহার রূঢ় আচরণ স্মরণ করিয়া সে লজ্জিত হইল। নীরবে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রকাশ তৃপ্তির পাণ্ডুবর্ণ যন্ত্রণা-কাতর মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর প্রায় ক্রন্দনের স্বরেই বলিয়া উঠিল, "তৃপ্তি, তোমাকে বিয়ে করে মহাপাপ করেচি। নিজেও সুখী হতে পারলুম না, তোমাকেও সুখী করতে পারলুম না।"

তৃপ্তি উত্তর দিল না। প্রকাশ আবার কহিল, "এটা আমার পুর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল। কাউকে মনকষ্ট দিয়ে যে কায করা যায়, তার ফল কখনও ভাল হয় না। তার অশ্রু আমার জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে। শুনেছি আমার দ্বিতীয়বার বিয়ের সংবাদ শুনে তার বাপ যে শয্যা নেন, তা থেকে আর তিনি ওঠেন নি। সত্যি বলতে কি তৃপ্তি, আমার সর্ব্বদাই মনে হয় যেন মর্ম্মাহত পিতার অশান্ত আত্মা আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই ঘুরচে। ওঃ

ভগবান! কত দিনে এ যন্ত্রণার শেষ হবে?" বলিয়া প্রকাশ তৃপ্তির হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

তৃপ্তি তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "তোমার ইচ্ছেটা কি যে আমি এখনই মরি? নইলে রাত্রিতে ভূত প্রেতের কথা কেন? রাম রাম!"

প্রকাশ আর কিছু না বলিয়া বিছানাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

১২

গৌরীর মৃত্যুর পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেদিন বেলা হইল অথচ পদ্মা উঠিল না দেখিয়া অম্বা পদ্মার রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "ঠাকুরঝি, এত বেলা হল এখনও ঘুমুচ্চ নাকি?"

ভিতর হইতে পদ্মা উত্তর দিল, "না বৌদি ঘুমুই নি। তবে বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে তাই উঠতে পাচ্চি না।"

অম্বা কহিল, "বড় বিপদে ফেল্লে! আমি একলা হাতে কায করে' কি করে আপিসের ভাত দেব? মার একাদশী। তিনি গেছেন গঙ্গা স্নান করতে।"

পদ্মা যন্ত্রণাহত কণ্ঠে মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিল, "কি করি বৌদি, আমি ত মাথা তুলতে পাচ্চি না।"

অম্বা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "মাথার আর অপরাধ কি? রাত জেগে লেখাপড়া করবে। আবার দুটো মেয়ে পড়াবে। আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাদের কথা ত গ্রাহ্যি হয় না। ভাল এক আপদ হয়েছে যা হোক।" বলিয়া অম্বা বিরক্তিভরে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

এত কষ্টের মধ্যেও পদ্মা ভারতীর আরাধনা ত্যাগ করে নাই। সংসারের দুঃখের ভারে মন যখন অতিমাত্রায় তিক্ত হইয়া উঠিত, তখন সাহিত্য চর্চ্চাই ছিল তাহার জুড়াইবার উপায়। কিন্তু গৌরীর মৃত্যুর পর সংসারের কার্য্যের ভার তাহার উপর পড়ায়, দিনে সে এমন অবসর পাইত না যে সাহিত্য-চর্চ্চা করে। তাই রাত্রিতে নিখিল-বিশ্ব যখন সুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত, বাঙ্গলা সাহিত্যের সুপরিচিতা সু-লেখিকা পদ্মা দেবী তখন ভারতীর সেবায় রত হইতেন। মাসিক পত্রে গল্প ও প্রবন্ধ লেখা তাহাকে যেন নেশার মতন পাইয়া বসিয়াছিল। বাঙ্গলার দুইখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র "বিশ্ববাণী" ও "লেখাতে" তাহার রচনা বাহির হইত। "বিশ্ব-বাণী"তে তাহার ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত উপন্যাস "অশ্রু" বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিল। অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকগণ পদ্মা দেবীর রচনা পাইলে অতিশয় আগ্রহ পূর্ব্বক ছাপিতেন। বাঙ্গলা ভাষায় এমন পাঠক নাই যে পদ্মা দেবীর রচনার ভক্ত নহে। যে পত্রে পদ্মার লেখা বাহির হইত তাহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। অতিবড় ছিদ্রান্বেষী সমালোচকগণও স্বীকার করিতেন যে, পদ্মা দেবীর রচনাতে যে করুণ মর্ম্মস্পর্শী ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে একেবারে নূতন। পাঠকগণ পদ্মা দেবীর রচনার জন্য আগ্রহ পূর্ব্বক মাসের পয়লার প্রতীক্ষা করিত। কিন্তু হায়, তাহাদের কেহই জানিত না, এই শক্তিশালিনী লেখিকা যে কিরূপ অশ্রুরাশির মধ্যে আপনার জীবন কাটাইতেছিল। কেবল "বিশ্ব-বাণী"র প্রধান সম্পাদক মুকুন্দলালের বাল্যবন্ধু অনাদিবাবু পদ্মার অদৃষ্টের সকল কথাই জানিতেন। তাঁহারই চেষ্টাতে পদ্মার প্রথম গল্প "ব্যথা" প্রকাশিত হইয়াছিল।

মোহিত পিতা বর্ত্তমানে পদ্মাকে তেমন সুনজরে দেখিত না। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভগিনীর প্রতি তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। পদ্মার মুখের দিকে চাহিলেই তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। পদ্মার অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসের জন্য সে আপনাকেই দায়ী মনে করিত। কারণ পিতাকে এরূপ কার্য্যে সেই এক প্রকার জোর করিয়াই সম্মত করিয়াছিল। সে সাধ্যমত পদ্মার প্রতি সদয় ব্যবহার করিত। কিন্তু অম্বা ও রণকালীর ব্যবহারে পদ্মা জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের কায করিয়াও পদ্মা শান্তিতে থাকিতে পাইত না। রণকালী সর্ব্বদাই তাহার কার্য্যে খুঁত ধরিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেন। অম্বাও তাহাকে সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিত। কিন্তু পদ্মা তাহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা গুণে নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। যখন বড় অসহ্য হইত তখন শয়ন

র দ্বার রুদ্ধ করিয়া পিতার ছবি খানি সম্মুখে রাখিয়া বর্ষণ করিত ও সহ্য করিবার ক্ষমতা চাহিত। াহিত, পত্নী ও খাশুড়ী যে পদ্মার প্রতি কিরূপ ব্যবহার রে, তাহা জানিত। কিন্তু অম্বাকে সে কিছুতেই আঁটিয়া ঠতে পারিত না। তাঁহার উপর রণকালী হইয়াছিলেন গাদের উপর বিষফোড়া।" "মরণটাও হয় না যে বাঁচি। মুখপোড়া যেন আমাকে ভুলে আছে। সংসারে বার কুটুম সবাই করবার বেলা কেউ নেই।" লের হাঁড়ীতে কাঠি দিতে দিতে ধোঁয়াতে চোখ মুখ ন করিয়া অম্বা উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। এমন য়ে সদ্যস্নাতা পদ্মা একরাশ চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া াসিয়া কহিল, "ওঠ বৌদি, আমি কচ্চি।"

অম্বা মুখ ভার করিয়া কহিল, "না থাক। তোমার থা ব্যথা করচে, রাঁধতে হবে না। আমরা গরীবের মেয়ে মাদের সব সওয়া আছে। মরি বাঁচি কায আমাদের র্ত্তেই হবে। যাও তুমি শুয়ে থাকগে। তোমার দাদা দি জানতে পারেন যে তোমার মাথা ব্যথার উপর তোমাকে য়ে রাঁধিয়েছি তাহলে আমার শ্রাদ্ধ করবেন।"

পদ্মা দেখিল গতিক ভাল নহে। অম্বার এইরূপ বাক্য- াণ সমস্ত দিনই তাহার উপর বর্ষিত হইবে। সে এক কবার জোর করিয়াই অম্বাকে উঠাইয়া দিয়া রাঁধিতে সিল। অম্বা উনানের আঁচ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মনে নে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তবুও মুখে বাক্যবাণ ায়া পদ্মাকে বিঁধিতে ছাড়িল না।

মোহিত খাইতে বসিয়া কহিল, "পদ্মা, আমি একটা কথা াবচি।"

পদ্মা কহিল, "কি কথা?"

মোহিত কহিল, "প্রকাশ এখন অনেক টাকা উপার্জ্জন রে। আমি ভাবচি তোর খোর-পোষের দাবী করে তার াছে উকীলের চিঠি দেব। বিবাহিতা স্ত্রী, এমন করে াকি দেবে তা হবে না, কি বলিস?"

পদ্মা কহিল, "না দাদা আমি ওদের টাকা চই না, তোমাকে ওসব কিছু করতে হবে না।"

মোহিত কহিল, "চাই না কেন রে? এ কি তার কাছে ভিক্ষা করা? নিজের পাওনা নিবি তাতে দ্বিধা কি?"

পদ্ম কহিল, "না না, আমি কিছুতেই ওদের কাছে কিছু চাইব না। যারা এত বড় দুঃখ আমার মাথায় তুলে দিলে, তাদের কাছে চাইব ভিক্ষে? তার চেয়ে না খেয়ে মরা ভাল। তুমি যদি আমায় খেতে দিতে না পার দাদা, বল, আমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করব।" বলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মোহিত দুঃখিত হইয়া কহিল, "ছিঃ আমি কি তাই বলছি রে? তোকে এক মুঠো খেতে দিতে পারব না? ও কথা ত বলি নি পদ্মা। আমি কি ভাবছি জানিস, যে যদি আমি এখন মারা যাই তখন কি হবে? আর বাড়ীও বোধ হয় আমাদের থাকবে না।"

পদ্মা কহিল, "কেন?"

মোহিত কহিল, "জানিস ত বাবা বাড়ী বাঁধা রেখে টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু এক পয়সাও শোধ দিয়ে যাননি। এখন আমার এমন সাধ্য নেই যে সে ঋণ শোধ দিয়ে বাড়ী রাখি। যা আনি পেটে খেতেই কুলোয় না।"

পদ্মা কহিল, "তাহলে পৈতৃক ভিটে ত্যাগ করবে?"

মোহিত কহিল, "কি করব? তা ছাড়া ত উপায় নেই।"

পদ্মা জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা দেনা আছে।"

মোহিত কহিল, "প্রায় আড়াই হাজার টাকা।"

পদ্মা কহিল, "এ সামান্য টাকার জন্যে বাবার বাড়ী যাবে; না, তা কখনও হবে না।"

মোহিত কহিল, "আচ্ছা দেখা যাবে কি হয়। আমার কি ইচ্ছা যে পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করি?"

পদ্মা কহিল, "আচ্ছা দাদা এক কায করলে হয় না?"

মোহিত কহিল, "কি কায।"

পদ্মা কহিল, "এই আমাদের ত গহনা আছে, তা বিক্রি করে ঋণ শোধ করনা কেন?"

মোহিত হতাশভাবে কহিল, "তাও চেষ্টা করে দেখেছি

পদ্মা। কিন্তু তা হবার নয়, তোর বৌদি কিছুতেই নিজের গয়না দেবে না। বলেচে আমি জেলে যাই তাও ভাল।"

পদ্মা কহিল, "বৌদির গহনা কেন চেয়েছিলে? আমারও ত প্রায় তিন হাজার টাকার গহনা রয়েছে। তাই দিয়ে বাড়ী রাখ।"

মোহিত পদ্মার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে কহিল, "না, তোর গহনা আমি কিছুতেই নিতে পারব না। তোর ঐ গহনা ছাড়া আর কিছুই নেই, তোর গহনা নিয়ে যদি আমি ঋণমুক্ত হই তাহলে আমার মতন পাষণ্ড আর নেই।"

পদ্মা কিন্তু বুঝিল না। সে কহিল, "কেন নেবে না? বাবার ঋণ শোধ করা কি আমারও একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়? আমি মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতুম তাহলে কি তুমি এমন কথা বলতে পারতে? আর বাবা ত আমার বিয়ের জন্যেই ঋণ করেছিলেন। তোমাকে আমার গহনা নিতেই হবে। তা ছাড়া ওসব গহনা আমি ত ব্যবহারও করি না। সুধু বাক্সবন্দী হয়ে আছে।"

মোহিত আবার কহিল, "কিন্তু তোর ত আর কিছুই নেই পদ্মা।"

স্নিগ্ধ হাস্যে পদ্মা কহিল, "নাই বা থাকল, গহনাতে আমার কি দরকার? তুমি বেঁচে থাকতে আমার একমুঠো ভাতের অভাব হবে না দাদা।"

মোহিত কহিল, "কিন্তু আমি যদি মারা যাই?"

পদ্মা সজল নেত্রে কহিল, "ওকথা বোলনা। আমি তাহলে কি নিয়ে থাকব? আর তাই যদি হয় তখন নিজের অন্নের সংস্থান করতে পারব; তুমি বৌদির গহনা নিও না। তাকে পাঁচ জায়গাতে যেতে হয়। আমার চেয়ে তার গহনার দরকার ঢের বেশী।"

আরও কিছুক্ষণ তর্কের পর মোহিত পদ্মার প্রস্তাবে সম্মত হইল। অমা অন্তরালে দাঁড়াইয়া ভ্রাতা ভগিনীর সকল কথাই শুনিল, মোহিত পদ্মার গহনা নিতে সম্মত হইলে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আঃ বাচলাম। আমার গয়নাগুলো বেচে গেল।"

মধ্যাহ্ন আহারের পর পদ্মা তাহার ঘরে মেজের উপর একটা মাদুর পাতিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় মোহিতের কন্যা কমলা তাহার হাতে দুইখানা খাম দিয়া কহিল, "পিসীমা তোমার চিঠি।"

পদ্মা পত্র দুইখানা হাতে লইয়া কহিল, "কমল, একবার সুধীদের বাড়ীতে যাও। সুধীকে বিকেলে আমার কাছে আসতে বোলো।"

"আচ্ছা।" বলিয়া কমল চলিয়া গেল। পত্র দুইখানার মধ্যে একখানা যে নীতার তাহা লেখা দেখিয়াই পদ্মা বুঝিল। আর একখানা অপরিচিত হস্তাক্ষর। পদ্মা ভাবিল কোনও পত্রিকার অফিস হইতে আসিয়াছে। সে পত্রখানা খুলিয়া পড়িল—

কল্যাণী—

পত্নীরূপে তোমাকে সম্বোধন করিবার অধিকার আমার নাই। সে অধিকার আমি নিজেই নষ্ট করিয়াছি। প্রথম যৌবনে মোহের রঙ্গিন চশমা পরিয়া তোমার মত অমূল্য মণিকে পায়ে ঠেলিয়াছি। তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমার পূর্ণ মাত্রায় হইয়াছে। যাক নিজের কথা বলিয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে বসি নাই। পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্তও করিতেছি। যদি তোমার অর্থকষ্ট হইয়া থাকে আমাকে জানাইও। এটা যে তোমার প্রতি আমি অনুগ্রহ দেখাইতেছি তাহা ভাবিও না। এটা তোমার ন্যায্য দাবীরই একটু অংশ। আর পার ত মনের নিকটও আমার সম্পর্কটা স্বীকার করিও। ঈশ্বর তোমাকে শান্তি দিন।

ইতি -

প্রকাশ।

পত্র পড়িয়া পদ্মার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বিবাহের আট বৎসর পরে প্রকাশ তাহাকে পত্নীর অধিকার দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কে তাহা চাহিয়াছে? কি দরকার ছিল? সে তাহার কে? প্রকাশের চেয়ে ত পর তাহার কেহই নাই। বোধ হয় সে দ্বিতীয়া পত্নী লইয়া সুখী হয় নাই। কিন্তু তাহাতে পদ্মার কি আসিয়া যায়? ছিঃ

প্রকাশ কি পদ্মাকে এতই নীচ ভাবিয়াছে যে সে খাইতে না পাইয়া তাহার নিকট উদরান্নের জন্য হাত পাতিবে? কিন্তু এ কি? তাহার বক্ষে এরূপ বেদনা হইতেছে কেন? প্রকাশ ত তাহার কেহ নয়। তবে তাহার পত্র পড়িয়া পদ্মার বক্ষ কাঁপে কেন? পদ্মা উঠিয়া বাক্সে পত্রখানা বন্ধ করিল। তার পর ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া কাঁদিয়া কহিল—"বাবা—বাবা—তোমার পদ্মাকে এ আঘাত সহ্য করবার শক্তি দাও।"

১৩

যে কার্য্যের প্রথমে কাহারও অশ্রু ঝরিয়া পড়ে তাহার ফল কখনও সুখের হয় না। প্রকাশের জীবনে এইটি অতি সত্যরূপে ফলিয়া গিয়াছিল। বাল্যকাল হইতে সে অতিশয় খেয়ালী ও রাগী। রাগিলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাইত। সে চিরকালই উচ্চাভিলাষী। পত্নীর আদর্শ তাহার খুব উচ্চ রকমেরই ছিল। বন্ধুরা কহিত তাহার যেরূপ উচ্চ আদর্শ, সেরূপ আদর্শের পত্নী পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার; সুতরাং তাহার আইবুড়ো নাম ঘুচিবে না। সুন্দরী শিক্ষিতা না হইলে সে বিবাহ করিবে না, ইহাই ছিল তাহার পণ। তাই যখন ভূপতি তাহার সুন্দরী বালিকা তৃপ্তিকে তাহার হস্তে দিতে চাহিল তখন সে পিতার মত নাই বলিয়া সম্মত হয় নাই। সে জানিত তৃপ্তি অশিক্ষিতা, বৈমাত্রেয় ভগিনীর গৃহে পালিতা। এরূপ ভাবে পালিতা কন্যার মনোভাব কখনও উচ্চ হয় না তাহা প্রকাশ জানিত। পদ্মার গুণের কথা শুনিয়া ও সে সুন্দরী শুনিয়া প্রকাশের তাহাকে বিবাহ করিতে আপত্তি হয় নাই। পদ্মার ফটো দেখিয়া তাহাকে তাহার বেশ পছন্দই হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের পর পদ্মার বর্ণের জাল ধরা পড়িলে প্রকাশ ক্রোধে জ্ঞান হারাইল। পদ্মাকে জব্দ করিবার জন্য তৃপ্তিকে বিবাহ করিল। ক্রোধের বশে তাহার পরিণাম বুঝে নাই। সে তাহার ভ্রম বুঝিল যখন তৃপ্তিকে আপনাদের বাড়ীতে আনিল। আরও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ আপনার কার্য্যের ভ্রম বুঝিল যখন তৃপ্তিকে লইয়া পাটনাতে যাইয়া সংসার পাতিল। এই সময় হইতে তাহার সংসারের সুখ একেবারে অন্তর্হিত হইল। আলাদা সংসার পাতিয়া প্রকাশ বুঝিল, রূপ কেবল চোখের তৃপ্তির জন্য। তাহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশজাত উচ্চশিক্ষিত পুরুষের পত্নীর যোগ্যতা তৃপ্তিতে নাই। তৃপ্তি সংসারের ভার লইবার অযোগ্য। তাহার মন অতি সঙ্কীর্ণ। সে প্রতি পদে প্রকাশকে সন্দেহ করিত। বাড়ী আসিতে একটু বিলম্ব হইলে প্রকাশের আর রক্ষা থাকিত না। আর এক কারণে তৃপ্তির উপর প্রকাশ বিরক্ত হইল। তৃপ্তির বিশ্বাস, প্রকাশ পদ্মাকে মনে মনে ভালবাসিত ও তাহাকে পত্রাদি লিখিত। প্রকাশ কিছুতেই তাহার এ বিশ্বাস দূর করিতে পারে নাই। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঘোরতর কলহ হইত। প্রকাশ এই অশিক্ষিতা স্ত্রীর সংসর্গে তাহার জীবনের উচ্চ আদর্শ নষ্ট হইল ভাবিয়া সর্ব্বদাই অনুতাপ করিত। এই সময়, মাতার খোঁজে যাইতে নিমেষের জন্য দেখা কর্ম্মনিরতা পদ্মার মুখ প্রায়ই তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিত। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহা চিত্তপট হইতে মুছিতে পারে নাই।

কলিকাতাতে সে বার কংগ্রেস হইলে প্রকাশ কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় গেল। কংগ্রেস শেষ হইলে সে একদিন কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইল। আহারান্তে বিশ্রামগৃহে বসিয়া বন্ধুর সহিত নানা কথার আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় পিওন ডাক দিয়া গেল। বন্ধু সর্ব্বপ্রথমে একখানি মাসিক পত্রিকা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কি যেন খুঁজিয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলেন। প্রকাশ কহিল, "কি হে, কি পড়া হচ্ছে অমন মনযোগ দিয়ে?"

বন্ধু কহিলেন, "বিশ্ববাণী।"

প্রকাশ কহিল "বিশ্ববাণী! নাম শুনেছি বটে এখনকার বড় মাসিকের মধ্যে বিশ্ববাণী একখানি। তা, কি পড়া হচ্ছে অত তন্ময় হয়ে?"

বন্ধু পড়িতে পড়িতে উত্তর দিলেন, "অশ্রু'। এতে পদ্মা দেবীর "অশ্রু" বলে যে উপন্যাস বেরুচ্ছে তা বড়ই চমৎকার। তাই পড়ছি।"

প্রকাশ কহিল "তবে ত পড়তে হচ্ছে।" তাহার পর বন্ধুর নিকট হইতে পত্রিকা লইয়া প্রকাশ "অশ্রু" উপন্যাসের যে কয়েক পরিচ্ছেদ বাহির হইয়াছিল তা পড়িয়া ফেলিল। পড়িয়া ত সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সজীব করুণ ভাব কোনও পুস্তকে প্রকাশ পড়ে নাই। সে ভাবিল, কি আশ্চর্য্য, একজন মহিলার লেখনী হইতে এমন লেখা বাহির হইতে পারে! রচনা পড়িয়া রচয়িত্রীর পরিচয় জানিবার জন্য তাহার চিত্ত অতি আকুল হইয়া পড়িল। প্রকাশ কহিল, "হ্যাঁ হে, এই পদ্মা দেবী কে?"

বন্ধু কহিলেন, "কি করে জানবে বল? বাঙ্গালা সাহিত্যের ত কোন সংবাদই রাখ না, সাহেব মানুষ! উনি এখনকার একজন উদীয়মানা লেখিকা, প্রায় সব ভাল ভাল মাসিক পত্রে ওঁর লেখা বার হয়। আমার বোধ হয় উনিই কালে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখিকা হবেন।"

প্রকাশ কহিল, "ওঁর পরিচয়টা কি?"

বন্ধু কহিলেন, "কেন হে, পরিচয় জেনে কি করবে?"

প্রকাশ কহিল, "কিছু নয়। তবে অমন একজন প্রতিভাশালিনী লেখিকার পরিচয় জানতে কি কৌতূহল হয় না?"

বন্ধু একটু চিন্তা করিয়া বিষণ্ণভাবে কহিলেন, "শুনেছি ওঁর সাংসারিক জীবন সুখের নয়। স্বামী অন্য পত্নী নিয়ে ঘর করেন, উনি বাপের বাড়ীতে থেকে সাহিত্য সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।"

চকিতের মধ্যে প্রকাশের মনে কি একটা চিন্তা কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের আলোর মতন ক্ষণেকের জন্য চমকাইয়া গেল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "ওঁর বাড়ী কোথা? বাপের নাম কি?"

বন্ধু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "উনি কলুটোলার মুকুন্দলাল বাবুর মেয়ে। আমার ছোট বোন লতার সঙ্গে আগে বেথুনে পড়তেন কি না, তাই জানি। শুনেছি ওঁর স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহের সংবাদে মুকুন্দবাবু মারা যান। এখন উনি ভাইয়ের কাছে থাকেন। সত্যি বলতে কি প্রকাশ, ওঁর স্বামীটী একটী পশু, নইলে অমন রত্নের আদর করলে না! আমার সঙ্গে যদি তার কখনও দেখা হয়, তাহলে আমি তাকে আচ্ছা করে চাবকে দেবো ঠিক করেছি। কিন্তু ও কি? তোমার কি হল?"

বন্ধুর কথায় প্রকাশ মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইল। তার পর কহিল, "কিছু নয়, রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নি। তাই বড় মাথা ঘুরচে।"

"মাথা ঘুরচে? সর্ব্বনাশ! শুয়ে পড় প্রকাশ। এতক্ষণ বলনি কেন? আমি ত খাওয়ার পর থেকে গল্পই করে যাচ্চি।" বলিয়া বন্ধু এক প্রকার জোর করিয়াই প্রকাশকে শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন।

সে রাত্রে প্রকাশ ঘুমাইতে পারিল না। পদ্মার মুখ তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। পদ্মাকে সে একবার মাত্র দেখিয়াছিল। সেই একবার দেখিয়াই পদ্মার মুখ তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। পদ্মার প্রতি আপনার নিষ্ঠুর আচরণ স্মরণ করিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সুলেখিকা, সহস্র সহস্র পাঠকের শ্রদ্ধার পাত্রী তাহার স্ত্রী! তাহার বড় আপনার, কিন্তু তাহাকে আপনার বলিবার অধিকার তাহার আজ নাই! সে অধিকার সে নিজেই নষ্ট করিয়াছে। বন্ধু ঠিক বলিয়াছেন, তাহার চাবুক খাওয়াই উচিত।

মৃত পিতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রকাশ কহিল, "বাবা তোমার হতভাগ্য পুত্রকে ক্ষমা কর। তুমি সংসারের শ্রেষ্ঠরত্ন আমায় দিয়েছিলে, কিন্তু অন্ধ আমি, তার মূল্য বুঝতে পারি নি!" পদ্মা ও তৃপ্তির মুখ কল্পনায় পাশাপাশি রাখিয়া প্রকাশ দেখিল, দুই মুখে কত প্রভেদ। তৃপ্তি সামান্যা নারী মাত্র। আর পদ্মার সেই শ্যামবর্ণ মুখে কি উজ্জ্বল প্রতিভার কিরণ মাখা, তাহার বিশাল চক্ষু হইতে প্রতিভা যেন বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছিল।

প্রকাশ পাটনাতে ফিরিয়া গেল। এই ঘটনার পর তৃপ্তির সঙ্গ তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। পদ্মার চিন্তা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তাহাকে দিবানিশি দগ্ধ করিতে

গিল। যে যে পত্রে পদ্মার লেখা বাহির হইত, সে হার গ্রাহক হইল। তৃপ্তকে কিছু না বলিলেও সে র দিনেই আসল কথা জানিয়া ফেলিল। নারী যতই ি ও নির্ব্বোধ হউক না কেন, সন্ত্রী বিষয়ে তাহার মাত্রাতে থাকিবেই। সে একদিন প্রকাশকে রাগাইয়া বাহির করিয়া লইল যে, লেখিকা পদ্মা ও তাহার চীন পদ্মা একই লোক। ইহার পর হইতে প্রকাশের র যে আরও কড়া পাহারা বসাইল। তার সতর্ক ইতে পড়িয়া প্রকাশের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম রিল। এই সময় একদিন পকাশ পদ্মাকে একখানি র লিখিল, কিন্তু পদ্মার নিকট হইতে তাহার কোনও ত্তর আসিল না। সে ইহাতে বিস্মিত হইল না, কারণ উত্ত-র প্রত্যাশা সে করে নাই।

১৪

নীতা বহুকাল পিত্রালয়ে আসে নাই, হঠাৎ সেদিন ত্র কন্যা লইয়া আসিয়া হাজির। মোহিত তখন স্নান রিয়া আহারে যাইতেছিল। হঠাৎ নীতাকে বাড়ীতে বেশ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া কহিল, "নীতু যে, তকাল পরে বুঝি গরীব দাদাকে মনে পড়ল?"

নীতা কহিল, "যে চাকরী, ঘুরতে ঘুরতে প্রাণ যাবার াগাড়। নূতন জায়গায় গিয়ে গোছাতে না গোছাতে াবার বদলী—তা আসব কি?"

মোহিত কহিল, "ভাল আছিস ত? ঞ্রব কোথায়? ন হাস্কেল কেমন আছে?"

নীতা কহিল, "তিনি ভাল আছেন। দেশে রয়েচেন। ামি আমার ছোট দেওরের সঙ্গে এলুম। পাটনাতে দলী হয়েছেন কিনা, এই গ্রীষ্মের ছুটীটা দেশে কাটিয়ে টার পর পাটনাতে যাব।"

মোহিত কহিল, "পাটনাতে বদলী হয়েছে, তা সে াট সাহেব এল না কেন রে?"

নীতা একটু লজ্জিত ভাবে কহিল, "আসবেন দু'চার ন পরে। অনেক দিন পরে বাড়ী ফিরেছেন, মা কিছুতেই খন ছাড়লেন না।"

মোহিত কহিল, "তা তুই এখন কিছুদিন থাকবি ত? না ঘোড়া দাঁড় করিয়ে এসেছিস?"

নীতা হাসিয়া কহিল, "না, থাকব বলেই এসেছি। তবে বৌ যদি তাড়িয়ে দেয় ত আলাদা কথা।"

অম্বা সেখানে ছিল। ননদের রহস্য উত্তর দিল, "আমি তোমাদের তাড়াবার কে ভাই? আমার বাপ ভাইয়ের ত বাড়ী নয় তোমার বাপ ভাইয়ের বাড়ী, আমার সাধ্য কি যে তোমাদের কিছু বলি?" বলিয়া সে নীতার আনীত সন্দেশগুলা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। এমন সময় পদ্মা আসিয়া কহিল, "দাদা খাবে এস। এই যে, ছোড়দি কখন এলে?" বলিয়া সে নীতাকে প্রণাম করিল। নীতা তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। এই কি সেই পূর্ব্বেকার লাবণ্যময়ী পদ্মা? কোথায় তাহার বিশাল চক্ষুর সে মোহন শোভা; কোথায় তাহার সুন্দর দেহের গঠন? তাহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ। চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে। নীতা কহিল, "একি পদ্মা, তোর এমন মড়ার আকার হয়েছে কেন?"

অম্বা কহিল, "শরীরের আর অপরাধ কি ভাই? লিখে লিখে শরীর পাত করলে। রাত্রিতে ঘুমবে না, খালি লিখবে। এত বারণ করি কিছুতেই শুনবে না।"

নীতা কহিল, "বিশ্ববাণীতে পদ্মার যে উপন্যাস বেরুচ্ছে, সকলে তার খুব প্রশংসা করে। উনিও বলেন পদ্মা কালে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লেখিকার স্থান নেবে।"

অম্বা মুখ ভার করিয়া কহিল, "কি জানি ভাই, অত শত বুঝি না। মুখ্যু মানুষ, লেখার কদর কি জানব বল? তবে এইটুকু বুঝি যে শরীর আগে।"

নীতার আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা ছিল না, তাই কথা চাপা দিবার জন্ত সে কহিল, "দাদা খেতে গেলে না? দে না পদ্মা, এই দালানেই একখানা আসন পেতে।"

মোহিত আহারে বসিলে নীতা কহিল, "কে রাঁধলে, বৌদি বুঝি?"

অম্বা কহিল, "না ভাই, আমার যা শরীর, আগুনের তাত সহ্য হয় না, পদ্মাই রেঁধেছে।"

নীতা বিস্মিত হইয়া কহিল, "পদ্মা আবার রাঁধতে শিখলি কবে রে।"

মোহিত কহিল, "ঘাড়ে পড়লেই সব শিখতে হয়। ভাগ্যিস পদ্মা রাঁধতে শিখেছিল। নইলে হোটেল থেকে কিনে খেতে হত।"

অম্বা রাগিয়া কহিল, "হোটেল থেকে খেতে হত কেন? আমি কি মরেছি নাকি?"

মোহিত শ্লেষ করিয়া কহিল, "না, মরনি তা জানি, কিন্তু তোমার শরীরে ত আগুনের তাত সহ্য হত না।"

অম্বা আর কিছু বলিল না, রাগ করিয়া সেস্থান হইতে উঠিয়া গেল। নীতার দিকে চাহিয়া মোহিত কহিল, "একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব তার মিতে। তাকে ত এখনও দেখিস নীতু।"

নীতা কহিল, "সে আবার কে দাদা?"

মোহিত কহিল, "শীগগিরই জানতে পারবি। তুই এসেছিস, পদ্মাকে দেখিস। পিসীমা যাওয়ার পর ওর বড় কষ্ট হয়েছে।" বলিয়া সে উঠিল।

মোহিত আফিসে চলিয়া গেলে পদ্মা বিকালের জলখাবার প্রস্তুত করিতে লাগিল। আর নীতা রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া ভগিনীর সহিত গল্প করিতে লাগিল। এমন সময় গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক একখানি নামাবলী গায়ে, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপ কাটিয়া রণকালী বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। নীতাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তুমি কে গা বাছা? তোমার চামড়াটা ত খুব কটা!"

সত্যই নীতার বর্ণ তুষারশুভ্র। কিন্তু রণকালীর প্রশ্নের ভঙ্গিতে সে বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুমিই বা কে বাছা? তোমাকে ত এ বাড়ীতে পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। তোমার গায়ে ত খুব পুণ্যের ছাপ দেখছি।"

রণকালী রাগিয়া আগুন হইয়া কহিলেন, "কি! আমার সঙ্গে মস্কারা? এত বড় আস্পদ্দা?"

পদ্মা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "ছোড়দি, উনি বৌদির মাসীমা। মাসীমা, এ আমার ছোড়দি।"

রণকালী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "এবেই হয়েছে। এবার মোহিত ডুবলো। তা তোমাকেও বুঝি সোয়ামী ত্যাগ করেছে?"

নীতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "কে তুমি? তোমার মুখ ত বড় খারাপ। সোয়ামী ত্যাগ না করলে বুঝি বাপের ঘরে আসতে নেই? আর দাদাই বা ডুববে কিসে শুনি? তোমার খরচ যদি বারমাস যোগাতে পারে, তাহলে দুদিন বোনকে বুঝি খেতে দিতে পারবে না? আমি আমার বাবার বাড়ীতে এসেছি, তুমি কথা কইবার কে?"

রণকালী দেখিলেন এ পদ্মা নহে যে, মুখ বন্ধ করিয়া বাক্যবিষ পরিপাক করিবে। তিনি একটু দমিয়া গেলেন। ঠিক এই সময় অম্বা আসিয়া কাতর ভাবে নীতার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি রাগ কোরনা ঠাকুরঝি; মা বুড়োমানুষ,কি বলতে কি বলেছেন।" তারপর রণকালীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "মা, একে তুমি দেখনি তাই চিনতে পারনি। এ আমার সেজ ননদ, পদ্মার দিদি।"

মাসীমা কলহে পরাজিত হইয়া বড়ই দমিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে, ইহার উপর জোর খাটিবে না। ইহাকে ইট মারিলে পাটকেল খাইতে হইবে, সুতরাং ইহার সহিত সন্ধি করাই বুদ্ধির পরিচয়। তিনি কহিলেন, "তা, আমি বুড়ো মানুষ, কি বলতে কি বলেছি, কিছু মনে করিস না মা।" বলিয়া তিনি সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

নীতা কহিল, "এ গোদের উপর বিষ ফোড়াটি বুঝি বাবা মারা যাবার পর এসেছে? উঃ, কি মুখের ঝাল। কি করে সহ্য করিস্ পদ্মা?" উত্তরে পদ্মা একটু ম্লান হাসি হাসিল।

মোহিত ও নীতার ছেলে মেয়েরা আহার করিলে পদ্মা কহিল, "ছোড়দি তুমি আর বৌদি খেয়ে নাও।"

নীতা কহিল, "আর তুই কখন খাবি?"

পদ্মা কহিল, "আমার একটু দেরী আছে। মাসীমার

াজ একাদশী, তার খাবার তৈরী করতে হবে, করে বে খাব।"

নীতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "একাদশীতে খাবার ক রে? তুই যে অবাক করলি।"

পদ্মা ভীত হইয়া কহিল "চুপ কর ছোড়দি, শুনলে খুনি কুরুক্ষেত্র হবে।"

নীতা কহিল, "তোর সবতাতে ভয়, তাই অমন রে পেয়ে বসেছে। যাক, কি খাবার হবে শুনি?"

পদ্মা চুপি চুপি কহিল, "এই লুচি, আলু পটলের একটা ডালনা, আর পটল ভাজা।"

নীতা কহিল,"বাঃ—চমৎকার একাদশী, এমন একাদশী দেশে চলে অনেকেই মাসে দুদিন লুচির লোভে বিধবা তে চাইবে। তা যাক, দাদার কপাল ভাল। কিন্তু তামাকে এই এত রান্না করে আবার ঐ সব করতে বে কেন তা বুঝলাম না। বৌ এ সব করতে পারে া?"

পদ্মা সভয়ে কহিল, "বৌদির শরীর খারাপ।"

বাধা দিয়া নীতা কহিল, "আর তোমার শরীরটা াড় ভাল, না? বৌদির ত শরীর খারাপের কোনও লক্ষণ দেখলুম না। ফুলচেন ত যেন রবারের বলের মতন। যাক, তুমি আজ কিছুতেই ওসব করতে পাবে না। বৌদি করুক।" বলিয়া নীতা ডাকিল—"বৌদি!"

অম্বা আসিলে নীতা কহিল, "দেখ বৌদি, আমি পদ্মা সব এক সঙ্গে খাব। তুমি তোমার মাসীর খাবার টাবার যা করবার করে দিও।" অম্বা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রিতে দুই ভগিনীতে শয়ন করিয়া অনেক সুখ দুঃখের কথা হইল। নীতা কহিল, "চল্ পদ্মা, আমার কাছে থাকবি। আমি বড় মানুষ না হলেও, আমার কাছে তুই শান্তি পাবি, একথা আমি বলতে পারি।"

পদ্মা কহিল, "আমি তোমার কাছে যদি যাই, তাহলে দাদা মনে কষ্ট পাবেন। আর তাঁর কষ্টও হবে—বৌদি ত খাওয়া দাওয়া কিছুই দেখে না। তাছাড়া, বাবা এ বাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, এখানে আমার যত কষ্টই হোক, এই আমার কাছে বড় আকাঙ্ক্ষিত স্থান।"

নীতা আর কিছু বলিল না।

ক্রমশঃ

শ্রীনীহারনলিনী দত্ত।

ধর্ম্ম

ধনরত্ন পরিজন মানবের সদা সহচারী,
স্থূলভাবে অবিরোধী চিরদিন হয় অপকারী।
পরত্রে নহেকো সাথী, অনিত্য এ মায়াময় ভবে—
নিমেষে মিলায় তারা, আত্ম-অনুগামী, হায়, কবে?
কিন্তুমাত্র বন্ধু ধর্ম্মে আজীবন করিলে সেবন,
আত্মার অনুগ হয়ে পূতপথে করেন চালন।
তাই কত যোগী ঋষি, থাকি তুঙ্গ অচলশিখরে
ভুলিয়া বাসনা ভোগ সেবে তাঁরে একাগ্র অন্তরে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আমাদের বক্তব্য

[৩]

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় বেদান্তের এই একটা মূল্যবান্ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছি যে, 'সামান্যের' মধ্যেই উহার 'বিশেষ'গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে; উহারাই ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এই জন্যই ছান্দোগ্যে নামরূপকে ব্রহ্মেরই মধ্যে অবস্থিত, ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্ভূত বলা হইয়াছে—"তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম।" (ছা, ৮।১৪।১)। দুন্দুভি দৃষ্টান্তে (বৃহৎ ভাং, ২।৪।৭) এ কথা আরও, সুস্পষ্ট। "...সামান্যস্য গ্রহণেন তদ্‌গতা বিশেষা গৃহীতা ভবন্তি। ন তু তত্রৈব নির্ভিদ্য গ্রহীতুং শক্যন্তে।" এই বিশেষ গুলিকে, উহাদিগের সামান্য হইতে পৃথক্ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া (separation) লওয়া যায় না। সুতরাং সামান্যের সহিত এই বিশেষ গুলির নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধ হইতে উহাদিগকে বিচ্যুত করিয়া লওয়া যায় না। বেদান্তে কার্য্য-কারণের যে সম্বন্ধ বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারাই এই তত্ত্বটী বুঝিতে পারা যায়। নামরূপাত্মক জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যেই বিধৃত রহিয়াছে। যাহা তাঁহাতে জ্ঞানাকারে নিত্য অবস্থিত, * তাহাই বিশেষাকারে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়, অভিব্যক্ত হইয়াও ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্যুত হয় না। এই সম্বন্ধ চ্যুত করিয়া 'স্বতন্ত্র' করিয়া লইলে কি দোষ হয়, তাহারও একটু আলোচনা আবশ্যক। এখন আমরা সেই কথাটী বলিব।

নামরূপ, ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্ভূত, ইহা যদি না বল, যদি নামরূপকে ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে সম্বন্ধ-চ্যুত করিয়া একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লও,—তাহা হইলে একদিকে ব্রহ্মের সত্তা, অপর দিকে নামরূপের সত্তা, এই দুই বস্তুতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইবেই; ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। একটা পূর্ণ, অপরটা অপূর্ণ; একটা নিত্য, অপরটা অনিত্য; একটা কারণ, অপরটা কার্য্য: একটা Infinite, অপরটা Finite;—এইরূপে পাশাপাশি দু'টা স্বতন্ত্র বস্তুকে স্থাপন করিতে পার না। † এই বিরোধ নিবারণের উদ্দেশ্যে নামরূপকে ব্রহ্ম হইতে 'অনন্য' বলা হইয়াছে। ['অনন্য' অর্থ—এক বা অভিন্ন নহে; কার্য্যকে উহার কারণ হইতে কিছু ভিন্ন হইতেই হয়, নতুবা "প্রকৃতি-বিকারোচ্ছেদ প্রসঙ্গঃ।" (শঙ্কর)। আনন্দগিরিও বলিয়াছেন—"ন তু ঐকান্তিকাভেদঃ।"] নামরূপ কোন 'অন্য' বা স্বতন্ত্র (Foreign) বস্তু নহে। উহা ব্রহ্মের স্বরূপেরই অন্তর্ভূত; ব্রহ্মস্বরূপ হইতে খসাইয়া লইয়া নামরূপকে ব্রহ্মের বাহিরে স্থাপন করা যায় না, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে কখনও উহাকে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না; উহা ব্রহ্মের স্বরূপেরই মধ্যে, তাহার সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই, অবস্থান করে। তৈল—তিলেরই অন্তর্ভূত; উহা তিলের সহিত দৃঢ় সম্বদ্ধ, সুতরাং তিলের বাহিরে, তিলকে ছাড়িয়া দিয়া, তৈল থাকিবে কিরূপে? শঙ্কর এই জন্যই বলিয়া দিয়াছেন যে, কোন অবস্থাতেই নামরূপ, ব্রহ্মের বাহিরে, ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া, থাকিতে পারে না।—

> যদা আত্মস্থে অনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে,
> তদা নামরূপে আত্মস্বরূপাপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মণা
> অপ্রবিভক্তদেশকালে সর্ব্বাবস্থাসু ব্যাক্রিয়েতে।"
>
> (তৈঃ ভাঃ, ২.৬)

---

* "নিত্যাসিদ্ধস্য ঈশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতি বিষয়ং নিত্যজ্ঞানং ভবতি।" (শ্বেঃ ভাং, ১।১।৫)
"নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎ প্রকৃত্যোরপি নিত্যত্বেন ভবিতুং যোগ্যং।" (গীতাভাষ্য)

† দুইটা একান্ত ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করিয়া, উহাদিগকে পরস্পর সম্বন্ধে আনিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা শঙ্কর দেখাইয়াছেন।

যাহা ব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে (In suppressed or potential form) বর্ত্তমান ছিল, তাহাই ক্রমে ব্যক্ত (Actual) হইয়া থাকে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই নামরূপকে সেই স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। ব্রহ্মের সঙ্গে নামরূপের এই সম্বন্ধ যদি বিচ্যুত কর, তাহা হইলে দুইটা পরস্পর বিরোধী স্বতন্ত্র বস্তু দাঁড়াইবেই। একদিকে ব্রহ্ম অন্য দিকে নামরূপ—উভয়েই স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র স্বরূপ বিশিষ্ট। * নামরূপকে সূক্ষ্ম 'শক্তি' বলিয়া ধরিলেও, এই আশঙ্কা স্বতঃই মনে উদিত হইতে পারে যে, তবে ত উহার স্বতঃসিদ্ধ সত্তা আছে—

"শক্তিত্বেন স্বতঃ সত্তাকং স্যাৎ ?"

আনন্দগিরি এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া, এই প্রকারে তাহার সমাধান করিয়াছেন—

"নেত্যাহ। আত্মশক্তিত্বেন আত্মন্তর্ভাবাৎ…ন প্রধানবৎ স্বাতন্ত্র্যং।"

তিনি সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—'ইহা পরমাত্মার শক্তি, সুতরাং পরমাত্মারই অন্তর্ভুক্ত; এবং পরমাত্মারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাকে পরমাত্মা হইতে কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলা যায় না।'

এই প্রকারে, নামরূপকে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভূত না বলিলে, কুম্ভকার যেমন আপনা হইতে স্বতন্ত্র একটা উপাদান—মৃত্তিকা—লইয়া ঘটাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ আপনা হইতে স্বতন্ত্র একটা উপাদান (নামরূপ শক্তি) লইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করেন,—এই দোষ উপস্থিত হইবেই। এই দোষ নিবারণের জন্য নামরূপকে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভূত বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-সত্তা হইতে উহার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই; উহা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে কোন 'অন্য' বা স্বতন্ত্র (Foreign) বস্তু নহে; উহা পরমাত্মারই একান্ত অধীন; পরমাত্মার স্বরূপ হইতে উহার কোন স্বাধীন সত্তা নাই,—ইহা বলা হইয়াছে। এই নিমিত্তই শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"পরমেশ্বরাধীনা তু ইয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা।" (বেদাং ভাং, ১।৪।৩) ইহাকে ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত বলিলে, উভয়ের মধ্যে আর কোন বিরোধ থাকে না। শ্রুতি এইরূপে, জগৎ ও ব্রহ্মের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন।—

"তেনায়ং হেতুনা অস্মাৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে
তৈঃ দ্বৈতৈঃ।…
অস্মদীয়োঽয়ং 'সর্ব্বানন্যত্বাৎ' আত্মৈকদর্শনপক্ষো
ন বিরুধ্যতে তৈঃ।" (মাণ্ডুক্য-কারিকা ভাষ্য, ৩।১৭।১৮)

আনন্দগিরিও বলিয়াছেন—

"স্বতন্ত্রত্বনিষেধেন স্বতঃসত্তানিষেধাৎ ন অদ্বৈত-
শ্রুতিবিরোধঃ।"

ব্রহ্মের সত্তা ও নামরূপের সত্তা একই। ব্রহ্মসত্তা হইতে নামরূপের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন—

"কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। এবং কারণমপি ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বং।" (বেং ভাং, ২।১।১৬)

এইটী ভাবিয়াই অভিব্যক্ত 'বিশেষ বিশেষ' নাম রূপকেও "আত্মা" বলা হইয়াছে—("পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি সন্ আত্মা…বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাস আত্মানং)।" নামরূপকে শঙ্কর অন্যত্র 'আত্মভূত' বলিয়াছেন—"আত্মভূতে ইব নামরূপে।" রত্নপ্রভাকার এই জন্যই জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধকে 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ উভয়ের স্বরূপ-গত কোন ভেদ নাই।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, এই দেশকালে বিভক্ত বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁহা হইতেই ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাহা কিছু বৈচিত্র্য জগতে দেখা দিয়াছে, তৎসমস্তই অব্যক্ত-ভাবে ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যেই নিহিত আছে। ব্রহ্মে যদি বৈচিত্র্যরূপ বীজ না থাকে, তাহা হইলে জগতে বৈচিত্র্য আসিবে কোথা হইতে ? "যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে"

* "অন্যোঽসা বন্যোঽহমস্মীতি"—এই দোষের।

ন তত্ত্ব উৎপদ্যতে' অনাত্মভূতস্য অনারম্ভত্বাৎ।" এই বৈচিত্র্য ব্রহ্মস্বরূপের হানি না করিয়াই উৎপন্ন হয় এবং সেই স্বরূপকে ত্যাগও করে না। "স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে" (বেং ভাং, ২।১।২৮) এবং "ন হ্যাত্মনোঽন্যৎ তৎপ্রবিভক্ত দেশকালং...বস্তু বস্ততে।" (তৈঃ ভাঃ, ২৬)। কিন্তু কোন বস্তুই ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং ব্রহ্মকে নামরূপ হইতে ভিন্ন, নামরূপের অতীত বলিতেই হয়।১ তিনি কিন্তু সকল বস্তুর অধিষ্ঠান, তিনি সমস্ত বস্তুকে আশ্রয় করিয়া, অন্তর্ভুক্ত করিয়া, ক্রোড়গত করিয়া বর্ত্তমান। কেহই তাঁহার বাহিরে নহে; সমস্ত জগৎ তাঁহারই মধ্যে। কার্য্য থাকিলে উহার মূলে কারণ থাকিবেই; কেন না, কারণই কার্য্যাকার ধারণ করে; কার্য্য উহার কারণেরই রূপান্তর মাত্র।

"কার্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্য অর্থবত্ত্বমাহ্বতি।" (বেং ভাং) সুতরাং জগৎ থাকিলে, তাহার মূলে ব্রহ্ম থাকিবেনই। নামরূপ, কারণের মধ্যেই অব্যক্তরূপে অবিভক্ত ছিল; উহাই কার্য্যাকারে দেখা দিয়াছে। তবেই নামরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, অন্য বস্তু (Foreign) হইবে কিরূপে? ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া দিলে, এ জগৎ মিথ্যা হইয়া উঠে, 'কদলীস্তম্ভবৎ অসার' হইয়া পড়ে। এই জন্য, অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মস্বরূপকে ভুলিয়া বা উহাকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়া আমরা যে জগতের বস্তুগুলিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়া ব্যবহার করি, তাহাকেই শঙ্কর মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া জগৎকে দেখিলে তাহাকেই শঙ্কর পরমার্থদৃষ্টি বলিয়াছেন। এইটী না বুঝিতে পারায়, বেদান্ত লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

(১) কিন্তু তিনি নামরূপ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহেন। কেন না, ব্রহ্মস্বরূপ ছাড়া, নামরূপ অন্য স্বরূপ পাইবে কোথা হইতে? নামরূপ ত কোন Foreign বস্তু নহে। যাহা কারণ, তাহা উহার কার্য্য হইতে অধিকতর ব্যাপক; সুতরাং কার্য্য হইতে ভিন্ন।

কারণ ও কার্য্যের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকাই চাই। কিন্তু দুইটী বস্তু ব্যতীত সম্বন্ধ হয় না—"দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য।" (বেং ভাং) পূর্ব্বাবস্থার একান্ত নাশ হইয়া যদি পরবর্ত্তী অবস্থা জন্মে, তবে সম্বন্ধ হইবে কাহার সহিত? এই জন্যই পূর্ব্বাবস্থাটাকেই পরবর্ত্তী অবস্থার কারণ বলা হয় নাই।—"ন অসৌ উপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগম্যতে।" (বে ভা, ২।২।২৬) কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থারই অন্তর্ভূত 'অনুপমৃদ্যমানা' বস্তুস্বভাবকে কারণ বলা হইয়া থাকে। শঙ্কর বলেন—"ন ক্ষীরস্য সর্ব্বোপমর্দ্দেন দধিভাবাপত্তিঃ।" ক্ষীরের এই 'স্বভাবটাই' পরবর্ত্তী অবস্থায় অনুগত হয় এবং উহাই সম্বন্ধের হেতু। বস্তুর এই স্বভাবটাই প্রকৃত কারণ; উহার নাশ হয় না। তাই শঙ্কর বলিয়াছেন—

"...এবঞ্চ সতী, ঘটস্য প্রাগভাব ইতি—ন ঘটস্বরূপমেব প্রাগুৎপত্তের্নাস্তীতি ...স্বেন হি ভবিষ্যদ্রূপেণ ঘটো বর্ত্ততে।" (বৃহং ভাং, ১।২।১)

এইরূপে পরিণামকেও একরূপে বিবর্ত্ত বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।* নারায়ণতীর্থ তাই বলিয়াছেন যে—

"পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগেন উত্তরাবস্থারূপস্য বিবর্ত্তস্য ঘটাদেরিব স্বকারণতঃ পৃথগসত্ত্বাৎ, সত্ত্বহীনস্য অলীকত্বাৎ।"

অতএব বস্তুর অবস্থান্তরগুলিই যে একটী অপরটীর 'কারণ' তাহা নহে। বস্তুর 'স্বভাবের' মধ্যেই অবস্থান্তরগুলি অন্তর্ভূত থাকে; উহারাই সেই স্বভাব হইতে ক্রমে উৎপন্ন হয়। সুতরাং উহারা সেই বস্তুর স্বভাব হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। সর্ব্বত্র ভাষ্যকার এ কথা বলিয়া দিয়াছেন—

"চৈতন্যাব্যতিরেকেণৈব হি কলাঃ জায়মানা তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীয়মানাশ্চ সর্ব্বদা লক্ষ্যন্তে।" (প্রশ্ন—ভাঃ ৬।২)। সর্ব্বত্র এই প্রকার।

* "ইদানীং ঘটাদিষ্বপি 'বিবর্ত্তত্বৈব'। পরিণামো নাম বিবর্ত্তাদন্যো নাস্ত্যেব।"—ঐ তৎ ভাষ্যটীকা

কোন অবস্থাতেই নামরূপকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে এই একটা প্রকাণ্ড দোষ হয় যে, ব্রহ্মকেও একেবারে স্বতন্ত্র হইতে হয়। এবং ব্রহ্ম একেবারে 'শূন্য' হইয়া উঠেন। ব্রহ্ম—মন নহেন, প্রাণ নহেন; ব্রহ্ম—জ্ঞান নহেন, ক্রিয়া নহেন, কোন কিছুই নহেন। শব্দ তাঁহাতে যাইতে পারে না; বাক্য তাঁহার ধারে ঘেঁসিতে পারে না; মন তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আইসে। তাঁহাকে বুঝিবার, ধরিবার ছুঁইবার কোন উপায় থাকে না। এই মহৎ দোষ নিবারণের জন্যই, মাণ্ডুক্য উপনিষদে, সুষুপ্তি অবস্থা ছাড়াও পরমাত্মার একটী "তৃতীয়" বা চতুর্থ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এ কথাটা কি তর্কতীর্থ মহাশয় তলাইয়া দেখিয়াছেন? শ্রুতি কি বৃথাই এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন? সুষুপ্তির অবস্থায় আত্মায় জগতের কোন জ্ঞান থাকে না; কোন ক্রিয়া থাকে না। এ অবস্থাটা Negative স্বরূপ মাত্র। কিন্তু ইহা ত আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপ নহে। আত্মা আনন্দ-স্বরূপ, তিনি Positive রূপ। এই positive স্বরূপ বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি 'তুরীয়' অবস্থার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম—জগতের ইহা নহেন, উহা নহেন, বলিলেই যথেষ্ট হয় না। ব্রহ্ম—জগতের অতীত হইয়াও, জগতের তাবৎ বস্তুকে আত্মস্থ করিয়া ক্রোড়স্থ করিয়া, কুক্ষিগত করিয়া বর্ত্তমান। তিনি সকলের অতীত হইয়াও সকলের 'অধিষ্ঠান'। তুরীয়াবস্থা এই মহাতত্ত্বেরই নির্দ্দেশ করিয়াছে। কোন বস্তুই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। তিনি সকল বস্তুকে তাঁহার অন্তর্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

"যিনি সকলের অতীত তাঁহাকে ত কোন শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে কি তিনি 'শূন্য' হইয়া উঠিতেছেন না?" এই প্রশ্ন তুলিয়া তাহার এইরূপ সমাধান করিয়াছেন—"না ব্রহ্মকে শূন্য বলিতে পার না। কোন কল্পনা, কোন ধর্ম্ম, কোন অবস্থা, কোন বিকার—শূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। রজ্জুকে আশ্রয় করিয়াই সর্পের প্রতীতি হইয়া থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যে মরুভূমিতে জল দেখিতে পায় সেখানেও সেই জলের প্রতীতি মরুক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়াই উপস্থিত হয়।" ইত্যাদি। "এইরূপ জগতে অভিব্যক্ত প্রাণ মন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিকার বা ধর্ম্মগুলি—সেই 'তুরীয়' পরমাত্মার আশ্রয়েই অভিব্যক্ত হয়। সেই আত্মাই সর্ব্বপ্রকার বিকারের "আস্পদ" সুতরাং তাহাকে 'শূন্য' বলিবে কিরূপে?" উহাই জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে।[১]

সুতরাং যে পরমাত্মা জগতের সকল বস্তুর 'আস্পদ', সর্ব্বত্র অনুস্যূত, সকল বিকারে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জগতের কোন বস্তুই থাকিতে পারে না। "তুরীয়াবস্থা" এই মহাতত্ত্বেরই নির্দ্দেশ করে।

নামরূপাত্মক জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না, তাহার আরও গুরুতর হেতু আছে।

নামরূপাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইবে কিরূপে? নামরূপাদি বিকার-গুলির মধ্য দিয়াই ব্রহ্মের স্বরূপটী আত্মবিকাশ করিতেছে। একটি বস্তুর সম্পূর্ণ বিকাশ দেখিতে হইলে, আমাদিগকে একেবারে উহার চরম অবস্থা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। বীজাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরাবস্থা, শাখা প্রশাখা অবস্থা প্রভৃতি—সমস্ত পর পর অবস্থাগুলি—শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে হইবে; তবে বৃক্ষটিকে সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে। শেষ অবস্থায় বৃক্ষটীর পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। পর-মত খণ্ডনের সময় শঙ্করাচার্য্য একটি বড় মূল্যবান কথা বলিয়াছেন—"হেতুসম্ভাবানুপলব্ধেস্তু ফলস্য উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ...হেতুসম্ভাবস্য ফলকালাবস্থায়িত্বং চ।" (বৃঃ ভাঃ ২।২।২০ এবং ২।১।১৫)। কারণকে উহার সমুদয় ফলোৎ-

(১) জাগ্রদাদিস্থানেষু এক এবাত্মা অব্যভিচারী...তুরীয়ং ব্রহ্ম।...নির্ব্বিশেষে এবাত্মনি সুখিত্বাদিবিশেষাঃ কল্পিতাঃ... আত্মা এতেষু অনুগতঃ।"- মাং ভাং, ১।১১।

পত্তিকাল পর্য্যন্ত থাকিতেই হয়। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পর-পর উৎপন্ন সকলগুলি অবস্থা বা বিকারের মধ্য দিয়াই ত বৃক্ষটী পূর্ণাভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং কোন অবস্থাকেই বৃক্ষের স্বরূপ হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তির সহিত বিজ্ঞান ভিক্ষুরও চমৎকার ঐক্য আছে। বিজ্ঞান ভিক্ষুও যোগবার্ত্তিকে এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

"বস্তু ধর্ম্মী......পল্লবাদিরূপ শেষ বস্তুরা ব্যজ্যতে।" ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের স্বরূপকে বুঝিতে হইলে, নামরূপাত্মক জগতের চরম অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। নামরূপের মধ্য দিয়াই উত্তরোত্তর ব্রহ্ম আপন স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন। জগৎ সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে। সুতরাং জগৎকে —জগতের কোন অবস্থাকে—মূলস্থ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইবে কিরূপে? "জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিঃ··· পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি।" (বেঃ ভাঃ, ১.৩.৩০ ও ১.১।১১)। ব্রহ্মেরই স্বরূপ-নিহিত নিত্য ঐশ্বর্য্য, মায়া দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে, একথা মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১ সুতরাং জগৎকে মূলস্থ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া—পৃথক করিয়া লইবে কিরূপে? এই তত্ত্বটি বুঝিয়া দেখিলেও ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের নিত্য সম্বন্ধ মানিতেই হইবে। এ সম্বন্ধে আরও কথা আছে, প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে তাহা বলিলাম না।

এই সকল তত্ত্ব তলাইয়া না দেখার জন্য প্রতিবাদকারী তর্কতীর্থ মহাশয় যুদ্ধার্থে আসরে নামিয়াছেন।

বেদান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যখনই কোন জড়কে দেখিবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, ঐ জড়ের মূলে চেতনের সঙ্গে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। মূলে চেতন নাই, অথচ জড় রহিয়াছে বা জড় ক্রিয়া করিতেছে, ইহা হইতেই পারে না। এইজন্য বেদান্তে জড়কে "পরার্থ" বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ জড়মাত্রই চেতনের প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকে, উহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। আবার বেদান্তে ইহাও বলা হয় যে, যেখানে জড়ে কোন নিয়মবদ্ধ ক্রিয়া দেখিবে, বুঝিবে যে চেতনদ্বারা প্রেরিত হইয়াই উহা ক্রিয়া করিতেছে। এ কথাগুলি আমরা এস্থলে বিস্তৃত করিয়া বলিলাম না। সর্ব্বত্রই শঙ্করাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নামরূপ কখনই চেতনের সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না। যেখানেই নামরূপ, যেখানেই জড়, সেই খানেই উহার মূলে চেতনের সম্বন্ধ আছে, ইহা বুঝিতেই হইবে।

জগতের বস্তুগুলিকে যদি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেও, তাহা হইলেও তুমি এই বস্তুগুলিকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে। কিন্তু এভাবে জগতের বস্তুকে ভাষ্যকার মিথ্যা বলেন নাই। যে মুহূর্ত্ত জগতের বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে, সেই মুহূর্ত্তে মূলস্থ ব্রহ্মও 'শূন্য' 'অজ্ঞেয়' হইয়া উঠিলেন। নামরূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়াই ত আমরা তদ্দ্বারা ব্রহ্ম স্বরূপের কিছু পরিচয় পাইয়াছি। শঙ্কর বলেন—

"যদি হি নামরূপে ন ব্যাক্রিয়েতে···ব্রহ্মণো প্রজ্ঞানঘনাখ্যং রূপং ন প্রতিখ্যায়েত।" (বৃঃ ভাঃ)

যদি জগতের অভিব্যক্ত জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতির বিলোপ কর, তবে ত ব্রহ্মও অজ্ঞেয় হইয়া উঠেন; ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। ইন্দ্র আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, সুষুপ্তাবস্থায় আত্মায় জগতের কোন জ্ঞানই থাকে না, সুতরাং আত্মারও কোন জ্ঞান থাকে না। তবে ত এরূপ আত্মাকে শূন্য, অজ্ঞেয়, বিনষ্ট বলিয়াই ধরিতে হইবে। "ন খল্বয়ং···আত্মানং বিজানাতি 'অয়মহমস্মীতি,' নো এব ইমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি। নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।"

জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, জগৎকে চেতনের সম্বন্ধচ্যুত করিলে, ব্রহ্মও শূন্য বা একটা

(১) "···নিত্যসিদ্ধ আত্মা আনন্দাখ্য আনন্দস্যৈব নিত্য মৈশ্বর্য্যং মায়য়া অভিব্যজ্যতে।" (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২১৩ অধ্যায়)।

Abstract empty principle হইয়া উঠিবেনই। উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন ও ভাষ্যকার—কেহই এ প্রকার সিদ্ধান্ত করেন নাই। বেদান্ত বুঝিতে গিয়া, অনেকেই এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন।

এখন আমরা জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও দেখাইব। জগৎ সম্বন্ধে যে কথা, জীব সম্বন্ধেও বেদান্তের অবিকল সেই একই কথা। আমরা বেদান্ত দর্শনের ১।১।১৭ ভাষ্যে পাঠকপাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষিত করিতে চাই।১ ভাষ্যটী এই—

"প্রতিবিধাতে এবতু পরমার্থতঃ···পরমেশ্বরাৎ 'অন্যো' দ্রষ্টা শ্রোতা বা। পরমেশ্বরস্তু···কর্ত্তৃ ভোক্তৃ বিজ্ঞঃ নাম্যথাৎ 'অন্যঃ'। যথা মায়াবিনঃ···পরমার্থরূপো ভূমিষ্ঠো মায়াবী অন্যঃ।"

ব্রহ্মকে জীব হইতে 'অন্য' বা স্বতন্ত্র বলা ২ যাইতে পারিলেও, কোন জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে 'অন্য' বা স্বতন্ত্র স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু বলা যায় না। এস্থলেও পাঠকপাঠিকা দেখিবেন, জগতের কোন বস্তুকেই যেমন ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না, তদ্রূপ কোন জীবকেও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। জীব ও জগৎ—দুইই ব্রহ্মস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত; সেই স্বরূপ হইতেই ইহারা ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে; সেই স্বরূপ হইতেই স্বতন্ত্র হইয়া ইহারা কখনই থাকিতে পারে না। স্বতন্ত্র করিতে গেলেই, ব্রহ্মে ও জগতে এবং ব্রহ্মে ও জীবে—পরস্পর একটা বিরোধ উপস্থিত হইবেই; তাহা নিবারণ করা যাইবে না। এই জন্য শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন—

"যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ, এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ, সর্ব্ব এতে আত্মনঃ সমর্পিতাঃ।" (বৃহঃ, ২।৫।১৫)।

আমরা যে ভাষ্যটীর আলোচনা করিতেছি, এই ভাষ্যে একটী "ইন্দ্রজালের" দৃষ্টান্ত আছে। এই ইন্দ্রজাল শব্দটী লইয়াও তর্কতীর্থ কম গোলযোগ উত্থাপিত করেন নাই! এই ইন্দ্রজালের প্রকৃত তাৎপর্য্যটীও এস্থলে ব্যাখ্যা করিয়া দেখান আমরা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। কতকগুলি লোক (তর্কতীর্থ মহাশয়ও সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত) বেদান্তে ব্যবহৃত 'মায়াবী', 'ইন্দ্রজাল' প্রভৃতি শব্দ দেখিবামাত্র এমনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে, তবে ত বেদান্ত জগৎকে ইন্দ্রজাল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন!! নিরুক্তকার যস্কের কথায় আমরা বলিতে পারি যে, অন্ধ যে স্তম্ভ দেখিতে পায় না, তাহা কিছু স্তম্ভের দোষ নহে!

যে ব্যক্তি দর্শকদিগের সম্মুখে ভূমিতে দাঁড়াইয়া, মায়া বা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া দর্শকের চক্ষে "ভেল্‌কি" লাগাইয়াছে, তাহাকে শঙ্কর "মায়াবী" বলিয়াছেন। এই মায়াবী ত ভূমিতে দাঁড়াইয়াই আছে। কিন্তু দর্শকেরা দেখিল একটী পুরুষ সূত্র অবলম্বন করিয়া, হস্তে খড়্গ ও চর্ম্ম লইয়া, আকাশে উঠিয়া গেল, এবং আকাশে থাকিয়াই নানারূপ ইন্দ্রজালক্রিয়া দেখাইতে লাগিল। এখন, এই যে আকাশস্থ পুরুষটী খেলা দেখাইতেছে, দর্শকেরা ত ইহাকেই মায়াবী মনে করিতেছে। কিন্তু ইহার কি সেই ভূমিস্থ প্রকৃত 'মায়াবী' পুরুষ হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে? ইহা ত সেই ভূমিস্থ মায়াবীরই একটা রূপান্তরমাত্র। সুতরাং ইহাকে একটা স্বতন্ত্র 'অন্য' বস্তু বলিতে পার না। কিন্তু যেটী প্রকৃত মায়াবী, সে ত ইহা হইতে 'অন্য'; কেন না, সে ত বরাবরই ভূমিতে দাঁড়াইয়াই রহিয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন—'সূত্রেণ আকাশ মধিরোহতঃ খড়্গ চর্ম্মধরাৎ মায়াবিনঃ ভূমিষ্ঠো মায়াবী 'অন্য'।" এস্থলে আকাশস্থ পুরুষকে যদি স্বতন্ত্র একটা ব্যক্তি বলিয়া

---

(১) ১।৩।১৯ ভাষ্যে অবিকল এই কথা। "পরমাত্মনো জীবাদন্যত্বং দ্রঢ়য়তি। জীবস্য তু ন পরস্মাদন্যত্বং"।

(২) ব্রহ্মকে জগৎ বা জীব হইতে 'অন্য' বলার অর্থ ইহা নহে যে, ব্রহ্মকে জগৎ হইতে ছাঁটিয়া একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইল। ব্রহ্ম—পূর্ণ, অর্থাৎ জগৎ—অপূর্ণ, ব্রহ্ম—অব্যয় অনন্ত, জগৎ—পরিবর্ত্তনশীল, সান্ত। এই জন্যই ব্রহ্মকে জগৎ হইতে 'অন্য' বলা হয়। এ কথাটাও ভুলিলে চলিবে না।

ধরিয়া লও, তবেই তাহা 'মিথ্যা' হইবে। আর উহাকে যদি ভূমিস্থ মায়াবীরই একটা রূপান্তর মাত্র বোধ কর, তাহা হইলেই তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। তখন তুমি বুঝিবে যে, ভূমিস্থ পুরুষটাই প্রকৃত পুরুষ; রূপান্তর গ্রহণ করিয়াও সে আপনার স্বরূপে ঠিকই আছে। জগৎ ও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মেরও অবিকল এই প্রকার সম্বন্ধ। জগৎ বা জীব, ব্রহ্মেরই একটা রূপান্তর, 'সংস্থান-ভেদ' মাত্র, কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। এই রূপান্তর ধারণ করিয়াও ব্রহ্মের আত্মস্বরূপের কোন ক্ষতি হয় নাই, তাঁহার স্বরূপটী জগৎ বা জীবের অতীতই রহিয়াছে; স্বতন্ত্রই রহিয়াছে।[১] কিন্তু জগৎ বা জীবকে যদি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ছাঁটিয়া লও, তাঁহার সম্পর্কবর্জ্জিত করিয়া, উহাদিগকেই স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া ধরিয়া লও, তাহা হইলেও ভুল হইল। তাদৃশ জগৎ বা জীব অসত্য, মিথ্যা। ভেদ ও অভেদের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

এস্থলে আর একটী কথা বলিব। বেদান্তে শুক্তি-রজত, রজ্জু-সর্প প্রভৃতি দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, এই মায়াবী প্রদর্শিত 'ইন্দ্রজালের' দৃষ্টান্তটীই আমাদের মতে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। কেন একথা বলিতেছি, তাহা পাঠকবর্গকে নিবেদন করিব। শুক্তিতে যে রজতদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে শুক্তির কোন ক্রিয়াদ্বারা ঐ দৃশ্য উৎপন্ন হয় না; কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ই ঐরূপ দৃশ্য দেখিতে পায়। কিন্তু আমরা যে ইন্দ্রজাল দেখি, মায়াবীর ক্রিয়া দ্বারা সেই ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হয় এবং আমাদের ইন্দ্রিয় তদনুসারে সেই দৃশ্য দেখিয়া থাকে। ইন্দ্রজালের দৃষ্টান্তে এই তত্ত্বটী স্ফুট হয়। নতুবা জগৎদৃশ্যটী কেবল subjective হইয়া উঠে। ব্রহ্মও স্বরূপনিহিত আত্মশক্তি (মায়া) দ্বারা জগদ্দৃশ্য উৎপন্ন করেন এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে সেই দৃশ্যই প্রতীয়মান হইতে থাকে। শুক্তিরজতাদির দৃষ্টান্তে শুক্তির অন্তর্নিহিত কোন শক্তির কথা পাওয়া যায় না। নামরূপাদির পরিবর্ত্তনে, উহাদের মূলস্থ ব্রহ্ম-স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না,—এই তত্ত্বটুকুই কেবল শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্তে পরিস্ফুট হয়। এই জন্যই আমাদের মনে হয় মায়াবী-প্রদর্শিত ইন্দ্রজালের দৃষ্টান্তটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্ত।

শঙ্কর মতে ভেদ ও অভেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কিরূপ, তৎ সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত দিব। একটা বৃক্ষজ্ঞান উপস্থিত হইল, আমি ঐ জ্ঞানের 'জ্ঞাতা' হইতেছি। আবার পরক্ষণেই অপর একটা বস্তুজ্ঞান (যেমন লতার জ্ঞান) উপস্থিত হইলে, উহার আমি জ্ঞাতা হইলাম। আবার ঐ বস্তুগুলি চলিয়া গিয়া উহাদের স্মৃতি উপস্থিত হইল; এখন আমি ঐ স্মৃত বস্তুর জ্ঞাতা হইতেছি। এইরূপে, জ্ঞানের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতারও রূপ বদলায়। কিন্তু প্রকৃত যিনি জ্ঞাতা, তিনি এই বিকারি-জ্ঞাতার অন্তরালে অবস্থিত। সে জ্ঞাতার রূপ বদলায় না। বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বা বিবিধ জ্ঞানের ইনি অবিকৃত জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। শঙ্কর বলিয়াছেন—"স আত্মা··· সর্ব্ব-প্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তি স্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে। সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শিত্বে উপজনাপায়-বর্জ্জিত দৃক্-স্বরূপতা।" (কেনং ভাং, ২৪) এই যে বিকারী জ্ঞাতা ইহাই সাধারণ Empirical জীব। বিকারী বস্তু ও তাহার বিকারে বস্তুত কোন ভেদ নাই; সুতরাং এই জ্ঞাতার জ্ঞান সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞাতা যিনি, তিনি এই বিকৃত জ্ঞাতার অন্তরালে; ইনিই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। ইনি সকল বস্তুর জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা, কিন্তু ইনি অবিকৃত থাকিয়া যান। এখন যদি এই বিকারী জ্ঞাতাকে অন্তরালবর্ত্তী প্রকৃত জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লও এবং উহাকেই একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলিয়া মনে কর, তবেই ভুল হইল। এ স্থলে, অন্তরালবর্ত্তী অবিকৃত জ্ঞাতা যিনি, তিনিই প্রকৃত জীব। বিকৃত জ্ঞাতা জীবটী, উহারই রূপান্তর মাত্র। এই বিকারী জ্ঞাতার মধ্য দিয়াই, প্রকৃত জ্ঞাতার স্বরূপটী বিকাশিত হইতেছে। সুতরাং বিকৃত জ্ঞাতা ও উহার জ্ঞান-গুলি, তাঁহার স্বরূপ-বিকাশের

(১) "যদ্যপি কার্য্যাত্মনা উল্লিচ্যতে, তথাপি যৎ স্বরূপং পুনস্তৎ তন্ন জহাতি।" (বৃহঃ ভাঃ) ॥

'দ্বার' মাত্র ; কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে।" সুতরাং ইহাকে কোন স্বতন্ত্র বস্তু মনে না করিয়া, প্রকৃত জ্ঞাতার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই-ইহাকে কেবল পরিচায়ক লিঙ্গ বা বিকাশের ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতে যদি পার, ইহাই শঙ্কর মতে পারমার্থিক দৃষ্টি। ইহাতে বিকারী জ্ঞাতা বা Empirical জীবটী মিথ্যা হইয়া উড়িয়া যাইতেছে না ; কেবল ইহার 'স্বতন্ত্রতা' চলিয়া যাইতেছে, স্বাধীন সত্তা চলিয়া যাইতেছে। অন্তরালস্থ অবিকৃত জ্ঞাতাটীই প্রকৃত জীব; উহাই নানাবিধ বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া আপনার পরিচয় দিতেছে, আপন স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। "নাহদ্ দ্বারমন্তি আত্মনো বিজ্ঞানায়।" তিনি, এই সকল জ্ঞান যোগে, কোন ভিন্ন বা 'অন্য' বস্তু হইয়া উঠিতেছেন না। স্বরূপে ঠিক্ থাকিয়াই তিনি, এই সকল রূপান্তর গ্রহণ করিতেছেন—আপনাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত। পাঠক এখন দেখিতেছেন, শঙ্কর-মতে অভেদই প্রকৃত তত্ত্ব; ভেদগুলি কেবল স্বরূপের বিকাশের দ্বার মাত্র। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এই একই তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। জগৎকে ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ছাঁটিয়া লওয়া যায় না, স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। এ কথাটী এখন বোধ করি পরিষ্কার হইল *।

এই যে নামরূপাত্মক জগৎ, ইহা কিছু একবারেই স্থূলাবস্থায় দেখা দেয় নাই। এই জন্য বেদান্তে, এই নামরূপাত্মক জগতের যথাক্রমে তিনটী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। কারণাবস্থা, সূক্ষ্মাবস্থা ও স্থূলাবস্থা। কারণাবস্থাকে নামরূপের বীজ বা মায়া বলা হইয়াছে। এই মায়াবীজ পরব্রহ্মের মধ্যেই অব্যক্ত ভাবে, অবিভক্তরূপে, একাকার হইয়া অবস্থিত। এই অব্যক্ত মায়াবীজই ক্রমে সূক্ষ্মাকারে পরিণত ও পরে স্থূলাবস্থায় পরিণত হইয়া জগৎ হইয়াছে। জীবের এই মায়াবীজটী 'সুষুপ্তাবস্থা' স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থা এই তিন অবস্থান্তর গ্রহণ করে। সুষুপ্তাবস্থাই, জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার বীজ বা কারণ। জীবের সমুদয় ইন্দ্রিয়াদির শক্তি এই সুষুপ্তাবস্থায় অব্যক্তভাবে লীন থাকে; উহাই পরে ব্যক্ত হয়। জীবের সুষুপ্তাবস্থা ও জগতের প্রলয়াবস্থাকে শ্রুতি একরূপ অবস্থা বলিয়াছেন। প্রলয়াবস্থাতেও জগতের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া জ্ঞান প্রভৃতি অব্যক্ত রূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে। আনন্দগিরি এই অবস্থায় মায়াকে "সর্ব্বকার্য্য কারণশক্তি সমাহাররূপা মায়া" বলিয়াছেন। মায়ার ত্রিবিধ অবস্থার কোন অবস্থাকেই পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না।

"মধুনি রসবৎ, সমুদ্র প্রবিষ্ট নদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি...মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছন্তি।" (প্রশ্ন ভা, ৪।১—২)

সুষুপ্তকালের এই বর্ণনা ও প্রলয়কালের বর্ণনা অবিকল একরূপ। সর্ব্বপ্রকার শক্তিক্রিয়াদি মায়াবীজে অব্যক্ত ভাবে থাকে। উহাই ক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূলাবস্থায় ব্যক্ত হয়।

মাণ্ডুক্য ভাষ্যে এবং শঙ্করের সুপ্রসিদ্ধ "উপদেশ সাহস্রী" তে এই তত্ত্বটী বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"তদেবৈকং ত্রিধা জ্ঞেয়ং মায়াবীজং পুনঃ ক্রমাৎ।
মায়াব্যাত্মা হ্যবিকারোপি বহুধৈকো জলার্কবৎ॥"

উপং সা, ১৭।২৭।

এই মায়া পরমাত্মার মধ্যে "চিদেকাত্মনা বিলীনত্বাৎ" একাকার হইয়া বিলীন থাকে। যখন ইহা জগতের আকারে স্থূলাবস্থায় পরিণত হয়, তখনও ইহার 'স্বতন্ত্রতা' থাকে না। সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের একত্বের ব্যাঘাত হয় না।—

"তমোবীজস্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবৃত্তিশঙ্কা স্যাৎ, তথা সতি সাংখ্য সিদ্ধান্তাপাত ইতি...আশ্রয়ং দর্শয়তি।" পরমাত্মা যদি মায়ার আশ্রয় হন, তবে মায়ার অবস্থান্তর দ্বারা পরমাত্মারও ত অবস্থান্তর হইতে পারে। ইহার উত্তরে টীকাকার রামতীর্থ বলিতেছেন—

"এক এবাত্মা স্বগত বিকার রহিতোঽপি বহুধা বিভাব্যমানো ভবতি জলার্কবৎ।"

জীবন্মুক্ত পুরুষ যে মায়াকে দেখেন না, তাহা নহে। কিন্তু মায়া সত্ত্বেও, তদ্দ্বারা তাঁহার বিকার উপস্থিত হয়

* "তদ্-যুক্ত মখিলং বস্তু, ব্যবহার শ্চিদন্বিতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে।"—শঙ্কর কৃত "আত্মবোধ"।

না। মায়া সত্ত্বেও, পরব্রহ্মের কোন বিকার উপস্থিত হয় না। "জ্ঞানাবস্থায়াং কদাচিৎ প্রাণাত্মা কারাং মায়াং পশ্যন্নপি অজ্ঞানাবস্থায়ামিব ন ব্যামুহ্যতি…নির্ব্বিকার এব ভবতি।" (১৭।৩১)

এই মায়াশক্তিযুক্ত নির্গুণ ব্রহ্মকে মাণ্ডুক্যভাষ্যে শঙ্কর "সব্রহ্ম" বা কারণ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ।"

এই মায়াবীজকে কোন অবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু এতদ্ দ্বারা ব্রহ্মের একত্বের কোন ক্ষতি হয় না।

তবেই, প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, কথাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে। যদি তুমি নামরূপাত্মক জগৎকে বা উহার বীজ মায়াকে একটা 'অন্য' বা স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলে, একদিকে ব্রহ্ম, আবার অন্য দিকে আর একটা স্বাধীন বস্তু দাঁড়াইল। ব্রহ্ম যখন জগৎকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া রহিয়াছেন, তখন জগৎকে আর একটা 'অন্য' বস্তু বলা যায় না। ইহা পরমার্থতঃ, ব্রহ্মেরই বিকাশ, ব্রহ্মস্বরূপেরই অভিব্যক্তি মাত্র।[১] সুতরাং ইহা 'অন্য' কোন বস্তু নহে; স্বতন্ত্র কোন স্বতসিদ্ধ পদার্থ নহে। জীবন্মুক্ত পুরুষ যে জগৎকে দেখিবেন না, তাহা নহে; জগৎকে তিনি 'অন্য' বস্তু বলিয়া বোধ করেন না, এইমাত্র। জগৎকে তিনি ব্রহ্মস্বরূপেরই অভিব্যক্তি ভিন্ন অন্যরূপে দেখেন না। শঙ্কর "স্বাত্মনিরূপণ" গ্রন্থে কথাটা এইভাবে বলিয়াছেন—

"এষ বিশেষো বিদুষাং, পশ্যন্তোপি প্রপঞ্চ সংসারং।
পৃথগাত্মনো ন কিঞ্চিৎ, পশ্যন্তু সকল নিগমনির্ঘোষাৎ।"

জগতের মূলে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া, দুই প্রকারে জগৎকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ করা যায়। এক, জগতের উপরে ব্রহ্মের 'আরোপ' করিয়া; অথবা ব্রহ্মের উপরে জগতের আরোপ করিয়া। ইহারই নাম "অধ্যাস-বাদ।" প্রথমটাতে, জগৎ আবার কোথায়, সবই ত ব্রহ্ম। দ্বিতীয়টাতে, জগৎই ত সব, জগৎ ছাড়া আর ব্রহ্ম কোথায়? কিন্তু এ উভয়ই ভুল। ইহা "একত্ব বাদ" হইতে পারে, কিন্তু ইহা "অদ্বৈতবাদ" নহে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কোনকালেই বিচ্যুত হয় না। এটী বড়ই গম্ভীর তত্ত্ব। অনেকে এই তত্ত্বটী না বুঝিয়া, অদ্বৈতবাদ লইয়া খিচুড়ী করিয়া তোলেন।

জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ থাকিবেই।[২] কিন্তু ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্ব্বিকার ও অসঙ্গ বস্তু; সেটা ভুলিয়া যদি দুইটীকে মিশাইয়া ফেল, তবেই ভুল হইল। ব্যবহারিক অবস্থায়, পরমাত্মা মায়ার অবস্থান্তর দ্বারা যথার্থই অবস্থান্তরিত হইয়া 'অন্য' হইয়া উঠেন,—সাধারণ লোক এই ভাবে দেখে। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টি এরূপ নহে। মায়ার অবস্থান্তর দ্বারা ব্রহ্ম কখনই বিকৃত হন না। তিনি স্বতন্ত্রই থাকেন; এবং এই অবস্থান্তর গুলি প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপেরই বিকাশ মাত্র, অন্য কিছু নহে,—ইহাই পারমার্থিক দৃষ্টি। "নহি বিশেষ দর্শন মাত্রেণ বস্তুন্যত্বং ভবতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।" (বেদা) ইহাতে পরিণাম উড়িয়া যায় না। অনেক ইংরেজ অদ্বৈতবাদকে Monism বলিয়া অনুবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অন্যায় অনুবাদ। ইহাকে—non-dualism বলিতে পার।

সমাপ্ত

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

১। যত্র মনঃ প্রাণাদি গচ্ছতি, তত্র সর্ব্বত্র আত্মচৈতন্যস্য অভিব্যক্তি নিয়মাৎ।" (উপ সা, রামতীর্থ টীকা, ১৭।১৯)।
"স প্রাণ মসৃজত। তত্র চ আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃ সর্ব্বদা অভিব্যক্ততরং ইত্যাদি।"—(বৃহ ভাষ্য, ৪ ৪।২।)

২। এই সম্বন্ধ কিরূপ? রজ্জ্বামিব সর্পঃ" (শ্বেত ৬। ১।৬)। তবেই ব্রহ্ম, সম্বন্ধ সত্ত্বেও বিকৃত হইতেছেন না। "রজ্জ্বাদেরুরগাদ্যৈঃ সম্বন্ধবদস্য দৃশ্য সম্বন্ধঃ।" (স্বাত্মনিরূপণ. ৭২)। "ন পৃথগনুভবঃ কিন্তু তৎ সাহচর্য্যাৎ" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য (শতশ্লোকী ৬৩)। "তদ্-যুক্ত মখিলং বস্তু, ব্যবহার স্তিদন্বিতঃ।" (আত্মবোধ)

গর্ব্বিতা রূপসীর প্রতি

বৃথা গর্ব্ব, সুনয়নি, কতকাল রহিবে রূপসী?
নিতম্ব দুলায়ে মিছা হিল্লোলিয়া চল হেলি' দুলি'!
সমুন্নত বক্ষ তব চিরদিন রহিবে কি ফুলি'?
দাড়িম্বের দানাসম ব্যর্থ হাসো সুদন্ত বিকশি'!
ফুল্ল চাঁপাফুল তুল্য তনু শেষে হবে কৃষ্ণমসী!
কুঞ্চিত কোকিল-কালো প্রলম্বিত সুকুন্তলগুলি,
শণসম শুভ্র হবে!—তাহা সত্য গিয়াছ কি ভুলি'?

আমি কিন্তু সেই কথা একা একা ভাবিতেছি বসি।
রমণীর রূপ? সে যে মুক্তছিপি কর্পূরের প্রায়,
উবিয়া যাইবে ক্রমে, র'বে শূন্য শিশি অবশেষ!
উষার হাসিটি যথা সূর্য্যোদয়ে মিশাইয়া যায়,
সৌন্দর্য্য তেমনি যাবে, নাহি র'বে তার কোনো লেশ!
রূপ তবু পূজ্য বটে, রূপ-গর্ব্ব সহা নাহি যায়!
অতি ঘৃণ্য সে রূপসী, আত্মরূপ যে করে নির্দ্দেশ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা

শান্তিপথ গ্রন্থাবলী

নং ১ "শান্তি সঙ্গীত" পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী নিষ্কলচৈতন্য ভারতী প্রণীত এবং নং ২ "শুভমুহূর্ত্তে বা স্বামী নিষ্কলচৈতন্য ভারতী মহারাজের জীবনের এক অধ্যায়" শ্রীমৎ অদ্বৈতচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রণীত। উভয় গ্রন্থ কলিকাতা কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। পোঃ কাঁচড়াপাড়া (২৪ পরগণা) শান্তিমঠ হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৫ ও ৮৭পৃষ্ঠা কাগজের মলাট, মূল্য যথাক্রমে ⁄১০ ও ।॥০

"শান্তি সঙ্গীত" খানি অধ্যাত্ম বিষয়ক কয়েকটি গানের সমষ্টি; ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তিরস-পিপাসুগণ প'ড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। "শুভমুহূর্ত্ত"—লেখক মহাশয় কেমন করিয়া পুরীধামে স্বামীজীর পরিচয় ও দর্শন লাভ করেন, এবং কেমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বলাভ করিয়া ধন্য হন, তাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। "তুমি হারলে আমার হবে, আমি হারলে তোমার হব"—এই বলিয়া স্বামীজীর সঙ্গে পাশা খেলিতে বসিয়া, হারিয়া, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। ইহাই লেখক মহাশয়ের শুভ মুহূর্ত্ত। স্বামীজী প্রদত্ত পাশা খেলার ব্যাখ্যাটিও চমৎকার। "পাশা খেলা তার শক্তি, দান পাওয়া চাই, আবার চাল জানাও দরকার। ঠিক যেন দৈব আর পুরুষকার। দেখুন না, দান পড়ে ভাগ্যে অর্থাৎ দৈবে, আর চাল দিতে চাই বুদ্ধির কৌশল অর্থাৎ পুরুষকার। কারুর হয়ত দান পড়ে ভাল, কিন্তু চাল জানে না, অপরে হয়ত চাল জানে ভালদান পড়ে না—তারা উভয়ে ঠকে যায়। এই দেখনা, ভাগ্যবশে অনায়াসে অনেকে সুন্দর হৃদয় পায়, পারিপার্শ্বিক কাহারও সৎসঙ্গ পায়; কিন্তু সে সব জিনিষের সদ্ব্যবহার করে' সৎপথে অগ্রসর হতে পারে না। তারা অধ্যবসায় দ্বারা কর্ম্মের কৌশলে যোগ অবলম্বন করে নাই। ঘুটিগুলি তাদের বেঘোরে মারা পড়ে, বাজী হার হয়। অপর এক দল আছেন তাঁদের খুব চাল জানা আছে অর্থাৎ খুব বড় বড় জ্ঞানী, যোগী কর্ম্মী ইত্যাদি, কিন্তু হবে কি, দৈবের দান তাঁদের পক্ষে বিরূপ।"—অন্যত্র—"পাশা ত নয়, পাওয়ার আশা। কি পাওয়া জান? ঘর পাওয়া; যেখানে উঠলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। অনেকবার পাকা ঘুটি কাঁচিয়ে দিয়ে আবার গোড়া থেকে বুক লাগাতে হয়।"

এই পুস্তকে স্বামীজীর অনেক ধর্ম্মোপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার রসিকতাপূর্ণ যে সকল উক্তি স্থানে স্থানে ছড়াইয়া আছে সেগুলিও মনোরম।

১৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড সমাপ্ত।

কলিকাতা
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।